বাংলার লোক-সাহিত্য

চতুর্থ খণ্ড—কথা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম. এ., পি. এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক,
নয়াদিল্লীর জাতীয় সঙ্গীত-নাটক-আকাদেমির
'ফেলো', পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা
পরিষদের অবৈতনিক অধ্যক্ষ

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

কথাসাহিত্যিক

শ্রীযুক্ত ভবানী মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু

বাংলার লোক-সাহিত্য

প্রথম খণ্ড—আলোচনা

দ্বিতীয় খণ্ড—ছড়া

তৃতীয় খণ্ড—গীত ও নৃত্য

চতুর্থ খণ্ড—কথা

পঞ্চম খণ্ড—ধাঁধা

নিবেদন

'বাংলার লোক-সাহিত্য' চতুর্থ খণ্ড—কথা প্রকাশিত হইল। বাংলার লোক-কথার এ পর্যন্ত ইহাই বৃহত্তম সঙ্কলন এবং বিস্তৃততম আলোচনা। ইতিপূর্বে বাংলা লোক-কথার যে কয়েকটি সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই শিশু-পাঠ্য কিংবা স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। রূপকথা ও উপকথা সাধারণত শিশুপাঠ্য এবং ব্রতকথা সাধারণত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থরূপেই আমাদের মধ্যে প্রচলিত। কিন্তু ইহাদের যে প্রত্যেকটিরই এক একটি সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এ'যাবৎ বাংলার লোক-কথা সংগৃহীত এবং আলোচিত হয় নাই। বর্তমান সঙ্কলনে তাহারই প্রথম প্রয়াস দেখা যাইবে।

বাংলার নিজস্ব লোক-কথার ক্ষেত্রে কিছুকাল যাবৎ কতকগুলি বহির্মুখী প্রভাব আসিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ফলে প্রকৃত এই দেশীয় নিজস্ব লোক-কথা বলিতে যাহা বুঝাইতে পারে, তাহার সংখ্যা অত্যন্ত নির্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এ'দেশে পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী নানা লোক-কথা এ'দেশের শিশুসমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, বাংলার নিজস্ব লোক-কথার মধ্যে তাহাদের নানা উপকরণ নানাদিক দিয়া প্রবেশ করিতেছে। 'শিশুসাহিত্য' রচনা লাভজনক ব্যবসায় হইয়াছে; সেইজন্য নানা বিদেশী কাহিনীর বাংলা অনুবাদ নানাভাবে এ'দেশের শিশু-সমাজের সম্মুখে প্রতিনিয়তই উপস্থিত করা হইতেছে। বাংলার সুদূর পল্লী গ্রামেও আজ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার ফলে নানা ভাবে এই সকল বিদেশী গল্পের সংগ্রহ বাংলার শিশুরাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। মাতামহী পিতামহীদিগের আজ গল্প বলিবার শিক্ষা কিংবা সুযোগ নাই, শিশুরা হাতের কাছে যাহা পাইতেছে, তাহা পড়িয়াই তাহাদের এই অভাব পূর্ণ করিতেছে। সুতরাং 'বাংলার লোক-কথা' বলিতে আজ তাহা কতখানি প্রকৃতই বাংলার এবং কতখানি বাংলার বাহিরের, সাধারণের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমান সঙ্কলনটির মধ্যে যাহাতে প্রকৃত বাংলার লোক-কথাই স্থান পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে।

জাতির লোক-কথা সংগ্রহের উদ্দেশ্য নানা প্রকার হইতে পারে। প্রথমত শিশুর মনোরঞ্জন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোক-কথার সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য লোক-কথা সংগ্রহ করিলে ইহার মধ্য হইতে এমন কতকগুলি উপকরণ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক হয়, যাহা অন্যান্য দিক হইতে অপরিহার্য। অন্যান্য দিকের মধ্যে ভাষা-তত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং মনস্তত্ত্বের কথা উল্লেখযোগ্য। এই সকল বৈজ্ঞানিক দিকের সঙ্গে ইহার আরও একটি দিক আছে, তাহা ইহার কাব্যমূল্য।

ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে লোক-কথা সংগ্রহের একটি বিশেষ মূল্য আছে। মাতামহী-পিতামহীগণ যে-ভাষায় একটি কাহিনী প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাদের নিজস্ব ভাষার সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল রূপটির পরিচয় প্রকাশ পায়। একে ত নিরক্ষর মেয়েলী কথ্যভাষাই জাতির সর্বাপেক্ষা রক্ষণশীল ভাষা, তাহার উপর একটি প্রাচীন ধারা অনুসরণ করিয়া কাহিনীগুলি আবৃত্তি করা হয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে ভাষার প্রাচীন রূপ এবং প্রাচীন ভঙ্গিও অনেক সময় রক্ষা পায়। সেইজন্য ভাষার প্রাদেশিক রূপ (dialect) অনুশীলনের পক্ষে লোক-কথার ভাষার প্রাদেশিক রূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সংগ্রহ করা আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহার পক্ষে একটি প্রধান বাধা এই যে, বাংলা অক্ষরে নিখুঁত প্রাদেশিক উচ্চারণ অনুযায়ী কথ্য ভাষা প্রকাশ করা যায় না, শুধু বাংলা কথ্য ভাষা কেন, কোন ভাষার অক্ষর দ্বারাই কোন কথ্য ভাষাই নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্য এই উদ্দেশ্যে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এক International Phonetic Transcription ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে রোমান অক্ষরের মধ্যেই ভাষাতত্ত্বের আন্তর্জাতিক পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক স্বীকৃত নানা চিহ্নের ব্যবহার করিয়া প্রাদেশিক শব্দগুলিকে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কেবল মাত্র ভাষাতত্ত্ববিদেরই বোধগম্য হইতে পারে। সাধারণ সংগ্রাহক যেমন সে ভাবে কথাগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন না, তেমনই সাধারণ পাঠকেরও তাহা বোধগম্য হয় না। স্বর্গত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের প্রসিদ্ধ রূপকথার সংগ্রহ পূর্ববঙ্গের টাঙ্গাইল, মাণিকগঞ্জ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলেও টাঙ্গাইল-মাণিকগঞ্জের কথ্য ভাষায় সংগৃহীত হয় নাই। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর উপকথার সংগ্রহ 'টুনটুনির বই'ও পূর্বমৈমনসিংহ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইলেও কলিকাতা অঞ্চলের সাধু ভাষায় প্রকাশিত

হইয়াছে। তথাপি বর্তমান সংগ্রহে বাংলা অক্ষরের মাধ্যমেই কয়েকটি কাহিনী ইহাদের প্রাদেশিক কথ্যভাষার রূপ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রকাশ করা হইয়াছে। সর্বত্র এই রীতি অনুসরণ করিলে সাধারণ পাঠকের ইহা কোন কাজেই আসিত না।

জাতিতত্ত্বের (ethnology) দিক হইতেও লোক-কথা সংগ্রহের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, জাতির লোক-কথার সংগ্রহ যত আধুনিকই হউক না কেন, ইহা সর্বদাই একটি অতি প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া থাকে ; সেইজন্য ইহাদের মধ্যে সমাজ-জীবনের বহু বিস্মৃত আচার-আচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পাবা যায়। ইহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাটি অনুসরণ করিবার সুযোগ হয়। সেইজন্য জাতির লোক-কথা সংগ্রহ-কালে ইহার কোন অংশই অবান্তর বিবেচনা না করিয়া সামগ্রিক ভাবে তাহা সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়, সমসাময়িক রীতি ও নীতি-বোধ দ্বারা তাহা মার্জিত করিয়া লইলে তাহার সেই মূল্য আর থাকে না। ভাষা অপেক্ষাও এখানে বস্তুগত খুঁটিনাটির উপর বেশী লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হয়। এই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ সংগ্রাহকের প্রয়োজন। বর্তমান সংগ্রহে সেইদিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং প্রয়োজন মত ইহাদের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক উপকরণগুলির মূল্য এবং তাৎপর্য প্রতিটি কথার সঙ্গে একটি মন্তব্য যুক্ত করিয়া বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

নৃতত্ত্বের (anthropology) সঙ্গে জাতিতত্ত্বেরও যোগ আছে। জাতির লোক-কথার মধ্যে যেমন জাতিতত্ত্বের নানা মূল্যবান্ উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনই নৃ-তত্ত্বেরও উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কারণ, লোক-শ্রুতি (folklore) সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বেরই একটি অংশ এবং লোক-কথা জাতির লোক-শ্রুতিরই অন্যতম বিভাগ। মানব-সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে লোক-কথার ক্রমবিকাশের ধারা জড়িত। ইহাদের গভীর অনুশীলনের মধ্য দিয়া বিশেষ একটি জাতির সঙ্গে অতীতে যে সকল জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক সময় ইতিহাস তাহার সন্ধান দিতে পারে না। লোক-কথার মধ্য দিয়া জাতীয় চরিত্র যত সার্থকভাবে রূপায়িত হইয়া থাকে, লোক-সাহিত্যের আর কোন বিভাগের মধ্য দিয়া তাহা হয় না। সেইজন্য সমাজ-বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানুষের চারিত্রিক ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিবার পক্ষে জাতির লোক-কথা একটি

প্রধান অবলম্বন। বর্তমান সঙ্কলনে সেইদিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে এবং সম্ভব স্থলে কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিবারও প্রয়াস করা হইয়াছে।

তারপর মনস্তত্ত্ব। লোক-কথা জাতির মনস্তত্ত্ব অনুশীলনের একটি প্রধান অবলম্বন। স্বপ্নের মনস্তত্ত্ব অনুশীলন করিয়া মানব-চরিত্রের নানা রহস্যের যেমন উদ্ঘাটন সম্ভব হইয়াছে, জাতির লোক-কথার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াও তাহা সম্ভব হইতে পারে। কারণ, স্বপ্নের মধ্যে নানা অসংলগ্ন চিন্তা যেমন রূপ পায়, অচেতন এবং অবচেতন মনের বহু অতৃপ্ত অভিলাস যেমন সহজে মুক্তি লাভ করে, লোক-কথার মধ্যদিয়াও তাহাই সম্ভব হইয়া থাকে। কারণ, লোক-কথা বিশেষত রূপকথাও স্বপ্নদর্শী মনেরই সৃষ্টি। সমাজের অচেতন এবং অবচেতন-লোকের নানা ভাবনা-কল্পনা ইহাদের মধ্য দিয়া মুক্তি পায়। সেইজন্য অনেক সময় ইহাদের চিত্র এবং চরিত্রের আচার-আচরণগুলি আপাতদৃষ্টিতে আমাদের নিকট অসম্ভব এবং অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্তমান সঙ্কলনের মধ্যে দেখা যাইবে, মা সদ্যপ্রসূত সন্তানের মাংস আহার করিতেছেন, ভাই ভগিনীকে কাটিয়া তাহার মাংস খাইতেছে, ইত্যাদি বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যত বীভৎস এবং অসম্ভবই বিবেচিত হোক না কেন, ইহাদের আচরণ সুগভীর মনস্তত্ত্বমূলক, তাহা যথাযথ বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। লোক-কথায় বর্ণিত কোন আচার-আচরণই ইহার আবৃত্তিকারক বা আবৃত্তিকারিণীর স্বেচ্ছাপ্রসূত নহে, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা প্রত্যেকটিরই মর্মার্থ বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

লোক-কথাগুলি মৌখিক আবৃত্তির উদ্দেশ্যেই স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করা হইয়া থাকে, ইহারা কদাচ লিখিত হইয়া প্রচারিত হয় না। ইহাদিগকে বলিবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে, লিখিত ভাবে প্রকাশ করিতে গেলে ইহার সেই ভঙ্গিটি রক্ষা পায় না। তবে কোন কোন সংগ্রাহক সেই ভঙ্গিটি কিছু কিছু রক্ষা করিয়া তাহাদের সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অনেকে ভঙ্গিটি রক্ষা করিতে গিয়া প্রাদেশিক ভাষা বিসর্জন দিয়াছেন; তাহাতে ইহারা সর্বজনবোধ্য হইলেও ইহাদের লৌকিক রস হইতে ইহারা বঞ্চিত হইয়াছে। যেমন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁহার 'ঠাকুমার ঝুলি' এবং 'ঠাকুরদাদার ঝোলা' সংগ্রহ দুইটিতে মূল ভঙ্গিটি রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাদেশিক ভাষাটি বিসর্জন দিয়াছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহার 'টুনটুনির বই'য়ে মূলের প্রাদেশিক ভাষা যেমন বিসর্জন দিয়াছেন, তেমনই মূলের ভঙ্গিটিও পরিবর্তন

করিয়া নিজস্ব এক অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিজস্ব একটি রচনাশৈলী (Style) ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু লোক-কথা মাত্রেরই যে একটি ঐতিহ্যমূলক (traditional) রচনাশৈলী (style) আছে, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাদেশিক ভাষা এবং ভঙ্গি রক্ষা করিয়া কথাগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে তবেই সেই সংগ্রহ আদর্শ সংগ্রহ হয়। তবে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংগ্রহেই আঞ্চলিক ভাষার বিশিষ্ট রূপ সাধারণত পরিত্যক্তই হইয়া থাকে। বাংলা-দেশেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে দুই একজনের ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

বাংলার লোক-কথার যে তিনটি প্রধান বিভাগ আছে, যেমন রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা তাহাদের মধ্যে যদি পুরাণ-আচারবাদীদিগের মত গ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রতকথাকেই প্রাচীনতম এবং তাহা হইতেই অন্যান্য শাখার বিকাশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুরাণ-আচারবাদীদিগের বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান হইতেই লোক-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। তবে যাঁহারা পুরাণ এবং কিংবদন্তীর উৎস বলিয়া ইতিহাসকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইতিহাসকেই লোক-কথার উৎস বলিয়া স্বীকার করেন। বাংলার রূপকথা-গুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ব্রতকথা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাই হোক, ইহা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে এ'কথা সত্য, বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন এবং চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর কিছুর মধ্যেই প্রকাশ পায় নাই। বিশেষত ইহারা নানা বিষয়ে রক্ষণশীল বলিয়া বাঙ্গালীর সমাজ ও আচার জীবনের এক অতি প্রাচীন রূপ ইহাদের মধ্য দিয়াই সার্থকতমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতার কথা ইহাদের মধ্যে অবান্তর মাত্র। সমাজ এবং মানুষই ইহাদের মধ্যে মুখ্য। সেইজন্য বর্তমান সংগ্রহে তাহাদেরও একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকটি লোক-কথার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন পাঠান্তর নির্দেশ করিবার জন্য বিভিন্ন পাঠই সঙ্কলিত হইয়াছে। ভৌগোলিক এবং সামাজিক কারণে ইহারা যে মূল অভিপ্রায় অক্ষুন্ন রাখিয়াও বহিরঙ্গে নানা পরিবর্তন স্বীকার করিয়া লয়, তাহাই এই পাঠান্তরগুলির মধ্য দিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। ইহাদিগকে এক গোষ্ঠীর (group) গল্প বলিয়া নির্দেশ করা

যায়, যেমন শঙ্খকুমার গোষ্ঠী, রুমনা-ঝুমনা গোষ্ঠী কিংবা নাগ-সন্তান গোষ্ঠী। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কি ভাবে ইহারা আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা ইহাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর বিভিন্ন গল্পের তুলনামূলক আলোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা হইতে কোন্ অঞ্চলের গল্পটি প্রাচীনতম ঐতিহ্যের বাহক, তাহাও অনুমান করা সহজ হইবে।

কথাগুলি দীর্ঘকাল যাবৎ নানা সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলার বহু আঞ্চলিক প্রাচীন পত্র-পত্রিকার প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে সকল কথা প্রকাশিত হইয়া আজ লোক-চক্ষুর অন্তরালবর্তী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকেও সন্ধান করিয়া বিষয়-অনুযায়ী ইহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্বোল্লিখিত 'ঠাকু'মার ঝুলি', 'ঠাকুরদাদার ঝোলা', 'টুনটুনির বই'য়ের গল্পগুলিও লোক-মুখে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে, লিখিত গ্রন্থ হইতে তাহা পুনরায় মৌখিক প্রচারিত হইতে স্বাভাবিক নিয়মেই কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে এইভাবে আরও পরিবর্তিত হইবে। ইহারা মৌখিক যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, সেইভাবে কিছু কিছু বর্তমান সঙ্কলনে প্রকাশিত হইল। সম্ভব ক্ষেত্রে প্রত্যেক কথারই সংগ্রহ-কালও উল্লেখ করা হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের লোক-সাহিত্য বিষয়ের ছাত্রছাত্রীগণ মেদিনীপুর জেলার বাঁশপাহাড়ী, বেলপাহাড়ী, হাতিবাড়ী এবং পুরুলিয়া জিলার কাঁটাদি এবং অযোধ্যা পাহাড়ের সংগ্রহ-শিবিরে যোগদান করিয়া আমার সংগ্রহ কার্যে সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থমুদ্রণ কার্যে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীসনৎকুমার মিত্র, শ্রীসুধীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডক্টর শ্রীমতী আশা দাশ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। আমার প্রাক্তন ছাত্র অধুনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনবিভাগের সংরক্ষক শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী পশ্চিম বাংলার বনাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া গল্পগুলি সংগ্রহ করিবার সময় আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার আশীর্বাদ ভাজন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ
মহালয়া, ১৩৭৩ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

বাংলার লোক-সাহিত্য

চতুর্থ খণ্ড—কথা

ভূমিকা

এক

লোক-কথার বিশেষত্ব

প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কথাসাহিত্যের দুইটি ধারা—একটি মৌখিক এবং আর একটি লিখিত। লিখিত ধারাটির উদ্ভব হইবার পূর্বে কেবল মাত্র মৌখিক ধারাটিরই অস্তিত্ব ছিল, ক্রমে সমাজে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ধারাটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মৌখিক ধারাটি যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা নহে—তবে তাহার প্রাণশক্তি বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, এ কথা সত্য। সকল দেশেই যে মৌখিক ধারাটির উপর ভিত্তি করিয়াই লিখিত ধারাটির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও নহে। লিখিত সাহিত্যের মধ্যস্থতায় দেশবিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে অনেক ক্ষেত্রে এক দেশের লিখিত কথাসাহিত্যের প্রভাবের ফলে অন্য দেশের লিখিত কথাসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে ; তবে এ কথা সত্য যে, তাহারও অন্তস্তলে জাতির নিজস্ব মৌখিক সাহিত্যধারার গৌণ প্রভাব রহিয়াছে। যেমন বাংলাদেশের কথাই যদি ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এ'দেশে যে লিখিত কথাসাহিত্য ধারার জন্ম হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ ইংরেজি লিখিত কথাসাহিত্যের প্রভাবজাত হইলেও ইহারও মর্মমূলে দেশীয় মৌখিক কথাসাহিত্যের যে একটি ঐতিহ্য ছিল, তাহার প্রভাবও অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইহার মধ্যে সক্রিয় হইয়া আছে। তবে ইহার উপরিস্তরে তাহা অনেক সময় বোধগম্য নহে।

মৌখিক কথাসাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার এমন একটি প্রাণশক্তি (vitality) আছে যে, তাহা অতি সহজেই দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করিতে পারে। লিখিত ভাবে প্রচারিত হইলেও ইহার এই ধর্ম যে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়, তাহা নহে। সেইজন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন, ইউরোপ মহাদেশের সকল মৌখিক কথাসাহিত্যই একদিন ভারতবর্ষ হইতে মৌখিক কিংবা লিখিত হইয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল—ঈশপের উপকথা, সিণ্ডেরেলার কাহিনী ইত্যাদি সকলই একদিন ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের নানা সূত্রে যোগাযোগের ফলে ইউরোপ মহাদেশ ভারতবর্ষ হইতে লাভ করিয়াছে। ভারতের মৌখিক কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় যে

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল, তাহা লিখিত কথাসাহিত্যের প্রথম আবির্তাবের যুগে সংস্কৃত ও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষায় যে বিপুল কথাসহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। পৈশাচী ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা', পালি ভাষায় লিখিত বুদ্ধজীবন-কাহিনী 'জাতক', সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 'কথাসরিৎ-সাগর', 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী', 'দশকুমার-চরিত', 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদির কাহিনী যে একদিন মৌখিকই ভারতের বিভিন্নধর্মী এবং বিচিত্র জীবনধারা অনুগামী জন-সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তারপর ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত হইয়া দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এমন কি, লিখিত হইবার পুর্বেও প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক কাল হইতেই ইউরোপ এবং এশিয়া ভূখণ্ডের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে নিরক্ষর ভারতীয়দিগের যে নানা ভাবে যোগাযোগ সাধিত হইয়াছিল, তাহার ফলেও তাহা মৌখিকই প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও মনে করিয়াছেন যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে রূপকথা (fairy tales, Marchen) কিংবা উপকথা (animal tales) ইত্যাদি প্রচলিত আছে, তাহা একদিন অতীতে ভারতের সঙ্গে ইউ-রোপের যোগাযোগ সূত্রেই ভারত হইতে ইউরোপে প্রচারিত হইয়াছিল ; তবে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করিবার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্থানীয় রূপ লাভ করিয়াছে। ভারতের কেবল মাত্র পশ্চিম অঞ্চলেই নয়, পূর্বাঞ্চলেও ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিস্তারের ফলে ভারতীয় কথা-সাহিত্য সেখানেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য এখনও ব্রহ্মদেশ, মালয়, সুমাত্রা, বলি, কাম্বোডিয়া, শ্যামরাজ্য, চীন, জাপান এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন যুগ এবং মধ্যযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষে মৌখিক এবং লিখিত কথাসাহিত্যের যে বিপুল ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই পরবর্তী কালে আধুনিক কথাসাহিত্য রচনার মধ্যে গৌণ প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে।

মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে বাংলাদেশে এখনও যাহা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা ইত্যাদিই প্রধান। সাম্প্রতিক কালে লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও মৌখিক ধারার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই ইহারা সমাজে প্রচার লাভ করিয়া থাকে। লিখিত কিংবা মুদ্রিত রূপগুলি ইহাদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মাত্র দূর করিয়া থাকে। ইহারা এখনও পল্লী অঞ্চলে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া নিরক্ষর সমাজের কথাসাহিত্যের রস-পিপাসা চরিতার্থ

করিবার সহায়তা করে, কেবলমাত্র যে শিশুদিগের কৌতূহল দূর করে, তাহা নহে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইহাকে 'শিশুসাহিত্য' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। একটু গভীর ভাবে বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহা পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরই উপভোগের রস-বস্তু—শিশুর সম্যক্ উপভোগের বস্তু নহে। কারণ, রূপকথা মাত্রেরই বিষয়-বস্তু প্রেম, উপকথা মাত্রেরই লক্ষ্য জীবন ও সমাজ-দর্শন এবং ব্রতকথার লক্ষ্য ঐহিক কল্যাণ। ইহাদের উপরিস্তরে যে লঘু কল্পনা কিংবা হাস্যরসের আবরণই থাকুক না কেন, ইহাই ইহাদের চরম লক্ষ্য নহে; তাহা অতিক্রম করিয়া ইহাদের আরও যে একটি লক্ষ্যে পৌঁছিতে হয়, তাহাতে শিশুর দৃষ্টি কিংবা অনুভূতি গিয়া পৌঁছিতে পারে না, তাহা কেবলমাত্র পরিণত বয়স্কেরই লক্ষ্যগোচর হইতে পারে। সুতরাং পরিণত বয়স্কের জন্য লিখিত কথাসাহিত্যের সঙ্গে ইহাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া কোন পার্থক্য নাই, কেবলমাত্র উদ্দেশ্যসিদ্ধির যে প্রণালী, তাহার মধ্যেই পার্থক্য আছে। তবে এ কথা সত্য, আধুনিক কথাসাহিত্য লিখিত হইবার ফলে ইহার একই কাহিনী যেমন উপন্যাসের মত দীর্ঘায়তন লাভ করিতে পারে, মৌখিক কথা-সাহিত্যের কোন একক কাহিনী এত দীর্ঘ হয় না। রূপ-কথা দীর্ঘতম মৌখিক কথা; কিন্তু তথাপি ইহা আধুনিক উপন্যাসের মত এত দীর্ঘ রচনা হইতে পারে না। উপকথাগুলি আরও সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, আকারের দিক দিয়া ইহারা আধুনিক সংক্ষিপ্ত ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে। শুধু আকারের দিক হইতেই নহে, উভয়ের মধ্যেই যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অভিন্ন। মৌখিক কথার ক্ষেত্রে পশুপক্ষীর রূপকের মাধ্যমে মানুষের কথাই বলা হয়, লিখিত ছোটগল্পের ক্ষেত্রে নরনারীর চরিত্র কোন রূপকের সহায়তা ব্যতীতই প্রত্যক্ষভাবে আসিয়া আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে জীবন-দৃষ্টির দিক দিয়া কিছুই পার্থক্য নাই। এই শ্রেণীর রচনাই যে আধুনিক কালে ছোট গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কতদূর সঙ্গত হইবে, তাহা বিবেচনার বিষয়।

মৌখিক কথাসাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা অতি সহজেই দেশান্তরে বিভিন্ন ভাষাভাষীদিগের মধ্যেও প্রচার লাভ করিতে পারে। গদ্য ইহার বাহন বলিয়াই যে ইহা সম্ভব, একমাত্র তাহাই নহে; ইহার বিষয়বস্তুর মধ্যেও এমন একটি সর্বজনীনতা থাকে, যাহা অতি সহজেই সকল শ্রেণীর সমাজের নিকটই গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যে সর্বজনীন

আবেদন সত্ত্বেও তাহা এত সহজে প্রচার লাভ করিতে না পারিবার কতকগুলি কারণ আছে; প্রথমতঃ লিখিত কথাসাহিত্যের মধ্যে একটি বিশেষ দেশের বিশেষ একটি সমাজ অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, কিন্তু মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কোন দেশ কিংবা বিশেষ কোন সমাজের কোন রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না, ইহার এই নির্বিশেষত্বের গুণে ইহা যে কোন দেশে যে কোন কালে সমাদৃত হইতে পারে। যে গল্পের নায়ক এক রাজপুত্র, তাহা যেমন যে-কোন দেশের কাহিনীর মধ্যে নিজস্ব বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, তাহার পরিবর্তে যদি নায়ক হয় মানসিংহের পুত্র যুবরাজ জগৎসিংহ, তবে তাহা তত সহজে অন্য কোন দেশের সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। কারণ, জগৎসিংহ বিশেষ কোন দেশ এবং কালের পরিচয়ে বাঁধা, কিন্তু 'এক রাজপুত্র' তাহা নহে—তাহাকে যে-কোন দেশে যে-কোন সময়ে লইয়া গিয়া স্থাপন করা যায়। এই নির্বিশেষতার পরিবর্তে বিশিষ্টতা অর্জনই আধুনিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক কথাসাহিত্যের মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি করিবার মূল। এই জন্যই লোক-কথা (Folktales) যত সহজে দেশ-দেশান্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে, উপন্যাস ও ছোটগল্প তত সহজে বিদেশে প্রচার লাভ করিতে পারে না। এমন কি, একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লিখিত কথাসাহিত্যের প্রচার সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে। রূপকথা বাংলার আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য কেবল মাত্র বাঙ্গালী শিক্ষিত হিন্দু সমাজে সীমাবদ্ধ, ক্রমে সমাজ-জীবনের নৈতিক আদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা হিন্দু সমাজের ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। অল্পসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু মাত্র বঙ্কিম আদর্শের সমর্থক; কিন্তু মৌখিক কথাসাহিত্যের আবেদন বিশেষ কোন যুগ-নির্ভর নহে বলিয়াই, ইহা যেমন সর্বকালীন, তেমনই সর্বদেশীয়।

মৌখিক কথাসাহিত্যের কোন বিষয়ই—যেমন, রূপকথা, উপকথা কিংবা ব্রতকথা আকস্মিকভাবে কোন নাটকীয় ঘটনা দ্বারা আরম্ভ হয় না, লিখিত কথা-সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাসের মধ্যেও সেই বিশেষত্বটি অনুভব করা যায়। যেমন, রূপকথায়-'এক যে ছিল রাজা', উপকথায় 'এক যে ছিল শেয়াল' কিংবা ব্রতকথায় 'এক ভিক্ষাসুর বামুন'—এই প্রকার কাহিনী-সূচনা শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনই উপন্যাসেও শুনিতে পাওয়া যায়, 'হরিদ্রা গ্রামে একঘর জমিদার ছিলেন, জমিদারের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়,' কিংবা 'রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশে রূপনগর

নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল' ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিক কথাসাহিত্যের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের উপর ক্রমেই গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে বলিয়া এইভাবে সহজ ঘটনার কথা উল্লেখ করিবার পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণ দ্বারাই উপন্যাসের সূচনা হইয়া থাকে। এইভাবেই ক্রমে এই বিষয়ে লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে মৌখিক সাহিত্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতেছে।

স্মৃতির পক্ষে লঘুভার করিবার জন্য মৌখিক কথাসাহিত্যে কতকগুলি প্রণালী অনুসরণ করা হয়, লিখিত কথাসাহিত্যে তাহা অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয় না। যেমন, মৌখিক কথাসাহিত্যে বিভিন্ন উপলক্ষে একই অবস্থা (situation) বর্ণনা করিবার জন্য বিভিন্ন বর্ণনা ব্যবহার করিবার পরিবর্তে পূর্ববর্তী বর্ণনারই পুনরাবৃত্তি করা হইয়া থাকে। কাক ও চড়ুই-র উপকথায় কাক সর্বত্র গিয়া এক কথাই বলিতেছে—'ভাই গেরস্ত, দাও ত আগুন, গড়বে কাস্তে, কাটবে ঘাস, খাবে গাই, দেবে দুধ, খাবে কুত্তা, হবে তাজা, মারবে মোষ, লব শিং, খুঁড়ব মাটি, গড়ব ঘটি, তুলব জল, ধোব ঠোঁট—তবে খাব চড়াইর বুক।' লিখিত কথাসাহিত্যে স্বভাবতই এই বিশেষত্বটি বর্জিত হইয়াছে; কারণ, এখানে স্মরণ করিয়া রাখিবার কিছুই আবশ্যক হয় না। তবে দেখা যায়, মধ্য যুগ পর্যন্ত কোনও কোনও লিখিত আখ্যায়িকা-কাব্যে মৌখিক কথাসাহিত্যের ঐতিহ্য বা সংস্কার অনুসরণ করিয়া এই রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে; ইহা হইতে কি ভাবে যে ক্রমবিকাশের সূত্র ধরিয়া লোক-কথা হইতে উচ্চতর কথা-সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

লোক-কথায় সাধারণত সকল প্রকার জটিলতা পরিহার করা হইয়া থাকে, জটিল কাহিনী এবং জটিল বর্ণনা দ্বারা লোক-কথা কদাচ ভারাক্রান্ত হয় না। নির্মল নদীস্রোতের মত কাহিনীর একটি স্বচ্ছ ধারা স্বচ্ছন্দ গতিতে ইহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। লিখিত কথাসাহিত্যে যে বর্ণনার অতিরঞ্জন এবং কৃত্রিমতা দেখা যায়, অতি রোমান্টিকতার উদ্দাম উল্লাস যেমন ইহার কাহিনীকে মর্ত্যের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এক অনির্দেশ্য ঊর্ধ্বলোকের দিকে ধাবমান করে, লোক-কথা কিংবা মৌখিক কথাসাহিত্যে তাহা দেখা যায় না। যাহা লিখিত হয়, তাহা যেমন ফেনাইয়া ফেনাইয়া, বাড়াইয়া বাড়াইয়া, অতিরঞ্জিত এবং কৃত্রিম করিয়া তুলিতে পারা যায়, স্মৃতি-প্রবাহে ভাসমান মৌখিক কথাসাহিত্যে তাহা ইচ্ছা করিলেও সম্ভব হয় না। লিখিত কথাসাহিত্য ব্যক্তির রুচি এবং শিল্পবোধজনিত সৃষ্টি বলিয়া তাহার মধ্যে লেখকের একটি ব্যক্তিত্ব

(personality) যেমন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, লোক-কথায় তেমন হইবার কোন সুযোগ থাকে না ; লোক-কথায় ব্যক্তিমানস অবলুপ্ত হইয়া যায় ; কিন্তু উপন্যাসে লেখকের ব্যক্তিমানস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় ; এই সূত্র অনুসরণ করিয়া ইহা কৃত্রিম এবং অবাস্তব হইয়া উঠে। কিন্তু লোক-কথা বৃহত্তর সমাজ-মানসের সৃষ্টি বলিয়া এবং সমাজ-মানসেই ইহা জীবন্ত ভাবে বিধৃত বলিয়া ইহা কখনও কৃত্রিম হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় না। লিখিত কথাসাহিত্য ব্যক্তি-প্রতিভার স্পর্শে ভাষায় এবং ভাবে বিশিষ্টতা লাভ করে বলিয়া এবং বিশেষ একটি রূপে ও আদর্শে লিখিত হইবার ফলে নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া নূতন রূপ লাভ করিতে পারে না বলিয়া এক অনমনীয় (rigid) রূপ গ্রহণ করে ; কিন্তু মৌখিক কথাসাহিত্য মৌলিক বক্তব্য বিষয় অভিন্ন রাখিয়া যুগে যুগে বহিরঙ্গে নব নব রূপান্তরকে অস্বীকার করে না, যুগের ও সমাজের দাবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ইহার পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি হয় ; সেইজন্য ইহা কদাচ অনমনীয় (rigid) হইয়া উঠিয়া একটি অবিচল আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না।

লোক-কথায় সাধারণতঃ দুর্বল এবং অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি, খলচরিত্রের প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা এবং বীর চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় প্রকাশ পাইয়া থাকে। লিখিত কথাসাহিত্যে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতি অনুসরণ করা হয় না ; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, এই নীতির যে খুব বিশেষ কোনও ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে, তাহাও নহে। সুতরাং ইহার মধ্য দিয়াও মৌখিক কথাসাহিত্যের সংস্কারই যে লিখিত কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়া গৌণভাবে হইলেও অনুসরণ করা হইয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে আধুনিক লিখিত কথাসাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, বাংলার মৌখিক কথা-সাহিত্যের সঙ্গে মুখ্যত তাহার কোন সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে নাই ; কারণ, তাহা মুখ্যত ইংরেজি লিখিত কথাসাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব বশতই সৃষ্ট হইয়াছিল।

দুই

লোক-কথার বিস্তার

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে লোক-কথার বিস্তার যত ব্যাপক, তেমন আর কোন বিষয়েরই নহে। লোক-কথার মধ্যে এমন একটি সর্বজনীন আবেদন প্রকাশ পায়, যাহার গুণে ইহা অতি সহজেই দেশান্তরে প্রচার লাভ করিয়াও ইহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে। বিশেষতঃ সর্বস্তরের মানুষের গল্প শুনিবার যে একটি স্বাভাবিক আগ্রহ আছে, তাহাও লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অনেক বেশী।

লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করিলে লোক-কথাকে প্রাচীনতম বলিয়াও মনে হইতে পারে। কারণ, মৌলিক বিষয়-বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহা বহিরঙ্গে নানা পরিবর্তন স্বীকার করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারে। সেই সূত্রে ইহা দেশান্তরে গিয়া স্বতন্ত্র ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াও প্রচারিত হয়। কিন্তু কোন ছড়া কিংবা গীতি দেশান্তরের ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতে পারে না। বাংলা ছড়া কিংবা বাংলা গান কোনদিন বাংলার প্রতিবেশী জাতি সাঁওতালের ভাষায় পরিবর্তিত হইতে পারে না; কারণ, ছড়া কিংবা গীত ছন্দোবদ্ধ রচনা বলিয়া ইহা বাংলা ভাষায় নিজস্ব ধ্বনি-গুণের উপর সৃষ্ট; সুতরাং দেশান্তরের ভাষায় পরিবর্তিত হইতে গেলে ইহার নিজস্ব ছন্দ ও ধ্বনির মধ্যে আঘাত লাগে; অতএব ইহার পক্ষে তাহা হইবার উপায় থাকে না। কিন্তু লোক-কথা গদ্যে রচিত, সুতরাং ইহাতে বিশেষ কোন ভাষার ছন্দ ও উচ্চারণ গঠনের কোন কথাই আসে না; অতএব দেশান্তরের গদ্য ভাষায় তাহা সহজেই রূপান্তরিত হইতে পারে। বিষয়-বস্তুকে অবিকৃত রাখিয়া সেই জন্যই লোক-কথা এক দেশ হইতে অন্য দেশে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় সহজেই প্রচার লাভ করিয়াছে।

দেশ দেশান্তরে লোক-কথার প্রচারের পক্ষে কোন বাধা না থাকিবার ফলে ইহা যেমন অতি সহজেই নানা উপায়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, তেমনই ইহা একটি সু-প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিবারও সুযোগ লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যত প্রাচীন কালেই ইহার উদ্ভব হোক না কেন, ইহার প্রাণধারা সমাজের মধ্যে রক্ষা পাইতে কোন বাধা হয় না। কারণ, কোন লোক-কথাই যথার্থ অর্থে

প্রাচীন বলিতে যাহা বুঝায়, কদাচ তাহা হইতে পারে না। ঈশপের উপকথার কিংবা পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের মূল ভাষা প্রাচীন হইয়া গেলেও ইহাদের বিষয়-বস্তু কোনদিনই প্রাচীন হয় না। সেই জন্য পৃথিবীর কোন অংশেই ইহাদের শ্রোতার যেমন অতীতেও অভাব হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।

ইহার একটি প্রধান কারণ, লোক-চরিত্রের কতকগুলি মৌলিক বিষয়ই প্রধানতঃ লোক-কথার অবলম্বন হইয়া থাকে; সেইজন্য ইহা দেশান্তরে প্রচারের পক্ষে যেমন সহজ হয়, তেমনই দেশ দেশান্তরের লোক-কথার মধ্যেও একটি ঐক্য সৃষ্টি হইতে পারে। লোক-সাহিত্যের অন্যতম বিষয় গীতিকা (ballad)-র মধ্যেও লোক-চরিত্রের কথা আছে সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গীতিকার বহিরঙ্গে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহার জন্য ইহা কখনও লোক-কথার মত সর্বজনীন ও সর্বকালীন আবেদন সৃষ্টি করিতে পারে না। সর্বজনীন আবেদন ত দূরের কথা, ইহার বহিরঙ্গ গঠনের বিশেষত্বের জন্যই গীতিকা একই ভাষাভাষী অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে সমান প্রচার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু লোক-কথার বহিরঙ্গ গঠনের কোন বিশেষত্ব নাই। বিষয়-বস্তুই ইহার মূল লক্ষ্য, বিষয়-বস্তুর সর্বজনীনতার গুণেই ইহা সহজেই সর্বত্র প্রচার লাভ করিয়া থাকে।

লোক-কথার মধ্যে কোন নীতি কিংবা তত্ত্ব প্রচারিত হয় না বলিয়াও ইহা সব শ্রেণীর সমাজের মধ্যে সমান প্রচার লাভ করিতে পারে। তবে নীতি-মূলক কথা যে নাই, তাহা নহে—কিন্তু লোক-কথায় নীতি থাকিলেও তাহা কোন ধর্মীয় কিংবা সামাজিক নীতি নহে, তাহা ধর্মচিন্তানিরপেক্ষ মানবিক চারিত্র-নীতি মাত্র। সেই সূত্রেই ইহার সর্বজনীনতায় কোনও বাধা সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু যেখানেই ধর্মীয় কিংবা সম্প্রদায়গত কোন নীতির কথা আছে, সেখানেই ইহাদের সর্বজনীন প্রচারের অন্তরায় সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৌদ্ধ জাতকের কথা উল্লেখ করা যায়। বুদ্ধদেবের অতীত জীবন কথা বর্ণনা করিয়া যে কাহিনী পালী ভাষায় জাতক নামে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতক লোক-কথার গুণ থাকিলেও, তাহা বৌদ্ধধর্মের নীতি এবং আদর্শকে একান্ত করিয়াছিল বলিয়া তাহা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া সর্বত্র বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ চারিত্র নীতির উপর নির্ভর করিয়া উদ্ভূত হইলেও কালক্রমে ইহার যে সাম্প্রদায়িক রূপ বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়াই ইহার সর্বজনীন আবেদন ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সেইজন্য বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া অন্য ধর্ম এবং সমাজের

মানুষকে হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার মধ্যেই ইহাদের লোক-কথাগত গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু লোক-কথার ভিত্তির উপরই জাতকের কাহিনী একদিন রচিত হইয়াছিল; সেইজন্য ইহাদের কোন কোন অংশে সাহিত্যিক গুণ বিদ্যুতালোকের মত চকিতে কোন কোন সময় বিকাশ লাভ করে; কিন্তু ইহাদের মূল লক্ষ্যের নিকট ইহার সাহিত্যিক ধর্ম রক্ষা পাইতে পারে নাই।

বাংলাদেশের ব্রতকথাগুলি বিশ্লেষণ করিলেও দেখা যাইবে, মূলতঃ লোক-কথা হইতেই ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, ইহাদের সর্বাঙ্গে এখনও সাহিত্যিক স্পর্শ অনুভব করা যায়, একটি ধর্মীয় লক্ষ্য ইহার সম্মুখে আনিয়া যেন জোর করিয়া অনেক সময় স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার ফলেই ইহাদের আবেদনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে। লোক-কথা এইভাবে যখন কোন সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন ইহার প্রাণশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়; তাহার ফলে বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে ইহা বিচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমে ইহা কেবলমাত্র আচারগত উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে না। বাংলার ব্রতকথাগুলি তাহারই প্রমাণ। ব্রতকথাগুলির বহুলাংশে সর্বজনীন মানবিক আবেদন থাকা সত্ত্বেও ইহারা ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কেবল মাত্র ব্রত-পার্বণের ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে সর্বজনীন ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীন প্রচারে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবেই লোক-কথার প্রাণধারা যে লুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। লোক-কথার মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ফলে ধর্মীয় কথায় প্রাণপ্রবাহ লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু লোক-কথার মৌলিক ধারাটি অব্যাহত ভাবেই সমাজ মানসে অগ্রসর হইতে থাকে। ধর্ম এবং আচারের প্রভাব যখন সমাজের মধ্যে খুব ব্যাপক হইয়া উঠে, তখন ইহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে না পারা গেলেও ইহার প্রেরণা কোনদিনই একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারে না। যে লোক-কথার উপর ভিত্তি করিয়া জাতকের কাহিনী রচিত হইয়াছিল, তাহার ধারা গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' সোমদেবের 'কথা-সরিৎ-সাগর', বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে'র মধ্য দিয়া অব্যাহত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; কিন্তু জাতকের মধ্যে ইহার যে ধারাটি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ইহার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের পথে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাহার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। বিশাল নদীর প্রবাহ হইতে একটি ধারা যেমন পথ ভুলিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া কালক্রমে শুষ্ক হইয়া

যায়, তেমনই লোক-কথার বিশাল প্রবাহ হইতে যদি কোন ধারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া কোন ধর্মীয় খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া শুষ্ক হইয়া যায়।

লোক-কথা অতি সহজেই ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। কারণ, ধর্ম প্রচারের ইহা অপেক্ষা সহায়ক আর কিছুই নাই। সাধারণ নিরক্ষর সমাজের মধ্যে লোক-কথার আবেদনই সর্বাধিক বলিয়া ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমই ইহাকে অবলম্বন করা হইয়া থাকে। এই ভাবেই বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলি প্রথম রচিত হইয়াছিল; তারপর এই সম্পর্কে একটি ধারা প্রবর্তিত হইবার ফলে সেই ধারায় ক্রমে শত শত বৌদ্ধ নীতিমূলক কাহিনী রচিত হইয়াছে। ধর্ম প্রচারের উগ্র মনোভাব যখন ক্রমে অসহিষ্ণু পরিচয় লাভ করিল, তখন ইহাদের মধ্য হইতে লোক-কথার সকল গুণ দূরীভূত হইয়া গিয়া তাহা পূর্ণাঙ্গ সাম্প্রদায়িক রচনায় পর্যবসিত হইল। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাহিরে ইহাদের আর কোন আবেদন প্রকাশ পাইতে পারিল না। বৌদ্ধ ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়া জৈন ধর্মও নীতি-মূলক কাহিনী রচনার ভিতর দিয়া ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিল, ইহার এই উদ্দেশ্যে রচিত কাহিনীগুলি 'ধম্মকহা' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতনের সঙ্গে যেমন জাতকের কাহিনীগুলির সম্পর্ক ছিল, জৈন ধর্মের উত্থান-পতনের সঙ্গেও তেমনই 'ধম্মকহা'র উত্থান পতনের ইতিহাস জড়িত হইয়া গেল। অনেকে মনে করেন, জৈন 'ধম্মকহা'র ধারায় হিন্দু ধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের সামঞ্জস্য পরিকল্পনা করিয়া কালক্রমে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের যুগে বাংলায় মেয়েলী ব্রতকথাগুলির উদ্ভব হইয়াছে। জাতকের সঙ্গে ধম্মকহা এবং বাংলার মেয়েলী ব্রতকথাগুলির একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, জাতকে পরধর্মের প্রতি যে অসহিষ্ণু মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, ধম্মকহা কিংবা বাংলার মেয়েলী ব্রতকথায় তাহা পায় নাই। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইলেও কালক্রমে ধম্মকহা সাহিত্যিক প্রাকৃত বা literary প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া কালক্রমে তাহাও প্রাচীন ধর্মীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু বাংলা মেয়েলী ব্রতকথা মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হইবার ফলে ইহার প্রাণধারা অব্যাহত আছে। ব্রতকথারও যে অংশটি লিখিত হইয়াছে, তাহার প্রাণধারা বিলুপ্ত হইয়াছে।

লোক-কথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়া যখন কোন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সাধন করিতে যায়, তখনই ইহা লুপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবী ক্রমেই যত সম্প্রদায়গত কিংবা ধর্মীয় চিন্তাধারা দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, লোক-কথার সেই অনুযায়ী ততই অপব্যবহার হইয়াছে। ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্র হইতে লোক-কথার উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও ইহা জাতির ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে না; সেইজন্য বেদ, বাইবেল প্রভৃতি প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থের মধ্যেও লোক-কথার বহু উপকরণ প্রবেশ করিয়া ইহাদের একদিক দিয়া সর্বজনীন আবেদন ও অপর দিক দিয়া স্বাধীন বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

বাংলার রূপকথা এবং উপকথাগুলিও ক্রমে ব্রতকথায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়া ইহাদের মধ্য হইতে সাহিত্যগুণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে অনেক প্রচলিত ব্রতকথাই রূপকথা কিংবা উপকথার ক্ষেত্রে হইতে আসিয়াছে এবং অতি সহজেই ইহাদের মধ্য হইতে ধর্মীয় লক্ষ্যটুকু পরিত্যাগ করিয়া ইহাদিগকে পুনরায় রূপকথা কিংবা উপকথার ক্ষেত্রে ফিরাইয়া লইয়া আসিতে পারা যায়। ব্রতকথা কিংবা ধর্মীয় আচারের ক্ষেত্রে এই কাহিনীগুলি প্রবেশ করিবার ফলে ইহারা আর পরিবর্তিত হইতে কিংবা বিকাশ লাভ করিতে পারে না, তবে ইহার মূল ধারাটি যদি রূপকথা কিংবা ব্রতকথার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করিতে পারে, তবে তাহার ক্রমবিকাশে কোন বাধা হয় না। ক্রমে একই রূপকথা কিংবা উপকথা লইয়া দুইটি ধারা সৃষ্টি হয়—একটি রূপকথার মৌলিক ধারা, আর একটি ব্রতকথার ধারা। ব্রতকথার ধারাটি একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়া সেখানেই ইহার শেষ শয্যা রচনা করে, রূপকথার মূল ধারাটি ক্রমবিকাশ লাভ করে।

তিন

জাতীয় চরিত্র ও লোক-কথা

লোক-কথার মধ্য দিয়া যে সর্বজনীন আবেদনই প্রকাশ পাক না কেন, ইহার সম্পর্কে এ কথাও সত্য, ইহার মধ্য দিয়া জাতির বিশিষ্ট চরিত্রের রূপটিও প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা না হইলে জাতির সাহিত্য হিসাবে ইহার কোন মূল্যই থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায়, কথাসাহিত্যের যে দুইটি প্রধান বিভাগ অর্থাৎ রোমান্স ও উপন্যাস সেই অনুযায়ী লোক-কথাও দুইটি সুস্পষ্ট ভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। ইহার যে অংশ রোমান্টিক অর্থাৎ কল্পনানির্ভর, তাহা যত সহজে দূর দেশান্তরে প্রচার লাভ করিতে পারে, ইহার দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ যে অংশ প্রত্যক্ষ বা বাস্তব জীবনাশ্রয়ী, তাহা তত সহজে দেশান্তরে বিস্তার লাভ করিতে পারে না। তবে এ কথাও সত্য, বাস্তব জীবনের একান্ত খুঁটিনাটি বিষয় লোক-কথার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না; যাহা সবিশেষ, লোক-সাহিত্যে তাহার স্থান নাই, যাহা কেবল মাত্র নির্বিশেষ ইহাতে কেবল মাত্র তাহারই স্থান আছে। সেইজন্য লোক-কথার চরিত্র মাত্রই type বা এক একটি সুনির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করিয়া যেন নির্মিত হইয়া থাকে। চরিত্রগুলির মধ্যে সাধারণভাবে কোন বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া ইহারা দেশান্তরে প্রচার লাভের সুবিধা হয়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ ভাবেও ব্যক্তিগত না হইলেও জাতিগত বিশেষত্ব ইহাদের মধ্যে অনেক সময়েই প্রকাশ পায়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালীর নিকট ব্যাঘ্র জীবটির যে একটি বিশেষ স্থান আছে, অন্যান্য জাতির তাহা নাই। সেইজন্য নিজের জীবনবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহার সম্পর্কিত একটি মনোভাব যে ইহার গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ইহার প্রতিবেশী সমাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হইবে। ব্যাঘ্র হিংস্রতম জীব হওয়া সত্ত্বেও বাংলার লোক-কথার বাঘই সর্বাপেক্ষা হাস্যাস্পদ ও বুদ্ধিহীন বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।[১] সুতরাং যে জাতির ব্যাঘ্র সম্পর্কে এই মনোভাব গঠিত হইতে পারে নাই, সেই জাতির মধ্যে ইহার সম্পর্কে অনুরূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিবার অনুরূপ অবকাশ রচিত হইতে পারে নাই। সুতরাং অনুরূপ ভাবাপন্ন ব্যাঘ্র

১ 'বাংলার লোক-সাহিত্য', ১ম খণ্ড (তৃতীয় সং) পৃ. ৪৯৪-৪৯৬,

সম্পর্কিত লোক-কথাগুলি সেই সকল জাতির মধ্যে গিয়া প্রচার লাভ করিতে পারে নাই। এই সম্পর্কে বাংলার প্রতিবেশী সাঁওতাল জাতির কথাই উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার লোক-কথায় ব্যাঘ্র বাংলাদেশের অনুরূপ বুদ্ধিহীন এবং হাস্যাস্পদ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে প্রকৃতই হিংস্র প্রকৃতির। লোক-কথার মধ্যে ব্যক্তি চরিত্রের পরিবর্তে জাতীয় চরিত্রেরই বিকাশ হইয়া থাকে ; লোক-কথার চরিত্র, গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, কদাচ ব্যক্তির প্রতিনিধি নহে। সেইজন্য বাঙ্গালী চরিত্রের যাহা জাতীয় গুণ, তাহাই তাহার বাস্তবধর্মী সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় ; কিন্তু যেখানে বাধাহীন কল্পনার বিস্তার, সেখানে মানুষের মৌলিক কল্পনা শক্তিকে অবলম্বন করিয়া তাহা বিকাশ লাভ করে বলিয়া তাহার আবেদনের ক্ষেত্র স্বভাবতই বিস্তৃততর হইয়া থাকে। সেইজন্য কল্পনাধর্মী রূপকথার যে আবেদন প্রকাশ পায়, বাস্তবধর্মী উপকথার সেই আবেদন প্রকাশ পায় না। বাস্তব জীবনাচরণের খুঁটিনাটির ক্ষেত্রেই জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, কল্পনার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এক অখণ্ড ঐক্য অনুভূত হয়।

কথাসাহিত্যের লিখিত রূপ উপন্যাস এবং ছোটগল্পের যে ব্যাপক আবেদন প্রকাশ পায়, তাহার সঙ্গে লোক-কথার তুলনা হইতে পারে না। কারণ, উপন্যাস-ছোটগল্পের চরিত্র ব্যক্তির প্রতিনিধি, লোক-কথার চরিত্রের মত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নহে। ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে তাহার মধ্য হইতে যে শাশ্বত মানুষের একটি রূপ বাহির হইয়া আসে, গোষ্ঠীর প্রতিনিধি-মূলক type বা ছাঁচ জাতীয় চরিত্র হইতে তাহা আসে না। Type বা ছাঁচ চরিত্র নিষ্প্রাণ, কিন্তু ব্যক্তিচরিত্র প্রাণবান্। এই গুণেই তাহা সর্বত্র আবেদন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং বিশেষ জাতির সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও গল্প-উপন্যাসের চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া যে শাশ্বত মানবিক গুণ প্রকাশ পায় এবং যাহার উপর ইহাদের সর্বজনীন আবেদন নির্ভর করে, লোক-চরিত্রের মধ্যে তাহার অবকাশ থাকে না। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন তুলনামূলক বিচার চলিতে পারে না। লোক-কথার ধর্মদ্বারাই লোক-কথার বিচার করিবার আবশ্যক।

বাংলার লোক-কথার একটি প্রধান অংশ ব্রতকথা, ইংরেজিতে ইহাদিগকে **ritual tale** বলা যায়। প্রধানতঃ ব্রতাচারের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক, ইহাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, সুতরাং লোক-কথার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবার ইহাদের কোন দাবী নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যাইবে, বাংলার ব্রতকথার

মধ্যে একদিকে যেমন ঐহিক কামনা-বাসনার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই অন্য দিকে পার্থিব জীবনের উপর ভিত্তি করিয়াই ইহারা পরিকল্পিত হইয়াছে—সুদূর স্বর্গের কামনা ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতে পারে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, বহু লোক-কথাই ব্রতকথায় পরিণত হইয়াছে ; এমন কি, যে সকল উপকরণের জন্য লোক-কথা ব্রত-কথার রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা এমন অসংলগ্ন ভাবে ইহাদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছে যে, তাহা দ্বারা ইহাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হইতে পারে নাই। বাঙ্গালীরই জাতীয় চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মধ্য যুগের মঙ্গল-কাব্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, সেখানে মানুষে এবং দেবতায় পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, দেবতাও মানুষের গুণসম্পন্ন হইয়া সেখানে আচরণ করিয়াছে। শুধু মঙ্গলকাব্যের শাক্তসাহিত্য ধারায়ই নহে, বৈষ্ণব কবিতার ধারার মধ্যেও দেখা গিয়াছে যে, ভগবানের মধ্যে মানবিক গুণ সন্ধানই ইহার লক্ষ্য হইয়াছে। এই বিষয়ে মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব কাব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য ইহারা উভয়ই সাহিত্য-গুণ-সম্পন্ন। বাংলার ব্রতকথাগুলিও সেই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া পৌরাণিক কাহিনীই হোক, কিংবা অন্যান্য প্রদেশের ব্রতকথার সঙ্গে তুলনাতেই হোক সাহিত্য গুণান্বিত হইতে পারিয়াছে। বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মবোধের মধ্যে যদি এই প্রেরণা না থাকিত, তবে তাহার জাতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে এই গুণ কদাচ প্রকাশ পাইতে পারিত না।

ব্রতকথাগুলি যাহারা রচনা কিংবা স্মৃতির মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাংলাদেশের নিরক্ষর স্ত্রীসমাজ—তাহাদের সম্মুখে কোন সুদূর পারত্রিক লক্ষ্য থাকে না। ঐহিক সংসারকে অতিক্রম করিয়া পারত্রিক কল্যাণ বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা ইহার জ্ঞান ও বুদ্ধিগম্য নহে, সুতরাং ঐহিক জীবনকে আশ্রয় করিয়াই তাহার চিন্তা ও কর্ম রূপ লাভ করে। এই প্রেরণা হইতে যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্মের মধ্যেই সাহিত্যের যে প্রেরণা রহিয়াছে, তাহারই ব্যবহার করিবার ফলে ব্রতকথাগুলিও লোক-কথার অন্তর্গত হইতে পারিয়াছে। এই সম্পর্কে স্বর্গত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'বাংলার-ব্রত' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আমাদের একটা ভুল ধারণা ব্রত সম্বন্ধে আছে। আমরা মনে করি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ধর্ম ও নীতি শেখাতে মেয়েদের জন্তে আধুনিক কিণ্ডার গার্ডেন প্রণালীর ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি আবিষ্কার করে

গেছেন। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি তাই বটে; কিন্তু আসল মেয়েলি ব্রত মোটেই তা নয়। এগুলি আমাদের পূর্ব-পুরুষের ও পূর্বেকার পুরুষদের—তখনকার যখন শাস্ত্র হয় নি, হিন্দু ধর্ম বলে একটা ধর্মও ছিল না।' কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাদের সম্পর্কে একটি কথা আছে,—লোক-কথা যেমন লোকাচার মুক্ত স্বাধীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, ব্রতকথা তাহা নহে, বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচার ব্যতীত ইহাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষেই ইহাদের আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, ব্রত ব্যতীত স্বাধীন আনন্দ উপভোগের ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান নির্দিষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্য ইহাদের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাহার ফলে কাহিনীও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু যেখানে ব্যক্তির পরিবর্তে গোষ্ঠী নির্ভর হইয়া থাকে, সেখানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি কিছুতেই সম্ভব নহে। বৈচিত্র্যহীনতা সেই জন্যই অনিবার্য হইয়া থাকে।

বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রে বীরত্বের স্থান নিতান্ত গৌণ; সেই জন্য বীর-রসাত্মক কিংবা বীর নায়ক-চরিত্রবিশিষ্ট লোক-কথা ইহাতে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না, যেখানে বীরত্বের অভাব, সেখানেই কৌশলের আবির্ভাব; বুদ্ধির প্রাখর্য কিংবা কৌশল সেই জন্য বাংলার লোক-কথায় একটি প্রধান অংশ অধিকার করিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার দৈহিক শক্তির অভাব বুদ্ধির কৌশল দ্বারা পূর্ণ করিতে চাহিয়াছে। সেইজন্য দুঃসাহসিক অভিযানে জয় লাভ করিবার কাহিনী অপেক্ষা বুদ্ধি দ্বারা জয় লাভ করিবার কাহিনীই বর্ণনা করিরা আনন্দলাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্র এবং দুর্বলকে অপরিসীম বুদ্ধির অধিকারী বলিয়া কল্পনা করিয়া বাঙ্গালী নিজের দৈহিক শক্তির অভাবের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে। ব্যাঘ্রের চরিত্রের উপর বুদ্ধিহীনতা এবং সামান্য টুন-টুনি পাখীর উপর বুদ্ধিমত্তার পরিকল্পনা ইহারই ফল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে অনেক জাতির মধ্যেই অন্ধ ধর্মবোধ তাহার সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, অনেক সময় তাহা বিকাশ লাভ করিতেই দেয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের একটি প্রধান গুণ এই যে, যখন হইতে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জাতি রূপে গড়িয়া উঠিবার মত শক্তি লাভ করিল, তখন হইতেই ইহা ধর্ম-বিষয়ক সকল অন্ধতা বা গোঁড়ামি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার মত শক্তির অধিকারী হইয়াছিল। ভারতীয় সনাতন ধর্মের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিদ্রোহী সন্তানই বাঙ্গালী; ধর্ম ও সংস্কারের সর্ববিধ বন্ধনের মুক্তি-সঙ্গীত চিরকাল বাঙ্গালীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। সেই জন্য তাহার সাহিত্যিক প্রেরণা ধর্মবোধের দ্বারা

কোনদিন রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে নাই। লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক কিংবা উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রেই হোক, ধর্ম কিংবা নীতি বাঙ্গালীর সাহিত্য-চিন্তাকে কোন দিন শাসন করিতে পারে নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে যেমন এক শ্রেণীর নীতি-কাহিনী সহজেই জন্মলাভ করিয়াছে, বাংলা দেশে তাহা করে নাই। ব্রতকথাগুলিকেও আচারমূলক কাহিনী বলিয়া উল্লেখ করা গেলেও যথার্থ নীতিমূলক কাহিনী বলা যায় না। ঈশপের কথা যেমন নীতি-মূলক, 'হিতোপদেশে'র কথাও তেমনই নীতি-মূলক; বাংলার লোক-সাহিত্যে তেমন নীতিমূলক কাহিনী কিছু নাই। এ দেশের উপকথার মধ্যে যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কদাচ নীতি নহে—বরং তাহা কৌতুকরসে অভিষিক্ত। প্রকৃত নীতিকথা বা didactic fables বাংলার লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায় না। মানুষের স্বাভাবিক সুখ-দুঃখের অনুভূতি কোন কৃত্রিম নৈতিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। মানুষের সহজ ধর্মই বাংলার লোক-কথার ভিত্তি হইয়াছে বলিয়া তাহা কোন দিক হইতেই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। এমন কি, যে ব্রতকথার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাও মধ্য যুগের বাংলার অন্যতম সমৃদ্ধতম সাহিত্য শাখা সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। তাহা মঙ্গলকাব্য শাখা; সহজ মানুষ ইহারও ভিত্তি-রূপে যদি ব্যবহৃত না হইত, তবে ইহা এত সমৃদ্ধ সাহিত্যের প্রেরণা দিতে পারিত না।

চার

লোক-কথা ও আখ্যায়িকা-কাব্য

প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত এবং লোক-কথা মৌখিক (oral) সাহিত্য-ধারার অন্তর্গত হইলেও উভয়ের মধ্যে বিষয়গত কতকগুলি সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ লোক-সাহিত্যের মৌখিক ধারা (oral tradition)-র উপর ভিত্তি করিয়াই মঙ্গলকাব্যের লিখিত (written) ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের যে বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ ব্রতকথা হইলেও লোক-কথা (folk-tale)-র বহু বিভিন্ন উপাদানও আসিয়া কালক্রমে ইহাতে সংমিশ্রণ লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র 'মনসা-মঙ্গল' কাহিনী হইতে তাহাদের কিছু নিদর্শন এখানে উল্লেখ করা গেল।

লোক-কথায় দেবদেবীর জন্ম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়; দেবতা অলৌকিক চরিত্র, অতএব অলৌকিক উপায়েই ইহাদের জন্ম হইয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ এই বিষয়টিকে supernatural birth motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মনসা-মঙ্গল কাব্যে মনসার জন্মবৃত্তান্তটি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইহার মধ্যেও এক অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। শিব-বীর্যে পদ্ম-পাতায় অযোনি-সম্ভবা মনসার জন্ম হইয়াছে—স্বাভাবিক নিয়মে জননীগর্ভে তাঁহার জন্ম হয় নাই। বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই বিষয় অবলম্বন করিয়া অগণিত রূপকথা (fairy tale) রচিত হইয়াছে।

লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় (motif) এই যে, ইহাতে কনিষ্ঠ পুত্র, কনিষ্ঠা কন্যা কিংবা কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অসাধ্য সাধন করিবে। পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতি-বিদ্‌গণ ইহাকে successful youngest son (daughter or daughter-in-law) motif বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনসা-মঙ্গল কাহিনীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দর এবং কনিষ্ঠা পুত্রবধূ বেহুলা যথার্থ ই অসাধ্য সাধন করিয়াছে। বাংলাদেশেও কোন কোন রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তাঁহার কনিষ্ঠা রাণী ও তাহার সন্তানকে বনবাস দিয়াছেন, কিন্তু অবশেষে সেই কনিষ্ঠা রাণীর সন্তানই নানা অসাধ্য সাধন করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্যান্য রাণীর সন্তানকে নানা ভাবে রক্ষা করিয়াছে, তাহার

ফলে পরিণামে সে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। লোক-কথায় সাত পুত্রের জনক রাজা কিংবা সদাগরের একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রই কাহিনীর নায়কত্ব লাভ করিয়া থাকে, অন্যান্য পুত্রদিগের কোন পরিচয় তাহাতে প্রকাশ পায় না। চাঁদ সদাগরের কাহিনীতেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়—তাঁহার সাত পুত্র ও সাত পুত্রবধূ ছিল; কিন্তু তাহাদের ভিতর হইতে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা পুত্রবধূই কাহিনীর মধ্যে দিয়া নিজেদের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ করিতে সক্ষম হইল, জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূগণ পটভূমিকার মধ্যে অস্পষ্ট হইয়া রহিল।

লখীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ লোক-সাহিত্যের একটি সাধারণ অভিপ্রায় (motif) পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্‌গণ ইহাকে resuscitation motif বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিবিধ উপায়ে এই পুনর্জীবন-লাভ সম্ভব হইতে পারে। ইংরেজি লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়,'the parts of the dismembered corpse are brought together and revived'. (Thompson, *The Folktale*, New York, 1946, p. 255). এই উপায়েই লখীন্দরের পুনর্জীবন-লাভ সম্ভব হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, মঙ্গলকাব্যের মূল কাহিনীর পরিণতিতে লোক-সাহিত্যেরই একটি বিষয় অবলম্বন করা হইয়াছে। মঙ্গল-কাব্যে এই বিষয়ে মৌলিকতা নাই।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির লোক-সাহিত্যে এই একটি বিশ্বাস প্রচলিত থাকিতে দেখা যায় যে, মানুষের দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার আত্মা ক্ষুদ্রতর কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না। একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন, 'Sometimes it is thought of as having the form of a mouse, or bird or butterfly which leaves the mouth at the supreme moment' (ঐ পৃ. ২৫৮)। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও দেখিতে পাওয়া যায়, অনিরুদ্ধ ও উষা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া যখন আত্মত্যাগ করিল, তখন—

> সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল।
> ভ্রমর-ভ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল॥ —বিষ্ণু পাল

ইহাদের আত্মা দুটি ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়া প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া পড়িল। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের অনুরূপ ইঁদুর, পাখী কিংবা প্রজাপতির পরিবর্তে এখানে যে মানব-মানবীর আত্মা ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিল, ইহার

কারণ, বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর-ভ্রমরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীব। বাংলার ছেলেভুলানো ছড়ায়ও শুনিতে পাওয়া যায়—

হেঁসেল ঘরে ঘুম যায়রে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
মায়ের কোলে ঘুম যায়রে দুধের কুমারী॥

তারপর বাংলার বহু রূপকথায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন দৈত্য স্ফটিক-স্তম্ভের মধ্যে তাহার ভ্রমররূপী আত্মাটি গোপনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আহার-অন্বেষণে বাহির হইয়া গিয়াছে। তারপর একদিন এক রাজপুত্র আসিয়া স্ফটিকস্তম্ভ ধূলিসাৎ করিয়া ভ্রমরটি বিনাশ করে—তাহাতেই দৈত্যের মৃত্যু হয়। অতএব বাংলার লোক-সাহিত্যে ভ্রমর জীবাত্মার প্রতীক্ রূপে একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। সেই সূত্রেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনিরুদ্ধ ও উষার আত্মা এখানে ভ্রমর-ভ্রমরীর রূপ লাভ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও লোক-সাহিত্যের সাধারণ একটি বিষয় (motif) মঙ্গল কাব্যের উপজীব্য হইয়াছে।

মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে চাঁদ সদাগর এবং শঙ্কর গারড়ী উভয়কেই মহাজ্ঞানের অধিকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মহাজ্ঞান কি? এই জ্ঞানের অধিকারী হইলে অসাধ্য সাধন করা যায়। কিন্তু ইহা সাধারণ জ্ঞানের মত নহে। সাধারণ জ্ঞান কেহ হরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না, কিন্তু কৌশল জানা থাকিলে মহাজ্ঞান হরণ করিয়া লওয়া যায়; ইহা অপহৃত হইলে সকল শক্তি লোপ পায়। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য ইহাকে magic power বা magic wisdom বলে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিশেষ সাধনার প্রয়োজন। শঙ্কর গারড়ী নেতার সাধনা করিয়া নেতা-প্রদত্ত সর্পমাংস-মিশ্রিত অন্ন আহার করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি নিজে যেমন 'আকাট, অকুট' শরীর লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই সর্পবিষ নাশ করিবার শক্তিতে ধন্বন্তরির মত শক্তিশালী রূপে সমাজে গণ্য হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যেও এই ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক যে,' one can acquire magic wisdom from eating something, particularly from a part of a serpent' (ঐ, পৃঃ ২৬০)। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই যে মহাজ্ঞান বা magic power, তাহা অপহৃত হইতে পারে। মনসা-মঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখিয়াছি যে, শঙ্কর গারড়ী এবং চাঁদ সদাগর উভয়েই তাঁহাদের জীবনের এক দুর্বল মুহূর্তে ইহা হরণ করিবার কৌশল এক ছদ্মবেশিনী নারীর নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—তাহার ফলেই তাহা অপহৃত হইয়াছে। 'Magic power

stolen by concubine' এবং 'betrayal of husband's secret by wife'—পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যের ইহারা সাধারণ অভিপ্রায়; বাংলাদেশেও এই শ্রেণীর দুই একটি লোক-কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক-সাহিত্যেরই বিষয় এখানেও মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হইয়াছে। লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার কোনও ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করা যায় না। বাংলার লোক-সাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত, ইহার এই বহিরঙ্গ পরিচয়ের কথা বাদ দিলে ভাবের দিক দিয়া ইহাতে যে সর্বজনীনত্ব আছে, তাহা ইহাকে বিশ্বের লোক-সাহিত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়াছে; উপরের আলোচনা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইবে।

পূর্বনির্দিষ্ট মত সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু এবং তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর সহায়তায় তাঁহার পুনর্জীবন প্রাপ্তির বিষয়ও লোক-কথারই সাধারণ অভিপ্রায় (motif) মাত্র। মার্কিনদেশীয় লোক-সাহিত্যে Enchanted Prince-নামক একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। 'At the prince's birth it is prophesied that he will meet his death from a serpent. To forestall this fate he is confined to his tower. When he grows up, however, he sets out on adventures and finds a king who will give his daughter in marriage……the marriage takes place. In later parts of the story the princess save his life from a snake.' (ঐ, পৃ. ২৭৪)। এই রূপ-কথার সঙ্গে মনসা-মঙ্গল কাহিনীর যে মৌলিক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পারস্পরিক কোনও প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল নহে—মানব-মনের শাশ্বত ঐক্যের ফল। এখানেও একটি মঙ্গল-কাব্যের মৌলিক কাহিনী লোক-সাহিত্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতেই যে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা অনুভূত হইবে।

প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সতী নারী কতকগুলি অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হয়; এই শক্তির বলেই সে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এ'দেশের পুরাণেও লক্ষহীরার কাহিনীতে এক সতীর উল্লেখ আছে—তাঁহার চরিত্রেও যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতেই জাত। মনসা-মঙ্গলের সতী চরিত্রে বেহুলাও কতকগুলি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ধনামনা, ঘাটওয়াল, গোদা, টেটন ইত্যাদির পাপ অভিলাষ ব্যর্থ করিয়া যে তিনি নিজের

কর্তব্যপথে অগ্রসর হইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছেন, এই অলৌকিক শক্তির বলেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু কাহিনীর শেষভাগে তাঁহার সতীত্বের যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার ভিতর দিয়াই তাঁহার চরম শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। এখানে সাধারণভাবে মনে হইতে পারে যে, রামায়ণে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কাহিনী হইতেও মনসা-মঙ্গলেও বেহুলার সতীত্বের পরীক্ষার কথা আসিয়াছে। কিন্তু এ'কথা সত্য নহে। রামায়ণে কেবলমাত্র সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথাই আছে, কিন্তু মনসা-মঙ্গলে তাহার পরিবর্তে বেহুলার 'অষ্ট-পরীক্ষা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা লোক-সাহিত্যের সাধারণ বিষয় মাত্র—রামায়ণের প্রভাব-জাত নহে; যদি মনসা-মঙ্গলের উপর ইহা রামায়ণের প্রভাব-জাত হইত, তবে বেহুলার 'অষ্ট-পরীক্ষা'র পরিবর্তে একমাত্র অগ্নি-পরীক্ষার কথাই থাকিত। পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্য সমালোচকগণ এই বিষয়টি chastity test motif বলিয়া থাকেন। এই সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ বলিয়াছেন, 'Many forms of testing are found in folklore and legend; they are generally connected with ordeal. The test by fire is the most common.' রামায়ণের মধ্যে এই বিষয়ক নিতান্ত সাধারণ প্রণালীটিই অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু মনসা-মঙ্গলে সর্প-পরীক্ষা (snake ordeal), ক্ষুরাঙ্কুর-পরীক্ষা (razor's edge ordeal), জল পরীক্ষা (water-ordeal), শূন্য-পরীক্ষা (পাশ্চাত্ত্য লোক-সাহিত্যে ইহার কোনও প্রতিরূপ পাওয়া যায় না), জৌঘর-পরীক্ষা (fire ordeal), তুলা-পরীক্ষা ইত্যাদি বিবিধ পরীক্ষার কথা উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ এই যে, মনসা-মঙ্গলের প্রত্যক্ষ প্রেরণা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে আসে নাই—লোক-সাহিত্যের বিস্তৃততর ক্ষেত্র হইতে আসিয়াছে।

সর্প বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার প্রতিহিংসা গ্রহণের বৃত্তান্ত লইয়াই মনসা-মঙ্গল রচিত হইয়াছে। সর্পের প্রতিহিংসা প্রত্যেক দেশেরই লোক-সাহিত্যের একটি নিতান্ত সাধারণ বিষয়। ইংরেজীতে ইহাকে revengeful serpent motif বলা হইয়া থাকে। 'Injured snake avenges' নামেও লোক-সাহিত্যের একটি অভিপ্রায় (motif) আছে, তাহাও মনসা-মঙ্গল কাহিনীর ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়; কারণ, injury বা আঘাত যে সর্বদাই শারীরিক হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই; সর্পের পক্ষে যে আঘাত শারীরিক, সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পক্ষে তাহাই মানসিক বলিয়া বিবেচিত

হইতে পারে। অতএব, ইহাও মনসা-মঙ্গল কাব্যের মৌলিক বিষয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অতএব দেখা যাইতেছে, এখানেও মনসা-মঙ্গলের কাহিনী লোক-সাহিত্যের প্রেরণা হইতে জাত—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হইতে জাত নহে।

সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর বর্ণনা মনসা-মঙ্গল কাব্যের অন্যতম বিষয়, কমলে কামিনীর বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়ীভূত। সমুদ্রমধ্যস্থ পুরীর পরিকল্পনা লোক-সাহিত্যেরই প্রেরণা-জাত। একজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এই সম্পর্কে অনুমান করিয়াছেন, 'The literature of chivalry must have been a great stimulus to tales about remarkable castles—castles of gold or silver or even of diamond, castles suspended on chains or upheld by giants or built on the sea,' প্রাচীন বাংলাদেশেও বহির্বাণিজ্যের যুগ ইউরোপের Chivalry যুগের মতই সমাজের বহির্মুখী কর্মবহুল যুগ ছিল—অতএব সেই যুগেই এ'দেশেরও লোকসাহিত্যের মধ্যে অনুরূপ প্রেরণা কার্যকরী থাকা একান্তই স্বাভাবিক।

ব্রতকথা বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মঙ্গলকাব্যের মত ব্রতকথারও উদ্দেশ্য লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন; ব্রতকথা হইতেই যে মঙ্গলকাব্যের প্রেরণা আসিয়াছে, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

পাঁচ

লোক-কথা ও উপন্যাস

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত লোক-কথার (Folk tales) ধারা অনুসরণ করিয়াই আধুনিক কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিলতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে লোক-কথারই একটি ধারা লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সেই জটিল জীবনের বাস্তব পরিচয়কে রূপ দিতে গিয়া আধুনিক কথা-সাহিত্য উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আর একটি ধারা নিরক্ষর সমাজের মধ্য দিয়া ইহার অন্তর এবং বহির্মুখী পরিচয়কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিয়াছে। অর্থাৎ উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের মধ্যে জাতির লোক-কথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। তবে একথা সত্য, যে ভাবে শিক্ষার প্রসার হইতেছে, তাহার ধারা আরও কিছুদিন এমনই অব্যাহত থাকিলে, নিরক্ষর বলিতে আমাদের সমাজেও কেহ আর অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন অন্যের মুখ হইতে কাহিনী শুনিয়া কেহ আর তৃপ্তি লাভ করিবার পরিবর্তে নিজেই পাঠ করিয়া তাহা হইতে রস-পিপাসা চরিতার্থ করিবে। কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের কথা, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিবার উপায় নাই। পাঠ করিবার পরিবর্তে পরের মুখে শুনিয়া তৃপ্তিলাভ-সংস্কার পৃথিবীর সকল অগ্রসর সমাজের মধ্যে আজও প্রচলিত আছে। আমরা বক্তৃতা শুনি, বেতারে বক্তাকে চোখে না দেখিয়াও তাহার ভাষণ কিংবা তাহার মুখ হইতে প্রচলিত কথা বা কাহিনী শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করি ; মাতামহী পিতামহীর নিকট গল্প শুনিবার সুযোগ পাই না বলিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না, সুতরাং শিক্ষিত হইলেই যে সমাজ মৌখিক প্রচারের সকল সংস্কার পরিত্যাগ করিবে, তাহা মনে হয় না। অতএব উপন্যাস আমরা বসিয়া পড়িবার সুযোগ পাই বলিয়াই যে তাহা মৌখিক প্রচারিত সাহিত্যের তুলনায় বিশেষ কোন সুবিধা কিংবা সুযোগ দিতে পারে, তাহা নহে। ইহা সর্বদাই সমাজ এবং ব্যক্তির নিজস্ব রুচির উপর নির্ভর করে। সুতরাং সমাজে নিরক্ষরতা দূর হইলেই যে মৌখিক সাহিত্য লুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহা কদাচ সম্ভব হইতে পারে না। তথাপি দেখা যায়, আজ মৌখিক কথাসাহিত্য শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। তাহা আজ কোন উচ্চতর অনুশীলনের বিষয় নহে ; কিংবা আধুনিক কথাসাহিত্যের সঙ্গে তাহার যে

কোন প্রকার তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে, তাহাও কেহ মনে করেন না।

লোক কথার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বৈচিত্র্যের অভাব আছে; কিন্তু উপন্যাস এবং ছোটগল্পের বিষয়ের মধ্যে অন্তহীন বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়-বস্তু (motif) অবলম্বন করিয়া দেশ দেশান্তরে একই প্রকৃতির লোক-কথা রচিত হয়, কিংবা দেশান্তর হইতেও অতি সহজেই অপর কর্তৃক রচিত লোক-কথাও সম্পূর্ণ নিজের বলিয়া গৃহীত হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সঙ্কলিত উপকথা-সংগ্রহ 'টুনটুনির বই'-এ যে সকল উপকথা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা অবাধে উত্তর ব্রহ্মে সাধারণ জন-সমাজে ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রচিত উপন্যাস সে দেশের ভাষায় অনূদিত হইলে সেই পরিমাণ সমাদর লাভ করিতে পারে না—মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের গবেষণার বিষয় হইবে মাত্র। তাহার ফলে প্রত্যেক দেশেই আধুনিক কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতির নিজস্ব প্রতিভা অনুযায়ী নূতন নূতন মনীষার উদ্ভব হয়। ইহার প্রেরণাতেই ব্রহ্মদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নূতন কথাসাহিত্য রচিত হইবে। লোক-কথা ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া সমাজে প্রচারিত হয় বলিয়া তাহার ভিতর দিয়া জাতীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। লোক-কথার মধ্য দিয়া জাতির পরিচয়টি প্রায়ই রূপ পাইতে পারে না। বাংলা দেশে শৃগাল সম্বন্ধে যে সকল উপকথা প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই সাঁওতাল পরগণা কিংবা ছোট-নাগপুরের আদিবাসীদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালী মনীষার সুস্পষ্ট পরিচয় নাই, ইহার ধারা কোন্ দেশ হইতে যে কি ভাবে আসিয়া বাঙ্গালীর চিত্তমুকুরের মধ্য দিয়া লঘু ছায়াপাত করিয়া আবার মিলাইয়া যায়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের ভিতর দিয়া বিশেষ একটি যুগের বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন, তাহার নৈতিক আদর্শ এবং সর্বো-পরি একটি বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনীষার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রহিয়া গিয়াছে, ইহা জাতির চিত্তাকাশে লঘুভাবে ভাসমান মাত্র নহে, ইহা সুনির্দিষ্ট দেশ এবং কালের সুস্পষ্ট সীমা-চিহ্ন বহনকারী। সুতরাং লোক-কথার যাহা উদ্দেশ্য এবং যে রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গে আধুনিক কথা-সাহিত্যের যোগ ক্রমে অনেক গৌণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য, লোক-কথার মধ্যে চরিত্র এবং দেশ-কালের যে নির্বিশেষত্ব আছে, তাহা-

দিগকেই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষ ক্ষেত্রে রূপায়িত করিয়া লইয়াই আধুনিক উপন্যাসের সূচনা হইয়াছে। লোক-কথার রাজপুত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের জগৎসিংহ এবং লোক-কথার মধুমালাই তিলোত্তমা ; শৈলেশ্বরের শিব-মন্দিরে এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে বিদ্যুতালোকের চকিত দর্শনের সঙ্গে পথচিহ্নহীন দুর্গম অরণ্যানীর সমতল উপত্যকায় স্বপ্নদর্শনের কোন পার্থক্য নাই ; যে সামান্য পার্থক্যটুকু আছে, তাহা কেবল মাত্র চিত্রগত, ভাবগত নহে। সুতরাং লোককথার মধ্যে সমাজ মানসে যে নির্বিশেষ ভাব-চৈতন্যের উদয় হয়, তাহাই আধুনিক উপন্যাস সবিশেষ পাত্রে পরিবেষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু কথা-সাহিত্যের যাহা স্বাভাবিক ধর্ম অর্থাৎ চরিত্রগুলির সঙ্গতি এবং স্বাভাবিকতা, তাহা উভয় ক্ষেত্রে সমানই বর্তমান থাকিয়া যায় ; তবে লোক-কথার অনেক ক্ষেত্রেই রূপকের আবরণে যাহা বলা হয়, তাহাই উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে মাত্র।

আধুনিক যুগ প্রত্যক্ষতার যুগ। কাব্যের ক্ষেত্র হইতেও সাঙ্কেতিকতা এবং রূপক ব্যবহারের প্রথা লুপ্ত হইয়া গিয়া বাস্তব জীবনের নগ্নরূপ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে ; সেইজন্য আধুনিক শিক্ষিত মন লোককথা-ধর্মী কাহিনীগুলির ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকে। সুতরাং লোক-কথায় এবং উপন্যাসে যে পার্থক্য, তাহা ভাবগত নহে—কেবলমাত্র বহির্মুখী রূপগত।

পূর্বেই বলিয়াছি, লোক-কথার মধ্যে যে গুণই থাকুক না কেন, তাহা বৈচিত্র্য-হীন ; কারণ, কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই লোক-কথা রচিত হইয়া থাকে ; এমন কি, এই মৌলিক বিষয়গুলি দেশে দেশেও প্রায় অভিন্ন। দেশে দেশে অভিন্ন হইবার ফলে হয়ত তাহা প্রচারের দিক দিয়া সহজ হয় ; কিন্তু বৈচিত্র্যহীনতার ত্রুটির জন্য ইহা নূতন কোন আস্বাদ দিতে পারে না। আধুনিক কথাসাহিত্যের সুনির্দিষ্ট কিংবা মৌলিক বিষয়-বস্তু (motif) কেহ বাঁধিয়া দিতে পারেন না, ইহা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ; সেইজন্য বিষয় এবং রস বৈচিত্র্যে ইহার সঙ্গে লোক-কথার তুলনা হয় না।

তবে একথা সত্য, লোক-কথার যে একটি অসাধারণ প্রাণশক্তি (Vitality) আছে, আধুনিক কথাসাহিত্যে তাহা নাই। এই প্রাণশক্তির বলে লোক-কথা দেশ-দেশান্তরে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যেও অতি সহজে প্রচার লাভ করে, প্রত্যেক জাতিরই ইহা নিজস্ব সম্পদ হইয়া যায়, কিন্তু আধুনিক কথাসাহিত্যের

এই প্রাণশক্তি নাই। বঙ্কিমের উপন্যাস দেশে দেশান্তরে ভাষান্তরিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করা দূরে থাকুক, নিজেদের দেশেই ইহা আজ অপ্রচলিত ও প্রাচীন বা classics পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে ; তাঁহার ভাষার আদর্শ, তাঁহার জীবন ও সমাজ-দর্শনের আদর্শ, তাঁহার নৈতিক আদর্শ আজ এদেশেই এমন পরিবর্তিত হইয়াছে যে, তাহা আর শিক্ষিত জনসাধারণেরও রুচিকর মনে হইতে পারে না, অথচ লোক-কথার মধ্যে এমন কোন অনমনীয় (rigid) কিংবা অপরিবর্তনীয় আদর্শ থাকে না বলিয়া সর্বদাই ইহা জনচিত্তের রস-প্রবাহের মধ্য দিয়া ভাসিয়া যাইতে থাকে। এইভাবে লোক-কথা যখন যুগ হইতে নূতন যুগে উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন লিখিত কথাসাহিত্য অক্ষরের বাঁধনে বাঁধা পড়িয়া থাকিয়া ক্রমে জীর্ণ এবং প্রস্তরীভূত (fossilised) হইয়া যায়।

লোক-কথার যেমন কোন জাতি নাই, অর্থাৎ বিশেষ জাতির লোক-কথা বলিয়া যেমন কোন রচনা চিহ্নিত করা যায় না, তেমনই লোক-কথার কোন ধর্মও নাই, অর্থাৎ বিশেষ কোন লোক-কথা বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বীর সৃষ্টি কিংবা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি একথা বলিবার উপায় নাই। অর্থাৎ খৃষ্টানের লোক-কথা, য়িহুদির লোক-কথা বলিয়া যেমন কিছু নাই—হিন্দুর লোক-কথা, মুসলমানের লোক-কথা বলিয়াও কিছু নাই। জাতি বা nationality দ্বারা যেমন ইহার পরিচয় নহে, তেমনই ধর্ম দ্বারাও ইহার পরিচয় নহে। যদিও ইহা বিশেষ কোন দেশের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নহে, তথাপি বাংলার লোক-কথা, জার্মানির লোক-কথা বলিয়া ইহাদের পরিচয় হইতে পারে—হিন্দুর লোক-কথা, মুসলমানের লোক-কথা বলিয়া নহে। বাঙ্গালী জাতি হিন্দু মুসলমান এবং আদিবাসী ধর্মাবলম্বী দ্বারা গঠিত, তেমনই জার্মান জাতিও খৃষ্টান এবং য়িহুদি ধর্মাবলম্বীদিগের দ্বারা গঠিত। বাংলা এবং জার্মানিতে এই সকল বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে দেশান্তর হইতে আগত উপকরণের সংমিশ্রণ করিয়া ইহাদের লোক-কথা ইহাদের নিজস্ব ভাষায় নিজের মত করিয়া গঠন করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক কথাসাহিত্যে ধর্মীয় পরিচয় সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াই যে শাশ্বত মানবিক পরিচয় ব্যক্ত হইতে পারে, তাহা সত্য নহে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে হিন্দুর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বর্তমান আছে, অথচ বাঙ্গালী জাতি কেবলমাত্র হিন্দু-সংস্কৃতির উপাদানে গঠিত নহে ; এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা শুনিতে

হইয়াছে। কিন্তু লোক-কথার অন্তর এবং বহির্ভাগ এই প্রকার সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। লোক-কথার কোন অংশেই ধর্মীয় কিংবা জাতীয় কোন বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় থাকে না বলিয়া দেশান্তরে ইহা প্রচারের-পক্ষে সহজ হয়।

তবে একথা সত্য, আধুনিক কথাসাহিত্য ক্রমে এই ধর্মীয় এবং জাতীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া বহুলাংশে এই বিষয়ে লোক-কথার ধর্মলাভ করিতেছে। যে সমাজতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্র আজ বহু রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য হইয়াছে, তাহার আদর্শ অনুসরণ করিবার ফলে ধর্ম কিংবা কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে কথাসাহিত্য আর রচিত হইতে দেখা যায় না, তবে যে দেশের সাহিত্য, সে দেশের সামাজিক আচার এবং নীতিবোধ তাহার অবশ্যই অবলম্বন হইয়া থাকে—একমাত্র ইহার মধ্যেই কাহিনীর আঞ্চলিক বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। নতুবা আজ আর ইংরেজি উপন্যাস আর বাংলা উপন্যাসের সমাজ-দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করা যায় না। টলষ্টয়ের কথাসাহিত্যের মধ্যে ধর্মের কথা নাই, তাহা ধর্ম কিংবা সম্প্রদায় আশ্রিত রচনাও নহে—ইহাদের মধ্যে প্রেমের কথা আছে, এমন কি ; সেই প্রেম যে বাইবেল কিংবা খৃষ্টানের প্রেম (Christian love) তাহাও নহে তাহা সহজ মানব প্রেম মাত্র। এই সূত্রেই প্রায় লোক-কথার মতই তাঁহার রচিত কথা-সাহিত্য পৃথিবীব্যাপী শিক্ষিত সমাজের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের রচনারও এই বিশেষত্ব আছে। ইহার মধ্যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক কোন পরিচয় নাই, এমন কি আঞ্চলিক সমাজ-জীবনের যে পরিচয় আছে, তাহাও নিতান্ত লঘুভাবে কাহিনীর উপরি স্তরের মধ্যেই এমন ভাবে সীমাবদ্ধ যে, তাহাতে কাহিনী কোন বিশিষ্টতা লাভ করিতে পারে নাই। রাষ্ট্রে এবং সমাজ-চিন্তার মধ্যে আজ পৃথিবীব্যাপী যে অখণ্ড ঐক্য দেখা যাইতেছে তাহারই প্রভাবে কথাসাহিত্যের মধ্যেও যত সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক বিশেষত্ব আছে তাহা ক্রমে দূর হইয়া গিয়া সকল কিছুই একাকার হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের বক্তব্য এবং তাহা প্রকাশ করিবার প্রণালীর মধ্যেও আজ অনেকটা ঐক্য দেখা যাইতেছে।

ছয়

লোক-কথা ও মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহার সহিত বাংলার স্ত্রী-সমাজে প্রচলিত ব্রতকথার দেব-চরিত্রের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। অতএব ইহাদের পরস্পর কি সম্পর্ক তাহা একটু বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনার প্রয়োজন। ব্রতকথাগুলি মেয়েলী ব্রতাচারের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রতাচার হইতে স্বতন্ত্র ইহাদের কোনও মূল্য কিংবা স্থান নাই। ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক একটি অপরিহার্য অঙ্গ, তাহার ফলে ইহাদের মধ্য দিয়া একটি প্রধান গুণ এই প্রকাশ পাইয়াছে যে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়া ইহারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। অতএব ব্রতকথাগুলি একটি প্রাচীনতর ও অধিকতর রক্ষণশীল ধারা অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোন কোন সময়ে যে ব্রতকথার কাহিনী পল্লবিত হইয়া মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে দেখা যায়, ইহার অর্থ এই যে, ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্য রচনার প্রেরণা ও বিষয়-বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে—মঙ্গলকাব্য হইতে ব্রতকথার প্রেরণা কিংবা বিষয়-বস্তু গৃহীত হয় নাই।

ব্রতকথাগুলি ধর্মীয় আচারের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফলে ইহারা বহুল প্রচারের ভিতর দিয়াও অপরিবর্তিত থাকিবার যে সুযোগ লাভ করিয়াছিল, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ, মঙ্গলকাব্যগুলি কোনও বিশেষ পূজাচারের অন্তর্ভুক্ত নহে। কোনও দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গলগান গীত হইলেও, তাহা কখনও প্রকৃত সেই পূজার অন্তর্নিবিষ্ট আচার রূপে গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে কোন দেবতার পূজা উপলক্ষে সেই দেবতার মঙ্গল গানের অনুষ্ঠান না করিলেও চলিতে পারে। কিন্তু ব্রতকথাগুলি আবৃত্তি না করিলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় না। অতএব ব্রতকথাগুলি কোন আকারেই পরিবর্তিত হইতে পারে না, অথচ মঙ্গলকাব্যের পক্ষে ইহার মূল কাহিনী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কোন কোন অংশ পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইতে কোন বাধা নাই। সেইজন্য যুগে যুগে কবিগণ 'নূতন মঙ্গল' রচনা করিলেও 'নূতন ব্রতকথা' কেহ কখনও রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্রতকথাগুলি যে মঙ্গলকাব্য হইতে প্রাচীনতর, এই বিষয়ে

সংশয় প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। এখানে একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। চৈতন্য-পূর্ববর্তী কাল হইতেই সমস্ত বাংলাদেশ ব্যাপিয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য প্রচারিত থাকা সত্ত্বেও, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই মনসার ব্রতকথা নামক একটি ক্ষুদ্র ব্রতকথা সংগৃহীত হইয়াছে—ইহা এক সদাগর ও তাহার সাত পুত্রবধূর কথা। কেবল বাংলা দেশেরই বিভিন্ন অঞ্চল নহে, ইহা উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলা এবং মহারাষ্ট্র ও গুজরাট হইতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অথচ কাহিনীটি অত্যন্ত প্রাচীন; তথাপি এখন পর্যন্তও ইহা প্রচলিত আছে। ইহার সহিত মনসা-মঙ্গলোক্ত কাহিনী অর্থাৎ চাঁদ সদাগর ও বেহুলার কাহিনীর কোনও সম্পর্ক নাই। অথচ এ'কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যদি ব্রতকথার উৎপত্তি হইত, তবে মনসার ব্রতকথায় চাঁদ সদাগর বেহুলার কাহিনী স্থান না পাইয়া সদাগরের সাত পুত্রবধূর একটি অকিঞ্চিৎকর কাহিনী স্থান পাইবার কোনই কারণ ছিল না। বরং মনসার ব্রতকথাটি হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, মঙ্গলকাব্য অপেক্ষা প্রাচীনতর যুগে উদ্ভূত হইয়া মনসার ব্রতকথাটি মেয়েলী মনসাব্রতের আচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য পরবর্তী কালে অধিকতর কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি প্রচারিত হইবার যুগেও ইহা তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছে। আচারের অন্তর্ভুক্ত না হইলে ইহা সহজেই পরিত্যক্ত হইত এবং ইহার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দে সেখানে মনসা-মঙ্গলের কাহিনীটি গৃহীত হইত। অতএব মঙ্গলকাব্য হইতে যে ব্রতকথার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা এখানে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। মনসার ব্রতকথার দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সর্বত্রই যে ব্রতকথা হইতেই মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও নহে। মঙ্গলকাব্য অনেক সময় নূতন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়াও রচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বস্তু অবলম্বন করিয়া একবার কোন দেবতার মঙ্গলগান সমাজে প্রসারলাভ করিলে সেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া আর নূতন কোন বিষয়-বস্তু অবলম্বন করা সম্ভব হইত না—শতাব্দীর পর শতাব্দী একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিত।

ব্রতকথা মৌখিক ধারা (oral tradition) অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে, মঙ্গলকাব্য লিখিত (written) সাহিত্যের অন্তর্গত। প্রত্যেক দেশেই

মৌখিক সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়াই লিখিত সাহিত্য জন্মলাভ করিয়া থাকে, লিখিত সাহিত্য হইতে মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি হইবার কোন নিদর্শন কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব ব্রতকথার মৌখিক ধারার উপরই কালক্রমে মঙ্গল-কাব্যের লিখিত সাহিত্যের ধারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ'কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার লিখিত ধারা অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য রচনার ধারা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৌখিক ধারাটি লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কারণ, মঙ্গলকাব্য দ্বারা ব্রতকথার কোনও উদ্দেশ্যই সাধিত হয় নাই। ব্রতকথার প্রতিপালক স্ত্রী-সমাজ, মঙ্গলকাব্য পুরুষের সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট এবং তাহা দ্বারাই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ব্রতকথার ভিতর দিয়া নারীজীবনের ব্যক্তিগত নানা ঐহিক কামনার অভিব্যক্তি দেখা যায়—মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-চেতনা রূপলাভ করিয়াছে। ব্রতকথার আবৃত্তি পারিবারিক অনুষ্ঠান মাত্র, কিন্তু মঙ্গলগান বৃহত্তর সামাজিক অনুষ্ঠান। ব্রতকথা অন্তঃপুরের বিষয়, মঙ্গলগান বারোয়ারীতলার বিষয়। একটির ভিতর দিয়া পারিবারিক জীবন ও অপরটির ভিতর দিয়া গোষ্ঠী-জীবন প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ব্রতকথা ও মঙ্গল-কাব্যের ক্ষেত্র পরস্পর স্বতন্ত্র—একের অভাব অন্য দ্বারা দূর হয় নাই, বাংলার সমাজের বিশেষ অবস্থায় মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছিল, সেই অবস্থা বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধঃপতন ও পরিণামে সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়াছে; কিন্তু রক্ষণশীল স্ত্রীসমাজের ভিতর দিয়া ব্রতকথা আজ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। সমাজের মধ্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিত বলিয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব ক্রমবিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু শাশ্বত ব্যক্তিস্বার্থবোধের উপর ব্রতকথার ভিত্তি ছিল বলিয়া তাহা শত শত বৎসরের ব্যবধানেও অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে। অতএব মঙ্গলকাব্য ব্রতকথার দাবী পূর্ণ করিতে পারে নাই, সেইজন্য মঙ্গলকাব্যগুলির বহুল প্রচারের যুগেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল এবং বর্তমান যুগে মঙ্গলকাব্য লুপ্ত হইয়া গেলেও ব্রতকথাগুলি অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে—পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-সংস্পর্শহীন স্ত্রীসমাজ এখনও ইহা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু পল্লীসমাজেও মঙ্গলগানের আর প্রচলন নাই।

তথাপি এ'কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মঙ্গলকাব্যের চরিত্রের পরিকল্পনা ব্রতকথারই দেব-চরিত্র পরিকল্পনার প্রভাব-জাত। অন্তঃপুরাশ্রিতা অসহায়া নারী দৈব করুণার উপর সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর করিয়া যেমন নিজের অবস্থার মধ্যে শান্তি ও সান্ত্বনার সন্ধান পাইয়া থাকে, একদিন তুর্কী-আক্রান্ত বাংলার হিন্দু সমাজও অন্তঃপুর-বন্দিনী নারীর মতই তেমনই অসহায় বোধ করিয়াছিল। আত্মশক্তিতে মানুষ যখন বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে তখন সে স্বভাবতঃই দৈব-শক্তির উপর নির্ভর করে। যে অসহায় অবস্থার ভিতর দিয়া নারী দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রতকথাগুলির জন্মদান করিয়াছে, সেই অবস্থার ভিতর দিয়াই পুরুষকে মঙ্গলকাব্যের দেবত্ববোধ জাগ্রত করিতে হইয়াছিল বলিয়া উভয়ের পরিকল্পিত দেবচরিত্রের মধ্যে ঐক্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু তাহা সত্বেও এ'কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর উপর মেয়েলী ব্রতকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবও কিছু কিছু কার্যকর হইয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও ব্রতকথার মূল দেব-চরিত্র এবং মঙ্গল-কাব্যের মূল দেব-চরিত্রের মৌলিক উপাদান বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। উভয়দিকেই উদ্দিষ্ট-দেবতা ভক্তের রক্ষক এবং অভক্তের সংহারক এবং উভয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের মর্ত্যলোকে নিজস্ব পূজা প্রচারই লক্ষ্য।

ব্রতকথার অনেক অপরিস্ফুট বিষয় মঙ্গলকাব্যের ভিতর দিয়া সুপরিস্ফুট হইয়াছে; এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মঙ্গলকাব্যগুলি অনেক সময় ব্রতকথার টীকা বা ভাষ্যের কাজ করিয়াছে। ব্রতকথার মধ্যে সূত্রাকারে যে সকল বিষয় অবস্থান করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যে তাহাই বিস্তৃততর বর্ণনা লাভ করিয়াছে। ব্রতকথার সূত্র বা ইঙ্গিতগুলিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনা সন্নিবেশের স্বাধীনতা মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সর্বদাই গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রতকথার চরিত্রগুলি কোনও বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারে না, তাহাদের নির্বিশেষ পরিচয় মাত্র প্রকাশ পায়; যেমন, এক রাজা, এক সদাগর কিংবা এক বামুন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলি বিশিষ্ট পরিচয় লাভ করিয়া থাকে; যেমন, রাজা বীরসিংহ, রাজা চন্দ্রকেতু, চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, সোমাই ওঝা ইত্যাদি। এই জন্যই ব্রতকথার চরিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, মঙ্গলকাব্যে ব্রতকথার চরিত্রগুলির এই অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে—

ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রই সুস্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় লাভ করিয়া আধুনিক উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা-বাহুল্য ইহার বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বর্ণনা অনেক সময় 'এপিক-ধর্মী' হইয়া উঠে, কিন্তু ব্রতকথায় এই গুণ প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। ব্রতকথায় চিত্র-রূপের বৈচিত্র্য নাই; ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হইলে সকল ব্রত-কথাতেই শুনিতে পাওয়া যাইবে 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান'। ইহার চরিত্রগুলি যেমন নির্বিশেষ, তেমনই ইহার কোন চিত্ররূপও সবিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য ইহার চরিত্রগুলির মত চিত্রগুলিও মনের উপর কোনও দাগ কাটিতে পারে না।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ হইতে জাত সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় প্রেরণায় ব্রতকথাগুলির জন্ম, অলৌকিকতা ইহাদের অবলম্বন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি বৃহত্তর সমাজ-চেতনার ফল, ইহাদের বাস্তব ধর্ম অনেক সময় ইহাদের অলৌকিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়া থাকে। ব্রতকথার পরিকল্পনায় রক্ষণশীল ও মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়। কারণ, ব্রতকথা কোনদিন নূতন করিয়া রচিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু 'নূতন মঙ্গল' রচিত হইয়া সর্বদাই সমাজের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

সাত

লোক-কথা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়স হইতেই যে লোক-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, সেকথা পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। তিনি যে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি কিছু ছড়া ও গ্রাম্য-গীতি সংগ্রহ করিলেও কোন লোক-কথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি লোক-কথার প্রেরণাও যে তাহার সমগ্র জীবনের কাব্য-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কাব্য-রচনার ধারা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধের' একটি প্রবন্ধে রূপকথার রস-ব্যঞ্জনাটিকে তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন; কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুতবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা.........

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়ালো।'

'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানসী'র যুগে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন বাংলার প্রকৃতি ও সহজ জীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তিনি তখন তাঁহার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাব-সাধনার মাঝখানেও বাংলার প্রকৃতি এবং জীবনকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহকার্য তখন তাঁহার চলিতেছিল; সুতরাং তাহারই পটভূমিকায় তাঁহার কবি-মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাঁহার সেই অনুভূতি সেদিন যে কত গভীর ছিল, তাহা তাঁহার 'মানসী'র একটিমাত্র কবিতা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'বধূ' কবিতার মধ্য দিয়া বাংলার রূপকথা সম্পর্কে এই উল্লেখ করিয়াছেন,

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হঁ্যা গো;
উঠিলে নব শশী ছাতের পরে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

বাঙ্গালী জননীর কণ্ঠে উচ্চারিত রূপকথা যেন বাংলার প্রকৃতি—তাঁহার আকাশ বাতাস ফুল লতাপাতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সব কিছু মিলিয়াই বাঙ্গালীর জীবনকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। দূরে বাঁধের অস্পষ্ট জলরেখা, রাত্রির আকাশের বাঁকা রেখা চাঁদ, ঘনসারিবদ্ধ শ্যামল তালবন—ইহাদের সব কিছুকেই আশ্রয় করিয়া বাংলার সহজ জীবনটি যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাংলার রূপকথাও যেন তাহারই মধ্যে নিজের আসনটি সহজভাবেই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন হইতে তাহার রূপকথাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিবার একটি উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের চেতনার মধ্যে এই সত্যটি ধরা দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া এইখানেই বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যত সার্থক যোগ রক্ষা করিয়াছেন, অন্য কোথাও তাহা তত সার্থক ভাবে পারেন নাই।

'সোনার তরী' রচনার যুগেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ'কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, 'সোনার তরী'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপর লোক-সাহিত্যের সর্বাধিক প্রভাব

সক্রিয় হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতাটির উল্লেখ করিতে হয়। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া আধুনিক-ধর্মী কবিতা রচনায় বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি সার্থক প্রয়াস। বাংলার রূপকথা যে প্রাচীন রক্ষণশীল কিংবা নিরক্ষর সমাজেরই উপভোগ্য নয়, ইহার ভিতর দিয়া যে সর্বকালীন জীবন-সত্য প্রকাশ করা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন। ইংরেজ কবি কীট্স যেমন আধুনিক জগতের কবি হইয়াও কল্পনায় প্রাচীন গ্রীসের জীবনের ভিতর হইতে সৌন্দর্য ও নিত্যত্ব সন্ধান করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বাংলার নিরক্ষর সমাজের অলিখিত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাঁহার কবি-প্রতিভা অনুযায়ী সৌন্দর্য ও জীবন সন্ধান করিয়া আধুনিক পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

সযত্নে সাজিল রাণী বাঁধিল কবরী,
নব ঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তারপরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক-দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় রূপকথা Cinderella-র বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছিলেন, সমগ্র ইউরোপ দেশব্যাপী প্রচলিত এই রূপকথাটি ভারতবর্ষ হইতেই একদিন সেখানে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভারতীয় জীবনের সংস্কার এত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করা যায়। বাংলা দেশের রূপকথার মধ্যেও এই কাহিনী আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। একটি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়া আসিবার ফলে বাংলা রূপকথার এই কাহিনী যখন প্রাণশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহার মধ্যে আধুনিকতম জীবন ও শিল্পচেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভিমানে যখন বাংলার রূপ-কথাগুলি এ দেশের শিক্ষিত সমাজ বিস্মৃত হইয়া যাইতেছিল, তখনই

ইহাতে প্রত্যেক চরিত্রই সুস্পষ্ট ব্যক্তিপরিচয় লাভ করিয়া আধুনিক উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্রের মর্যাদা লাভ করে।

ব্রতকথার প্রধান ধর্ম সংক্ষিপ্ততা, বর্ণনার বাহুল্য ইহাতে সাধারণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা মৌখিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য; কারণ, সংক্ষিপ্ততা স্মরণ করিয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে। মঙ্গলকাব্য লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা-বাহুল্য ইহার বৈশিষ্ট্য। মঙ্গলকাব্যের বিষয়-বর্ণনা অনেক সময় 'এপিক-ধর্মী' হইয়া উঠে, কিন্তু ব্রতকথায় এই গুণ প্রকাশ পাইবার উপায় নাই। ব্রতকথায় চিত্র-রূপের বৈচিত্র্য নাই; ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে হইলে সকল ব্রত-কথাতেই শুনিতে পাওয়া যাইবে 'হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়াল ভরা গরু, মরাই ভরা ধান'। ইহার চরিত্রগুলি যেমন নির্বিশেষ, তেমনই ইহার কোন চিত্ররূপও সবিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য ইহার চরিত্রগুলির মত চিত্রগুলিও মনের উপর কোনও দাগ কাটিতে পারে না।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ হইতে জাত সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় প্রেরণায় ব্রতকথাগুলির জন্ম, অলৌকিকতা ইহাদের অবলম্বন; কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি বৃহত্তর সমাজ-চেতনার ফল, ইহাদের বাস্তব ধর্ম অনেক সময় ইহাদের অলৌকিকতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া উচ্চাঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়া থাকে। ব্রতকথার পরিকল্পনায় রক্ষণশীল ও মঙ্গলকাব্যের পরিকল্পনায় প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় প্রকাশ পায়। কারণ, ব্রতকথা কোনদিন নূতন করিয়া রচিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু 'নূতন মঙ্গল' রচিত হইয়া সর্বদাই সমাজের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

সাত

লোক-কথা ও রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়স হইতেই যে লোক-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, সেকথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তিনি যে লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি কিছু ছড়া ও গ্রাম্য-গীতি সংগ্রহ করিলেও কোন লোক-কথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি লোক-কথার প্রেরণাও যে তাহার সমগ্র জীবনের কাব্য-সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কাব্য-রচনার ধারা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'বিচিত্র প্রবন্ধের' একটি প্রবন্ধে রূপকথার রস-ব্যঞ্জনাটিকে তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন; কাশী, কাঞ্চী, কনোজ, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুতবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা.........

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তারপর ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়ালো।'

'কড়ি ও কোমল'-এর যুগ অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানসী'র যুগে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন বাংলার প্রকৃতি ও সহজ জীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তিনি তখন তাঁহার একান্ত আত্মকেন্দ্রিক ভাব-সাধনার মাঝখানেও বাংলার প্রকৃতি এবং জীবনকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বাংলা লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণের সংগ্রহকার্য তখন তাঁহার চলিতেছিল; সুতরাং তাহারই পটভূমিকায় তাঁহার কবি-মনোভাবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাঁহার সেই অনুভূতি সেদিন যে কত গভীর ছিল, তাহা তাঁহার 'মানসী'র একটিমাত্র কবিতা অনুসরণ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি তাঁহার 'বধূ' কবিতার মধ্য দিয়া বাংলার রূপকথা সম্পর্কে এই উল্লেখ করিয়াছেন,

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো!
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁ গো;
উঠিলে নব শশী ছাতের পরে বসি,
আর কি রূপকথা বলিবি না গো!

বাঙ্গালী জননীর কণ্ঠে উচ্চারিত রূপকথা যেন বাংলার প্রকৃতি—তাঁহার আকাশ বাতাস ফুল লতাপাতারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—সব কিছু মিলিয়াই বাঙ্গালীর জীবনকে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে। দূরে বাঁধের অস্পষ্ট জলরেখা, রাত্রির আকাশের বাঁকা রেখা চাঁদ, ঘনসারিবদ্ধ শ্যামল তালবন—ইহাদের সব কিছুকেই আশ্রয় করিয়া বাংলার সহজ জীবনটি যেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, বাংলার রূপকথাও যেন তাহারই মধ্যে নিজের আসনটি সহজভাবেই প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর জীবন হইতে তাহার রূপকথাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন নাই। এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিবার একটি উদ্দেশ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের চেতনার মধ্যে এই সত্যটি ধরা দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া এইখানেই বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের সঙ্গে যত সার্থক যোগ রক্ষা করিয়াছেন, অন্য কোথাও তাহা তত সার্থক ভাবে পারেন নাই।

'সোনার তরী' রচনার যুগেই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং এ'কথা মনে করা খুবই স্বাভাবিক যে, 'সোনার তরী'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের উপর লোক-সাহিত্যের সর্বাধিক প্রভাব

সক্রিয় হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতাটির উল্লেখ করিতে হয়। বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে আধুনিক রোমান্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া আধুনিক-ধর্মী কবিতা রচনায় বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি সার্থক প্রয়াস। বাংলার রূপকথা যে প্রাচীন রক্ষণশীল কিংবা নিরক্ষর সমাজেরই উপভোগ্য নয়, ইহার ভিতর দিয়া যে সর্বকালীন জীবন-সত্য প্রকাশ করা সম্ভব, রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার ভিতর দিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন। ইংরেজ কবি কীট্‌স যেমন আধুনিক জগতের কবি হইয়াও কল্পনায় প্রাচীন গ্রীসের জীবনের ভিতর হইতে সৌন্দর্য ও নিত্যত্ব সন্ধান করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও বাংলার নিরক্ষর সমাজের অলিখিত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাঁহার কবি-প্রতিভা অনুযায়ী সৌন্দর্য ও জীবন সন্ধান করিয়া আধুনিক পাঠককে উপহার দিয়াছেন।

সযত্নে সাজিল রাণী বাঁধিল কবরী,
নব ঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তারপরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক-দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, ইহা ইউরোপীয় রূপকথা Cinderella-র বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছিলেন, সমগ্র ইউরোপ দেশব্যাপী প্রচলিত এই রূপকথাটি ভারতবর্ষ হইতেই একদিন সেখানে গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল; সেইজন্য ইহার মধ্যে ভারতীয় জীবনের সংস্কার এত প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভব করা যায়। বাংলা দেশের রূপকথার মধ্যেও এই কাহিনী আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। একটি গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়া আসিবার ফলে বাংলা রূপকথার এই কাহিনী যখন প্রাণশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তখন তাহার মধ্যে আধুনিকতম জীবন ও শিল্পচেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়া ইহাকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অভিমানে যখন বাংলার রূপ-কথাগুলি এ দেশের শিক্ষিত সমাজ বিস্মৃত হইয়া যাইতেছিল, তখনই

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মনোভাব ও রসবোধের অনুগামী করিয়া বাংলার এই রূপকথাটিকে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন ; একদিক দিয়া ঐতিহ্য ও অপর দিক দিয়া আধুনিকতা এই উভয়ের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' কবিতাটি বিশেষ শক্তিশালী রচনা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে।

'সোনার তরী'র কবিতাগুলি রচনাকালে যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপকথাগুলির রসতীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান কারণ পুর্বে একবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি সেই যুগে বাংলার নিভৃত পল্লীজীবনের মধ্যে নিজের সাধনার আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি নিজেও 'ছিন্নপত্রে' লিখিয়াছেন,

'এখানে এসে আমি এত "এলিমেণ্ট্স অব পলিটিক্স" এবং "প্রব্লেম্স্ অব দি ফ্যুচার" পড়ছি শুনে বোধ হয় খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোন কাব্য নভেল খুঁজে পাইনে। যেটা খুলে দেখি, সেই ইংরেজি নাম, ইংরেজি সমাজ, লণ্ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িং রুম, এবং যত রকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিদে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত এবং অশ্রুবিন্দুর মত উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাইনে। কেবল প্যাচের উপর প্যাচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানব-চরিত্রকে মুচ্ড়ে নিংড়ে কুঁচ্কে মুচ্কে, তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিওরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোট নদীর শান্তস্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসার, দুই কূলের অবিরল শান্তি এবং চারিদিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাইনে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোট ছোট পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো রূপকথা জানতুম এবং সরস ছন্দে সুন্দর ক'রে ছেলেবেলাকার ঘোরো-স্মৃতি দিয়ে সরস ক'রে লিখতে পারতুম, তা' হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হতো। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চ হাসি মিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং ছোটো খাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারিকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি, আম বাগানের ঘনচ্ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষে ক্ষেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং করুণতায় পরিপূর্ণ।'

উপরের উদ্ধৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি যে মেয়েলী রূপকথা নিজে খুব বেশি জানিতেন, তাহা নহে—অথচ যে কয়টিই জানিতেন, তাহাদের ভিতর দিয়াই ইহাদের সম্পর্কে আরও জানিবার আগ্রহ বোধ করিতেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার পক্ষে এই বিষয়ে আরও বেশি করিয়া জানিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। বাংলার রূপকথার সম্পর্কে যে সামান্য জ্ঞানটুকু তাঁহার ছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি 'সোনার তরী'র 'বিম্ববতী' কবিতাটির মত আরও কয়েকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' অন্যতম। এই কবিতাটির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ পুষ্পমালা-রূপকথাটির প্রাচীন এবং গতানুগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিক রোমাণ্টিক চেতনা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু-জনে দেখা হোত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।

ইহার মধ্য দিয়াও রূপকথার চিরন্তন প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করা হইয়াছে। রূপকথার চরিত্র মাত্রই রূপক, এখানেও রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে রূপক চরিত্র—ইহারা শাশ্বত জীবনের চিরন্তন প্রেম-কাহিনীর নায়ক-নায়িকা মাত্র।

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি।
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ
কখনো দুরু দুরু করে বুক
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।

এইভাবে 'সোনার তরী'র 'নিদ্রিতা' কবিতার ভিতর দিয়াও বাংলার রূপকথার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে,

রাজার ছেলে ফিরিছে দেশে দেশে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি তো কিছু রাখে নি দেখিবার।

রবীন্দ্র-কাব্যসাধনার মূল কথাটি রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই রূপকথাটি আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই যে, 'আমার যৌবন-কল্পনার অভীষ্টজন অবাস্তব আদর্শ বা স্বপ্নপুরীর অধিবাসী, বাস্তব জগৎ কিংবা সূর্যালোকিত পৃথিবীর অধিবাসী নহে'—

দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি,
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি,
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপনভরা লাবণ্যে নিরালা।

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী'র অন্যান্য বহু কবিতার ভিতর দিয়াই বাংলার প্রাচীন রূপকথার নিদ্রিত পুরীটিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতাতেও তিনি লিখিয়াছেন,

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।
অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া
হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি
ফুলায় পুন ছাতি।

রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র যুগ অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র নীতি-কবিতার সমষ্টি 'কণিকা' কাব্য গ্রন্থ রচনা করিলেন। তাঁহার একটি কবিতায় তিনি রূপকথার আবরণে বুদ্ধিভিত্তিক রূপকধর্মী একটি নীতি-কাহিনী রচনা করিলেন। কবিতাটির নাম 'চুরি-নিবারণ'—

সুয়োরাণী কহে, 'রাজা, দুয়োরাণীটার
কত মৎলব আছে বুঝে ওঠা ভার।

গোয়াল ঘরের কোণে দিলে ওরে বাসা,
তবু দেখো অভাগীর মেটে নাই আশা।
তোমারে ভুলায়ে শুধু মুখের কথায়
কালো গরুটিরে তবু দুয়ে নিতে চায়।'
রাজা বলে, 'ঠিক ঠিক বিষম চাতুরী—
এখন কী করে ওর ঠেকাইব চুরি!
সুয়ো বলে একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ।

'কল্পনা'র যুগে রবীন্দ্রনাথ যে 'জুতা আবিষ্কার' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত রূপকথা না হইলেও আখ্যান-পরিকল্পনায় তাহাতে রূপকথার সুস্পষ্ট প্রভাব অনুভব করা যায়—

কহিলা হবু, 'শুন গো গোবু রায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র।' ইত্যাদি

'শিশু' কাব্যগ্রন্থ রচনার যুগেও রবীন্দ্রনাথ রূপকথার বিষয় এইভাবে স্মরণ করিয়াছেন,

শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল কুঁড়ি।
তাহারি মাঝে বাসা।
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে যাওয়া আসা।—'খোকা'

এই কবিতার মধ্যেই রূপকথার চিত্র স্মরণ করিয়া আবার লিখিয়াছেন,

সেথা ফুল গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশুপাখি,
যাহা খুশী তাই করে,
সত্যের কিছু না ডরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।' —ঐ

রূপকথার সাত ভাই চম্পার চিত্রটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,

চাঁপার ডালে চাঁপা ফোটে
এমনি ভানে।

যেন তারা সাত ভায়েরে
কেউ না জানে। —'ভিতরে ও বাহিরে'

শিশু কাব্যগ্রন্থে 'সমালোচক' কবিতার মধ্য দিয়া শিশু পিতার বিদ্যার সমালোচনা করিয়া বলিতেছে,

ঠাকুর মা কি বাবাকে কথ্‌খনো
রাজার কথা শুনায় নি ক কোনো।
সে সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি।

শিশু কাব্যগ্রন্থের 'বীরপুরুষ' কবিতাটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই বাংলার রূপকথায় বর্ণিত দুঃসাহসিক অভিযানের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে,—

ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কতলোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

রূপকথার রাজপুত্র কর্তৃক দুঃসাহসিক উপায়ে রাক্ষস কিংবা কোন দৈত্যকে বধ করিবার চিত্রটিই এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তারপর 'রাজার বাড়ী' কবিতাটির মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই রূপকথার রাজবাড়ীর স্বপ্ন পরিবেশটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা সাত সাগরের পারে,
আমি ছাড়া আর কেহ তো পায় না খুঁজে তারে।
দু' হাতে তার কাঁকন দু'টি দুই কানে দুই দুল,
খাটের থেকে মাটির প'রে লুটিয়ে পড়ে চুল।
ঘুম ভেঙ্গে তার যাবে যখন সোনার কাঠি ছুঁয়ে
হাসিতে তার মাণিকগুলি পড়বে ঝরে ভুঁয়ে।
রাজকন্যা ঘুমোয় কোথা শোন মা কানে কানে—
ছাদের পাশে তুলসী গাছের টব আছে যেইখানে।

—'রাজার বাড়ী'

'উৎসর্গ' কাব্য রচনার যুগেও রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে রূপকথার রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন,

গভীর চিত্তে যে গোপনশালা সেথায় ঘুমায় যে রাজবালা
জানি না সে কোন জনমের পাওয়া।

*   *   *   *   *

ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠি রূপে
ভাঙলো তার চির যুগের ঘুম।

তারপর ক্রমে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রত্যক্ষ জীবন ও জগৎ পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া কল্পনা ও অধ্যাত্মলোকে আরোহণ করিলেন, তখনও রূপকথার চিত্র তাঁহার সাধনার সঙ্গী হইয়া রহিল; তারপর 'বলাকা' র যুগ অতিক্রম করিয়া যখন তিনি পুনরায় মর্ত্যের প্রীতিভরে পুনরায় মাটির উপর নামিয়া আসিলেন, তখনও রূপকথার স্বপ্ন তাঁহার দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইল না। তাঁহার শেষ জীবনের 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বিচিত্রা' কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,

লক্ষহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরীর মাঠে। —'বিচিত্রা'

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'রাজপুত্র' কবিতাটির মধ্যে আনুপূর্বিক রূপকথার রাজপুত্রের চিত্রটি গ্রহণ করিয়াছেন। 'আতঙ্ক' কবিতার মধ্যে রূপকথার একটি চিত্রকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন,

ওইখানে দৈত্য পুরী
অদৃশ্য কুঠুরি থেকে তার
মনে মনে শোনা যেত হাউমাউ খাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলখিলি হাসত ডাইনী বুড়ী। —'আতঙ্ক'

'শিশু'র 'নৌকাযাত্রা' কবিতায় শিশু যে অভিলাস ব্যক্ত করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়াও যেন রবীন্দ্রনাথের চোখে রূপকথার স্বপ্ন-অঞ্জনটুকু মাখা রহিয়াছে—

ভোরের বেলা দেব নৌকা ছেড়ে,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোথায় যাব ভেসে।

দুপুর বেলা তুমি পুকুর ঘাটে,
আমরা তখন নতুন রাজার দেশে।
পেরিয়ে যাব তিরপুর্ণির ঘাট,
পেরিয়ে যাব তেপান্তরের মাঠ
ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যে হয়ে যাবে,
গল্প বল্‌ব তোমার কোলে এ'সে।
আমি কেবল যাব একটি বার
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার। —'নৌকাযাত্রা'

এই চিত্রটিই পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথকে 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্য রচনার প্রেরণা দিয়াছিল।

'ছুটির দিনে' রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় শিশুর মনে যে চিত্রটির উদয় হয়, তাহাও রূপকথার জীবনাশ্রিত—

এম্‌নিতরো মেঘ করছে
সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে
একলা ঘোড়ায় চেপে।
গজমোতির মালাটি তার
বুকের পরে নাচে—
রাজকন্যা কোথায় আছে
খোঁজ পেলে কার কাছে।
মেঘে যখন ঝিলিক মারে
আকাশের এক কোণে
দুয়োরাণীর মনের কথা
পড়ে না তার মনে?
দুখিনী মা গোয়াল ঘরে
দিচ্ছে এখন ঝাঁট
রাজপুত্তুর চলে যে কোন
তেপান্তরের মাঠ। —'ছুটির দিনে'

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণের মধ্যেও লোক-সাহিত্যের স্বাক্ষর বর্তমান রহিয়াছে, যেমন, 'ছড়ার ছবি,' 'ছড়া' ইত্যাদি—

শৈশব প্রসঙ্গে ছড়া ও রূপকথার বিষয় বার বার ইহাদের মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের বহু কবিতায় ছড়ার ভগ্নাংশ অবিকৃত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা যেন হৃদয়ের একান্ত আপন অনুভূতিকে ছড়ার বন্ধনে বলয়িত করিয়া রাখিবার এক আকুল আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'ছড়া' ; ইহা বিশেষ তাৎপর্যমূলক।

সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় বাংলার রূপকথা সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই আলোচনা শেষ করিব। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—'এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব কত রাজ্য-পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুন্ন চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুম পাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চিরপুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত। অতএব বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এমনি ভাবেই বাংলার রসে রসায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের রস-সাধনাই ইহার পরিচয়।

আট

বাংলা লোক-কথা সংগ্রহ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতেই খৃষ্টান ধর্ম-প্রচারকদিগের প্রচেষ্টায় বাংলা লোক-সাহিত্যের একটি প্রধান উপকরণ প্রবাদ সংগ্রহের কাজ আরম্ভ হইলেও বাংলার লোক-কথা সংগ্রহের দিকে তাহাদের দৃষ্টি কোন দিনই আকৃষ্ট হয় নাই। অথচ বাংলার প্রতিবেশী অঞ্চল বিশেষতঃ সাঁওতালভাষী অঞ্চল হইতে একজন ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারকের চেষ্টায় বৃহত্তম লোক-কথা-সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদিগের পর একজন বিশিষ্ট ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যর জন্ গ্রীয়ারসন বাংলা লোক-সাহিত্যের আর একটি অতি মূল্যবান্ উপকরণ গীতিকা প্রকাশিত করেন। তারপর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাংলার লোক-কথার প্রথম সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। ইহার সংগ্রাহক প্রসিদ্ধ রেভাঃ লালবিহারী দে, তাঁহার সংগ্রহ তিনি ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ইহার নাম *Folk-Tales of Bengal.*

ইহা ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার ফলে ইহার দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহাতে অতি সহজেই সেদিন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারিয়াছিল। সেদিন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লোক-কথা বিষয়ে যে নূতন ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলা-দেশের এই উপকরণগুলি তাহার মধ্যেও স্থান লাভ করিয়া বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতিকে এক নূতন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে ইহাই সে দিন ভারতীয় লোক-কথার প্রথম সংগ্রহ ছিল বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিয়া এই বিষয়ে কেহই কোন তুলনামূলক আলোচনা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। দেশের গার্হস্থ্য জীবনাশ্রিত এই লোক-কথাগুলিকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া রেভাঃ লালবিহারী দে এক অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন; ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার একদিকে ইংরেজি জ্ঞান, আর এক-দিকে বাঙ্গালীর জীবন ও তাহার লৌকিক রস-সংস্কার সম্পর্কে সহানুভূতি দুই-ই সমান ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে যুগে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্সগুলি শিক্ষিত বাঙ্গালীকে আনন্দদান করিতেছিল, সেই যুগে লালবিহারী দে রচিত ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়া বাংলার রূপকথায় তাহারা নিজেদের ঘরের আনন্দ-বেদনার কথা শুনিতেছিল।

ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলার লোক-কথাগুলি প্রকাশিত হইবার দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, সেদিন দেশের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজও ইহাদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিল এবং তাহার মধ্যে এই বিষয়ে কৌতূহল জাগ্রত হইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং বাংলার লোক-কথা সংগ্রহের বিষয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালেও তাহা কেহ অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

রেভাঃ লালবিহারী দে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরই বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যতম কৃতী সন্তান মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও জন্ম হয়। উভয়েই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষায় সমান অগ্রসর ছিলেন এবং উভয়েই তাঁহাদের জীবনের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিবার সহায়করূপে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইয়াও বাংলা ও বাঙ্গালীরই সাংস্কৃতিক জীবনের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা হইতেই এই বিষয়টি বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি ইংরেজি ভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা এই : *Folk Tales of Bengal, Peasant Life in Bengal, Bengali Festival and Holidays, Sports and Games of Bengal, Bankers' Caste of Bengal, Chaitanya and Vaisnavas of Bengal.* লালবিহারী হিব্রু, ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক নিযুক্ত হইয়া বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনায় বাসকালীন তিনি একখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন, তাহার নাম 'অরুণোদয়।' সে যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ 'অরুণোদয়ে'র লেখক ছিলেন। তিনি তারপর সরকারী শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত বহরমপুর কলেজের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বহরমপুর হইতে তিনি হুগলী বদলি হইয়া আসেন এবং সেখান হইতেই অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৭৭-১৮৮৯ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। 'অরুণোদয়' ব্যতীতও তিনি *India Reformer, Friday Review* এবং *Bengal Magazine* নামক ইংরেজি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেভা: লালবিহারী দের *Folktales of Bengal* ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ। ইহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,

'I had myself, when a little boy, heard hundreds—it would be no exaggeration to say thousands—of fairy tales from that

of same old woman, Sambhu's mother—for she was no fictitious person ; she actually lived in the flesh and bore that name ; But she had gone long long ago...I found in the person of a Bengali Christian woman, who, when a little girl and living in her heathen home, had heard many stories from her old grandmother. She was a good story-teller, but her stock was not large ; and after I had heard ten from her I had to look about fresh sources.'...

লালবিহারী দের *Bengal Peasant Life* বা *Govinda Samanta* প্রকৃত-পক্ষে লোক-কথার সংগ্রহ না হইলেও লোক-কথার রসে ইহাও সঞ্জীবিত হইয়াছে। লোক-জীবনের যে স্তর হইতে লোক-কথা উৎসারিত হইয়া থাকে, তাহার প্রতি সুগভীর মমতা না থাকিলে লোক-কথা সংগ্রহ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। লালবিহারী দের *Bengal Peasant Life* নামক গ্রন্থটিতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য লালবিহারী দে'র ভাষা। ইংরেজি রচনায় তাঁহার অপরিসীম দক্ষতা ছিল শুধু তাহাই নহে, তিনি ইংরেজি ভাষাকেও বাঙ্গালী জীবনের উপযোগী করিয়া রচনা করিতে পারিতেন। যে রূপকথাগুলি তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালী জীবনের রসগত ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়া যে বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহা কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই। সেইজন্য একদিকে যেমন সার্থক ইংরেজি ভাষা ইহাদের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তেমনই অন্য দিক দিয়া বাংলা ভাষারও বৈশিষ্ট্য ইহাদের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব রক্ষা পাইয়াছে। একদিক দিয়া ইংরেজি ভাষার জ্ঞান, অন্যদিকে বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহার সুনিপুণ পরিচয় উভয়ের ভিতর দিয়াই তাঁহার সংগ্রহ একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

রেভাঃ লালবিহারী দে'র বাংলা লোক-কথার সংগ্রহ রাজ-সংস্করণরূপে পাশ্চাত্ত্য চিত্রশিল্পী দ্বারা বহু চিত্রে শোভিত হইয়া মুদ্রিত হইয়া বহুল প্রচার লাভ করিবার ফলে এই বিষয়ে কেবলমাত্র যে বৈদেশিক অনুসন্ধানকারীর দৃষ্টিই আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই নহে—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত দেশীয় সমাজও এই বিষয়ের প্রতি কৌতূহল অনুভব করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি ভাষাতেই আরও কয়েকটি সংগ্রহ প্রকাশিত হইল। তাহাদের মধ্যে রামসত্য মুখোপাধ্যায় প্রণীত *Indian Folklore* (১৯০৪), কাশীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

Popular Tales of Bengal (১৯০৫), ম্যাককালক্ সংকলিত *Bengali Household Tales* (১৯১২), ডি. এন. নিয়োগী সংকলিত *Tales Sacred and Secular* (১৯১২), শোভনা দেবীর *The Orient Pearls*. ব্রাডলি-বার্ট সঙ্কলিত *Bengal Fairy Tales* (১৯২০), দীনেশচন্দ্র সেন রচিত *The Folk-literature of Bengal* (১৯২০), মহারাণী সুনীতিদেবী সঙ্কলিত *Indian Fairy Tales* (১৯২৩), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ও ফরাসী ভাষায় *Sons les Manquiers* নামে এই বিষয়ে একখানি সংকলন প্রকাশ করেন।

১৯০৫ সনে বাংলা দেশে যে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তাহার ভিতর দিয়া বাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ এক নূতন প্রেরণা লাভ করে। ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলে ভুলানো ছড়া ও গ্রাম্য গীতির সংগ্রহের ভিতর দিয়া এই বিষয়ে এই দেশীয় পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহ লাভ করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি লোক-কথা সংগ্রহের কার্যে অগ্রসর হইয়া আসেন। তাঁহাদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রেভা: লালবিহারী দে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাংলা ভাষায় তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার কোন কোন সংগ্রহ ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। বাংলা দেশের শৈশব শিক্ষায় তাঁহার সংগ্রহের সঙ্গে পরিচিত হন নাই, এমন লোক অতি অল্পই আছেন।

ঢাকা জিলার উলাইল গ্রামে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার মাতৃবিয়োগের পর তিনি মৈমনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন দীঘাপাইত গ্রামে পিসিমার নিকট লালিত পালিত হন। নিঃসন্তানা পিসিমাই তাঁহাকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল সেই গ্রামে পিসিমার সান্নিধ্যে কাটাইয়া প্রধানতঃ তাঁহার মুখ হইতেই বাংলার লোক-কথার এক সমৃদ্ধ সঞ্চয়ের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। তখন হইতেই লোক-কথার সংগ্রহের কার্যে তিনি প্রেরণা লাভ করেন এবং সমগ্র জীবন ইহারই অনুশীলনে ব্যয় করেন। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। লোক-সাহিত্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে তিনি কেবলমাত্র নিজের

আগ্রহ লইয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই বিষয়ে কোনদিক হইতে বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ পান নাই।

কাব্য রচনা দ্বারা দক্ষিণারঞ্জনের সাহিত্য-জীবনের সূচনা হয়; ক্রমে তিনি বাংলার লোক-কথা সংগ্রহের কার্যে মনোযোগী হন। তিনি তাঁহার সংগৃহীত উপাদানগুলি লইয়া তখন কলিকাতায় আসেন। তাঁহার প্রতি তখন সুধী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহাকে তাঁহার সংগ্রহগুলি প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহিত করেন এবং রবীন্দ্রনাথের একটি মূল্যবান ভূমিকা সহ তাঁহার সংগ্রহের একাংশ 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭) নামে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমে তিনি 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' (১৯০৯) 'ঠানদিদির থলে', 'দাদা-মহাশয়ের থলে' ইত্যাদি সংগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্রমে তিনি শিশুপাঠ্য অন্যান্য গ্রন্থও রচনা করেন। তাহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার জন্য তিনি শিশুসাহিত্য-সম্রাট্ নামে পরিচিত।

দক্ষিণারঞ্জনের সংগ্রহের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার মধ্যে কথার রসটুকু রক্ষা করিবার জন্য তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাজ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। ইহার একটি প্রধান বাধা এই ছিল যে, যে প্রাদেশিক কথ্য ভাষায় কথাগুলি আবৃত্তি করা হইয়া থাকে, তাহা বাংলাদেশের সর্বত্র সমান বোধগম্য নহে; অথচ ইহাদের মূল কথ্যভাষায় ইহাদিগকে প্রকাশ করিলে ইহাদের ভাষাতত্ত্বগত মূল্য ছাড়া সাধারণ পাঠকের নিকট আর কোন মূল্যই প্রকাশ পাইতে পারে না। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার নিজস্ব অসাধারণ প্রতিভাগুণে তাঁহার সংগ্রহ একদিক দিয়া যেমন সর্বজনবোধ্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে ইহাদের কথার রস বা আবৃত্তির বৈশিষ্ট্যটিকেও রক্ষা করিয়াছেন। তিনি যথার্থই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, পিতামহী কিংবা মাতামহী কণ্ঠে এইগুলি যে ভাবে আবৃত্তি করা হয়, তাহার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র নিছক একটি কাহিনীই শুনিতে পাওয়া যায় না, সেই কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়া যে একটি বিশেষ ভঙ্গী প্রকাশ পায়, তাহার মধ্য দিয়া ইহার যথার্থ একটি রস সৃষ্টি হয়। ইহা গদ্য রচনা হইলেও গদ্যের সাধারণতঃ যে কাজ, ইহার কাজ পুরাপুরি তাহা নহে; ইহা পদ্যধর্মী গদ্য, রস ইহার প্রাণস্বরূপ; কথাগুলি পরিবেষণের মধ্য দিয়া ইহাদের ভাষার কাব্যধর্মিতা এবং রসপ্রাণতা প্রকাশ না পাইলে ইহাদের আবেদন ব্যর্থ হয়। অথচ প্রাদেশিক ভাষার ব্যবধান অতিক্রম করিয়া ইহারা যদি সর্বজনবোধ্য না হইতে পারে, তবে ইহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

সেই জন্য তিনি এই বিষয়ে বিশেষ একটি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি যে একটি আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্তী অনেক সংগ্রাহকই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু কেহই সার্থক হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহা তাঁহারই একটি বিশিষ্ট গুণ ছিল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

রেভাঃ লালবিহারী দে এবং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র উভয়েই যাহা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ লোক-কথার একটি মাত্র বিষয় অর্থাৎ রূপ-কথা ; ইহার আর একটি যে প্রধান বিষয় ছিল, তাহা ইহাদের কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহা উপকথা, ইংরাজিতে সাধারণ ভাবে ইহাকে Animal Tales বা Humorous Tales বলা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে যাঁহার দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল, তিনিও বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে একজন বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী, তাঁহার নাম উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। তিনি ১৩১৭ সালে (১৯১১ খৃঃ) তাঁহার উপকথার সংগ্রহ 'টুনটুনির বই' প্রকাশিত করেন। তিনি তাঁহার সঙ্কলনের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

তাঁহার 'টুনটুনির বই' এই প্রকার গল্পেরই সংগ্রহ। এখানে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, যদিও শিশুদিগকে নিদ্রা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য মহিলাগণ রূপকথাও বলিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার সংগ্রহে একটিও রূপকথা নাই, সব কয়টিই উপকথা। সুতরাং দেখা যায়, উপেন্দ্রকিশোরের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, লোক-কথার মধ্যে উপকথার যে বৈশিষ্ট্য, তাঁহার বিশেষ দৃষ্টির গুণে তাহাই তাঁহার নিকট সংগ্রহ ও প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই ভাবে বিভিন্ন দিক হইতে যদি সংগ্রহের কার্য সেদিন সম্ভব না হইত, তবে আজ বাংলার লোক-কথা সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় পাইবার কোন উপায় ছিল না।

১২৭০ সালে (ইং ১৮৬৪) মৈমনসিংহ জিলার মসূয়া গ্রামের এক সমৃদ্ধ পরিবারে উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালেই মৈমনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন, তখনই তাহার নূতন নামকরণ হয়, উপেন্দ্রকিশোর, তাঁহার পিতৃদত্ত নাম

কামদারঞ্জন। তিনি বাংলার শিক্ষাজগতে সুপরিচিত সারদারঞ্জন রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

মৈমনসিংহ সহরের জেলা স্কুলে পাঠ করিবার কালেই তিনি সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। সেখান হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং তারপর মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হন, মেট্রোপলিটান কলেজ হইতেই তিনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার পুত্র সুকুমার রায় পিতার শিশুসাহিত্য-প্রীতির উত্তরাধিকারী হইয়া বাংলার শিশু-সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন এবং পৌত্র সত্যজিৎ রায় চিত্র-জগতে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৩২২ সালে (১৯১৬ খৃঃ) উপেন্দ্রকিশোর মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

মৈমনসিংহ জিলার পল্লী অঞ্চল হইতেই উপেন্দ্রকিশোরের উপকথাগুলি সংগৃহীত হইলেও ইহাদের ভাষা পরিমার্জিত করিয়া তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের প্রাদেশিক কোন রূপ তিনি রক্ষা করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উপকথা বলিবার যে ভাষাটি আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, ইহার মধ্যে সেই ভাষাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। উপকথাগুলির প্রধান রস কৌতুকরস, তাঁহার ভাষার ভিতর দিয়া কৌতুকরস সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই ইহাদের বিশিষ্ট প্রাণশক্তি যে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাই অনুভূত হইবে।

বাংলার লোক-কথার একটি প্রধান অংশ ব্রতকথা; ইহার কেবল মাত্র সাহিত্যিক মূল্যই নহে, একটি আচারগত মূল্যও আছে। এই উভয় দিক হইতেই ব্রতকথাগুলি নানা সংগ্রহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম সংগ্রহ যে কবে কাহা দ্বারা সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যাইবে না, তবে রূপকথা সংগ্রাহক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 'ঠানদির থলে' নামক ইহার একটি সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, তখন তিনি বাংলার ব্রতকথাগুলি সংগ্রহের কার্যে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে কিরণবালা দেবী কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়া ইহার একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংগ্রহটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দী মহকুমা অঞ্চলের ব্রতকথাগুলিই সঙ্কলিত

হইয়াছিল। ব্রতকথাগুলি বলিবার যে একটি বিশেষ মেয়েলী ভঙ্গী আছে, সে বিষয়ে স্ত্রীসমাজ যতখানি সচেতন, পুরুষ-সমাজ তত নহে। প্রকৃত পক্ষে ব্রতকথাগুলি স্ত্রীসমাজের মধ্যেই প্রচলিত; কিরণবালা দেবী স্ত্রীসমাজে ইহাদের ব্যবহারের ভঙ্গীটি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাদিগকে সঙ্কলন করিয়াছিলেন; প্রাদেশিক মেয়েলী ভাষাও ইহাদের মধ্যে রক্ষা পাইয়াছে। অথচ সর্বসাধারণের বোধগম্য হইতে ইহাদের মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নাই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁহার 'ঠানদির থলি'র মধ্যে ব্রতের প্রণালীগুলি যথাযথ বর্ণনা করিতে যত যত্নবান হইয়াছেন, ইহাদের কথাগুলি বর্ণনা করিবার মধ্যে সেই যত্ন প্রকাশ করেন নাই। সেইজন্য তাঁহার এই সংগ্রহ তাঁহার অন্যান্য রূপকথা সংগ্রহের তুল্য মর্যাদার অধিকারী হইতে পারে নাই। স্ত্রীসমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রসার লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলী ব্রতকথাগুলি ব্যবসায়ী সঙ্কলয়িতা কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া অনেকদিন যাবৎই বটতলা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। মৌখিক ধারা পরিত্যাগ করিয়া ইহারা লিখিত হইবার ফলে ইহাদের প্রাণধারা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। বহু ক্ষেত্রে ইহারা সঙ্কলয়িতার হাতে পড়িয়া সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপ লাভ করিতেছে; তাহাতে লোক-কথা হিসাবে ইহাদের মূল্য হ্রাস পাইতেছে। শিক্ষিত মেয়েরা যাহাতে তাহাদের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিবার পরিবর্তে মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ইহারা সঙ্কলিত হয় বলিয়া ইহাদের মধ্যে সাহিত্যিক, সামাজিক কিংবা নৃতত্ত্বগত মূল্য সামান্যই প্রকাশ পায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহারা সঙ্কলিত হইলে ইহাদের দ্বারা যে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিত, অনভিজ্ঞ সঙ্কলিয়তা কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রচারিত হইবার ফলে ইহাদের মধ্যে সেই গুণ প্রকাশ পাইতে পারে না।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন দেশের অন্তর্গত ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুপ্রসিদ্ধ লোক-কথা বিশ্লেষক অধ্যাপক স্টিথ টম্‌সন এবং জোনস্ বেলিসের সম্পাদনায় *The Oral Tales of India* নামে এক সুবৃহৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় লোক-কথার অভিপ্রায় বা motif-গুলির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। অধ্যাপক স্টিথ্ টম্‌সন ইতিপূর্বেই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ *Motif Index of Folk Literature* নামক গ্রন্থে যে ধারায় ভারতীয় লোক-কথা সমূহের অভিপ্রায় (motif) নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যেও প্রধানতঃ সেই প্রণালীই গৃহীত হইয়াছে। এ পর্যন্ত ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় যে

সকল বাংলা লোক-কথা অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই অধ্যাপক টম্‌সন তাঁহার উক্ত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার *The Folk Literature of Bengal* বইখানি যে গ্রন্থ দুইখানির ভিত্তিতে রচনা করিয়াছেন, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সেই বই দুইখানি এই আলোচনায় স্থান পাইতে পারে নাই। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'টুন্‌টুনির বই'য়ের কোন ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই; সুতরাং স্বভাবতঃই তাহাও তিনি তাঁহার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মার্কিন দেশের ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *The Oral Tales of India* নামক গ্রন্থে ভারতীয় লোক-কথার যে পরিচয় ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাংলার লোক-কথা স্থান লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই; কিংবা তাহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য যথাযথ বিশ্লেষিত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্ত্য লোক-কথা বিশারদ ডক্টর হীনৃজ মোদে *Folk-lore* পত্রিকায় (Vol. II. No. 4) 'Types and Motifs of the Folktales of Bengal' নামক এক প্রবন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ লালবিহারী দে'র সংগৃহীত একটি কাহিনী উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহাতে একাধিক অভিপ্রায় (motif) থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ-সম্পাদক একটি মাত্র অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কতকগুলি সুদীর্ঘ কথার মধ্যে নানা অভিপ্রায় (motif) থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষিত নির্দেশিকায় তাহাদের একটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই ভাবে একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোক-কথা বিশারদের রচনায় বাংলার লোক-কথা যে যথাযথ মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই, তাহা ডক্টর মোদে নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বিচার করিয়াছেন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত দেশের লেনিনগ্রাদ সহরের Institute of the People of Asia হইতে ভারতীয় লোক-কথার একটি রুশ অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে একটিও বাংলার লোক-কথা স্থান লাভ করে নাই।

সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্ত্য গবেষকদিগের মধ্যে বাংলার লোক-কথা বিষয়ে যিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তিনিই ডক্টর হীনৃজ মোদে। তাঁহার আলোচনার মধ্য দিয়া বাংলা লোক-কথাগুলির মূল সূত্রটি ধরিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে। ইহা বাংলা লোক-কথার পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

লোক-কথার শ্রেণীবিভাগ

বিশেষ এক একটি দেশে যে বিপুল লোক-কথার সংগ্রহ প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে আলোচনার সুবিধার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পূর্বে এই শ্রেণীবিভাগে সুনির্দিষ্ট কোন প্রণালী অনুসরণ করা হইত না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম প্রচারক কিংবা রাজকর্মচারিগণও যে সকল সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইচ্ছা মতই ইহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। বাংলা লোক-কথাও সাধারণতঃ বিষয় অনুযায়ী, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা এই সকল ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। কোন কোন বিদেশী লোক-কথা সংগ্রাহক ইহাদিগকে Animal Tales, Romantic Tales, Wonder Tales, Humorous Tales ইত্যাদি ভাগে ভাগ করিয়াছেন।

কেবল মাত্র লোক-কথা নহে, উচ্চতর কথাসাহিত্যও উপন্যাস, রোমান্স, ছোট গল্প ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং লোক-কথাকেও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইবে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু কোন্ প্রণালী অনুসরণ করিলে এই শ্রেণীবিভাগ যথার্থ সার্থক হইতে পারে, তাহাও বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

বাংলাতে যে ইহাকে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, তাহার একটি প্রধান ক্রুটি এই যে, অনেক সময় রূপকথায় এবং ব্রতকথায় সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। অনেক রূপকথা সাম্প্রদায়িক (sectarian) প্রয়োজনে ব্রতকথায় পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যে রূপকথার গুণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায় না, অথচ তাহাদের মধ্যে ব্রতকথার ধর্মও সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ইংরেজিতে যে কেহ কেহ Animal Tales এবং Humorous Tales-এর মধ্যে পার্থক্য অনুভব করিয়াছেন, তাহাও সর্বদা সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না। কারণ, অনেক Animal Tales যথার্থ হাস্যরসোদ্দীপক। বিশেষতঃ Romantic Tales এবং Wonder Tales এর মধ্যেও সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষতঃ পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন সংগ্রাহকগণ বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রণালী গ্রহণ করিলে আলোচনায় অসুবিধা হয় বলিয়া এই সম্পর্কে একটি

আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিয়াছেন।

আধুনিক কালে পৃথিবীর লোক-কথা বিষয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গবেষক অধ্যাপক ষ্টিথ্‌ টম্‌সন এই বিষয়ে সর্বপ্রথম একটি নীতির প্রবর্তন করেন, তাহা Aarne Thompson প্রবর্তিত 'Index of Tale Types' বলিয়া পরিচিত। ইহাতে লোক-কথাগুলিকে তিনি ইহাদের Type অনুযায়ী এইভাবে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিলেন,—প্রথমতঃ পশুপক্ষীর কথা (Animal Tales), ইহার অন্তর্গত বন্যপশু ও গৃহপালিত পশু, মানুষ ও বন্যপশু, গৃহপালিত পশু, পক্ষী, ও অন্যান্য পশুপক্ষী ইত্যাদি উপবিভাগ নির্দেশ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিভাগটির নাম দিলেন সাধারণ লোক-কথা এবং ইহার অন্তর্গত নিম্নলিখিত উপবিভাগগুলি নির্দেশ করিলেন—দৈব বিড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন স্ত্রী, স্বামী কিংবা অন্যান্য আত্মীয়, অলৌকিক কর্তব্য পালন, দৈব সহায়ক, ঐন্দ্রিজালিক বস্তু, অলৌকিক শক্তি কিংবা অলৌকিক জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় কাহিনী, রোমাণ্টিক কথা, বুদ্ধিহীন রাক্ষসের কাহিনী। তৃতীয় বিভাগটিতে Jokes and Anecdotes অথবা হাস্যরসাত্মক এবং অন্যান্য ছোটখাট কাহিনীমূলক ঘটনার স্থান নির্দেশ করিয়াছেন ; নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উপরিভাগ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছিল, —বোকার গল্প, দাম্পত্যজীবনের গল্প, নারী ও পুরুষ বিষয়ক গল্প, মিথ্যা কথার গল্প, সমস্যামূলক গল্প ও অন্যান্য গল্প। ইহাকেই সাধারণ ভাবে Type Index বলা হয়। ইহাতে প্রত্যেকটি type এক একটি সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; যেমন The quest for the lost wife (Type 400). The black and the white bride (Type 403) ইত্যাদি।

এ কথা সত্য, লোক-কথার মধ্যে যে সকল চরিত্র কিংবা ঘটনা থাকে, তাহা কোন সবিশেষ (individual) চরিত্র লাভ করিতে পারে না ; সেইজন্য ইহা type বা ছাঁচে ঢালাই বলিয়া মনে হয়। সুতরাং type অনুযায়ী ইহাদিগের শ্রেণীবিভাগ করিলে ইহাদের আলোচনার পক্ষে সুবিধা হয়। ইহাদের মধ্য দিয়া পৃথিবীব্যাপী লোক-কথার মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্বেও এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত জটিল। বিশেষতঃ একই লোক-কথার মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রেরও type বা আদর্শ থাকিতে পারে, সেই জন্য প্রত্যেকটি লোক-কথাই এক একটি স্বাধীন ছাঁচের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

ইহাতে লোক-কথাগুলির type-সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া শ্রেণীবিভাগকে জটিল করিয়া তুলে।

অধ্যাপক ষ্টিথ টম্‌সন ইহার পর লোক-কথাগুলিকে ইহাদের অভিপ্রায় (motif) অনুযায়ী পুনর্বিভাগ করেন, তাহাই টম্‌সন প্রবর্তিত Motif Index নামে পরিচিত। ইহাতে তিনি লোক-কথাগুলির অভিপ্রায় অনুযায়ী ইহাদিগকে যে ভাবে বিভক্ত করিলেন, তাহা এই—

A. Mythological Motifs (পৌরাণিক অভিপ্রায়)
B. Animals (পশুপক্ষী)
C. Tabu (নিষেধাজ্ঞা)
D. Magic (ইন্দ্রজাল)
E. The Dead (প্রেতলোক)
F. Marvels (বিস্ময়)
G, Ogres (রাক্ষস)
H. Tests (পরীক্ষা)
J. The Wise and the Foolish (পণ্ডিত ও মূর্খ)
K. Deception (প্রতারণা)
L. Reversal of Fortune (ভাগ্যবিপর্যয়)
N. Chance and Fate (সুযোগ ও ভাগ্য)
P. Society (সমাজ)
Q. Rewards and Punishments (পুরস্কার ও শাস্তি)
R. Captives and Fugitives (বন্দী ও পলাতক)
S. Unnatural Cruelty (পাশবিক নিষ্ঠুরতা)
V. Religion (ধর্ম)
W. Traits of Character (চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য)
X. Humour (হাস্যরস)
Z. Miscellaneous Groups of motifs (বিবিধ অভিপ্রায়)

এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত ব্যাপক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির জীবন ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ইহা পরিকল্পিত হয় বলিয়া লোক-কথার আলোচনা সম্পর্কে ইহাই আজ সর্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক ষ্টিথ টম্‌সন পৃথিবীর এ' যাবৎ সংগৃহীত প্রায়

সকল লোক-কথারই একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা Motif Index of Folk Literature নামে ছয়টি সুবৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা দ্বারাও যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে, তাহা নহে। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত ব্যাপক এবং কেবলমাত্র বিস্তৃত উপকরণের উপর ইহা দ্বারা কাজ করা যাইতে পারে। যদি বিশেষ কোন জাতির কিংবা অঞ্চলের লোক-কথা লইয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন হয়, তবে দেখা যায়, সেই জাতির নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী যে লোক-কথা তাহার মধ্যে গড়িয়া উঠে কিংবা প্রচার লাভ করে, তাহার সীমা আরও সঙ্কীর্ণ। সেই ক্ষেত্রে এই বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগের কোন আবশ্যকতা করে না। বিশেষতঃ অনেক লোক-কথারই যে একটি মাত্রই অভিপ্রায় (motif) থাকে, তাহাও নহে—ইহার বিভিন্ন অভিপ্রায় থাকিতে পারে। এমন কি, এই বিভিন্ন অভিপ্রায় পরস্পর বিভিন্নমুখীও হইতে পারে ; সুতরাং কেবল একটি মাত্র অভিপ্রায় নির্দেশ করিলে ইহাদের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, যে-সকল লোক-কথা সরল, অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে একটির বেশী দুইটি অভিপ্রায় নাই, তাহাদের সম্পর্কে এই শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত ব্যাপক হইলেও সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

Motif বা অভিপ্রায়ের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিবার আর একটি ত্রুটি সম্পর্কে একজন ইংরেজ গবেষক যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন, 'The more significant or salient traits of these stories—motifs as we may call them —are distributed and rearranged anew in every time and clime of India. Everywhere each narrator and recorder takes up, as it were, the whole chain of these motifs, which we may liken to a chain of beads. He tears it apart so that the beads scatter in every direction, and then he strings them up in a new arrangement. Thus any motif may turn up at any time, in any place, and practically in any connection in Hindu fiction and its tributaries.'

লোক-কথা মৌখিক সাহিত্য বলিয়া ইহা সর্বদাই পরিবর্তিত হইতে হইতে ক্রমবিকাশ লাভ করে, এই পরিবর্তন প্রধানতঃ বহিরঙ্গেই হইয়া থাকে, কোন কোন সময় অন্তরঙ্গেও যে না হয়, তাহাও নহে ; সেইজন্য ইহাদের অভিপ্রায়ও (motif) পরিবর্তিত হইতে পারে। রূপকথা কিংবা উপকথাগুলি যখন ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্রতকথায় পরিবর্তিত হইয়া যায়, তখন ইহাদের মধ্যে

যাহা মৌলিক অভিপ্রায় ছিল, তাহা গৌণ হইয়া গিয়া এক নূতন অভিপ্রায়ের (motif) সৃষ্টি হয়। এইভাবে ভারতীয় প্রাচীনতর উপকথাগুলি যখন বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে পরিবর্তিত হইয়াছিল, তখন ইহাদের মৌলিক অভিপ্রায় যে অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি এ কথা সত্য, লোক-কথা যে-পরিবর্তনই স্বীকার করুক না কেন, ইহার মূল অভিপ্রায়ই (motif) সর্বাপেক্ষা অপরিবর্তিত থাকে। চরিত্রের গুণ কিংবা বিষয়ের পরিণতি—ইহারা সহজে পরিবর্তিত হইতে পারে বলিয়া type অনুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহা অপেক্ষা অভিপ্রায় (motif) অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অনেক কারণেই বিশেষ ভাবে সমর্থনযোগ্য। সেইজন্য আধুনিক গবেষকদিগের মধ্যে লোক-কথার শ্রেণীবিভাগের এই নীতিই ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইতেছে। স্টিথ টম্‌সনের *Motif Index of Folk Literature* গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই বিষয়ে যে যাহার ইচ্ছামত এক একটি প্রণালী গ্রহণ করিতেন; কিন্তু এখন সকলেই তাঁহার নীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী।

তথাপি এ'কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব কতক-গুলি স্থানীয় (local) সমস্যা আছে, তাহাও এই সম্পর্কে উপেক্ষিত হইতে পারে না। বাংলার সমাজে যে এক বিপুল সংখ্যক ব্রতকথা আছে, তাহাও লোক-কথার বিশিষ্ট বিভাগ। ইহার অভিপ্রায় দৈব নিগ্রহ ও অনুগ্রহ। ইহাকে Chance and Fate বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যায় সত্য; কিন্তু ইহা দ্বারাও ইহার পরিপূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অন্যান্য দেশে এই শ্রেণীর লোক-কথার সংখ্যা অধিক নহে; কারণ, যে সকল জাতি একান্ত দৈব নির্ভর, তাহাদের মধ্যে ব্যতীত Chance and Fate বিষয়ক কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে না। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর লোক-কথার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সুতরাং প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব অবস্থা অনুসারে লোক-কথার ক্ষুদ্রতর বিভাগগুলি পরিকল্পনা করিলেও আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিস্তৃততর গবেষণার ক্ষেত্রে অভিপ্রায় অনুযায়ী বিভাগই সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

পূর্বেই বলিয়াছি, এক একটি কাহিনীর বিভিন্ন অভিপ্রায় থাকিতে পারে; সুতরাং সূক্ষ্মভাবে অধ্যাপক স্টিথ টম্‌সনের প্রণালী অনুসরণ করিয়া গেলেও তাহাতেই যে এই বিষয়ে শেষ কথা বলা হয়, তাহা নহে। প্রত্যেক জাতিরই

সংস্কার অনুযায়ী এক একটি অভিপ্রায় গুরুত্ব লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং যখন আঞ্চলিক সংগ্রহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করিয়া লইলে সেই সমাজের পাঠকদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেবল মাত্র বৃহত্তর ক্ষেত্রে আলোচনার সময় এই বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতি অনুসরণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এই প্রসঙ্গে লোক-কথাগুলির শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে যে-নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহা কোন আন্তর্জাতিক নীতি নহে, বরং তাহার পরিবর্তে জাতির রস-সংস্কারের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ইহার নিজস্ব রীতি। এই প্রণালীটি অনুসরণ করিলে লোক-কথা বর্ণনায় অহেতুক পাণ্ডিত্য প্রকাশের পরিবর্তে ইহার রস-বিচার অব্যাহত থাকিতে পারে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই টম্‌সন-নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ের (motif) কথা যথাস্থানে উল্লেখিত থাকিবে।

একজন ইংরেজ লোক-সাহিত্য গবেষকও লিখিয়াছেন,…'a motif is at most only one element in a tale. More important than the motif itself is the emphasis it receives, the values which the actual telling gives to its details, the purpose it is made to serve. The motif is merely the material for an attitude and it is the attitude in the story that links it distinctively to a tribe.'

কোন লোক-কথা সামগ্রিক ভাবে বিচার করিতে গেলে কেবল মাত্র ইহার অভিপ্রায়টির দিকেই লক্ষ্য রাখিলে চলে না; কারণ, অভিপ্রায় বা motif ইহার একটি মাত্র বিষয়। প্রত্যেক জাতিই নিজের দিক হইতে ইহাদের এক একটি বিষয়ের উপর জোর দিয়া থাকে। প্রত্যেক লোক-কথাই এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করিয়া থাকে, এই উদ্দেশ্য সকল জাতির নিকট কখনও এক এবং অভিন্ন হইতে পারে না। সেই অনুযায়ীই প্রত্যেক জাতির মধ্যেই ইহাদের বর্ণনা দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির লোক-কথার স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করিবার সময় কেবল মাত্র ইহার মূল অভিপ্রায়টির সন্ধান না করিয়া যে সকল বিষয়ের প্রতি ইহা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহে, তাহাও সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিবার আবশ্যক হয়।

প্রথম অধ্যায়

অলৌকিক জন্মকথা

অনপত্যতা মানুষের জীবনের চরম অভিশাপ, রাজা মানব-সমাজেরই প্রতিনিধি, সামাজিক দায়িত্ব তাঁহার আরও অনেক বেশি, সুতরাং তাঁহার পক্ষে অনপত্যতার অভিশাপ তাঁহার এবং তাঁহার রাজ্যের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের অনিবার্য কারণ। সেইজন্য তাঁহার পক্ষে অপত্যহীনতা সমগ্র রাজ্যের পক্ষেই দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। অথচ ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায়, বহুপত্নীকতার দোষে, অসংযত বিলাসিতার মধ্যে গা ভাসাইয়া দিবার ফলে অনেক রাজাকেই সন্তান-হীনতার অভিশাপ সহ্য করিতে হয়। রাজা গোষ্ঠীজীবনের নায়ক ; সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যৎ সর্বনাশ, সমাজেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা আনিয়া দেয় বলিয়া সমগ্র সমাজ ইহার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিত। সেইজন্য রাজার পুত্রসন্তান লাভে যেমন সমগ্র সমাজের আনন্দ, তাঁহার অনপত্যতায় তেমনই সমগ্র সমাজের দুশ্চিন্তা। সমাজের এই মনোভাবটিই এক শ্রেণীর লোক-কথার ভিতর দিয়া অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

লোক-কথার অপুত্রক রাজা যে স্বাভাবিক উপায়ে পুত্রলাভ করিবে তাহা নহে। সন্ন্যাসী, ফকির কিংবা কোনও অলৌকিক চরিত্রের প্রদত্ত কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু (magic object) আহার করিয়া এক কিংবা একাধিক রাণী সন্তান-সম্ভবা হইবেন। তারপর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কোনও বস্তু আহার করিবার ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেও স্বাভাবিক চরিত্র লাভ করিতে পারিবে না। নানা দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া জীবনের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরিণামে সে কল্যাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে। পুত্রহীন রাজার প্রত্যেকটি কাহিনীর সাধারণ কাঠামো এই প্রকার হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি এবং বিস্তারের মধ্যে পার্থক্য আছে। রামায়ণের মধ্যে অপুত্রক রাজা দশরথের পুত্রলাভের যে বৃত্তান্তটি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যেও এই অভিপ্রায় বা motifটি কার্যকর হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, অপুত্রক রাজা দৈব উপায়ে যে পুত্র লাভ করে, তাহার জীবন যে নানা বিপর্যয় দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, রামায়ণ-কাহিনীতে তাহারও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে লোক-কথার অনুরূপ

পরিকল্পনাও রামায়ণ-কাহিনী দ্বারা পরবর্তী কালে যে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রামায়ণের কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহা এমনই নানা লৌকিক উপকরণে পরিপূর্ণ।

ভারতীয় বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-সাহিত্যে দেখা যায় যে, কোন অলৌকিক চরিত্র প্রদত্ত কোন ফল আহার করিয়া নিঃসন্তান রাণীরা অন্তঃস্বত্তা হইয়াছেন। 'কথা-সরিৎ-সাগরে' এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী রাণী বাসবদত্তাকে স্বপ্নে একটি ফল প্রদান করিয়াছিলেন, অচিরকাল মধ্যেই তিনি পুত্রসন্তান লাভ করেন। রাজা পরিত্যাগ সেনের দুই নিঃসন্তানা পত্নী দুর্গা কর্তৃক প্রদত্ত দৈব ফল আহার করিয়া সন্তানবতী হইয়াছিলেন। 'কথা-সরিৎ-সাগরে'ই উল্লেখিত আছে, শিব কর্তৃক প্রদত্ত ফল আহার করিয়া বিক্রমাদিত্যের জননী এত খ্যাতনামা পুত্র-সন্তানের জন্মদান করেন।

ভারতীয় আদিবাসী-সমাজেও এই ধারণা বর্তমান আছে। তবে তাহাতে প্রধানতঃ দেখা যায়, কেবল মাত্র সূর্য-রশ্মি দ্বারা অনেক কুমারী কন্যা সন্তানের জননী হইয়াছে। মহাভারতের কর্ণের জন্মকাহিনী ইহার অনুরূপ। বাংলার মঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, শিববীর্যে পদ্মপত্রে মনসার জন্ম হইয়াছে, জননীর গর্ভে তাহার জন্ম হয় নাই। দেবতা এবং অতি-মানব (superman)-এর জন্ম সাধারণতঃ এই ভাবেই হইয়া থাকে।

১

ডালিমকুমার

এক যে ছিল রাজা—তার দুই রাণী। বড় রাণীর নাম দুয়োরাণী আর, ছোটর নাম সুয়োরাণী। রাজার বিরাট রাজত্ব—ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতী-শালে হাতী ; ধনদৌলত কিছুরই অভাব নাই। রাজার রাজত্বে প্রজারা সুখেই দিন কাটাইত। কিন্তু. রাজার মনে সুখ নাই। তাঁহার দুই রাণীর কিন্তু একটিও ছেলেপুলে হয় নাই। তিনি যদি চোখ বুজেন, এতবড় রাজত্ব কাহার হাতে যাইবে —এই চিন্তায় রাত্রে রাজার চোখে ঘুম আসিত না। পুবদিকে সূর্য ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়—দিন যায়, বছর যায়—রাজার বয়স বাড়ে।

একদিন রাজপ্রাসাদের দুয়ারে এক ফকির আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। সোনার থালায় সরু চাল আর সব্জী সাজাইয়া সুয়োরাণী ভক্তিভরে ফকিরকে ভিক্ষা দিতে আসিলেন। কিন্তু ফকির সেইদিকে না তাকাইয়া রাণীর নিকট জানিতে চাহিল তাঁহার ছেলে-মেয়ে কয়টি। সুয়োরাণী মাথা নীচু করিয়া জানাইলেন, এখনও তাঁহার একটিও সন্তান হয় নাই। শুনিয়া ফকির বিরক্ত হইয়া কহিল, 'আঁটকুড়ো (অপুত্রক) স্ত্রীলোক অশুচি ; আঁটকুড়োর হাতের ভিক্ষে আমি নেই না'।—এই কথায় সুয়োরাণী কান্নায় ভাঙিয়া পড়িলেন। ফকিরের পা-দুইটি জড়াইয়া কহিলেন, 'প্রভু, দয়া করুন ; কি ক'রে আমি একটা ছেলে পাবো, দয়া ক'রে বলুন।' সুয়োরাণীর কান্না দেখিয়া ফকিরের দয়া হইল। ফকির তাহার ঝোলা হইতে একটা শিকড় বাহির করিয়া রাণীর হাতে দিয়া বলিল, 'এই শিকড়টার সঙ্গে ডালিমের ফুল শিলে বেটে কাল সকালে খেয়ে নেবেন ; তা'হলেই আপনার একটি ছেলে হবে। রূপে গুণে সে সকলকে মোহিত করে দেবে। তার নাম রাখবেন ডালিমকুমার। শত্রুরা তাকে যদি মারবার চেষ্টা করে, আপনি ভয় পাবেন না। তাঁর প্রাণ একটা হারের মধ্যে আছে। আপনাদের পুকুরের মধ্যে একটা বোয়াল মাছ আছে। সেটাকে কাট্‌লে, তার পেটের মধ্যে একটা সুন্দর কাঠের বাক্স দেখতে পাবেন। সেই বাক্সের মধ্যে লুকোনো আছে একটি সোনার হার। সেই হারটি যদি কেউ গলায় পরে, তখুনি ডালিম-কুমারের মৃত্যু হবে। এই গুপ্তকথা সাবধানে রাখবেন। আমি চল্‌লুম।' —এই বলিয়া ফকির যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুয়োরাণী ফকিরের কথা মত সেই শিকড় ডালিম ফুলের সঙ্গে পিষিয়া খাইলেন। যথাকালে তাঁহার একটি পুত্র হইল। ছেলের কি রূপ—যেন চাঁদের টুক্‌রা। ছেলের মুখ দেখিয়া রাজার আর আনন্দ ধরে না। যে যাহা চাহিল, তিনি বিচার না করিয়া বিলাইয়া দিতে লাগিলেন। রাজ্যে মহা ধূমধাম পড়িয়া গেল—প্রজারা আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। কিন্তু দুয়োরাণী হিংসায় জ্বলিয়া মরিতে লাগিলেন—রাজা আর তাঁহাকে পছন্দ করেন না।

দিনে দিনে ডালিমকুমার বাড়িতে লাগিল। পায়রা লইয়া খেলিতে সে খুব ভালোবাসিত। প্রায়ই তাহার পায়রা দুয়োরাণীর ঘরে উড়িয়া যাইত। প্রথম প্রথম রাণী ডালিমকে আদর করিয়া পায়রা ফিরাইয়া দিতেন। একদিন তিনি পায়রা আটকাইয়া রাখিলেন। ডালিমকুমার কান্নাকাটি করিতে লাগিল। তখন দুয়োরাণী বলিলেন যে, সে যদি তাহার মায়ের নিকট হইতে একটি সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, তবেই তিনি পায়রা ছাড়িয়া দিবেন। ডালিমকুমার তখনই রাজী হইল। দুয়োরাণী তাহাকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ডালিমকুমারের প্রাণ কোথায় গোপন করা আছে, তাহার মায়ের নিকট হইতে তাহা জানিয়া তাঁহাকে খবর দিতে হইবে। ডালিমকুমার ইহা শুনিয়া খুবই বিস্মিত হইল। কিন্তু সেই খবর দিতে প্রতিশ্রুত হইল। দুয়োরাণী পায়রা ছাড়িয়া দিলেন—তবে তাঁহার নাম জানাইতে বারবার বারণ করিয়া দিলেন। ডালিমকুমার পায়রা ফিরৎ পাইয়া আহ্লাদে চলিয়া গেল। মা'কে জিজ্ঞাসা করার কথা আর স্মরণ রহিল না। আর একদিন দুয়োরাণী আবার তাহার পায়রা ধরিলেন। ডালিম কিছুই বলিতে পারিল না। তবে এ'বার ঠিক জানিয়া আসিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

সুয়োরাণীর নিকট যাইয়া ডালিম জানিতে চাহিল, তাহার প্রাণ কোথায় লুকানো আছে। ডালিমের প্রশ্ন শুনিয়া সুয়োরাণী প্রথমে অবাক্ হইলেন—ডালিম এ-কথা কি করিয়া জানিল? তিনি পুত্রকে আদর করিয়া ওই কথা ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ডালিম কিছুতেই ছাড়িল না—ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল। বাধ্য হইয়া সুয়োরাণী বলিলেন, 'বাছা, তোমার প্রাণ হ'ল একটা সোনার হার।'

'মা, কোথায় আছে সেই হার?'—ডালিম জানিতে চাহিল।

সুয়োরাণী বলিলেন, আমাদের পুকুরে একটি বোয়াল মাছ আছে। তার পেটের মধ্যে সুন্দর একটি কাঠের বাক্স আছে। সেই বাক্সের মধ্যেই

সেই হারটি আছে। কিন্তু বাছা; এই কথা তুমি যেন কাউকে ব'লো না। চারিদিকে নানান্ শত্রু তোমার অনিষ্ট করতে চায়।'

ডালিম বলিল, 'না, মা; একথা আমি আর কাউকেই বলবো না।'

কিন্তু দুয়োরাণীকে তাহা বলিতেই হইল; যখন পরে একদিন ডালিমের পায়রা উড়িয়া দুয়োরাণীর ঘরে ঢুকিল, তিনি তখুনি তাহা ধরিয়া ফেলিলেন এবং ডালিমের কাছে সংবাদটি জানিতে চাহিলেন। মায়ের নিষেধ ডালিমের মনে পড়িল। কিন্তু আদরের পায়রাটি সে ছাড়িতে পারিল না। তাহা ছাড়া, দুয়োরাণীকে না জানাইবার কোন কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। সরল বিশ্বাসে সে সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিল। প্রতিটি কথা রাণী ডালিমের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন; পরে ডালিমকে আদর করিয়া পায়রাটি ছাড়িয়া দিলেন।

বোয়াল মাছটিকে পাইবার জন্য দুয়োরাণী এক ফন্দি বাহির করিলেন। তিনি কিছু শুকনো পাটকাঠি সংগ্রহ করিয়া বিছানার নীচে সাজাইয়া দিলেন। তাহার উপর ভাল করিয়া চাদর বিছাইলেন; শেষে তিনি নিজে তাহার উপর শুইলেন—পাটকাঠিগুলি মড়্‌মড়্ করিয়া উঠিল। তিনি এক দিকে এক একবার পাশ ফেরেন, আর মড়্‌মড়্ করিয়া শব্দ ওঠে, আর তিনি চীৎকার করিতে থাকেন। সকলে জানিল, দুয়োরাণীর হাড়-মড়্‌মড়ি ব্যায়রাম হইয়াছে।

সংবাদটি রাজার কানে উঠিল। তিনি তাঁহার সর্বাপেক্ষা দক্ষ চিকিৎসককে পাঠাইয়া দিলেন। দুয়োরাণী চিকিৎসককে অর্থ দিয়া বশ করিলেন। চিকিৎসক জানাইলেন যে, পুকুর হইতে বোয়াল মাছ ধরিতে হইবে এবং তাহার পেটের মধ্য হইতে একটু ওষুধ বাহির করিয়া রাণীর গায়ে মাখাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া, রাজা বোয়াল মাছ ধরিতে আদেশ দিলেন।

জেলে পুকুরে জাল দিয়া বোয়াল মাছটি ধরিল। আশ্চর্যের কথা—ডালিম পুকুরের কাছে সঙ্গীদের সহিত খেলা করিতেছিল; যেই মাছটি ধরা পড়িল, তৎক্ষণাৎ ডালিম অসুস্থ হইয়া পড়িল। মাছটিকে রাণীর নিকট লইয়া যাওয়া হইল; ডালিমকে তাহার মায়ের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। তাহার হঠাৎ অসুস্থতার কারণ কেহই খুঁজিয়া পাইল না। দুয়োরাণী মাছটিকে কাটাইলেন; আর ওদিকে ডালিমকুমার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। মাছটির পেটের ভিতর হইতে একটি সুন্দর বাক্স বাহির হইল। রাণী বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি সুন্দর সোনার হার রহিয়াছে, তৎক্ষণাৎ হারটি তুলিয়া নিজের গলায় পরিলেন—আর অন্য দিকে ডালিমকুমারের মৃত্যু হইল। চারিদিকে

হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা পাগলের মত কাঁদিতে লাগিলেন। সুয়োরাণী শোকে-দুঃখে অন্নজল ত্যাগ করিলেন।

ডালিমকুমারকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, সে নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। তাহা দেখিয়া রাজা মৃতদেহ পোড়াইতে চাহিলেন না। গ্রামের প্রান্তে একটি অতি সুন্দর বাগানবাড়ী প্রস্তুত করাইয়া মৃতদেহটি সেখানে রাখিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন প্রচুর খাদ্য এবং জীবন্ত মানুষের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার। সেখানে প্রবেশ করিবার অধিকার কাহাকেও দেওয়া হইল না। কেবলমাত্র ডালিমকুমারের অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্ত্রীর পুত্র প্রত্যহ সকালে প্রিয়বন্ধুর মৃতদেহ দেখিতে যাইত।

পুত্রের মৃত্যুর পর সুয়োরাণী একাকী জীবন যাপন করিতেন। সমস্ত সাধ-আহ্লাদ, আনন্দ পরিত্যাগ করিলেন। রাণীর বেশভূষা আর তিনি স্পর্শ করেন নাই। সুয়োরাণীর এই বৈরাগ্য হওয়ায় রাজা এখন দুয়োরাণীর কাছে যাইতেন, দুয়োরাণী সকল সময় সেই সোনার হারটি গলায় পরিয়া থাকিতেন। কেবলমাত্র রাজা যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ তাহা খুলিয়া রাখিতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যখন হারটি খোলা থাকিত, ডালিমকুমার ওদিকে জীবন্ত হইয়া উঠিতেন এবং মানুষের মতই আহার-বিহার করিতেন। রাত্রেই রাজা দুয়োরাণীর নিকট যাইতেন এবং হারটি সারারাত খোলা থাকিত। ডালিমকুমারও সারারাত জীবন্ত হইয়া বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আবার সকালে যখন দুয়োরাণী তাহা গলায় পরিতেন, ডালিমকুমারও মড়ার মত পড়িয়া থাকিতেন।

ইহাতে তাহার দেহটি সজীব ছিল। মন্ত্রীপুত্র সকালে আসিয়া দেখিতেন এবং অবাক হইতেন যে খাদ্যবস্তু কে যেন খাইয়া যাইত। মন্ত্রীপুত্র আসিতেন দিনে; তিনি স্থির করিলেন রাত্রে কে আসিয়া খাদ্য খাইয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে। একদিন রাত্রে আড়াল হইতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার বন্ধু জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য গ্রহণ করিয়া চলাফেরা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীপুত্রের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গোপনীয় স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বন্ধুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুই বন্ধুতে অনেক কাঁদিলেন, অনেক আনন্দ করিলেন। তখন হইতে দুই বন্ধু প্রতিরাত্রে মিলিত হইতেন এবং পরামর্শ করিতেন কি করিয়া দুয়োরাণীর কবল হইতে হারটি উদ্ধার করা যায়। কোন পথই তাঁহারা দেখিতে পান না। এইভাবেই কয়েকটা বছর কাটিয়া গেল।

এই কাহিনীর কয়েক বছর আগের কথা, বিধাতা-পুরুষের ভগিনীর একটি মেয়ে হয়। মেয়েটির জন্মের ষষ্ঠদিনে বিধাতা-পুরুষ মেয়েটির কপালে তাহার ভবিষ্যৎ লিখিয়া দিলেন। ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দাদা, তুমি আমার মেয়ের কি ভবিষ্যৎ লিখে দিলে?'—বিধাতা-পুরুষ বলিলেন, 'তোমার মেয়ের বিয়ে হবে একজন মৃত স্বামীর সঙ্গে।' এই কথা শুনিয়া ভগিনীর দুঃখের সীমা রহিল না। কিন্তু তিনি জানিতেন, বিধাতা-পুরুষের লেখার কোন পরিবর্তন করা যাইবে না।

মেয়েটির যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, ততই যেন তাহার রূপ বাড়িতে লাগিল। তাহার বিবাহের বয়স হইলে তিনি অন্যদেশে পলাইয়া গেলেন। ভাগ্যের খেলায় একদিন রাত্রে সেই কন্যার সহিত সেই বাগানে ডালিমকুমারের সাক্ষাৎ হইল। মন্ত্রীপুত্রের সম্মুখে দু'জনের বিবাহ হইল।···বহুদিন গেল—ডালিমকুমারের দুইটি সন্তান জন্মিল। বহু পরামর্শের পর নাপিতানী সাজিয়া ডালিমের স্ত্রী দু'য়োরাণীর পায়ে আল্‌তা পরাইতে গেল। সেই হারটি রাণীর গলায় ছিল।

একদিন তাহার পুত্র সেই হারটি লইবার জন্য দারুণ কান্নাকাটি সুরু করিল। দুয়োরাণী আদর করিয়া শিশুর গলায় তাহা পরাইয়া দিলেন। ছেলেটি তাহা আর পরে ফিরাইয়া দিতে চাহিল না। রানী জানিতেন,বহুকাল পূর্বেই ডালিমের মৃত্যু হইয়াছে—তাই বিশেষ আপত্তি করিলেন না। ডালিমের স্ত্রী দ্রুত বাড়ী আসিয়া স্বামী ও মন্ত্রীপুত্রকে উহা দিল। ডালিম পুনরায় প্রাণ পাইল। রাজার কাছে সংবাদ গেল—ডালিমকুমার জীবিত আছেন এবং তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র রহিয়াছে। সারা রাজ্যে আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। ডালিমকুমার স্ত্রী-পুত্র লইয়া প্রাসাদে ফিরিল। সুয়োরাণী আবার আনন্দ করিলেন। দুয়োরাণীকে কাঁটাকুপের মধ্যে জীবন্ত কবর দেওয়া হইল। রাজার মৃত্যুর পর ডালিম রাজা হইয়া বহু বৎসর সুখে বাস করিলেন।

মন্তব্য

অলৌকিক উপায়ে রাজার পুত্রলাভ ব্যতীত এই রূপকথাটির আরও কয়েকটি অভিপ্রায় (motif) আছে। ইহাদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক হার (magic neck-lace, D 1073) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতের উপজাতির মধ্য হইতে ঐন্দ্রজালিক হারের একটি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে একটি

হারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গলায় ধারণ করিলেই ধারণকারী অদৃশ্য হইয়া যায়। (Verrier Elwin, *Myths of Middle India*, 1949 p. 465).

মানুষের আত্মা বাহিরের কোন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ইহাও ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। (External Soul E. 710). বোয়াল মাছের ভিতরে হারের মধ্যে যে ডালিমকুমারের আত্মা রক্ষিত আছে, তাহাকে ইংরেজিতে Life token (E 761) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এখানে বোয়াল মাছটি যেই ধরা পড়িল ডালিমকুমার সেই মুহূর্তে অসুস্থ হইয়া পড়িল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথিবী ব্যাপী লোক-কথার মধ্যে অনুরূপ অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এই বিষয়ে উল্লেখিত হইয়াছে,—'Another world-wide motif occuring in these and sometimes in other American Indian tales is the life token. When the hero sets out on adventures, he leaves some magic object behind him which indicates whether he is safe or not. It may be a plant that fades, or some liquids which boils when he is in danger. (Stith Thompson, *The Folktale*, 1946, p. 342-3).

তারপর মৃতের সঙ্গে বিবাহ ইহাও ইহার আরও একটি অভিপ্রায়; ষ্টীথ টম্‌সন ইহাকে Unusual Marriage (T 110)-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে যে কাঁকন মালা কাঞ্চন মালা নামে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, কিংবা দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত 'মৈমনসিংহ গীতিকা'তে যে 'কাজলরেখা' নামক রূপকথাটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদেরও অনুরূপ অভিপ্রায় দেখা যায়। আমাদের দেশে গঙ্গাযাত্রীর সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহ হইত, তাহাও মৃতের সঙ্গে বিবাহেরই তুল্য। সেই জন্য আমাদের দেশের লোক-সাহিত্যে এই শ্রেণীর কাহিনীর সংখ্যা এত অধিক শুনিতে পাওয়া যায়।

২

মধুমালা

এক যে ছিল রাজা। তাঁহার রাজ্যে ধনদৌলত, হীরে জহরৎ, মণি মাণিক্য আর ধরে না। রাজপুরীতে হাজারো দাসদাসী। রাজ্যে হাজারো লোকের আনাগোনা। লক্ষ্মী যেন উথলে উঠছে। এত ঐশ্বর্য, এত সম্পদ, তবু রাজার মনে সুখ নাই। যার দুয়ারে স্বর্গের দেবতা দুয়ারী, তার মনে সুখ নাই। রাজার সব আছে। কিন্তু রাজার কোনো ছেলেপুলে নেই। রাজ্যের সব আনন্দ একটি মাত্র অভাবে নিভে যেতে বসেছে।

রাজাকে সবাই ধিক্কার দিয়ে বলে আঁটকুড়ে। ঝাড়ুদার যে ঝাড়ুদার, সেও রাজার মুখ দেখলে মুখ লুকিয়ে নেয়। তার কাছে রাজা অনামুখো। রাজার মুখ তার কাছে অযাত্রা। ঝাড়ুদারের কথা রাজার কানে গেল। মনের দুঃখে রাজা কবাটে খিল দিলেন। এ মুখ তিনি কাউকে দেখাবেন না। রাজপুরীতে হাহাকার পড়ে গেল।

রাজ্যে রাজা থেকেও নেই। পানের বাটায় পান রইল পড়ে, সোনার গাড়ুতে জল ঝরলো না। রাজা দুয়ার খোলেন না। রাজ্যের পালন-পাট বিচার আচার সব বন্ধ হয়ে গেল। এমনি করে কাটলো সাত দিন সাত রাত। রাজার দুয়ারে উজীর নাজির পাত্রমিত্র সকলে জড়ো হলো। তবু রাজার সেই এক কথা, 'এ মুখ লোক-সমাজে আর দেখাবো না, এ দুঃখের প্রাণ আর রাখবো না।'

রাজার দুঃখে বিধাতাপুরুষ কেঁদে উঠলেন। তিনি দুয়ারী হয়ে দাঁড়ালেন রাজার সিংহ-দরজায়। তারপর সন্ন্যাসী সেজে জটাজুট পরে আশা প্রদীপ হাতে রাজার দুয়ারে এসে হেঁকে বললেন, 'রাজা, দণ্ডধর, দুঃখু করো না, এ দুঃখু তোমার খুব শীগগীর কেটে যাবে।'

এ কথা সবাই শুনলে। ঘরের ভিতরে রাজাও যেন স্বপ্ন দেখে উঠে বসলেন। শুনতে পেলেন, মধুর সুরে সন্ন্যাসী বলছেন, 'রাজা, দুঃখু করো না, তোমার দুঃখের রাত্তির এবার শেষ হবে, দুয়ার খুলে বেরিয়ে এস।' সন্ন্যাসী বললেন, 'জীয়াসপুকুরের পাড়ে, একটি সোনার গাছে, দুটি সোনার ফল ঝুলছে। সেখানে গিয়ে মাথা হেঁট করে প্রদীপখানি মাথায় রেখে আশার এক ঘায়ে ফল দু'টি পেড়ে আন।' রাজা সন্ন্যাসীর কথায় তাই করলেন। কিন্তু আশা

ফিরে এল, ফল দুটো পড়ল না। রাজা মনমরা হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'মনের ভুলে সব নষ্ট করেছো, যাক গে, এবার চোখ বন্ধ করে হাত দুটি পাত—একটি সোনার পাখী পাবে। তার নখ, পাখা, চঞ্চু কেটে ফেলে সপ্ত ব্যঞ্জনে তা আহার কর।' রাজা তাই করলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'দশমাস দশদিন বাদে তোমার রানীর সোনার কুমার হবে। তার রূপে চন্দ্রসূর্য হার মানবে। মদনের মত পুত্র তোমার রাজ্য আলো করবে।

সন্ন্যাসী বললেন, 'কিন্তু একটি সাবধান বাণী তোমাকে শুনতে হবে।' রাজপুত্তুরের জন্মের পর বারো বছর তার ঘরের দরজা খুলতে পাবে না। যদি খোলো রাজকুমার উদাসী হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

সন্ন্যাসী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাটরানী পাটেশ্বরী ধূপ দীপ মালা চন্দন চাঁপাফুল দিয়ে আপন পুরী সাজালেন। রাজা দানধ্যান করে রাণীর পুরে গেলেন। এমনি করে ছ'টি মাস কেটে গেল। রাজা শক্ত মজবুত করে পাতালে পাথরপুরী নির্মাণ করালেন। বড় বড় কারিকর, রূপলাল, সোনালাল, জয়বিজয় পাথর ভেঙে পাতালপুরী তৈরী করলো। সে পুরী দিনে রাতে সমান অন্ধকার। খাড়া পাহারায় রইল করাতী সেপাই, যাতে মাছিও তরোয়ালের ঘায়ে হাজার খান হয়ে যায়। রাজা সেই পুরীতে তিনটি প্রাণীর জন্যে বারো বছরের প্রয়োজনীয় জিনিস—তার চেয়েও অনেক বেশী—রেখে দিলেন।

দশমাস দশদিনের দিন এক দাই সঙ্গে নিয়ে রাণী সেই পুরীতে গেলেন। ঢোল মৃদঙ্গ বেজে উঠল।

সেইখানে আকাশের চাঁদ পৃথিবীর মাটিতে জন্ম নিল। পাতাল পুরীতে চাঁদ সুয্যির কাড়াকড়ি পড়ে গেল। লক্ষ হাজার কোটী ফুলের গন্ধে রাণী আর দাই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বার দুয়ারীও সেই গন্ধে অজ্ঞান হল। রাজার কাছে খবর গেল। পাত্র মিত্র ভাট, ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে রাজা ছেলে দেখে এলেন। সন্ন্যাসীর কথামত ছেলের নাম হল মদনকুমার। রাজার জন-জৌলুষ ফিরে এল। রাণী বাঁরো বছরের জন্যে কবাটে খিল দিলেন।

রাজার রাজ্যে আর সুখ ধরে না। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গাইয়ের দুধে গোয়ালের মাটি ভাসে, গোলাগঞ্জের শস্য উপ্‌চে পড়ে। মালঞ্চ ফুলে ভরে যায়, ভিখ ফকিরে ঘর বাঁধে, রাজার রাজভাণ্ডার হাটে মাঠে পথে ঘাটে ঠাঁই কুলোয় না। রাজা দিন গোনেন।

এক একটি করে বারো বছর কেটে যেতে আর তিনটি মাত্র দিন বাকী। মদনকুমার পাতাল পুরীতে বারো বেদ অষ্ট পাঠ সাঙ্গ করলেন। এবার মদন-কুমার মাকে বললেন, 'এত বয়স হল, চন্দ্র সূর্য দেখলাম না।' রাণীর মন ছেলের কথায় গললো। দাইকে পাঠালেন, রাজার কাছে। রাজাও অনেক তা না না করে মত দিলেন, 'তবে দুয়ার খুলে দাও।'

রাজপুত্তুরের অমন রূপ দেখে রাজ্যের লোক অবাক হল। এমনি করে বছরের পর বছর যায়। রাজপুত্তুরের সখ হল মৃগয়ায় যাবেন। বেরিয়ে পড়লেন, লোক লস্কর সঙ্গী সাথী নিয়ে। বিশেষ করে বন্ধু উজীর পুত্তুর সঙ্গে রইল। রাজা রাণী ছেলেকে বাধা দিলেন না।

রাজপুত্তুর আর উজীর পুত্তুর কত নদী বন পাহাড় পার হয়ে পাহাড় বনে তাঁবু ফেললেন। শিকার করতে এসে এখানে পাখীর টু শব্দ পাওয়া গেল না, হরিণ মরিণের ছায়াও না। উজীর পুত্তুর রাজপুত্তুরকে ফিরতে বললেন। রাজপুত্তুর বললেন, 'কিছুতেই না, এখানেই কানাৎ ফেল।' পাট বস্ত্রের চাঁদোয়া খাটিয়ে, হীরে মোতির ঝালর দিয়ে সোনার যুগল পালঙ্কে রাজপুত্তুর উজীর পুত্তুর নিদ্রা গেলেন!

নিশুতি রাত। সেই রাতে কালপরী আর নিদ্রাপরী দু'ইটি বোন আকাশ উজল করে ইন্দ্রপুরীর দিকে যাচ্ছিলেন। আকাশে তখন তারা মিটিমিটি করে জলছে, বাতাস ধীরে বইছে। কালপরী পাহাড় বনের উপর দিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'অন্যদিন তো এ পথে যাই, আজ কেন এখানে নিবু নিবু তারা, বাতাস ধীরে বয়, চাঁদের মুখে কালি কেন?' হঠাৎ চমকে উঠে কালপরী বললে, 'দেখ দেখ, ময়দানের মাটিতে যেন হাজার চাঁদের ফুল ফুটেছে। নিশ্চয় এ কোন স্বর্গের দেবতা, চল বোন দেখিগে।' নিদ্রা বললে, 'রাত ভোর হল আর দেখে কাজ নেই।' কালপরী শুনলে না। দেখতে নেমে এল! দেখে নিদ্রাপরী বললে, 'এ দেবতা নয়, রাজপুত্তুর, মানুষের এত রূপ।' দুজনে চুপটি করে রাজ-পুত্তুরের পালঙ্কের ধারে এসে দাঁড়ালেন। দু'জনে আবার কথা হল, এ রূপের তুলনা নেই, তবে এর জন্যেই যেন তাম্বুল রাজকন্যা মধুমালাকে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রের মাঝখানটিতে তাম্বুল রাজা বিরাট পুরী নির্মাণ ক'রে সেইখানে কন্যা মধুমালাকে রেখেছেন। তাই শুনে কালপরী বললে, 'আমার এই রাজপুত্তুর, আর তোমার মধুমালা—এ দুজনকে আমি মিলিয়ে দেব। তুমি পালঙ্ক ধর।' দুজনে পালঙ্ক ধরে মধুমালার দেশে নিয়ে গেল।

আকাশ পাড়ি দিয়ে রাত এক প্রহর থাকতে কালপরী আর নিদ্রাপরী মধুমালার দেশে পৌঁছালো। তারপর মধুমালার ঘরে তার পালঙ্কের ডাইনে রাজকুমারের পালঙ্ক নামাল, দু'জনকে দেখে মনে হল, পূর্ণিমার চাঁদ, আর প্রভাতের রবি। কালপরী বললে; 'এদের দু'জনকে এবার জাগিয়ে দে, এরা কি করে দেখি।' এই বলে ফুল পাখার বাতাস দিয়ে এরা সরে গেল। নিদ্রাপরী বলল, 'এ তুই কি করলি, এরা যে যাকে দেখবে, সে তার জন্য উদাসী হবে।'

প্রথম জাগলেন মধুমালা। জেগে উঠে দেখলেন, মদনকুমারকে। দেখতে দেখতে অবাক হলেন, স্বপ্ন না সত্যি, দেবতা না অন্য কেউ। শিয়রে পানের বাটায় ছিল সাতফলা ছুরি। সেই ছুরি মধুমালা রাজপুত্তুরের বুকের উপর রাখলেন। যদি দেব দেবতা হয় জাগবে। দৈত্য দানা হলে ছুরির মুখে রক্ত ছুটবে। ছুরি রাখতে রাখতে মদনের চেতনা হল। রাজকন্যার এলো কেশ, মেঘডম্বুর শাড়ী আর চন্দন রাঙা চাদর দেখে তাঁর মনে হল পূর্ণিমার চাঁদ এর কাছে হার মানে। তারপর দুজনে দুজনকে প্রাণভরে দেখলেন। পরিচয় জানলেন পরস্পরের। আংটি বদল হল। আবার রাত না ভোর হতেই দুইবোন কালপরী আর নিদ্রাপরী মদনের পালঙ্ক পাহাড় বনের কানাতে নিয়ে এলেন। কিন্তু যাবার সময় এঁরা দুজনের পালঙ্ক বদল করে দিলেন।

মদন জেগে উঠে দেখলেন, মধুমালা নেই; কাঁদতে লাগলেন। খালি বলেন, 'হায়, মধুমালা।' উজীর পুত্তুর কত বোঝালেন, বললেন, 'দেশে চল।'

রাজপুরীতে হাহাকার পড়ে গেল। মদন খায় না দায় না, কেবল মুখে শুধু মধুমালা। রাজাকে ব'লে চোদ্দ ডিঙা সাজিয়ে কুমার মধুমালার দেশে যাত্রা করলেন। রাজা প্রমাদ গুণলেন, আঁটকুড়ে নাম যদি বা ঘুচল, এ আবার কোন সর্বনাশ হল।

চোদ্দ ডিঙা ভেসে চলে। এমন সময় উঠল ঝড়। লোক লস্কর সব গেল। মদনকুমার ঢেউয়ের জলে প'ড়ে আছাড় পিছাড় খেতে লাগলেন। তের রাত্তির পরে সমুদ্রের জলে বান ডাকলো। মদনকুমার সমুদ্রের চড়ায় গিয়ে লাগলেন। রাখালরা নদীর তীরে গরু চরাচ্ছিল। তারা মদনকুমারকে দেখে বিস্মিত হল; ভাবল, হয় রাজার বেটা, না হয় সদাগর। তারা ভাবল, এ আমাদের রাজকন্যার বর। রাজা চম্পমান সেই দেশের রাজা। রাজকন্যা চম্পমালার সঙ্গে মদন-কুমারের বিয়ে হল। রাজকন্যাকে মধুমালার কথা জিজ্ঞেস করাতে সে রাজ-

পুত্তুরকে বললে, 'সাত নদীর কিনারে পঞ্চকলা তার খবর জানে।' সেখান থেকে মদনকুমার পঞ্চকলার কাছে গেল। পঞ্চকলার সঙ্গে মদনকুমারের বিয়ে হল। পঞ্চকলা বললেন, 'চন্দ্রকলা তার খবর জানে।' চন্দ্রকলার দেশে গিয়ে মদনকুমার চন্দ্রকলাকে বিয়ে করলেন। চন্দ্রকলাকে মদনকুমার মনের কথা জানালেন। তিনি বললেন, স্বর্ণমন্দিরের চুড়োয় যে ময়ূর আছে, সেটি নিয়ে তুমি যাও মধুমালার দেশে।

এদিকে মধুমালার আহার নেই, নিদ্রা নেই ; মুখে শুধু কুমার আর কুমার। রাজা মেয়ের কান্না দেখে দেশে দেশে লিখন দিলেন। এবার এসে গেলেন মদন কুমার—দুজনের মিলন হল। রাজা রানীর আনন্দ ধরে না। সব কিছু উজাড় করে দিলেন মেয়ে-জামাইকে। মধুমালা আর মদনকুমার দেশে ফিরলেন পথে চন্দ্রকলা, পঞ্চকলা আর চম্পকলাকে নিয়ে এলেন।

রাজ্যে ধুমধাম পড়ে গেল। বাদ্যি বাজনা বাজল, আলো জ্বলল, লোকজনে গমগম করল রাজপুরী। রাজা দণ্ডধর চার যুগে অমর হয়ে পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতকুড় নিয়ে রাজত্ব করলেন।

আর সেই কালপরী আর নিদ্রাপরী ইন্দ্রের সভায় লাথি মেরে মদনের রাজ-সভায় শ্বেত চামর হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

মন্তব্য

এখানে দেখা যায়, ফল-ফুলের পরিবর্তে একটি সোনার পাখীর মাংস খাইয়া রানী সন্তান-সম্ভবা হইয়াছেন। ষ্টীথ টমসনের বিভাগ অনুযায়ী ইহা Magic remedies for barrenness (591·1) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষীর মাংস আহার করিয়া রাণী যে পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন, তাঁহার চরিত্রের মধ্যেও আকাশবিহারী পক্ষীচরিত্রের গুণ সংক্রামিত হইয়াছিল। প্রণয়িণীর সন্ধানে তিনি এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে ময়ূরে চড়িয়া উড়িয়া গিয়াছেন।

এই রূপকথার বিষয় শাশ্বত প্রেম। রূপকথাকে যাঁহারা 'শিশুসাহিত্য' বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন, ইহা যথার্থ শিশুর বোধগম্য হইতে পারে না।

বাংলা দেশের তথা ভারতীয় লোক-কথায় পরীর গল্প নাই। ইহাতে যে পরীর উল্লেখ আছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইহার উপর আরব্য অথবা পারস্য রূপকথার প্রভাব আছে। মুসলমান ধর্মের সূত্রেই ইহা বাংলাদেশে আসিয়াছে।

৩

পুষ্পমালা

এক ছিল নিঃসন্তান রাজা, আর এক আঁটকুড়ে কোটাল। রাজার মনে সুখ নেই, কোটালের মনেও না। এমনি করে দিন যায়। কাউকে কিছু না বলে রানী গেলেন পুত্র-সরোবরে নাইতে। গিয়ে দেখেন অপর পারে কোটালনীও এসেছেন। রানী কোটালনীকে জিজ্ঞেস করেন, বাসনা পূর্ণ হলে কার ঘরে বাজনা বাজবে। কোটালনী বলেন, 'আমরা হলাম ক্ষুদ্র মানুষ, রানীদিদির ঘরেই বাজনা বাজবে।' রানী ভারী খুসী হলেন। আনন্দে তিনি বললেন, 'না দিদি, তা নয়, আয় আমরা সত্যি করি। সত্যি এই—যদি আমার ঘরে ছেলে হয়, তোর ঘরে মেয়ে হয়, বিয়ে দেব, আমার ঘরে ছেলে হয়, তোর ঘরে ছেলে হয়, বন্ধু পাতিয়ে দিব ; আর যদি আমার ঘরে মেয়ে হয়, তোর ঘরে ছেলে হয়, তা হলেও বিয়ে দেব।' কোটালনী ভয় পেলো, বললো, 'এমন সত্যি করতে আমি পারব না।' রানী নাছোড়বান্দা, কোটালনী রানীর কথায় রাজী হল। দুজনে স্নান সেরে দুঘাটের দুই পদ্ম ফুল ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিলেন। ঢেউএ দুই পদ্ম এক হল। দু'জনে উলু দিলেন। তারপর দু'জনে যে যার বাড়ী গেলেন। একথা কেউ জানল না।

রাজা গেছেন মৃগয়ায়। কোটাল গেছেন তাঁর সঙ্গে। সেখানে দুজনে বটগাছের তলায় বসে আছেন, রাজা তীরের ফলা দিয়ে বটপাতায় লিখলেন। 'কোটালের ছেলে যদি হয়, আর আমার মেয়ে হয়, বিয়ে দেব ; কোটালের মেয়ে হয়, আমার ছেলে হয়, কোটালের গর্দান নেব, কোটালের ছেলে আর আমার ছেলে হলে কোটালকে আদ্দেক রাজত্ব দেব।' বটের পাতা কোটালের হাতে দিয়ে রাজা ঘোড়া ছোটালেন।

দিন গেল। রানীর হলো ক্ষীরের পুতুলের মত কন্যা, আর কোটালের হলো সোনার ছেলে। রাজা মুখ নীচু করে রাজসভায় গেলেন। বাদ্যি বাজনা বাজলো কোটালের ঘরে।

কোটালের ঘরে কোটালের ছেলে যেন চন্দনের পুতুল, রাজার ঘরে রাজকন্যা যেন পুষ্প প্রতিমা।

কোটালপুত্রের নাম চন্দন, রাজকন্যার নাম পুষ্পমালা। এদের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন গুরুমশায়ের পাঠশালে এরা পড়তে গেল। রাজকন্যা সেখানে

বসেন সিংহাসনে, কোটালপুত্র বসেন মাটিতে। বার বছর পরে একদিন লিখতে লিখতে রাজকন্যার হাতের কলম খসে কোটালপুত্রের আসনের কাছে পড়ে গেল। কোটালপুত্র তুলে দিলেন কলম। এখন থেকে রাজকন্যার কলম রোজ পড়ে যায়, কোটালপুত্র তুলে দেন। আটদিন পর যখন আবার কলম পড়লো এবার আর কলম তুললেন না কোটালপুত্র। উল্টে বললেন, 'কলম তুলতে পারি, যদি মালা বদল হয়।' শুনে রাজকন্যা শিউরে উঠলেন। বললেন, 'আমার বাপের রাজ্যে বাস করে এমন কথা বল।' কোটালপুত্র বললেন, 'আমাদের জন্যেই তো তোমার বাপের রাজ্য টিকে আছে।' কন্যা বললেন, 'তাইতো।' এমনি করে দুজনে দুজনের মনের কাছে আরো এসে গেলেন।

একদিন রাণী দেখেন পুত্র-সরোবরের কোলে কোটালনী দাঁড়িয়ে কাঁদছে, আর বলছে—এই সরোবরে যে সত্য তাঁরা করেছিলেন, কেন তা মিথ্যা হয়ে গেল। রানী কোটালনীকে তিরস্কার করলেন। রাজকন্যা সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোটালমাসী কিসের সত্য করেছিলেন।' রাণী তাড়াতাড়ি মেয়েকে আর দাসী বাঁদী নিয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

এদিকে কোটালপুত্র কোটালের কাছে সে বটপাতাটি দেখে সব জানতে পেয়ে হাতে তলোয়ার আর বটপাতা নিয়ে রাজার দরবারে হাজির। রাজাকে সব কথা বলাতে রাজা উত্তর দিলেন, 'তোমার যোগ্যতা দেখাও।' কোটালপুত্র রাজসভা ছেড়ে শন্‌শন সরোবরের জলে গিয়ে নামলেন। তিনটি পদ্মপাতা তিনটি সত্যের বটপাতা, আর তলোয়ার নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলেন। রাজকন্যা নাইতে এসে দেখলেন, পায়ের কাছে পদ্মের পাতে এক তরোয়াল তিন পদ্ম। রাজকন্যা ভাবলেন, মা'র প্রথম সন্তান মা পুত্র-সরোবরে সঁপে দিয়েছেন। মার সত্য যেন পূর্ণ হয় ; ব'লে তলোয়ার তুলে নিলেন। অমনি চন্দন বটপাতা হাতে হাত ধরল। রাজকন্যা মূর্ছা খেয়ে পড়ে গেলেন। সত্যের বটপাতা রাজকন্যার আঁচলে বেঁধে দিয়ে কোটালপুত্র বাতাসে মিশে গেল। রাজকন্যার দ্বারে পাইক পাহারা দুয়ারী দাসী, রানী রাজা সব ছুটে এলেন।

রাজকন্যা সব জানতে পেরে মনে মনে ঠিক করল, কোটালের ঘরই তাহার ঘর। গুরু মশাইকে তারা সব বললো। গুরু বললেন, 'সত্য রাখলে স্বরগ, না রাখলে পাতাল।' তাই রাজার মান, রাজ্যের মান রাখতে তারা দুই পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে রাজ্যের বাইরে চলে গেল।

দু দিন তিন দিন চার দিন ঘোড়া ছুটেছে। মাঠ আর শেষ হয় না। তারপর মাঠের পর এক গ্রাম মিললো। একটি বাড়ী, সেখানে এক বুড়ী থাকে। সে আসলে সাত ডাকাতের মা। এদের গায়ে হীরে জহরৎ দেখে ভাবতে লাগলো, কতক্ষণে তার ছেলেরা এসে সব লুটপাট করে নেবে। যাই হোক চন্দন আর পুষ্প সিপাইয়ের ছদ্মবেশে রইল। পুষ্প রাঁধতে গেল। চন্দন নাইতে গিয়ে বুঝলো, তাঁরা ডাকাতের হাতে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি খিচুড়ী রান্না করে পক্ষীরাজে তাঁরা চাবুক দিলেন। বুড়ী এসে দেখে লোক নেই। বুড়ি আছাড়ি পিছাড়ি খেতে থাকে। এর আগে বুড়ী শ্বেত সরষে প'ড়ে, দুই পুঁটলী করে দুই পক্ষীরাজের পিছন পায়ে বেঁধে, ছুঁচের ফুটো করে রেখেছিল। সিপাইরা তা জানতো না। সিপাইরা ছোটে আর পথে পথে সরষে পড়ে, আর শ্বেতফুল হয়ে যায়। এমন সময় সাত ডাকাত বাড়ী এসেই তাদের অনুসরণ করলে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি তাদের ডাকাতেরা ধরে ফেললে। চন্দনের তলোয়ারের ঘায়ে সাত ডাকাত কাটা পড়লো। কিন্তু কাটা মুণ্ডুর মাঝে লুকিয়ে ছিল এক ডাকাত। সে দয়া ভিক্ষে করে এদের সঙ্গে সঙ্গে চললো, বললো, 'আমায় প্রাণে মেরো না, আমি ঘোড়ার ঘেসেড়া হবো।' পুষ্পর প্রাণ গললো। ডাকাত তাদের সঙ্গে চললো। অসতর্ক মুহূর্তে চন্দনের মাথা কেটে নিল ডাকাত। আর পুষ্পকে ঘোড়ায় করে নিয়ে চললো। পুষ্প কৌশলে ডাকাতের মাথা কেটে নিল।

পুষ্পমালার দুঃখের শেষ নেই। বনের মধ্যে তাঁর চোখের জলে নদী হয়ে গেল। এমন সময় হর-পার্বতী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পুষ্পের দুঃখ দেখে পার্বতী শিবকে অনুরোধ করলেন, চন্দনের প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে। চন্দন বেঁচে উঠলেন। পুষ্পমালা আর চন্দন আবার চলতে লাগলেন।

নিশি প্রভাতে কন্যা আর কুমার এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর এক রাজ্যে গিয়ে পড়লেন। সেখানে নদীর তীরে বাগান। ফুলে ফুলে ভর্তি। চন্দন পুষ্পের কোলে মাথা রেখে ঘুমুতে লাগলেন। সেই সময় ফুলের সাজি আর ফুলের মালা নিয়ে মালি আর মালিনী বাগানে এসেছে। কন্যা আর কুমারের ওপর মালিনীর চোখ পড়ল। মালিনী এক যাদুকরী। মালিনীর যাদুতে মানুষ ছাগল ভেড়া হ'য়ে যায়। পুষ্পের কিছু হল না। মালিনীর যাদুতে চন্দন ছাগল হয়ে মালিনীর পিছু নিলেন।

পুষ্প কাঁদেন। তারপর চোখের জলে চোক মুছে দুই পক্ষীরাজ হাতে ধরে রাজপুরীর দিকে গেলেন। রাজা সিপাইকে (পুষ্পকে) আট দুয়ারে অষ্ট প্রহর পাহারা দিতে বললেন। সেই রাজ্যে এক শঙ্খিনী অজগর ছিল। তার শঙ্খের ডাকে সমস্ত রাজ্য মূর্ছা যায়। রাজা বললেন, 'এই শঙ্খিনীকে মারতে হবে।' দু'তিন দিন কেটে গেল, রাজাকে বলে অন্য উপায় বের করলেন কন্যা। এক সরোবরে জলের তিয়াসে যখন শঙ্খিনী এল, তখন শান তলোয়ার শঙ্খিনীর ফণাচক্রে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু কন্যা দেখেন অর্ধেক সাপ, অর্ধেক সেই মালিনী। মালিনী শাপ থেকে মুক্তি পেলো। এই মালিনী আর কেউ নয়, পুষ্পমালার মা; সেই রাণী যিনি তিন সত্যি ভেঙেছিলেন, সাপ হয়ে রাজ্য খাচ্ছেন, আজ তাঁর মুক্তি হল। ফণা শঙ্খ রাজাকে দেখাতে বলে মালিনী সেখানে পড়ে গেল, তখন এক বনফুলের গাছ সৃষ্টি হল। রাজা তো ভারী খুশী, কন্যাকে অর্ধেক রাজত্ব দিতে চাইলেন। কন্যাকে দেখে রাজা বিস্মিত হলেন। তারপর কন্যা রাজাকে বললেন, 'মালীর কাছে এক ছাগল আছে, হাজার পাঁচেক ছাগলের হাড় আছে, তা পেলেই সব বলবো।' মালী বললো, 'সব মিথ্যে কথা।' পাইক বেয়ারারা ছুটল, কার কথা মিথ্যা জানবার জন্যে। কন্যার কথা সত্যি হল। কন্যা সব কাহিনী বললো। মালী যে সেই পূর্বের সত্য ভঙ্গকারী রাজা, তাও প্রমাণ হল। মালী কন্যার কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর সেই ছাগল অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে চন্দন বেরিয়ে এল। চন্দন আর পুষ্পমালার বিয়ে হল। কিন্তু এক শর্তে দুজনে দুখানি খড়্গ নিলেন। যদি কন্যার খড়্গকে কুমার কাটাতে পারে, তবে কন্যা কুমারের হবে। কুমারের জয় হল। চন্দন, পুষ্পমালা আর রাজা রাণী শাপ থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজ্যে ধূমধাম পড়ে গেল। যার যার সত্য পূর্ণ হল। রাজা, কোটাল, রাণী, কোটালনী পুষ্প চন্দনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে, এখনও পুত্র-সরোবরের জল মানুষ কলসে কলসে খায়।

মন্তব্য

এই রূপকথাটি অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'সোনার তরী' কাব্য গ্রন্থের 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটি লিখিয়াছেন। তবে তাহাতে কোটালের পুত্রকে রাজার ছেলে করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে

কাহিনীর প্রথমাংশ এবং শেষাংশও বর্জিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাঠশালায় ইহাদের আচরণ এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

উপরে ব'সে পড়ে রাজার ছেলে
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কী ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে,
পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে
আবার পড়ে যায় খ'সে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।

এই রূপকথাটির মধ্যে যে অভিপ্রায় (motif) গুলি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক (magical) শক্তিরই প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ পুত্র-সরোবরের কথাই ধরা যাউক। ঐন্দ্রজালিক শক্তি-সম্পন্ন জলবিন্দুর মধ্যে সন্তান উৎপাদনকারী গুণ আছে বলিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন আদিম জাতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে। বাংলা দেশের রাঢ় অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক পূজার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তাহাতে দেখা যায়, ধর্মরাজ ঠাকুরের শিলামূর্তিকে যে পুকুরে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান হয়, বন্ধ্যা নারীগণ পুত্র কামনায় তাহার জলবিন্দু মস্তকে ধারণ করে। তাহাতেই তাহারা সন্তানবতী হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। (এই সম্পর্কে মৎপ্রণীত 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' চতুর্থ সংস্করণ, ধর্মপূজার ইতিহাস বিষয়ক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)। ভারতীয় আদিমজাতির লোক-কথার মধ্যেও শুনিতে পাওয়া যায়, কোন তৃষ্ণার্ত কুমারী অরণ্য মধ্যে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের উপর সঞ্চিত জল পান করিয়া গর্ভবতী হইয়াছে। (Verrier Elwin, *Folk-tales of Mahakoshal*, 1944, p. 361।) এই জলের মধ্যে সূর্যতেজ সঞ্চারিত হওয়াতে ইহাতে পুত্রসন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা দান করিয়াছিল। জলের ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাস হইতেই এই শ্রেণীর কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছে।

তারপর এই কাহিনীতে যে মালিনী চরিত্রটি আছে, তাহাকে যাদুকরী (magician) বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার মধ্য

দিয়াই তাহার আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে। মালিনীর যাদুক্রিয়ার ফলে চন্দন ছাগলে পরিণত হইল। এই ভাবে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে রূপ-পরিবর্তনকে স্টীথ টম্‌সন Transformation (DO-D699) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

এই রূপ-পরিবর্তন নানা প্রকার হইতে পারে; যেমন, মানুষ হইতে পশুতে পরিবর্তন, মানুষ হইতে কোন জড় বস্তুতে পরিবর্তন,—রামায়ণোক্ত অহল্যার পাষাণে পরিবর্তন ইহারই অন্তর্ভুক্ত—পশু হইতে মানুষে পরিবর্তন,—এক প্রকার পশু হইতে অন্য প্রকার পশুতে পরিবর্তন, পশু হইতে জড় পদার্থে পরিবর্তন, জড় পদার্থ হইতে পশুতে পরিবর্তন, এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে পরিবর্তন, একই বস্তুর বিভিন্ন রূপে পরিবর্তন ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটিই ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

শঙ্খিনীকে বধ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, ইহা সাপ নয়, বরং অর্ধেক সাপ ও অর্ধেক মালিনী। ইহাকে বাংলায় নাগ-কন্যা বলে। ইংরাজীতে ইহারই নাম Serpent Damsel. ইহাও লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় (F 582.1)। ভারতীয় লোক-কথায় ইহার বহু বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই সকল ঐন্দ্রজালিক অভিপ্রায় ব্যতীতও এই রূপকথাটির আরও কয়েকটি অভিপ্রায় (motif) আছে; তাহারা যে নিতান্ত গৌণ, তাহা বলা যায় না। তবে তাহা প্রধানতঃ নীতিমূলক।

প্রথমতঃ তিন সত্য ভঙ্গ করিবার পাপ ও তাহার পরিণামের কথা এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজা সত্যভঙ্গের অপরাধে মালী হইলেন, রাণীও সত্যভঙ্গের অপরাধে শঙ্খিনী সাপ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং সত্যভঙ্গ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা ইহাতে একটু প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ইহা নীতিমূলক। তারপর সাত ডাকাত, ডাকাতের মা বুড়ী ইত্যাদির পরিকল্পনাও লোক-কথার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে।

৪

মালঞ্চমালা

এক রাজা। রাজা নিঃসন্তান। কত সাধু সন্ন্যাসী, কত জ্যোতিষী রাজ্যে এলেন গেলেন। কিছুতেই কিছু হ'ল না। তারপর রাজা যাগযজ্ঞ করলেন, আদেশ হল, তিন দিন তিন রাত্তির উপোস করে চার দিনের দিন মালঞ্চের পাশে আমগাছে সোনার রঙের দু'টি আম ফলবে, তাদের বাঁয়েরটি খাবেন রাণী, ডাইনেরটি খাবেন রাজা। রাজার পাইক বরকন্দাজ, লোক লস্কর কেউ পারলো না আম দুটি পাড়তে। কোটাল সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফল দু'টি পেড়ে আনলো। কিন্তু রাজা রানী ফল দু'টি উল্টোভাবে খেলেন—ডাইনেরটি খেলেন রানী, বাঁয়েরটি খেলেন রাজা। তারপর ঘর আলো করে রাজপুত্তুর জন্ম নিলেন। ষষ্ঠীর রাতে ধারা তারা বিধাতারা কপালের লিখন লিখে দিয়ে যাবেন। দাই মালিনী আর রানী শিশু-সন্তানকে নিয়ে শুয়ে আছেন। ধারা তারা বিধাতারা এসে রাজপুত্তুরের আয়ু মাত্র বারো দিন বলাবলি করতে লাগলেন। মালিনী জেগে উঠে বিধাতার পা জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'রাজ-পুত্তুরের কপালে কি লিখলে ?' বিধাতা কিছু বলতে চান না ; কিন্তু মালিনীর অনুরোধ উপরোধ কান্নাতে বলে দিলেন। শুনে রাজা রানী রাজ্যশুদ্ধ লোক সবাই মূর্ছা গেলেন।

এক ব্রাহ্মণ সেই রাজ্যে এসে বলে গেলেন যে রাজপুত্রের আয়ু বাড়বে যদি বারো বছরের কন্যার সঙ্গে বিয়ে হয়। চলে যাবার সময় ব্রাহ্মণ একটি হীরে ফেলে দিয়ে গেলেন কোটালের বাড়ীতে। বারো বছরের রাজকন্যা কোথাও মিলল না। অবশেষে কোটালের কন্যা মালঞ্চমালার সঙ্গে শিশু রাজপুত্তুরের বিয়ে হল। যেমন তেমন বিয়ে। বিয়ের কিছুদিন পরে রাজপুত্তুরের মৃত্যু হল। রাজ্য উড়ে পুড়ে গেল। রাজা কোটালকন্যা মালঞ্চমালাকে ডাইনী মনে করে চোখ উপড়ে, চুল কামিয়ে, হাত পা কেটে ছেড়ে দিলেন। মৃত শিশু-পতিকে নিয়ে তিনি বনে চলে গেলেন। যমদূত এলো, কালদূত এলো, শালদূত এলো কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারল না মালঞ্চমালার শিশু-স্বামীকে। এমন সময় এক ছদ্মবেশিনী নারী মালঞ্চের সই সেজে সেই বনে এল এবং মালঞ্চের স্বামীকে বাঁচিয়ে দিলে, মালঞ্চ আবার তার রূপ ফিরে পেলো।

বনপথে চলতে চলতে এক বাঘের সঙ্গে দেখা। বাঘ ভাবলে এই বাচ্চা ও মেয়েলোকটিকে খেতে হবে। মালঞ্চ বুঝিয়ে সব বলাতে বাঘের মনে দয়া হল। বাঘ তাদের বাড়ী নিয়ে এল, বাঘিনী দিল দুধ। বাঘ্-বাঘিনী হ'ল মালঞ্চের মামা-মামী। শিশু যখন পাঁচ বছরের হল, তখন মালঞ্চ তার লেখা পড়ার জন্য উদগ্রীব হল। তাই মামা-মামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালঞ্চ তার বালক স্বামীকে নিয়ে শহরের ধারে কাছে চলে গেল। বাঘ-বাঘিনী চোখের জলে তাদের বিদায় দিল। মালঞ্চ ও তাঁর বালক স্বামী এক মালিনীর কুটিরে আশ্রয় নিল। মালিনীর আদর যত্নে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। মালিনীর মালঞ্চ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল।

সেই দেশের রাজা ছিল দুধবর্ণ। তার সাত ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের নাম কাঞ্চী। তারা যে পাঠশালে পড়তো সেই পাঠশালে পড়তে লাগলো মালঞ্চের স্বামী চন্দ্রমাণিক। চন্দ্রমাণিক যে মালঞ্চের স্বামী, একথা চন্দ্রমাণিকও জানত না, মালিনীও জানত না। রাজকন্যা কাঞ্চী চন্দ্রমাণিকের রূপে গুণে আকৃষ্ট হল। কিন্তু বাদ সাধলো তার ভাইয়েরা। কেমন করে মালীর সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হবে! তাই তারা নানা ভাবে নাজেহাল করতে লাগল চন্দ্রমাণিককে। চন্দ্রমাণিক মালঞ্চমালার সাহায্যে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অবশেষে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে গিয়ে বন্দী হলেন। মালঞ্চ বাঘ-মামার সাহায্যে বন্দীশালার শিকল কেটে তাকে মুক্ত করলেন। মালিনী মাসী সেই নিঃসন্তান রাজার রাজ্য থেকে পক্ষীরাজ ঘোড়া নিয়ে এসেছিল। রাজাও খবর পেলেন, তাঁর পুত্র বেঁচে আছেন এবং দুধবর্ণের গারদে বন্দী। রাজা সৈন্য সামন্ত নিয়ে এলেন। দুধবর্ণ যুদ্ধে রাজাকে পরাস্ত করলেন। এবার বাঘের দল এসে দুধবর্ণের রাজ্যকে ছারখার করে দিল। রাজা, রাজপুত্র র, রাজকন্যাকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন, কোটাল কন্যাকে উপেক্ষা করলেন। ডাইনী বলে তাড়িয়ে দিলেন।

মালঞ্চমালার যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল। একবার রাজা গেলেন মৃগয়ায়, পথে জল-তৃষ্ণায় অধীর হয়ে উঠলেন, মালঞ্চ তাকে জল দিয়ে বাঁচালো। তখন মালঞ্চের প্রতি রাজার অসীম মমতা জাগলো। রাজার কাছে মালঞ্চ আপন পরিচয় দিলেন। মালঞ্চকে সাদরে বরণ করে নিয়ে গেলেন রাজা। মালঞ্চ হলেন রাজ্যের ঠাকুরাণী, আর পাটরানী হলেন কাঞ্চী। রাজা রানী পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতনী নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

মন্তব্য

এই কাহিনীর মধ্যে দুইটি অভিপ্রায়ই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; প্রথমতঃ মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তি (Resuscitation EO-E199) এবং দ্বিতীয়তঃ অসম বিবাহ (Unequal marriage T 121); ইহাদের অতিরিক্ত আরও দুই একটি বিষয় আছে। যেমন দয়ালু পশু (Animals in service to man B 292) কিংবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পশু (Speaking animals B 210) ইত্যাদি।

মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির কাহিনী বাংলা দেশের লোক-কথায় নিতান্ত সাধারণ। এই পুনর্জীবন প্রাপ্তি নানা উপায়েই হইয়া থাকে। মনসা-মঙ্গলের কাহিনীতে দেখা যায়, মৃত লখীন্দরের অস্থিগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাতেই প্রাণ সঞ্চার করা হইয়াছে। আলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন কোন চরিত্র মন্ত্রপূত জল সিঞ্চন করিয়া মৃতকে বাঁচাইতে পারেন। কাজলরেখার কাহিনীতে দেখা যায়, সন্ন্যাসী প্রদত্ত রহস্যজনক বৃক্ষের পাতা কাটিয়া চোখে লাগাইয়া দিতেই মৃত রাজপুত্র বাঁচিয়া উঠিল। এখানে বিশেষ কোন প্রক্রিয়া দ্বারা যে মৃত স্বামীকে বাঁচাইবার কথা আছে, তাহা নহে। মালঞ্চমালার সমবয়সী মেয়ে তাহাকে অমনই বাঁচাইয়া দিল। বেহুলার চরিত্র ও তাহার আচরণের সঙ্গে মালঞ্চমালার চরিত্র ও আচরণের সম্পর্ক আছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক-কথায়ও মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির বহু প্রণালীর উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু হইতে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন জল সিঞ্চন করিয়া পুনর্জীবন দানের মত কাহিনী পাশ্চাত্ত্য দেশেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। অধ্যাপক স্টীথ টম্‌সন লিখিয়াছেন, 'Most popular of all in folktales is revival through the Water of Life (E 80). This water is usually found after a long quest and is powerful against both disease and death.'

বেহুলা এবং মালঞ্চমালা তাহাদের সতীত্বের পুরস্কার স্বরূপ স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিল, সুতরং ইহাদের কাহিনীর মধ্যে একটু নৈতিকগুণ প্রকাশ পাইয়াছে।

অসম বিবাহের কাহিনী নানা প্রকার হইতে পারে, এখানে বয়সের অসমতা; শিশু স্বামীর সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহের কথা আছে। বাংলার নাথ সাহিত্যেও শিশু গোরক্ষনাথের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের ষোড়শী কন্যার বিবাহের কথা আছে।

কটকী ফুল

এক রাজার ছয়টি রাণী ছিল। কিন্তু কাহারও একটি সন্তান না থাকায়, রাজার দুঃখের সীমা ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য কাহার হাতে যাইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীরা তাঁহাকে আরও বিবাহ করিতে উপদেশ দিলেন।

একদিন রাজা ছদ্মবেশে গ্রামের পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন। একস্থানে তিনটি সুন্দরী কন্যাকে স্নান করিতে দেখিলেন। কৌতুহলী হইয়া রাজা তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন। তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মেয়েটি বলিল যে, তাহার গর্ভে দুইটি যমজ ছেলে-মেয়ে হইবে। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী হইবে এবং ছেলেটির কপালে থাকিবে চাঁদ, আর দুই হাতে থাকিবে তারা। রাজা এই কথা শুনিয়া পুলকিত হইলেন এবং মেয়েটিকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। মেয়েটি একটি বৃদ্ধা ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়ে; রাজার প্রস্তাবে বৃদ্ধা হতবাক্ হইয়া গেল। রাজা মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ছয় রাণী ছোটরাণীকে দেখিতে পারিত না।

কিছুকাল পরে নতুন রাণী সন্তান-সম্ভবা হইলেন। বিশেষ কাজে রাজা সেই সময় রাজ্যের বাহিরে গেলেন। সত্যই একদিন নতুন রাণীর যমজ ছেলে-মেয়ে হইল। ছয়রাণী ষড়যন্ত্র করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নবজাত শিশু দুইটিকে সরাইয়া ফেলিল এবং দুইটি কুকুর ছানা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিল। ধাত্রী শিশু দুইটিকে এক কুমোরের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল। কিছুদিন পরে রাজা ফিরিয়া আসিয়া যখন শুনিলেন যে, নতুন রাণীর দুইটি কুকুরছানা হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

এদিকে কুমোর-দম্পতি শিশু দুইটিকে অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে রূপে-গুণে ছেলে-মেয়ে দুইটি বাড়িতে লাগিল। যখন তাহাদের বয়স বারো বৎসর, সেই সময় কুমোর মারা গেল এবং তাহার স্ত্রী সহমরণে গেল। ছেলে-মেয়ে দুইটি তখন কুমোরের সমস্ত কিছু বিক্রয় করিয়া রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা যেই শহরের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বাজার আলোকিত হইয়া উঠিল। দোকানদারেরা ইহাতে এতই

বিস্মিত হইল যে, দুই ভাই-বোনকে দেবদূত বলিয়া ভাবিল এবং বাজারের নিকটেই বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে দিল। যখন দুই ভাই-বোন রাস্তায় বাহির হইত, তখন একটি স্ত্রীলোক তাহাদের অনুসরণ করিত ; স্ত্রীলোকটি তাহাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

কপালে চাঁদ, হাতে তারা সেই বালক ও তাহার বোন বাজারের নিকটে বাস করিতে লাগিল। বালক একটি ঘোড়া কিনিল। সে নিকটবর্তী বনে শিকার করিতে যাইত। রাজ্যের রাজাও সেই বনে শিকারে যাইতেন। একদিন বালকটিকে দেখিয়া রাজার অন্তরে পুত্রস্নেহ জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহার নিকটবর্তী হইলেন। সেই সময় একটি হরিণ মারিতে যাইয়া বালকটির মাথার পাগ্‌ড়ী খুলিয়া গেল এবং রাজা দেখিলেন, তাহার কপালে চাঁদ অঙ্কিত রহিয়াছে। রাজা তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন ; কিন্তু বালকটি উত্তর না দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কোন মতে তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া ছয় রাণীকে ব্যাপারটি জানাইলেন। তাঁহারা সেই ধাত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে শপথ করিয়া বলিল যে, শিশু দুইটিকে সে পোড়াইয়া মারিয়াছে। যাহাই হোক্, ধাত্রীটি খোঁজ করিতে করিতে সেই বালকের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নিজেকে তাহাদের দিদিমা বলিয়া পরিচয় দিল। মেয়েটি তখন বাড়ীতে একা ছিল। ধাত্রী মেয়েটির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া বলিল যে, বালিকা যদি তাহার ভাইকে কটকী ফুল আনিয়া দিতে পারে, সেই ফুল পরিলে তাহাকে আরো সুন্দরী দেখাইবে এবং কোন রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ হইবে। গৃহে ফিরিয়া বালক বোনের নিকট সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। তবে তাহার প্রিয় বোনকে খুসী করিবার জন্য পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া সমুদ্রের অপর পারে কটকী ফুল আনিতে চলিল।

সমুদ্রের ওপারে পৌছিয়া বালক একটি হরিণ ও একটি গণ্ডার মারিয়া রাক্ষসদের এলাকায় ঢুকিয়া পড়িল। তারপর এক বিরাট রাক্ষসীকে মাসী বলিয়া ডাক দিল। রাক্ষসী তাহার কপালে চাঁদ এবং হাতে তারা দেখিয়া বলিল যে, তাহারা তাহারই অপেক্ষায় ছিল। বালক মাসী বলিয়া ডাকিয়াছে, তাই তাহাকে খাইল না—হরিণ ও গণ্ডারটি খাইয়া ফেলিল। তার পর বালককে উত্তর দিকে যাইতে বলিল। সেইদিকে এক রাক্ষস ছিল ; বালক তাহাকে মেসো বলিয়া সম্বোধন করিল এবং হরিণ ও গণ্ডার খাইতে

দিল। মেসো-রাক্ষস বালককে পথ বলিয়া দিল। বালক সেই দিকে গিয়া গভীর কাচিরি বন দেখিল; সে কাচিরি বনের কাছে প্রার্থনা জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বন সরিয়া গিয়া পথ হইয়া গেল। তার পর সমুদ্র পড়িল; সমুদ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেই সমুদ্র দুই পাশে সরিয়া গিয়া পথ করিয়া দিল। ইহার পরেই সে কটকী ফুলের বাগান দেখিতে পাইল। দেখিল, সেখানে একটি প্রাসাদ। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বালক একটি সুন্দরী কন্যাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিল। তাহার মাথার দিকে সোনার কাঠি এবং পায়ের দিকে ছিল রূপার কাঠি। সোনার কাঠির স্পর্শে মেয়েটি জাগিয়া উঠিল। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া বালককে দেখিল এবং বলিল যে, সে বালককে জানে এবং তাহার ইতিহাসও জানে। সে বলিল যে, সেখানে সাত শত রাক্ষস আছে। রাত্রে তাহারা ফিরিয়া আসে। সে নিজে এক রাজকন্যা। এক রাক্ষসী তাহাকে ভালোবাসে, তাই তাহার সেবার জন্য তাহাকে রাখিয়াছে। সারা দিন বালক রাজকন্যার সহিত ঘুরিয়া বেড়াইল এবং কি করিয়া রাক্ষসদের মারা যায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইবার পূর্বে বালক লুকাইয়া রহিল এবং রাজকন্যাকে রূপার কাঠির দ্বারা ঘুম পাড়াইয়া দিল।

রাত্রে রাজকন্যা রাক্ষসীর নিকট চোখের জল ফেলিয়া জানিয়া লইল, কিসে তাহাদের মৃত্যু হইবে। পরদিন রাক্ষসীরা বাহির হইয়া যাইবার পর, বালক পুনরায় রাজকন্যাকে জাগাইল এবং সমস্ত শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখের পুকুরে ডুব দিল। পুকুরের নীচে একটি সুন্দর কাঠের বাক্স দেখিতে পাইল। তাহা লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। বাক্সের মধ্যে দুইটি মৌমাছি ছিল; নিজের হাতের উপর রাখিয়া সেই দুইটিকে পিষিয়া মারিল—যাহাতে এক ফোঁটা রক্ত মাটীতে না পড়ে। মৌমাছি দুইটি মরিবার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া সেই সাত শত রাক্ষস বাগানের চারিদিকে মরিয়া পড়িয়া গেল। তখন বালক প্রচুর কটকী ফুল লইল, ফুলের বীজও লইল। তার পর রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া বসিল। নিজের দেশে ফিরিয়া বালক রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিবাহ করিল। একদিন রাজা আসিয়া পুষ্পবতীর নিকট সকল কাহিনী শুনিলেন। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া তিনি ছয় রাণীকে জীবন্ত কবর দিলেন। তারপর ছোট রাণীকে ফিরাইয়া আনিলেন। রাজা স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পুত্র বধূকে লইয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য

এই বিস্তৃত রূপকথাটির মধ্য দিয়া বিভিন্ন অভিপ্রায় (motif) প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ পাশবিক নিষ্ঠুরতা (unnatural cruelty) ; বিমাতৃগণ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া নবজাত দুইটি শিশুকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার ষড়যন্ত্র করিলেন (S 301 Children abandoned)। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, বিমাতার ষড়যন্ত্রে বনবাসে পরিত্যক্ত এই শ্রেণীর শিশুগণ অলৌকিক ভাবে সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া পরিণামে পিতার সঙ্গে মিলিত হয়, ষড়যন্ত্রকারিণী বিমাতাদিগের তখন দণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। তবে নিষ্ঠুর বিমাতা (cruel step-mother) অভিপ্রায়টির এখানে আভাস মাত্র আছে, একমাত্র সূতিকাগৃহ হইতেই অরণ্যে নিক্ষেপ করা ব্যতীত আর কোন অত্যাচারের রূপ তাহাদের মধ্যে দেখা যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ইহার আর একটি অভিপ্রায় দৈবাৎ রাজার কোন কুমারী কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ এবং তাহাক বিবাহ (King accidentally finds maiden and marries her. N 711),

তারপর সপত্নীর ঈর্ষ্যা (Zealousy of co-wives) ইহার আরও একটি অভিপ্রায়। কিন্তু তাহাও কেবলমাত্র কাহিনীর প্রথম ভাগেই সীমাবদ্ধ।

কটকী ফুলের মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন বস্তুর(magic object D 800) অন্তর্গত ঐন্দ্রজালিক ফুল (D 980.1*) অভিপ্রায়ের ইঙ্গিত আছে। এই ফুল পরিলে বালিকা আরও সুন্দরী হইবে এবং রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। সুতরাং ইহাতে ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথাই প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্বশেষে ইহার মধ্যে রাক্ষসের বৃত্তান্তও আসিয়াছে এবং রাক্ষসকে হত্যা করিবার মধ্যে যে অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে অধ্যাপক টমসন Hero hidden and ogre deceived by his wife (G 532) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বাংলার লোক-কথার ইহা অতি সাধারণ একটি অভিপ্রায়।

৬

সাত মায়ের এক ছেলে

এক রাজার সাত রাণী। কিন্তু কাহারও কোন সন্তান নাই; সেইজন্য রাজার দুঃখের সীমা নাই। কিছুকাল পরে এক সাধুর নির্দেশে রাজা একটি গাছ হইতে সাতটি আম আনিয়া তাঁহার সাত রাণীকে খাইতে দিলেন। রাণীদের সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিল।

রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। এই নতুন রাণী আসলে ছিল এক রাক্ষসী। রাজা তাহাকে এত বেশী ভালবাসিতেন যে, তাহার কথায় সাত রাণীকে অন্ধ করিয়া এক গুহায় পাঠাইয়া দিলেন।

সেই গুহায় সাত রাণী অতি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন বড় রাণীর এক সন্তান জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, নিজেরাই বাঁচিতে পারি না, সন্তান লইয়া কি হইবে? এই ভাবিয়া শিশুটির মাংস সাত ভাগ করিয়া সাত রাণী খাইলেন। কিন্তু ছোট রাণী তাহা রাখিয়া দিলেন। এইভাবে পর পর ছয় রাণীর শিশুকে তাঁহারা খাইলেন। কিন্তু ছোট রাণী তাঁহার অংশের ছয় ভাগ রাখিয়া দিলেন। যখন তাঁহার পুত্র জন্মিল, তিনি তখন নিজ পুত্রকে বাঁচাইয়া পুর্বের ছয়টি শিশুর মাংস ছয় রাণীকে খাইতে দিলেন। সকল রাণী বুঝিলেন, ইহা পুরানো মাংস। ছোট রাণী জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে বাঁচাইতে চান। সকলেই ইহাতে খুশী হইল এবং সাত রাণী আপন আপন স্তন্যদুগ্ধ পান করাইয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে রাক্ষসী-রাণী রাজার রাজ্যের সব কিছু একে একে খাইয়া ফেলিতে লাগিল—রাজ্য প্রায় শ্মশান হইয়া উঠিল; কিন্তু কেহই রাক্ষসীর সন্ধান পাইল না। কারণ, রাক্ষসী রাতের বেলা নিজমূর্তি ধরিয়া মানুষ-পশু খাইতে বাহির হইত এবং দিনের বেলায় রাণী সাজিয়া থাকিত।

এদিকে সাত রাণীর সন্তানটি দিনে দিনে এক বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হইল; একদিন সে জননীদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজার নিকট চাকুরী করিতে আসিল। রাজা তাহাকে আপন পার্শ্বচর নিযুক্ত করিলেন। অল্পদিন পরেই যুবক রাণীর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিল; তখন সে রাজাকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিতে মনস্থ করিল এবং রাক্ষসীকে হত্যা করিবার পথ খুঁজিতে লাগিল।

রাক্ষসী যখন জানিতে পারিল যে, যুবকের নিকট তাহার প্রকৃত স্বরূপ গোপন নাই, তখন যুবককে হত্যা করিবার জন্য সমুদ্রের অপর পার হইতে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আনিবার জন্য পাঠাইল। সঙ্গে তাহার মা'কে একটি চিঠি দিল যেন সঙ্গে সঙ্গে যুবককে হত্যা করে। যুবক সমস্ত কিছুই বুঝিল। সে সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া, 'দিদিমা, দিদিমা' করিয়া ডাকিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে এক বিরাট আকৃতির রাক্ষসী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবক নিজেকে রাক্ষসীর নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহার মেয়ের অসুখের কথা জানাইল এবং বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি দিতে বলিল। রাক্ষসী তখন নাতিকে লইয়া ওপারে গেল। রাক্ষসীর ঘরে একটি বিরাট গদা ও এক গাছি দড়ি ছিল। তাহা হাতে লইয়া সমুদ্র পার হইতে পারা যাইত। একটি খাঁচায় একটি টিয়াপাখী ছিল; তাহা ছিল রাণী-রাক্ষসীর প্রাণ।

রাক্ষসী যখন আহার সন্ধানে বাহির হইল, যুবক সেই অবসরে সব কিছু সঙ্গে লইয়া, গদা ও দড়ির সাহায্যে সমুদ্র পার হইয়া একেবারে আপন দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী-রাক্ষসী তাহাকে জীবিত দেখিয়া বিস্মিত হইল।

একদিন রাজসভায় সকলের সম্মুখে যুবক সেই টিয়া পাখীর খাঁচাটি লইয়া উপস্থিত হইল। তারপর টিয়া পাখীটি হত্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই রাণী রাক্ষসী-মূর্তি ধারণ করিয়া সভার মধ্যে পড়িয়া মরিয়া গেল। যুবক তখন সকল কাহিনী সভার সম্মুখে প্রকাশ করিল। রাজা আপন পুত্রকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সাত রাণীকে গুহা হইতে প্রাসাদে আনাইলেন। রাণীদের প্রকৃতই অন্ধ করা হয় নাই। সকলে তখন সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। পরে রাজার মৃত্যুর পর রাজপুত্র সিংহাসনে বসিল।—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়ালো।

মন্তব্য

এই রূপকথাটির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়ের (motif) সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যাইতেছে, তাহা নরমাংসাহার বা cannibalism. (G 10)। কিন্তু নরমাংসাহারের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ অমানুষিক চরিত্র বা রাক্ষস খোক্কসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, এখানে জননী শিশুপুত্রের মাংস আহার করিতেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে

প্রচলিত লোক-কথাতেও দেখা যায় যে, কোন অমানুষিক চরিত্র নিজের সন্তানের মাংস আহার করিতেছে ; কিন্তু মানুষ তাহার নিজের সন্তানের মাংস আহার করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে। মধ্য ভারতের ভুইঞা জাতির মধ্য হইতে সংগৃহীত একটি কাহিনী এই প্রকার—

'The moon was eating a roasted bel fruit and the sun asked her,'What is that you are eating ?' 'My children.''Then give me a little,' The sun ate the fruit and found it sweet. Pleased with this the Sun ate all his own children, except one which ran away like the lightning.' (Verrier Elwin, *Myths of Middle India,* 1949, P. 56) চন্দ্র এবং সূর্য সম্পর্কে এই কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও প্রকৃত কোন নরনারী যে তাহাদের সন্তানের মাংস খাইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তের কোথাও সন্ধান পাওয়া যায় না।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জীয়ন্ত মানুষ ধরিয়া খাইবার কাহিনী প্রচলিত থাকিলেও, তাহাতে সন্তানের মাংস খাইবার কথা কোথাও নাই। সুতরাং এই কাহিনীটিতে এই বিষয়টি কোথা হইতে কি ভাব আসিল এবং ইহার প্রকৃত তাৎপর্যই যে কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার বিষয়। Mother devouring her own children—অধ্যাপক ষ্টীথ টম্সনের বহু বিস্তৃত অভিপ্রায়-তালিকার মধ্যেও ইহার কোন উল্লেখ নাই।

এই কাহিনীর মধ্যেও external soul অর্থাৎ আত্মার বাহ্যরূপের কথা আছে। টিয়াপাখীর মধ্যে এখানে রাক্ষসীর আত্মার অবস্থানের যে আছে, তাহা রূপকথার সাধারণ অভিপ্রায় মাত্র।

বুধকুমার রূপকুমার

মস্ত বড় এক রাজ্য—সেই রাজ্যের এক রাজার সাত রাণী ছিল। রাজার সম্পদ ছিল প্রচুর; আর লোক-লস্করে রাজপুরী জমজমাট। কিন্তু রাজার একটিও সন্তান নাই, রাজা ও প্রজা সকলেই সেজন্য বড় দুঃখী ছিল।

একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গেলে এক সন্ন্যাসী আসিয়া বড় রাণীকে একটা শিকড় দিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, শিকড়টি বাঁটিয়া সাত রাণীতে খাইলে সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।

রাণীরা মনের আনন্দে শীঘ্র স্নান সারিয়া আসিয়া পাকশালে যে যাহার কাজ করিতে গেলেন। বড় রাণী আজ ভাত রাঁধিবেন। দুয়োরাণীর উপর বাটনা বাটিবার ভার পড়িয়াছিল। বড়রাণী তাঁহাকে শিকড়টি বাটিয়া দিতে বলিলেন। দুয়োরাণী শিকড় বাটিতে বাটিতে নিজে কতকটা খাইয়া ফেলিলেন, তাহার পর অবশিষ্টাংশ রূপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া বড়রাণীকে দিলেন; মেজরাণী, সেজরাণী, কনেরাণী একে একে সবাই উহা খাইয়া ফেলিলেন। ন-রাণী আসিয়া দেখেন, বাটিতে একটু তলানি পড়িয়া আছে। তিনি তাহাই খাইলেন। মাছ কাটার পর ছোটরাণী আসিয়া দেখেন, তাঁহার জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই; তিনি আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু পরে ন-রাণী আসিয়া ছোটরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া শিলনোড়া ধোয়া জল খাওয়াইলেন। ছোটরাণী কাঁদিয়া কাটিয়া শিল-নোড়া ধোয়া জলই খাইলেন।

দশমাস দশদিনে পাঁচরাণীর পাঁচটি সোনার চাঁদ ছেলে হইল; ন-রাণীর পেটে এক পেঁচা আর ছোটরাণীর পেটে এক বানর হইল। বড় রাণীদের ঘরে আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হইল; আর ন-রাণী ও ছোটরাণীর ঘরে কান্না-কাটি পড়িয়া গেল। কিছুদিন পর ন-রাণী চিড়িয়াখানার বাঁদী, আর ছোটরাণী ঘুঁটে কুড়ানী দাসী হইয়া দুঃখে কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রাজা অন্যান্য রাণীদের আদর করিয়া ঘরে তুলিলেন।

ক্রমে রাজার ছেলেরা বড় হইল। পাঁচ রাজপুত্রের নাম হইল—হীরা-রাজপুত্র, মাণিক রাজপুত্র, মোতিরাজপুত্র, শঙ্খরাজপুত্র, আর কাঞ্চনরাজপুত্র। পেঁচার নাম হইল ভুতুম্ ও বানরের নাম হইল বুদ্ধু। পাঁচ রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়। ভুতুম্ আর বুদ্ধু দুইজনে মায়েদের কুড়ে ঘরের পাশে একটা ছোট বকুল গাছের ডালে বসিয়া খেলা করে। পাঁচ রাজপুত্রের অত্যাচারে রাজ্যের লোক তিক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিল। বুদ্ধু মায়ের ঘুঁটে

কুড়াইয়া দেয়, আর ভুতুম্ চিড়িয়াখানার পাখীর ছানাগুলিকে আহার করায়। দুইজনে রাজবাড়ীর দক্ষিণ দিকে বনের মধ্যে বেড়াইতে যায়। মায়ের জন্ম বুদ্ধু কত ফল আনে। ভুতুম্ ঠোঁটে করিয়া দুই মায়ের পান খাইবার সুপারী আনে।

একদিন পাঁচ রাজপুত্র পক্ষিরাজে চড়িয়া চিড়িয়াখানা দেখিতে আসিয়া পথে বকুল গাছে বুদ্ধু ও ভুতুমকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্রগণের আদেশে বুদ্ধু ও ভুতুম্‌কে বন্দী করা হইল। চিড়িয়াখানা পরিষ্কার করিয়া বুদ্ধু ও ভুতুমের মা ঘরে আসিয়া উভয়কে না দেখিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

বুদ্ধু ও ভুতুম্ রাজপুরীতে আসিয়া অবাক হইয়া গেল। তাহারা রাজপুত্রগণকে বলিল 'ও ভাই রাজপুত্র, আমাদিগে আনিয়াছ, তো মাদিগেও আন।' রাজপুত্রদের জিজ্ঞাসাবাদে বুদ্ধু ও ভুতুম্ তাহাদের মাদিগেরও পরিচয় দিল। রাজপুত্রগণ তাহাদের দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। একজন সিপাই ন-রাণী ও ছোটরাণীর গর্ভে কিরূপে এই পেঁচা ও বানর হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে গল্প বলিল। রাজপুত্রগণ লজ্জায় ও ঘৃণায় বুদ্ধু ও ভুতুমকে খেদাইয়া দিতে আদেশ দিলেন। বুদ্ধ ও ভুতুম সিপাইয়ের মুখে জানিল যে, তাহারাও রাজপুত্র। তখন তাহারা রাজার কাছে যাইবার মনস্থ করিল।

এদিকে সোনার খাটে গা ও রূপার খাটে পা মেলিয়া পাঁচরাণী সিঁথিপাটি করিতেছিলেন; দাসী সংবাদ দিল নদীর ঘাটে শুকপঙ্খী নায়ে মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যা আসিয়াছে। অমনি রাণীরা উঠেন কি পড়েন করিয়া ছুটিয়া আসিলেন; কুঁচবরণ কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন—

কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল।
নিয়া যাও কন্যা মোতির ফুল॥

নৌকা হইতে কন্যা বলিলেন—

মোতির ফুল মোতির ফুল সে বড় দূর,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর পুর।
হাটের সওদা ঢোল-ডগরে, গাছের পাতে ফুল,
তিন বুড়ীর রাজ্য ছেড়ে রাঙ্গা নদীর কূল।

বলিতে বলিতে শুকপঙ্খী নৌকা বহুদূর চলিয়া গেল।

রাণীরা সকলে বলিলেন—

কোন্ দেশের রাজকন্যা কোন্ দেশে ঘর ?
সোনার চাঁদ ছেলে আমার তোমার বর।

কুঁচবরণ কন্যা উত্তর দিলেন—

কলাবতী রাজকন্যা মেঘবরণ কেশ,
তোমার পুত্র পাঠাইও কলাবতীর দেশ।
আনতে পারে মোতির ফুল ঢোল-ডগর,
সেই পুত্রের বাঁদী হয়ে আসব তোমার ঘর।

শুকপঙ্খী অদৃশ্য হইল। রাজা পুত্রদের বাড়ী আনাইলেন। রাজা সকল কথা শুনিয়া ময়ূরপঙ্খী সাজাইতে হুকুম দিয়া দরবারে আসিলেন।

তখন বুদ্ধু ও ভুতুম্ দরবারে প্রবেশ করিল। বুদ্ধু রাজার কোলে বসিল, ভুতুম্ উড়িয়া গিয়া রাজার কাঁধে বসিল। রাজা চমকিত হইলেন। বুদ্ধু ডাকিল, 'বাবা', ভুতুম্ ডাকিল 'বাবা'।

নিস্তব্ধ রাজসভায় রাজার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল গড়াইল। রাজা ভুতুমের গালে চুমা খাইলেন, বুদ্ধুকে দুই হাত দিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন। রাজা তখনি রাজসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া বুদ্ধু ও ভুতুমকে লইয়া উঠিলেন।

এদিকে রাণীরা হুলুধ্বনি দিয়া পাঁচ রাজপুত্রকে কলাবতী রাজকন্যার দেশে পাঠাইলেন। বুদ্ধু এবং ভুতুমও ময়ূরপঙ্খীতে করিয়া যাইতে চাহিলে রাণীরা ভুতুমের গালে ঠোনা ও বুদ্ধুর গালে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজা ভয়ে কথাটি কহিতে পারিলেন না। রাণীরা রাগে গরগর করিতে করিতে রাজাকে লইয়া রাজপুরীতে চলিয়া গেলেন। তখন বুদ্ধু ও ভুতুম পরামর্শ করিয়া ময়ূরপঙ্খী গড়াইতে ছুতার বাড়ী গেল।

এদিকে বুদ্ধু ও ভুতুমের মায়েরা কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর ধারে আসিয়া দুইখানি সুপারীর ডোঙ্গায়, দুই কড়া কড়ি ধানদূর্বা আর আগা-গলুইয়ে পাছা-গলুইয়ে সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া ভাসাইয়া দিলেন। সুপারীর ডোঙ্গা ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভুতুমের মা, বুদ্ধুর মা কুঁড়েতে ফিরিলেন। এদিকে ছুতোরের বাড়ী যাইতে যাইতে বুদ্ধু ও ভুতুম দেখিল দুইখানি সুপারীর ডিঙ্গা ভাসিয়া যাইতেছে। তখন দুই ভাই পরামর্শ করিয়া সেই নায়ে চড়িয়া বসিল। দুই ভাইয়ের দুই ময়ূরপঙ্খী পাশাপাশি ভাসিয়া চলিল।

এদিকে রাজপুত্রদের ময়ূরপঙ্খী তিন বুড়ীর রাজ্যে গিয়া পৌঁছিল। বুড়ীদের তিন বুড়া পাইক আসিয়া সবাইকে থলের মধ্যে পুরিয়া তিন বুড়ীর কাছে লইয়া গেল। বুড়ীরা তাহাদিগকে দিয়া তিন সন্ধ্যা জল খাইয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। অনেক রাত্রে তিন বুড়ীর পেটের মধ্য হইতে রাজপুত্রেরা মা-

যাবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন সময় বুদ্ধু ও ভুতুম তাহাদের ডাকিল। রাজপুত্রেরা বুঝিতে পারিল না, কে তাহাদের ডাকিতেছে। তখন বুদ্ধু ও ভুতুমের কথায় রাজপুত্রেরা বুদ্ধু ও ভুতুমের লেজ ও পুচ্ছ ধরিয়া বাহির হইল। বুদ্ধু রাজপুত্রদের চুপি চুপি তলোয়ার দিয়া তিন বুড়ীর গলা কাটিতে বলিল। রাজপুত্রেরা তাহাই করিল এবং তাড়াতাড়ি ময়ূরপঙ্খীতে উঠিয়া পাল তুলিয়া দিল। বুদ্ধু আর ভুতুমকে কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না।

ময়ূরপঙ্খী সারারাত ছুটিয়া ভোরে রাঙ্গা নদীর জলে গিয়া পড়িল। রাঙা নদী কূল-কিনারাহীন। মাঝিরা দিক হারাইল। পাঁচ ময়ূরপঙ্খী সমুদ্রে গিয়া পড়িল; রাজপুত্র, মাঝি-মাল্লা সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। সাতদিন সাতরাত পর বুদ্ধু ও ভুতুম আসিয়া রাজপুত্রদের রক্ষা করিল। দেখিতে দেখিতে ময়ূরপঙ্খী সমুদ্র ছাড়াইয়া এক নদীতে আসিয়া পড়িল। দুই পাড়ের আম কাঁঠালের গাছ হইতে রাজপুত্রেরা সকলে পেট ভরিয়া আম কাঁঠাল খাইয়া সুস্থির হইলেন।

তখন রাজপুত্রেরা ময়ূরপঙ্খীতে বানর আর পেঁচাকে দেখিয়া বলিল, 'এ দুটোকে জলে ফেলে দে।' মাঝিরা বুদ্ধু আর ভুতুমকে জলে ফেলিয়া দিল। ইহার পর চলিতে চলিতে রাজপুত্রদের পাঁচটি ময়ূরপঙ্খীই ডুবিয়া গেল। কতক্ষণ পরে বুদ্ধু ও ভুতুমের ডোঙ্গা সেইখানে আসিল। বুদ্ধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল 'দাদা, এখানে কি যেন হইয়াছে, এস তো ডুব দিয়া দেখি।' বুদ্ধুর কথায় ভুতুম সুতা ধরিয়া বসিয়া রহিল, বুদ্ধু নদীর জলে ডুব দিল। ডুব দিয়া বুদ্ধু পাতালে এক রাজপুরীতে আসিল। সেখানে মানুষজন নাই, কেবল একশো বচ্ছুরে এক বুড়ী বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুদ্ধু সেখানে গিয়া এক অন্ধ কুঠরীর মধ্যে বন্ধ হইল। সেখানে রাজপুত্র ও মাঝি-মাল্লারাও বন্দী হইয়াছিল। তাহারা বুদ্ধুর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিল। বুদ্ধু মৃতের ভাণ করিয়া পড়িয়া রহিল। পাতাল পুরীর যে দাসী নিত্য খাবার দিয়া যাইত, সে মৃত মনে করিয়া বুদ্ধুকে মুক্ত করিয়া দিতেই বুদ্ধু উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতেই সেই মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কন্যাকে দেখিল। রাজকন্যার খোঁপার মোতির ফুলটি বুদ্ধু আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইল। কলাবতী রাজকন্যা বুদ্ধুকে দেখিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি যে পণ করিয়াছেন! তাই বানরের গলাতেই মালা দিতে হইল। বানর স্বামীর সঙ্গে আসিবার জন্য রাজকন্যা এক কোটায় উঠিলেন। কোটা দোকানীর কোটার সঙ্গে মিশিয়া গেল। তখন

বুদ্ধু শুকের নিকট হইতে ঢোল-ডগর লইয়া বাজাইতে লাগিল। ঢোল-ডগরের ডাহিনে ঘা দিলে হাট বাজার বসে, বামে ঘা দিলে হাটবাজার ভাঙ্গিয়া যায়। শেষে দোকানীরা হয়রান হইয়া কোটা ফিরাইয়া দিল। কোটা হইতে তখন রাজকন্যা ফল খাইতে চাহিল। বুদ্ধু ফল পাড়িতে গিয়া দেখিল, গাছের গোড়ায় অজগর সাপ জড়াইয়া আছে। বুদ্ধু কোমরের সুতা দিয়া সাপটিকে কাটিয়া ফেলিল। তখন রাজকন্যা বলিল 'আর না, এবার তোমার বাড়ী চল।' বুদ্ধু পাঁচ রাজপুত্র, মাঝিমাল্লা সহ ঢোল-ডগর কাঁধে, কোটা হাতে মোতির ফুল কাঁধে, বুড়ীর কাঁথা গায়ে, গাছের ফল খাইতে খাইতে কোমরের সুতায় টান দিল। ভুতুম বুঝিতে পারিয়া সুতা টানিয়া তুলিল। তখন সকলে ভাসিয়া উঠিল। এবার সকলকে লইয়া ময়ূরপঙ্খী দেশে চলিল। কিন্তু গভীর রাত্রে বুদ্ধু কোটা খুলিয়া রাজকন্যার সঙ্গে কথা কহিত বলিয়া রাজপুত্রগণ বুদ্ধু ও ভুতুমকে জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু রাজকন্যা রাজপুত্রদের বিবাহ করিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, 'ঢোল-ডগর যার, আমি তার।' রাজপুত্রেরা রাজকন্যাকে আটক করিলেন।

ময়ূরপঙ্খী রাজার ঘাটে আসিতেই রাণীরা বরণ করিতে আসিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া জানিলেন যে, রাজকন্যা কাহারও নহেন। কেবল ঢোল-ডগর যার, তিনি তার। রাণীরা বলিলেন, 'তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।' রাজকন্যা জানাইলেন যে, তাঁহার 'এক মাসের ব্রত আছে; একমাস পর যাহা ইচ্ছা, তাহা করা যাইবে।' তাহাই ঠিক হইল।

এদিকে বুদ্ধু ও ভুতুমের মায়েরা ছেলেদের শোকে নদীর জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়া দেখেন বুদ্ধু ও ভুতুম তাঁহাদের নিষেধ করিতেছে। তখন দুই রাণী আনন্দে বুদ্ধু ও ভুতুমকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। দুইজনে ছেলেদের লইয়া কুড়ে ঘরে গেলেন। এদিকে ঢোল-ডগরের শব্দে দুই রাণীর কুঁড়ে ঘরের পাশে দোকানপাট বসিল, গাছের পাতায় পাতায় ফল ধরিল, লক্ষ সিপাই কুঁড়ে ঘর ঘিরিয়া পাহারা দিতে লাগিল। রাজার ইহাতে চোখ ফুটিল; তিনি ন'-রাণী ও ছোটরাণীকে আনাইলেন। কলাবতী রাজকন্যাকে আপনি দুই রাণী ব্রতের ধান-দূর্বা মাথায় গুঁজিয়া বরণ করিতে আসিলেন। শুনিয়া পাঁচরাণী ঘরে খিল দিলেন। পরদিন মহাধুমধামে মেঘবরণ চুল কুঁচবরণ কলাবতী কন্যার সঙ্গে বুদ্ধুর বিবাহ হইল। আর একদেশের রাজকন্যা হীরাবতীর সঙ্গে ভুতুমের বিবাহ হইল। পাঁচ রাণী আর খিল খুলিলেন না। পাঁচ রাজপুত্র আর

কপাট খুলিলেন না। রাজা ঘরের উপরে কাঁটা ও মাটি দিয়া ঘর বুজাইয়া দিলেন। একদিন রাত্রে কলাবতী ও হীরাবতী দেখেন বুদ্ধু ও ভুতুম নাই। কেবল বিছানায় বানরের ছাল ও পেঁচকের পাখা পড়িয়া আছে। দুই রাজপুত্র রূপে বুদ্ধু ও ভুতুম ঘোড়ায় চড়িয়া নগর পাহারা দিতেছে। তখন রাজকন্যারা বানরের ছাল ও পেঁচার পাখা পুড়াইয়া দিতেই গন্ধ পাইয়া দুই রাজপুত্র ছুটিয়া আসিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিল। শেষে সব ঠিক হইয়া গেল। সকলে প্রভাতে উঠিয়া দেখে দেবতার মত দুই সোনার চাঁদ রাজপুত্র রাজার দুই পাশে বসিয়া আছে। সকলে দেখিয়া চমৎকার মানিল। বুদ্ধুর নাম হইল বুধকুমার, আর ভুতুমের নাম হইল রূপকুমার। রাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তারপর রাজা, ন·রাণী, ছোটরাণী, বুধকুমার, রূপকুমার, কলাবতী ও হীরাবতী রাজ-কন্যাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

মন্তব্য

ইহার মধ্যে যে সকল অভিপ্রায় (motif) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমই উল্লেখযোগ্য গর্ভসঞ্চার ও জন্মের (Conception and Birth, T 500—T 599) অভিপ্রায়—ইহারই অন্তর্ভুক্ত নারী কর্তৃক পশুপক্ষীর জন্মদান অভিপ্রায়টি (woman gives birth to animal) ইহার মূল বক্তব্য। রূপকথার ইহা একটি সাধারণ অভিপ্রায়। এখানে নারী জননীর গর্ভে পশুপক্ষী সন্তান জন্ম গ্রহণের কারণ স্বরূপ দেখা যাইতেছে, অন্যান্য রাণীগণ যে ভাবে ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন শিকড়টি বাটিয়া খাইয়াছিলেন, ছোট দুইজন রাণী জ্যেষ্ঠাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া সে ভাবে তাহা আহার করিতে পারেন নাই ; সেই জন্যই তাঁহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির সন্তানের জন্মদান করিয়াছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে গর্ভ সঞ্চার হইলেও অনেক সময় নারীর গর্ভ হইতে পশুপক্ষী জন্মলাভ করিতে পারে। নারীর গর্ভ হইতে সাপের জন্ম হইবার বৃত্তান্ত নিতান্তই সাধারণ। তবে নারীর গর্ভজাত এই সকল পশুপক্ষি-রূপী সন্তান সর্বদাই শেষ পর্যন্ত হয় পুনরায় নরনারীর রূপ ধারণ করে, কিংবা অসাধ্য সাধন করিয়া নরনারী-রূপী জনক-জননীকে নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে। তাহারা প্রায়ই অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়া অসাধ্য সাধন করে। এই অভিপ্রায়টিকে আপাতদৃষ্টিতে অক্ষম নায়কের বিজয় বা সাফল্য লাভ (success of unpromising hero L 160) বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। তারপর কনিষ্ঠা রাণী সাধারণতঃ যে সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকে, এই কাহিনীতে তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে।

সাত ভাই চম্পা

এক রাজা, তাহার সাত রাণী। কিন্তু সাত রাণী হইলে কি হইবে, রাজার কোন সন্তান নাই; এত বড় রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর কি হইবে, এই ভাবনায় রাজার দিনে আহার নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই।

এমন সময় একদিন শুনিতে পাওয়া গেল, ছোট রাণীর সন্তান হইবে। রাজার মনে আহ্লাদের অন্ত নাই, কিন্তু বড় রাণীদের মনে হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রাজা সর্বদা বাহিরের দরবারে বসিয়া প্রজাদের নালিশ শুনেন। সন্তান হইবা মাত্র অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পাইয়া যাহাতে সন্তান দেখিতে আসিতে পারেন, সে জন্য এক কাজ করিলেন; ছোট রাণীর কোমরে আর নিজের কোমরে এক সোনার শিকল বাঁধিয়া দিলেন; সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই সোনার শিকল ধরিয়া টানিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্তঃপুরে ছুটিয়া আসিয়া নিজের সন্তান দেখিতে পাইবেন।

বড়রাণীরা বলিলেন, 'ছোটরাণীর ছেলে হইবে, আঁতুড় ঘরে বাহিরের লোক যাইতে দিব কেন, আমরাই থকিব।' রাজা তাহাতে রাজি হইলেন। আঁতুড় ঘরে গিয়াই তাহারা মিছামিছি ছোটরাণীর কোমরের শিকল ধরিয়া নাড়িয়া দিলেন। রাজা অন্তঃপুরে ছুটিয়া আসিয়া আঁতুড় ঘরে গিয়া দেখেন, কিছুই নাই। দেখিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

ছোটরাণীর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইল। বড়রাণীরা তখন শিকল নাড়িল না, হাঁড়ি সরা আনিয়া ছেলেমেয়েগুলিকে তাহাতে পুরিয়া ছাই গাদায় পুতিয়া ফেলিয়া আসিল। ছোটরাণী যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে? বড়রাণীরা তখন মিথ্যা করিয়া বলিল, কি আবার হইয়াছে, কতকগুলি এ্যাং ব্যাং চ্যাং হইয়াছে। শুনিয়া ছোটরাণী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

বড়রাণীরা এইবার ছোটরাণীর কোমরের শিকল ধরিয়া টান দিলেন। রাজা দরবারে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ছুটিতে ছুটিতে অন্তঃপুরে আসিয়া হাজির হইলেন। বড়রাণীরা কতকগুলি ইঁদুর বাদুড়ের ছানা আনিয়া রাজাকে দেখাইল; বলিল, ছোটরাণীর এই সকল সন্তান হইয়াছে।

শুনিয়া রাজা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। ছোটরাণীকে রাজা অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া দিবার আদেশ দিয়া গেলেন।

বড় রাণীদের অভিলাস পূর্ণ হইল, তাহারা খুসীতে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ছোটরাণী ঘুঁটে কুড়ানী দাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার দুঃখ দেখিয়া পাথর ফাটিয়া যায়। এই ভাবে দিন যায়।

রাজার পুত্র নাই, তাই রাজ্যের বাগানে রাজার পুজার ফুলও ফুটে না। একদিন মালী দেখিল, এক ছাই গাদার উপর এক পারুল গাছে সাতটি চাঁপা ও একটি পারুল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মালী ছুটিয়া গিয়া রাজাকে কহিল, 'রাজা মশাই, রাজ্যে ফুল ফুটে না, কোনদিন পুজার ফুল জোগাইতে পারি না, আজ দেখি, রাজবাড়ীর ছাই গাদার উপর এক পারুল গাছে সাতটি চাঁপা আর একটি পারুল ফুটিয়া রহিয়াছে।'

রাজা বলিলেন, 'পাড়িয়া আন, সেই ফুলে আজ পুজা করিব।' মালী ফুল লইতে আসিতেছে দেখিয়া পারুল গাছে পারুল ফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া জাগাইল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজার মালী ফুল তুলিতে আসিতেছে, তাহাকে পুজার ফুল দিবে কি না দিবে?'

সাত চাঁপা মালীকে দেখিয়া উপরে উঠিয়া গেল; বলিল,আগে রাজা আসুক, তবে ফুল দিব, তার আগে দিব না। শুনিয়া মালী ত অবাক, ফুলেরা কথা কহে! দৌড়িয়া গিয়া রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা আশ্চর্য হইয়া সেইদিকে ছুটিলেন, আবার পারুল চাঁপা ফুলদিগকে জাগাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজা ফুল তুলিতে আসিতেছেন, তাঁহাকে পুজার ফুল দিবে কি না দিবে?'

অমনি পারুলেরা আরও উঁচুতে উঠিয়া গেল, বলিল, আগে বড়রাণী আসুক, তারপর ফুল দিব, তার আগে দিব না।

রাজা বড় রাণীকে ডাকাইয়া আনিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া চাঁপাফুলেরা বলিল, 'মেজরাণী আসুক, তবে ফুল দিব, তাহা না হইলে দিব না।' মেজরাণী আসিলেন, তবু ফুল পাইলেন না। চাঁপা ফুলেরা একে একে ছয়জন রাণীকেই আসিতে বলিল; রাজা সকলকেই আনাইলেন; কিন্তু কেহই ফুল তুলিতে পারিল না। রাজা হতাশ হইয়া পড়িলেন।

তারপর ফুলেরা বলিল,

না দিব না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী,
তবে দিব ফুল।

রাজা লোক-জন পাঠাইয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসীর খোঁজ করিতে লাগিলেন। অনেক খোঁজা খোঁজির পর ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া গোবর-মাথা হাত লইয়া ঘুঁটে কুড়ানী দাসী আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র সাতটি চাঁপা আকাশ হইতে নীচে নামিয়া আসিল, তাহাদের মধ্য হইতে সাতটি ফুলের মত রাজপুত্র আর পারুল ফুলটির মধ্য হইতে একটি ফুটফুটে রাজকন্যা ঘুঁটে কুড়ানী দাসীর কোলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

রাজা সব অবস্থাই বুঝিতে পারিলেন; তিনি বড়রাণীদিগের দিকে তাকাইলেন, তাহারা আগেই ভয়ে জড়সড় হইয়া গিয়াছিল। রাজা বড়রাণী-দিগকে উপরে নীচে কাঁটা দিয়া মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন, তারপর সাত পুত্র ও এক কন্যা এবং ছোটরাণীকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে ফিরিলেন; রাজা মনের সুখে ছোটরাণী ও সাত পুত্র এবং এক কন্যা লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য

এই রূপ কথাটির মধ্যে যে অভিপ্রায়টি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য তাহাকে ইংরেজিতে ডক্টর ভেরিয়র এলউইন Talking Flowers (818·1*) বা বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন পুষ্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ষ্টীথ টম্‌সনের লোক-কথা অভিপ্রায়ের বিস্তৃত সংকলনের মধ্যে অনুরূপ কোন অভিপ্রায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, মধ্য ভারতের আদিবাসীর পুরাকাহিনী (myth)-র মধ্য হইতে ভেরিয়ার এলউইন এই অভিপ্রায়-মূলক একটি কাহিনীর মাত্র সন্ধান পাইয়াছেন, কাহিনীটি তাঁহার ভাষায় এইরূপ—

Mahadeo made a garden of Champa, Jasmine and Keonra flowers in Korbasera's enclosure. When the flowers blossomed they began to talk to each other, 'What lovely flowers we are, yet no one comes to play with us or marry us and we have to live here ignored by men.' Then they said again, 'Let us go and put our grievance before the pérson who made us.' They asked the Jasmine, who is the Raja of the flowers, to go to Mahadeo on their behalf.

এতদ্ব্যতীত ডঃ ভেরিয়র এলউইন মধ্যপ্রদেশ হইতে বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন বৃক্ষের (Talking tree) ও কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। স্টীথ টম্‌সন

extraordinary tree (F 810) নামক একটি অভিপ্রায় মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

এই কাহিনীর আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায়, অন্যায় ভাবে নিহত ব্যক্তির সমাধির উপর ফুলগাছের জন্ম ; স্টীথ টমসন্ ইহাকে Reincarnation in plant (tree) growing on grave (E 631) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মধ্য ভারতীয় উপজাতির মধ্য হইতে এই প্রকার অনেকগুলি কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই কাহিনীতে নিহত শিশুদিগের আত্মা প্রস্ফুটিত চাঁপা ও পারুল ফুলের মধ্য দিয়া পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কেবলমাত্র জন্মান্তরবাদী ভারতীয় জাতির মধ্যেই যে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তাহা নহে—জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সমাজের লোক-সাহিত্যেও অনুরূপ কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ভারতে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করিবার পরিবর্তে অগ্নিসৎকার করাই সাধারণ নিয়ম ; সেইজন্য ভারতীয় লোক-কথায় ভস্মীভূত দেহের চিতার উপরেও বৃক্ষাদি জন্মিতে শুনা যায়। উড়িষ্যার জুয়াঙ্ নামক এক উপজাতির পুরাকাহিনী (myth) হইতে জানা যায় যে, এক রাজকন্যার চিতার উপর তামাক গাছের জন্ম হইয়াছিল। কুৎসিৎ বলিয়া রাজকন্যার বিবাহ হয় নাই, মৃত্যুর পর মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পর জন্মে তুমি কি হইয়া জন্মিতে চাও? তিনি বলিলেন, 'এ জন্মে আমাকে সকলে ঘৃণা করিয়াছে, পরজন্মে সকলের প্রিয়তম বস্তু হইয়া জন্মিতে চাই।' মহাপ্রভু তাহার চিতার উপর তাহাকে তামাক গাছ রূপে জন্ম দিলেন। (Elwin, *ibid* P. 326-27)

এই দুইটি অভিপ্রায় ব্যতীতও বিজয়িনী ছোটরাণীর অভিপ্রায়টিও ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

৭

সাত ভাই চম্পা

(পাঠান্তর)

এক দেশের এক রাজা। রাজার দুই রাণী। কিন্তু কাহারও কোন সন্তান নাই। ছোটরাণী রাজার খুব আদরের, বড়রাণীর তাই দুঃখের আর সীমা নাই। মনে সর্বদাই এই ভাবনা। এইরূপে দিন যায়। ইতিমধ্যে ছোটরাণী সন্তানসম্ভবা হইলেন। রাজ্যে আনন্দের বান ডাকিল, রাজা প্রজা সকলেই খুব খুশী, কেবল খুশী হইলেন না বড়রাণী। তিনি মনে মনে নানারূপ কুমতলব স্থির করিতে লাগিলেন। বড়রাণী ধাত্রীর সহিত গোপনে পরামর্শ করেন। ধাত্রীকে তিনি গোপনে শিখাইলেন যে, 'ছোটরাণীর ছেলেই হউক আর মেয়েই হউক, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র পুঁতিয়া ফেলিবে এবং ছেলের পরিবর্তে একটি কাঠের পুতুল রাখিয়া দিবে, যদি তুমি এইরূপ করিতে পার, যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।'

ধাত্রী বড়রাণীর কথা অমান্য করিতে সাহস করিল না, তাই নিরুপায় হইয়া অবশেষে সে ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইল। সরলপ্রাণা ছোটরাণী কিন্তু বড়রাণীর উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত। বড়রাণী যে তাহার জন্য কিরূপ কুটিলতাপূর্ণ জাল বিস্তার করিয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

যথাসময়ে ছোটরাণী একটি অনিন্দ্যসুন্দর কন্যা প্রসব করিলেন। বড়রাণী তৎক্ষণাৎ ধাত্রীর সাহায্যে সেই কন্যাটিকে ছাই গাদায় পুঁতিয়া ফেলিতে বলিলেন এবং কাঠের পুতুলটিকে তাহার স্থলে আনিয়া রাখিতে বলিলেন। ধাত্রীও আজ্ঞা-মাত্র তাহাই করিল। এদিকে রাজবাড়ীর সবাই ছোটরাণীর সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় অন্দর হইতে সংবাদ আসিল, ছোটরাণী একটি কাঠের পুতুল প্রসব করিয়াছেন। এই খবর শুনিয়া সকলেই অতিশয় দুঃখিত হইল। কিছুদিন কাটিয়া গেল, ছোটরাণী পুনরায় গর্ভবতী হইলেন। রাজা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনিয়া গণনা করাইলেন ; পণ্ডিত বলিয়া গেলেন ছোট রাণীর পুত্রসন্তান হইবে কিন্তু সে শাপভ্রষ্ট। যথাকালে ছোটরাণীর একটি চাঁদের ন্যায় পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বড়রাণী তাড়াতাড়ি ধাত্রীকে দিয়া তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলেন এবং একখানি ইটের উপর কাপড় জড়াইয়া রাখিয়া দিলেন। যথাসময়ে রাজপুরীতে খবর পৌঁছিল যে ছোটরাণী একটি ইট প্রসব করিয়াছেন। রাজপুরীতে শোকের ঝড় বহিয়া গেল। পুত্র-আশায় বঞ্চিত হইয়া রাজা অতীব মনঃকষ্ট পাইলেন।

এইরূপে ছোটরাণী একটি কন্যা এবং পর পর সাতটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন এবং বড় রাণী প্রত্যেকবারই সন্তান পুঁতিয়া ফেলিয়া একটা না একটা জিনিস দিয়া সকলকেই ভোলাইলেন। রাজা এইসব দেখিয়া ছোটরাণীর উপর অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং তাহাকে রাজবাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া গোয়ালঘরে তাহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বড়রাণীর মুখে হাসি আর ধরে না; পায়ের মলের বাজনা থামে না। তাহার সুখের কাঁটা দূর হইয়াছে, এই আনন্দে বড়রাণী মনের সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। হতভাগিনীর দুঃখে গাছ-পাথর ফাটে, নদী নালা শুকায়; ছোটরাণী ঘুঁটেকুড়ানী দাসী হইয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

কিছুদিন যায়, রাজার পিতার দান-সাগর শ্রাদ্ধ হইবে। সমুদয় জিনিস জোগাড় হইয়াছে। সব কিছু প্রস্তুত, কেবল ফুল আসে নাই। বাগানে কোথাও ফুল নাই, সব ঝরিয়া গেছে। কেবল ছাইগাদার উপর সাতটি চাঁপা ফুল ও একটি পারুল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মালী তাড়াতাড়ি তাহাই আনিতে গেল। যেমনি ফুল লইতে যাইবে, অমনি পারুলফুল চাঁপাফুলদিগকে ডাকিয়া বলিল—'সাত ভাই চম্পা জাগ রে।'

অমনি সাত চাঁপা উঠিয়া পড়িয়া সাড়া দিল—

'কেন বোন্ পারুল, ডাক রে?'

পারুল বলিল—'রাজার মালী এসেছে,

পূজার ফুল দিবে কি না দিবে?'

সাত চাঁপা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর

আগে আসুক রাজা, তবে দিব ফুল।'

দেখিয়া শুনিয়া মালী অবাক্ হইয়া গেল। ফুলের সাজি ফেলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সে রাজার কাছে খবর দিল।

আশ্চর্য হইয়া রাজাও রাজসভার সকলে সেইখানে আসিলেন, রাজা আসিয়া ফুল তুলিতে গেলেন, অমনি পারুল চাঁপাকে ডাকিয়া বলিল,—

সাত ভাই চম্পা জাগ রে?

চাঁপারা উত্তর দিল—কেন বোন্ পারুল ডাক রে?

পারুল বলিল—রাজা আপনি এসেছেন,

ফুল দিবে কি না দিবে?

চাঁপারা বলিল—'না দিব, না দিব ফুল উঠিব শতেক দূর,
আগে আসুক রাজার বড় রাণী
তবে দিব ফুল।'

বলিয়া চাঁপাফুলেরা আরও উঁচুতে উঠিল।

রাজা বড় রাণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বড়রাণী ফুল তুলিতে গেলে ফুলগুলি উপরে উঠিয়া আকাশে তারার মত হইয়া ফুটিয়া রহিল। তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিল,

'না দিব, না দিব ফুল, উঠিব শতেক দূর,
যদি আসে রাজার ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী
তবে দিব ফুল।'

তখন খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল। রাজা চৌদোলা পাঠাইয়া ঘুঁটে-কুড়ানী দাসী ছোটরাণীকে লইয়া আসিলেন।

ছোটরাণীর হাতে পায়ে গোবর, পরনে ছেঁড়া কাপড় তাই লইয়া তিনি ফুল তুলিতে গেলেন। অমনি চাঁপারা আকাশ হইতে নামিয়া আসিল, পারুলও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। তখন ফুলের মধ্য হইতে চাঁদের মত সুন্দর সুন্দর সাত রাজপুত্র এক রাজকন্যা 'মা মা' বলিয়া ডাকিয়া ছোটরাণীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সকলে অবাক। রাজার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বড়রাণী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

রাজা বড়রাণীকে পুঁতিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া সাত রাজপুত্র, রাজকন্যা ও ছোটরাণীকে লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাজপুরীতে জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল।

মন্তব্য

প্রথম কথাটিতে যেমন বহু সন্তানের একসঙ্গে জন্ম (Multiple Birth T 586) অভিপ্রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, ইহাতে তাহার পরিবর্তে এক একটি করিয়া সন্তান জন্মের কথা নির্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই কাহিনীটি একটু আধুনিক ভাবাপন্ন (modernized) বলিয়া মনে হয়। কাহিনীতে একসঙ্গে সাতপুত্র ও এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিবার যে সার্থকতা আছে, এক একটি করিয়া সাতটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মের সেই সার্থকতা নাই। কথার রস হইতে ততো জমাট বাঁধিতে পারে নাই।

১০
ঘুমন্ত পুরী

এক রাজা, তাঁর এক রাণী। বিশাল রাজ্য, বিরাট প্রাসাদ, লোক-লস্কর কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু রাজা-রাণীর মনে সুখ নাই, তাহাদের কোন সন্তান নাই। রাজার মৃত্যুর পর এই বিশাল রাজ্য কে আসিয়া দখল করিয়া লইবে।

একদিন রাজা রাণীকে লইয়া নদীতীরে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। একটি সোনালী রঙের মাছ জল হইতে মাথা উঁচু করিয়া রাজা ও রাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোমরা দুঃখ করিও না, তোমাদের এক পরমা সুন্দরী কন্যা হইবে।'

মাছের কথায় রাজা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবে রাণী কিন্তু একেবারে অবিশ্বাসও করিলেন না; মনে মনে তিনি খুসী হইয়া উঠিলেন।

কিছুদিন পর রাণীর এক কন্যা হইল। রাজ্যে আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতে লাগিল। রাজা রাজ্যের সকল প্রজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজবাড়ীতে আনিলেন, তাহাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া নানা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিতে লাগিলেন।

রাজ্যের সকলেই নিমন্ত্রণ পাইল, কিন্তু একটি বুড়ী কি করিয়া বাদ পড়িয়া গেল। বুড়ী রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজকন্যাকে অভিশাপ দিল যে সে পনর বছর বয়সে বিবাহ হইবার আগেই সূঁচের ঘায়ে মরিবে। রাজ্যশুদ্ধ লোক শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু বুড়ীর অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পনর বছর বয়সেই রাজকন্যা ছুঁচের ঘায়ে যেন ঘুমাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে রাজ্যশুদ্ধ সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল, দাসদাসী সৈন্যসামন্ত রাজা মন্ত্রী কেহই আর জাগিয়া রহিল না। রাজবাড়ীর চারিদিক কাঁটা জঙ্গলে ভরিয়া গেল, সেই জঙ্গলের দিকে যদি কেহ তাকাইত, তবে তাহার চোখে কাঁটা ফুটিয়া যাইত। সেই জন্য কেহই আর সেদিকে তাকাইত না। জঙ্গলের ভিতর বিরাট একটা পুরী এমনি ভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ভয়ে তাহার পথ দিয়া লোক চলিত না।

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। অন্যদেশের এক রাজপুত্র দৈবাৎ একদিন সেই পথে শিকার করিতে আসিল। কাঁটাবনের মধ্যে এক বিরাট

প্রাসাদ দেখিতে পাইয়া তাহার সম্মুখে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার চোখে কাঁটা ফুটিল না, বরং যেখানেই তাহার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেখানেই গাছে গাছে ফুল ফুটিতে লাগিল, ডালে ডালে পাখী গাহিয়া উঠিল।

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন—দেখিলেন, দ্বারে দ্বারী ঘুমাইতেছে, সভাসদেরা রাজসভায় বসিয়া ঘুমাইতেছে, রাজা সিংহাসনে বসিয়া ঘুমাইতেছেন। রাণী অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। রাজকন্যা তাহার খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। রাজপুত্র রাজকন্যার পালঙ্কের নিকট দাঁড়াইলেন, অপলক দৃষ্টিতে রাজকন্যার নিদ্রিত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সহসা রাজকন্যা চোখ মেলিয়া তাকাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পুরী আবার জাগিয়া উঠিল।

রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজপুত্র নিজের দেশে ফিরিয়া গেলেন।

মন্তব্য

এই রূপকথার মধ্যে যে অভিপ্রায়টি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য, তাহা বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন পশু, এখানে তাহা মাছ। ইংরাজিতে ইহাকে Speaking Animals (B 210) অভিপ্রায় বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর অন্যত্রও এই শ্রেণীর কাহিনী অত্যন্ত ব্যাপক। বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন পশুপক্ষীর মুখ দিয়া সাধারণতঃ মানুষ তাহার জীবনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে পায়। অনেক সময় তাহারা এই ভাবে মানুষকে সাবধান করিয়া দিয়া তাহার উপকার সাধন করে। এখানে একটি মাছের মুখে রাজা সন্তান লাভ করিবেন, এই শুভ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে পাইলেন।

হিন্দু পুরাণে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার; সেই সংস্কার অনুসরণ করিলে দেখা যায়, মাছের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা কিছুই আশ্চর্য নয়। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং মহাভারত হইতেও জানিতে পারা যায় যে, একটি মাছ মনুকে আসন্ন প্রলয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া সাবধান হইতে বলিয়া দিয়াছিল; তারপর প্রলয়ের অনন্ত জলরাশির মধ্যে মনুকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ভারতীয় আদিবাসীর লোক-কথার মধ্যেও মৎস্যের পরোপকার করিবার বিশিষ্ট একটি শক্তির কথা আছে। ভেরিয়ার এলউইন লিখিয়াছেন, 'In the Bhil legends a fish warns maiden—or a dhobi—of the

danger of flood. In an Asur Agaria legend, the father of mankind was born from the belly of the fish Raghuman, advising Bhagavan where to get earth for the creation of the world. (*Myths of Middle India*, op. cit. p. 174) ভারতীয় জনশ্রুতিতে মৎস্যকন্যা অর্থাৎ অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক মৎস্যের অনেক বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। এই কাহিনীর মূল অভিপ্রায়টি ইংরেজী Extra-ordinary Castle (F 771) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। স্টীথ টমসন্ লিখিয়াছেন, 'The literature of chivalry must have been a great stimulus to tales about remarkable castles—Castles of gold or silver, or even of diamond, castles suspended on chains or upheld by giants or built on the sea......they are frequently found abandoned, or with all their inhabitants asleep; and sometimes such marvelous houses appear and disappear.' (*The Folktale*, ibid, p 253).

এই রূপকথাটির শেষ অংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতার এই কয়টি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে—

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম
উঠিল কলস্বর,
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।

১১

সিদ্ধিলাভ

এক রাজার কোন সন্তান ছিল না। একদিন এক সাধু আসিয়া রাজাকে একটি ওষুধ দিলেন। বলিলেন, তাহা খাইলেই রাণীর দুইটি যমজ সন্তান হইবে। সাধুকে সেই যমজ সন্তানের একটিকে দিতে হইবে। রাজা তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। প্রকৃতই সেই ওষুধ খাইয়া রাণীর দুইটি যমজ সন্তান হইল। ষোলো বছর পরে সেই সাধু একদিন হাজির হইয়া একটি সন্তান দাবী করিলেন। অতি দুঃখের মধ্যেও বাধ্য হইয়া একটি সন্তান সাধুকে দিতে হইল—জ্যেষ্ঠ পুত্র সাধুর সহিত চলিলেন।

সাধুর সহিত পথ চলিতে চলিতে রাজপুত্র একটি কুকুর ছানা এবং একটি বাজপাখী কুড়াইয়া পাইলেন। বনের পথে সাধুর কুঁড়ে ঘরে রাজপুত্রের দিন কাটিতে লাগিল। সাধু রাজপুত্রকে উত্তর দিকে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন একটি হরিণের অনুসরণ করিয়া তিনি উত্তর দিকে গিয়া পড়িলেন। সেদিকে একটি প্রাসাদ দেখিলেন। একটি সুন্দরী কন্যা রাজপুত্রকে সম্ভাষণ জানাইল। সুন্দরী তাহার সহিত পাশা খেলিবার জন্য রাজপুত্রকে আহ্বান করিল। রাজপুত্র সুন্দরীর নিকট হারিয়া একে একে তাঁহার সঙ্গী কুকুর ছানা ও বাজপাখীকে হারাইলেন; শেষে তিনি নিজেও তাঁহার গোলাম হিসাবে বন্দী হইলেন। আসলে সেই সুন্দরী একজন রাক্ষসী।

মাতাপিতার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় জ্যেষ্ঠ পুত্র বাগানে একটি গাছ পুঁতিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাই তাঁহার জীবন; ইহার পাতাগুলি শুকাইতে সুরু করিলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন। ওদিকে যখন রাক্ষসীর হাতে তিনি বন্দী হইলেন, প্রাসাদের বাগানে গাছটিও শুকাইতে লাগিল। কনিষ্ঠ পুত্র ইহা দেখিয়া, দাদার সন্ধানে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় কনিষ্ঠ পুত্র সাধুর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র উত্তর দিকে গিয়াছিল এবং রাক্ষসীর হাতে হয়ত প্রাণ হারাইয়াছে—সাধুর নিকট হইতে এই কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ পুত্র সেইদিকে গেলেন। একটি হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিলেন, হঠাৎ সেখানে এক সুন্দরী কন্যা হাজির হইয়াছে। সে কনিষ্ঠ পুত্রকেও পাশা খেলায় আহ্বান করিল। কিন্তু এইবার

রাক্ষসী হারিয়া যাইতে লাগিল। তিনবার বাজীতে হারিয়া রাক্ষসী একে একে জ্যেষ্ঠপুত্রকে এবং তাঁহার কুকুর ছানা ও বাজপাখীকে বাহির করিয়া দিল। রাক্ষসী আপন প্রাণভিক্ষা চাহিল এবং একটি গোপন কথা জানাইল যে, ওই সাধু একজন কালীর উপাসক এবং জ্যেষ্ঠপুত্রকে কালীর সম্মুখে বলি দিয়া তন্ত্রসিদ্ধ হইতে চায়। পূর্বে সে এইরূপ ছয়জন রাজপুত্রকে হত্যা করিয়াছে—এখন সাতটি হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করিবে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, সত্যই সেখানে আরও ছয়টি মড়ার খুলি রহিয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া মড়ার মাথা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল এবং কি করিয়া সাধুকে বধ করিতে হইবে শিখাইয়া দিল।

কয়েকদিন পরে সাধু জ্যেষ্ঠপুত্রকে লইয়া কালীমন্দিরে চলিল। কনিষ্ঠপুত্রও সঙ্গে গেল বটে, কিন্তু তাহাকে মন্দিরের ভিতর যাইতে সাধু নিষেধ করিল। দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাধু রাজপুত্রকে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিতে বলিল। রাজপুত্র বলিলেন যে, তিনি রাজপুত্র কি করিয়া প্রণাম করিতে হয়, জানেন না। তখন সাধু নিজে যে মুহূর্তে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করা শিখাইতে গেল, রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক দেহ হইতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মাথাগুলি হাসিয়া উঠিল; দেবী রাজপুত্রকেই সিদ্ধিদান করিলেন। অপর ছয়জন রাজপুত্র জীবন ফিরিয়া পাইলেন এবং সকলে আপন আপন রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো—

মন্তব্য

ইহার মধ্যে যে কয়টি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বাধা-নিষেধ বা taboo। সাধু রাজপুত্রকে উত্তর দিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিল, সে তাহার আদেশ অমান্য করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তারপর কনিষ্ঠ ভ্রাতার অনুগ্রহে সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইল। বাধা-নিষেধ বা taboo ভঙ্গ করিলে সর্বদাই এই প্রকার বিপদ এবং অবশেষে বিপদ হইতে মুক্তির কথা পৃথিবীর সকল দেশের লোক-কথাতেই শুনিতে পাওয়া যায়।

Taboo সম্পর্কে একজন পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিৎ পণ্ডিত এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, 'Tabu sets apart a person, thing, place, name (sometimes even the distinctive syllable of a name) or an action as untouchable, unmentionable, unsayable, or not to be done for a number of reasons.'

বিভিন্ন কারণে এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ; এখানে যে কারণে তাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা রাক্ষসী হইতে রাজপুত্রকে রক্ষা করিয়া নিজের স্বার্থে দেবীর নিকট তাহাকে বলি দেওয়া। Taboo শব্দটি ইংরেজি কিংবা কোন পাশ্চাত্ত্য শব্দ নহে, ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পলিনেসিয় জাতির নিজস্ব ভাষা হইতে গৃহীত, ইহা সেখান হইতে আসিয়াই সকল পাশ্চাত্ত্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই অর্থেই সর্বত্রই ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। বাংলাতেও এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা (taboo) ভঙ্গকারী সর্বত্রই আপনা হইতেই ইহার জন্য দণ্ডলাভ—কখনও মৃত্যুদণ্ড, কখনও কোন দুরারোগ্য ব্যাধির দণ্ড—লাভ করে ; কিন্তু এই দণ্ড মানুষকে দিতে হয় না, আপনা হইতেই তাহার ভোগ করিতে হয়। ভারতের উপকথায় এই প্রকার নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীর বহু শাস্তিলাভের কাহিনী প্রচলিত আছে। বাংলা দেশের সুপরিচিত মনসার ব্রতকথা তাহাদের অন্যতম।

এই রূপকথাটির মধ্যেও রাক্ষস, আত্মার বাহ্য রূপ (external soul F 710) এবং নরবলির অভিপ্রায়ও প্রকাশ পাইয়াছে।

সর্বশেষে ইহাতে বিজয়ী কনিষ্ঠ সন্তান (Successful youngest Son. L 10) অভিপ্রায়টিও কার্যকর হইয়াছে, দেখা যায়। এই কাহিনীটি শঙ্খকুমার কাহিনী গোষ্ঠীর অন্তর্গত। পরের কথাগুলি দ্রষ্টব্য।

শঙ্খকুমার

এক রাজা। তাঁহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী অতি উত্তম। প্রজামাত্রেই সুখে শান্তিতে কালযাপন করুক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক ও নিপুণ যোদ্ধা। তাই তাঁহার রাজ্যের সর্বত্রই সর্বদা শান্তি বিরাজ করিত। এমন যে নানা সদ্‌গুণশালী নরপতি, যিনি পরের সুখ শান্তির নিমিত্ত সদাই যত্নশীল, তিনি কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও মনে শান্তি পাইতেন না। কারণ, তিনি ছিলেন পুত্রধনে বঞ্চিত।

পুত্রলাভের আশায় রাজা ক্রমান্বয়ে সাতটি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণীদের কেহই সন্তানবতী হইলেন না। তাই তাঁহাদের চিত্তও শান্তিহীন।

একদিন অতি প্রত্যূষে রাজার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু আলস্যবশতঃ শয্যা ত্যাগ করিতে একটু বিলম্ব হইল। বাহিরে আসিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তখনও উঠানে ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, মালী তখনও রাজবাটীতে উপস্থিতই হয় নাই। ইহাতে রাজা রাগান্বিত হইলেন। তখনই তিনি কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন,—এখনই মালীকে দরবারে আনিয়া হাজির কর।

হুকুম পাইয়া কোতোয়াল তৎক্ষণাৎ মালীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল এবং দেখিতে পাইল, সে খাইতে বসিয়াছে। ইহা দেখিয়া কোতোয়াল হাড়ে চটিয়া গেল এবং কর্কশ স্বরে বলিল,—'ওরে বে আক্কেল! তুই কোন্ সাহসে রাজবাড়ীর কাজ না করিয়া খাইতে বসিয়াছিস? বেলা যে কতটা হইল, তাহা কি তুই বুঝিতে পারিস নাই?' মালীর স্ত্রী কোতোয়ালকে বসিতে আসন দিল; কিন্তু সে বসিল না; মালীকে বলিল,—'চল্ হারামজাদা, এখনই রাজবাড়ী। তোর বরাতে যে আজ কি আছে, সেখানে গেলেই তা টের পাবি।' মালীর খাওয়া তখন শেষ হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি আচমন করিয়া আসিয়াই সে কোতোয়ালকে বিনীত ভাবে বলিল,—'আমার বেয়াদপি মাফ করবেন। কথাটা আমি আপনাকেই বলি; রাজার কাছে বলিবার আমার সাহসে কুলাইবে না। মহাশয়, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়া আমাকে ঘর-সংসার করতে হয়। প্রতিদিনই রাজবাড়ীতে খুব সকালে ঝাঁট দিতে যাই, যাইয়া প্রথমেই দেখিতে

পাইব, আঁটকুড়ো অনামুখো রাজার মুখ। এই জন্যই বুঝি একটা দিনও আমাদের ভালয় ভালয় যায় না; খাওয়া-দাওয়া কোন দিনই ভাল হয় না। তাই আজ ইচ্ছা হইল, আগে অপরের মুখ দেখিব ও কিছু খাইব, পরে রাজবাড়ী গিয়া ঝাঁট দিব।' ইহা শুনিয়া কোতোয়াল আশ্চর্যান্বিত হইল। সে মালীকে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—'চুপ কর্ হারামজাদা। চল, এখনই আমার সঙ্গে।' কোতোয়াল মালীকে রাজদরবারে হাজির করিয়া, তাহাকে প্রহরীর জিম্মায় রাখিয়া রাজার নিকট গেল এবং তাঁহার নিকট মালীর বিলম্বের কারণ বর্ণনা করিল।

এ কথা শুনিয়া রাজা একেবারে দমিয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভিতর অশান্তির ঝড় বহিতে লাগিল। স্তম্ভিতের মত ক্ষণকাল কোতোয়ালের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন,—'কোতোয়াল! বাস্তবিকই আমি বড় হতভাগ্য! রাজা হইয়াও আমি যে আটকুঁড়ে! এ মুখ আর আমি কাউকে দেখাইব না। তুমি গিয়া এখনই মালীকে ছাড়িয়া দাও। তার কোনই অপরাধ নাই। সে ঠিক কথাই বলিয়াছে।' কোতোয়াল হেটমুখে চলিয়া গেল। রাজাও শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া শয্যায় আশ্রয় লইলেন। শয্যার উপর অসাড় ভাবে পড়িয়া থাকিয়া তিনি নিজ দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইল। রাজা কিন্তু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিলেন না। ইহাতে রাণীরা ও রাজবাটীর আর সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সকলেই কত সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু রাজা দ্বার খুলিলেন না। এমনই ভাবে সেদিন চলিয়া গেল। রাজা অনাহারে রহিলেন। কাজেই রাণীদের, এমন কি রাজবাড়ীর সকলেরই সেদিন অনশনে অতিবাহিত হইল। রাজবাটীস্থ সকলেরই মুখ-মণ্ডল বিষাদ-কালিমা মাখা।

পরদিন সকাল বেলা, রাজকার্য না-করিলে নয় বলিয়া মন্ত্রী ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং সকলেই নিজ নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। শূন্য সিংহাসনের দিকে চাহিয়া সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সকলেই মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিয়া কার্যে রত হইলেন। এমন সময় 'জয় মা তারা' বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এক সন্ন্যাসী ঠাকুর। তৎক্ষণাৎ পারিষদগণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া ঠাকুরকে

প্রণাম করিয়া উপযুক্ত আসনে বসাইলেন। রাজাকে সভায় দেখিতে না পাইয়া সন্ন্যাসী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী তাঁহাকে তাহা অকপটে জানাইলেন। সন্ন্যাসী ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'রাজাকে আমার আগমনের সংবাদ জানাও এবং বলিও তিনি যেন এখনই আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন।' মন্ত্রী মহা বিপদে পড়িলেন। রাজাকে বাহিরে আসিতে বলিলে তিনি বিরক্ত হইবেন, আবার এ সংবাদ না দিলে সন্ন্যাসীও রুষ্ট হইবেন। অবশেষে, অন্য উপায় না দেখিয়া, বৃদ্ধ মন্ত্রী অন্দরে যাইয়া রাণীদিগকে এ কাজের ভার দিলেন। রাণীরা রাজাকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের আগমন সংবাদ দিলেন। এবং তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বিনীত ভাবে বার বার বলিতে লাগিলেন। অভ্যাগত সন্ন্যাসীকে নিজে আদর আপ্যায়নে তুষ্ট করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিয়া, রাজা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বরাবর সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীর নিকট অগ্রসর হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সিংহাসনে বসিতে বলিয়া বলিলেন—'মহারাজ! আমি আপনার মনঃকষ্টের কারণ জানিতে পারিয়াছি। শীঘ্রই আপনার দুঃখের অবসান হইবে।' এই বলিয়া একটি শিকড় রাজার হাতে দিয়া পুনরায় বলিলেন,—'এই ঔষধটি বাটিয়া কিঞ্চিৎ মধু ও পানের রসের সহিত রাণীরা সেবন করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সুসন্তান হইবে। তবে আপনাকে এই সত্য করিতে হইবে যে, আমার পছন্দ মত একটি ছেলে আমি যখন আসিয়া চাহিব, তখনই আমাকে দিতে হইবে।' রাজা ভাবিলেন, মোটেই ছেলে নাই, সাতটি হইলে একটি না হয় দিবই। পরে প্রকাশ্যে বিনীত ভাবে বলিলেন,—'যে আজ্ঞে।'

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। রাজা শিকড় নিয়া রাণীদিগকে দিলেন ও তাহাদিগকে ঔষধ সেবনের নিয়ম বলিয়া দিলেন।

সকল রাণীর চেয়ে ছোট রাণীকেই রাজা বেশী ভালবাসেন। রাজার ভয়ে সতীনরা তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট রাখিলেও, অন্তরে সকলেই তাঁহার প্রতি কু-ভাব পোষণ করিতেন। ছোট রাণী যখন একটি পরিচারিকার সাংসারিক অভাব অনটনের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই অবসরে তাঁহার সতীনেরা ঔষধ সেবন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি সেখানে আসিয়া তাঁহাদের নিকট ঔষধ চাহিলেন। বড় রাণী বলিলেন—'তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, বোন! তোমাকে বলিয়াছিলাম, শীঘ্র আসিয়া ঔষধ খাইতে; তা' তুমি আর আসিলেই

না। আমরা শিল হইতে ঔষধ নিয়া খাইয়াই তাহার দিকে চাহিয়া দেখি, উহাতে ঔষধ নাই। তখন আমরা সকলেই আপশোস করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, শিল নোড়াতে এক-আধটুকু লাগিয়া আছেই; তাহাই তুমি জল দিয়া গুলিয়া খাও, তাহাতেই ফল হইবে।' ছোট রাণীর মনটা বড়ই সরল। তিনি তাঁহাদের কোন কথাই অবিশ্বাস করিলেন না। শিল নোড়া ধুইয়া যে ঔষধ মাখা জল পাইলেন, তাহাই তিনি ভক্তি করিয়া খাইলেন।

ঔষধ সেবনের পরই রাণীরা গর্ভবতী হইলেন। দশ মাস দশ দিন পর বড় রাণী ও তাঁহার পরবর্তী পাঁচ সতীন একটি করিয়া ছেলে প্রসব করিলেন। আর ছোট রাণী প্রসব করিলেন একটি শঙ্খ। ছেলেদের একটিও দেখিতে সুন্দর নয়। রাজা পুত্রদিগকে, চেহারা কুৎসিত হইলেও, দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। ছোট রাণী শঙ্খ প্রসব করায় রাজা ও অপরাপর সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

রাজকুমারদের জন্ম-সংবাদ রাজ্যের সর্বত্রই প্রচারিত হইল। এ শুভ সংবাদ যে শুনিল, সেই পুলকিত হইল। এই শুভ জন্ম তারিখ হইতে কয়েক দিন পর্যন্ত শত শত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ও অসংখ্য দীন-দুঃখীকে রাজা অকাতরে ধন-রত্নাদি দান করিলেন এবং প্রত্যেককে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন। এই কয়েকদিন ব্যাপিয়া নানাবিধ আমোদজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হইল।

শঙ্খ প্রসব করায় ছোট রাণীকে সকলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিল; এমন কি, রাজার ভালবাসায়ও তিনি বঞ্চিত হইলেন। সতীনেরা সদা সর্বদাই কারণে অকারণে তাঁহার প্রতি কু-ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যবাণে তাঁহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। সতীনদের উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, ছোট রাণী রাজার অনুমতি লইয়া শঙ্খটি সহ বাগানের মধ্যস্থ দালানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ছয় রাণীরই ছেলে হইল, তাঁহাদের সকলকেই রাজা আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুখের সীমা নাই। যাহা কখনও হয় নাই, তাহাই হইল ছোট রাণীর, তিনি প্রসব করিলেন একটি শঙ্খ! এজন্য তাঁহার মনে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। ইহার উপর আবার স্বামীর ঘৃণাভাজন হইয়া এবং সতীনদের উৎপীড়নে অধৈর্য হইয়া, তিনি এই স্থানে আসিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, দূরে সরিয়া আসিলেই বুঝি কতকটা শান্তি পাইবেন। কিন্তু

তাহা হইল কৈ? একাকী থাকিয়া তাঁহার মন আরও উতলা হইয়া পড়িল, তাঁহার আহারে রুচি নাই, শুইলে ঘুম হয় না। একলাটি বসিয়া শুধু নিজের দুরদৃষ্টের বিষয়ে চিন্তামগ্ন থাকেন। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। চিন্তায় চিন্তায় তাহার শরীর বড়ই খারাপ হইয়া পড়িল। দিন দিন শঙ্খটি বড় হইতে লাগিল।

ছোট রাণী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেন। তিনি দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলে দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেন; ভক্তি গদগদ চিত্তে বলিতেন,—'মা মঙ্গলচণ্ডী! এ দুঃখ যে আমার সহ্য হয় না। সন্তাপহারিণি! তোমার এ অধম সন্তানের মনের সন্তাপ দূর কর, মা।' যখন তিনি এইরূপ প্রার্থনায় রত থাকিতেন, তখন যেন তাঁহার মনের অস্থির ভাব একটু কমিয়া যাইত। তখন তাঁহার মনে হইত, মা মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় একদিন না একদিন এ অসহনীয় দুঃখ দূর হইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া তিনি জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজ দেহের প্রতি দৃক্‌পাত না করিলেও, শঙ্খটিকে বড়ই যত্নে রাখিতেন।

এইরূপে অনেক দিন চলিয়া গেল। একদিন তিনি খাবার প্রস্তুত করিয়া তাহা ভালরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া বাগানের পুকুরে গেলেন রোজকার মত স্নান করিতে। ফিরিয়া আসিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, কে যেন ঢাকনিটি সরাইয়া রাখিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনের কতকটা খাইয়াছে। ইহার পর প্রত্যহই এইরূপ ঘটিতে লাগিল। ক্রমাগত কয়েক দিন এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল। কে যে এ কাজ করে, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন তিনি এরূপভাবে খাবার ঢাকিয়া রাখিলেন এবং স্নান করিতে যাইবার ভাণ করিয়া, বারান্দায় আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ঘরের ভিতর কি হয় তাহা দেখিবার জন্য জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল পরেই তিনি দেখিতে পাইলেন, শঙ্খের ভিতর হইতে একটি পরম সুন্দর ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া ঢাক্‌নিটি সরাইয়া রাখিয়া খাইতে বসিয়া গেল। দেখিয়া রাণীর চিত্ত পুলকে শিহরিয়া উঠিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ তিনি ঘরে ঢুকিয়াই ছেলেটিকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং কোলে লইয়া আদর করিয়া বলিলেন—'সোনার চাঁদ ছেলে আমার, তুই থাক্‌তে আমার এত দুর্দশা! এমন করে তুই আমায় এতদিন ফাঁকি দিয়াছিস? আর তোকে আমি ছাড়ব না।' এই বলিয়া তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় আপন পুত্রকে নিজ হাতে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া তিনি শঙ্খটি ভাঙ্গিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া রাজপুত্র ভীতকণ্ঠে বলিলেন—'মা, তুমি এ কি করিলে? এখনই যে সন্ন্যাসীর মাথায় টনক নড়িবে।'

আপন সন্তানের মুখে মা ডাক শুনিয়া রাণীর চিত্ত আনন্দ রসে আপ্লুত হইল। তিনি বলিলেন,—'বাছা! আর কি ইহা তোমার চোখের সামনে রেখে দিতে পারি? শঙ্খটি থাকলে আবার যদি তুই ঐটির ভিতর প্রবেশ করিস, এই ভয়েই উহা ফেলে দিলাম।'

মাতা পুত্রে এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছিল। ঠিক এই সময়ে রাজবাড়ীর এক ভৃত্য বাগিচার ভিতর কোন কাজে আসিয়াছিল। ঐ স্থান দিয়া যাইবার সময় এই অভিনব দৃশ্য তাহার নজরে পড়িল। দেখিয়াই সে দৌড়াইয়া গিয়া রাজাকে এই শুভ সংবাদ দিল। রাজা তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ছোট রাণীর ক্রোড়ে এমন সুন্দর ছেলে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। রাণী পুলকিত মনে কুমারকে রাজার ক্রোড়ে দিলেন। রাজা ছেলেকে ক্রোড়ে লইয়া রাণীর হাত ধরিয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই সংবাদ তখনই রাজ্যময় প্রচারিত হইয়া পড়িল। দূর দূরান্তর হইতে দলে দলে নরনারীবৃন্দ কুমারকে দেখিতে আসিতে লাগিল। সুরূপ সুসন্তানের জননী ছোট রাণীকে রাজা আবার পূর্বের মত ভালবাসিতে লাগিলেন। এই পুত্রকেই ভবিষ্যতে যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত করা হইবে ইহাই রাজা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

রাজা এখন পরম সুখী। রাজপুত্রদের বয়স এখন পাঁচ বৎসরের অধিক হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে তাহাদের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল; মুখমণ্ডলে সে প্রফুল্ল ভাব তখনই অন্তর্হিত হইল। ভয়ে ভয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—'মহারাজ! এখনই আমার পছন্দমত আপনার একটা ছেলে আমাকে দান করিয়া আপনার সত্য রক্ষা করুন।' রাজা কুমারদিগকে তথায় আনাইলেন। সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে ছোট রাণীর পুত্র শঙ্খকুমারকে পছন্দ

করিলেন। রাজা বিনীত ভাবে বলিলেন,—'ঠাকুর! আপনি শঙ্খকুমারের পরিবর্ত্তে আর যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ করুন।' সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কিছুতেই তাহা হইতে পারে না। এইটিকেই আমি চাই।' এই বলিয়াই তিনি কুমারকে লইয়া রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার অনেকক্ষণ পর ছোট রাণী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিতে পাইলেন। শুনিবামাত্রই তিনি কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। তখন তিনি সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'মা! তোমার কৃপায় পুত্র-ধন লাভ করিয়াছিলাম, আমার নয়নের মণি শঙ্খকুমারকে হঠাৎ সন্ন্যাসী আসিয়া আমার অলক্ষ্যে লইয়া চলিয়া গেল! পূর্ব্বজন্মে না জানি কি মহাপাপ করিয়াছিলাম; সেই পাপের ফলেই কি এইজন্মে আমি পুত্র পাইয়াও হারাইলাম! আমার শঙ্খকুমারকে আমায় ফিরাইয়া দাও, মা।' ইহার পরই তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন শূন্য হইতে বলিলেন—'ভয় নাই, ছোট রাণী! কিছুকাল ধৈর্য ধরিয়া থাক। তোমার পুত্র তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবেই।' রাজবাড়ীর প্রধানা মহিলারা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—'মা! তুমি যখন সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিয়া থাক, তখন নিশ্চয়ই তুমি দেবীর কৃপায় শঙ্খকুমারকে ফিরিয়া পাইবে।' ছোটরাণী কতকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং দেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'আমার শঙ্খকুমার যেখানেই গিয়া থাক, তাহাকে তুমি রক্ষা করিও, মা! বাছা যেন মঙ্গলমত শীঘ্র ফিরিয়া আইসে।'

রাজা ও ছোটরাণী শঙ্খকুমারের বিরহে সদাই বিষণ্ণ। শঙ্খকুমার রূপে গুণে সকল বিষয়েই তাহার ভাইদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এমন যে রত্ন ছেলে, তাহাকেই লইয়া গেল সন্ন্যাসী। রাজার চেয়ে রাণীর কষ্ট বেশী। কেন না, রাজার এখনও ছয় পুত্র বর্ত্তমান; তাহার মধ্যে সবে ধন নীলমণি শঙ্খকুমার তাঁহার চক্ষের আড়ালে, দূরে—বহুদূরে। মায়ের কাছে পুত্র হইতে প্রিয়তর আর কি আছে? সেই সন্তানকে কেহ যদি মায়ের কাছ ছাড়া করিয়া লইয়া যায়, তবে কি তাহার মন স্থির থাকিতে পারে? শঙ্খকুমার চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই ছোটরাণীর খাওয়া পরার সাধ মিটিয়া গেল। কোথায় বা গেল সেই অপরূপ রূপ। রাজা আসিয়া সাধ্য সাধনা না করিলে তাঁহার স্নান, আহার কিছুই হইত না। শঙ্খকুমারের কথা ভিন্ন তাঁহার অন্য কথা নাই, শঙ্খকুমারের চিন্তা ছাড়া তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। চিন্তায় চিন্তায় তাঁহার

প্রায় সারারাত্র অতিবাহিত হয়; যদিও বা কখনও একটু তন্দ্রার ভাব আইসে, সেই তন্দ্রার ঘোরেও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শঙ্খকুমারকে দেখেন।

এদিকে সন্ন্যাসীর সঙ্গে রাজকুমার যন্ত্রচালিতের ন্যায় হাঁটিয়া চলিল। পথে পিতা, মাতা ও অন্যান্য পরিজনের কথা তাহার পুনঃ পুনঃ মনে পড়ায়, সে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল। সে জননীর নিকট শুনিয়াছিল, দেবী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিলে যে কোন সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। তাই সে এই বিপদকালে ভক্তি সহকারে দেবীর নাম স্মরণ করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিল। তাঁহারা কয়েকদিন ধরিয়া কত নগর-পল্লী, নদ-নদী, বিস্তৃত ময়দান ও গহন বন যে অতিক্রম করিলেন, তাহার অন্ত নাই। অবশেষে তাঁহারা খুব বড় একটা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর আদেশে কুমার তাঁহার হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া রহিল। আবার আদেশ পাইয়া নয়ন মেলিয়া দেখিতে পাইল, তাহারা নদীর অপর পারে পৌছিয়াছে। এপারে গ্রাম নগর কিছুই নাই, আছে শুধু সুদূর বিস্তৃত বিজন বন। বন্য পথ অতিশয় অপ্রশস্ত; দুই ধারে ছোট বড় নানা জাতীয় তরুলতা। গাছের শাখার শাখায়, পাতায় পাতায় এত মিশামিশি যে, চন্দ্র সূর্যের কিরণ প্রবেশের পথটিও যেন কোথাও নাই। এই বনে প্রবেশ করিলে দিবসও রজনী বলিয়া ভ্রম হয়। রাজপুত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কোথাও জন-মানবের সাড়া শব্দও পাইল না; কিন্তু নানা জাতীয় পশু-পক্ষীর কোমল গম্ভীর রব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। হাঁটিতে হাঁটিতে পরিশেষে তাঁহারা এক অপরিসর প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। ইহার এক প্রান্তে শঙ্খকুমার এক মন্দির দেখিতে পাইলেন। মন্দিরের চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা; ভিতরে আরও ঘর আছে। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলেন। কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা স্নান করিয়া আসিলেন। রাজপুত্রকে নিজের ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সন্ন্যাসী পূজার জিনিসপত্র যোগাড় করিতে গেলেন। যাইবার পূর্বে তিনি তাহাকে বলিয়া গেলেন,—'তুমি এই গৃহের এক উত্তরদিক ছাড়া আর সব দিকই ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে পার।'

উত্তর দিকের কোন কিছু দেখিতে নিষেধ করায় রাজপুত্রের সন্দেহ হইল এবং এই দিকটাই তাহার আগে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। তাই সে সেই দিকেই প্রথম লক্ষ্য করিল এবং দ্বার খুলিয়াই দেখিতে পাইল, একটি রক্তের পুকুরে অনেকগুলি মনুষ্যের মুণ্ড পদ্মের মত ভাসিতেছে, দেখিয়াই সে অবাক্

হইল, বিস্মিত রাজপুত্রকে দেখিয়া মুণ্ডগুলি খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। কাটা মাথা, তাহাও আবার হাসে! ইহা ভাবিয়া শঙ্খকুমারের আশ্চর্যের সীমা রহিল না। সে মাথাগুলিকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমরা কেন আমাকে দেখিয়াই হাসিতেছ?' মুণ্ডগুলি সব সমস্বরে বলিল,—'হাঁ, তোমারও যে আজ আমাদেরই মত অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। মন্দিরে যে কালী আছেন, তাঁহার সম্মুখে সন্ন্যাসী আমাদিগকে বলি দিয়াছেন। আমরা একশত সাতটি। মায়ের সম্মুখে আর একটি বলি দিতে পারিলেই তিনি সিদ্ধ হইবেন।' ইহা শুনিয়া রাজপুত্র ভীত হইল এবং ভক্তিভরে দেবী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর নাম স্মরণ করিতে লাগিল।

তখনও সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসেন নাই। শঙ্খকুমার হাঁটিতে হাঁটিতে মন্দিরের দরজার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেবীকে দর্শন করিয়া করজোড়ে বলিল,—'মা! এই সঙ্কট হইতে তোমার এ অধম সন্তানকে উদ্ধার কর।' দেবী কুমারের প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'শঙ্খকুমার! তোমার কোন ভয় নাই। সন্ন্যাসী যখন তোমায় আমাকে প্রণাম করিতে বলিবেন, তখন তুমি বলিও যে, প্রণাম কি ভাবে করিতে হয়, তাহা তুমি জান না। তারপর সে যখন নিজে প্রণাম করিয়া দেখাইয়া দিবে, তখনই তুমি আমার হাতের তরবারি লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, ইহার পর আমার পাদোদক লইয়া কাটা মুণ্ডগুলির উপর ছিটাইয়া দিও, উহারা বাঁচিয়া উঠিবে।' মায়ের অমৃত-মাখা কথা শুনিয়া রাজপুত্রের মনের ভয় দূর হইল—পুনরায় যাইয়া সন্ন্যাসীর ঘরে বসিয়া রহিল।

কিছুকাল পর সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিলেন এবং শঙ্খকুমারকে বলিলেন,—'আমি এখন দেবীর পূজা আরম্ভ করিব। যখন তোমাকে ডাক দিব, তখন তুমি সেখানে উপস্থিত হইও।' এই বলিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া পূজা আরম্ভ করিলেন। যথাকালে তাঁহার আহ্বানে রাজপুত্র তথায় উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—'শঙ্খকুমার! দেবীকে প্রণাম কর।' শঙ্খকুমার দেবীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিল—'প্রণাম? কি ভাবে প্রণাম করিতে হয় তাহা ত' আমি জানি না, আপনি দেখাইয়া দিন।' ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ঐ অবস্থাতেই বলিলেন—'কেমন দেখিলে ত?' 'আর একটু কাল ঐ ভাবে থাকুন, ভাল করিয়া দেখিয়া লই।' বলিয়াই কুমার দেবীর হাতের অসি লইয়া সন্ন্যাসীর মাথাটি কাটিয়া ফেলিল। তৎপর দেবীকে সাষ্টাঙ্গে

প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক লইয়া সেই মুণ্ডগুলির উপর ছিটাইয়া দিল। অমনি সমস্ত মাথাই নিজ নিজ দেহ-সংযুক্ত হইল, সকলেই বাঁচিয়া উঠিল। শঙ্খকুমার তাহাদের পরিচয় লইয়া জানিল, তাহারা সকলেই রাজপুত্র।

রাজপুত্রগণ সেদিন সেইখানে পরমানন্দে যাপন করিল। সকলেই স্থির করিল, পরদিন তাহারা নিজ নিজ গৃহে গমন করিবে। শঙ্খকুমারের চিন্তা হইল, ইহার পর প্রতিদিন দেবীর পূজা হইবে কি রূপে? পরদিন সকালে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইয়াই সে দেখিতে পাইল, দেবীর দিকে মুখ করিয়া বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন এক শান্তমূর্তি ব্রাহ্মণ। তাঁহার তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি ধীর স্বরে বলিলেন, 'অদ্য অতি প্রত্যূষে সেই দস্যু প্রকৃতির সন্ন্যাসীর নিধন সংবাদ অবগত হইয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার আন্তরিক ইচ্ছা প্রত্যহ দেবীর পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।' শঙ্খকুমার ভাবিল, সকলই দেবীর ইচ্ছায় হইয়া থাকে। একে একে সকল রাজপুত্রই সেখানে উপস্থিত হইল। সকলেই দেবীকে ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। দেবীর কৃপায় রাজপুত্রেরা সকলেই নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে উপস্থিত হইল।

ছোটরাণী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছিলেন। ব্রত শেষে বাহিরে আসিবা মাত্রই তিনি দেখিতে পাইলেন, শঙ্খকুমার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া তিনি পরম পুলকিত হইলেন এবং তখনই ঘট হইতে নির্মাল্য আনিয়া পুত্রের মাথায় দিলেন। ইহার পর শঙ্খকুমার পিতা, বিমাতা ও অপরাপর সকলের সঙ্গে দেখা করিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

ইহার পর কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। রাজপুত্রদের বিবাহের বয়স হইল। নানা স্থান হইতে ঘটক আসিয়া সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। রাজা পাত্রী নির্বাচন করিয়া এক শুভদিনে মহাসমারোহে সাত পুত্রকে বিবাহ করাইলেন।

ছোটরাণী যথাকালে খুব ঘটা করিয়া সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিলেন। দেবীর কৃপায় যে তিনি পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল। ক্রমে ক্রমে দেবীর মাহাত্ম্য দূর দূরান্তরে প্রচারিত হইল। রাজা দেবীর পরম ভক্ত বলিয়া সকলেই জানিতে পারিল। তিনি পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।'

(যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ঢাকা জিলা হইতে সংগৃহীত, 'অর্চনা', চৈত্র, ১৩৩৩)

মন্তব্য

এখানে যে অভিপ্রায়গুলি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ-যোগ্য পুনর্জীবন দান (Resuscitation E0-E199). এখানে অবশ্য পাদোদক ছিটাইয়া দিয়া নরমুণ্ডগুলির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের কথা আছে ; কিন্তু অন্যত্র নিহত সন্ন্যাসীর রক্ত ছিটাইয়া দিয়া রাজপুত্রদিগকে পুনর্জীবন দানের কথা আছে, ইহাই প্রাচীনতর বলিয়া মনে হয়। রক্ত দ্বারা জীবন দান লোক-কথার একটি প্রধান অভিপ্রায় (E113). তারপর ইহাতে অন্যান্য সাধারণ কতকগুলি অভিপ্রায়ও আছে, যেমন ছোটরাণী, রাজার বিজয়ী ছোট ছেলে, নারীগর্ভে শঙ্খশিশুর জন্ম ইত্যাদি।

তবে ইহাতে একটি বিশেষ অভিপ্রায়ও প্রকাশ পাইয়াছে, শঙ্খকুমার গল্প গোষ্ঠীর অন্য কোথাও ইহা নাই। সন্ন্যাসী শঙ্খকুমারকে একটি নদী পার হইবার সময় তাহার চোখ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আরব্য উপন্যাসের আলিবাবা ও চল্লিশ-জন দস্যুর কাহিনীতে মর্জিয়ানা দর্জির চোখ বাঁধিয়া তাহার প্রভুর গৃহে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল। এই উভয় ক্ষেত্রে ইহাদের উদ্দেশ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা নহে। প্রথম ক্ষেত্রে নদী পার হইবার উপায় জানিয়া নিজে হইতে যাহাতে শঙ্খকুমার পলাইতে না পারে, সেজন্য তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্জির নিকট মর্জিয়ানার প্রভুর গৃহের গোপনতা রক্ষা করিবার জন্য তাহার চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পথের গোপনতা রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থার অবলম্বন লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়।

মৃত রাজপুত্রদিগের মুণ্ডের সংখ্যা শঙ্খকুমার গল্পগোষ্ঠীতে কোথাও সাত, কোথাও একশত সাত। কোথাও আটটি নরবলিতে সিদ্ধি, কোথাও ১০৮টি নরবলিতে সিদ্ধি। উভয়ই প্রথা-সম্মত। এখানে দেবী সন্ন্যাসীকে কি ভাবে বধ করিতে হইবে, তাহার উপায় বলিতেছেন, অন্যত্র নরমুণ্ডগুলি এ'কথা বলিয়াছে। দেবী অপেক্ষা নরমুণ্ডগুলির পক্ষেই তাহা স্বাভাবিক।

শঙ্খনাথ

'এক দেশে এক রাজার সাত রাণী ছিল। কোন রাণীর ছেলেমেয়ে হয়নি ব'লে রাজা মনের দুঃখে থাকেন। একদিন সকালে রাজা দেখ্‌লেন, ঝাড়ুদার বাড়ী ঝাঁট্ দেয়নি। এই দেখে তিনি ঝাড়ুদারকে ধ'রে আন্‌বার জন্যে কোটালকে পাঠালেন।

কোটাল ঝাড়ুদারের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লে যে ঝাড়ুদার ভাত খাচ্ছে, তাই দেখে কোটাল জিজ্ঞেস ক'র্‌লে, "তুই আজ রাজবাড়ী ঝাঁট্ না দিয়ে ভাত খাচ্ছিস্?"

ঝাড়ুদার বল্‌লে, "কি ক'রব, হুজুর! ওই আঁট্‌কুড়ো রাজার মুখ দেখে আমার দিনের বেলায় কোনদিন ভাত জোটেনি, সেইজন্য আজ খেয়ে যাচ্ছি।" এই কথা শুনে কোটাল রেগে গিয়ে রাজাকে সব বল্‌লে রাজার শুনে ভারি দুঃখ হ'ল, আর কাউকে মুখ দেখাবেন না ব'লে ঘরে দোর দিয়ে রইলেন।

এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে ডাক্‌লেন। রাজা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। আস্‌তেই সন্ন্যাসী বল্‌লে, "আর তোকে ভাবতে হবে না, এইবার তোর ছেলে হবে।" এই ব'লে একটি শেকড় দিয়ে বললেন, "এইটে বেটে রাণীদের খেতে বল্, তা হ'লেই সাত রাণীর সাত ছেলে হবে। আর যে ছেলেটি সব চেয়ে ভাল হবে, সেইটি আমাকে দিতে হবে।" এই বলে সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন।

রাণীরা সেই শেকড় বেটে খেলে; এমন সময় ছোটরাণী এসে বল্‌লে, "কই আমায় ত দিলে না?" তখন রাণীরা বল্‌লে, "ওই যা! ভুলে গেছি! তা তুই শিলটা ধুয়ে খা, তা হ'লেই হবে!"

ভাল মানুষ ছোটরাণী, কাজেই তাদের কথামত তাই খেলে।

তারপর সকলের গর্ভ হ'ল, দশমাস দশদিনে সবাই প্রসব ক'রলে, কিন্তু ছেলেরা কেউ বা কালা, কেউ বা খোঁড়া এই রকম হ'ল। আর ছোটরাণী একটি শাঁখ প্রসব ক'রলে। রাজা তাই দেখে ছোটরাণীকে ত্যাগ ক'রলেন।

ছোট রাণী মনের দুঃখে একটি কুঁড়েতে সেই শাঁখ নিয়ে বাস করতে লাগ্‌লো। রাত্রে ছোট রাণীর মনে হ'তো কে যেন তার মাই খাচ্ছে; কিন্তু জেগে উঠে কিছুই দেখতে পেত না।

একদিন ছোটরাণী রাত্রে ঘুমবার ভাণ ক'রে শুয়ে ছিল। খানিক পরে দেখলে, শাঁখের ভেতর থেকে একটি সুন্দর ছেলে বেরিয়ে এলো। তাই না দেখে ছোট রাণী তাড়াতাড়ি উঠে সেই ছেলেকে বুকে ক'রে নিয়ে শাঁখটা ভেঙ্গে দিলে, দিয়ে বললে "আমি তোমায় ছাড়্‌ব না।"

ছেলেটি বল্‌লে, "মা, তুমি কি করলে? সেই সন্ন্যাসী আমায় এইবার এসে নিয়ে যাবে।" রাণীর ভারী ভাবনা হ'ল। সকাল হ'তেই রাজার কাছে গিয়ে সব কথা ব'লে ছেলে কোলে দিলে। দিতেই রাজা রাণীকে ব'ললেন, "আমি তোমায় ভুল ক'রে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এই ব'লে রাণীকে ঘরে নিয়ে গেলেন।

বার বছর পরে সেই সন্ন্যাসী ফিরে এলো; এসে ছেলে চাইলে। রাজা ছয় ছেলেকে নিয়ে এসে ব'ললেন, "এই ছয় রাণীর ছয় ছেলে, আর ছোট রাণীর একটি শাঁখ হয়েছে। আপনি এর মধ্যে যাকে পছন্দ হয়, নিন্‌।"

সন্ন্যাসী বললেন, "না এরা ত কেহই সুন্দর নয়"—এই ব'লে একটি শাঁখ বাজিয়ে ডাকলেন, কৈ আমার শঙ্খনাথ কৈ?"

সন্ন্যাসী ডাক্‌তেই ছোট রাণীর ছেলেটি ছুটে এল। তখন সন্ন্যাসী ব'ললেন, "আপনি আমাকে ঠকাবার মতলব ক'চ্ছিলেন; এই ছেলেকে আমার চাই।" এই ব'লে সন্ন্যাসী ছেলে নিয়ে চ'লে গেলেন। রাজা-রাণী চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে লাগলেন।

রাণীর কান্নাতে পাড়ার মেয়েরা রাজ-বাটীতে ছুটে এল। তার ভেতর থেকে একজন গিন্নী সব কথা শুনে ছোট রাণীকে ব'ললেন, "মা, তুমি সঙ্কটার ব্রত কর, তাহ'লেই ছেলে ঘরে ফিরে আসবে।"

রাণী সেই কথা শুনে শুক্রবারে সমস্ত দিন উপোস ক'রে একমনে সঙ্কটার পূজো করতে লাগলো।

ওদিকে সন্ন্যাসী শঙ্খনাথকে পথে যেতে যেতে বললেন, "দেখ, বনের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে, সেখানে ভারি বাঘ ভালুক আছে; কিন্তু খুব শীগ্‌গির যাওয়া যায়। আর যে একটা ভাল পথ আছে, সেটা দিয়ে গেলে বড্ড দেরী হয়। তুমি কোন্‌টা দিয়ে যাবে?"

শঙ্খনাথ বল্‌লে, "আমি রাজার ছেলে, আমার ভয় কিছু নেই। আমি বনের ভেতর দিয়ে যাব।"

সন্ন্যাসী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সেই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। খানিক দূরে একটি

কালী-মন্দিরের কাছে একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি কাপড় জামা ছেড়ে স্নান ক'রে এসো, মায়ের পুজো করতে হবে।"

স্নান ক'রে শঙ্খনাথকে কুঁড়ে ঘরে বস্‌তে বললেন, আর দক্ষিণ দিকের দরজা খুলতে বারণ ক'রে দিয়ে সন্ন্যাসী কালীপুজো করতে গেলেন।

শঙ্খনাথের মনে সন্দেহ হ'ল। সে সেই দক্ষিণ দিকের দরজা আস্তে খুললে; খুলে দেখলে যে, একটা রক্তের পুকুরে অনেক মড়ার মুণ্ডু ভাস্‌ছে। সেই মুণ্ডুগুলো তাকে দেখেই হেসে উঠলো।

শঙ্খনাথ জিজ্ঞেস করলে, "তোমরা হাস্‌ছো কেন, আর তোমরা কারা?" মুণ্ডুগুলো বল্‌লে, "আমরাও রাজপুত্র, এই সন্ন্যাসী আমাদের কালীর কাছে বলি দিয়েছে, তোমাকেও আজ বলি দেবে।" শঙ্খনাথ বল্‌লে, "তবে উপায়?" মুণ্ডুরা বল্‌লে, "যদি আমাদের বাঁচাও, তবে বল্‌বো।" শঙ্খনাথ প্রতিজ্ঞা করলে।

তখন তারা বল্‌লে, "সন্ন্যাসী যখন তোমায় কালীর কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে ব'ল্‌বে, তখন তুমি বল্‌বে, 'আমি রাজার ছেলে, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানি না; আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।' সন্ন্যাসী তখন মাটিতে শুয়ে দেখিয়ে দেবে, আর তুমি তখনই খাঁড়া নিয়ে সন্ন্যাসীকে কেটে ফেল্‌বে, ফেলে তার রক্ত আর মায়ের ফুল আমাদের গায়ে ছড়িয়ে দেবে।"

শঙ্খনাথ সব কথা শুনে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে চুপ ক'রে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

খানিক পরে সন্ন্যাসী এসে শঙ্খনাথকে দেখে ভারি আনন্দিত হ'ল। ১০৭টা বলি শেষ হয়েছে, এইটে হ'লেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। শঙ্খনাথকে নিয়ে তিনি কালীর কাছে গেলেন, তারপর বল্‌লেন "মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে যাবে, চল।"

শঙ্খনাথ বল্‌লে, "আমি রাজার ছেলে, কি ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়, তা আমি জানি নে; আপনি আমায় দেখিয়ে দিন।"

সন্ন্যাসী যেমন মাটিতে সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে দেখালে, অমনি শঙ্খনাথ খাঁড়া নিয়ে দু'খান ক'রে মুণ্ডু কেটে ফেল্‌লে, ফেলেই সেই রক্ত আর মায়ের ফুল নিয়ে সেই মুণ্ডুগুলোর উপরে ছড়িয়ে দিলে।

তারা সবাই বেঁচে উঠে শঙ্খনাথকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো।

সেই দেশের রাজার কাছে এই কথা উঠলো। রাজা খুব আদর-যত্ন ক'রে

শঙ্খনাথকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে শঙ্খনাথের বিয়ে দিলেন। তারপর হাতী-ঘোড়া ধন-দৌলত দিয়ে মেয়ে-জামাইকে পাঠালেন। অন্য অন্য রাজপুত্রেরাও সঙ্গে চ'ললো।

এদিকে ছোটরাণী শুক্রবারে সঙ্কটার ব্রত ক'রে প্রণাম ক'রে উঠেছে, এমন সময় কে বললে, 'মা তোমার ছেলে বিয়ে করে বউ নিয়ে আস্‌ছে।' খবর পেয়ে রাজারাণী দৌড়ে গিয়ে ছেলে বউ বরণ করে ঘরে তুল্‌লেন। রাজপুত্রদের খাতির যত্ন করলেন।

তারপর শঙ্খনাথ তার সকল বিপদের কথা বল্লে, শুনে সকলে অবাক।

রাজরাণী তখন মহা ঘটা করে সঙ্কটার ব্রত কর্‌লেন। রাজপুত্রদের সকলকে এই ব্রত কর্‌তে বলে দিলেন।

ছোটরাণী বেটা বউয়ের মাথায় সঙ্কটার অর্ঘ্য ছুঁইয়ে দিলেন। রাজা তাঁর সকলকেই এই ব্রত করবার হুকুম দিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই যে যার রাজ্যে চলে গেল।

ক্রমে মা সঙ্কটার ব্রত-কথা দেশে প্রচার হ'ল। সকলেই বাঞ্ছিত বর লাভ করতে লাগল।'

(২৪ পরগণা জেলা হইতে সংগৃহীত, শ্রীআশুতোষ মজুমদার 'মেয়েদের ব্রতকথা' কলিকাতা, ১৩৫৩)

মন্তব্য

এই কথাটিতে সাধারণতঃ যে সকল অভিপ্রায় আছে, তাহা পুর্ববর্তী কথাটির অভিপ্রায়গুলির প্রায় অনুরূপ। সন্ন্যাসী প্রদত্ত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গাছের শিকড় খাইয়া রাণীরা এখানে গর্ভবতী হইয়াছেন। প্রতারিতা কনিষ্ঠা রাণীও স্বাভাবিক ভাবে শিকড়টি খাইতে না পারিয়া শিল নোড়া ধোয়া জল খাইয়া গর্ভবতী হইয়াছেন এবং তাহার পুত্রই সর্বশেষে বিজয়ী হইয়াছেন (Successful youngest son)। কিন্তু এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে, সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন গাছের শিকড় যথারীতি খাওয়া সত্বেও অন্যান্য রাণীগণ স্বাভাবিক সন্তান প্রসব করিবার পরিবর্তে কেউ বা কালা, কেউ কানা, কেউ বা খোঁড়া এই প্রকার সন্তান কেন প্রসব করিলেন? এখানে একটু নীতি কথা আসিয়াছে। ছোট রাণীকে প্রতারণা করিবার জন্যই তাহাদের

সন্তানদিগের মধ্যে এই সকল ত্রুটি দেখা দিয়াছে। ইহাতে নৈতিক শাসনের কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই কথাটিতে একটি বাধা-নিষেধের (taboo) অভিপ্রায় আছে, পূর্ববর্তী কাহিনীতে তাহা নাই। শঙ্খনাথকে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলিতে বারণ করিবার মধ্যে এই অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু পূর্ববর্তী কাহিনীটিতে তাহাকে উত্তরদিকে যাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। বাঙ্গালী হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী দক্ষিণ দিক যমের দিক, উত্তর দিকের অধিপতি ধনপতি কুবের। তবে জনশ্রুতি অনুযায়ী মৃতের শির উত্তর দিকে স্থাপন করা হয়। ইহাতে মনে হয়, পুরাণ অনুযায়ী দক্ষিণ দিকে যমের অধিকার থাকিলেও জনশ্রুতি অনুযায়ী উত্তর দিকের অধিপতি যম। মনসার ব্রতকথায় যে একটি বাধানিষেধের কথা আছে, তাহাতে দেখা যায়, দক্ষিণ দিক নিষিদ্ধ দিক। যাই হউক, উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় দিকই নিষিদ্ধ (taboo) দিক হইতে পারে, বাংলার লোক-শ্রুতিতে দুই প্রকারই ব্যবহার রহিয়াছে। পরে শঙ্খকুমার-গোষ্ঠীর আর একটি কাহিনীতে পশ্চিম দিককে নিষিদ্ধ দিক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার নিদর্শন বিরল। বাধা-নিষেধের অভিপ্রায় বিষয়ে অন্যান্য কাহিনীতে যেমন দেখা যায়, এখানে তাহাই হইয়াছে। অর্থাৎ ইহা ভঙ্গ করা হইয়াছে।

শঙ্খেশ্বর

'এক রাজা ও তার সাত রাণী। রাজার কোন সন্তান নাই। মনোদুঃখে সে কাল কাটায়। রাজবাড়ীর মালী প্রত্যূষে রাজবাড়ী ঝাঁট দেয়; কিন্তু মালীর দুঃখ দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আর একদিন মালিনী বলিল, 'কাল হইতে এক প্রহরের পুর্বে রাজবাড়ী যাইতে পারিবে না। ঘুম হইতে উঠিয়াই আঁটকুড়ে রাজাকে দেখে, আর আমাদের দুঃখ লাগিয়াই থাকে।' পরদিন সকালে মালীকে না দেখিয়া রাজা লোক পাঠাইলেন। মালিনী ঐ লোককে বলিয়া দিল, 'আঁটকুড়ে রাজাকে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলে কোন কাজ হয় না। আরও দেরীতে রাজবাড়ী যাইবে।' এই কথা শুনিয়া রাজা মর্মাহত হইয়া দুয়ার দিয়া শুইলেন। সমস্ত কার্য মন্ত্রীই চালাইতেছেন। এইরূপে তিন দিবস আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাজা শয্যাশায়ী ছিলেন। চতুর্থ দিবসে এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার দর্শন মাগিল। সকলেই সন্ন্যাসীকে নিষেধ করিল; কিন্তু সন্ন্যাসী জিদ আরম্ভ করায় অনেক আহ্বানের পর রাজা দরজা খুলিলেন। রাজার সঙ্গে আলাপে সন্ন্যাসী সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, রাজাকে সঙ্গে করিয়া এক কদলী বৃক্ষের নিম্নে গমন করিলেন। সেস্থানে রাজা, সন্ন্যাসী কর্তৃক কদলী-গুচ্ছ হইতে এক আঘাতে একটি কলা বিচ্ছিন্ন করিতে আদিষ্ট হইলেন। রাজা তদনুসারে কাজ করায় একটি কলা ভূপতিত হইল। সন্ন্যাসী তাহা সমস্ত রাণীকে খাওয়াইতে বলিলেন। 'এই কদলী ভক্ষণেই রাণীদের গর্ভ সঞ্চার হইবে'; এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী রাজাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, ছোট রাণীর সন্তান তিনি নিয়া যাইবেন।

সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলে রাণীরা কদলী ভক্ষণ করিলেন। ছোট রাণী সে সময় ঘাটে গিয়াছিলেন। দাসী ছোট রাণীকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, ছোটরাণী দৌড়িয়া আসিল। ইতিমধ্যেই সকলে কদলী ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছেন। ছোট রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বক্কল কোথায়'? রাণীরা বলিলেন, 'এঁটোলে নিক্ষেপ করিয়াছি।' ছোটরাণী সেই বক্কলটি কুড়াইয়া ভক্ষণ করিলেন। সুসময়ে সকলেরই পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইল। ছোটরাণীর গর্ভ হইতে একটি শঙ্খ জন্মগ্রহণ করিল। ছোটরাণী তাহার নাম শঙ্খেশ্বর রাখিলেন। রাজা ছোটরাণীর প্রতি অবহেলা আরম্ভ করিলেন। তাহাকে ভিন্ন এক গৃহে থাকিতে অনুমতি

দিলেন। রাজার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই তাহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিল। মনের দুঃখ মনে লুকাইয়া, ছোটরাণী পৃথক্ গৃহে শঙ্খেশ্বরকে লইয়া থাকে, স্নান করায়, খাওয়ায়। প্রতি মঙ্গলবার গোপনে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করেন। গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে, শঙ্খের মধ্য ইহতে এক সুন্দর ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া রাণীর স্তন্য পান করে ও প্রভাতের সঙ্গেই শঙ্খের মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপে বার বৎসর অতীত হইল। ছোটরাণীর দুঃখের সীমা নাই। বার বৎসর অতীত হইলে ঐ সন্ন্যাসী আসিয়া ছোটরাণীর সন্তান প্রার্থনা করিল। রাজা রাণীকে কাঁদাইয়া, জোর করিয়া শঙ্খটি দিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী শঙ্খেশ্বর বলিয়া ডাকিতেই একটি রাজপুত্রের ন্যায় সুন্দর কুমার শঙ্খ হইতে বাহির হইয়া পিছনে পিছনে রওনা হইল। এদিকে ছোটরাণী চীৎকার করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যাইতে যাইতে বহুদূর গমন করিল এবং ভিন্ন রাজ্যে গভীর জঙ্গলে এক শ্মশানে উপস্থিত হইল। শঙ্খেশ্বর সেখানে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইল। চারিদিকে মরার মাথা, তাহাকে দেখিয়া খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই সমস্ত দেখিয়া তাহার ভীতির সঞ্চার হইল।

শঙ্খেশ্বর পূজার ফুল তোলে, আছে, খায়। এইরূপে এক অমাবস্যার রাত্রি উপস্থিত। সন্ন্যাসী অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করে। সাতটি হইয়াছে। এইটি সম্পাদন হইলে অষ্ট-সিদ্ধি পূর্ণ হয়। এই দিকে গভীর রাত্রে শঙ্খেশ্বর বলির সমস্ত আয়োজন দেখিয়া মনে মনে 'মা নাম' জপ করিতে লাগিল। মঙ্গলচণ্ডী দেবী গোপনে তাহাকে বলিয়া দিলেন, 'সন্ন্যাসী তোমাকে প্রণাম করিতে বলিবে। তুমি বলিবে প্রণাম কাহাকে বলে জানি না। এরূপ সময়ে সন্ন্যাসী নত হইয়া প্রণাম করিলে, খড়্গ দ্বারা তাহাকে বলি দিও।' কথানুসারে শঙ্খেশ্বর, সন্ন্যাসীকে বলি দিলে, রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িতেই তিন জন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। তখন মঙ্গলচণ্ডী কাণে কাণে শঙ্খেশ্বরকে বলিলেন, 'ডাইনে কাটিয়া বাঁ দিকে মোছ, আর তিনবার বল, সন্ন্যাসী, বিনাশ হও।' এইরূপে কার্য সমাপন করিলে সন্ন্যাসী বিনাশ প্রাপ্ত হইল। এদিকে ছোটরাণী মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রতি মঙ্গলবারে সম্পন্ন করায়, তাঁহার বরে শঙ্খেশ্বর ঐ ভিন্ন রাজ্যের রাজকন্যাকে বিবাহ করতঃ বহু দাস দাসী, মণিমুক্তা ও রাজকন্যা সহ নিজ রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। ছোটরাণীর দুঃখ দূর হইল। মায় পুতে সুখে বসবাস করিতে লাগিল।'

(প্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তী কর্তৃক মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ হইতে সংগৃহীত ; 'ব্রত ও আচার।')

মন্তব্য

ইহার মধ্যেও শঙ্খকুমার কাহিনীর অন্যান্য অভিপ্রায়গুলি সাধারণতঃ বর্তমান থাকিলেও একটি নূতন অভিপ্রায়ও আছে। তাহা নিহত শত্রুর রক্তবিন্দু হইতে তাহার তিনগুণ শত্রুর পুনর্জীবন লাভ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে রক্তবীজের কাহিনী আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। তবে ইহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে, একবিন্দু রক্ত হইতে এখানে মাত্র তিনজন সন্ন্যাসীরই জন্ম হইয়াছে ; কিন্তু পৌরাণিক কাহিনীতে দেখা যায়, প্রতি বিন্দুতে একজনের জন্ম হইয়া লক্ষ লক্ষ রক্তবীজের জন্ম হইয়াছিল।

এখানে অমাবস্যার রাত্রে যে অষ্টসিদ্ধি লাভের কথা আছে, তাহার মধ্যে অমাবস্যা তিথির ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং অষ্টসিদ্ধি বা magic knowledge-তেও সাধারণ লোক-বিশ্বাসেরই কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

এখানে যে বস্তুটি আহার করিয়া সাত রাণী গর্ভবতী হইলেন, তাহার মধ্যেও একটি অভিনবত্ব আছে—অন্যত্র অন্যান্য জিনিস আহার করিয়া গর্ভবতী হইলেও এখানে বাংলা দেশের সুপরিচিত ফল কদলী আহার করিয়া রাণীগণ গর্ভবতী হইয়াছেন। বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসে কদলীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। (দ্রষ্টব্য : Asutosh Bhattacharyya, On the cult of the Plantain, Tree and its ethnographical significance in Bengal.' The Quarterly Journal of the Mythic Society, Vol. XLI. No. 1, pp. 1—7) দুর্গাপূজার নবপত্রিকায় কদলীবৃক্ষ একটি বিশেষ স্থান লাভ করে। রম্ভাতৃতীয়া ব্রত একটি উল্লেখযোগ্য মেয়েলী ব্রত, কলাছড়া ব্রতও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয়, ষোলকলা ব্রত সধবা মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। অতএব দেখা যায়, বাঙ্গালী বহুকালাবধিই কদলীর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে বিশ্বাসী।

১৪

নরঘাতক সন্ন্যাসী

এক দেশের এক রাজা। রাজার রাজ্যে ধনদৌলত, পাত্র মিত্র কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু তবু রাজার মনে শান্তি নাই। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান নাই; এই দুঃখে সবাই মলিন। নিঃসন্তান রাজা অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই।

একদিন এক সন্ন্যাসী রাজাকে আসিয়া বলিলেন, 'আমার নিকট আশ্চর্য ঔষধ আছে তাহা সেবন করিলে রাণীর গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মিবে। কিন্তু যদি আপনি সেই সন্তানের মধ্যে একটি আমায় দেন, তবেই আমি ঔষধ দিতে পারি।'

রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং যথা সময়ে রাণীর এক অপরূপ রূপলাবণ্যবান্ পুত্র সন্তান জন্মিল। রাজপুত্রের রূপে রাজপুরী আলোকিত ও রাজা প্রজা সকলেই আনন্দিত হইল।

কিছুদিন পরে রাণীর আরও একটি পুত্রসন্তান হইল। উভয়েরই আকৃতি প্রকৃতি হুবহু এক।

ক্রমে তাহারা বড় হইতে লাগিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার দ্বারা তাহারা বিদ্যা শিক্ষা ও অস্ত্র শিক্ষায় অতি অল্প সময়েই পারদর্শিতা লাভ করিল।

বহু দিবস গত হইল, তবু সন্ন্যাসী আসিল না দেখিয়া সকলেই তাহার কথা বিস্মৃত হইল, কিন্তু দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদিন সহসা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দুইজন কুমারের মধ্যে একটিকে প্রার্থনা করিল।

রাজ্য মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু সন্ন্যাসীর কথায় কেহই আপত্তি করিতে সাহস করিল না। রাজা উভয় সন্তানকেই সমভাবে স্নেহ করিতেন; তাই খুব চিন্তায় পড়িলেন, অবশেষে কুমারদ্বয়ের উপরই মীমাংসার ভার দিলেন।

কনিষ্ঠ রাজকুমার বলিল, 'দাদা, তুমি পিতার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ, এ রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, আমিই সন্ন্যাসীর সহিত যাই।'

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন 'ভাই, তুমি ছোট, মার আনন্দ স্বরূপ। ইহা ব্যতীত তুমি কোন বিষয়েই আমার অপেক্ষা হীন নও। অতএব আমিই যাই।' অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর জ্যেষ্ঠ পুত্রের যাওয়াই স্থির হইল।

সন্ন্যাসী ও রাজকুমার কিছুদূর গিয়া এক জায়গায় দুইটি কুকুর ছানা ও একটি কুক্কুরী দেখিতে পাইল। একটি কুকুর ছানা রাজকুমারের সঙ্গ লইল। আরও কিছুদূর গিয়া তাহারা একটি পাখী ও তাহার দুইটি ছানা দেখিতে পাইল। একটি ছানা তাহাদের সঙ্গে চলিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বনের ভিতর একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'রাজকুমার, এই কুটীরেই আমাদের বাস করিতে হইবে। কাজের মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে ফুল তুলিয়া আমার পূজার সাহায্য করিবে। পশ্চিম দিকে যাওয়া ব্যতীত আর কোন কার্যেরই নিষেধ নাই।'

রাজকুমার প্রাতে ফুল তুলিতেন এবং সমস্ত দিন শিকার করিয়া বেড়াইতেন। একদিন রাজকুমার একটি হরিণের পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে সন্ন্যাসীর নির্দেশ ভুলিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। কিছুদূর গেলে পর অকস্মাৎ হরিণটি অদৃশ্য হইল; তৎপরিবর্তে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের দ্বারদেশে এক পরমাসুন্দরী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। রমণী অত্যন্ত নম্রস্বরে রাজকুমারকে বলিল, 'যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, আমার সহিত পাশাক্রীড়া করিয়া আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ করুন। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, খেলিবার পূর্বে যুবতী বলিল, 'তুমি যদি জয়লাভ কর, তবে আমি তোমার কুকুরের অনুরূপ একটি কুকুর দিব। যদি আমি জয়লাভ করি, তাহা হইলে তোমার কুকুর গ্রহণ করিব।'

রাজকুমার পরাজিত হইলে যুবতী সেই কুকুরকে অন্যস্থানে রাখিয়া পুনরায় খেলিতে আরম্ভ করিল। এবার রাজকুমার শুক পক্ষীটিকে বাজি রাখিলেন এবং তাহাকেও হারাইলেন। তৃতীয় বার রাজপুত্র আপনাকে পণ রাখিলেন এবং সে বারেও পরাজিত হইলেন। যুবতী রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

যুবতীটি আসলে রাক্ষসী। ছলে ভুলাইয়া মানুষকে ভক্ষণ করাই তাহার কাজ। সে দিন তাহার আহার শেষ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া রাজপুত্র সে দিন বাঁচিয়া গেলেন।

এ দিকে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রাজপুরী হইতে বিদায়ের পূর্বে স্বহস্তে রাজবাটীর প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া ভ্রাতাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, 'ভাই, যখন দেখিবে এই গাছ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তখন জানিবে আমি কোন বিপদে পড়িয়াছি। কনিষ্ঠ রাজপুত্র প্রতিদিনই সেই গাছটিকে লক্ষ্য করিতেন;

বৃক্ষটিকে শুষ্ক হইতে দেখিয়া কুমার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, তৎক্ষণাৎ মাতা-পিতার অনুমতি লইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে বনের দিকে গমন করিতেছেন, এমন সময় পথের পার্শ্বের কুকুর শাবকটি তাহাকে আসিয়া বলিল, 'আপনি আমার ভাইকে লইয়া গিয়াছেন, এখন আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলুন।'

কনিষ্ঠ রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের দুই ভাইয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্যই এই বিভ্রমের কারণ। এই কুকুর শাবক নিশ্চয়ই তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা বলিতেছে। তিনি শাবকটিকে সঙ্গে নিলেন।

আরও কিছু দূর যাইবার পর একটি পক্ষীশাবক তাহাকে আসিয়া বলিল, 'আপনি আমার বড় ভাইকে সঙ্গে লইয়াছেন, এখন আমাকেও লউন, আমরা একত্রে আপনার সেবা করিব।'

রাজপুত্র তাহাকেও সঙ্গে নিলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সন্ন্যাসীর কুটিরে উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসী মনে করিল জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রই ফিরিয়া আসিয়াছে; খুশী হইয়া সে বলিল, 'তোমাকে পশ্চিম দিকে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার নিষেধ না শুনিয়া সেই দিকে গিয়াছিলে, তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ।'

কনিষ্ঠ রাজপুত্র পরদিন প্রাতে সেই কুকুরশাবক ও পক্ষী শাবকটিকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিম দিকে রওয়ানা হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর একটি হরিণ দেখিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। হরিণটি কিয়ৎ দূর গমন করিয়া এক প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; রাজপুত্রও তাহার পশ্চাৎ গমন করিলেন। কিন্তু অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিয়া হরিণটিকে আর দেখিতে পাইলেন না। তৎপরিবর্তে এক পরমাসুন্দরী যুবতী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

যুবতী বিনম্র কণ্ঠে তাহাকে বলিল, 'আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি আসিয়াছেন, দয়া করিয়া আমার সহিত একবার পাশাক্রীড়া করিয়া যান।'

রাজপুত্র সম্মত হইলেন।

যুবতী খেলার জন্য প্রস্তুত হইল। প্রথমে সেই কুকুর শাবকটিকে পণ রাখিল। খেলায় রাজপুত্র জয়ী হইলেন, যুবতী তখন তাহার ভ্রাতার নিকট হইতে পাওয়া কুকুরশাবকটি আনিয়া দিল। দ্বিতীয় বারের খেলায়ও রাজপুত্র জয়ী হইয়া শুক পক্ষীটিকে উদ্ধার করিলেন; শেষ বারে যুবতী কহিল, 'যদি

হারি, তোমার অনুরূপ একটি মনুষ্য দিব। আর যদি জয়লাভ করি, তবে তোমাকে বন্দী করিব।

সেবারেও রাজপুত্র জয়ী হইলেন। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুবতী জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইল। দুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া প্রভূত আনন্দ পাইলেন; উদ্ধারের পর উভয়ে রাক্ষসীকে হত্যা করিবার সংকল্প করিলেন।

তখন রাক্ষসী প্রাণ ভয়ে বলিল 'আমাকে মারিও না, আমি এখন একটি গোপন কথা প্রকাশ করিব, তাহাতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র রক্ষা পাইবেন।'

রাজকুমারদ্বয় রাক্ষসীর কথায় সম্মত হইলে রাক্ষসী বলিল, 'ঐ সন্ন্যাসী একজন শক্তি-উপাসক। উহার আশ্রমের কাছেই একটা কালীমন্দির আছে। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা, সাতটি রাজকুমারকে বলি দিয়া মোক্ষ লাভ করে, ছয়টি রাজপুত্রকে এ পর্যন্ত বলি দিয়াছে। এখন এই জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে বলি দিতে পারিলে ইহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

রাক্ষসীর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য রাজপুত্রদ্বয় কালিকাদেবীর মন্দিরে গেলেন। দেখিলেন, সত্যই ছয়টি নরমুণ্ড পাশাপাশি রক্ষিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে দেখিয়া একটি মুণ্ড বলিয়া উঠিল, 'রাজকুমার! আমরা এখন ছয়টি মুণ্ড, আরও শীঘ্রই আরও একটি মিলিত হইয়া সাতটি হইব।' রাজপুত্রেরা ব্যাপারটি অনুধাবন করিতে পারিল না দেখিয়া তাহারা বলিল, 'সন্ন্যাসীর কার্য শীঘ্রই শেষ হইবে। তখন সে মন্দিরে আসিয়া তোমার মাথা কাটিয়া দেবীর পূজা সমাধান করিবে। তবে একটি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা সকলেই মুক্তি পাইবে।' রাজকুমারদ্বয় আগ্রহী হইয়া উপায় জানিতে চাহিলে তাহারা বলিল, যখন সন্ন্যাসী পূজাশেষে তোমাকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিতে বলিবে, তখন তুমি বলিবে যে আমি রাজকুমার, দণ্ডবৎ হইতে জানি না। তখন সন্ন্যাসী তোমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে দেখাইয়া দিবে। ইত্যবসরে তুমি মায়ের হাতের খড়্গ লইয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিবে।'

কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কার্য শেষ হইল। সে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে পূজা করিতে গেল, কনিষ্ঠ রাজপুত্রও গোপনে তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

পূজাশেষে সন্ন্যাসী রাজকুমারকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রমাণ করিতে বলিল। রাজকুমার বলিলেন, 'আমি রাজকুমার, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে জানি না,

আপনি দেখাইয়া দিলে পারিব।' সন্ন্যাসী প্রতিমার সম্মুখে যেই মাত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তখনি রাজকুমার প্রতিমার হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া এক আঘাতেই সন্ন্যাসীর মস্তক ছেদন করিলেন। নরমুণ্ডগুলি আন্তরিক খুশীতে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তাহারা জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে বলিল, 'রাজকুমার! আমাদের দেহের সহিত আমাদের মুণ্ডগুলি পরস্পর একত্রিত করিলে আমরা পুনর্জীবিত হইব।' তখন দুই ভ্রাতায় মিলিয়া নরমুণ্ডগুলির দেহ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকল দেহগুলি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা প্রত্যেকের দেহের সহিত প্রত্যেকের মস্তক সংযোজিত করিবা মাত্রই রাজপুত্রগণ পুনর্জীবন লাভ করিলেন। তখন সেই ছয় রাজপুত্র এই রাজপুত্রদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আপন আপন রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

বহুদিন পর রাজা ও রাণী দুই পুত্রকে একত্র লাভ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ পাইলেন।

মন্তব্য

এই কাহিনীটি শঙ্খকুমার কাহিনীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কয়েকটি বিষয়ে ইহার স্বাতন্ত্র্য বিশেষ লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ ইহাতে রাজা একপত্নীক, বহুপত্নীক নহেন। তারপর রাণী সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ খাইয়া শঙ্খ প্রসব করিবার পরিবর্তে স্বাভাবিক সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সন্তান এখানে একাধিক হইয়াছে; ইহারা প্রকৃত যমজ না হইলেও যমজের লক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্পর্ক বিষয়ক অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে। আত্মার বহির্মুখী বাস্তব রূপ (external soul) ইহার একটি নূতন অভিপ্রায়। বাকৃশক্তি সম্পন্ন (Speaking animal) ইহার আর একটি নূতন অভিপ্রায়। তবে শঙ্খকুমারের অন্যান্য কাহিনীর মত ইহাতে বাধা-নিষেধ (taboo) এবং রক্ত দ্বারা পুনর্জীবন দান অভিপ্রায়গুলি প্রকাশ পাইয়াছে। পুনর্জীবন দানের পদ্ধতিও লক্ষ্যণীয়। মৃতের অস্থিগুলি যথাযথ ভাবে একত্র করিয়া তাহাতেই জীবনদান করা হইয়াছে। লখীন্দর চরিত্রেরও এইভাবেই পুনর্জীবন দান করা হইয়াছে। রাজার এক পত্নী এবং রাণীর শঙ্খের পরিবর্তে স্বাভাবিক সন্তানের জন্মদানের মধ্যে আধুনিকতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ১০৮ কিংবা ৮টি নরবলির পরিবর্তে এখানে ৭টি নরবলিতে সিদ্ধির কথা বলা হইয়াছে। সাত সংখ্যারও ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে।

ষাটাই

রাজার মত সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও সন্তানহীনতা অভিশাপ; তবে দৈব অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজা পুত্র সন্তান লাভ করিলে, সেই সন্তান যেমন নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়, সাধারণ গৃহস্থের দৈব আশীর্বাদ-লব্ধ সন্তান স্বভাবতঃই তেমন শক্তি-সম্পন্ন হইতে দেখা যায় না, সাধারণ এবং স্বাভাবিক চরিত্রসম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময় বিশেষ কোন কোন লৌকিক দেবতার পুজা করিয়া গৃহস্থ সন্তান লাভ করিয়া থাকে; তাহাদের আচরণেও কোন অস্বাভাবিক বিষয় যে লক্ষ্য গোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে। নিম্নে সাধারণ নিঃসন্তান গৃহস্থের সন্তান লাভের কতকগুলি প্রচলিত কাহিনী বর্ণনা করা হইল।

'এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রী এক গ্রামে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কোন রকমে তাঁহাদের সংসার চালাইতেন। কিছু দিন পরে তাঁহাদের একটি মেয়ে হইল। তাহার নাম রাখিলেন ষাটাই। মেয়েটি বেশ বড় হইলে ব্রাহ্মণ তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর একমাত্র সন্তান বলিয়া ষাটাইকে তাহাদের কাছেই রাখিলেন।

বহুদিন গেল, ষাটাইর আর সন্তান হয় না। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বড়ই দুঃখিত। ছেলেপেলে না থাকাতে বাড়ীই নিরানন্দ। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী কত ব্রত, কত পুজা মানৎ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই ষাটাইর সন্তান হইল না।

একদিন ব্রাহ্মণ দূরে ভিক্ষা করিতে গিয়াছেন; দেখিতে পাইলেন, একটা বটগাছের নীচে অনেকগুলি স্ত্রীলোক কি একটা পুজার আয়োজন করিতেছে। ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, এখানে কি পুজা হইতেছে?' স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে বলিল, 'আমরা মা ষষ্ঠীর পুজা করিতেছি।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ ব্রতের ফল কি? আর ইহার নিয়ম কি?' তাঁহারা বলিলেন, 'এই ব্রত করিলে নিঃসন্তানদের সন্তান হয় এবং যাহাদের সন্তান হইয়াছে, তাহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। আর এই ব্রত শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে করিতে হয়; এবং যিনি ব্রত করিবেন, তিনি মাছ খাইবেন না, মাথায় ও শরীরে তেল মাখিবেন না।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনে করিলেন, এই ব্রত

আমার ষাটাইকে দিয়া করাইলে যদি তাহার সন্তান হয়, তবে তাহাকে দিয়া এই ব্রত করাইব।

ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীর কথা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়াছেন। এদিকে মা ষষ্ঠী এক বৃদ্ধার বেশে পথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা হইল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি কোথায় চলিয়াছ? কি ভাবিতেছ?' ব্রাহ্মণ বলিলেন 'আমার মেয়ে ষাটাইর কোন সন্তান হইল না। তাই আমরা বড়ই দুঃখিত। আজ অনেকগুলি এয়োকে ষষ্ঠীর ব্রত করিতে দেখিলাম। শুনিলাম, এই ব্রত করিলে নাকি লোকের সন্তান জন্মে এবং সন্তানের মঙ্গল হয়। ষাটাইকে দিয়া ব্রত করাইলে, তাহার সন্তান হইবে, তাই ভাবিতেছি।' বৃদ্ধাবেশী ষষ্ঠী তখন বলিলেন, 'তুমি নিয়ম মত তোমার ষাটাইকে দিয়া ব্রত করাও, নিশ্চয়ই তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। কিন্তু বাড়ীর সকলকে বলিয়া রাখিও, ষাটাইর যাহাই জন্মুক না কেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া না দিয়া যেন যত্ন করিয়া রাখে।'

ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া ষাটাই ও তাহার মাকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং তারপর হইতে ষাটাই নিয়ম মত ষষ্ঠীর ব্রত করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে ষাটাইর সন্তান-সম্ভাবনা হইল। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মহা আনন্দে ষাটাইকে পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, সাত মাসে সপ্তামৃত, আট মাসে অষ্টামৃত ও নয় মাসে সাধ দিলেন। ব্রাহ্মণ যখনই ভিক্ষায় বাহির হইতেন, তখনই ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যাইতেন, 'ষাটাইর যাহাই হউক না কেন, ফেলিয়া দিও না।'

একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেলে পর ষাটাইর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া সন্তানের পরিবর্তে একটা ঝুলি হইল। সকলেই ইহা দেখিয়া আশ্চর্য ও দুঃখিত হইলেন। এত দিনে বেশী বয়সে ষাটাইর যা-ও সন্তান হইল, তা-ও একটা ঝুলি। ঝুলিটাকে রাখিয়া আর কি হইবে, ইহা ভাবিয়া সকলে বাঁশঝাড়ের নীচে সেটাকে ফেলিয়া আসিল। ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ব্রাহ্মণ সকল শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন এবং ঝুলি কোথায় ফেলিয়াছে, তাহা জানিয়া বাঁশগাছের তলায় গেলেন। গিয়া দেখেন, ঝুলিটাকে কাকে ঠোকরাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ঝুলির ভিতর হইতে ষাটটি ছেলে ও একটি মেয়ে বাহির হইয়া কিল্‌কিল্ করিতেছে। ব্রাহ্মণ একটি ঝুড়ি আনিয়া ছেলেগুলিকে ও মেয়েটিকে উঠাইয়া লইলেন এবং এতগুলি শিশু প্রতিপালন করা অসম্ভব ভাবিয়া

রাজবাড়ীতে নিয়া গেলেন। রাজাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া বলিলেন, 'আমি এতগুলি শিশু প্রতিপালন করিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। আপনি যদি ইহার উপায় না করেন, তবে যত্নাভাবে এতগুলি ব্রহ্মহত্যা হইবে।' রাজা ব্রাহ্মণের কথায় স্বীকার হইলেন। রাজার হুকুমে ষাট মহল বাড়ী নির্মিত হইল এবং উহাদের জন্য ষাটটি ধাই, ষাটটি গাই, ষাটটি নফর দেওয়া হইল। ষাটখানি গ্রাম ইহাদের ভরণ-পোষণের জন্য দিলেন। যথা সময়ে ষাটাইর ষাট পুত্রের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিদ্যারম্ভ, চূড়াকরণ, উপনয়ন হইল এবং যথাসময়ে তাহাদের বিবাহ ও সন্তানাদিও হইল।

এদিকে ব্রাহ্মণী ও ষাটাই মহা দুঃখিত। এতকাল কত ভক্তি করিয়া মা ষষ্ঠীর অর্চনা করিলেন, কিন্তু একটা ঝুলি ভিন্ন আর কোন সন্তানই হইল না। ঘরে একটি শিশু নাই; গাছের ফল পাকিয়া তলায় পড়িয়া যায়, অথবা পক্ষী খায়, আর সন্তানের অভাব তাঁহাদের বেশী করিয়া লাগে। ঘরে তাঁহাদের মন টিকে না।

একদিন ষাটাই এইসব কথা লইয়া পিতার নিকট দুঃখ করিতেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, তোমার আবার সন্তানের দুঃখ কি? তোমার ষাট পুত্র, এক কন্যা। রাজা তাহাদের প্রতিপালন করিতেছেন।' ষাটাইর এ কথায় আর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা নাই। তিনি তখনই ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের দেখিতে গেলেন। সে দিন যে ষষ্ঠীপূজা তাহাও আনন্দে ষাটাই ভুলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া বাড়ী খুঁজিয়া ছেলেমেয়ে, বউ, জামাই, নাতি-নাতনীদের দেখিতে দেখিতে পা ব্যথা হইয়া গেল। ছোট ছেলের বাড়ী আসিয়াই ষাটাই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ছোট ছেলের বউ তাড়াতাড়ি ষাটাইর মাথায় তেল-জল দিয়া স্নান করাইয়া, তাঁহাকে বোয়াল মাছের ল্যাজা দিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিলেন।

অমনি ষষ্ঠীর কোপে ষাটাইর ষাট ছেলে, মেয়ে, বউ, জামাই, নাতি, নাতনী সকলেই ঢলিয়া পড়িল। সমস্ত পুরী আঁধার হইয়া গেল। ষাটাই তো ছেলেমেয়েদের পাইয়াই হারাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির। তখনই রাজার কাছে ও ব্রাহ্মণের কাছে খবর গেল।

ব্রাহ্মণ আসিয়া সমস্ত দেখিলেন, দেখিয়া ষাটাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ষষ্ঠীর ব্রত করিয়াছ?' ষাটাই বলিলেন, 'না, ভুলিয়া গিয়াছিলাম।' ব্রাহ্মণ তখন বুঝিতে পারিলেন, কেন উহারা ঢলিয়া পড়িয়াছে। তিনি সকলকে ঘরে

রাখিয়া মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে এক আম গাছ, তাহাতে হলদে হলদে পাকা আম হইয়া রহিয়াছে। কেউ সেই আম খায় না। এমন কি, কাকেও সেই আম খায় না। আম গাছটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিল, 'ঠাকুর, কোথায় চলিয়াছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে।' গাছটা ব্রাহ্মণকে বলিল, 'আমার ফল কেউ খায় না, এমনকি পাখীতেও না। ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিও, কেন আমার এই দুর্দশা?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচ্ছা'। আবার কিছুদূর যাইতে যাইতে এক নদী। নদী বলিল, 'ঠাকুর, কোথায় যাও?' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে।' নদী বলিল, 'আমার জল কেউ খায় না কেন, তাহা ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিও।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'আচ্ছা'। তার পরে অনেক দূর গিয়া এক বট গাছের নীচে বসিয়া ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীকে এক মনে ডাকিতে লাগিলেন। অনেক ডাকিতে ডাকিতে মা ষষ্ঠীর মনে দয়া হইল। তিনি বলিলেন, 'এখন আবার আমাকে ডাকিতে আসিয়াছ কেন? আমাকে ডাকিয়া তোমাদের কি হইবে? মেয়েকে গিয়া বোয়াল মাছের ল্যাজা দিয়া ভাত খাওয়াও।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, অপরাধ হইয়াছে, 'এবার ক্ষমা কর। আর কখনও এ রকম হইবে না। আমার যাটাইর সন্তানদের বাঁচাইয়া দাও।' বহু অনুনয়ে ষষ্ঠীর রাগ কমিল। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'এখানে যে অমৃতকুণ্ডে জল আছে, তাহা নিয়া বাড়ী যাও। এই জল যাহারা ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের গায়ে তিনবার ছিটাইয়া দিও, তবেই তাহারা বাঁচিয়া উঠিবে। প্রত্যেক ষষ্ঠীতে ব্রত পালন করা সহজ হইবে না, তাই জন্ম হইলে, ষষ্ঠীর দিন, অন্নারম্ভে, বিবাহে ষষ্ঠীর কথা শুনিবে।' ব্রাহ্মণ তখন আমগাছ ও নদীর কথা বলিলেন, ষষ্ঠীও তাহাদের কি করিতে হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অমৃতকুণ্ডের জল লইয়া ফিরিবার সময় নদীকে বলিলেন, 'তুমি কোন তৃষ্ণার্তকে অত্যন্ত তৃষ্ণার সময় জল খাইতে দাও নাই বলিয়া তোমার এ অবস্থা। কোন সৎ ব্রাহ্মণকে জল খাইতে দিলেই তোমার দুঃখ ঘুচিবে।' নদী বলিল, 'ভাল ব্রাহ্মণ আর কোথায় পাইব? তুমিই আমার জল খাও।' এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ নদী হইতে অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া জল খাইলেন। কিছুদূর গিয়া আম গাছ। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার কথা মা ষষ্ঠীকে বলিয়াছি, তিনি বলিলেন, তুমি কোন ক্ষুধার্ত সৎব্রাহ্মণকে তাহার ক্ষুধার সময় আম খাওয়াইলেই তোমার এই দুঃখ দূর হইবে।' গাছ বলিল, 'সৎ ব্রাহ্মণ আর কোথায় পাইব? তুমিই আমার

আম খাও, তবেই হইবে।' ব্রাহ্মণ পেট ভরিয়া আম খাইলেন ও কতকগুলি আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া বাড়ী রওয়ানা হইলেন। বাড়ী আসিয়া সেই অমৃতকুণ্ডের জল ছিটাইয়া সকলকে বাঁচাইলেন, তারপর সকলেরই খুব আনন্দ, খুব সুখ। সেই হইতে ষাটাই নিয়মিতভাবে ষষ্ঠীর ব্রত করিতেন এবং দেশে-বিদেশে এই ব্রত প্রচার করিয়া দিলেন।' (বিক্রমপুর হইতে ইন্দুবালা সেন কর্তৃক সংগৃহীত, 'প্রতিভা', ভাদ্র, ১৩২৪ সাল)

মন্তব্য

ইহার প্রধান অভিপ্রায় নারীর অস্বাভাকিক বস্তুর জন্মদান; অস্বাভাবিক বস্তু এখানে একটি থলে। থলের মধ্যে ষাটটি সন্তান, সুতরাং ইহাকে বহুসংখ্যক সন্তানের একসঙ্গে জন্মদান (multiple birth T586) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মহাভারতের আদি পর্বের অন্তর্গত আস্তিকপর্বে যে নাগ-কাহিনী আছে, এই কাহিনীতে তাহার প্রভাব অনুভব করা যায়।

কদ্রু সেখানে ষাট হাজার নাগ-সন্তানের একসঙ্গে জন্মদান করিয়াছিলেন। তিনিও একটি থলি প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাতেই ষাটহাজার নাগ-সন্তান ছিল। এই ষাট হাজার হইতেই এখানে ষাট আসিয়াছে।

তারপর বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন বৃক্ষ (Talking tree, F811·15), বাক্‌শক্তি সম্পন্না নদী (Talking River, F811·16*), পুনর্জীবনদান (Resuscitation EO-E199) ইত্যাদি অভিপ্রায়ও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। জল (Water of Life E84) সিঞ্চন করিয়া এখানে পুনর্জীবনদানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

বাঘের দয়া

'এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তাহার সন্তানাদি নাই; এক দিবস ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে,—রাস্তায় অসময়ী নারায়ণী তাহাকে বলিল, 'ব্রাহ্মণ, কোথায় যাও, আমাকে ভিক্ষা দাও।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমি নিঃসন্তান, অত্যন্ত দুঃখী। আমার নিত্য ভিক্ষা তন্নুরক্ষা।' অসময়ী নারায়ণী বলিল, 'তুমি এই হলদি দু'খানা নাও, তোমার অভাব মোচন হইবে। তোমার স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছে, ইহাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হইবে এবং তাহার একটি ছেলে জন্মিবে। ছেলের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিবাহ প্রভৃতিতে আমায় তৈল-সিন্দুর দিও এবং পৃথিবীতে আমার ব্রত প্রচার করিয়া দিও।'

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের একটি ছেলে হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাড়ী চলিয়াছে—পথিমধ্যে এক বাঘের সহিত সাক্ষাৎ। বাঘ বলিল, 'ব্রাহ্মণ তোকে খাই।' ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, 'আমার ছেলে হইয়াছে, পুরোহিত বাড়ী যাইতেছি, আমাকে খাইও না।' বাঘ বলিল, 'বার বৎসর যাবৎ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ বাঘিনীকে আনিয়া দিতে পারিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।' ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া চলিয়া গেল এবং বাড়ী আসিয়া অসময়ীর নিকট বাঘিনীর উদ্ধারের জন্য মানস করিল।

একদিন বাঘ বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিল, শোলার খাঁচায় বাঘিনী আসিয়া উপস্থিত।

দৈবযোগে ঐ পথে এক পথিক যাইতেছিল। ব্যাঘ্র পথিককে হত্যা করিল এবং তাহার ধনরত্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে পুরস্কার দিতে গেল। ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়া বাঘ ডাকিল, 'বাবা! বাবা! বাহিরে আসুন, প্রণাম করিব।' ব্রাহ্মণ ভয়ে ছেলেটিকে উপরে রাখিয়া দ্বারপথে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল যে বাঘ কি করে। বাঘ বারাণ্ডায় ধনরত্ন রাখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল এবং বলিল, 'ভ্রাতার অন্নারম্ভে যেন নিমন্ত্রণ করেন।'

ব্রাহ্মণের ছেলের অন্নারম্ভ। সমস্ত স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু ভ্রমক্রমে অসময়ী নারায়ণীর তৈলসিন্দুর দেওয়া হয় নাই। ছেলে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণী নানা ছাঁদে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ ব্রাহ্মণের মনে হইল যে অসময়ী নারায়ণীর তৈলসিন্দুর দেওয়া হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে ব্রতের

নিয়মিত দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া উপস্থিত সকলে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিল ; ব্রতের গুণে ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিল যে, 'অসময়ে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিলে কাহারও দুঃখ থাকে না। যে যাহা মানস করিয়া ভক্তিভাবে এ ব্রত করে, তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয়।'

ঢাকা বিক্রমপুর হইতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত 'বিক্রমপুর পত্রিকা'য় (কার্তিক, ১৩২১ সাল) প্রকাশিত।

মন্তব্য

এই কথার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন হলুদ, বাক্ শক্তি সম্পন্ন পশু (B210) পরোপকারী হিংস্র পশু ইত্যাদি অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। পরোপকারী পশুর মধ্যে বাঘের চরিত্রটি এখানে লক্ষ্যণীয়। বাঘ এখানে স্বভাবতঃই পরোপকারী নহে, একজনকে উপকার করিবার জন্য আর একজন নিরীহ ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিল। সুতরাং ব্যাঘ্রের মূল প্রকৃতি এখানে ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তবে ইহার মধ্যে মানুষের সেবায় পশু (Animal in service to man B 292) কিংবা উপকারী বন্য পশু (Helpful wild beasts B 430) ইত্যাদি অভিপ্রায়ও প্রকাশ পাইয়াছে। সাধারণতঃ বাংলার লোক-কথায় বাঘের যে কাহিনীগুলি পাওয়া যায়, তাহাতে বাঘ সর্বদাই নির্বোধ, তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জীবের নিকট সর্বদাই নির্বুদ্ধিতার জন্য ইহা নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। এই কাহিনীটি তাহার একটি ব্যাতিক্রম। ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ হিংস্রতা এখানে উপস্থিত আছে, বাংলার লোক-কথায় ব্যাঘ্রচরিত্রের ইহা একটি ব্যতিক্রম গুণ।

ছদ্মবেশী

এক দরিদ্র গৃহস্থ। দিন আনে দিন খায়—কোন রকম কায়ক্লেশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া আছে; কিন্তু দুঃখের উপর আরও দুঃখ—তাহার স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না, কোনটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া এক দিন, কোনটি দুই দিন কোনটি তিন দিনের হইতে না হইতেই মরিয়া যায়। এইরূপে একুশটি সন্তান মারা গেল। একে দারিদ্র্য দুঃখ তাহাতে আবার পুত্রশোক। গৃহস্থ ও গৃহস্থ-পত্নী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। দিন যাইতে লাগিল। একদিন গৃহস্থ-পত্নী অন্নজল ত্যাগ করিয়া প্রাণ বিসর্জনের উদ্দেশ্যে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে একদিন দুই দিন করিয়া তিন দিন চলিয়া গেল। গৃহস্থ-পত্নী জলও গ্রহণ করিলেন না।

ভগবানের একটু দয়া হইল। তিনি এক ভিখারী ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত। লোকজন কেহ নাই, গৃহিণী শয্যাগত, উত্থান-শক্তি রহিত। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণীর নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, 'মা, তোমার কি হইয়াছে, আমায় বল; আমি ভিক্ষুক তোমার দ্বারে উপস্থিত।' গৃহিণী সহসা এই মা সম্বোধন শুনিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; তিনি করযোড়ে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল,—'মা গাত্রোত্থান কর, এবং আমায় বল, তোমার কি হইয়াছে।' গৃহস্থ-পত্নী তখন বলিলেন—'আর উঠিয়া কি হইবে, এ প্রাণ আর রাখিব না।'

ব্রাহ্মণ দেখিলেন বড় বিপদ। তাই বলিলেন—'মা, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কথা শুন, তুমি উঠ এবং আমার নিকট তোমার মনের দুঃখের কারণ খুলিয়া বল।' তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং ব্রাহ্মণের নিকট আপন দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণের মন ভিজিল, তিনি বলিলেন, 'মা, তুমি একাচোরা ব্রত কর, তোমার মঙ্গল হইবে, তোমার সন্তানের কোন অমঙ্গল হইবে না।' গৃহস্থ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, ব্রতের নিয়ম কি?'

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'মা, তুমি দরিদ্রা, কোন প্রকারে ভক্তিভাবে একা-চোরা ঠাকুরকে পূজা কর, তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে। এই ব্রতে চাউলের গুঁড়া লাগিবে। তুমি আতপ চাউল সংগ্রহ করিতে পারিবে কি? না পার, সিদ্ধ চাউল ব্যবহার করিও, তাতে বাধা নাই। কলার পাতে চাউলের

গুঁড়া দিয়া ভোগ দিও; পারিলে দধি-দুগ্ধ দিও, না পারিলে দিও না। সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ব্রতিনীকে সে দিন থাকিতে হইবে জানিও।' ভিখারী ব্রতের নিয়মগুলি বলিয়াই অদৃশ্য হইলেন।

গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া শুদ্ধ ভাবে স্নান আহ্নিক করিয়া ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন। প্রতিমাসে নিয়মিত রূপে ব্রত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাহার গর্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটি ছেলে হইল। গৃহস্থ ও তাহার পত্নী আনন্দে আটখানা হইয়া গেল।

ছেলে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। গৃহস্থের অবস্থা এখন বেশ স্বচ্ছল। অভাবে পড়িলেই দেবতার আদর হয়, সুতরাং এখন আর গৃহস্থ-পত্নী সেই একাচোরা ব্রত প্রতিমাসে না করিয়া তিন মাস পরে করিয়া থাকেন। কখনও ছয় মাস চলিয়া যায়।

আজ ছেলের অন্নারম্ভ। দেবদেবীর পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়ের মহা ঘটা; কিন্তু একাচোরা ব্রতের কোন আয়োজন নাই; গৃহিণী ভুলিয়া গিয়াছেন। এমন সময় এক ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে ব্রাহ্মণ ভিতরে গিয়া বাড়ীর দাসীকে বলিল: 'ঝি, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমাকে চারটি চাউলের গুঁড়া আর একটি বীচিকলা দিতে পার? তাহা হইলে আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারি।'

ঝি বাড়ীর ভিতরে গৃহিণীকে ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা জানাইল। গৃহিণী শুনিয়া চটিয়া উঠিলেন। আমার বাড়ীতে আজ রাজভোগ, তোর কাছে চাউলের গুঁড়া, কলা চাহিল কে? এখানে এ'সব কিছুই মিলিবে না।'

ব্রাহ্মণ গৃহিণীর কথা শুনিয়া চটিয়া গেল এবং বলিল—'শুন ঝি! তোমার কর্ত্রীর বড় অহঙ্কার হইয়াছে, আচ্ছা!' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিল; কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে বালক ঘুমাইতেছিল, কেহ আর তাহার খবর লইতেছে না। কিছুকাল পরে যখন তাহার কাজ পড়িল, তখন বালককে জাগাইতে যাইয়া দেখে, সর্বনাশ! বালক জীবিত নাই! তাহার সর্বাঙ্গ শীতল। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। আমোদ-প্রমোদ থামিয়া গেল। বাদ্যভাণ্ড সব বিদায়। গৃহিণী মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছেন।

সহসা গৃহিণীর মনে পড়িল, তিনি যে দেবতার বরে ছেলে পাইয়াছিলেন, সেই দেবতা একাচোরার ব্রতেরই কোন আয়োজন নাই। তখন তাহার মনে জাগিল—দাসীর কাছে যিনি চাউলের গুঁড়া চাহিয়াছিলেন, তিনিই সেই ছদ্মবেশী একাচোরা ঠাকুর। তাড়াতাড়ি গৃহিণী পূজার 'আগ' রাখিয়া ঝিকে সঙ্গে লইয়া একাচোরা ঠাকুরের উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের সঙ্গে সেই ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইল। গৃহস্থপত্নী সেই ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন 'ঠাকুর, দোহাই তোমার, আমার ছেলেকে বাঁচাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তোমার বড় অহঙ্কার হইয়াছে। তুমি আমার বরে সন্তান লাভ করিয়াছ, আর এখন আমাকে তুচ্ছ করিতেছ। এক মুষ্টি চাউলের গুঁড়া দিতে যার এত শৈথিল্য, তার সন্তানের আবশ্যকতা কি? তুমি যেমন অলক্ষ্মী, তেমনই থাক।' গৃহস্থপত্নী বড় কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ তাহার আবদার ছাড়াইতে পারিলেন না। তাহার মন ভিজিয়া গেল। তিনি ছেলেকে বাঁচাইয়া দিলেন আর বলিলেন, 'একাচোরা ব্রত কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার সর্বনাশ হইবে।'

গৃহস্থ-পত্নী এখন হইতে কায়মনে আবার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার সংসার সুখের হইল। সেই অবধি জগতে একাচোরা ব্রত প্রচলিত হইল।'

(মৈমনসিংহ জেলা হইতে নরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক সংগৃহীত। 'প্রতিভা', কার্তিক, ১৩১৯ সাল)

মন্তব্য

এখানে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বস্তু আহার করিয়া সন্তান লাভের কথা নাই, বরং তাহার পরিবর্তে একাচোরা নামক এক দেবতার পূজা করিয়া সন্তান লাভের কথা আছে। তবে এই দেবতার আহার্য যে চাউলের গুড়া ও বীচিযুক্ত কলা এবং তাহাই যে দেবতার পূজার উপকরণ, তাহা ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহাতে একটি অভিপ্রায় গৌণভাবে সক্রিয় আছে, তাহাকে Chance and Fate (N) বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কচুপাতায় প্রাণ

'এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তাহার কোন সন্তান জীবিত থাকে না। ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইভাবে তাহার ছয়টি পুত্র-সন্তান যখন সে হারাইল, সপ্তম সন্তানের সময়ে কেহই তাহাকে স্তন্যপান করায় না, স্নান করায় না, পেট ভরিয়া খাইতে দেয় না, ভালরূপ আদর যত্ন করে না, এঁটোলে, গাছের নীচে, পথে, বনজঙ্গলে ফেলিয়া রাখে। কিন্তু কেহই তাহার অনিষ্ট করে না। বাঘ, ভল্লুক, ভূতপিশাচ এই সমস্ত তাহাকে দেখিলে একশত হাত দূরে দিয়া যায়। এইরূপে বিনা যত্নে, বিনা আদরে ছেলের সাত মাস বয়স হইল। তখন অন্নপ্রাশনের বয়স উপস্থিত। ব্রাহ্মণ কী আর করিবে, কোন মতে ভিক্ষাশিক্ষা করিয়া অন্নপ্রাশনের আয়োজন করিল। অন্নপ্রাশনের পুর্ব দিনে ব্রাহ্মণ উকমাইর, গাছের গুড়ি এই সমস্ত ব্রত করিল ; কিন্তু একাচোরা ব্রত করিল না। অন্নপ্রাশনের দিন এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'আমাকে এক সের চাউলের গুড়া, চাটুখোলার খই, ঢেঁকিমুখের চিড়া, ধোবাইল জল এই সমুদয় দ্রব্য খাইতে দাও।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'যদি সন্ন্যাসী দৈ-চিড়া খায়, তবে দাও, নতুবা বিদায় দাও।' এই কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী ক্রোধে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল এবং যাওয়ার সময়ে ব্রাহ্মণ-পুত্রের প্রাণ কচুপাতার মধ্যে পুরিয়া নিয়া গেল। এইদিকে অন্নপ্রাশনের পুর্বে নাপিত ছেলেকে ঘুম হইতে উঠাইতে গিয়া তাহাকে মৃত দেখিতে পাইল। এই অবস্থা দেখিয়া বাড়ীতে কান্নাকাটি হুলুস্থুল পড়িয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন এই সমস্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রশোকে এত অধৈর্য হইল যে, ছেলেকে কাঁধে তুলিয়া পাগলের মত ছুটিল ও বলিতে লাগিল, 'দেখিব, আমার ছেলেকে কোন দেবতায় হত্যা করে।' পথে বনদুর্গা তিন ডাক দিয়া ও সাধ্য সাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকে ফিরাইল ও বলিল, 'ওরে ব্রাহ্মণ, তুই সমস্ত দেবতার পুজা করিয়াছিস্ ; কিন্তু একাচোরা ঠাকুরের ব্রত করিস্ নাই ; এইজন্য তোর ছেলের প্রাণ নিয়া একাচোরা এই কদম্ গাছে উঠিয়াছেন। তাঁহাকে সাধ্য-সাধনা করিয়া পুজা দিলে তোর সন্তান জীবিত হইবে।' ব্রাহ্মণ বলিল, 'আমার ভাণ্ডার শূন্য, কি দিয়া পুজা হইবে?' তখন বনদুর্গা তাহাকে তিনটি

মৃত্তিকাখণ্ড দিয়া বলিলেন, 'এই দ্রব্য বিনিময়ে হাট হইতে যাহা চাও, তাহাই ক্রয় করিয়া আনিতে পারিবে।' ব্রাহ্মণ ছেলেকে বাড়ীতে রাখিয়া হাটে গেল ও দুই চোখে ভাল দ্রব্য যাহা দেখিল, তাহাই ক্রয় করিয়া বাটীতে আনিল। ব্রতের আয়োজন করিয়া সে ঐ কদম গাছের নীচে গমন করিল। বহু কাকুতি মিনতিতে তুষ্ট হইয়া একাচোরা তাহার বাড়ীতে আসিলেন। ঠাকুর বিধিমত পূজায় তুষ্ট হইয়া ছেলের প্রাণদান করিলেন ও ধনদৌলতে বাড়ীঘর পূর্ণ করিলেন। তখন হইতেই এই ব্রত সকলে আচরণ করে। এই ব্রত যে করে তাহার শুভকার্য সিদ্ধি হয়, মরা মানুষ জিয়ে, নষ্ট ধন ফিরিয়া পায়, যে যা মানসিক করে, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।'

(মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ হইতে প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত, 'ব্রত ও আচার')

মন্তব্য

এখানে শিশুর আত্মাকে কচুপাতার মধ্যে পুরিয়া রাখার মধ্যে যে বিশেষ অভিপ্রায় (External Soul E 765 : Life dependent on external object E 765) প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কচুপাতায় স্থিত জল যেমন অস্থির ও ক্ষণস্থায়ী, শিশুর আত্মা কচুপাতার মধ্যে রক্ষা করিবার অর্থও এই যে তাহার যে কোন সময় মৃত্যু হইতে পারে।

তারপর তিনটি মৃত্তিকাখণ্ডের ঐন্দ্রজালিক গুণও ইহার বিশেষ অভিপ্রায় (Magic Object)। তিনটি মৃত্তিকাখণ্ড ধনরত্নের কাজ দিয়াছে।

লোক-কথার অভিপ্রায় (motif) বর্তমান থাকিলে সাধারণ ব্রতকথাও যে লোক-কথা হইতে পারে, এই কাহিনীটি তাহারই প্রমাণ।

'এক দেশে এক সদাগর ছিল ; তাহার সাত মেয়ে, কিন্তু কোনও ছেলে নাই। পার্বতী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে—হাতে নড়ি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, মাথায় জটা সেই সদাগরের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সদাগরের স্ত্রী তাঁহাকে আদর আপ্যায়ন করিয়া ভিক্ষা দিলেন ; কিন্তু তিনি পুত্র-আঁটকুড়ের ভিক্ষা গ্রহণ করেন না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সদাগরের স্ত্রীর মনে ভারি দুঃখ হইল, সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সদাগর এবং অন্য লোকজন ছুটিয়া আসিল ; ব্যাপার কি জানিয়া সকলে সেই বৃদ্ধাকে খুঁজিতে বাহির হইল ; দেখিল, অদূরে এক বটগাছের তলায় তিনি বসিয়া আছেন। সদাগর তাঁহার পায়ে পড়িয়া অনেক কান্নাকাটি করিল এবং যাহাতে তাঁহার স্ত্রীর একটি ছেলে হয়, সেইরূপ কোনও ঔষধ দিতে অনুরোধ করিল।

বৃদ্ধা তাহাকে একটি ফুল দিয়া বলিলেন, "ঋতুস্নানের পর তোমার স্ত্রী যেন এই ফুলটা ধুইয়া জল খায়. তাহা হইলেই ছেলে হইবে।"

সদাগরের স্ত্রী নির্দেশ মত কাজ করিল এবং সন্তান-সম্ভবা হইল। দশ মাস দশ দিন যায়, ব্যথায় অস্থির ; কিন্তু সন্তান হইতেছে না। এ'দিকে কৈলাসে পার্বতীর আসন টলে। তিনি পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ব্যাপার কি !

পার্বতী ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া অমনি এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সেই সদাগরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সূতিকা-গৃহ হইতে সকলকে সরাইয়া দিয়া তাহার পদ্মহস্ত সদাগরের স্ত্রীর পেটে বুলাইয়া দিলেন। অমনি চাঁদের মত একটি ছেলে ভূমিষ্ঠ হইল। পার্বতী উহার নাম জয়দেব রাখিতে বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সেই দেশেই ধনপতি নামে আর এক সদাগর ছিল ; তাহার সাত ছেলে, কিন্তু কোনও মেয়ে নাই। পার্বতী অতঃপর তাহার বাড়ীতেও একদিন পূর্বোক্তরূপে ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং কন্যা-আঁটকুড়ের ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। শেষে ধনপতির স্ত্রীও দেবীর কৃপায় ঐরূপে একটি কন্যাসন্তান লাভ করিল এবং তাহার নাম রাখিল জয়াবতী।

জয়াবতীর যখন ছয়-সাত বৎসর বয়স, সে সঙ্গিনীদের লইয়া বনের ফুল-পাতা কুড়াইয়া বালির নৈবেদ্য দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে, এমন সময় একদিনে

জয়দেবের উড়ন্ত পায়রা আসিয়া তাহার কোলে পড়িল। জয়দেব পায়রা লইতে আসিল ; কিন্তু জয়াবতী প্রথমে তাহা দিতে স্বীকৃত না হইলেও শেষে দিতে বাধ্য হইল। জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা ফুল-পাতা-বালি দিয়া ও-সব কি করিতেছে। জয়াবতী উত্তরে জানাইল, তাহারা জয়মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতেছে ; এই ব্রত করিলে হারানো ধন ফিরিয়া পায়, মরিলে বাঁচিয়া উঠে, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, সতীন মারিয়া ঘর হয়, রাজা মারিয়া রাজ্য পায়।

জয়দেব আর কিছু বলিল না, পায়রা লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া রহিল, জয়াবতীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না দিলে সে উঠিবেও না, খাইবেও না।

শেষে উভয় পক্ষের সম্মতিতে জয়দেব ও জয়াবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের দিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের এক মঙ্গলবার,—সেদিন জয়াবতী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিয়াছে। রাত্রে আঁচল খুলিয়া 'গদ' খাইতেছে, এমন সময় জয়দেব জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করিতেছ, তুক্ না তাক্?' জয়াবতী স্বামীকে জানাইল, সে তুক্-তাক কিছুই করে নাই, মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের গদ খাইয়াছে, বিবাহের হৈ-হল্লায় সারা দিন খাইতে পারে নাই। "এই ব্রত করিলে কি হয়?" "হারালে পায়, ম'লে জিওয়, খাঁড়ায় কাটে না, আগুনে পোড়ে না, সতীন মেরে ঘর হয়, রাজা মেরে রাজ্য পায়।"

জয়দেব মনে মনে বলিল, আচ্ছা, পরীক্ষা করা যাইবে। পরদিন তাহারা নৌকায় করিয়া চলিয়াছে, জয়দেব জয়াবতীর সব কয়টি অলঙ্কার পৌটলা বাঁধিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল। কৈলাস হইতে পার্বতী তাহা জানিতে পারিলেন। তাঁহার আদেশে অমনি এক রাঘব বোয়াল পৌটলাটি তাহার পেটের মধ্যে পুরিল।

বউভাত ; জেলেরা মা পার্বতীর চক্রান্তে অন্য কোনও মাছ না পাইয়া নদী হইতে সেই রাঘব বোয়ালটিই ধরিয়া আনিল। জয়াবতী সেই মাছটি কাটিতে যাইয়া সমস্ত অলঙ্কার ফিরিয়া পাইল। এইরূপে জয়াবতী আরও বহু পরীক্ষায়,—১৭ শত বেনের রন্ধনে, ১৭ শত বেনের একত্র পরিবেশনে উত্তীর্ণ হইল। মা দুর্গা কখনও শ্বেত মাছি, কখনও শ্বেত কাক প্রভৃতির রূপ ধরিয়া আসিয়া জয়াবতীকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

জয়াবতীর ছেলে হইল ; জয়দেব এক সুযোগে তাহাকে কুচি কুচি করিয়া করিয়া কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। পার্বতী তাহাকে বাঁচাইয়া

জয়াবতীর কোলে তুলিয়া দিলেন। আর একদিন জয়দেব কুমারের পোণে গিয়া ছেলেকে রাখিয়া আসিল ; কুমারেরা পোণে আগুন দেয়, আগুন আর জলে না, মা পার্বতী কৈলাস হইতে সব জানিতে পারিলেন। তিনি এক বৃদ্ধার বেশে আসিয়া কুমারের বাড়ী উঠিলেন, জয়াবতীর ছেলেকে পোণ হইতে অলক্ষ্যে কোলে তুলিয়া লইয়া আসিলেন, অমনি পোণ জলিয়া উঠিল।

শেষে এই রাজ্যের রাজা মারা গেল। রাজার শ্বেত হস্তী অন্য রাজার খোঁজে বাহির হইয়া জয়দেবকে নিয়া সিংহাসনে বসাইল। এইরূপে জয়দেব দেখিল, জয়াবতী ব্রতের ফল যাহা যাহা বলিয়াছিল, সকলই ফলিল। দেশে দেশে জয়মঙ্গলচণ্ডীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।'

(শ্রীকামিনীকুমার রায় কর্তৃক পশ্চিম বঙ্গ হইতে সংগৃহীত, বসুমতী, ভাদ্র ১৩৬০)

মন্তব্য

এখানে ফুলধোয়া জলপান করিয়া পুত্রহীনা নারী পুত্র সন্তান লাভ করিল। ফুলের স্পর্শে জল ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন হইল বুঝিতে হইবে। মধ্যভারতীয় উপজাতির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীতে জানা যায়, সূর্য-কিরণে উত্তপ্ত জল সন্তান জন্মদানের শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। এখানে জলের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

বোয়াল মাছ বাঙ্গালীর লোক-শ্রুতি অনুযায়ী সর্বগ্রাসী ; সেইজন্য অলঙ্কারের পুঁটুলিটি ইহা গ্রাস করিয়া লইল। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে যে মৎস্যের আংটি গ্রাস করিবার কথা আছে, তাহাও লোক-অভিপ্রায় (folk-motif) হইতে আসিয়াছে।

শ্বেত রং পশুপক্ষীর প্রতি পৃথিবীর সর্বত্রই শ্রদ্ধাবোধের অস্তিত্ব আছে। এখানে শ্বেত হস্তী রাজার খোঁজে বাহির হইবার কথা বলা হইয়াছে। বাংলায় শ্বেতকাক, শ্বেত মাছি এবং সূর্যদেবতার নিকট বলিরূপে শ্বেত পশুপক্ষীর কথা সর্বত্র পাওয়া যায়। শ্বেতবর্ণ পশুপক্ষী ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। মার্কিন দেশীয় আদিবাসীর মধ্যে শ্বেত কুকুর, শ্বেত মহিষ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়, শ্বেত হরিণের চর্মদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত করিয়া নৃত্য করাও পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্বেত হস্তী ব্রহ্মদেশে পূজিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া

বাংলার লোক-কথার একটি বিশেষ অংশকে ঐন্দ্রজালিক কথা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। পাশ্চাত্ত্য লোক-কথায় যে ঐন্দ্রজালিক কাহিনীসমূহ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটিই ভারতবর্ষ হইতে নানাভাবে গৃহীত হইয়াছে, বলিয়া পাশ্চাত্ত্য লোক-শ্রুতিবিদ্ পণ্ডিতগণও অনুমান করিয়াছেন। ডক্টর ভেরিয়ার এলউইন বলিয়াছেন, "The 'Magic Articles' motif probably originated in the East and spread thence across the world'. ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় বহুল প্রচলিত The Magician and his Pupil নামক সুপরিচিত লোক-কথাটি সম্পর্কে স্টীথ টম্‌সন লিখিয়াছেন, 'The main fact that this tale is originally from India seems never to have been disputed though it has become so well-known in Europe that it must be ranked among the most popular of oral stories.' (*The Folktale*, 1946, p. 69)

সমগ্র ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশ যাদুবিদ্যার দেশ বলিয়া পরিচিত। 'বাঙ্গাল কা যাদু' সম্পর্কে সর্বত্রই একটু শ্রদ্ধাবোধ আছে। কামরূপের অন্তর্গ: কামাখ্যা তীর্থ একদিন তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রও ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তান্ত্রিক প্রভাবিত বাংলা দেশ হইতেই একদিন যাদুবিদ্যা ভারতের সর্বত্র এবং ভারত হইতে তাহা ভারতের বাহিরেও প্রচারলাভ করিয়াছিল। সেই সূত্রেই ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস-সম্পন্ন লোক-কথা দেশ দেশান্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। সুতরাং বাংলার লোক-কথায় ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর প্রাধান্য থাকিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

এমন কি পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচলিত ঐন্দ্রজালিক লোক-কথার একটি প্রধান অংশ মূলতঃ বাংলাদেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়া ভারতের বাহিরে প্রচার লাভ করিয়াছে, এমন মনে করাও কিছুতেই অসঙ্গত মনে হইতে পারে না।

১

হাড়ের স্তূপ

এক দেশে এক রাজা ছিল। তাহার একটি পুত্র। রাজপুত্রের তিন বন্ধু ছিল—মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, ও বণিকপুত্র। চারজনে অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। একবার চারিজন দেশভ্রমণে বাহির হইল। সন্ধ্যা হইলে তাহারা বনের মধ্যে এক মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মন্দিরে এক সন্ন্যাসী পুজা করিতেছিলেন। চারবন্ধু নিকটেই এক গুহায় আশ্রয় লইলেন। প্রথম প্রহরে বণিকপুত্র পাহারায় রহিলেন—তিনবন্ধু ঘুমাইতে লাগিলেন। বণিকপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী একখানি হাড় হাতে লইয়া মন্ত্র পড়িলেন—বণিকপুত্র মন্ত্রটি স্পষ্ট শুনিয়া শিখিয়া লইলেন—মন্ত্র পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিক হইতে বহু হাড় আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহার পর কোটালপুত্রকে ডাকিয়া তিনি ঘুমাইলেন। কোটালপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী সম্মুখের হাড়ের দিকে চাহিয়া মন্ত্র পড়িতেই সেগুলি জোড়া লাগিয়া একটি কঙ্কাল হইল। কোটালপুত্র মন্ত্রটি শুনিয়া মুখস্থ করিলেন। ইহার পর তিনি মন্ত্রীপুত্রকে জাগাইয়া নিজে ঘুমাইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সম্মুখে একটি কঙ্কাল রহিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়িতেই তাহাতে মাংস-চামড়া ইত্যাদি যুক্ত হইল—ইহা একটি বিরাট পশুর আকার ধারণ করিল। মন্ত্রীপুত্রও মন্ত্রটি শুনিয়া শিখিয়া ফেলিলেন। ইহার পর তিনি রাজপুত্রকে জাগাইয়া, নিজে ঘুমাইলেন। রাজপুত্র দেখিলেন, সন্ন্যাসী একটি মন্ত্র পড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীটি জীবন্ত হইয়া বনে পলায়ন করিল। রাজপুত্রও মন্ত্রটি শুনিয়া শিখিলেন। সেই সময় প্রভাত হইল। চারিবন্ধু তখন জাগিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন।

একস্থানে উপস্থিত হইয়া চার বন্ধু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র রাতের ঘটনা উল্লেখ করিলেন। অপর তিনবন্ধু তখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা বলিলেন। সকলেই তাঁহাদের মন্ত্র পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিলেন। সম্মুখেই একখানি হাড় পড়িয়াছিল, বণিকপুত্র প্রথম তাহা উঠাইয়া মন্ত্র পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বনের চারিদিক হইতে বহু হাড় আসিয়া একস্থানে জমা হইল। তার পর কোটালপুত্র সেই হাড়গুলির দিকে তাকাইয়া মন্ত্র

পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ হাড়গুলি জোড়া লাগিয়া একটি বিরাট কঙ্কাল হইয়া উঠিল। তার পর মন্ত্রীপুত্র মন্ত্র পড়িতেই তাহার রক্ত-মাংস আসিয়া জুটিল—তাহা একটি বিরাট আকারের ব্যাঘ্রে পরিণত হইল। তখন তিনবন্ধু রাজপুত্রকে মন্ত্র পড়িতে নিষেধ করিলেন। কারণ, ইহা প্রাণ পাইলে সকলকেই হত্যা করিবে। কিন্তু সকলের মন্ত্রই যখন সার্থক হইয়াছে, তখন রাজপুত্র নিজের মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য জেদ ধরিলেন। নিরুপায় হইয়া তিনবন্ধু তখন গাছে উঠিয়া বসিলেন। রাজপুত্র প্রায় গাছের নিকটে থাকিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছে উঠিয়া পড়িলেন। মন্ত্র বলার সঙ্গেই সেই ব্যাঘ্র প্রাণ পাইয়া ভীষণ গর্জন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং রাজপুত্রদের ঘোড়াগুলিকে হত্যা করিল; একটি লইয়া দূর বনে চলিয়া গেল। চারবন্ধু ভয়ে গাছের উপর কাঁপিতে লাগিলেন। বিপদ সরিয়া যাইতে তাঁহারা গাছ হইতে নামিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা সমুদ্রের তীরে পৌছিলেন। বহুক্ষণ পর একটি সদাগরের নৌকা দেখিয়া উহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাতে উঠিলেন। চার পাঁচদিন যাইবার পর তাঁহারা এক বন্দরে আসিয়া থামিলেন।

চারবন্ধু যেখানে নামিলেন, তাহা এক মৃতের দেশ। সবকিছুই সেখানে রহিয়াছে; কিন্তু কোন মানুষ নাই। যেন দেশের সকল মানুষ সকল কিছু রাখিয়া এইমাত্র কোথায় গিয়াছে—চারবন্ধু অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন। তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে রাজপ্রসাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ প্রাসাদের মধ্য হইতে চারিটি অপরূপ সুন্দরী রমণী বাহির হইয়া আসিয়া এক এক বন্ধুকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিল এবং আদর যত্ন করিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর এক একজন রমণী এক এক বন্ধুকে লইয়া পৃথক্ ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজপুত্র তাঁহার সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলে যে, রাজ্যে কোন লোকজন নাই কেন। সঙ্গিনী নিজেকে সেই রাজ্যের রাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিল এবং অপর তিনজনে আসলে রাক্ষসী এবং তাহারাই রাজ্যের সকল মানুষ এবং পশুকে খাইয়াছে ইত্যাদি বর্ণনা করিল। রাজপুত্র তাহাকেও ছদ্মবেশী রাক্ষসী বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু রাজকন্যা প্রমাণ দিলেন যে, রাত্রে রাক্ষসীরা আপন রূপ ধরিয়া মানুষ খাইতে বাহির হয়; কিন্তু সে ঘরেই থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুত্র অপর তিনবন্ধুকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

তাঁহারা রাত্রে নিদ্রার ভান করিয়া রহিলেন এবং রাজকন্যার কথা সত্য প্রমাণিত হইল। কিন্তু রাজপুত্রের সঙ্গিনী রাজকন্যা মানুষের মতই ব্যবহার করিতেন। তখন সকলে পলাইবার মতলব করিলেন। রাত্রে জাগিয়া রাক্ষসীরা দিনে ঘুমাইত। সেই অবসরে চারবন্ধু, রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন সমুদ্রতীরে আসিতেন। একদিন তাঁহারা সত্যই একটি সদাগরের নৌকা দেখিতে পাইয়া নানা উপায়ে তীরে ভিড়াইলেন এবং পাঁচজন তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। রাক্ষসীরা ঘুম হইতে উঠিয়া সমস্ত বুঝিল এবং নিজেদের দেহ দশ যোজন বাড়াইয়া জাহাজটি ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না বটে, কিন্তু তাহারা চীৎকার করিয়া রাজকন্যাকে তিরস্কার করিল যে, একাই সে সকলকে খাইতে চায়। এই কথায় অপর তিন বন্ধু মনে মনে সন্দেহ করিলেও, রাজপুত্র কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না—তিনি জানিতেন, রাজকন্যা মানবী।

জাহাজের কর্তৃপক্ষ রাজপুত্রদের এক বন্দরে নামাইয়া দিল। সেইখানে কৌশলে রাজকন্যাকে ফেলিয়া চার বন্ধু নিজেদের দেশে চলিয়া গেলেন। রাজকন্যা সমস্ত বুঝিলেন। তিনি অতি কষ্টে বহুদিন পরে রাজপুত্রের দেশে আসিয়া হাজির হইলেন। বহু চেষ্টায় রাজপুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন। এইবার রাজপুত্র উহাকে গ্রহণ করিলেন এবং দুইজনের বিবাহ হইল। কিন্তু রাজকন্যার মনে সুখ ছিল না; তিনি সর্বদাই আপনার মাতাপিতার কথা ভাবিতেন।

তখন চারবন্ধু রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই মন্দিরে সেই সন্ন্যাসীর নিকট গেলেন এবং হত্যা করার মন্ত্র শিখিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী তাহা শিখাইয়া দিলেন। এইবার সকলে রাজকন্যার দেশে গিয়া সেই মন্ত্র দ্বারা তিনজন রাক্ষসীকে হত্যা করিলেন। তারপর রাজ্যের সকল মানুষ এবং পশুর হাড় যেখানে রাক্ষসীরা স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছিল, সেইখানে গিয়া আপন-আপন মন্ত্রদ্বারা সমস্ত হাড়গুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। রাজকন্যা বহুকাল পরে আপন মাতাপিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিছুকাল সকলে মহা আনন্দ ও ধূমধামের সঙ্গে সেই দেশে কাটাইলেন। তার পর রাজপুত্র, স্ত্রী ও তিন বন্ধুকে লইয়া আপন রাজ্যে ফিরিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।—

'আমার কথাটি ফুরালো—
নটে গাছটি মুড়োলো—”

মন্তব্য

ইহার মধ্যে প্রধানতঃ যে অভিপ্রায়টি নির্দেশ করা হইল, তাহা অধ্যাপক স্টীথ টম্‌সনের নির্দেশক অনুযায়ী Reincarnation অর্থাৎ পুনর্জন্মের অন্তর্গত মৃতের অস্থি-সংগ্রহ এবং তাহাতে পুনর্জীবন দান (E607'1) বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মন্ত্রদ্বারা হাড়ের মধ্যে পুনর্জীবন দান করা হইয়াছে ; অতএব এখানে মন্ত্রই ঐন্দ্রজালিক শক্তি (magic)-র আধার বলিয়া মনে করা হইয়াছে। মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে মন্ত্রের অলৌকিক ফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কোন কার্যকারণের সূত্র ধরিয়া তাহা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্যই এই কাহিনীর মূল বিষয় ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চারিবন্ধু রাত্রির চারি প্রহরে জাগ্রত থাকিয়া নর-নারীর মূর্তি গঠন করিয়া তাহাতে প্রাণ-সঞ্চারের কাহিনী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। ওরাওঁ নামক উপজাতির একটি কাহিনীতে অনুরূপ একটি বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। একদা চারিবন্ধু একসঙ্গে বিদেশে চাকুরির খোঁজে বাহির হইল। যাইতে যাইতে পথে রাত্রি হইল। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, প্রত্যেকে এক প্রহর করিয়া জাগিয়া পাহারা দিবে। প্রথম প্রহরে প্রথম বন্ধু জাগিয়া একটি নারীমূর্তি তৈয়ার করিল, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় বন্ধু ইহাকে বস্ত্র পরাইল, তৃতীয় প্রহরে তৃতীয় বন্ধু ইহাকে অলঙ্কার পরাইল, চতুর্থ প্রহরে চতুর্থ বন্ধু ইহাকে সিন্দুর পরাইল। অমনই মূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিল।

চিত্রিত ব্যাঘ্রকে চক্ষুদান দিবার ফলে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠিবার কাহিনী বাংলা লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। (পরে দ্রষ্টব্য)

২

পদ্মরাগ

এক রাজা মারা যাইবার সময় চারটি পুত্র রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্রকে রাণী সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ইহাতে অন্য তিনপুত্র ছোটভাই ও মা'কে আলাদা একটি বাড়ীতে রাখিয়া, সমস্ত রাজ্য তিন জনে ভাগ করিয়া লইল।

বালক বয়সেই কনিষ্ঠ পুত্র অত্যন্ত সাহসী ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন নদীর তীরে একখানি নৌকা রহিয়াছে দেখিয়া বালক তাহাতে উঠিয়া বসিল এবং মা'কেও জোর করিয়া উঠাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। খোলা সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া বহুদূর যাইবার পর, একস্থানে দেখা গেল এক জল-ঘূর্ণির নিকট বিরাট আকারের পদ্মরাগ মণি ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বালকটি কতকগুলি উঠাইয়া লইল। কিন্তু তাহার মা আপত্তি করায় সে একটি মাত্র রাখিয়া সব ফেলিয়া দিল। কিছুকাল পরে নৌকা বন্দরে আসিয়া ভিড়িল।

সেই রাজ্যে বালক তাহার মাতাকে লইয়া বাস করিতে লাগিল। সেই দেশের রাজপুত্রদের সহিত বালক পদ্মরাগ মণিটি লইয়া খেলা করিতেছিল। রাজকন্যার সেইটি লইতে লোভ হইল। রাজা সেই বিরাট আকারের বহুমূল্য পদ্মরাগ মণিটি দেখিয়া চমকিত হইলেন এবং দশ হাজার মোহরের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিলেন। রাজকন্যা আরও একটি ঐরূপ মণি পাইতে ইচ্ছা করিল। রাজার অনুরোধে বালক পুনরায় নৌকা লইয়া সমুদ্রে বাহির হইল।

বালক সেই জল-ঘূর্ণির কেন্দ্রস্থলে আসিয়া জলের তলদেশ পর্যন্ত পথ দেখিতে পাইল। সে প্রথমে বহু সংখ্যক পদ্মরাগ মণি সংগ্রহ করিয়া নৌকায় রাখিল। পরে সেই পথ দিয়া জলের নিম্নে নামিয়া গেল। তলদেশে একটি বিরাট প্রাসাদ ছিল। সে তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। একটি ঘরে গিয়া সে দেখিল যে, দেবতা শিব চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন। দেবতার মস্তকের কিছু উপরে একটি মঞ্চ রহিয়াছে; তাহার উপর একজন অপরূপ সুন্দরী কন্যা শুইয়া রহিয়াছে। রাজকুমার নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, কন্যার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। খণ্ডিত মস্তক হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত শিবের জটার উপর পড়িয়া বিরাট বিরাট পদ্মরাগ মণির আকার ধারণ করিতেছে এবং সমুদ্রের উপর ভাসিয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিয়া রাজপুত্র অত্যন্ত ভীত হইল। সে লক্ষ্য করিল যে, একটি সোনার এবং একটি রূপার রং কাঠি

সেই খণ্ডিত মস্তকের নিকটে পড়িয়া রহিয়াছে। সে কাঠি দুইটি হাতে উঠাইতে গেলে, দৈবাৎ সোনার কাঠিটি হাত ফসকাইয়া কন্যার মস্তকের উপর পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে মস্তক দেহের সহিত যুক্ত হইল এবং সুন্দরী জীবন্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। রাজপুত্রকে দেখিয়া সে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে-স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিল; কারণ, দেবতার ধ্যান ভঙ্গ হইলে, চোখের দৃষ্টিতে রাজপুত্রকে ভস্ম করিয়া দিতে পারেন। রাজপুত্র ভয় পাইলেন না। তিনি সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং নৌকা করিয়া দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাজপুত্রের মাতা সুন্দরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া বরণ করিলেন। রাজপুত্র এক কুড়ি পদ্মরাগ মণি রাজার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে খুশী হইয়া রাজকন্যা রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। রাজপুত্র দুই স্ত্রী লইয়া বহুকাল সুখে বাস করিলেন।

আমার কথাটি ফুরোলো—
নটে গাছটি মুড়োলো।

মন্তব্য

এই কাহিনীর মূল অভিপ্রায়টিকে বিস্ময়কর বস্তু (Marvels) বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহাতে সমুদ্রের নীচে যে একটি প্রাসাদের উল্লেখ আছে, তাহাকে বিস্ময়কর প্রাসাদ (Extraordinary Castle F 771) বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তারপর ইহাতে পুনর্জীবন দান (Resuscitation) করিবার কথাও আছে। সোনার কাঠি, রূপার কাঠি ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন—একটি জীবন ও আর একটি মৃত্যুর কারণ। বাংলার রূপকথার ইহারা নিতান্ত সাধারণ অভিপ্রায়। এখানে পদ্মরাগ মণির যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার মধ্যে পুরাকাহিনী বা myth-এর অভিপ্রায়টিও আসিয়াছে। এখানে ধ্যানস্থ ব্যক্তিকে শিব বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও তাঁহার আচরণে রাক্ষসের ব্যবহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রাচীনতর কাহিনীতে ইহা কোন রাক্ষসেরই চরিত্র ছিল বলিয়াই মনে হইবে। বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র (Successful youngest son) অভিপ্রায়টিও ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। অপরিসর এবং সংক্ষিপ্ত কাহিনীর মধ্যে এতগুলি অভিপ্রায়ের সমাবেশ হইবার ফলে কাহিনীটি যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে নাই।

৩

ছোট বউ

এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী ছিল। বড় বউয়ের মাথায় ছিল মাত্র এক গোছা চুল, আর ছোট বউয়ের মাথায় ছিল মাত্র দুই গোছা চুল। লোকটি ছোটবউকে বেশী ভালবাসিতেন।

একদিন তিনি বিদেশে গিয়াছেন, সেই অবসরে ছোট বউ ঝগড়া করিয়া বড় বউয়ের সেই এক গোছা মাত্র চুলও উঠাইয়া ফেলিল এবং তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিবার জন্য বড় বউ বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

বনের পথ ধরিয়া যাইবার সময় সে একটি তূলা গাছ দেখিয়া সযত্নে তাহার গোড়া পরিষ্কার করিয়া দিল। গাছটি আশীর্বাদ করিল। খানিকদূর যাইয়া একটি কলাগাছ দেখিল। বউটি তাহার গোড়াও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিল। আবার কিছুদূর গিয়া সে একটি তুলসীগাছ দেখিয়া প্রণাম করিল এবং তাহার গোড়াও পরিষ্কার করিয়া দিল। সকল গাছই তাহাকে আশীর্বাদ করিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে পর বউটি দেখিল, একটি মুনি ধ্যান করিতেছেন। সে মুনির পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। মুনি বউটির দুঃখের কথা শুনিয়া আদেশ করিলেন যে, সে যেন সামনের পুকুর হইতে কেবলমাত্র একটি ডুব দিয়া আসে। স্ত্রীলোকটি মুনির আদেশ মত পুকুরে যাইয়া একটি মাত্র ডুব দিয়া যেই-উঠিল, তখনই দেখিল, তাহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—তাহার মাথা ভরা কালো চুল গোড়ালি স্পর্শ করিতেছে; রূপ-যৌবন তাহার যেন উছলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে তাহার মন ভরিয়া গেল; সে মুনিকে আসিয়া প্রণাম জানাইল। মুনি তখন তাঁহার কুটীর হইতে যে কোন একটি কঞ্চির ঝুড়ি আনিতে বলিলেন। স্ত্রীলোকটি একটি সামান্য ধরনের ঝুড়ি আনিল। ঝুড়ি খুলিতেই দেখা গেল, তাহা সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান পাথরে পরিপূর্ণ। মুনি বলিলেন যে, ওই ঝুড়ির রত্ন কোনদিনও নিঃশেষ হইবে না। তারপর স্ত্রীলোকটিকে আশীর্বাদ করিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

ফিরিবার পথে তুলসীগাছ তাহাকে আশীর্বাদ করিল যে, তাহার স্বামী তাহাকে ভালবাসিবে। কলাগাছ তারপর একটি কলাপাতা দিয়া বলিল যে, যখনই সে উহা নাড়াইবে, তৎক্ষণাৎ কলা এবং অন্যান্য ফল পাইবে। তারপর, তুলা গাছ একটি আপন গাছের ডাল দিয়া বলিল যে, উহা নাড়াইলে সে শুধু সুতার নানারূপ পোশাক পাইবে তাহা নয়, রেশম ইত্যাদি, মূল্যবান পোশাকও পাইবে। সকল কিছু লইয়া সে যখন গৃহে ফিরিল, তখন ছোট বউ হিংসায় পুড়িতে লাগিল। সকল কথা জানিয়া সেও তৎক্ষণাৎ বনে রওনা হইল। কিন্তু কোনদিকে না চাহিয়া সে সোজা মুনির নিকটে গেল। তাহাকেও মুনি একটি মাত্র ডুব দিতে বলিলেন। একবার ডুব দিতে ছোট বউর রূপও সৌন্দর্যে পূর্ণ হইল। সে তখন ভাবিল, আর একটি ডুব দিলে সে নিশ্চয়ই বড় বউ অপেক্ষা সুন্দরী হইবে। এই ভাবিয়া সে যেই আর একটি ডুব দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বের কুৎসিত রূপ ফিরিয়া পাইল। মুনি তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিল।

গৃহস্থ ফিরিয়া আসিয়া বড় বউকে দেখিয়া এবং তাহার ধনসম্পত্তির কথা জানিয়া তাহাকে আদর যত্ন করিতে সুরু করিল এবং মনের আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল। আর ছোট বউ তাহাদের ঝি হইয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিল।

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে-গাছটি মুড়োলো—

মন্তব্য

প্রথমতঃ এই কাহিনীটিতে নিষ্ঠুরতা (Cruelty)-র অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে। নিষ্ঠুর আচরণ এখানে সতীন হইতে আসিয়াছে। তারপর দয়ালু বৃক্ষ (Extraordinary Tree F 810) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। সাহায্যকারী পশুপক্ষী (Helpful Animal)র মত ভারতীয় লোক-কথায় সাহায্যকারী বৃক্ষও একটি বিশেষ অভিপ্রায়। নিরাশ্রিত ও বনবাসে বিসর্জিত বহু চরিত্রের প্রতি অশ্বত্থ বৃক্ষের উপকারের কথা ভারতীয় লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে তুলাগাছ, কলাগাছ এবং তুলসী গাছ তিনই মানুষের চির উপকারী। তুলা পরিধানের বস্ত্র, কলা আহারের খাদ্য, তুলসী রোগের ঔষধ।

তারপর ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন পুকুরও ইহার একটি অভিপ্রায়। ইহা ঐন্দ্রজালিক বস্তু (Magic Object D 800)-র অন্তর্গত। এখানে একটি ঝুড়ির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে রত্নরাজি আছে, তাহা কোনদিন নিঃশেষ হইবে না—ইহাও একটি ঐন্দ্রজালিক গুণ। Inexhaustible Food (D 1651.1) বিষয়ক একটি অভিপ্রায় আছে, এখানে তাহা অক্ষয় ভাণ্ডার বা Inexhaustible Treasure (D 1651.2).

কাহিনীর শেষাংশে একটু নীতিকথা প্রকাশ পাইয়াছে।

ঈশপের উপকথায় বর্ণিত কাঠুরিয়া ও বনদেবতার কাহিনীর সঙ্গে ইহার সামান্য ঐক্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এই ঐক্য অনুসরণ-জাত নহে, বরং পরস্পর স্বাধীন কল্পনা-প্রসূত। ঈশপের উপকথায় শুনিতে পাওয়া যায়, এক কাঠুরিয়া তাহার কুঠারখানি জলের মধ্যে হারাইয়া কাঁদিতেছিল, বনদেবতা তাহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া এবং তাহার সাধুতার পরিচয় পাইয়া তাহাকে তাহার নিজের কুঠার ত ফিরাইয়া দিলেনই, অধিকন্তু একখানি সোনার কুঠার উপহার দিলেন। লোভী দ্বিতীয় কাঠুরিয়াকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। ছোটবউ-এর আচরণ এবং তাহার প্রতিফল এখানে তাহারই অনুরূপ হইয়াছে।

যে সকল গাছ বাঙ্গালী জীবনের ব্যবহারিক সূত্রে নানাভাবে আবদ্ধ, তাহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই বিশ্বাস করা হয়। এই বিষয়ে তুলা গাছ সম্পর্কে এদেশে বিশেষ কোন লোক-শ্রুতি না থাকিলেও কলা ও তুলসীগাছ সম্পর্কে বিস্তৃত লোক-শ্রুতি প্রচলিত আছে। নবপত্রিকা পূজায়, রম্ভা তৃতীয়া ও ষোলকলা নামক মেয়েলী ব্রতে এই সমাজের কলাগাছ সম্পর্কিত মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তুলসীগাছের পূজা এবং ইহার সম্পর্কিত অগণিত জনশ্রুতি তুলসীগাছের প্রতি এই জাতির মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে।

কাঞ্চনমালা

এক সওদাগর। সওদাগর বুড়ো হয়েছেন। তাঁর এক ছেলে রূপলাল, রূপের সাগর। ছেলে বড় হয়েছে, এবার তার বিয়ে দিতে হয়। দেশে দেশে লোক পাঠালেন সওদাগর।

সওদাগরের বাড়ীর কাছে এক মালিনীর বাড়ী। মালিনী ভোরে ফুলের ডালা, আর সাঁঝে ফুলের মালা সওদাগরের বাড়ীতে নিত্য যোগান দেয়। একদিন স্বপ্ন দেখলেন সওদাগর-পুত্র, তার শিয়রে কাঞ্চনবরণ রাজকন্যা দাঁড়িয়ে। রূপ তার আর ধরে না। রাজকন্যার মেঘের বরণ চুল থরে থরে সোনার অঙ্গ ঢেকে রয়েছে। ঘুম ভাঙতেই সওদাগর পুত্র ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মিটি মিটি তারার জ্যোৎস্নায় মালিনী ফুলের ডালা নিয়ে আসে। এত ভোরে সওদাগর-পুত্রকে দেখে মালিনী জিগ্যেস করলো,—

উষার বাতাস ফুলের গন্ধ
এত ভোরে সাধুর পুত্র।

সওদাগর-পুত্র বললেন, মালিনী মাসী, স্বপ্নে দেখলাম, কাঞ্চনবরণ কাঞ্চনমালার মেঘবরণ চুল। সে কোন্ দেশের ফুল।

মালিনী তাঁর অপুর্ব সুন্দরী বোনঝির মেঘের বরণ চুল, সোনার বরণ হাত দেখালেন। সওদাগরপুত্র মালিনীকে বললেন, একটি বার মুখ দেখাও! মালিনী বললে যদি সত্যি কর যে, বিয়ে করবে তবে মুখ দেখতে পাবে। সওদাগর-পুত্র সত্যি করলেন।

সওদাগর-পুত্র সে রূপের কথা সকলকে বলতে বলতে পাগল হয়ে গেলেন। বুড়ো সওদাগর দেশে দেশে লোক পাঠালেন। রূপলাল পিতাকে জানালেন যে, কাঞ্চনমালাকে না পেলে তিনি বিয়ে করবেন না। তবু সওদাগর দেশে দেশে লোক পাঠালেন। মালিনী এদিকে তোড়জোড় করতে লাগলেন, কেমন করে সওদাগরের-পুত্রের সঙ্গে আপন বোনঝির বিয়ে দিতে পারা যায়। মালিনীর বোনঝির কানে একটি সুর বারবার ভেসে আসে, সওদাগর-পুত্রের সেই কথা 'একটিবার মুখ দেখাও।'

বিধির খেলায় সব উলট পালট হয়ে গেল। পাহাড় পর্বত সাত সমুদ্র নদ নদীর পারে ছিল এক সোনার রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজকন্যা কাঞ্চনমালা। কাঞ্চনমালা জ্যোৎস্নারাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, রূপের সাগর রূপলাল ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবেন না। রাজার হুকুমে মালা চন্দন নিয়ে দেশে দেশে লোক ছুটল।

অনেক বাধা বিঘ্নের পর দুই দেশের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হল। পত্র পট বিনিময় হল। পট দেখে রাজকন্যা বললেন, এই আমার বর। সওদাগর রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে দিলেন, সামনের পূর্ণিমায় রূপ সওদাগরের বিয়ে।

খবর শুনে মালিনী মালঞ্চ উথাল পাথাল করলো। মালিনী সওদাগরকে বললে একি, রূপলাল বললে, যা চাইলাম, তাই পেলাম। মালিনীর মাথায় বুদ্ধি খেলল। সে বললো তুমি নিজে পট দেখেছ। সওদাগর-পুত্র বললে, দেখিনি, শুনেছি। মালিনী বললে সব মিথ্যে কথা, আমাকে পট দেখিও, না হলে ও পট যাদুকরা, তুমি দেখলেই অন্ধ হয়ে যাবে। সওদাগর-পুত্র অতশত ভাবেননি। তাই পটের সন্ধানে চললেন।

মালিনী ছুটে গিয়ে বোনঝিকে বললেন, করঞ্চা ফুলের মালা গাঁথ। সন্ধ্যা ঘোর হতেই শেষ ডাক দিয়ে কাক যখন বাসায় যাবে, সেই সঙ্গে মালা আমার হাতে দিবি। মাসীর হাতে বোনঝি যখন মালা দিল, ঘরের ভরা কলসী ঠাস করে ফেটে গেল।

পট বুকে নিয়ে সওদাগর-পুত্র ঘুমিয়ে পড়ল। এমন সময় মালিনী পট নিয়ে চলে গেল, যাবার সময় করঞ্চাফুলের মালা তার বুকের কাছে ফেলে গেল। মালিনী যতই পট মুছতে যায়, পটের রূপ ততই খোলে। তারপর অনেক চেষ্টা করে পটটাকে কুরূপ করে সওদাগর-পুত্রের বুকের ওপর রেখে এল। সওদাগর পুত্রের তো মুখ ভার, এই নাকি কাঞ্চনমালা! তবু কোনো উপায় নেই। মালিনী বললে, ও মেয়ে ডাইনী, ও মেয়ে যম রাক্ষসী, চাইবে কি খাবে, খুব সাবধান, বিয়ে করতে যাবার সময়, চোখে সাত পরত কাপড় বেঁধে যাবে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তো বিয়ে হয়ে গেল। বউ নিয়ে ফিরলেন সওদাগর। মালিনী এসে জানাল খবরদার চোকের পরত খুলো না, কনে যম রাক্ষসী। দিনের পর দিন যায়, সওদাগর-পুত্র আর বাসরমুখো হন না। কাঞ্চনমালার দুঃখের শেষ নেই।

বুড়ো সওদাগর স্বর্গে গেলেন। মালিনী বলল, বুড়ো রাক্ষসী বিয়ে করেছ, তারই ফল। ভয়ে রূপলাল এক কুঁড়ে ঘর তুলে কাঞ্চনকে নির্বাসন দিলেন। সওদাগর-পুত্র এবার চোক্ খুলবেন, মালিনীর বোনঝিকে বিয়ে করবেন। কিন্তু বিয়ে আর হল না। এয়োদের মাথার সিঁদুর মুছল, বামুনদের টোল শূন্য হল। কলুর বলদ মলো, বেনের বেনেতি রসাতলে গেল।

সওদাগরের মা দেখেন, ভাঁড়ার লক্ষ্মীশূন্য। তাই পুত্রকে বাণিজ্যে যেতে বললেন। বাণিজ্য যাত্রা করতে গিয়ে নৌকা নড়ে না। শেষে মাঝি বললেন, স্ত্রীর কাছে সওদাগরপুত্র বিদায় নিয়েছে কি না। কাঞ্চনের কুঁড়েতে এসে সওদাগর পুত্র বললেন, তিনি বাণিজ্য যাত্রা করবেন, অনুমতি চাই। কাঞ্চন বললেন, সঙ্গে যাবেন। অনেক অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঞ্চনকে সঙ্গে নিলেন। তার জন্যে ঠিক হল একটি ভাঙ্গা নৌকো।

মালিনী আছাড়ি পিছাড়ি খায়। বোনঝিকে সঙ্গে নিয়ে নদীর পাড় দিয়ে ছুটে ছুটে নৌকো অনুসরণ করে চলে, আর বলে নৌকোকে ঘাটে লাগতে দিও না। পথে নানা বিঘ্ন বিপদ থেকে কাঞ্চনের জন্য সওদাগরপুত্র রক্ষা পান; কিন্তু তাঁর চোখ বাঁধা, তাই মনে করেন, সব বুঝি মালিনী মাসী. আর তার বোনঝি করে দেয়। নৌকা যেতে যেতে এক স্থানে থামল। সেখানে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে। কাটন কাটারী দেবতার পুজো দিতে। সেখানে নরবলি চাই। যে সওদাগরের চোখ বাঁধা তাকেই চাই। তাই সওদাগর পুত্ত্রকে ধরে নিয়ে তাকে বলি দিলে। কাঞ্চনমালা তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

তখন দেশে দেশে মন্বন্তর। কোথাও খাওয়া মেলে না। সওদাগরপুত্র কেবলই মালিনী মাসীর কথা ভাবে। আজ যদি মালিনী থাকত, তবে বনের হরিণ আমাকে খাওয়াত। কাঞ্চন সধবার সিঁদুর দিয়ে খুদকুঁড়া চেয়ে আনেন। তাই স্বামীকে রান্না করে খাওয়ান। সওদাগর খেয়ে প্রাণে বাঁচলেন। ভাবলেন. মালিনী মাসীর জন্যই তাঁর খাওয়া জুটল। এমন সময় কোথায় ছিল মালিনী, বোনঝিকে এক নায়ে থুয়ে সাত ডঙ্কা ডগর বাজিয়ে সওদাগরের নৌকোয় এসে উঠল।

পক্ষীর পাথ সপ্তপাল টেনে নৌকো ছুটে চলে। মালিনীর চক্রান্তে কাঞ্চনকে অগাধ জলে ডুবিয়ে দিলে। এবার চোকের কাপড় খুললেন সওদাগর। সওদাগর ভাবলেন, এবার মালিনী মাসীর বোনঝিকে বিয়ে করবো। কিন্তু

দেখেন জল থির, ছোট ছোট ঢেউএ পদ্মের পাতা ভেসে আসছে। পাতার আভায় ছল ছল জল জ্বলে ওঠে। সওদাগর পাতা তুলে দেখে, এ কোন স্বর্গের পাতা। জলে পট ধুয়ে গেছে, তবু কাঞ্চনের রূপ ধরে না। স্বর্গের সাতবোন অপ্সরার এক বোন কাঞ্চনমালা। তার বিপদে তারা ছুটে এল। সাতবোন রথ নিয়ে কাঞ্চনকে স্বর্গে নিয়ে গেল। রূপ সেই দৃশ্য দেখে অচৈতন্য হয়ে গেলেন। চৈতন পেয়ে রূপ দেখেন. গলিত অঙ্গ, ঝাঁকর চুল, ত্রিকালের অথর্ব বুড়ো সওদাগর ঠি ঠি করে কাঁপছেন। বুড়ো থুরথুরো হয়ে সওদাগর ঘরে ফিরলেন। যাগযজ্ঞের পর মুনি অপ্সরীরা বললেন, অপ্সরাকে দেখার জন্যে এমনি হয়েছে। একমাত্র সারতে পারে যদি এ সংসারে সওদাগরকে সবচেয়ে যে ভালবাসে সে সাত প্রহর উপবাসী থেকে এই গলিত অঙ্গে চুম খায়। কেউ এলো না ; এমনি কি, সওদাগরের মাও না। মালিনী হ্যাঁক থু বলে সরে গেলেন। শেষে এল মালিনী মাসীর বোনঝি। সওদাগর রূপ যৌবন ফিরে পেলো। মালিনী মাসীর বোন তালগাছ হয়ে সরোবরের পাড়ে রইল।

সওদাগর এবার ধনে জনে পূর্ণ হল। সেই তালগাছের পাশ দিয়ে সওদাগর যেতে যেতে একদিন তাঁর গালে এক ফোঁটা জল পড়ল। সে জল আর কারোর নয় স্বর্গের কাঞ্চনের। কাঞ্চন দুঃখ করে বললে, আমাকে তুমি সুখী করলে বটে, কিন্তু মালিনীর বোনঝিকে চিরকালের জন্যে বিনাশ করলে। আজ আমরা সাত বোন তাকে বাঁচাতুম। তবে চল আমি তোমার ঘর করি।

কিছুদিন পর কাঞ্চন ইন্দ্রের সভায় গেলেন। সওদাগর তাঁকে অনুসরণ করলেন। স্বর্গের ইন্দ্র রূপকে দেখে খুসী হলেন। কাঞ্চনকে আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন, যাও, তুমি স্বামীর ঘর কর। কাঞ্চন সখীর প্রাণ চাইলেন, আর সঙ্গে দিলেন একটি পাখা, বলে দিলেন উল্টোবাতাস যেন গায়ে না লাগে।

জ্যোৎস্না চারিদিকে থৈ থৈ করছে। রূপ কাঞ্চন রূপ সায়রের পাড়ে এসে দেখে তালগাছ নেই। রূপ সায়রের নিথর জলে সুন্দর সোনার নালে এক সহস্র-দল পদ্ম ফুটে আছে। পদ্মে এক অপরূপ পরমা সুন্দরী কন্যার এক মুখ, আর তার চোখের জলে মুক্তা ছড়িয়ে আছে। রূপ কাঞ্চন পাগল হয়ে সরোবরের জলে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সেই সময় কাঞ্চনের হাতের উল্টো বাতাস লেগে, পদ্ম এক নাগিনী,নাল এক ব্যাঙ হয়ে সাগর জলে ডুবে গেল।

কাঞ্চন আবার ছুটলেন স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র আশীর্বাদ করলেন, তোমরা চিরকাল দেবতাদের মত যুবা থাকবে, প্রতি বারো বছরের প্রথম পুর্ণিমার রাত্রে

একদিনের জন্য ঐ পদ্ম সরোবরে আবার ফুটবে। সেদিন সখীর সঙ্গে তোমাদের দেখাশুনা হবে। সেইদিন থেকে বারো বারো বছরে রূপ সরোবরের জলে মালিনীর বোনঝি সাপ হয়ে ফণা ধরে রোদ পোহায়, সেই ফণার নীচে ব্যাঙ হয়ে মালিনী থর থর করে কাঁপে।

বারো বছর বাদে বাদে বছরের প্রথম পূর্ণিমার রাতে রূপ কাঞ্চনের সঙ্গে তাঁদের প্রিয় সখীর দেখা হয়।

মন্তব্য

এই কাহিনীর মধ্যে যে সকল অভিপ্রায় পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমেই নরবলি (Human sacrifice 260.1)। তারপর ক্রমে পুনর্জীবন দান (Resuscitation E 1), রূপ পরিবর্তন (Transformation—man to object, D.200), বাধা-নিষেধ (Taboo—Miscellaneous, C700-C899), নিষেধ-ভঙ্গ (Punishment for breaking Taboo—Transformation C960) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্র কাঞ্চনকে যে আশীর্বাদ করিলেন, তোমরা চিরকাল যুবা থাকিবে, তাহার মধ্যেও ঐন্দ্রজালিক উপায়ে চির যৌবন লাভের (Magic rejuvenation D188) অভিপ্রায়টির ইঙ্গিত আছে।

৫

শিকড়ের গুণ

'এক মস্ত বড় সওদাগর। সওদাগরের দুই স্ত্রী। প্রথমার নাম রতনমালা, আর দ্বিতীয়ার নাম কাঞ্চনমালা। রতনমালার কোন ছেলে মেয়ে নাই। কাঞ্চনমালার এক পুত্র ও এক কন্যা—নাম নারায়ণ ও কমলা। রতনমালার গর্ভে কোন ছেলে মেয়ে না হওয়ায় সওদাগর বৃদ্ধ বয়সে কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে পুত্র ও কন্যা লাভ করিয়া সওদাগর হাতে স্বর্গ পাইলেন। দিন রাত কাঞ্চনমালার পুত্র ও কন্যা লইয়া আনন্দে দিন কাটান। রতনমালার কিন্তু সতীনের ছেলে মেয়ের প্রতি সওদাগরের এত আদর যত্ন বড় ভাল লাগিত না। তবু উপায় কি? সওদাগরের ভয়ে সতীনও তাহার পুত্র এবং কন্যা-দিগকে কিছু বলিতে পারিতেন না। নারায়ণ ও কমলা নিজ মায়ের চেয়েও বড়মাকে বেশী ভালবাসিত।

কিছুদিন পরে সওদাগর বাণিজ্যে গেলেন। বাণিজ্যে যাইবার সময় উভয় স্ত্রীকে ছেলে মেয়ে দুইটিকে লইয়া মিলিয়া মিশিয়া শান্তি-সুখে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়া গেলেন। সওদাগর বাড়ী হইতে যাওয়ার পর হইতেই রতন-মালার আধিপত্য বাড়িল। কাঞ্চনমালা নিজের ছেলে মেয়ে দুইটিকে লইয়া অতি সতর্কে দিন কাটান, তাহার বাপের বাড়ীর বুড়ী দাসীও কাজ কর্মে সকল বিষয়েই তাহাকে খুব সাহায্য করে। মানুষ হাজার সাবধান থাকিলে কি হয়? দুষ্ট লোকের কূটচক্র ভেদ করা বড় সহজ কথা নয়।

একদিন দুই সতীনে মিলিয়া গঙ্গা স্নান করিতে গেলেন। দুষ্ট রতনমালা কাঞ্চনমালার চুল ধুইয়া দিবার ছল করিয়া একখানা শিকড় যেমনি চুলের গোড়ায় বাঁধিয়া দিল, অমনি সে একটা কচ্ছপের আকার ধারণ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। রতনমালা কৃত্রিম ভাবে নানা ছাঁদে কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিল। সওদাগর বিদেশে, তিনি এই ঘটনার কিছুই জানেন না। কাঞ্চনমালার দাসী প্রমাদ গণিল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়া সে নারায়ণ ও কমলাকে লইয়া গঙ্গার তীরে একখানা কুটীর নির্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইলে সে নদীর তীরে আসিয়া বলিত,—

'ওঠ, ওঠ, কাঞ্চনমালা,
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা,
আসিবেন সওদাগর বাঁধিবেন রতনমালা
রাজ্যভোগ করবে তোমার নারায়ণ কমলা ॥'

বুড়ীর ডাকে একটা মস্ত বড় কাছিম জল হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া কুটীরে প্রবেশ করিত এবং কয়েকটা ডিম পাড়িয়া পুনরায় নদীর গভীর জলে ডুবিয়া যাইত।

এইরূপে এক বৎসর যায়। সওদাগর বাড়ী ফিরিবার পথে ঐ কুটীরের পাশ দিয়া নৌকায় করিয়া চলিয়াছেন। অমাবস্যার ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না; সওদাগরের নৌকা সেই কুটীরের ঘাটেই আসিয়া লাগিল। সওদাগর কুটীরের ভিতর আলোক দেখিয়া চাকরকে বলিলেন, ঐ যে লোকের বসতি দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে আগুন নিয়ে এসে রান্নার যোগাড় কর। কুটীরের দ্বারে আসিয়া দেখে যে একটি প্রাচীন স্ত্রীলোক 'ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা' বলিয়া ডাকা মাত্র মস্ত বড় একটা কাছিম জল হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ডিম পাড়িয়া চলিয়া গেল। চাকর এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহার প্রভুর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। ইহাও বলিল যে সেই ঘরে তাঁহার পুত্র কন্যা ও ছোট কর্ত্রীমার দাসীকেও দেখিয়াছে। চাকরের মুখে এ কথা শুনিয়া সওদাগর দ্রুতপদে সেই কুটীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দাসী ঐরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে সওদাগরকে সেখানে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; পুত্র ও কন্যা পিতাকে দেখিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সওদাগর দাসীর মুখে সব কথা শুনিয়া পুনরায় কাঞ্চনমালাকে ডাকিতে বলিলেন। দাসী যেমনি ডাকিল—

ওঠ ওঠ কাঞ্চনমালা,
দুধ দাও তোমার নারায়ণ কমলা।
এসেছেন সওদাগর বাঁধিবেন রতনমালা,
রাজ্যভোগ করবেন তোমার নারায়ণ কমলা ॥

অমনি কচ্ছপরূপী কাঞ্চনমালা আবার সেই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সওদাগর কচ্ছপটিকে ধরিয়া যেমন মাথায় হাত দিয়া আদর করিবেন, অমনি একটা শক্ত বস্তু হাতে লাগিল। উহা কি দেখিবার জন্য আলোর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে একটা শিকড়,—সওদাগর তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া যেমন শিকড়টাকে

কাটিয়া ফেলিলেন, অমনি কাঞ্চনমালা পুনরায় মনুষ্য দেহ ধারণ করিল। সওদাগর পরম সন্তুষ্ট মনে পুত্র কন্যা ও স্ত্রী সহ নৌকায় গেলেন এবং পর দিবস খুব ভোরে যাইয়া বাড়ীর ঘাটে পৌছিলেন। চাকর বাড়ীতে যাইয়া বলিল যে, কর্তার আদেশ তাঁহার দুই স্ত্রী পুত্রকন্যাসহ নদীর ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন।

রতনমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। এখন উপায়? রতনমালার দাসী বলিল, ভয় কি? আমি তোমাকে নিয়ে নৌকায় যাচ্ছি। তুমি সওদাগরকে বল্‌বে যে কাঞ্চনমালা নদীতে স্নান করতে যেয়ে জলে ডুবে মারা গিয়েছে। কত খুঁজেছি, কোথাও তার সন্ধান পাই নাই। দাসী বেটীকে কত বোঝালেম, ছেলেমেয়ে দুটিকে কত আদর যত্ন কল্লেম; কিন্তু দাসী তাদের নিয়ে কোথায় যে চলে গেল, আমি কোন খোঁজই পাচ্ছিনে। সেই অবধি বড়ই মনের কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। দাসীর কথামতই কাজ হইল। রতনমালা নৌকায় উঠিয়া কাঁদিয়া পড়া মাত্রই কাঞ্চনমালা পুত্রকন্যা সহ বাহিরে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। রতনমালা ও তাহার দাসীর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল। প্রাণের ভয়ে উভয়ে সওদাগরের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিল। কাঞ্চনমালার অনুরোধে সওদাগর তাহাদিগকে প্রাণে না মারিয়া বনবাস দিলেন; আর সুশীলা পত্নী কাঞ্চমালা ও পুত্র কন্যা নারায়ণ ও কমলাকে লইয়া মনের সুখে দিন কাটাইতে লগিলেন।'—'বিক্রমপুর পত্রিকা', বৈশাখ, ১৩২০

মন্তব্য

এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় ঐন্দ্রজালিক রূপান্তর (Transformation—Man to Animal D200). ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন শিকড়ের স্পর্শে এখানে ছোটরাণী কচ্ছপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। মানুষের শুশ্রূষাকারী পশু (Animals nourish men B530) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। অবশ্য এখানে পশু রূপান্তরিত মানবী, প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও শুশ্রূষা ইহা না করিলেও সন্তানের স্নেহে তাহার ডাকে সে সাড়া দিয়াছে। সর্বশেষে দুষ্কার্যের জন্য শাস্তিলাভ (Misdeeds Punished Q200-Q399) অভিপ্রায়টিও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইচ্ছামতী

একদিন লক্ষ্মী-নারায়ণ পাশা খেলিতে বসিয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সাহায্যকারী হইল; কথা রহিল, যদি লক্ষ্মীকে হারায়, তবে সে ভস্মীভূত হইবে, আর যদি নারায়ণকে হারায়, তবে 'কুটে আতুর' হইবে। নারায়ণ হারিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ 'কুটে আতুর' হইয়া পথে শুইয়া রহিল; রাজার মেয়ে ইচ্ছামতী শিবপূজার ফুল তুলিতে যায়, আতুর ব্রাহ্মণ কিছুতেই পথ ছাড়ে না। ওদিকে শিবপূজার বেলা হইয়া যায়, রাজার মেয়ে অগত্যা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দেয়, সে যদি পথ ছাড়ে, স্বয়ম্বর সভায় তাহাকেই সে মালা দিবে। ব্রাহ্মণ পথ ছাড়িয়া দিল এবং কালক্রমে ইচ্ছামতী সেই কুটে আতুরকেই বিবাহ করিল। দূর বনের ধারে এক কুটীরে তাহারা থাকে, আতুরের সেবায় রাজার মেয়ের দিন কাটে। লক্ষ্মীর বড় দয়া হইল। একদিন তিনি রালদুর্গা ব্রতের নিয়ম প্রণালী ইচ্ছামতীকে শিখাইয়া দিলেন। অগ্রাণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পুর্ণিমা পর্যন্ত দ্বিপ্রহরে এই ব্রত করিতে হয়। একটি কলার মাজপাতে ১৭টি আতপ চাউল ও ১৭টি দূর্বা এবং তামার একটি টাটে সিন্দুর, চন্দন, ওড়ফুল, জবার মালা, জোড়া কলা উপকরণ সাজাইয়া দিয়া ইচ্ছামতী চার মাস যথারীতি ব্রত করিল, ফাল্গুনী পুর্ণিমায় সূর্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, 'কুটে আতুর' স্বামীর কন্দর্পের মত শরীর হইল। রালদুর্গার পুজায় তাহাদের ঐশ্বর্যের সীমা রহিল না, একটি সুন্দর পুত্রসন্তানও তাহারা লাভ করিল। সংবাদ পাইয়া রাজা কন্যা-জামাতাকে দেখিতে গেলেন। কন্যার মুখে রালদুর্গা ব্রত-মাহাত্ম্য শুনিলেন। নিজেও বাড়ী আসিয়া সেই ব্রত করিলেন, অপুত্রক ছিলেন তিনি, পুত্রলাভ করিলেন।
—'বসুমতী' ভাদ্র ১৩৬০

মন্তব্য

ইহা সাধারণ ব্রতকথা। তথাপি ইহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ একজন খেলায় হারিলে আর একজন 'কুটে আতুর' হইবে, ইহাও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (Magic) ব্যতীত সম্ভব নহে; কারণ, ইহা কার্য-কারণ সূত্রে বিধৃত নহে। তারপর বিশেষ কয়েকটি মাসের বিশেষ দুইটি তিথিতে যে বিশেষ কতকগুলি উপকরণ দিয়া পূজা করিলে বিশেষ একটি ফল লাভ করা যায়, তাহাদের মধ্যেও কার্যকরণ সূত্রের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহাও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হয়।

৭

সোনার কাঠি

রাজার একমাত্র পুত্র দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। দেশশুদ্ধ লোক সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। কিন্তু রাজপুত্র কাহাকেও সঙ্গে নিলেন না। তিনি একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। কত নগর, কত বন উপবন পার হইয়া রাজপুত্র এক গভীর বনের ধারে উপস্থিত হইলেন। নীরব নিস্তব্ধ সেই বন, পশু পক্ষীর সাড়াটিও নাই। বনের মধ্যে এক বিরাট রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের চূড়া আকাশে ঠেকিয়াছে। কিন্তু ফটকে কোন প্রহরী নাই। রাজপুত্র পুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী যেন নিঝুম ঘুমে অচেতন' অবাক নয়নে রাজপুত্র দেখিতে লাগিলেন। রাজপুরীর আঙিনায় হাতী ঘোড়া বাঁধা; সিপাই, লস্কর, সৈন্য সামন্ত, সারি সারি। কিন্তু কেহ নড়ে না, চড়ে না, কথা বলে না—সব পাথরের মূর্তি। রাজপুত্র চমৎকৃত হইলেন। এইবার তিনি দরবারে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে সোনার সিংহাসনে রাজা পাথর মূর্তি, রাজার মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, সভাসদও পাথরমূর্তি। তাঁহাদের চোখে পলক নাই, মুখে ভাষা নাই। এইবার রাজপুত্র রাজকন্যার ঘরে প্রবেশ করিলেন। হাজার হাজার ফুলের গন্ধে সে ঘর মাতোয়ারা। সেই ঘরে এক ফুল বনের মধ্যে এক সোনার খাটে হীরার নালে সোনার পদ্ম। সোনার পদ্মের মধ্যে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার ঘুমন্ত মুখ। রাজকন্যার হাত-পা কিছুই দেখা যায় না। অবাক রাজপুত্র বিভোর হইয়া সেই অনুপম মুখ দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বহু বৎসর অতীত হইল। হঠাৎ একদিন রাজপুত্র দেখিলেন, রাজ-কন্যার শিয়রের এক দিকে এক সোনার কাঠি, একদিকে এক রূপার কাঠি। রাজপুত্র কাঠি দুইটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, হঠাৎ সোনার কাঠিটি হস্তচ্যুত হইয়া রাজকন্যার মাথা ছুঁইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কমল বন চঞ্চল হইয়া উঠিল—সোনার খাট নড়িয়া গেল, রাজকন্যার হাত হইল, পা হইল, ঘুমের আমেজ কাটিয়া রাজকন্যা উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজপুরীর ঘুমও ভাঙিয়া গেল। চারিদিকে প্রাণের সাড়া জাগিল। রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্র, সৈন্য সামন্ত লোকজনের সাড়া পড়িয়া গেল। সবাই অবাক। এই ঘুমের পুরীতে কে আসিল? সবাই দেখিল, রাজপুরীতে এক রাজপুত্র। দৈত্যের রূপার কাঠির

স্পর্শে রাজপুরী ঘুমে অচেতন ছিল। এই মরণ ঘুমের হাত হইতে রাজপুত্র তাহাদের বাঁচাইলেন।

রাজা বলিলেন, আমার এই কন্যা তোমায় দিলাম।

সমস্ত রাজপুরী আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল।

এইদিকে রাজপুত্রের চিন্তায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাণী বিছানা লইয়াছেন, রাজা অন্ধ হইয়াছেন। একদিন রাজপুত্র বধূ লইয়া পিতার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। রাজারাণী পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া লইলেন। রাজ্যে আবার আনন্দের ধ্বনি উঠিল।

মন্তব্য

সোনার কাঠি ও রূপার কাঠিকে ইংরাজীতে Magic wand par excellance বলিয়া উল্লেখ করা যায়। ইহারা ঐন্দ্রজালিক বস্তু (Magic Object D800)। তারপর ইহাতে যে পুরীটির বর্ণনা আছে, তাহাকে অলৌকিক স্থান (Extraordinary place F700) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই প্রকার একটি কাহিনী পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্য হইতে তাঁহার 'তাসের দেশ' নাটকটির প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

পূর্বোদ্ধৃত অনুরূপ কাহিনীর সঙ্গে ইহার একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, ইহাতে রাজকন্যার কেবলমাত্র নিদ্রিত মুখটি বর্তমান, ক্রমে সোনার কাঠির স্পর্শে সমগ্র দেহটি গড়িয়া উঠিল।

বিধিলিপি

'বনের ধারে ক্ষুদ্র একখানি কুটীরে এক বিধবা ব্রাহ্মণী একমাত্র পুত্রসহ বাস করিতেন। নিকটস্থ পাঠশালার গুরুমহাশয় দয়া করিয়া বিনা বেতনে ব্রাহ্মণ কুমারকে শিক্ষা দিতেন। গুরুমহাশয় একদিন স্নেহভরে ব্রাহ্মণকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তোমাকে সবই দিয়াছি। এখন তুমি বিদেশে কোথাও কোন কাজ লইয়া দুঃখিনী মায়ের কষ্ট দূর কর। ব্রাহ্মণকুমার কর্মের অনুসন্ধানে দূর দেশে চলিয়া গেল। এই ঘটনার পাঁচবৎসর পর সে কর্মস্থল হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। মা সন্তানকে কত আদর করিলেন। মা ও ছেলে পাঁচ বৎসরের কত কথাই বলিল। কয়েক দিন পর মা ছেলেকে বিবাহ করিবার জন্য খুব করিয়া ধরিলেন। মায়ের আদেশ না মানিয়া চলিলে পাপ হয় বলিয়া ছেলে বিবাহে সম্মতি দিল।

বিবাহের পর ছেলে কর্মস্থলে চলিয়া গেল। এ দিকে ব্রাহ্মণী নির্জন বনের ধারে সেই ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বধূকে রাখা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তাহাকে তাহার বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। আবার দুই বৎসর পর ছেলে প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিল। চারি পাঁচ দিন পর মা ছেলেকে বলিল, বাবা, এবার তুমি শ্বশুর বাড়ী যাইয়া বউমাকে লইয়া আইস। মায়ের আশীর্বাদ লইয়া পরদিন ছেলে শ্বশুর বাড়ী চলিল। কত দূর অগ্রসর হইলে একজন ভদ্রবেশধারী পথিক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত মিলিত হইল। আগন্তুকের চেহারা ও ভাব স্বভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণকুমারের মনটা কেন জানি দমিয়া গেল। দুই জন কেবলি হাঁটিতেছে, এমন সময় দূর মাঠে কতকগুলি গরু চরিতেছে দেখা গেল। আগন্তুক কি এক মন্ত্রকৌশলে ব্যাঘ্র সাজিয়া তন্মধ্য হইতে দুইটি গরু মারিয়া ফেলিল। সংহার কার্য শেষ করিয়া সে ভদ্রলোকের মত ব্রাহ্মণকুমারের নিকট ফিরিয়া আসিল। আবার দুই জনে চলিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই এই বার দেখিতে পাইল, একটা খালে দাঁড়াইয়া একজন ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছে। আগন্তুক কুমীর সাজিয়া জলে নামিল এবং ব্রাহ্মণকে বিনষ্ট করিল। আবারও সে নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে চলিতে লাগিল। এসব দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের

মত সেই অপ্রার্থিত সহযাত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটিতে লাগিল। সে যেন কাহারও অধীন হইয়া পড়িয়াছে! আরও কতকটা পথ অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন সময় তাহার সঙ্গী বনের ধারে কাষ্ঠ আহরণ-রত একটি কাঠুরিয়াকে অজগর হইয়া গিলিয়া ফেলিল।

অতঃপর আগন্তুক এক দিব্য মূর্তি ধারণ করিল এবং ব্রাহ্মণকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দেখ, আমিই মানবের ভাগ্য-বিধাতা। তুমি আমার কার্য-প্রণালী দেখিয়া বড়ই ভীত হইয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু সংসারে এই ভাবেই অদৃষ্টের খেলা হইয়া থাকে। কর্মফলপ্রসূত ভাগ্যলিপির অন্যথা হইতে পারে না। এই যে অকালমৃত্যু ও অপমৃত্যু দেখিলে, ইহাও ভাগ্যলিপি। আমার কার্যপ্রণালী তোমাদের নিকট অজ্ঞাত বলিয়া অদ্ভুত। তুমি শ্বশুরগৃহে চলিয়াছ, এই দুই পাত্রে দধি দিলাম, সকলকে খাইতে দিও। সাবধান, তোমার জ্যেষ্ঠ শ্যালককে ইহার অংশ দিও না, তাহা হইলে সে বাঁচিবে না। আর তোমার নিজ অদৃষ্ট সম্বন্ধে জানিয়া রাখ, আজ হইতে দুই বৎসর পর পূর্ণিমা রজনীতে শূলে প্রাণ হারাইবে। আমিও তোমার সঙ্গে আসিতেছি, আজ রাত্রে তোমার শ্বশুর বাড়ীতে গৃহান্তরে অন্য এক প্রাণীর আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। আমাকে নির্মম অদৃষ্ট বলিয়া জানিও। এই কথা বলিয়া অদৃষ্ট দেবতা অদৃশ্য হইলেন। ব্রাহ্মণকুমার দধি সহ শ্বশুর বাড়ী আসিল। জামাতার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ আয়োজন হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাবনায় জামাতার হৃদয় অবসন্ন।

পূর্ব কথামত অদৃষ্ট দেবতা অন্য গৃহ হইতে এক জনের প্রাণবায়ু লইয়া গেলে হরিবোল ধ্বনি শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। সে আপন স্ত্রীকে অদৃষ্ট দেবতার ভবিষ্যৎ বাণী বলিতে পারিল না।

গৃহিণীর মুখে কুটুম্বের আনীত দধির অপূর্ব স্বাদের কথা শুনিয়া গৃহস্বামীর দধি খাইবার বড় ইচ্ছা হইল। স্ত্রী অবশিষ্ট দধিটুকু স্বামীকে আনিয়া দিল। দধি খাইয়া শ্যালকের পেটে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভগ্নীপতি যখন শুনিল, তাহার শ্যালক গোপনে দধি খাইয়াছে, তখনি সে বুঝিল, ইহার আর জীবনের আশা নাই। রাত্রি শেষ না হইতেই সব ফুরাইল, অদৃষ্টের জয় হইল।

শ্বশুরগৃহে কয়েক দিন থাকিয়া পত্নীসহ ব্রাহ্মণকুমার মার নিকট ফিরিয়া আসিল। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সে আর কর্মস্থলে না যাইয়া মণি-

কণিকার ঘাটের নিকট একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণকুমারের মনে বড় আশা, গঙ্গার উপর থাকিলে শূলের ভয় নাই। দেখিতে দেখিতে শেষ পুর্ণিমা রজনী আসিয়া উপস্থিত। রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত প্রায়, তবুও ব্রাহ্মণকুমারের ভয়।

এদিকে অদৃষ্ট দেবতা বড়ই ভাবনায় পড়িলেন। গঙ্গার উপর শূলে মৃত্যু অসম্ভব, কি করিয়াই বা ব্রাহ্মণকুমারকে তীরে আনা যায়। ঠাকুর এবার বিষম ফাঁপড়ে পড়িয়া মহাশক্তি ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন। মা বলিলেন, 'তুমি ভাবিও না, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।' অদৃষ্ট দেবতা চলিয়া গেলেন। সেই সময় সেই দেশের রাজার প্রিয়তমা মহিষী একাকিনী গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দৈবযোগে পথ হারাইয়া গেলেন। ভগবতী মোহিনী মূর্তিতে রাণীর দেহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণকুমারের নৌকায় উঠিলেন। মহামায়ার মায়ায় ব্রাহ্মণ-কুমার দেখিল, দেশ হইতে তাহার স্ত্রী আসিয়া তাহাকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিতেছে। কিন্তু শত অনুরোধ চাতুরী সবই বিফল হইল। মৃত্যুর করাল মূর্তি যাহার হৃদয়ে অঙ্কিত, রমণীর মায়াজাল তাহার কি করিতে পারে? বিফল মনোরথ হইয়া রাণী ব্রাহ্মণকুমারের পার্শ্বে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাণী ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর রাজা দেখিলেন, তাঁহার প্রাণতুল্যা মহিষী এক ব্রাহ্মণকুমারের পার্শ্বে শুইয়া আছে। এ চিত্র দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। রাত ভোর না হইতেই ভীষণ মশানে ব্রাহ্মণকুমারকে শূলে চড়াইবার হুকুম হইল। সূর্যো-দয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণকুমারের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। অদৃষ্টের জয় হইল।'

—প্রতিভা, চৈত্র, ১৩১৮

মন্তব্য

ইহার মধ্যে বাধা-নিষেধ (Taboo : Eating certaion things C220) অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে। নিষেধ ভঙ্গ করিয়া মৃত্যু (C920)র কথাও ইহাতে আছে। অদৃষ্ট (N. Chance and Fate) অভিপ্রায়টিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

৯

পোস্তমণি

এক ঋষির কুঁড়ে ঘরে একটি ইঁদুর বাস করিত। ঋষি তাহাকে মানুষের মত কথা বলিবার ক্ষমতা দিলেন। বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরটিকে বিড়াল করিয়া দিলেন। পরে বিড়াল হইতে কুকুর, কুকুর হইতে বানর এবং বানর হইতে শূকর—ঋষি এইভাবে তাহার রূপ বদলাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই সে সুখী হইতে না পারিয়া হস্তী হইবার ইচ্ছা জানাইল। হস্তী হইয়া সে রাজার হাতে বন্দী হইল। রাজা-রাণী সেই হস্তীর পিঠে আরোহণ করিলেন; হস্তী নারীকে পিঠে লইতে অপমান বোধ করিল এবং পিঠ হইতে ফেলিয়া দিল। রাণীকে অতি যত্নে উঠাইয়া রাজা আদর করিলেন। ইহা দেখিয়া হস্তীর সুন্দরী নারী হইবার ইচ্ছা হইল। ঋষি তাহাকে সুন্দরী নারীতে পরিণত করিলেন। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া এক রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া আপন রাজ্যে লইয়া গেলেন। ইহাতে রাজার প্রথমা স্ত্রী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। পোস্তমণির (ঋষি হস্তীকে নারীতে পরিণত করিয়া এই নাম দিয়াছিলেন) সুখ বেশীদিন স্থায়ী হইল না। একদিন এক পাতকুয়ার মধ্যে পড়িয়া তাহার মৃত্যু ঘটিল।

সেই সময় সেই ঋষি রাজার নিকটে আসিয়া পোস্তমণির জীবনকাহিনী বলিয়া রাজাকে দুঃখ করিতে নিষেধ করিলেন। তারপর পাতকুয়া মাটি দিয়া ভরাট করিতে আদেশ দিলেন। ঋষি বলিলেন, পোস্তমণির হাড়-মাংস হইতে পোস্ত বা আফিম গাছ জন্মাইবে এবং এই গাছ হইতে আফিম সংগ্রহ করা যাইবে। যে ব্যক্তি সেই আফিম খাইয়া নেশা করিবে, তাহারও ঠিক পোস্তমণির মত বিভিন্ন অবস্থা অনুভব করিতে হইবে। আফিমখোর ব্যক্তি ইঁদুরের মত দুষ্ট প্রকৃতির হইবে; বিড়ালের মত দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছুক হইবে; কুকুরের মত ঝগড়াটে হইবে; বানরের মত নীচ হইবে; শূকরের মত গোঁয়ার হইবে এবং রাণীর মত বদমেজাজী হইবে। এই কথা বলিয়া ঋষি বিদায় লইলেন।

মন্তব্য

রূপ-পরিবর্তনই (Transformation DO—D699) এই কাহিনীটির একমাত্র অভিপ্রায়। নানাভাবে রূপ-পরিবর্তন ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। মানুষ হইতে পশুতে (D100), মানুষ হইতে বস্তুতে (D200), পশু হইতে মানুষে (D200), এক পশু ইহতে অন্য পশুতে (D410) রূপান্তর ইহার অভিপ্রায়।

হীরামন

একবার এক ব্যাধ একটি হীরামন পাখী ধরিয়াছিল। সে উহাকে রাজার কাছে বিক্রয় করিয়া দশ হাজার টাকা পাইল। পাখীটি মানুষের মত শুধু কথাই যে বলিত, তাহা নয়, তাহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। রাজা পাখীটিকে এত স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, দিনরাত পাখীটির সহিত কথা কহিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লইয়া ঘুরিতেন। ইহাতে রাজার রাণীরা অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তাঁহারা হীরামনকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন।

একবার রাজা কয়েক দিনের জন্য মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন। সেই অবসরে রাণীরা হীরামনকে এক বন্ধ ঘরে পুরিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা কুৎসিত। হীরামন তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এমন এক সুন্দরী আছে, যাহার পায়ের নখের সৌন্দর্যের সহিতও তাঁহাদের কাহারো দেহের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। ইহা শুনিয়া রাণীরা তাহাকে হত্যা করিতে গেল, হীরামন ঘরের জল বাহির হইবার নালা দিয়া পালাইয়া গেল।

রাজা ফিরিয়া আসিয়া পাগল হইয়া গেলেন এবং তাঁহার হীরামনকে যে ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে প্রচুর পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হীরামন এক কাঠুরিয়ার বাড়ীতে ধরা পড়িয়াছিল। সেই কাঠুরিয়া রাজার কাছে পাখীটি ফেরৎ দিয়া পুরস্কার লইল। পাখীর নিকট রাণীদের অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া রাজা ক্ষিপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের সকলকে গভীর অরণ্যে তাড়াইয়া দিলেন; সেখানে বন্য পশু তাঁহাদের খাইয়া ফেলিল।

ইহার পর রাজা পাখীটির নিকট সেই অদেখা রূপসীর কথা জানিতে চাহিলেন। হীরামন সেই রূপসীর সহিত রাজার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন এবং একদিন এক পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া দু'জনে বাহির হইলেন।

সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া রাজা এক প্রাসাদের সামনের বটগাছে আশ্রয় লইলেন। হীরামনের নির্দেশে তিনি আপন রাজ্য হইতে রূপার খই প্রস্তুত করাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন। হীরামন সেই খই ঠোঁটে করিয়া সেই গাছের নীচে হইতে সুরু করিয়া প্রাসাদের মধ্যে সেই সুন্দরীর শয়ন ঘরের দরজার

সম্মুখ পর্যন্ত ছড়াইয়া একটি যেন খইয়ের পথ প্রস্তুত করিয়া দিল। সুন্দরীর সহচরী দরজার সম্মুখে রূপার সেই খই দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সুন্দরীকে ডাকিল। সুন্দরী একটার পর একটা খই কুড়াইতে কুড়াইতে প্রাসাদের বাহিরে আসিয়া যেই বটগাছের নীচ পর্যন্ত আসিলেন, তৎক্ষণাৎ রাজা সুন্দরীকে ধরিয়া পক্ষীরাজের উপর আপনার পাশে উঠাইয়া লইলেন এবং পক্ষীরাজকে মৃদু আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীরাজ বিদ্যুৎগতিতে আকাশে উঠিয়া ছুটিতে লাগিল। রাজা দ্রুত যাইবার জন্য পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে ভুলক্রমে দ্বিতীয় আঘাত করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটির শক্তি নষ্ট হইয়া গেল—উহা নীচে নামিয়া আসিল। হীরামন হায় হায় করিতে লাগিল। কারণ, পক্ষীরাজ ঘোড়াকে দুইবার আঘাত করিতে হীরামন নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু আর কোন উপায় ছিল না। সকলে সেই নির্জন স্থানে কোন রকমে রাত কাটাইলেন।

পরদিন সকালে সেই দেশের রাজা মৃগয়া করিতে আসিয়া অরণ্যের মধ্যে সকলকে দেখিতে পাইলেন এবং সুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি রূপসীকে বন্দী করিলেন এবং যে রাজা তাঁহাকে আনিয়াছিলেন, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া সেই বনে রাখিয়া গেলেন। হীরামন তাহার সঙ্গে রহিল।

সুন্দরী পক্ষীরাজ ঘোড়াটিকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। নতুন রাজা সুন্দরীকে বিবাহ করিতে চাহিলে, তিনি ছয় মাসের এক ব্রত পালনের কথা বলিয়া রাজাকে নিরস্ত করিলেন। সুন্দরী ইহার পর হীরামনের সন্ধান করিবার জন্য ছাদের উপরে পাখীদের খাওয়াইবার জন্য প্রতিদিন প্রচুর শস্যদানা ছড়াইয়া লক্ষ্য করিতেন, হীরামন আসিল কিনা।

ওদিকে সেই অন্ধরাজা এবং হীরামন অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছিলেন। হীরামন গাছে গাছে ঘুরিয়া পাকা ফল আনিয়া রাজাকে খাওয়াইত এবং নিজে খাইত। হীরামনের এইরূপ কষ্ট দেখিয়া বনের অন্যান্য পাখীরা দয়ালু রাণীর কথা বলিল। একদিন হীরামন শস্য খাইতে যাইয়া সুন্দরীকে চিনিল এবং দুইজনে বহুক্ষণ কথাবার্তা হইল। অল্প কয়েকদিন পরেই পক্ষীরাজ ঘোড়া পুনরায় শক্তি ফিরিয়া পাইবে; ইহার মধ্যে হীরামন পুনরায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে সুন্দরীর প্রাসাদের সম্মুখে উড়িয়া গেল। সেখানকার ব্যাঙমা পাখীর গায়ের ঘাম একটি পাতায় করিয়া সংগ্রহ করিল, এবং তাহা আনিয়া অন্ধ রাজার চোখে লাগাইয়া দিতেই তিনি আবার দৃষ্টি ফিরিয়া

পাইলেন। ইতিমধ্যে ছয়মাস উত্তীর্ণ হওয়ায় পক্ষীরাজ ঘোড়া পুনরায় শক্তি ফিরিয়া পাইল। সুন্দরী তাহার পিঠে চড়িয়া বন মধ্যে রাজার কাছে আসিলেন এবং সময় নষ্ট না করিয়া আপন রাজ্যের দিকে উড়িয়া গেলেন। কিছুকাল পরে মহাসমারোহে তাঁহাদের বিবাহ হইল। রাজা সুন্দরী রাণী এবং হীরামনকে লইয়া বহুকাল রাজত্ব করিলেন। হীরামন তাঁহাকে প্রতিদিন তেত্রিশ কোটী দেবতার নাম শুনাইত।

আমার কথাটি ফুরোলো—
নটে গাছটি মুড়োলো…

মন্তব্য

পক্ষীরাজ ঘোড়ার মধ্য দিয়া এই কাহিনীতে কাল্পনিক প্রাণী (Mythical beasts B10) অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য পক্ষীরাজ ঘোড়া রূপক অর্থে দ্রুতগামী অশ্বও বুঝায়। তবে এখানে দেখা যায়, পক্ষীরাজ ঘোড়ার শক্তি কতকগুলি বহির্মুখী ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি ঐন্দ্রজালিক শক্তি-সম্পন্ন। ভুল করিয়া ঘোড়াটিকে দ্বিতীয় বার আঘাত করিবার ফলে ঘোড়াটির শক্তি নষ্ট হইল, ইহার অর্থ দ্বিতীয়বার আঘাত নিষিদ্ধ (taboo) ছিল, তাহা ভঙ্গ করিবার ইহা দণ্ড। তারপর ব্যঙ্গমা পাখীর গায়ের ঘামের মধ্যে যে ঐন্দ্রজালিক গুণ ছিল, তাহা দ্বারা অন্ধ রাজা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন। ইহাও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারই ফল।

এই কাহিনীটির মধ্যে বুদ্ধিমান্ পশুপক্ষী (Wise Animal B 120) অভিপ্রায়টিও ব্যক্ত হইয়াছে। শুক পক্ষীকেই এখানে হীরামন পাখী বলা হইয়াছে। শুক পক্ষী কেবল কথা বলিতেই পারে (Talking bird B 210) তাহা নহে, ইহার যেমন কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, তেমনই পরোপকার করিবারও শক্তি আছে। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই ঐন্দ্রজালিক শক্তিই ইহার অবলম্বন। ঐন্দ্রজালিক শক্তি দ্বারা ইহা অসাধ্য সাধন করিতে পারে। এই কাহিনীতে তাহাই দেখা গিয়াছে। এক জাতিস্মর শুক পক্ষীর কথা সংস্কৃত কথাসাহিত্য 'কাদম্বরী'তে শুনিতে পাওয়া যায়।

১১

মুক্তি

এক বনে এক ডাইনী ছিল। তাহার একটি যুবতী মেয়ে ছিল। ডাইনীর ইচ্ছা, রাজার সঙ্গে তাহার মেয়ের বিবাহ দেয়। রাজার ছেলেরা বনে মৃগয়া করিতে আসিলেই মেয়েটি তাহাদের ভুলাইয়া ডাইনীর কাছে লইয়া আসে। ডাইনীর পছন্দ না হইলে তাহাদের মারিয়া ফেলে। একদিন এক রাজকুমারকে ডাইনীর পছন্দ হইল। সে ভাবিল, ইহাকে আপাতত রাখিয়া দিই। ইহার অপেক্ষা ভাল পাত্র না পাইলে ইহার সঙ্গেই বিবাহ দিব। এই ভাবিয়া ডাইনী মন্ত্রপূত জল দিয়া রাজকুমারকে ফুলগাছে পরিণত করিল। একদিন সেই দেশের রাজা সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিলেন, তৃষ্ণার্ত হইয়া তিনি জলের খোঁজে ডাইনীর কুটীরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বুড়ী বলিল, জল আমি দিতে পারি, তবে আমার একটি মেয়ে আছে। তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে।

রাজা নিরুপায় হইয়া রাজী হইলেন এবং পরদিন ডাইনী ও নূতন রাণীকে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। বড়রাণী নূতন রাণীকে দেখিয়া খুশীই হইলেন এবং তাহাদের খুব যত্ন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহারা তাহাতে ভুলিল না। রোজ রাত্রিতে বড়রাণী যখন ঘুমায়, তখন ডাইনী তাহার রক্ত শুষিয়া খাইতে লাগিল। বড়রাণী দিনে দিনে অস্থিচর্মসার হইতে লাগিলেন এবং একদিন হঠাৎ মারা গেলেন। এই সব দেখিয়া রাজার মনে সন্দেহ হইল। তিনি কি উপায়ে পুত্রকন্যাদের ডাইনির হাত হইতে রক্ষা করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রাজা একদিন মৃগয়ায় যাইয়া গহন বনের মধ্যে একটি কুটীর প্রস্তুত করিলেন এবং লুকাইয়া দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে সেখানে রাখিয়া আসিলেন। তাহাদের দেখাশোনা করিবার জন্য এক উপায় স্থির করিলেন। সেই বাড়ীর জানালায় একটি সরু সূতা বাঁধিয়া সূতাটি রাজবাড়ীতে আনিয়া তাহার শোবার ঘরের জানালার সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন, রাজা সেই সূতা ধরিয়া কথাবার্তা বলেন এবং মাঝে মাঝে যাইয়া দেখিয়া আসেন।

ডাইনী বেগতিক দেখিয়া সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল ; খুঁজিতে খুঁজিতে সেই সূতাটি দেখিতে পাইল। ডাইনী সূতা ধরিয়া সেই

বাড়ীতে যাইয়া দেখিল, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাইনী অমনি মন্ত্র পড়িয়া ছেলে দুইটিকে পাখী করিয়া দিল। মেয়েটি তো পরের ঘরে চলিয়াই যাইবে, তাই তাহার আর কোন ক্ষতি করিল না। সকাল হইলেই ভাই দুইটি পাখী হইয়া উড়িয়া যাইত, রাজকন্যা একা একা কাঁদিত। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তবু ভাইয়েরা ফিরিল না দেখিয়া রাজকন্যা খোঁজ করিতে বাহির হইল। একা একা বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ দেখিল, তাহার সামনে একা পরম সুন্দর রাজপুত্র। রাজকন্যা ভয় পাইয়া গেল, এই বনের মধ্যে হঠাৎ রাজকুমার কোথা হইতে আসিবেন? নিশ্চয়ই এ কোন ডাইনী।

তাহার ভয় দেখিয়া রাজপুত্র বলিল, আমি মানুষ। ডাইনী মন্ত্র পড়িয়া আমাকে সারাদিন গাছ করিয়া রাখে, রাত্রে মানুষ করিয়া দেয়। তখন রাজকন্যা বলিল, আমার ভাইদেরও ডাইনী মন্ত্র পড়িয়া সারাদিন পাখী করিয়া রাখে। ইহা হইতে মুক্তির কি কোনই উপায় নাই? তখন রাজকুমার বলিল, একটি মাত্র উপায় আছে। ওই যে পুকুর দেখিতেছ, ওর ভিতরে এক রকম গোল গোল পাতা আছে। সন্ধ্যাবেলা এক ডুবে ঐ পাতা আনিয়া রাতারাতি যদি ভাইদের জামা করিয়া পরাইয়া দিতে পার, তবেই মায়া কাটিয়া যাইবে। আর এই পাতার একটি মুকুট করিয়া আমার মাথায় পরাইয়া দিলে আমিও মুক্তি পাইব। এই বলিয়া রাজকুমার রাজকন্যাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া সেই গাছ চিনাইয়া দিলেন। সেই দিন রাত্রে রাজকন্যার ভাইয়েরা ফিরিয়া আসিলে রাজকন্যা তাহাদের বলিল, কাল যেন তাহারা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসে। পরদিন সন্ধ্যা হইলে রাজকন্যা ডুব দিয়া সেই পাতা তুলিয়া আনিল এবং তাড়াতাড়ি জামা বুনিতে বসিল। রাত যখন গভীর হইয়াছে, তখন ডাইনী ভাবিল, দেখি তো ছেলেমেয়েরা কি করিতেছে! আসিয়া দেখিল, সর্বনাশ হইয়াছে। তখন ডাইনী নানা চাতুরি করিয়া রাজকন্যার কাজে বাধা দিতে লাগিল। অবশেষে মন্ত্রপুত জল দিয়া সব কাজ পণ্ড করিয়া দিতে উদ্যত হইল। এদিকে রাজকুমার হঠাৎ শুনিতে পাইল, একটি শুক সারিকে বলিতেছে, রাজকন্যার ভারি বিপদ, ডাইনী তাহাকে যাদু করিয়াছে। রাজকন্যা যে লতা দিয়া জামা বুনিতেছে, তাহার শিকড় ডাইনীর গায়ে ঘসিয়া দিলে ডাইনী বেহুঁস হইবে। রাজকুমার তাড়াতাড়ি সব শুনিয়া রাজকন্যার কাছে গেল এবং লতার শিকড় ডাইনীর গায়ে ঘসিয়া দিল। ডাইনী সঙ্গে সঙ্গে বেহুঁশ হইয়া গেল। সকাল হইয়া আসিল। রাজকন্যা ও রাজকুমারেরা বিপদ হইতে মুক্ত হইল।

মন্তব্য

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় রূপ-পরিবর্তনের অভিপ্রায়ই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ রাজকুমার ফুলগাছে পরিণত হইল (Transformation—Man to Object D 200); তারপর মন্ত্রদ্বারা সকলে দুইটি পাখীতে পরিণত হইল (Men to Animal D 100)। ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন গাছের পাতা Magic Leaf D955) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। বিশেষ গাছের পাতায় জামা তৈয়ারি করিয়া গায়ে দিয়া ঐন্দ্রজালিক গুণ হইতে মুক্তিলাভকে মোহমুক্তি (Disenchantment—Person disenchanted D 700) অভিপ্রায় বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লতার শিকড়ের (Magic herbs D983·3) কথাও ইহাতে আছে। সুতরাং ঐন্দ্রজালিক অভিপ্রায় গুলিই ইহাতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

১১

ডাইনী

বহুদিন আগে এক গ্রামে একদল ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়েছিল। ডাকাতরা প্রথম যে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকেছিল, সেটি ছিল আসলে এক ডাইনী বুড়ীর বাড়ী। সে বহু রকম যাদু জানতো। ডাকতরা কিন্তু এসব কিছুই টের পায়নি। তারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই বুড়ীকে দেখতে পেয়ে তার টাকা পয়সা কোথায় আছে বের করে দেবার কথা বললো। অমনি বুড়ী তার নিজের কোমরে রাখা এক গোছা চাবি ঝন্ ঝন্ করে নাড়া দিয়ে মুখে বিড় বিড় করে কি যেন বলে উঠলো। অমনি সেই অতগুলো লোক সব এক একটি গাভী হয়ে গেল। তাদের চাবি নেওয়া হলো না, টাকা-কড়ি নেওয়াও আর হলো না। নানা রংএর গরুতে বুড়ীর গোয়াল ভর্ত্তি হয়ে গেল। তার পর থেকে বুড়ীর বাড়ীতে অনেক দুধ হ'তে লাগলো।

একদিন একটি গাভী মনের আনন্দে চরতে চরতে বহু দূরে এক নদীতে জল খেতে গেল। সেই নদীর পাড়ে এক রাজকুমারকে দেখে গরুটি হাম্বা হাম্বা রব করে তার দিকে এগিয়ে গেল। রাজকুমার গরুটির গায়ে হাত বুলাতেই গরুটি মানুষের আকার ধারণ করল। রাজকুমার অবাক্ হয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু জেনে নিল। তারপর লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজকুমার তখনই বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। বুড়ী বার বার মুখে বিড় বিড় করেও কুমারকে গরু করতে পারলো না। রাজকুমার বুড়ীর গোয়ালে গিয়ে এক একটি গরুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, আর তারা এক একটি মানুষরূপ ধরলো। তারপর রাজকুমার ধীরে ধীরে বুড়ীর কাছে গিয়ে বুড়ীর গায়ে হাত দিতেই বুড়ী পাথর হয়ে গেল। কুমার লোকগুলিকে আঙুল দিয়ে কিছু দূরে তাকাতে বললো। তারা তাকাতেই দেখতে পেল, একটা ক্ষীণকায় বৃদ্ধা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। তারা দেখেই কুমারকে কি কথা বললে, গিয়ে দেখলো কুমার সেখানে নেই। তারা সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কুমারের সন্ধান পেল না। তখন তারা বুঝলো, কুমার আর কেও নয়, স্বয়ং ভগবান। তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি কুমার সেজে তাদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন।

সেইদিন থেকে তারা সকলে ডাকাতি মনোভাব ছেড়ে দিয়ে নিজের নিজের বাড়ী ফিরে সৎভাবে দিন কাটাতে লাগলো।

—মুর্শিদাবাদ জিলা হইতে সংগৃহীত

মন্তব্য

এই কাহিনীর মধ্যেও রূপ-পরিবর্তনের অভিপ্রায়টি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ এতগুলি লোক মন্ত্রবলে এক একটি গাভীতে পরিবর্তিত হইল (Trans formation—Man to animal D 100), তারপর গাভীগুলি পুনরায় মানুষের রূপ ধারণ করিল (animal to person D300)।

এখানে পরিত্রাতারূপে ভগবানের উল্লেখ আধুনিক যোজনা মাত্র। কারণ, লোক-কথার মধ্যে ভগবানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলার ব্রতকথায় কোন কোন সময় লক্ষ্মীনারায়ণ, হরপার্বতী কিংবা অন্য কোন দেবদেবীর উল্লেখ থাকে, কিন্তু তাহাতে সাধারণভাবে ভগবানের উল্লেখ থাকেন। বিশেষতঃ উপরি-উদ্ধৃত কাহিনীটি ব্রতকথা শ্রেণীর রচনাও নহে। সুতরাং ইহাতে ভগবানের উল্লেখ নিতান্ত আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে ইহা ঐন্দ্রজালিক শক্তিবিজয়ী কোন রাজপুত্রের চরিত্র। রূপকথায় এমন কতকগুলি চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহারা ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা বশীভূত হয় না, যাদুমন্ত্র তাহাদের উপর প্রয়োগ করিলেও, তাহা ব্যর্থ হয়। এই চরিত্রটি তাহাই। রামায়ণের কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মুক্তি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভুত-প্রেতের কথা

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে যদিও জীবন-মৃত্যু এবং পরলোক সম্পর্কিত বিশ্বাসে কোন ঐক্য নাই, তথাপি প্রত্যেক দেশেই ভূত-প্রেত সম্পর্কে বিশ্বাসের মধ্যে ঐক্য আছে। প্রায় প্রত্যেক জাতিই বিশ্বাস করিয়া থাকে, মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তি অশরীরী আত্মারূপেই হোক কিংবা অন্য যে কোন রূপেই হোক, জীবিতের সমাজের সঙ্গে নানা ভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। আদিম জাতির সমাজের মধ্যেও এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলেও এবং প্রত্যক্ষত তাহার দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেলেও সেই ব্যক্তিকে যখন স্বপ্নে দেখা যায়, তখন জীবিতের সমাজের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় না ; আদিবাসী সমাজে ইহা হইতেই পরলোক এবং ভূত-প্রেত সম্পর্কে নানা জটিল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে যুক্তিবাদ ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ সত্ত্বেও আমরা এই ধারণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি নাই। ইউরোপে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই শ্রেণীর অলৌকিক চরিত্র অর্থাৎ ভূত-প্রেত ইত্যাদিতে বিশ্বাসের পরিমাণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলেও, সেখানকার লোক-সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে আজও ইহাদের সম্পর্কিত কাহিনী সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই। শুধু তাহাই নহে, কোন কোন প্রদেশে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি দেখা যায়। ভৌতিক গল্প পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের কেবল মাত্র যে অনগ্রসর সমাজেই প্রচলিত, তাহা নহে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজের মধ্যেও এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহারা ভূত-প্রেতের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নহেন ; ইহাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে এখনও অনেকেরই বিশ্বাস শিথিল হয় নাই।

ভারতবর্ষের মত দেশে, যেখানে পরলোক-সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাসের অস্তিত্ব আছে, সেখানে নানাভাবে এই শ্রেণীর চরিত্রের অস্তিত্ব এবং আচরণ সম্পর্কে বিশ্বাস প্রচলিত থাকিবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক। সেইজন্য ভারতের কেবলমাত্র প্রাদেশিক লোক-সাহিত্যে নহে, সংস্কৃত কথাসাহিত্যেও ভূত-প্রেত-পরলোক সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত থাকিতে দেখা যায়।

হিন্দু পারলৌকিক বিশ্বাস আনুযায়ী পরলোকের দুইটি বিভাগ—প্রেতলোক এবং পিতৃলোক। মৃত্যুর পরই আত্মা প্রেতলোকে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেখানে বায়ুভূত নিরাশ্রয় হইয়া অশান্ত ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সময় যদি যথাবিধি তাহার প্রেতকৃত্য করা না হয়, তাহা হইলেই নানাভাবে সেই আত্মা মানব সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে; অনেক সময় অকারণে মানুষের অহিতসাধনও করিয়া থাকে। তারপর যথাবিধি প্রেতকৃত্য পালন করা হইলে পর, তাহা পিতৃলোকে যখন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে জীবিতের সমাজের সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া যায়। প্রেতলোকে অবস্থিতি কালেই আত্মা নানাভাবে জীবিত মানুষের সম্পর্কে আসে। যাহার অপমৃত্যু হয়, কিংবা অন্য কোন কারণে প্রেতযোনি হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় থাকে না, তাহার প্রেত চিরদিন ধরিয়া নানাভাবে জীবিত সমাজের অকল্যাণ করিতে থাকে। ভূতপ্রেত নানাভাবেই জীবিতের সমাজের সম্মুখীন হইতে পারে। কোন কোন সময় জীবিত কালে সে যে রূপ ধারণ করিয়াছিল, সেই রূপেই আবির্ভূত হইতে পারে, তাহাকে চিনিবার কোন উপায় থাকে না; তবে যাহারা বিশেষভাবে জানে, তাহারা কেবল বুঝিতে পারে যে, তাহার ছায়া পড়ে না, তাহা হইতেই তাহারা সহজেই সাবধান হইতে পারে। অনেক সময় প্রেতাত্মা ছায়া রূপে অদৃশ্যভাবে অশরীরী হইয়াও নিজের পরিচয় দেয়। ইউরোপের কোন কোন দেশে living corpse বা জীবন্ত মৃতদেহ রূপেও প্রেতাত্মা আত্মপ্রকাশ করে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কাহিনী নাই; কারণ, ভারতে মৃতদেহ দাহ করিবার রীতি; সুতরাং কবর হইতে উঠিয়া আসিবার তাহার কোন অবকাশ থাকে না। ভূতের প্রত্যক্ষ রূপের অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বিশ্বাস প্রচলিত আছে, তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের মধ্যে ইউরোপে এই বিশ্বাস যত প্রবল, মার্কিন দেশে তত নহে। ভারতবর্ষে ভূত-প্রেতের প্রত্যক্ষ রূপ সম্পর্কে বিশ্বাস অত্যন্ত ব্যাপক। এই সম্পর্কিত কাহিনী লোক-কথার একটি বিস্তৃত অংশ জুড়িয়া আছে।

ভূতকে ভয় পাওয়ারই যখন কথা, তখন ভূতের গল্প ভয়ের গল্প হওয়াই সর্বত্র স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ ভূতের গল্প ভয়ের গল্প না হইয়া কৌতুক রসের গল্প হইয়াছে। জীবিত মানুষের বুদ্ধির নিকট ভূত সর্বদাই শেষ পর্যন্ত পরাজিত হইয়াছে। সকল ভূতের গল্পেরই প্রায় এই একই উদ্দেশ্য।

কিন্তু আদিম সমাজের বিশ্বাস অনুযায়ী দেখা যায় যে, প্রেতাত্মারা অনেক সময় মানুষের রোগজ্বালার কারণ; ইহারা তাহা হইতে প্রতিকার পাইবার উপায়ও নির্দেশ করে। অবশ্য তাহার বিনিময়ে তাহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে হয়। আমাদের দেশে কাহারও উপর 'ভর' হইলে তাহার মুখ দিয়া রোগমুক্তির উপায়ের নানা সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণ লোক মনে করে, এই 'ভর' অপদেবতার ভর, কিন্তু আদিবাসী মনে করে, ইহা প্রেতাত্মার 'ভর'। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি সুদীর্ঘ বিবরণ এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার পার্বত্য অঞ্চলে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন আসামের চা-বাগান-প্রত্যাগত এক শবর যুবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আসাম হইতে চলিয়া আসিলে কেন? সে দেশ ভাল লাগিল না?

শবর বলিল, দেশ ভাল লাগিবে না কেন? সেখানকার রাস্তা ঘাট কত সুন্দর, কাজ করিলে খাইবারও কোন অভাব নাই; কিন্তু একটি বিষয়ে সেখানে বড়ই অসুবিধা!

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বিষয়?

সে বলিল, সেখানে রোগ হইলে কোন প্রতিকার নাই!

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি কথা? সেখানে চা-বাগানের হাসপাতাল নাই?

শবর বলিল, হাসপাতাল আছে, বড় বড় বাঙ্গালী ডাক্তার বাবুও আছেন, কিন্তু থাকিলে কি হইবে? তাহারা রোগের কি বোঝেন? আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলাম, তাহারা রোগের কিছু বোঝেন না? তবে কে বোঝে?

শবর বলিল কুরণ বই ছাড়া কেহ রোগ বুঝে না, তাহারা পুজা না দিলে কোন রোগ আরোগ্য হইতে পারে না।

শবরদিগের নারী-পুরোহিতের নাম কুরণ বই, তাহারা রোগের কারণ নিরূপণ করিয়া নিজেদের মতে তাহার প্রতিকারের উপায় করিয়া থাকে। শবর বলিয়া যাইতে লাগিল, রোগ ত আর কিছু নয়, ইহা প্রেতাত্মার আক্রমণ; কাহার প্রেতাত্মা, কেন ধরিল, কি হইলে ছাড়িবে, তাহা কুরণ বই ছাড়া কে বলিবে? তারপর কুরণ বই সেই অনুযায়ী পুজা দিলে তবে রোগ দূর হইতে পারে, নতুবা নহে।

শবর যুবক এমন দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলি বলিল, যে ইহার উপর আর আমি কোন মন্তব্য করিতেও সাহস পাইলাম না। ইহাদের এই বিশ্বাস যে নিতান্ত আন্তরিক, এই বিষয়ে আমার আর সংশয় মাত্রও রহিল না। এই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হইয়া তাহারা আসামের উন্নততর জীবনের আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিয়া আদিম জীবনের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

শবর যুবককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা বলিতে পার, প্রেতাত্মাগণ কেন আমাদিগকে এমন আক্রমণ করে?

যুবক বলিল, তাহা আর বলিতে পারিব না? সে ত অত্যন্ত সহজ কথা। আমাদের উপর হিংসায় তাহারা জ্বলিয়া মরে। আমরা শল্পী (তাড়ী) পান করি, ভাত খাই, ছেলেপিলে লইয়া ঘর করি, আরও কত কি আমোদ আহ্লাদ করি। কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পায় না; সেইজন্য আমাদের উপর তাহাদের এমন হিংসা। যে যাহা খাইতে চায়, তাহা দিয়া তাহার পূজা দিলে, তবে সে ছাড়িয়া যায়, নহিলে প্রাণ পর্যন্ত লইয়া টান দেয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রায় প্রত্যেক উপজাতির মধ্যেই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যান্য ধারণার সঙ্গে অনুরূপ ধারণাও প্রচলিত আছে। তবে উড়িষ্যার শবর ও অন্যান্য প্রতিবেশী জাতিগুলির মধ্যে ইহা রোগের উৎপত্তির অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মার হিংসাত্মক আক্রমণ ব্যতীতও রোগের উৎপত্তি সম্পর্কে আদিম সমাজে আর একটি কারণ নির্দেশ করা হইয়া থাকে, তাহা কোন গুপ্ত শত্রুর ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া। উক্ত শবর-অধ্যুষিত অঞ্চলেই ভ্রমণ করিবার সময় এক বিধবা শবরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার স্বামী কি করিয়া মরিল?

শবরী বলিল, গ্রামের এক ব্যক্তির সঙ্গে একটা তালগাছের স্বত্ব লইয়া তাহার স্বামীর বিবাদ হইয়াছিল। তারপর সেই ব্যক্তি তিনটি মন্ত্র-পড়া হাঁসের ডিম তাহাদের বাড়ীর সম্মুখস্থ পথের মধ্যে গোপনে পুতিয়া রাখিয়াছিল। একদিন বহুরাত্রে তাহার স্বামী যখন পাহাড় হইতে শল্পী পান করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, তখন না জানিয়া সেই পথের মাটিতে প্রোথিত ডিমগুলির উপর দিয়া সে চলিয়া গেল। যাইবার সময় 'সর্, সর্, সর্' এই শব্দ শুনিতে পাইল। তারপর বাড়ি ফিরিয়া সে সেই যে শয্যা লইল, আর উঠিল না। মৃত্যুর পর তাহার প্রেতাত্মা ইড়াই বই কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছে।

প্রেতাত্মা কিংবা অপদেবতার আক্রমণ, অথবা কোন গোপন শত্রুর ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ফলেই যে রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এই প্রকার বিশ্বাস প্রচলিত আছে। অতএব উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুইটি সমগ্রভাবে আদিম জাতির এই সম্পর্কিত বিশ্বাস বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়।

এতদ্ব্যতীত রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আদিম সমাজ আরও কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা হইয়া থাকে। যেমন, বাধা-নিষেধ বা ট্যাবু ভঙ্গ। অবশ্য ইহার সঙ্গে প্রেতের কোন সম্পর্ক নাই। রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে গোঁড়া হিন্দুমতও আদিম সমাজের এই মতের অনেকটা অনুকূল। গোঁড়া হিন্দুদিগের বিশ্বাস, ইহজন্মে কিংবা পরজন্মে কোন জ্ঞানকৃত কিংবা অজ্ঞানকৃত পাপের ফলেই সাধারণ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। হিন্দুধর্মের নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ দ্বারা এই পাপপুণ্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করা হইয়া থাকে এবং হিন্দুধর্মের মতানুযায়ী পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত নামক আচার পালন করিবারও ব্যবস্থা আছে; রোগমুক্তির জন্যও তাহাতে কোন দৈব নির্ভরশীলতার পরিবর্তে একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধানের উপরই নির্ভর করা হইয়া থাকে।

আদিম সমাজের মধ্যে রোগোৎপত্তির কারণ সম্পর্কিত ধারণা লইয়া আলোচনা করিবার পরই তাহাতে রোগের প্রতিকারের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। স্থূলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে এই বিষয়ে আদিম জাতির প্রায় সর্বত্রই দুইটি প্রধান উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, প্রথমতঃ ঐন্দ্রজালিক (magical), দ্বিতীয়তঃ, ভৌতিক। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের অধিবাসী আদিম জাতির রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই ইহাদের মধ্যে হয় ঐন্দ্রজালিক, না হয় ভৌতিক কোন-না-কোন প্রকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। তবে ইহাদের প্রয়োগ করিবার প্রণালীর মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যাইতে পারে।

রোগে শয্যাগত হইয়া পড়িলে কিংবা অনেক দিন ধরিয়া ভুগিতে থাকিলে গণকের নিকট গিয়া এই রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইবে। এই গণক কোন অঞ্চলে গ্রাম্য পুরোহিত, ওঝা কিংবা এই শ্রেণীর দৈব কোন কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই নহে। যাই হোক, সে খড়ি পাতিয়া ছক

কাটিয়া কিংবা নিজস্ব অন্য কোন্ উপায়ে গণনা করিয়া কোন প্রেতাত্মার আক্রমণের ফলে রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করিয়া দিবে। অনেক সময় সে নিজেই তাহার প্রতিকারের ভার লইবে, কিংবা কোন কোন সময় প্রতিকার করিবার এই বিষয়ে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির সাহায্য লওয়া হইবে। উপরে শবর জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। অতএব শবর জাতির মধ্যেই এই বিষয়ে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহার একটি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

উড়িষ্যার কোরাপুট জিলার অভ্যন্তরে বুরমসিঙ্গি নামক এক গ্রামে আসিয়া একবার উপস্থিত হইলাম। সেখানে আসিয়াই শুনিতে পাইলাম, এক শবরের গৃহে এক বালকের রোগমুক্তির জন্য এক 'পুজা'র অনুষ্ঠান হইতেছে; শুনিবামাত্র সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা এই :

গৃহের মধ্যস্থলে একটি খুঁটির নীচে একটি ছোট বাঁশের ঝুড়িতে কিছু ধান আর একটি ঝুড়িতে কিছু চাউল দুই ভাগে পাশাপাশি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ধান ও চাউল-পূর্ণ ঝুড়ির পেটরার পাশে ছোট ছোট আরও ৪।৫ টি 'পত্র-পুটিকা (leaf-cup)য় আরও এই প্রকার পুজোপকরণ সাজাইয়া রাখা হইয়াছে; যেমন নুন, হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া ইত্যাদি। একজন কুরণ বই বা শবরদিগের স্ত্রীপুরোহিত এই পুজোপকরণগুলি সম্মুখে লইয়া বসিল। কুরণ বইর বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর হইবে, দেখিয়া মনে হয় অন্তঃস্বত্বা। ভারতীয় উপজাতির বিবরণে এই ধরণের স্ত্রীপুরোহিতের দৃষ্টান্ত খুব সুলভ নহে, ইহা শবর জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। যাই হউক, প্রথমতঃ সে সম্মুখের দিকে দুই পা ছড়াইয়া বাঁশের ঝুড়ি শুদ্ধ পুজোপকরণগুলি মাথায় লইয়া বসিল, এই ভাবে কিছুক্ষণ গীতিস্বরে কি মন্ত্র আবৃত্তি করিল। মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে সহসা তাহার মধ্যে প্রেতাত্মার 'ভর' হইল। রুগ্ন শিশুর জননী ইতিপূর্বেই কুরণ বইর পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিল, 'ভর' হইয়াছে বুঝিবামাত্র সে কুরণ বইর মাথা হইতে পুজোপকরণগুলি নামাইয়া লইল; লইয়া পূর্ব স্থানে রাখিয়া দিল। 'ভর' অবস্থায় চক্ষু মুদিয়া কুরণ বই গীতিস্বরে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে লাগিল। রুগ্ন শিশুর জননী তাহার পাশে বসিয়া একটি লাউয়ের খোল-নির্মিত পানপাত্রে করিয়া কিছু কিছু শল্পী মদ্য তাহার হাতে দিতে লাগিল; সে মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে ফাঁকে শল্পী পান করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ মন্ত্র বলিবার পর কুরণ বই থামিল। এইবার একটি মাঝারি আকৃতির শূকরকে

চারি পায়ে বাঁধিয়া পূজাস্থানে লইয়া আসা হইল। তারপর ইহার পিছনের দুই পায়ে ধরিয়া সহসা ইহাকে দরজার চৌকাঠের উপর জোরে এক আছাড় দেওয়া হইল, শূকরের নাক ও মুখ দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ শূকরটিকে বাহিরে লইয়া গিয়া ইহার ঘাড়ে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া দেওয়া হইল, মাথাটা ধড় হইতে তৎক্ষণাৎ পৃথক্ হইয়া গেল। শূকরের ছিন্ন মাথাটি একটি পাতায় করিয়া পূজাস্থানে লইয়া আসা হইল। পূর্বোক্ত ধান্যপূর্ণ ঝুড়িটির পার্শ্বেই শূকরের মুণ্ডটি নিয়া রাখা হইল। তারপর শূকরের ঘাড়ের নীচ দিক হইতে আর এক টুকরা মাংস বাহির করা হইল, তাহা একটু আগুনে সেঁকিয়া একটা পাতায় করিয়া পূজাস্থানে আনিয়া রাখা হইল। ইতিপূর্বে শূকরের ঘাড়ে ছুরি বসাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষতস্থান হইতে যে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা ভাঁড়ে রাখা হইয়াছিল। মাটির ভাঁড় হইতে কিছু রক্ত একটি পাতায় করিয়া আনিয়া পূজাস্থানে রাখা হইল।

এখন শূকরের মাংস রন্ধনের পালা আরম্ভ হইল। তাড়াতাড়ি শূকরের ছাল ছাড়ান হইল। মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হইতে লাগিল। উঠানের মধ্যে উনুন জ্বালাইয়া মাংস রান্না করা হইতে লাগিল, কিছু ভাতও রান্না করা হইল। তারপর দশ-বারোটি ছোট ছোট পত্রপুটিকায় কিছু কিছু ভাত ও তাহার সঙ্গে কিছু কিছু পক্ব শূকরের মাংস দিয়া তাহা আনিয়া পূজাস্থানে রাখা হইল। পত্রপুটিকাগুলি ধান ও চাউলপূর্ণ ঝুড়িগুলির পাশেই সাজাইয়া রাখা হইল।

কুরণ বই পুনরায় 'পূজা'য় বসিল। পুনরায় পূর্বের মত গীতিস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। তাহার দুই পা সম্মুখের দিকে প্রসারিত ও চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত, রুগ্ন শিশুর জননীর হাত হইতে শল্লীপূর্ণ পাত্র লইয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার উপর প্রেতাত্মার 'ভর' হইল। এইবার শিশুর মাতা রুগ্ন শিশুটিকে কোলে করিয়া পূজাস্থানে আসিয়া আগের জায়গায় বসিল। শিশুর বয়স দুই তিন বৎসর, গায়ে প্রবল জ্বর, উত্তাপ ১০৫-এর মত হইবে; তাহার গায়ে একটি কাপড় ছিল, পূজাস্থানে আনিয়া তাহার মাতা কাপড়টি খুলিয়া লইল। কুরণ বই লাউয়ের খোল-নির্মিত পান পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা জল লইল, সেই জলের মধ্যে কোন গাছের একটি সদ্যছিন্ন পাতা চুবাইয়া মন্ত্র পড়িয়া প্রথমতঃ তাহা দ্বারা পূজোপকরণগুলির উপর ও তারপর শিশুর অনাবৃত দেহে জল ছিটাইতে লাগিল। পৌষের শীতে জ্বরোত্তপ্ত দেহের উপর

জলের ফোঁটা পড়াতে রুগ্ন শিশু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মায়ের বুকে লুকাইতে চেষ্টা করিল, শিশুর মাতা কোন রকমেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। কুরণ বই ক্রমাগত জলের মধ্যে পাতা চুবাইয়া শিশুর গায়ে জল ছিটাইয়া যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ এই রকম করিবার পর কুরণ বই একটি ভাত ও পক্ক শূকর মাংস শুদ্ধ পত্রপুটিকা পূজাস্থান হইতে নিজের দিকে টানিয়া লইল। তাহা হইতে কিছু ভাত লইয়া কুরণ বই পার্শ্বোপবিষ্ট রুগ্ন শিশুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখে তুলিয়া দিল। সে থু থু করিয়া তাহা মাটিতে ফেলিয়া দিল। এইভাবে আরও দুই বার তাহার মুখে কুরণ বই ভাত তুলিয়া দিল, দুইবারই সে পূর্ববৎ তাহা থুথু করিয়া ফেলিয়া দিল। চতুর্থবার যখন এইভাবেই তাহার মুখে আরও কয়টি ভাত তুলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে ভাত কয়টি খাইয়া ফেলিল। তাহার জননী পাশে বসিয়া তাহাকে কখন কি করিতে হইবে না হইবে, সমস্তই বলিয়া দিতেছিল, সে তাহার মাতার কথামতই কার্য করিতেছিল। ছেলেকে এইভাবে খাওয়ানো শেষ করিয়া এইবার কুরণ বই ছেলের মা'র মুখে এক এক বার কিছু কিছু ভাত তুলিয়া দিতে লাগিল। মাতা রুগ্ন শিশুকে কোলে লইয়া স্তন্য দান করিতেছিল। সেও প্রথম তিনবার থু থু করিয়া মুখের ভাত ফেলিয়া দিল এবং চতুর্থবার তাহা গিলিয়া খাইল। 'পূজা' এইভাবে শেষ হইল। পূজা শেষ হওয়ার পর ভাত ও মাংস ব্যতীত অন্যান্য পুজোপকরণ, যথা ধান, চাউল, হলুদের গুঁড়া ইত্যাদি নূতন হাঁড়িতে পুরিয়া ঘরের চালে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

যে প্রেতাত্মার পূজা করা হইল, তাহার নাম ইউউঙ্‌ স্থম, তিনি সূর্যের প্রতীক্; জ্বর হইলে শরীর উত্তপ্ত হয় বলিয়া সূর্যই এই রোগের কারণ বলিয়া মনে করা হয়, সেই জন্য জ্বর রোগে সূর্যের পূজা করা হইয়া থাকে।

এখানে সূর্যের সঙ্গে সূর্যের এক কল্পিত পত্নীকেও পূজা করা হইয়াছে, সেই-জন্য পুজোপকরণ দুইভাগে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন যে প্রেতাত্মার 'ভর' হয়, তখন সেই প্রেতাত্মার নামে অর্পিত পুজোপকরণগুলি কুরণ বই মাথায় লইয়া বসে। পূজার প্রসাদ (এইক্ষেত্রে ভাত ও পক্ক শূকর মাংস) প্রকৃতপক্ষে রুগ্ন ব্যক্তিরই ভক্ষ্য। কিন্তু এইক্ষেত্রে যে রুগ্ন, সে দুগ্ধপোষ্য বলিয়া এই 'প্রসাদ' তাহার পরিবর্তে তাহার ভ্রাতা ও তাহার মাতাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

উল্লিখিত বিবরণটি বিশেষভাবে অনুধাবন করিলেই প্রেতাত্মার শক্তি বিষয়ে আদিম জাতির যে কি ধারণা, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা

যাইবে। সূর্য তাপ সঞ্চার করিয়া থাকে; সেইজন্য জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির দেহের তাপ বৃদ্ধির সূর্যই কারণ বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু সূর্য কেন মানুষের গায়ে এই রকম অকারণ তাপ বৃদ্ধি করিয়া মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ হন? কোন কুরণ বইকে একথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, সূর্য একজনের প্রেতাত্মা, প্রেত-লোক হইতে মুক্তি পাইয়া 'ইড়াই' বা দেবতা হইয়াছে, আমরা যদি তাহার পুজা না করি, তাহা হইলে সে কি খাইবে? মধ্যে মধ্যে মুরগী, শূকর, মহিষ এইসব খাইবার লালসায়ই সূর্য মানুষের মধ্যে রোগ দিয়া থাকেন, রোগগ্রস্ত হইলেই মানুষ তাহাকে এই সকল পশুপক্ষী বলি দিয়া পুজা করিবে; পুজা পাইলেই রোগ-দাতার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, রোগীও রোগমুক্ত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র যে পুর্বপুরুষের প্রেতাত্মাগণই বলি খাইবার লোভে বংশধরদিগের মধ্যে রোগ বিস্তার করিয়া থাকেন, তাহা নহে, অনেক সময় ইড়াই বা দেবতা হইয়া গিয়াও তাহারা পুজা খাইবার লোভে মানুষের মধ্যে রোগের বিস্তার করিয়া থাকেন বলিয়া মনে করা হয়। অবশ্য গভীরতম আলোচনায় দেখা যাইবে যে পুর্বপুরুষগণের প্রেতাত্মাই কালক্রমে বিবিধ দৈব চরিত্র ও নৈসর্গিক বস্তুর অধিষ্ঠাতা প্রাণ-পুরুষ বলিয়া কল্পিত হয়। উচ্চতর হিন্দুবিশ্বাসেও আকাশের নক্ষত্রকে কোন কোন পুবপুরুষের আত্মা বলিয়া কল্পনা করা হইয়া থাকে।

উচ্চতর হিন্দুসমাজেও রোগমুক্তির জন্য দেবতার নিকট পশুবলি মানসিক করিবার প্রবৃত্তি যে আদিম জাতির উক্ত মনোভাব হইতে জাত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বাংলাদেশের হিন্দুদিগের মধ্যেই এই ভাব প্রবলতম। শক্তি উপাসনার অধঃপতিত যুগে বাংলাদেশে এই মনোভাবের বিশেষ প্রচলন দেখা দিয়াছিল। এদেশের উচ্চতর জাতির অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের মধ্যে আজও এই বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল।

রোগমুক্তির জন্য শবর জাতির মধ্যে পুর্বপুরুষের প্রেতাত্মার যে প্রত্যক্ষ-ভাবে পুজা করা হইয়া থাকে, তাহার প্রণালীর একটু স্বতন্ত্র। এই প্রকার একটি অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল, তাহাও এখানে বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি।

উড়িষ্যার শবর জাতির দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একবার কিতুং নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একদিন শুনিতে পাইলাম; এক শিশুর রোগমুক্তির কামনায় এক শবর গৃহে জুজুমার পুজা হইতেছে। শবর ভাষায় পিতামহকে জুজুমা বলে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে,

আমাদের দেশে জুজু শব্দের অর্থ ভূত, শিশুকে জুজুর ভয় দেখান হয়। এখানে বুঝিতে পারা যাইতেছে, জুজুমা পিতামহের প্রেতাত্মা। উক্ত শিশুর পিতামহের বহুদিন পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছে ; পৌত্রের রোগমুক্তির জন্য তাহার প্রেতাত্মার পূজা করাই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ৩।৪ বৎসরে বয়সের একটি ছেলে বহুদিন যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিল, ভুগিয়া ভুগিয়া প্লীহা বাড়িয়া গিয়াছে ও হাত-পাগুলি কাঠির মত লিকলিকে হইয়া পড়িয়াছে। শিশুর মাতা কুরণ বইর নিকট শিশুর রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুরণ বই গণিয়া বলিল, ইহাকে ইহার জুজুমা বা পিতামহের প্রেতাত্মায় ধরিয়াছে, মুরগী বলি দিয়া তাহার পূজা না করিলে ইহার রোগমুক্তির কোন সম্ভাবনা নাই। বাধ্য হইয়া শিশুর জননী কুরণ বইর নির্দেশ মত পূজার আয়োজন করিয়াছে।

গৃহমধ্যে দুইটি ছোট বাঁশের পেটিকাপূর্ণ চাউল রাখিয়া উহার সম্মুখে কয়েকটি সদ্যছিন্ন গাছের পাতা বিছাইয়া রাখা হইল। একটি শল্লীপূর্ণ পাত্র হইতে দুই-এক ফোঁটা করিয়া শল্লী সেই পাতাগুলির উপর দেওয়া হইল। কুরণ বই এই উপকরণগুলি সামনে লইয়া সম্মুখের দিকে পা ছড়াইয়া সুর করিয়া মন্ত্র বলিতে লাগিল। আমার অনুবাদক মন্ত্রের এই প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে শুনাইল :

হে পিতৃপুরুষের প্রেতাত্মাগণ, তোমরা আইস ; তোমরা আসিয়া দেখ, তোমদিগকে কি দিই, কি না দিই; তোমরা আইস, শীঘ্র আইস ! হে বিভিন্ন দেওগণ, শীঘ্র আইস, তোমাদের জন্য পূজা সাজাইয়া বসিয়া আছি। সত্বর আইস, হে এই বংশের পূর্বপুরুষগণ, তোমরা শীঘ্র আইস।

মন্ত্র বলিতে বলিতে সহসা কুরণ বই থামিয়া গেল ; চোখ বন্ধ করিয়া দুই হাত শক্ত করিয়া মুঠি করিল, দাঁতে দাঁত ঘসিতে লাগিল ; ইহা হইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়া তাহার উপর প্রেতাত্মারা 'ভর' করিয়াছে। যাই হউক, কুরণ বইর এই অবস্থা হইবা মাত্র, পার্শ্বোপবিষ্ট একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা তাহার হাতের মুঠি খুলিয়া দিল, শক্ত করিয়া বাঁকান হাতটিকে নিজের হাত দিয়া মাজিয়া ঘসিয়া সোজা করিয়া দিল। কুরণ বই তখন জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কেন ডাকিয়াছ ? সে যে প্রেতলোকের কাহারও হইয়া এই প্রশ্ন করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা গেল।

পার্শ্বোপবিষ্ট মহিলাটি রুগ্ন বালকটিকে কুরণ বইর কোলে দিল। সে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, ইহার যত রোগ আছে, আমি

লইলাম —বলিয়া হাত দিয়া শিশুর সারা গা নির্মঞ্ছন করিয়া এক একবার হাত মুঠি করিয়া তাহা নিজের 'ট্যাঁকে' আনিয়া গুঁজিতে লাগিল। অর্থাৎ নিজে ট্যাঁকে করিয়া শিশুর সকল রোগ লইয়া গেল, ভাবে ইহাই বুঝাইল। কুরণ বই অনেকক্ষণ ধরিয়া এই রকম করিল; মধ্যে মধ্যে শিশুর গায়ে ফুঁ দিল। তারপর সে ভাবে বুঝাইল, শিশুর গায়ে আর কোন রোগ নাই।

এমন সময় একটি শবর যুবতী আসিয়া কুরণ বইর পাশে বসিল; দেখিয়া মনে হইল, যুবতীটিও কোন রোগে ভুগিতেছে। যুবতী তাহার নিজের রোগের কথা কুরণ বইর নিকট জানাইল। কুরণ বই তাহার প্রতিও অনুরূপ ব্যবস্থা করিল-অর্থাৎ সর্বাঙ্গ হাত দিয়া মুছিয়া মুঠিতে করিয়া তাহার রোগ নিজের ট্যাঁকে আনিয়া গুঁজিতে লাগিল। কুরণবই যুবতীকে বলিল, এন্‌ডাসুম (কোন একজনের প্রেতাত্মার নাম) তোমার রোগমুক্তির বিনিময়ে এই বৎসর নবান্ন উৎসবের পূর্বে একটি মুরগী খাইতে চাহিতেছেন; অতএব তুমি যথাসময়ে তাহার নামে একটি মুরগী বলি দিয়া পূজা করিবে। যুবতী তাহাতেই স্বীকৃত হইল, কুরণ বই তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সে একটু দূরে সরিয়া গিয়া বসিল।

কুরণ বই এইবার পুরামাত্রায় শল্পী পান আরম্ভ করিল। পার্শ্বোপবিষ্ট একটি বর্ষীয়সী মহিলা বার বার তাহার হাতে পানপাত্র তুলিয়া দিতে লাগিল, আর সে চক্ষু মুদিয়া পান করিয়া যাইতে লাগিল। এইবার তাহার উপর নূতন নূতন আত্মার 'ভর' হইতে লাগিল। আতিন নামক এক ব্যক্তি বহুদিন পূর্বে মরিয়া প্রেতলোক হইতে পিতৃলোকে গিয়া ইড়াই হইয়াছে (শবরদিগের মধ্যে এই প্রেতলোক ও পিতৃলোকের সুস্পষ্ট পার্থক্য বোধ বর্তমান আছে)। তাহার আত্মা কুরণ বইর উপর 'ভর' করিল। তাহার কথা না ফুরাইতেই কুরণ বইর উপর সর্পদেও'র 'ভর' হইল। তখন কুরণবই ঘন ঘন জিহ্বা বাহির করিয়া সর্পের জিহ্বা লেহনের অভিনয় করিতে লাগিল। দুই তিন মিনিট এই প্রকার করিবার পর সর্পদেও অন্তর্হিত হইলেন। তাহার সঙ্গে কাহারও কোনও বাক্যালাপ হইল না। তল্‌লু নামক এক ব্যক্তি কিছুকাল পূর্বে জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, এবার তাহার প্রেতাত্মা আসিল। নিমিলিত নেত্রে কুরণ বই ঘন ঘন শল্পী পান করিয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যেক নূতন আত্মার 'ভর' হওয়া মাত্রই কুরণ বই এক চুমুক পরিমাণ শল্পী পান করিয়া যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য এই শল্পী কুরণবইর মধ্যস্থতায় প্রেতাত্মাগণকেই নিবেদন করা হইতেছে। এইবার ক্রমাগতই কতকগুলি নূতন নূতন প্রেতাত্মা আসিয়া কুরণবইর উপর 'ভর'

করিয়া যাইতে লাগিল; কুরণবই নিজেই তাহাদের এইভাবে পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিল, 'আমি অমুক, বড় পিপাসা পাইয়াছে, কিছু শল্লী দাও'; তারপর শল্লী পান করিবার পর কুরণবইর মুখ দিয়া কোন প্রেতাত্মা কোন এক আধটা কথা বলিয়া কিংবা কেহ কেহ একেবারে কোন কথা না বলিয়াই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যে প্রেতাত্মা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, তাহার প্রশ্নের ধরন এই প্রকার: 'কেন ডাকিয়াছ, আমি আর বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না, আমার বহু কাজ, তোমার কি কথা, সত্বর বল।' হয়ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে প্রেতাত্মা প্রশ্ন শুনিবার জন্য অপেক্ষা করে, সে পার্শ্বোপবিষ্ট রুগ্ন ব্যক্তির আত্মীয়ের প্রশ্নের উত্তরে এই ধরনের জবাব দিয়া থাকে, 'কি করিয়া রোগ সারিবে? আমাদের কোন দিন কিছু খাইবার জন্য দিয়াছ? তোমরা না দিলে আমরা কোথায় পাইব? একটি ছাগল বলি দিয়া আমার পূজা কর। ছাগল না পার অন্ততঃ একটি মুর্গী দাও, আর শুধু আমাকে দিলেই চলিবে কেন? এই রোগ কিতুংসুম (অন্য এক দেবতা) দিয়াছে, তাহার নামেও একটি মুর্গী দিতে হইবে, নতুবা রোগ সারিবে না।' ইত্যাদি।

এই ভাবে প্রেতাত্মার পর প্রেতাত্মা আসিতে লাগিল। পাত্র পুরিয়া কুরণ বই ঘন ঘন শল্লী মদ্য পান করিয়া যাইতে লাগিল; পার্শ্বোপবিষ্ট কয়েকটি স্ত্রীলোক নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের রোগের কারণ ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ব্যগ্র ভাবে বার বার প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল, কুরণবইর মুখ দিয়া প্রেতাত্মাগণ ইচ্ছামত এক একটা জবাব দিয়া যাইতে লাগিল।

একটি রুগ্না যুবতী কুরণবইর খুব নিকটে আসিয়া ক্ষীণ স্বরে কি বলিল, কুরণবই তাহার গায়ে দুই হাতে হাত বুলাইয়া মাঝে মাঝে ফুঁ দিতে লাগিল। তারপর আর একজন বৃদ্ধা মহিলা আসিয়া কুরণবইর খুব নিকটে বসিল, সে নিজের কি অসুস্থতার কথা জানাইল। কুরণবই তাহার সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি জায়গায় মুঠি করিয়া ধরিয়া পূর্ববৎ সেই মুঠি শুদ্ধ হাত আনিয়া নিজের ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিবার অভিনয় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা উঠিয়া গেল।

সহসা কুরণবই চোখ মেলিয়া চাহিল, প্রেতাত্মার 'ভর' তাহার উপর হইতে ছাড়িয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত শল্লী পানের জন্য তাহার চক্ষু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, অবসন্ন দেহে টলিতে টলিতে সে কোনমতে পূজাস্থান হইতে উঠিয়া গেল।

বাংলা দেশের কোন কোন পল্লী অঞ্চলে এই আদিম সমাজানুযায়ী প্রেতাত্মা কর্তৃক রোগ-নির্ণয় ও রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রকার দৈব চিকিৎসকের প্রভাব যদিও এই দেশে বহুদিন যাবৎই হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি আজ পর্যন্তও বিভিন্ন রোগে তাহাদের মন্ত্রপূত জল বা মাদুলী কিংবা কোন টোট্‌কা ঔষধ এখনও শ্রদ্ধাভরে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা যে এই প্রদেশেরই প্রেতাত্মা সম্পর্কিত কোন আদিম অধিবাসীর বিশ্বাসের বিলুপ্ত-প্রায় কোন নিদর্শন মাত্র, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বাংলাদেশে আদিম চিকিৎসা প্রণালীর যতগুলি নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে একটির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহা হিজরা কর্তৃক রোগের কারণ ও রোগ মুক্তির উপায় নির্দেশ। হিজরার উপরও কোন প্রেতাত্মারই ভর হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে প্রায় অনুরূপ ব্যবস্থার প্রচলন আছে, সেইজন্য ইহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

পুর্ব বাংলায় এক লৌকিক দেবতার পুজা প্রচলিত আছে, তাহার নাম ডরাই বিষহরী। কোন শিশু ভয় (পুর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'ডর') পাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়িলে রোগমুক্তির জন্য এই দেবতার নিকট পুজা মানসিক করা হয়। এই পুজার প্রধান একটি অঙ্গ হিজরার গান। পুর্বে সম্ভবতঃ এই কার্যে প্রকৃত হিজরাকেই নিয়োগ করা হইত, বর্তমানে পুরুষেরাই মাথায় দীর্ঘ চুল রাখিয়া স্ত্রীলোকের মত সাজিয়া এই ব্যবসায় পালন করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে দেব-পুজাটি উপলক্ষ্য মাত্র, হিজরাই মূল লক্ষ্য। ডরাই বিষহরী পুজা যাহার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়, হিজরা তাহার বাড়ীর আঙ্গিনায় দুই পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতের বদ্ধ মুষ্টি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, আলু-থালু চুলে নানা অশ্লীল ছড়া কাটিতে কাটিতে মাথা একবার ডান দিকে ও আর একবার বাম দিকে ঘুরাইতে থাকে; দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহে। তাহার মধ্যে প্রেতাত্মার বা অপদেবতার 'ভর' হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। সমগ্র গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ তাহার চারিদিকে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়ায়, জনতার মধ্য হইতে যাহারা বয়সে প্রবীণ, তাহারা তাহাকে তাহাদের রুগ্ন আত্মীয়-স্বজনের রোগের কারণ, ফলাফল ও সম্ভবস্থলে প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করে। সেই অবস্থায় হিজরা এই সব প্রশ্নের নিজের ইচ্ছামত জবাব দিয়া যাইতে থাকে। কোন কোন স্থলে তাহাদের এক আধটি প্রতিকারেরও উপায় বলিয়া দেয়। প্রেতাত্মার সহায়তায় রোগ

গণনার এই প্রণালীটি ভারতবর্ষের বাহিরেও কোন কোন আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তবে এই কার্যে হিজরার ব্যবহার পূর্ববঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত আছে কি না, তাহার সন্ধান পাই নাই।

এ দেশে স্বপ্নে দৈব ঔষধ ও মাদুলী প্রাপ্তির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও বিশ্বাস অটুট আছে। পূর্ব পুরুষের যে সকল প্রেতাত্মা পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন, তাহারই এই সকল মাদুলি ও দৈব ঔষধ দিয়া থাকেন। পরে এই সকল প্রেতাত্মাই সাধারণভাবে দেবতারূপে কল্পিত হইয়া থাকে।

সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম জাতির রোগ জ্বালার কারণ পূর্ব পুরুষের প্রেতাত্মাগণ যে কি ভাবে ক্রমে বিভিন্ন রোগের অধিষ্ঠাতা লৌকিক দেবচরিত্রে পরিণত হইয়াছে, বাংলা দেশের লৌকিক ধর্মের ইতিহাস পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারা যায়। বিভিন্ন রোগের অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে এ দেশে বিভিন্ন দেব-দেবীর পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। যেমন বসন্ত রোগে শীতলা, কলেরায় ওলাঝোলা, পাঁচড়ায় ঘণ্টাকর্ণ, জ্বরে জ্বরাজ্বরী, বিষে বিষহরী, কুষ্ঠ রোগে ধর্মঠাকুর ইত্যাদি। এই সকল লৌকিক দেব-চরিত্র প্রথমতঃ এই সকল রোগে মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মা বলিয়া কল্পিত হইত, তারপর কালক্রমে হিন্দু দেবদেবীদিগের সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহারা কতকটা উন্নততর দেবরূপ লাভ করিয়াছে মাত্র। এই দেবতাদিগের মাহাত্ম্যসূচক লৌকিক কাহিনীগুলি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, তাহাদের অভিজাত্য উচ্চতর সমাজে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

অলৌকিক চরিত্রের মধ্যে ভূতের পরই রাক্ষসের কথা উল্লেখ করিতে হয়। ভূতের সঙ্গে রাক্ষসের একটি প্রধান পার্থক্য এই যে, ভূত অদৃশ্য থাকে, কোন কোন সময় ছদ্মবেশে আবির্ভূত হইয়া থাকে মাত্র, কিন্তু রাক্ষস সর্বদাই প্রত্যক্ষ চরিত্র। তাহার অপরিমিত দৈহিক বল থাকিলেও আকৃতি যেমন কুৎসিত, (মূলার মত দাঁত, হাতির মত কান, কুলার মত কান ইত্যাদি) তেমনই প্রকৃতিও অত্যন্ত কুৎসিত। ইহারা কাঁচা নরমাংসও আহার করিয়া থাকে। কিন্তু দৈহিক বল থাকা সত্ত্বেও মানুষের বুদ্ধির নিকট ইহারা সর্বদাই পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকে।

কেহ কেহ মনে করেন, কোন অনার্য জাতি সম্পর্কিত অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতির উপর মানুষ রাক্ষসের পরিকল্পনা করিয়াছে, ক্রমে তাহাদের আচার

আচরণ-সম্পর্কিত অতিরঞ্জিত বিশ্বাস হইতেই ইহাদের সম্পর্কে নানা অলৌকিক এবং উদ্ভট ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। রাক্ষসের আত্মা প্রায়ই নিজের দেহের মধ্যে থাকে না, Token বা কোন প্রতীকের মধ্যে থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ইহার অর্থ পরলোক-সম্পর্কিত কোন বিশ্বাস হইতে রাক্ষসের পরিকল্পনা আসিয়াছে। ভূত এবং প্রেতাত্মার সঙ্গেও সেইজন্য রাক্ষসের পরিকল্পনা অনেক সময় একাকার হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক স্মীথ টম্‌সন বলিয়াছেন,—From the belief about and fear of the dead among primitive men have come all sorts of ogre stories. The ogre is nothing but the dead, who has been variously imagined by different people. Whenever we have an ogre and a hero overcoming the ogre we have the dead and the protector against the dead. Fairies, dwarfs, nixes, brownies and all ogres of any kind come from the belief in the living dead. Naumann brings together a huge number of tales of the Bluebeard and of the Hansel and Gretel types and, though he admits certain of them are borrowed from others, in general he insists that they are all the natural expression of the fear of the dead and of the desire to overcome their power.

কিন্তু ভারতীয় লোক-কথায় প্রচলিত রাক্ষসের কাহিনীতে সকল রাক্ষস চরিত্রের পরিকল্পনাই যে মৃত বা প্রেতের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছে, এমন মনে হয় না। প্রতিবেশী অনার্য জাতির কুৎসিৎ আচরণের অতিরঞ্জিত চিত্র স্বরূপই এখানে অধিকাংশ রাক্ষস চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। রামায়ণ কাব্যে রাক্ষস একটি অনার্য জাতি। বৈদিক যুগ হইতেই ভারতের আর্যেতর জাতি রূপে রাক্ষস শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। প্রেতের সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

বামুন ভূত

এক দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে বহু কষ্টে ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া এক পরমা সুন্দরী কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে তাহাকে খুব কষ্ট করিতে হইত। এইরূপে জীবন ধারণ করা ক্রমেই তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তাই সে বিদেশে যাইয়া অর্থ উপার্জন করিবে স্থির করিল। সে তাহার কাছে সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, মাকে দিয়া বলিল, ইহা দ্বারা তোমরা দুইজনে খরচ চালাইও। আমি বিদেশে গিয়া চাকুরী করিব মনে করিয়াছি, যতদিন অর্থ সঞ্চয় না করিতে পারিব, তত দিন বাড়ী ফিরিব না। মা মনে মনে দুঃখ পাইলেও কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। আশীর্বাদ করিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

ব্রাহ্মণের বাড়ীর কাছেই একটি বেলগাছ ছিল, সেই গাছে একটা ব্রহ্মদৈত্য থাকিত। ব্রাহ্মণ যে দিন বিদেশ যাত্রা করিল, সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় সে ব্রাহ্মণের বেশে তাহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া সকলে ভাবিল, ব্রাহ্মণই বুঝি ফিরিয়া আসিয়াছে ব্রাহ্মণের স্ত্রী শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলে?

ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মদৈত্য বলিল, আজ দিন ভাল নয়, তাই ফিরিয়া আসিয়াছি।

ব্রাহ্মণের মা কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না, ব্রহ্মদৈত্য নির্বিবাদে বাড়ীর কর্তার ন্যায় থাকিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতীত হইল, ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ বিদেশে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছে। সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহারই মত আর একজন তাহার বাড়ীতে তাহারই স্থান অধিকার করিয়া আছে। ব্রাহ্মণকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া ব্রহ্মদৈত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা খুব অন্যায় হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের মা ও স্ত্রী উভয়ের একই প্রকার আকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

ব্রাহ্মণ উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই দেশের রাজার কাছে নালিশ করিল। রাজা তাহার সভাসদগণের উপর এই সমস্যার মীমাংসার ভার দিলেন এবং ব্রাহ্মণকে পরদিন আসিতে আদেশ করিলেন।

ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে এক মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের নীচে কতকগুলি ছেলে রাজা, মন্ত্রী, প্রজা সাজিয়া খেলিতেছিল। তাহারা ব্রাহ্মণকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখন সকল কথা ব্যক্ত করিল।

রাজবেশী যুবকটি খুব চতুর। সে ব্রাহ্মণের সব কথা শুনিয়া বলিল, রাজার অনুমতি পাইলে আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিতে পারি। রাজা সহজেই অনুমতি দিলেন। রাজসভায় বিচার আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মদৈত্য উভয়েই মনের কথা বলিল।

যুবক তখন একটি কুপী দেখাইয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, তোমাদের মধ্যে যে এই কুপীর মধ্যে ঢুকিতে পারিবে, সেই প্রকৃত মালিক। তুমি পারিবে? ব্রাহ্মণ বলিল, মানুষ কি কখনো কুপীর ভিতর ঢুকিতে পারে?

যুবক তখন ব্রহ্মদৈত্যকে বলিল, তুমি এই কুপীর ভিতর ঢুকিতে পার? যদি পার, তবেই বাড়ীর কর্তা হইতে পারিবে।

ব্রহ্মদৈত্য বলিল, কেন পারিব না? এই বলিয়া সে খুব ছোট আকার ধারণ করিল এবং সকলের সামনে যেই সেই কুপীর ভিতর ঢুকিল, অমনি যুবকটি কুপীরমুখ ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া দিল; ব্রহ্মদৈত্য আর বাহির হইতে পারিল না; কুপীর মধ্যে আটক হইয়া রহিল।

ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মন্তব্য

প্রেত-লোকেও জাতিভেদ আছে। অপঘাতে মৃত ব্রাহ্মণের প্রেত ব্রহ্মদৈত্য, অনুরূপ মুসলমানের প্রেত মামদো। এই কাহিনীটির মূল অভিপ্রায় প্রবঞ্চনা বা (Deception : প্রথমতঃ Woman deceived into sacrificing honour, K 1353 এবং তারপর False Husband, K 1915·1. গৃহে পরিত্যক্ত সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণে ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে; স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর রূপ ধারণ করিয়া স্বামীর অধিকার ভোগ করিয়াছে। সুতরাং প্রেতলোকে গিয়াও পার্থিব প্রলোভন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, ইহার মধ্য দিয়া তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

২

ভূতুড়ে বউ

একবার এক বামুনের বাড়ীর নিকটের একটি গাছে এক শাঁকচুন্নী-ভূত থাকিত। একদিন সে ক্রুদ্ধ হইয়া এক বামুনের স্ত্রীকে একটি গাছের কোটরে ঢুকাইয়া রাখিল এবং নিজে তাহার মূর্তি ধরিয়া বামুনের সংসারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বামুন কিংবা তাঁহার মাতা কেহই কিছু জানিতে পারিল না। তবে স্ত্রী যেন হঠাৎ সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গিয়াছে। বহু কষ্টসাধ্য কাজ সে অতি সহজেই করিতে পারিত এবং অতি দ্রুত করিত। বহু দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত কলসী আনিতে বলিলে সে তাহার হাত বিস্তৃত করিয়া তাহা লইয়া আসিত, তাহাকে উঠিয়া যাইতে হইত না। শাশুড়ী কোন কথা না বলিয়া পুত্রকে সমস্ত বিষয় জানাইল। একদিন দুই জনে দেখিল, সেই বউ কাঠ না থাকায় উনুনের মধ্যে আপন দুইখানি হাত ঢুকাইয়া জ্বালিয়া দিয়াছে—ভাত ফুটিতেছে। তখন স্ত্রী যে আসলে পেত্নী, তাহা বুঝিয়া, পুত্র ভূতের ওঝা ডাকিয়া আনিল।

ওঝা সরষে পুড়াইয়া স্ত্রীর নাকের কাছে ধরিতেই, সে দৌড়াইতে লাগিল; কিন্তু কোন কথা প্রকাশ করিল না। ওঝা তখন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া জুতাপেটা করিতে লাগিল। তখন শাঁকচুন্নী নিজের পরিচয় দিল এবং বামুনের স্ত্রী কোথায় আছে জানাইল। বামুন স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং সেবা-যত্ন করিয়া সুস্থ করিয়া তুলিলেন। ওঝা শাঁকচুন্নীকে জুতাপেটা করিয়া বাড়ীছাড়া করিল এবং সে আর কখনো বামুনের কোন ক্ষতি করিবে না জানাইয়া বিদায় হইল। ইহার পর বামুন স্ত্রী ও মাতাকে লইয়া সুখে ঘর-সংসার করিতে লাগিল।—

আমার কথাটি ফুরালো…
নটে গাছটি মুড়োলো…

মন্তব্য

পূর্ববর্তী কাহিনীটির ইহা বিপরীত। অর্থাৎ পূর্বে ভূত স্বামী সাজিয়া স্ত্রীকে প্রতারণা করিয়াছিল, এখানে দেখা গেল, পেত্নী ব্রাহ্মণের স্ত্রী সাজিয়া স্বামীকে প্রতারণা করিয়াছে। সুতরাং ইহাও প্রবঞ্চনা (Deception KO-K99) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত।

৩

ব্রহ্মদৈত্য

এক গ্রামের প্রান্তে একটি বড় বটগাছ ছিল। তাহাতে ভূতেরা বাস করিত। গ্রামের কোন লোক সন্ধ্যার পর সেই দিকে গিয়া আর ফিরিতে পারিত না, ভূতের হাতে প্রাণ দিতে হইত। সেই গ্রামের জমিদার তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি প্রচার করিলেন, সন্ধ্যার পর যে সেই বটগাছের ডাল ভাঙিয়া আনিতে পারিবে, তিনি তাহাকে একশো বিঘা নিষ্কর জমি উপহার দিবেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে রাজী হইল না।

সেই গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া বাস করিতেন। তাঁহারা এত দরিদ্র ছিলেন যে, অনাহারে তাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ জমিদারের ঘোষণা শুনিয়া এই কাজ করিতে রাজী হইলেন। অনাহারে মরা অপেক্ষা, ভূতের হাতে প্রাণ দেওয়া ভালো মনে করিয়া ব্রাহ্মণ ডাল ভাঙিতে গেলেন। বটগাছের কিছু আগে একটি বকুল গাছ ছিল। বকুল গাছের নীচে আসিয়া ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, বটগাছের নিকটে যাইতে আর সাহস হইল না। এমন সময় এক ব্রহ্মদৈত্য সেই বকুল গাছ হইতে নামিয়া ব্রাহ্মণকে সাহায্য করিতে আসিল এবং সেই ব্রহ্মদৈত্যের আদেশে ভূতেরা নিজেরাই ডাল ভাঙিয়া দিল।

সকালে জমিদার এবং গ্রামের অন্যান্য লোকেরা গিয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন এবং ব্রাহ্মণকে এক শত বিঘা শস্যপূর্ণ নিষ্কর জমি দান করিলেন। ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়িলেন—শস্য কাটিয়া ঘরে তুলিবার মত অর্থ তাঁহার ছিল না। তিনি আবার বকুল গাছের নীচে যাইয়া ব্রহ্মদৈত্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেই বট গাছে একশত ভূত ছিল। ব্রহ্মদৈত্য তাহাদের সাহায্যে রাতারাতি ধান কাটিয়া মাড়িয়া গোলায় তুলিয়া দিল। ব্রাহ্মণের আর কোন অভাব রহিল না।

কিছু দিন পরে ব্রাহ্মণ পুনরায় সেই বকুল গাছের নীচে যাইয়া ব্রহ্মদৈত্যকে স্মরণ করিলেন। ব্রাহ্মণ জানাইলেন যে, তিনি এক হাজার ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে চান। ব্রহ্মদৈত্য তৎক্ষণাৎ রাজী হইল এবং ব্রাহ্মণকে ভাঁড়ারের স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিল। তারপর সেই একশত ভূতের সাহায্যে এক রাতেই হাজার লোকের খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিল।

ভোজের দিনে হাজার ব্রাহ্মণ খাইল। ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মদৈত্যের সহিত খাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু অদৃশ্য থাকিয়া ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণের সহিত শেষ দেখা করিতে আসিল, কোন খাদ্য গ্রহণ করিল না। ব্রাহ্মণকে বিপদে সাহায্য করায় ব্রহ্মদৈত্যের প্রেত-জীবনের অবসান হইয়াছে—সে পুষ্পক রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ইহার পর বহুকাল সুখে দিন কাটাইয়াছিলেন।—

আমার কথাটি ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো…

মন্তব্য

ইহা পরোপকারী ভূত (Benevolent Ghost) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর কাহিনী পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক-কথায় কচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক সময় সদ্য লোকান্তরিত প্রেত নিজের পরিবারস্থ লোকের কোন উপকার করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের কাহিনীতে সাধারণভাবে পরোপকারী ভূতের কোন কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই হয়ত Stith Thompson তাঁহার নির্দেশিকায় এই বিষয়ক কোন অভিপ্রায়ের উল্লেখ করেন নাই। সেক্সপীয়রের Hamlet নাটকের ভূতের কথা তৎকালীন ইংরেজ জাতির সাধারণ লোকের বিশ্বাস অনুসরণ করিয়াই কল্পিত হইয়াছে। তাহাতে হ্যামলেটের পিতার ভূতকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং পরোপকারী বলা যায় না। সে দেশে ভূত সর্বদাই অনিষ্টকারী; কিন্তু এ দেশের পরিকল্পনায় যে সকল প্রেত মুক্তি চায়, তাহারা পরোপকার করে বলিয়া বিশ্বাস।

৪

প্রেতলোক

একদেশে এক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী থাকিত। তাহারা খুব গরীব ছিল, ভিক্ষা করিয়া খাইত। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে করিতে অনেক দূর গিয়া পড়িল; কিন্তু সে দিন সে কোথাও ভিক্ষা পাইল না; অতদূর হইতে বাড়ী ফিরিতে না ফিরিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল; তখন ব্রাহ্মণ কি করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া আশ্রয়ের খোঁজ করিতে লাগিল।

তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, রাস্তায় লোকজন নাই। ব্রাহ্মণ অন্ধকারে ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিল। হঠাৎ একটি লোক তাহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তাহাকে অনেক ডাকিল; কিন্তু সে কোন সাড়া দিল না। ব্রাহ্মণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, আরও একজন লোক যাইতেছে। ব্রাহ্মণ তাহার কাছে গিয়া বলিল, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিলাম, পথ ভুলিয়া নির্জন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি, দয়া করিয়া আমাকে একটু থাকিবার স্থান দিন।

সেই লোকটিও ব্রাহ্মণের কথার 'কোন জবাব দিল না। শুধু ইঙ্গিতে আরও আগে যাইতে বলিল। ব্রাহ্মণ এই সব দেখিয়া খুব অবাক হইয়া গেল। এদেশের লোকেরা কি কথা বলিতে জানে না, না কি? ইহারা মানুষই নয়? এই সব ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ অন্ধকার ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

এইরূপ কিছু দূর আসিবার পর ব্রাহ্মণ দূর হইতে একটি বাড়ীতে অনেক লোকজন যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইল। চারিদিকে দিনের মত আলো জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিল, নিশ্চয়ই ঐ বাড়ীতে কোন উৎসব হইতেছে। আশ্রয়ের আশায় ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি ঐ বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইল, দ্বারবান্ দ্বারে পাহারা দিতেছে। অনেক লোকজন আসা যাওয়া করিতেছে; কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই। ব্রাহ্মণ উত্তরোত্তর অবাক্ হইতে লাগিল। সে দ্বারবানের কাছে যাইয়া ভিতরে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিল।

ব্রাহ্মণের সব কথা শুনিয়া দ্বারবান তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গেল এবং রাজার সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সেও নিজের মুখে কোন

কথা বলিল না ; ব্রাহ্মণ ব্যাপার দেখিয়া বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, রাজার সঙ্গে কথা বলিয়া দেখা যাক্, কি হয়। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, মহারাজ, আমি খুব ক্ষুধার্ত, সকাল হইতে কিছুই খাই নাই, দয়া করিয়া আমার খাইবার ও থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে খুবই উপকৃত হইব।

ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আহার করিয়া রাজার কাছে আসিয়া বলিল, মহারাজ, আমি আপনার কাজকর্ম দেখিয়া খুব অবাক্ হইয়াছি। আপনার এত লোকজন কাজ করিতেছে, কিন্তু কাহারও মুখে কথা নাই কেন? তখন রাজা বলিলেন, আমরা কেহই জীবিত নাই, সকলেই প্রেত। এক কালে এই রাজ্য-সম্পদ আমারই ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণকে অসম্মান করিবার অপরাধে সকলের এই দশা হইয়াছে। এতদিন আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম, দয়া করিয়া আমাদের পরিত্রাণ করুন। আপনার আগমনে আজ আমরা উদ্ধার পাইলাম। আমার বিষয় বৈভব দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।

ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইয়া গেল। সে তখন রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, আপনি অক্ষয় স্বর্গলাভ করুন। ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে সবাই উদ্ধার হইয়া গেল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই সম্পত্তি লাভ করিয়া কালক্রমে একজন ধনবান্ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল।

মন্তব্য

ইহার প্রধান অভিপ্রায় প্রেতের রাজ্য (Land of the Dead, E181) জীবনের স্পর্শে মৃত্যুলোকের মুক্তি দেখা দিল। এখানেও পরোপকারী প্রেতের কথা যে আসে নাই, তাহা নহে ; তবে এখানে নিজের মুক্তি হইয়াছে বলিয়াই পরের উপকার করিবার প্রেরণা আসিয়াছে। পূর্ববর্তী কাহিনীর মত ইহাতে নিঃস্বার্থ পরোপকারের কথা নাই। ব্রাহ্মণের দিক হইতে ইহা সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate, N.) বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৫

দস্যু ভূত

এক দেশে এক বণিক্ ছিল। তাহার সংসার বলিতে ছিল কেবল একটি ছেলে আর একটি পুরানো চাকর। ছেলের বয়স যখন আঠারো বৎসর, তখন সেও পিতার ব্যবসায়ে যোগ দিল। পিতাপুত্রে ব্যবসায়ে দিন দিন উন্নতি করিতে লাগিল। কিছুদিন ব্যবসা করিবার পর বণিক হঠাৎ একদিন প্রাণত্যাগ করিল। ঐ সময়েই একদিন খবর আসিল, তাহার সাতখানি ডিঙ্গা জলমগ্ন হইয়াছে। বণিকের ছেলে একদিকে পিতার মৃত্যুশোক এবং অন্যদিকে সাতখানি ডিঙ্গার ক্ষতি সহ্য করিতে পারিল না। সে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সব বিক্রয় করিয়া বিদেশে যাইবে স্থির করিল। পুরানো চাকরটিও তাঁহার সঙ্গ নিল। পরদিন সকালে তাহারা ডিঙ্গায় আরোহণ করিল। ডিঙ্গা অতি বেগেই চলিতে লাগিল। হঠাৎ একদিন কর্ণধার বলিল, আজ হাওয়ার গতি ভাল না। ঝড় উঠিবে। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে প্রবলবেগে ঝড় আসিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিকট চিৎকার করিতে করিতে জলদস্যুদের ডিঙ্গা আসিয়া তাহাদের ডিঙ্গায় ধাক্কা দিল। কিন্তু ঝড়ের গতি অনুকূলে থাকাতে দস্যুদের ডিঙ্গা অনেক দূরে গিয়া পড়িল, তবে সংঘর্ষণের ফলে সদাগরের ডিঙ্গায় জল ঢুকিতে লাগিল। ডিঙ্গাটি জলমগ্ন হইবার আগেই কয়েক জন যাত্রী আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বণিকের ছেলে এবং তাহার চাকরও ছিল। তাহারা রাতদিন অনাহারে অনিদ্রায় ডিঙ্গার সন্ধান করিতে করিতে দস্যুদের ডিঙ্গাটিকে দেখিতে পাইল। অনাহারে মরা অপেক্ষা দস্যুর হাতে মরা ভাল, এই স্থির করিয়া তাহারা দুইজন সেই জাহাজে গিয়া উঠিল। উপরে গিয়া দেখে, প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন লোকের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, সকলের দেহই ক্ষতবিক্ষত, সকলেই যুদ্ধের সাজ পরিহিত। মাস্তুলে হেলান দিয়া এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার হাতে সুতীক্ষ্ণ তরবারি এবং পোশাক ডিঙ্গার কর্ণধারের মত। তাহার হাত পা শেকল দিয়া বাঁধা। তাহারা এই দৃশ্য দেখিয়া নির্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য বলিল, চলুন নীচে যাইয়া দেখি, আরও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা।

তাহারা নীচে আসিয়া দেখিল, সব ঘরই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ পোশাক, নানাপ্রকার খাবার এবং অসংখ্য টাকাকড়িতে সেই সব ঘর পরিপূর্ণ। এই সব দেখিয়া তাহারা ভয়ে এবং আনন্দে কি করিবে, স্থির করিতে পারিল না। যাহারা

ইহাদের হত্যা করিয়া গিয়াছে, তাহারা যদি আবার ফিরিয়া আসে, তবে তাহাদের কি দশা হইবে? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। তখন চাকর প্রভুকে বলিল, বোধহয় ইহারা বিদ্রোহী হইয়া পরস্পরকে হত্যা করিয়াছে, তাহা হইলে এই সম্পত্তি আপাততঃ মালিকহীন। তখন মনিব বলিল, চল, আমরা দুইজন এইসব মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিই। কিন্তু তাহারা যাহাকেই তুলিতে চায়, তাহাকেই তুলিতে পারে না। এদিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তাহারা জাহাজের নীচের তলায় একটি ঘরে আশ্রয় নিল। রাত্রি যখন দ্বিতীয় প্রহর, তখন জাহাজের উপরিভাগে প্রচণ্ড কোলাহল ও বিকট আর্তনাদ শুরু হইল। তাহারা ভাবিল, বুঝি কোন জলদস্যু এই ডিঙ্গা লুঠ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সকাল হইতেই আপনি সব নিস্তব্ধ হইল। চাকরকে সঙ্গে লইয়া বণিকপুত্র উপরে গিয়া দেখে ঠিক আগের দিনের মত যে যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়িয়া রহিয়াছে। এইরূপে চারদিন কাটিয়া গেল। তখন তাহারা ঠিক করিল, দিনের বেলা ডিঙ্গা চালাইয়া কোন বন্দরে যাইবে। তাহারা দিনের বেলা ডিঙ্গা চালাইত, সন্ধ্যার সময় বন্ধ রাখিত, রাত্রে সেই কোলাহল চলিতে লাগিল। দুই চারিদিন এইভাবে ডিঙ্গা চালাইয়া অবশেষে তাহারা বন্দরে পৌঁছাইল। বন্দরে পৌঁছাইয়া তাহারা একটি ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া মৃতদেহগুলিকে একে একে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন অধ্যক্ষকে তোলা হইল, তখন সে বলিয়া উঠিল, আমরা বহু দিবস এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; আজ আপনার কৃপায় আমরা শাপমুক্ত হইলাম। আশীর্বাদ করি এই বিপুল সম্পদ লইয়া আপনি সুখে থাকুন, এই বলিয়া সে চুপ করিল।

বণিকের ছেলে ও তাঁহার চাকর অতুল ঐশ্বর্যের মালিক হইয়া গেল।

মন্তব্য

পূর্ববর্তী কাহিনী কয়েকটির মত ইহাও পরোপকারী ভূত অভিপ্রায়ের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। তবে ইহার মধ্যে একটু নৈতিক সুর শুনিতে পাওয়া যায়। দস্যুবৃত্তি করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের মুক্তি হইল না, পরে সেই সঞ্চিত অর্থ দান করিবার সুযোগ লাভ করিয়া তাহারা মুক্ত হইয়া গেল। ইহাতে কতকটা দান-মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে বলিয়া অনুভূত হইবে।

৬

ভূতের মন্ত্রণা

এক দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার নাম দামোদর। সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য সে দেশে বিখ্যাত ছিল। সকলের শোকে দুঃখে সে প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিত। দেশের সবাই তাহাকে এইজন্য ভালবাসিত। কিন্তু এক দুরাত্মা প্রেত ব্রাহ্মণকে একেবারে সহ্য করিতে পারিত না। কি করিয়া তাহাকে পাপকার্যে প্ররোচিত করিয়া তাহার পুণ্যফলকে নষ্ট করিবে, তাহাই সেই দুরাত্মার প্রধান চিন্তা হইল।

এমন সময় সেই দেশের রাজকুমারীর খুব কঠিন অসুখ হইল। নানা দেশ হইতে অনেক চিকিৎসক আসিল; কিন্তু কেহই সফলকাম হইল না দেখিয়া রাজা কন্যাকে দামোদরের আশ্রমে পাঠাইবেন ঠিক করিলেন। ব্রাহ্মণের পবিত্র চরিত্রের করুণায় যদি কন্যা আরোগ্য লাভ করে, এই আশা করিয়া রাজা তাহাকে আশ্রমে পাঠাইলেন। রাজকুমারীর রূপের ছটায় আশ্রম আলোকিত হইল। বৃদ্ধ ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণও সেই রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। ভূত সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণের কানে দৈববাণীর ছলে বলিল, ব্রাহ্মণ, সুযোগ যখন পাইয়াছ, তখন এই কন্যাকে ছাড়িও না, বাহকদের বল, কাল সকালের পূর্বে রোগমুক্তির আশা নাই। ব্রাহ্মণেরও তখন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। সে ভূতের কথা-মত কাজ করিল। রাজাও কোনরূপ সন্দেহ করিলেন না। কারণ, ব্রাহ্মণকে সকলেই বিশ্বাস করিতেন।

অনঙ্গপ্রভাবে ব্রাহ্মণ তখন জ্ঞান হারাইয়াছে। ভূতের প্রভাবে বিমোহিত হইয়া সে ভূতের কথামত সব কাজ করিতে লাগিল। পরে জ্ঞান হইলে ব্রাহ্মণ ভূতের সব কারসাজি বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর কোনো উপায় নাই। ভূত তখন পরামর্শ দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ দেখিল, তাহার ধর্মের পথ তো কলঙ্কিত হইলই, উপরন্তু লোকনিন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইবারও আর কোনও উপায় নাই। তাই সে বাধ্য হইয়া ভূতের সাহায্য চাহিল। ভূত বলিল, তোমাকে আরও একটি পাপকাজ করিতে হইবে। রাজকন্যাকে হত্যা করিয়া আশ্রমের প্রান্তে মাটিতে পুঁতিয়া রাখ। রাজবাটী হইতে লোক আসিলে বলিও রাজকুমারী নীরোগ হইয়া সকালেই চলিয়া গিয়াছে। কেহই তোমার কথায় সন্দেহ করিবে না এবং তোমার পাপকাজও জানিতে পারিবে না।

ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। এদিকে ভূত রাজবাড়ীর লোকেদের কাছে গিয়া বলিল, তোমরা যাহাকে অন্বেষণ করিতেছ, আশ্রমের মাটীর তলায় তাহার মৃত-দেহ দেখিতে পাইবে। তখন তাহারা তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়িয়া রাজকন্যার মৃতদেহ দেখিতে পাইল। তাহারা শোকে অধীর হইয়া পড়িল এবং শাস্তিস্বরূপ ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল। ব্রাহ্মণের শূলদণ্ডের আদেশ হইল। এই সময়ে সেই ভূত আবার ব্রাহ্মণের কাছে হাজির হইল এবং সবার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণকে বলিল, যদি এখনও প্রাণে বাঁচিতে চাও, তবে আমার উপাসনা কর। আমি তোমায় রক্ষা করিব।

ব্রাহ্মণ প্রাণভয়ে তাহাতেই রাজী হইল এবং তখনি ভক্তিভাবে ভূতের স্তুতিবাদ শুরু করিয়া দিল। ভূত খুব খুশী হইল, এতদিনে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সে ব্রাহ্মণের নরকবাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া সেস্থান ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন ব্রাহ্মণ নিজের কৃতকর্মের জন্য খুব অনুতপ্ত হইল; এতদিনের সঞ্চিত পুণ্য বিসর্জন দিয়া সে বিলাপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার কান্না শুনিয়া এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া দিল এবং রাজার কাছে ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। রাজা কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া খুসীমনে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিলেন।

মন্তব্য

এখানে ভূত তাহার স্বাভাবিক চরিত্রগুণই প্রকাশ করিয়াছে, অর্থাৎ অনিষ্টকারী বা খল (villain) চরিত্রেরই অভিনয় করিয়াছে। এই কাহিনী সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। প্রথম বক্তব্য এই যে, ইহার মধ্যে রাজকুমারীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের যে আচরণের ইঙ্গিতটি রহিয়াছে, তাহা অশ্লীল। বহিরাগত এক শ্রেণীর লোক-কথায় এই প্রকার অশ্লীল ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া গেলেও সাধারণভাবে লোক-কথা মাত্রই ইহা হইতে মুক্ত। ইহার মধ্যে মুসলমান কথাসাহিত্যের একটু প্রভাব অনুভব করা যায়। তারপর কোন লোক-কথাই সাধারণত বিয়োগান্তক হইতে পারে না বলিয়া ইহাকে প্রায় জোর করিয়াই শেষ পর্যন্ত মিলনান্তক করা হইয়াছে। এক সন্ন্যাসী দ্বারা নিহত রাজকন্যাকে জীবিত করিয়া তোলা হইয়াছে।

ছদ্মরূপিণী

এক রাজার দুই রাণী। রাজার বিপুল ঐশ্বর্য ; কিন্তু তবু তাহার মনে শান্তি নাই। রাজার দুই রাণীর মধ্যে কোন রাণীরই ছেলে নাই। অনেক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্মেও কোন ফল হয় নাই।

একদিন সকালে এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজাকে বলিল, আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি। এই ঔষধ একটি পাকা হরীতকীর সহিত খাইলে ছোটরাণীর পুত্র জন্মিবে। আপনার রাজ্যের সীমার বাহিরে একটি জঙ্গল আছে, সেইখানে গেলে দেখিবেন, একটি গাছে একটি হরীতকী পাকিয়া আছে। এইরূপ বিবরণ দিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। রাজা পরদিন সকালবেলায়ই হরীতকী আনিবার জন্য সেই নিবিড় বনের মধ্যে গেলেন। কিন্তু চতুর্দিকে কোথাও সন্ন্যাসি-বর্ণিত সেই হরীতকী গাছ খুঁজিয়া পাইলেন না। ক্লান্ত হইয়া তিনি একটি গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক রাক্ষসী অসামান্য সুন্দরী যুবতীর বেশ ধরিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই নির্জন বনের মধ্যে এক রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া রাজা খুব অবাক্ হইয়া গেলেন। মেয়েটি ধীরে ধীরে বলিল, মহারাজ আমি যে কে এবং কেন এই বনের মধ্যে আছি, তাহা আমি জানি না। বোধহয় ছোটবেলায় আমার মা বাবা আমাকে বনবাস দিয়াছেন, সেই অবধি আমি এই বনের মধ্যে আছি এবং ফলমূল খাইয়া বাঁচিতেছি। রাজা সব শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি এই বনের মধ্যে কোন্ গাছে পাকা হরীতকী আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিব।

রাজার কথা শুনিয়া খুশী হইয়া মেয়েটি বলিল, মহারাজ, আগে আমাকে বিবাহ করুন এবং প্রতিজ্ঞা করুন, কোনদিন আমায় পরিত্যাগ করিবেন না, তবে আপনাকে ঐ ফল আনিয়া দিব।

রাজা তখন গান্ধর্বমতে তাহাকে বিবাহ করিলেন। রাক্ষসীও মায়াপ্রভাবে একটি হরীতকী গাছ তৈয়ারী করিয়া রাজাকে ফল পাড়িয়া লইতে বলিল। রাজা সেই ফল ও নতুন বধূ লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ঔষধ খাইয়া

ছোটরাণী সন্তানসম্ভবা হইলেন। রাজ্যের সকলেই খুসী হইলেন। কেবল সেই রাক্ষসী মনে মনে কুমতলব চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন সুযোগ বুঝিয়া সে রাজাকে গিয়া বলিল, আমাকে যদি সত্যই ভালবাসেন, তবে আপনার দুইজন রাণীকে আজই বনবাস দিন।

রাজাও নিরুপায় হইয়া ছোটরাণী ও বড় রাণীকে বনবাস দিলেন। বড়রাণী ও ছোটরাণী বনে গিয়া একটি পাহাড়ের গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। কিছুদিন পর ছোটরাণীর একটি অতি সুন্দর ছেলে হইল। উভয় রাণী মিলিয়া তাহাকে নির্জন গুহার মধ্যে মানুষ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজপুত্র বড় হইল। সে সকল কথা শুনিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

রাজপুত্র রাজবাড়ীতে যাইয়া চাকুরীর জন্য আবেদন করিল। রাজা তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। ইতিমধ্যে নূতন রাণী-রাক্ষসী রাজবাড়ীর সকলকেই খাইয়া ফেলিয়াছে; কেবল এক মন্ত্রী এবং রাজা বাঁচিয়া আছেন। রাজপুত্র সমস্ত দিন রাজাবাড়ীতে থাকিয়া সন্ধ্যার পুর্বে বাসায় ফিরিয়া যাইত বলিয়া রাক্ষসী তাহাকে খাইতে পারিত না। তাই রাক্ষসী মনে করিল, যে উপায়েই হউক, ইহাকে জব্দ করিতে হইবে। একদিন সে অসুখের ভাণ করিয়া রাজাকে বলিল, কেহ যদি বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি আনিতে পারে, তবেই আমি ভাল হইব। রাজা খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন ছদ্মবেশী রাজপুত্র আসিয়া বলিল, কোথায় পাওয়া যাইবে জানিতে পারিলে, আমি ঐ জিনিস আনিয়া দিব। তখন রাজা অন্দর হইতে একটি চিঠি আনিয়া তাহাকে দিল। যুবক চিঠি লইয়া তখনি রওয়ানা হইল। কৌতূহলী হইয়া পথের মধ্যে সে চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে তাহাকে খাইয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া আছে। যুবক চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া যথাস্থানে গিয়া পৌছাইল। সেখানে গিয়া রাক্ষসীর মাসীকে বলিল, মায়ের ভারি অসুখ, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি না হইলে বাঁচিবে না। রাক্ষসীর মাসী তাহাকে খুব যত্ন করিল এবং কাঁকুড়ের বিচি আনিয়া দিল। রাজকুমার ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছে যে ঘরের মধ্যে একটি পাখী রহিয়াছে। সে পাখীটি লইতে চাহিলে রাক্ষসীর মাসী বলিল, ইহাতে তোমার মায়ের পরমায়ু আছে। শুনিয়া রাজপুত্র সুযোগের অপেক্ষায় রহিল এবং একদিন রাক্ষসীর অবর্তমানে পাখীটি লইয়া পলাইয়া আসিল। পর দিন সকালে রাজাকে গিয়া বলিল, মহারাজ, আমার একটি বক্তব্য আছে। আপনি সভা করুন। রাজা সভা ডাকিলে যুবক সমুদয় বৃত্তান্ত বলিল এবং

প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য রাক্ষসীকে ডাকাইয়া আনিয়া পাখীর এক একটি অঙ্গ ছিন্ন করিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষসীরও অঙ্গচ্ছেদ হইতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসীর জীবন লীলা শেষ হইল। রাজ্যে শান্তি আসিল।

মন্তব্য

প্রেত নররক্তপিপাসু। রক্ত-লালসায় এখানে কোন প্রেতিণী নারীরূপ ধারণ করিয়া রাজার অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, প্রেতিণীকেই এখানে রাক্ষসী বলিয়া মনে করা হইয়াছে। নতুবা সাধারণ রাক্ষস রাক্ষসীদের প্রকৃতি যেমন কুৎসিৎ, আকৃতিও তেমনই কুৎসিৎ। এখানে রাক্ষসী রাণীর আকৃতি সুন্দরী নারীর ন্যায়। প্রেতেরা সাধারণতঃ এই রূপ ধারণ করিতে পারে। রাক্ষসীরাও কখনও কখনও তাহা পারে। পূর্বেই বলিয়াছি, অনেক সময় প্রেতের আচরণ এবং রাক্ষসের আচরণের মধ্যে বিশেষ কিছুই পার্থক্য থাকে না; ইহার কারণ, প্রেতের পরিকল্পনার সঙ্গে রাক্ষস পরিকল্পনার উদ্ভবের সম্পর্ক আছে। তবে সাধারণভাবে রাক্ষস বিকৃত আকৃতি-বিশিষ্ট, প্রেত পার্থিব নরনারীর রূপ ধারণ করিতে সক্ষম। এই কাহিনীটি একটু অন্যভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে ইহার অভিপ্রায়গুলি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

হীরাবতী

এক রাজপুত্র ও এক মন্ত্রিপুত্র, দুইজনে খুব বন্ধুত্ব। একদিন দুইজনে দেশ ভ্রমণে গিয়া এক অদ্ভুত দেশে হাজির হইল। সেই রাজ্য মধ্যে একটিও জীবিত প্রাণী নাই। পথ ঘাট মাঠ সব জনশূন্য। দেখিয়া দুই জনেই খুব অবাক্ হইয়া গেল। এদিকে রাজপুত্র পথশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, তাই মন্ত্রিপুত্র খাবার অন্বেষণে বাহির হইল। কোনও ক্রমে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখে রাজপুত্রের আর খাইবার অবস্থা নাই। সে কেবলই বলিতেছে, হীরাবতী রাজকন্যাকে বিবাহ করিব। সব দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র বুঝিল, নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। সে রাজপুত্রকে লইয়া সেই দেশ ছাড়িয়া অন্য এক দেশে গেল। সেইখানে গিয়া হীরাবতী রাজকন্যার সকল বৃত্তান্ত শুনিল। শুনিল, কোন এক রাক্ষস আসিয়া রাজ্যের সকলকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং রাজকন্যাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। শোনা যায়, রাক্ষস সেখানে থাকে না, মাঝে মাঝে আসে, আবার চলিয়া যায়।

মন্ত্রিপুত্র মহা ভাবনায় পড়িল। কি করিয়া হীরাবতী রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়া রাজপুত্রকে সুস্থ করিবে ইহাই হইল তাহার একমাত্র চিন্তা। রাত্রি এক প্রহর হইয়াছে। রাজপুত্র ঘুমাইয়াছে। মন্ত্রিপুত্রের চোখে ঘুম নাই। সে হঠাৎ শুনিল, একটি পাখী গাছকে বলিতেছে, রাজপুত্র হীরাবতী কন্যাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পাগল হইয়াছে ; করিবে বটে, কিন্তু বাঁচিবে না। বাসরঘরে সাপের কামড়ে দুই জনেই মারা যাইবে। তবে যদি কেহ সেই সাপকে মারিতে পারে, তবে রাজপুত্র রক্ষা পাইবে। মন্ত্রিপুত্র সবই শুনিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে আবার একটি পাখী আসিয়া গাছকে বলিল, রাজপুত্র হীরাবতী কন্যাকে বিবাহ করিবে বটে তবে বাঁচিবে না। বরকনে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কেহ যদি তাহা আগেই ভাঙ্গিয়া রাখে, তবেই রাজপুত্র রক্ষা পাইবে, এই বলিয়া পাখী উড়িয়া গেল। তৃতীয় প্রহরেও আর একটি পাখী আসিয়া বলিল, রাজপুত্র হীরাবতী কন্যাকে বিবাহ করিলে কন্যা মারা যাইবে। খাবার সময় প্রথম গ্রাসই মুখে আট্‌কাইয়া যাইবে। তবে কেহ যদি সেই গ্রাস কাড়িয়া খাইতে পারে, তবে কন্যা রক্ষা পাইবে।

শেষ রাত্রিতে আবার একটি পাখী আসিয়া বলিল, হীরাবতী রাজকন্যাকে রাজপুত্র যদি বিবাহ করে, তবে দুইজনেই মারা যাইবে ; বর-কনে যেদিন নগর ভ্রমণে বাহির হইবে, সেইদিনই মত্ত হাতি তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে। তবে কেহ যদি হাতিটিকে মারিয়া ফেলিতে পারে, তবেই সব রক্ষা পাইবে। কিন্তু এই সকল কথা জানিয়া কেহ যদি প্রতিকার করে, তবে এই কথা প্রকাশ মাত্র সে পাষাণ হইয়া যাইবে। এই কথা প্রকাশ না হইলে হীরাবতীর কোন সন্তান হইবে না। তবে হীরাবতীর প্রথম পুত্রের ছিন্নমুণ্ড যদি সেই পাষাণের উপর বসাইয়া দেওয়া যায়, তবে পাষাণ প্রাণ পাইবে।

মন্ত্রিপুত্র সব শুনিয়া রাজপুত্রকে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ও রাণীর পুত্রের অবস্থা দেখিয়া মর্মাহত হইলেন। রাজা ও রাণীর কাতরতা দেখিয়া মন্ত্রিপুত্র পরের দিন লোকজন লইয়া হীরাবতী কন্যার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সেই দেশে গিয়া সরোবর তীরে কন্যার দর্শন অপেক্ষায় রহিলেন। তারপর একদিন হীরাবতী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া মন্ত্রিপুত্র তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। তখন রাজকন্যা বলিলেন, রাক্ষসকে মারিতে না পারিলে আমার উদ্ধারের কোনই আশা নাই। রাক্ষস যেই ঘরে থাকে, সেই ঘরে একটি সোনার ছোট বাক্সের মধ্যে দুটি ভোমরা ভোমরী আছে, তাহারাই রাক্ষসের প্রাণ। সেই ভোমরা ভোমরীকে মাটিতে না ছোঁয়াইয়া যদি মারিয়া ফেলা যায়, তবেই রাক্ষস মারা যাইবে। তবে সেই বাক্সটি রক্ষা করিবার জন্য একটি অজগর সাপ আছে। কেহ কাছে গেলেই তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। তবে সুবিধা এই যে, কোন একটি বড় জন্তু তাহাকে খাইতে দিলে সাত আট দিন আর তাহার নড়িবার শক্তি থাকে না। রাক্ষস সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া রাত্রি দশদণ্ড সময়ে আসে এবং সমস্ত রাত্রি থাকিয়া ভোরে চলিয়া যায়।

মন্ত্রিপুত্র সব শুনিয়া সেদিন ফিরিয়া গেলেন। পরদিন একটি হরিণ শিকার করিয়া তাহার সহিত বিষ মিশাইয়া সেই সাপটিকে খাইতে দিলেন, সাপ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইল। সেই সুযোগে তিনি বাক্সটিকে তুলিয়া লইলেন এবং মুহূর্তমধ্যে ভোমরা ভোমরীকে মারিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসও সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাজকুমারীকে উদ্ধার করিয়া মন্ত্রিপুত্র স্বদেশে খবর পাঠাইলেন। মহাসমারোহে হীরাবতী কন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ হইল। রাজপুত্র সুস্থ হইলেন।

বিবাহ হইবার পরেই একে একে দুর্ঘটনা ঘটিতে লাগিল, তবে মন্ত্রিপুত্র আগে হইতেই প্রস্তুত থাকায় রাজপুত্র ও হীরাবতী উভয়েই রক্ষা পাইলেন।

রাজ্যে সকলেই সুখী। কিন্তু হীরাবতী রাজকন্যার কোন সন্তান না হওয়ায় সকলেই চিন্তিত। যাগযজ্ঞ করিয়াও কোন ফল হইতেছে না। তখন মন্ত্রিপুত্র আসিয়া বলিল, যদি আমার আশা ত্যাগ করেন, তবে হীরাবতীর পুত্র লাভ হইবে। রাজা, রাজপুত্র, রাণী কেহই এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। মন্ত্রী এবং তাহার পত্নীও পুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। কিন্তু সব কথা শুনিয়া রাজী হইলেন শুধু হীরাবতী। প্রথম পুত্রের জীবনদানের প্রস্তাবেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। মন্ত্রিপুত্রও রাজপুত্রের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প। তাই একদিন মন্ত্রিপুত্র সর্বসমক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহার কথা শেষ হওয়া মাত্রই মন্ত্রিপুত্রের দেহ পাষাণ হইয়া গেল। রাজ্যে শোকের ঝড় বহিল। কেবল কর্তব্যে স্থির হীরাবতী প্রস্তরখণ্ডটি নিজের ঘরে রাখিয়া দিলেন।

যথাসময়ে হীরাবতীর একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। পুত্রকে দেখিয়া সকলেই এতই আহ্লাদিত হইলেন যে তাহাকে হত্যা করিবার কথা কাহারও মনেই উঠিল না। হীরাবতী পূর্বেই ধাত্রীর বদলে ঘাতিকাকে ডাকিয়া আনাইয়াছিলেন। তিনিই শুধু অবিচল রহিলেন। ঘাতিকাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঘাতিকা আদেশ পালন করিল। মন্ত্রিপুত্র নবজীবন লাভ করিল। রাজপুরীতে সকলেই পুত্রশোকে অধীর, এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া নিহত শিশুকে দেখিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী হীরাবতীকে ছিন্নমুণ্ডটি দেহের সহিত জুড়িয়া দিতে বলিলেন এবং মন্ত্রপুত জল দিয়া শিশুর দেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন। রাজ্যের সবাই সন্ন্যাসীকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

মন্তব্য

ইহার মধ্যে অনেকগুলি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইলেও ইহার প্রধান অভিপ্রায় পুনর্জীবন লাভ (Resuscitation EO-E199); তারপর জীবন প্রতীক (Life token), বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পক্ষী, পক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণী, বন্ধুর জন্য আত্মত্যাগ ইত্যাদি অভিপ্রায়ও ক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাক্ষস স্বরূপে অধিষ্ঠিত আছে, অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রেতের লক্ষণাক্রান্ত নহে। বিভিন্ন অভিপ্রায়ের সমাবেশে ইহার সম্যক্ রসস্ফূর্তি হয় নাই।

পক্ষীরাজ

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক, কিন্তু রাজ্যে শান্তি নাই। প্রত্যেক বছরই এক বিরাটকায় দৈত্য আসিয়া রাজ্যে অবাধ উৎপীড়ন করিত। প্রজাদের প্রাণহানিও হইত। প্রজাবৎসল রাজার আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইহার কোন সুরাহা হয় নাই। যথাসময়ে দৈত্য আসিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যাইত। একদিন এক রাজপুত্র আত্মপরিচয় গোপন করিয়া রাজদরবারে আসিয়া সেই দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। রাজা পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন এবং যথোপযুক্ত যুদ্ধসামগ্রী দিয়া সাহায্যের ব্যবস্থা করিলেন।

যথাসময়ে দৈত্য আসিয়া উৎপাত শুরু করিল। তাহার তিনটি মাথা, দেহের অর্ধেক মানুষের মত, অর্ধেক ঘোড়ার মত, নিঃশ্বাস এত গরম যে কাহারও গায়ে লাগিলে সে দগ্ধ হইয়া যাইবে। যুবক খুবসাহসী এবং যুদ্ধপ্রিয় ছিল। সে দৈত্যকে প্রথমেই অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া উপর্যুপরি এত আঘাত করিতে লাগিল যে, দৈত্য প্রাণভয়ে পালাইয়া গেল। যুবক অনেক অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না।

রাজা যুবকের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন ঠিক করিলেন।

কিন্তু যুবক দৈত্যকে শুধু তাড়াইয়াই খুশী হইল না, সে তাহাকে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে চিন্তা করিয়া ঠিক করিল যে একটা পক্ষীরাজ ঘোড়া হইলে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারা যায়। যুবক তখন তাহার অভিপ্রায় রাজার নিকট ব্যক্ত করিল। রাজা অপ্রয়োজন বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু যুবকের অসীম আগ্রহ দেখিয়া রাজা অবশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যুবক তখন একগাছা হীরার লাগাম লইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়া অন্বেষণে বাহির হইল। সে লোকমুখে শুনিয়াছিল, হীরার লাগাম পরাইয়া দিলে পক্ষীরাজ ঘোড়া বশীভূত হয়। যুবক জানিত কাকদ্বীপে সমুদ্রের তীরে এক প্রকাণ্ড বন আছে, সেইখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া জল খাইতে আসে, তাই সে প্রথমেই কাকদ্বীপের দিকে গেল। কিন্তু কাকদ্বীপ

কোথায় তাহা সে জানিত না। পথে বার বার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে সে কাকদ্বীপের সেই বিশাল বনের ধারে আসিয়া পৌছাইল। তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। সে সমুদ্রের ধারে গিয়া দেখিল, চারজন লোক বসিয়া আছে।

প্রথমেই সে একজন বৃদ্ধকে বলিল, মহাশয়, কখনো পক্ষীরাজ ঘোড়া দেখিয়াছেন? উত্তরে বৃদ্ধ বলিল, স্বচক্ষে দেখি নাই, তবে সমুদ্রের তীরে খুরের দাগ দেখিয়া মনে হয়, এ দাগগুলি পক্ষীরাজ ঘোড়ারই খুরের দাগ। যুবক আরও কিছুদূর গিয়া এক প্রৌঢ়কেও পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

প্রৌঢ় পক্ষীরাজ ঘোড়ার কাহিনী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। যুবক তখন একজন যুবতীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল। যুবতী বলিল, একদিন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত একটি জন্তুকে সে উপর হইতে নীচে নামিতে দেখিয়াছে। যুবক কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইল। একটি বালক তাহাকে আরও আশা দিল। ফলে যুবক সেইখানে থাকিতে মনস্থ করিল। প্রতিদিন সকালে সে সমুদ্রের তীরে গিয়া বসিয়া থাকিত। বালকটিও তাহার সঙ্গে আসিয়া বসিত। একদিন প্রায় বিকাল হইতেছে এমন সময় সেই বালকটি সহসা চীৎকার করিয়া বলিল, ঐ দেখুন—

যুবক জলের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দেখিল, একটি প্রকাণ্ড সাদা ঘোড়া ঘুরিতে ঘুরিতে নামিয়া আসিতেছে। যুবক তাড়াতাড়ি এক নির্জন জায়গায় গিয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ার নামিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘোড়াটি নীচে নামিয়া জল খাইতে মুখ নীচু করিবামাত্রই সে ধীরে ধীরে আগাইয়া গিয়া এক লাফে তাহার পীঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়াটি তখন যুবককে পীঠে লইয়াই উপরে উঠিতে লাগিল। যুবকটি তাড়াতাড়ি ঘোড়াকে হীরার লাগাম পরাইয়া দিল। অমনি মুহূর্ত মধ্যে ঘোড়া তাহার বশীভূত হইল। তখন সে পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া সেই রাজার রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। রাজা তাহার বীরত্বের জন্য তাহাকে প্রচুর সম্মানিত করিলেন।

কিছুদিন-পর আবার সেই দৈত্য আসিয়া রাজ্যে অত্যাচার শুরু করিল। খবর পাইবামাত্র যুবক পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। তারপর সেই দৈত্যের সঙ্গে যুবকের মহাযুদ্ধ হইল। যুবক কৌশলে নিজেকে ও ঘোড়াকে দৈত্যের নিঃশ্বাস হইতে বাঁচাইয়া রাখিল এবং একে একে দৈত্যের তিনটি মাথাই কাটিয়া ফেলিল। খবর শুনিয়া রাজা নিজে আসিয়া

তাহাকে অনেক সমাদর করিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং মহাসমারোহে নিজের কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। প্রজাগণও শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া যুবককে আশীর্বাদ করিল। রাজ্যে আর কোন অশান্তি রহিল না।

মন্তব্য

দৈত্য এখানে অনিষ্টকারী শক্তি। ইহা দ্বারা রাক্ষসও বুঝাইতে পারে, অনিষ্টকারী প্রেত বা ভূতও বুঝাইতে পারে। ইংরেজিতে ইহাকেই Devil বা Demon বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইংরেজি Devil-এর সঙ্গে বাইবেলের Satan-এর সম্পর্ক আছে, কিন্তু বাংলা দৈত্য বুঝিতে তেমন কিছু বুঝায় না; কেবলমাত্র অপরিমিত শক্তির অধিকারী কোন দানবীয় রূপ বুঝায়। তবে পুরাণের অসুরের সঙ্গে বাংলা লোক-কথার দৈত্য দানবের চরিত্রের কিছু সম্পর্ক থাকিতে পারে। দৈত্যের আকৃতি সর্বদাই বিকৃত থাকে। ইংরেজিতে One-eyed devil-এর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এখানেও দৈত্যের তিনটি মাথা।

দৈত্য শব্দটির ইংরেজি কয়টি প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, যেমন giant, demon dragon, monster, spirit, ইত্যাদি। সংস্কৃতেও দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। সূক্ষভাবে বিচার করিলে প্রত্যেকটি শব্দকেই প্রকৃত একার্থবাচক বলিয়া মনে হইবে না। সংস্কৃত পুরাণ অনুসারে দেখা যায়, কশ্যপের ঔরসে দক্ষরাজের কন্যা দিতির গর্ভেজাত সন্তানগণই দৈত্য নামে পরিচিত। দেবতাদিগের সঙ্গে তাহারা স্বর্গের অধিকার লইয়া সর্বদাই সংগ্রামে লিপ্ত ছিল; সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ইংরেজি যে শব্দগুলি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটির সঙ্গেই সাধারণ মানুষের সম্পর্ক আছে। সাধারণ মানুষের উপর বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে। বাইবেলের শয়তান-চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের সম্পর্ক আছে। কারণ, শয়তানও মানুষেরই অনিষ্ট-সাধন করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু পুরাণের দৈত্য, দেবতাদিগেরই শত্রু, কিন্তু তাহাদের সাধারণ মানুষের কোন অনিষ্ট সাধন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বাংলা দেশে অনিষ্টকারী যে সকল দৈত্যের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারা ইংরেজি কিংবা মুসলমান কথা-সাহিত্য যথা আরব্য ও

পারস্য উপন্যাসের প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই গল্পটিও তাহাই।

ইংরেজি giant শব্দটি দ্বারা অনেক কিছুই বুঝাইতে পারে। তবে আকৃতির বিশালতা এবং বীভৎসতা প্রধানতঃ ইহা দ্বারা বুঝাইয়া থাকে। ইহারা সাত-মাথা, তিন-মাথা, এক-মাথা, কপালের মধ্যভাগে একটি মাত্র চক্ষু—এই প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। বাংলা লোক-কথার রাক্ষস কখনও কখনও এই প্রকার হয়। কিন্তু দৈত্য বলিতে দেবতারই শত্রু বুঝায়—পূর্বেই বলিয়াছি, তাহারা কশ্যপ মুনির ঔরস ও দক্ষকন্যা দিতির গর্ভজাত; সুতরাং তাহারা সুন্দর দেবাকৃতি। পক্ষীরাজ ঘোড়া বিস্ময়কর প্রাণী (Marvelous creature F 200-F 699) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত।

১০

বিদ্যাবতী

এক সদাগর, তাহার পুত্র বিদ্যাধর। সে একদিন ঘোড়ায় করিয়া চলিয়াছিল। রাজদরবারে বন্দী পিতাকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে মলয়াপাটন যাইতে হইবে। সেখান হইতে সোনার আস্তানা না আনিতে পারিলে পিতার মুক্তি নাই।

কত গ্রাম, নগর জনপদ পার হইয়া বিদ্যাধর চলিয়াছেন, তবুও যেন চলার শেষ নাই। সারা অঙ্গে ক্লান্তি নামিয়া আসিতেছে। শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে।

চলিতে চলিতে এক দীঘির পাড়ে আসিয়া বিদ্যাধর হাজির। তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্তাচলগামী। সামনে আদ্যিকালের বুড়ো বট, তাহারই নীচে ক্লান্ত সদাগরপুত্র ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ফাঁসুড়ে ডাকাত মনোহরের এই রাজ্য। তাহার ঘরে জোয়ান সাতবেটা, আর পরমা সুন্দরী কন্যা বিদ্যাবতী। মেঘের মত কালো চুল, হাঁটু পর্যন্ত তাহার বিস্তার, মুক্তার মত দাঁত। কন্যা যখন হাসেন, তখন মাণিক ঝরে, কাঁদিলে মুক্তা পড়ে। বুড়া বৃদ্ধ মনোহর ফাঁসুড়ে ছিল আবার গণৎকার, তাই গুণিয়া জানিতে পারিল যে, বিদ্যাধরের নিকট পাঁচটি মাণিক আছে। তখন বৃদ্ধের প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। বহু দিনের পরে শিকার মিলিয়াছে; ছিধা, সিধা ও মাধাকে ডাকিয়া বলিলেন। কেমন করিয়া সেই মাণিকগুলি হস্তগত করিবে সাত ভাই অনেক চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারিল না। বৃদ্ধ তাহাদের উপদেশ দিল, বিদ্যাধরকে বোনাই বলিয়া সম্বোধন কর এবং ভুলাইয়া তাহাকে এই বাড়ীতে লইয়া আইস। বিদ্যাধরের কেমন যেন সন্দেহ হইল। বিবাহ যদি তাহার হইয়া থাকিবে, তবে পুনরায় পিতা তাহাকে বিবাহ কেন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বুঝাইল যে, নয় মাসের বর, আর ছয় মাসের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল; তাই সে বিবাহের কথা বিদ্যাধরের স্মরণ নাই। তাহা ছাড়া অমন সুন্দরী কন্যা যখন, তখন বৃদ্ধের বাক্য কি মিথ্যা হইবে? বিদ্যাবতীকে বৃদ্ধ সব কথাই বলিলেন যে কৌশলে পাঁচটি মাণিক আদায় করিতে হইবে। বিদ্যাবতী এই কাজ বহু বার করিয়াছে; অনেকের স্ত্রী হইয়া অনেক তরুণের জীবন নাশ করিয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে সে সিদ্ধহস্ত।

বিদ্যাবতী রাত্রে অপরূপ সাজে সজ্জিত হইল, আর গোপনে এক ধারালো ছুরি লইল। বিদ্যাধর নিভৃত গৃহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাবতী তাঁহাকে জাগাইল। মোহিনী মায়া দিয়া বিদ্যাবতী সদাগরের সব খবর জানিয়া লইল। তারপর দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি যখন গভীর হইল, ফাঁসুড়ে-নন্দিনী জাগিয়া উঠিল। ধারালো অস্ত্র দিয়া যখন সে কাটিতে উদ্যত, তখন তাহার পৈশাচিক হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়িল। হাত হইতে ছুরিকা খসিয়া গেল।

সদাগর পুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা সে দেখিল, এক ভয়ঙ্করী মূর্তি বিদ্যাবতীর মধ্যে; তাহার মনে হইল যে, সে নিশ্চিত এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছে। যখন বিদ্যাধর বুঝিল, তাহার আর জীবনের আশা নাই, তখন বিদ্যাবতী বলিল, মুক্তি সে দিতে পারে, যদি বিদ্যাধর তাহার পতি হয়। বিদ্যাধর শপথ করিল, তাহার প্রার্থনা পরিপুর্ণ হইবে। বিদ্যাবতী গভীর রাত্রে দরজা খুলিয়া দিল, বিদ্যাধর পুর্ব প্রতিশ্রুতি মত বলিয়া গেল ফিরিবার সময় বিদ্যাবতীকে লইয়া যাইবে।

রাত্রি প্রভাত হইল। মনোহর কন্যার নিকট পাঁচটি মাণিক চাহিল। বিদ্যাবতী জানাইল যে সাধুর নন্দন পলায়ন করিয়াছে। ফাঁসুড়ে মনোহর ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। বিদ্যাবতী কৌশল করিয়া বলিল যে, সদাগর পুত্র যখন সোনার আস্তানা লইয়া ফিরিয়া আসিবে, তখন দ্বিগুণ ধন তাহাকে দিতে পারিবে। বৃদ্ধ কন্যার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতে লাগিল। মলয়াপাটনে গিয়া সদাগরপুত্র সোনার আস্তানা লইয়া ফিরিবার পথে আসিবেন, তাই সদাগরপুত্র গঙ্গার স্তবস্তুতি করিয়া আস্তানা লাভ করিল। লাভ করিল স্বর্ণের আস্তানা। এইবার সে পিতাকে মুক্ত করিতে পারিবে, সত্যপীরও নারায়ণের পুজা দিবে।

কিন্তু সদাগরপুত্র ফিরিবার পথে ফেঁসড়ার রাজ্য এড়াইয়া চলিলেন। মনোহর গণনার দ্বারা জানিতে পারিলেন, বিদ্যাধর পলাইতেছে। সাত বেটা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিল।

সদাগরপুত্র ভাবিল, তাহার আর নিস্তার নাই। বিদ্যাবতী কিন্তু ভারী আনন্দিত হইল, সদাগর পুত্র তাহার কথা রাখিয়াছে।

গভীর রাত্রে বিদ্যাধর আর বিদ্যাবতী বায়ুবেগে অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া পলায়ন করিল। সাতপুত্র বৃদ্ধের নির্দেশে ছুটিল। তারপর ভয়াবহ যুদ্ধ বাধিল। বিদ্যাধর ও বিদ্যাবতী ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল। বিদ্যাবতী সাত ভ্রাতাকে

পুর্বেই চলিয়া যাইতে বলিয়াছিল; কিন্তু তাহারা নিষেধ শুনিল না। সেই জন্য তাহাদের মাথা কাটা গেল। তারপর একে একে সবাই কাটা পড়িল; মা, বাবা, ভাজ কেহই বাদ গেল না। তাহারা দুইজনে তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

বিদ্যাধর ক্ষুধায় আকুল হইয়া পড়িল। এক বট বৃক্ষের তলায় সে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিদ্যাবতী বিদ্যাধরের হস্তে হেমঝারি দিয়া বলিলেন, যাও পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আইস। এক মালিনী সেই পুষ্করিণীর তীরে বাস করিত। সে তুকতাক্ মন্ত্রতন্ত্র জানিত। আসলে সে ছিল এক পেত্নী। মন্ত্রের গুণে সে বিদ্যাধরকে ছাগল বানাইয়া দিল।

বিদ্যাবতী গণনা করিয়া সব বুঝিতে পারিল। মৃত মা বাবার কথা স্মরণ করিয়া সত্যনারায়ণকে ডাকিল। তখন শূন্যে পুষ্পবৃষ্টি হইল, ফাঁসুড়ার বংশ বাঁচিয়া উঠিল। বটবৃক্ষের তলায় সব অঙ্গ আভরণ খুলিয়া ফেলিল, পুরুষের বেশ ধরিয়া রাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিল। তাঁহার নাম হইল রণজয়।

রাজার আদেশে রণজয় রাজ্য হইতে সিংহের উৎপাত বন্ধ করিল। রাজা তাহাকে কন্যাদান করিতে চাহিলেন। কিন্তু সে বিবাহ করিতে চাহিল না। বলিল, সে বিবাহ করিবে, যদি রাজা মালিনীর কুটির হইতে ছাগল আনিয়া দেন

মালিনী মিথ্যা কথা বলিল যে, ছাগল তাহার কাছে নাই। রণজয় কৌশলে ছাগলরূপী বিদ্যাধরকে বাহির করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে ভীষণ প্রহার করিলেন। তখন রণজয় বলিল, মন্ত্র বলে সে মানুষকে ছাগল করিতে পারে। বিদ্যাধর পুনরায় মানুষের রূপ ফিরিয়া পাইল। রণজয়কে রাজা রাজকন্যা গ্রহণ করিতে বলিলে, রণজয় আত্মপরিচয় প্রদান করিল। সভাসদেরা আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইয়া গেল। কন্যাকে বিদ্যাধরের হস্তে সমর্পণ করিতে রাজাকে বিদ্যাবতী অনুরোধ করিলেন। রাজবাড়ীতে আনন্দের ছড়া পড়িয়া গেল। রাজকন্যা জয়াবতীর সঙ্গে বিদ্যাধরের বিবাহ হইল।

তারপর জয়াবতী, বিদ্যাবতী ও বিদ্যাধর নিজ দেশে রওনা হইল। পিতাকে মুক্ত করিয়া বিদ্যাধর রাজাকে সোনার আস্তানা দিল। বিদ্যাবতী ও জয়াবতীকে লইয়া সদাগরপুত্র মনের সুখে ঘর সংসার করিতে লাগিল।

মন্তব্য

এক পেত্নর কথা এই কাহিনীর মধ্যে উল্লেখিত থাকিলেও, তাহা নিতান্ত গৌণস্থান অধিকার করিয়াছে। বরং ইহার মূল অভিপ্রায় ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বা magic; তাহা দ্বারাই পেত্নী তথা মালিনী বিদ্যাধরকে ছাগলে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। অনুরূপ কাহিনী পূর্বে ঐন্দ্রজালিক কাহিনীর মধ্যেই উল্লেখিত হইয়াছে। তবে পেত্নীর আচার আচরণ এখানে নির্ভুল। পুষ্করিণীর তীরে কিংবা বৃক্ষ শাখায়ই ইহারা বাস করে, এবং অনেক সময় নরনারীর ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহারা সমাজের অনিষ্ট করিয়া থাকে। সোনার আস্তানা মধ্যে বিস্ময়কর বস্তুর (Marvels) অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু সোনার আস্তানা কি জিনিস? মধ্যযুগের বাংলার চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীতে পাওয়া যায়, ধনপতি সদাগর গৌড়ের রাজার আদেশে সিংহল হইতে সোনার পিঞ্জর আনিতে গিয়াছিলেন। ইহা তাহাই মনে হয়। আস্তানা শব্দের অর্থ আবাস, পিঞ্জর পোষা পাখীর আবাস; সুতরাং সোনার আস্তানা বলিতে সোনার পিঞ্জরই এখানে মনে করিতে হইবে। তবে এ'কথা সত্য, Marvels বলিতে ইংরেজিতে যে অভিপ্রায়কে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, সোনার পিঞ্জর তাহা নহে; কারণ, যাহা মানুষের পক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব, তাহা কখনও বিস্ময়কর হইতে পারে না। তবে এই কাহিনীতে সোনার আস্তানা কথাটির উদ্দেশ্য তাহাই, ইহা দুর্লভ এবং দুষ্প্রাপ্য। সেইজন্য দুঃসাধ্য পরিশ্রম করিয়া দেশান্তর হইতে ইহা সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা অসাধারণ বস্তু (Extraordinary Things F 700-F 899) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত বলিয়াই সেই সূত্রেই ধরা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

দৈব কথা

দৈব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ লোক-কথার একটি বিশেষ অভিপ্রায়। বাংলা লোক-সাহিত্যে ইহারা প্রধানতঃ ব্রতকথাধর্মী রচনা। ব্রতকথার মধ্যে মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষারই বিকাশ দেখা যায়, পার্থিব বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই ব্রতকথার বাসনা এবং কামনা ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে যে অলৌকিকতার স্পর্শই থাকুক না কেন, ইহারা সাহিত্যগুণ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত নহে।

মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে দৈবের যে প্রভাব অনুভব করে, ব্রতকথার মধ্যে তাহারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। অনেক সময়ই ব্রতকথায় একটি লৌকিক দেবতা লক্ষ্য থাকে, কিন্তু তাহা সর্বক্ষেত্রেই দৈবেরই রূপক, তাহা সবিশেষ কোন চরিত্র নহে। তাহার শক্তিরও কিছুমাত্র তারতম্য নাই। সুতরাং ইংরাজিতে যাহাকে Fate এবং Divinity বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এখানে তাহাই দৈব। ইহা মানব-জীবন নিরপেক্ষ নহে। কারণ, দৈবের ক্রিয়া মানব-জীবনেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

দৈব এবং অলৌকিকতার কথা থাকা সত্ত্বেও এই সকল কাহিনী যে যথার্থ লোক-কথা, তাহার প্রমাণ ইহাদের অভিপ্রায়গুলির মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে। ইহাদের অভিপ্রায়, সাধারণ লোক-কথারই অভিপ্রায়। সুতরাং দৈব কিংবা অলৌকিকতা কাহিনীগুলির বহিরঙ্গগত অলঙ্কার মাত্র, ইহাদিগকে রূপক বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রত্যেকটি কাহিনীরই একটি বাস্তব লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের এই বাস্তব লক্ষ্য আছে বলিয়াই ইহারা সমাজ-মানসে সক্রিয় হইয়া আছে, পূজার মন্ত্রের মত প্রাণহীন হইয়া যায় নাই।

সমাজের গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনের একটি নিখুঁত পরিচয় এই কাহিনী-গুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ জীবনের রূপই ইহাদের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে, তবে জীবন-সমস্যার সমাধান ইহাদের বাস্তব নহে। সেখানে দৈব নির্ভরতার মধ্যে আত্মসমর্পণই ইহাদের বৈশিষ্ট্য।

১

প্রতিশোধ

(বগুড়া জিলার মেয়েলী কথ্যভাষায় সংগৃহীত)

ফাল্গুন মাস। কুলাই মঙ্গলবার। এক সদাগরের মাও কুলাই মঙ্গলবার কর্বি; বউ ঝিরা সকলেই কুলাই মঙ্গলবারের জোগাড় কর্‌তিছে। এমনি সময় সদাগরের বড় ব্যাটা আস্যা ক'ল যে, আমি যে তা আজ বাণিজ্যে যাব; তোমরা সকাল সকাল আমাক্ চাট্টা ভাত রান্ধ্যা দেও। ওরা রান্ধা-বাড়িও করে নাই, কিছুই না। পুজার জোগাড়িই কর্‌তিছে। কিছুক্ষণ পরে সদাগরের ব্যাটা আস্যা দেখে যে, পাকশাক কিছুই হয় নাই। তখন তার বড়ই রাগ হ'ল, রাগ্যা বাঁও পাও দিয়া পুজার সাজান কুলা উল্ট্যা ফাল্যা দিল। সদাগরের মাও বউ ঝি সকলে ভয়ে জড়বড় হয়্যা আগে যায়্যা ভাত রান্ধ্যা দিল, ডিঙ্গা বয়্যা দিল। সদাগর খাওয়া দাওয়া কর্যা যায়্যা ডিঙ্গায় উঠ্‌ল। ডিঙ্গা রওনা হ'ল। এদিকে কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডী কুপ্ত হ'ল। নগরের ডিঙ্গা নিয়া য্যায়া সাগরেত্ তল কর্‌ল। মাল্লা মাঝি ভাঁস্যা উঠ্‌ল, সদাগরও ঝাঁপায়্যা ঝুঁপায়্যা কুলেত্ উঠ্‌ল। কিন্তু হাজার টানাটানি কর্যাও ডিঙ্গাখানি তুল্‌তে পার্‌ল না।

তখন সদাগর বড়ই ভাবিত হয়্যা কেনারার উপর একটা বটগাছের তলায় বস্যা অক্রুণ্ কর্যা কাঁদ্‌বার লাগল। মাল্লা মাঝি কত কর্যা সদাগরেক্ বুঝাবার লাগ্‌ল। অনেকক্ষণের পরে একটু সুস্থির হয়্যা সদাগর মাল্লা মাঝিকেরে ক'ল, দেখ, ঐ যে ঢেঁকির পাড় পড়্‌তিছে ঐখান থাক্যা একটুক্ আগুন আন্যা আমক্ দিল্যা এনে, আমার যে তা বড়ই তামুক খাব্যার ইচ্ছা হ'চ্ছে। মাঝিকেরে মধ্যে একজন তখনি যেটি ঢেঁকি পড়্‌তিছিল, সেটি গেল। ক'ল যে, মাওরে! আমাক্ একটু আগুন দিব্যা? তারা ক'ল, না বাপু, আমরা ত ও আগুন দিবার পার্ব না, আমরা কুলাই মঙ্গলবারের চিড়া কুট্‌তিছি, এ আগুনঠ কাকেও ছাওয়া হয় না। মাঝি পুছ্‌ল, মাওরে! আমরাও ত বড় বিপদে পড়িছি, বর্তের কিছু পোর্‌সাদ আমাক্ ছাও, আমি নিয়্যা যাই। তারা ক'ল, এ বর্তের ত পোরসাদ নাই; যে বিপদেত্ পড়ে, তারি কুলখ্যা মঙ্গল-চণ্ডীর কাছে মানাছিনা কর্যা এই বর্ত করা লাগে। তবে আমি যাই, সদাগরেক্ ডাক্যা আনি—এই বলা মাঝি ফির্যা গেল।

যায়্যা সদাগরেক্ ক’ল, আগুন ত পাল্যাম না, তারা যে তা কুলাই মঙ্গলবারের চিড়া কুট্‌তিছে, সে আগুন কাকেও দেওয়া হয় না। তারা ক’ল, যে বিপদেত্ পড়ে, তারি কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডীর কাছে মানাছিনা কর্যা এই বর্ত করা লাগে। এই বর্ত কর্‌লে, অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়লে মুক্ত হয়। সদাগর দৌড়াদৌড়ি কর্যা গিরস্তের ঝি বেটীর কাছে যাচ্ছে, যায়্যা পুছিচ্ছে মাওরে, এ বর্তের ফল কি? এ বর্ত কর্‌লে কি হয়? তারা কচ্ছে, এ বর্ত কর্‌লে অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়্‌লে মুক্ত হয়।

মাওরে! আমিও বড় বিপদেত পড়িছি, আমাক্ তোমরা কিছু কিছু কর্যা ভাগ দ্যাও; আমিও যে তা এই বর্ত কর্বো। বউঝিরা কচ্ছে বর্ত, আমাকেরে সাথে করব্যার পার, সব ভাগ দিব; কিন্তু কুলার ভাগ দিব না।

সদাগর সেই গাঁয়েই থাকিছে; থাক্যা নগর মাঙ্গ্যা (মাগিয়া) এ বাড়ী ও বাড়ীত্ থাক্যা ১৭ মুঠ কর্যা জলপানের জোগাড় করিছে, এক বাড়ীতে থাক্যা একখান্ কুলা মাঙ্গ্যা নিচ্ছে, ধান হাতেত ডইলা চাল কর্যা নিচ্ছে, ১৭টা বরুয়ের (কুলের) পাতা আনিচ্ছে, ১৭ গাছ দূর্বা তুল্যা আনিচ্ছে; আস্তা, গিরস্তের ঝিবেটীকেরা দিয়্যা কুলাখানি সাজায়্যা নিচ্ছে। তারিকেরে সাথেই মোনে মোনে ভক্তি রাখ্যা পুজা করিছে। পুজা হল। সকলে কথা শুন্‌ব্যার বস্‌ল। কথা শুনা হলে সকলে ভক্তি কর্যা পোন্নাম কর্‌ল। সদাগরও মোনে মোনে ক’ল, মা! আমার মাও এই বর্ত কর্‌তিছিল, আমি তুচ্ছ কর্যা বাঁও পাও দিয়্যা তার কুলা উল্‌ট্যা ফাল্যা দিছিলাম, সেই জন্যে আমি এই বিপদেত্ পড়িছি; যদি এই বিপদেত্ থাক্যা আমাক্ মুক্ত কর, তাহ’লে আমি যথাসাদ্দি দিয়্যা তোমার পুজা কর্ব। এই কয়্যা পেন্নাম কল্ল।

তারপরে সকলে মিশ্যা মিল্যা পোরসাদ বাঁট্যা নিয়্যা খাব্যার বসল। খাওয়া হলে ২টা কি ৩টা কর্যা কলা, ১ ভাগ জলপান, বরুয়ের পাতা, ১টা কর্যা বরুই, ৮ চাল দূর্বা, কলার নেঙ্গুজ খান, পুজার নির্মালি সব কুলার উপর কর্যা নিয়্যা, কুলাখান মাথাত্ নিয়্যা উলু যোগাড় (হুলুধ্বনি) দিতে দিতে সকলে ঘাটেত্ গেল। সদাগরও ঐ রকম কর্যা নিজের কুলাখানি মাথাত্ নিয়া তার্‌কেরে সাথে সাথে ঘাটেত্ গেল। জলের কেনারাত্ বস্যা সক্‌কলে বল্‌ব্যার লাগ্‌ল যে, ফুল যায় ভাস্যা, পুত্তুর আসে হাস্যা—এই কয়্যা কুলা ভাসায়্যা দিল। সদাগরও তার ভিজা যেখানে তল হ’ছে সেইখানে যায়্যা তার কুলা ভাঁসা’ল। ভাঁসায়্যা মোনে

মোনে ভক্তি কর‍্যা পেন্নাম করল্ যে, মা! তুমি যদি পরতক্ক্য (প্রত্যক্ষ) দেব্‌তা হও, তবে আমাক্ এই বিপদেত্ থাক্যা মুক্ত কর, আমি নগর মাঙ্গ্যা তোমার পূজা কর্ব। কুলা ভাঁসায়্যা সকলে বাড়ী বিল্যা আলো।

পরের দিন ভোরে সদাগর হাত মুখ ধুব্যার কান্নে (কারণ) ঘাটেত যায়্যা দেখে যে, তার তলান্ ডিঙ্গা ধিকি ধিকি কর‍্যা একটু দেখা যায়। দেখ্যা তার বড়ই ভক্তি হ'ল। ঐ গাঁয়েই আবার ৮ দিন থাক্যা আবার নগর মাঙ্গ্যা পূজার জোগাড় করিছে। আবার ফের মঙ্গলবার সেই গিরস্তের ঝি বেটীকেরে সাথে করিছে। মোনে মোনে মান্‌সিত্ করিছে যে, মা! আমার ভরা ডিঙ্গা যদি ভাঁস্যা ওঠে, তাহ'লে ১৭টা মহোর দিয়া তোমার পূজা দিব। এই কয়্যা মোনের দ্বারা ১৭টা মহোর বাঁধা থুছে। গিরস্তের ঝি বেটীকেরে সালে পরসাদ (প্রসাদ) বাঁট্যা নিয়্যা খাছে। খাওয়া দাওয়া হ'লে আবার সকলে মিল্যা ৮ চাল দূর্বা, নির্মালি, কলার নেঙ্গুজ্ বরুই (কুল), বরুয়ের পাতা, ১ ভাগ জলপান সব সেই কুলায় মাথার উপর কর‍্যা গিয়া উলু যোগাড় দিতে দিতে ঘাটে ভাসাব্যার গেল। গিরস্তের ঝি বেটীরা জলের কেনারাত বস্যা, কুলা যায় ভাঁস্যা, পুত্তুর আসে হাস্যা—এই বল্যা কুলা ভাঁসাল। সদাগর যেখানে তার ডিঙ্গা তলা'ছে, সেইখানে যায়্যা কুলা ভাঁসাল। ভাঁসায়ে বাড়ী বিল্যা (বলিয়া) চল্যা আলো।

পরের দিন ভোরে সদাগর হাত মুখ ধুব্যার জন্যে ঘাটেত্ যায়্যা দেখে যে, তার ডিঙ্গা যেমন ভরাপোরা আছিল, ঠিক তেমনি ভাঁস্যা উঠেছে। সকলে হরির ধ্বনি দিল, উলু যোগাড় দিল। সদাগরের আর আল্লাদের সীমা সংখ্যা নাই। গিরস্তের ঝি বেটীকেরে কচ্ছে যে, মা! আমি বাড়ীতে পৌছ্যাই এই বর্তের জোগাড় কর্বো। তখন তোমাকেরে যদি নিয়্যা যাব্যার জন্যে লোক পাঠাই, তাহ'লে অবিশ্যি যা'ও। এই কয়্যা তারকেরে কাছে বিদায় হয়্যা সদাগর রওনা হচ্ছে। দিনরাত সমান কর‍্যা বাড়ীর দিকে আস্‌তেছে। বেলা চিকিমিকি আছে, এমনি সময় সদাগরের ডিঙ্গা আস্যা তার বাড়ীর ঘাটেত লাগ্‌ল। সকলে হরির ধ্বনি দিল, ডঙ্কা পড়্‌ল। ভাল ভাল নানা রকম কাপড় চোপড় পর‍্যা গওনা গাঁঠ্‌রার গায়েত দিয়্যা বৌ-ঝিরা ডিঙ্গা বর‍্যা দিব্যার জন্ম আলো। সদাগর ডিঙ্গাত থাক্যা নাম্যা আস্যা মায়ের পায়েত পরণাম (প্রণাম) কল্ল। পরণাম (প্রণাম) কর‍্যা বল্ল, মাও! ডিঙ্গা যে তা আগে বরা হবে না। আগে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা কর, তারি ৮ চা'ল দূর্বা আন্যা আগে আমার ডিঙ্গার পর দেও; তারপরে ডিঙ্গা বর‍্যা নিয়্যা যা'য়ো।

তুমি যে কুলাই মঙ্গলবারের বর্ত (ব্রত) করিছিলে, আমি তুচ্ছ কর্যা তার কুলা বাঁও (বাম) পাও দিয়া ঠেল্যা ফাল্যা দিছিলাম, সেইজন্যে আমার ভরা ডিঙ্গা যায়্যা সাগরেত তল্ হয়।

এই কয়্যা সদাগর তার মায়ের কাছে আগাগোড়া সব কথা ভাঙ্গ্যা চুর্যা কচ্ছে। কচ্ছে যে কুলখ্যা মঙ্গলচণ্ডীর কোপে আমার ভরাপুরা ডিঙ্গা যায়্যা সাগরেত ত'ল্যা গড়্লে (ডুবিয়া গেলে) সকলে ঝাঁপ্যা ঝাঁপ্যা কেনারাত্ উঠলাম। মোনের দুঃখেতে অনেক কাঁদাকাটি ক'রল্যাম; অনেক পরে একটুক্ সুস্তির হ'লে অমুক গাঁয়ে ঢেঁকির পাড় পড়ার শব্দ শুন্যা এক জন মাঝিক্ একটুক্ আগুন আনার জন্যে পাঠ্যা দিলাম। তাঁই ফির্যা আস্যা আমাক্ ক'ল যে গিরস্তের ঝি বেটীরা ত আগুন দিল না; ক'ল যে, আম্রা কুলাই-মঙ্গলবারের চিড়া কুট্তিছি, এ আগুন কাকেও দিব না। মাঝি তার্কেরে পুছিছিল যে এ বর্ত কল্লে কি হয়? তারা কয়্যা দিছে যে এ, বর্ত কল্লে অপুত্তুরের পুত্তুর হয়, নিধ্বনের ধন হয়, অন্ধের চক্ষু হয়, বিপদে পড়্লে মুক্ত হয়। আমি এই কথা শুন্যা তার্কেরে কাছে গিছিলাম। যায়্যা নগর মাঙ্গ্যা জয় জলপান, (চিড়ে মুড়কী) আর আর যা লাগে, সব এ বাড়ী ও বাড়ীত থাক্যা মাঙ্গ্যা নিয়্যা দুই মঙ্গলবার তার্কেরে সাথে এই বর্ত করিছিলাম। আর যেখানে আমার ডিঙ্গা ডুবছিল, সেইখানে যায়্যা কুলা ভাঁস্যায়া আস্ছিলাম। মনে মনে মান্সিত কর্যা ১৭টা মহোর বাঁধা থুছি যে, মা! আমার এই তলান্ (ডুবান) ডিঙ্গা যদি ভাঁস্যা উঠে তাহলে বাড়ীত্ যায়্যাই যথাসাদ্দি তোমার পুজা কর্বো। সেই জন্যে আমি তলান ডিঙ্গা ফির্যা পাছি। মা! তুমি আগে বাড়ীত্ যাও, যায়্যা সোনার মঙ্গলচণ্ডী গড়াও, রূপার ছত্তর ধর, তামার ঘটে জল দাও, দেশবিদেশ থাক্যা বামন পণ্ডিত আনাও, আত্মকুটুম্বু, বন্ধুবর্গ যাঁই যেখানে আছে, তার্কেরে আনাও; আর ঐ গিরস্তের ঝি বেটিকেরে আনাও, ১৭ ঝন্ বর্তী (ব্রতী) আনাও, আনায়্যা আগে পুজা কর। পুজা হলে সেই নির্মালি আর ৮ চা'ল দুর্বা আন্যা ডিঙ্গাত দেও; দিয়্যা ডিঙ্গা বর্যা নিয়্যা যাও।

এই বল্যা সদাগর ১৭টা মহোর মায়ের হাতেত দিচ্ছে। মাও সেই মহোর নিয়্যা যায়্যা ভাঙ্গায়্যা তাই দিয়্যা পুজার জোগাড় করিচ্ছে। বাড়ীতে ঘনঘটা কর্যা পুজার জোগাড় হচ্ছে। আত্মকুটুম্ব্ দাসদাসীত বাড়ী ভর্যা যাচ্ছে; সোনার মঙ্গলচণ্ডী হচ্ছে, রূপার ছত্তর হচ্ছে, তামার ঘট্ আসতিছে, দেশবিদেশ থাক্যা বামন পণ্ডিতেরা আসতিছে, কুলের

কুলপুমুত (কুলপুরোহিত) আস্যা পুজা করৃতিছে। ১৭ বাড়ীত থাক্যা ১৭ ঝন বর্তী আস্‌ছে, ১৭ পোরোস্ত (প্রস্থ) কর্যা পুজার জোগাড় হছে, অচালা অমাপা কর্যা পুজা হচ্ছে। পুজা হ'ল, ১৭ ঝন বর্তী বস্যা কথা শুন্‌ল। কথা শুন্যা, ৮ চাল দূর্বা, কলাগোটা, দুই সুদ্দা কলার নেঙ্গুজখান পুজার নির্মালি, একভাগ জলপান, ফলমূল, সব কুলার উপর তুল্যা নিয়্যা মাথাত কর্যা উলু যোগাড় দিতে দিতে ঘাটেত গেল; যায়্যা ডিঙ্গাত নির্মালি, ৮ চাল দূর্বা দিয়া বর্যা দিল। তখন সদাগর ভারে ভারে টাকা কড়ি ধনরত্ন নাম্যা নিয়্যা হরির ধ্বনি দিতে দিতে বাড়ীত আলো। অচলা হয়্যা মঙ্গলচণ্ডী ঘরেত বাঁধা থাক্‌ল, সদাগরের ধন-সম্পত্তি দিনের দিন বাড়তে লাগল। সেই থাক্যা মঙ্গল-চণ্ডীর কথা পিরথিবিত (পৃথিবীতে) নাম্‌ল।—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (রঙ্গপুর শাখা), ১৩১৪, পৃ. ৭৬-৮০—গিরিন্দ্রমোহন মৈত্র কর্তৃক সংগৃহীত

মন্তব্য

ইহার মূল অভিপ্রায়টিকে ইংরেজিতে সাধারণভাবে Misdeeds Punished (Q. 270) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দৈবকে অবহেলা করা এখানে দুষ্কার্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। পুজার উপকরণে পদাঘাত করাও দুষ্কার্যেরই (misdeed) অন্তর্ভুক্ত। তাহার জন্যই মূলতঃ এখানে শাস্তিভোগের কথা আছে। তারপর Reward for service of god (Q. 21) অর্থাৎ দেবতার প্রতি ভক্তির জন্য দৈব অনুগ্রহ অভিপ্রায়ও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। বাধা নিষেধ (Taboo) অভিপ্রায়টিও ইহাতে আছে। ব্রতের জন্য যে আগুনে চিঁড়া কুটা হইতেছে, তাহা তামাক খাইবার জন্য কিংবা অন্য কোন কাজের জন্য দেওয়া নিষিদ্ধ।

২

মুস্কিল আসান

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ এক পাড়াতেই ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাই একদিন গৃহস্থের বধূরা ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিল না। বলিল যে, এই ঠাকুর প্রত্যহ এক জায়গাতেই ভিক্ষা করে, আজ আমরা ভিক্ষা দিব না।

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ঐ দিন ভিক্ষা না পাইয়া মনের কষ্টে ঠাকুরকে বলিল—, আমার জীবিকা-নির্বাহের সম্বল একমাত্র ভিক্ষা, আজ তাহাও জুটাইলে না। কাজেই আজ আমি প্রাণ দিব। আমাকে উদ্ধার কর। এক দিন সকলেরই প্রাণ যাইবে; কাজেই ভিক্ষা যখন পাইলাম না, তখন আজই প্রাণ দিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দুপুর বেলা রৌদ্রের সময় চাষাদের ক্ষেতের ধারে শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, ঠাকুর, এখন আমার প্রাণ নিয়া যাও।

এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষেতের ধারে শুইয়া আছেন, ক্ষুধায় কাতর, প্রাণ যায়, এমন সময় মুস্কিল আসান ঠাকুর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ব্রাহ্মণের আয়ু থাকিতে প্রাণ দিতে আসিয়াছে এবং আমাকে এক মনে ডাকিতেছে; সুতরাং ব্রাহ্মণকে আয়ু থাকিতে উদ্ধার করিতে পারি না। কিন্তু বর্তমানে কষ্টভোগ হইতে উদ্ধার করিব।

এই বলিয়া স্বয়ং মুস্কিল আসান ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে তিনবার ডাক দিলেন। তিন বার ডাকের পর ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সকাতরে উত্তর দিলেন, কে আমাকে অনর্থক ডাকিয়া বিরক্ত করিতেছ? আমি মাঠের ধারে শুইয়া আছি, আমি ত কাহারও অনিষ্ট কোনও করিতেছি না। তুমি আমাকে কেন ডাকিতেছ?

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি মুস্কিল আসান ঠাকুর। তুমি উঠ, এখানে শুইয়াছ কেন?

ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলিলেন, কোথায়, তোমাকে ত ঠাকুরের মত দেখা যায় না। আমি শুনিয়াছি, আমার ঠাকুরের চারি হাত, শঙ্খ চক্র গদা, পদ্মধারী; কিন্তু তাহার ত কিছুই দেখি না। ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ

অবশেষে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখা দিলেন, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ঠাকুর আমাকে, এখন উদ্ধার কর।"

ঠাকুর বলিলেন, তোমাকে আমি কি প্রকারে উদ্ধার করিব, তোমার আয়ু আছে, কাজেই এখন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি না। তুমি এখন যে পাড়ায় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলে, সেই পাড়ায় ভিক্ষা করিতে যাও। আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশী ভিক্ষা পাইবে। তাহা হইতে মুস্কিল আসান ঠাকুরের সিন্নির জন্য কতক চাউল উঠাইয়া রাখিবে এবং আগামী কল্য মুস্কিল আসানের সিন্নি দিবে।

এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্ধান হইলেন এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণও ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ভিক্ষায় যাইয়া সত্য সত্যই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ঠাকুরের অনুগ্রহে বেশী পরিমাণে আতপ তণ্ডুল ও তাহার সঙ্গে কিছু তরকারীও পাইলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ঐ তণ্ডুল হইতে মুস্কিল আসানের জন্য কিছু রাখিয়া আর অন্যান্য বিক্রী করিয়া জিনিষ-পত্র ক্রয় করিলেন।

তৎপরে ব্রাহ্মণ মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছেন, এমন সময়ে এক কাঠুরিয়া কাঠ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল,—ঠাকুর, এই সিন্নি তৈয়ার করিয়া কি কর? ব্রাহ্মণ তাহাকে সকল কথা বলিল।

কাঠুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! একটু প্রসাদ পাইতে পারি কি? ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে অনায়াসে প্রসাদ দিলেন। কাঠুরিয়া প্রসাদ খাইয়া মানস করিল যে, সে যদি কাষ্ঠ বিক্রী করিয়া উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে সে মুস্কিল আসানের সিন্নি দিবে। যাহা হউক, মুস্কিল আসান ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণের দিন দিন দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইতে লাগিল।

এদিকে কাঠুরিয়া মানস করিয়াছে পর, পরদিনই কাঠ বিক্রয় করিয়া দ্বিগুণ লাভ করিল, এইভাবে সে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া উন্নতি করিল। অতঃপর একদিন সকল কাঠুরিয়া নদীর পারে মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছে, এমন সময় ধনপতি সওদাগর উহাদের পূজার আয়োজন দেখিয়া উপরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তহারা কিসের পূজা করিতেছে; তদুত্তরে কাঠুরিয়া বলিল যে, তাহারা মুস্কিল আসানের পূজা করে। সওদাগর পূজার ফলাফল জিজ্ঞাসা করায় কাঠুরিয়াগণ বলিল, এই পূজা করিলে অপুত্রার পুত্র,

নির্ধনের ধন, দুঃখীর দুঃখ-দারিদ্র্য নাশ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সওদাগর পুজার শেষে প্রসাদ খাইয়া মানস করিলেন যে, যদি তাহার সন্তান হয়, তবে তিনি একশত মুদ্রা দিয়া মুস্কিল আসানের পুজা দিবেন।

ইতিমধ্যে সওদাগরের স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়াছিলেন। কতকদিনের মধ্যেই সওদাগরের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন এবং দশ মাস দশ দিন পর একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল এবং স্বর্গের উর্বশীর ন্যায় সুন্দরী হইল। সওদাগর কন্যার রূপ ও গুণ দেখিয়া পুজার কথা ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা সকলই ভুলিয়া গেলেন। কন্যা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল। দ্বাদশ বর্ষীয়া হইল তবু কন্যার বিবাহ হইতেছে না। এমন কি, সম্বন্ধও আসে না। তখনই সওদাগরের পুজার মানসিকের কথা স্মরণ হইল এবং মুস্কিল আসান ঠাকুরকে এক মনে ডাকিতে লাগিলেন ও বলিলেন, আমার কন্যার বর যোগাড় করিয়া দাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। মুস্কিল আসান ঠাকুর তাহার করুণ ডাকে সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার বর যোগাড় করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে ঐ দেশেরই এক রাজা মারা গেলেন। রাজার একটি মাত্র ছেলে। রাজার রাজত্বও ছারখার হইয়া গেল। রাজপুত্র শেষে কোন উপায় না দেখিয়া দেশ ত্যাগ করিয়া কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। মুনিকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি আপনার আশ্রমে থাকিতে চাই। ডাক দেওয়াতে মুনি ঠাকুর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলি বলিয়া তোকে রক্ষা করিলাম। তাহা না হইলে তোকে এখনই ভস্মসাৎ করিতাম, তুই কি চাস এখানে?

রাজপুত্র বলিল, আমি আপনার নিকট থাকিব, পুজার ফল ফুল যোগাড় করিব। মুনি শান্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিল, পরে একদিন বলিল যে, তুই এখানে থাকিতে পারিবি না। তোর ভবিতব্য আসিতেছে।

রাজপুত্র বলিল, আমি কোথায় যাইব, আমার কেহই নাই, মুনিঠাকুর! মুনি তথাপি তাহাকে রাখিলেন না।

রাজপুত্র বাহির হইয়া শেষে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ধনপতি সওদাগরের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাড়ীর মালিকের নিকট জল পান করিতে চাইলেন। এমন সময় ধনপতি সওদাগর বাহির হইয়া দেখিলেন, কে জল চায়; তাহার পরিচয় লইলেন, পরে তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া

বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। ধনপতি সওদাগর রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার মেয়ের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র বলিলেন যে, আমার পাঁচশত টাকা পিতৃঋণ আছে, সেই টাকা দিতে পারিলে আমি বিবাহ করিব। ধনপতি সওদাগর তাহাই স্বীকার করিলেন এবং কন্যার বিবাহ দিলেন। কিন্তু মুস্কিল আসানের পুজা আর দিলেন না।

কতদিন পরে ধনপতি সওদাগর জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যে চলিলেন। বাণিজ্যে যাইয়া মুস্কিল আসানের অনুগ্রহে বিস্তর লাভ হইল। বাণিজ্যের লাভের গুণে ধনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে চোরে ঐ দেশের রাণীর গলার হার চুরি করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। সওদাগর সুন্দর হার দেখিয়া জামাতাকে কিনিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে চোর ধরিবার জন্য কোতল ছুটিল। সওদাগরের জামাতার গলে হার দেখিয়া কোতল তাহাদিগকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা হার গ্রহণ করিয়া সওদাগর ও জামাতাকে মশাল ঘরে রাখিল। সওদাগর একমনে মুস্কিল আসানকে ডাকিতে লাগিলেন।

মুস্কিল আসান ঠাকুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন, সওদাগর হার ক্রয় করিয়া তোমার দেশে চোর হইল কেন? তুমি ইহাদিগকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দাও। ধন-দৌলত সঙ্গে দিয়া দাও। নচেৎ তোমার বংশ ছারখার করিব।

রাজা পরদিন প্রাতে উঠিয়া উহাদিগকে ধনদৌলত দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সওদাগর আসিতেছেন, পথে মুস্কিল আসান ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নৌকায় কি ভরিয়াছ? এরূপ পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে সওদাগর চোর মনে করিয়া বলিল যে, আমি নৌকায় মাটী ভরিয়াছি। তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?

মুস্কিল আসান ঠাকুরের কৃপায় নৌকার সকলই মাটী হইল। সওদাগর নৌকায় মাটী দেখিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িল। ব্রাহ্মণ বলিল যে, তুমি কতবার মুস্কিল আসানের পুজা মানস করিলে; কিন্তু এ পর্যন্ত পুজা করিলে না কেন? সওদাগরের সকল কথা মনে পড়িল এবং পুনরায় তাহার পুজা মানস করিল। তারপর নৌকা পুনরায় ধন-দৌলত-পুর্ণ হইল।

এদিকে ধনপতি সওদাগরের বাড়ী পুড়িয়া যাওয়ায় সকলে অন্নকষ্টে দিন-যাপন করিতেছে। একদিন সওদাগরের স্ত্রী মুস্কিল আসানের পুজা স্বপ্নে দেখিয়া

পরদিন কিছু আতপ চাউল যোগাড় করিয়া মুস্কিল আসানের সিন্নি দিতেছে, এমন সময় সওদাগর দেশে আসিয়া পৌঁছিল। কন্যা প্রসাদ হাতে লইয়াছিল, সেই সময় পিতা দেশে আসিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদে প্রসাদ ফেলিয়া দিল। তাহাতে জামাতার সহিত সওদাগর জলে ডুবিল।

সওদাগরের কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া মুস্কিল আসান ঠাকুর স্বর্গ হইতে দৈববাণী করিলেন যে, প্রসাদ ফেলিয়াছ বলিয়া এ দুর্দশা, শীঘ্র যাইয়া আমার প্রসাদ গ্রহণ কর, তবেই সওদাগর, জামাতা ও নৌকা সহিত ভাসিয়া উঠিবে। সকলে জয়-জয়কার দিতে লাগিল। সওদাগর একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিবিধ বিধানে মুস্কিল আসানের পূজা দিল। পরে ধন-দৌলত বাড়ীতে আনিল। মুস্কিল-আসানের কৃপায় সওদাগর সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।—বিক্রমপুর (ঢাকা) অর্চনা, ১৩৪০

মন্তব্য

এই কাহিনীর দুইটি মূল্য—একটি লোক-কথার দিক দিয়া, আর একটি বাংলার সমাজ-জীবনের দিক দিয়া। লোক-কথার দিক দিয়া ইহার অভিপ্রায় দেবসেবার পুরস্কার (Reward for service of god Q. 21),

অসাধুতার শাস্তি (Impiety punished Q. 220) এবং ঐশ্বর্য লাভের জন্য পূজা দ্বারা দেবতার প্রসন্নতা বিধান (Ceremonies and prayers at unearthing of treasure, N 554) ইত্যাদি। বাংলার সাধারণ সমাজ-জীবনের দিক হইতে ইহাতে দেখা যায়, নিরক্ষর মুসলমান সমাজের কল্পিত অলৌকিক চরিত্র হিন্দু সমাজের বিষ্ণু বা নারায়ণ রূপে শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন। বাংলার লোক-সমাজে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপকরণের এইভাবে সংমিশ্রণ দেখা যায়। সত্যনারায়ণের পরিকল্পনাও এইভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই কাহিনীর শেষাংশের সঙ্গে সত্যনারায়ণের কাহিনীরও সামঞ্জস্য দেখা যায়।

৩

ত্রিনাথ

এক গৃহস্থ। সংসারে তাহার সুখের লেশমাত্রও নাই। একে সে খুব গরিব, তাহাতে আবার মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা ও একমাত্র পুত্রের ভক্তি ক্ষণকালের জন্যও সে পাইত না।

একদিন গৃহস্থের গাভীন গাইটি হারাইয়া গেল। সারাদিন খুঁজিয়াও সে উহার সন্ধান পাইল না; গৃহস্থ মনে করিল যে, গাভীটি কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ও উহা সে হাটে বিক্রয় করিবে। পরদিন তাহার হাটে যাওয়া স্থির হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে ক্লান্ত হইয়া গৃহস্থ হাটের নিকটবর্তী এক গাছের তলায় বিশ্রামের নিমিত্ত উপবেশন করিল। অল্পকাল পরেই সে শুনিতে পাইল, কেহ যেন গাছের উপর হইতে তাহাকে বলিতেছে, ওহে গৃহস্থ! এই বেলা মূলের নিম্নদেশ খুঁড়িয়া তিনটি পয়সা লও ও উহা দ্বারা হাট হইতে এক পয়সার পান-সুপারি, এক পয়সার গাঁজা ও এক পয়সার তেল আনিয়া এই মূলটির নিকট রাখিয়া দাও। তিন নাথ ঠাকুরের দোহাই দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া তৈল লইবে। তাহা হইলে উহার এক ফোঁটাও পড়িয়া যাইবে না। কাহাকেও কোথাও দেখিতে না পাইয়া গৃহস্থ বড়ই বিস্মিত হইল ও কথিত স্থান হইতে পয়সা লইয়া হাটে চলিয়া গেল।

গৃহস্থ সারা হাট অনুসন্ধান করিয়াও তাহার হারানো গাইটি পাইল না। তথা হইতে ফিরিবার পূর্বে পান-সুপারি ও গঞ্জিকা ক্রয় করিয়া তৈল কিনিবার কালে বিক্রেতা বস্ত্রাঞ্চলে কিছুতেই উহা দিতে চাহিল না। বরঞ্চ এজন্য তাহাকে উপহাস করিল। তখন অন্য দোকানদার স্বীকৃত হওয়ায়, ত্রিনাথের দোহাই দিয়া তাহার নিকট হইতে সে কাপড়ের কোণে তৈল বাঁধিয়া লইল। উহার এক ফোঁটাও ঝরিয়া পড়িল না দেখিয়া গৃহস্থ ও নিকটবর্তী অপর সকলেরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

গৃহস্থ গাছের তলায় উপস্থিত হইয়া, যথাস্থানে জিনিষগুলি রাখিয়া দিয়া বসিলে পর শুনিতে পাইল, এখন ত্রিনাথ দেবের পুজা হইবে। দ্রব্যাদি সুন্দরভাবে সাজাইয়া দেও। পুজা দেখিয়া যাইও। পুজার স্থান ও নিয়ম প্রণালী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়া সে সমস্ত ঠিক করিয়া দিল।

পূজা শেষে গৃহস্থ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, যে ব্যক্তি যে কামনা করিয়া তিন নাথের 'মেলা' দেয়, তাহার সেই বাসনা অচিরেই পূর্ণ হয়। তখনই সে কামনা করিল যে, যদি গাভীটি ফিরিয়া পাওয়া যায়, মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর ভালবাসা ও পুত্রের ভক্তি যথার্থভাবে পাওয়া যায় এবং অর্থাদির অভাব আর না থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই ত্রিনাথ দেবের মেলা দিবে। সে বাড়ীর কাছে আসিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহার গাভীটি একটি সুন্দর বৎস প্রসব করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে সবৎসা গাভটিকে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মাতা, পুত্র ও স্ত্রীর ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

তৎপর দিবস জিনিষপত্র জোগাড় করিয়া ও গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহস্থ ত্রিনাথ দেবের 'মেলা' দিল। প্রদীপের তৈল শেষ হইবার কিছুকাল পূর্বে তাহার গুরুদেব তাহার বাড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুঠাকুর অভ্যর্থিত হইয়া শিষ্যালয়ে পদার্পণ করিবার আশায় ভৃত্য দ্বারা শিষ্যকে স্বীয় আগমন সংবাদ জানাইলেন। গৃহস্থ প্রদীপের তৈল শেষ না হওয়ায় তৎক্ষণাৎ গুরুর আদেশ পালন করিতে না পারায়, গুরু ক্রোধান্ধ হইয়া পূজার গৃহে প্রবেশ করিয়া, পূজোপকরণ হস্তদ্বারা স্থানচ্যুত করিয়া সবেগে তথা হইতে ভৃত্যসহ চলিয়া গেলেন।

গুরুঠাকুর নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহার দুইটি পুত্রকে ঘোরতর কাতর অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং মনে করিলেন যে, ইহা ত্রিনাথ দেবের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশের ফল। যাহা হউক, তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যের নিকট এই সকল সংবাদ পাঠাইলেন। গৃহস্থ পূজা স্থান হইতে ধূলি লইয়া গুরুদেবের বাড়ী উপস্থিত হইল এবং ভক্তিপূত মনে ত্রিনাথ দেবকে স্মরণ করিয়া তাহা গুরু পুত্রদ্বয়ের অঙ্গে মাখাইয়া দিল। বালক দুইটি অল্পকাল মধ্যে আরোগ্য লাভ করিল। গুরুঠাকুর, ত্রিনাথ দেবের অপার মহিমা বুঝিতে পারিয়া সেই দিনই সন্ধ্যার পর মেলা দিলেন। এই মেলায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি বিকলাঙ্গ, একটি বধির ও একজন অন্ধ ত্রিনাথ দেবের কৃপায় স্ব স্ব দুর্দশা হইতে চিরতরে মুক্ত হইল। ইহা দেখিয়া সেখানে উপস্থিত সকলেরই চিত্ত ভক্তি-রসে আপ্লুত হইল। এইরূপে নানাস্থানে ত্রিনাথ দেবের মহিমা প্রচার হইল।

—ঢাকা

মন্তব্য

ইহা দৈব ও ভাগ্য (Chance and Fate N.) মূল অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। বিশেষ অভিপ্রায় হারানো বস্তু ফিরিয়া পাওয়া (Lost treasure restored N 211), সৌভাগ্য লাভের জন্য দেবের নিকট প্রার্থনা (পূজা), দৈব অবহেলার শাস্তি (Q 200) দেব-সেবার পুরস্কার (Reward for service of god Q21) ইত্যাদি।

গামছায় বাঁধিয়া তৈল আনিবার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic)র কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

৪

সুমতি

এক দেশে এক গোপ-দম্পতি বাস করিত। তাহাদের একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি বিবাহিত, তাহারও একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। একদিন গোপ-স্ত্রী আত্মীয়-বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার সময় পুত্রবধূকে বলিয়া গেল, 'আমি কুটুমবাড়ী যাই। তুমি কাইল বিহানে উইঠা আসিবাসি হাইরা ঘোল মাখন টান দিও, বন্দুলাগ লাইগা ভাত রাইন্ধ।'

গোপস্ত্রী এই কথা বলিয়া আত্মীয় বাড়ী চলিয়া গেল। তৎপর দিন বধূ সকালে উঠিয়া দেখে সে, খাড়া সুমতি ঠাকুরাণী তাহাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাহাকে বলিতেছেন যে, তুই আমারে এট্টু পান হাদা দে। আমি খাইয়া যাই। ইহা শুনিয়া বধূ কহিল, আমি হপায় ঘুমে থেইকা উঠ্‌ছি, তোমার লাইগা পান হাদা লইয়া বাইরইছিনা, অখন দিতে পারুম না।

এই কথা শুনিয়া সুমতি ঠাকুরাণী অভিশাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। বধূ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই।

কিয়ৎক্ষণ পর বধূ সাংসারিক কাজকর্ম স্পন্ন করিয়া ঘরে গিয়া দেখে যে তাহার পুত্রটি বিছানায় মরিয়া রহিয়াছে। ঘোলমাখনের পাত্রসকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, পাত্রস্থিত সকল ঘোলমাখন মাটিতে পড়িয়া কিম্ভূত কিমাকার হইয়াছে। গোশালায় গাভীবৎস সকল মরিয়া রহিয়াছে এবং কপাট বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া বধূ ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ পরে কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বিহানে ঐ যে বুড়া ঠাইক্‌রাইন্ আইয়া আমার কাছে পান হাদা চাইছিল, তারে পান হাদা না দেওনে আমার উপর রাগ কইরা শাপ দিয়া গেছে। বধূ তখন শোকে অস্থির হইয়া, আলুলায়িত কেশেই সেই ঠাকুরাণীর উদ্দেশ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, ঠাইক্‌রাইন্ গ, তুমি আমার মুখী একবার ফিরা চাও। আমি তোমার লাইগা পান হাদা আন্‌ছি।

সুমতি ঠাকুরাণী বধূর এই প্রকার কাতর বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, আমি আর তর মুখী ফিরি চামু না। তয় যদি তুই নগর থেইকা

কড়ার চুণ, কড়ার পান সুপারী, চিনি বাতাসা, তেল সিন্দুর আইনা পাড়া পড়শী ডাইকা আইনা আমার পুজা করস্, তা অইলে তর যা যা নষ্ট অইছে, সব দুনা অইব। তর পোলা বাইচা উঠ্‌ব। গরুগুলা বাইচা উঠ্‌ব। যাইট ঘরের দরজা খুল্‌ব।

এই কথা শুনিয়া বধূ অতি তাড়াতাড়ি চিনি বাতাসা প্রভৃতি পুজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রতিবেশীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সুমতি ঠাকুরাণীর পুজা দিল।

তৎপর দেখিতে দেখিতে নষ্টদ্রব্য সকল পুনর্বার দ্বিগুণ হইয়া যথাস্থানে গিয়া রহিল, পুত্রটিও পুনর্জীবিত হইল।

ইহা দেখিয়া বধূ আহ্লাদে আটখানা হইয়া দাসদিগের জন্য পাক করিয়া তাহাদিগকে খাইবার জন্য ডাক দিল ; কিন্তু তাহারা যাইয়া খাইল না। সমস্ত দিন উপবাসীই রহিল। সন্ধ্যাকালে বধূর শাশুড়ী বাড়ীতে আসিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিল, ঘোল-মাখন নি টান দিছ ? বধূ কহিল, দিছি। শাশুড়ী কহিল বন্দুলারা কি খাইছে ? বধূ কহিল, না।

তখন বধূর শাশুড়ী দাসদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগকে বলিল, আমার বউ রাইন্ধা বাইরা তোমাগ খাইবার কইছে, তোমরা খাও নাই ক্যা ?

তাহারা বলিল, তোমার বউ বিহানে জানি ক্যা কান্‌ছে, বুঝি তোমার বাড়ী কোন অমঙ্গল অইছে। তুমি তোমার বউর কাছে জাইনা আইয় গা কিয়ের লাইগা কান্‌ছে ?

ইহা শুনিয়া শাশুড়ী বাড়ীতে যাইয়া বধূর কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বিহানে কিয়ের লাইগা কানছিলা ? বধূ আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শাশুড়ীর নিকট বর্ণনা করিল। শাশুড়ী দাসদিগের নিকট যাইয়া সব কথা আনুপূর্বিক বলিল। শুনিয়া দাসগণ বলিতে লাগিল, আমরা একযুগ বারবছর ধইরা এই রাজার বাড়ী বন্দুলা খাটবার লাগছি। সুমতি ঠাইক্‌রাইণ যদি আমাগ এই থেইকা ছাইড়া দেয়, তয় আমরাও এই ঠাইক্‌রাইণের পুজা করুম্।

তাহাদিগের ভক্তি বিশ্বাস জানিতে পারিয়া সুমতি দেবী সেই দিন রাত্রিতেই রাজবাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, তুই যদি কাইল বিহানে বন্দুলাগ ছাইড়া না দেস্, তয় তর রাজ্য ছারখার অইব।

রাজা প্রভাতে উঠিয়াই ব্যস্তসমস্ত হইয়া দাসদিগকে বলিলেন, তরা আমার রাজ্য থেইকা চইলা যা।

তাহারা মনে ভাবিল, এক যুগ বার বছর ধইরা রাজবাড়ী বন্দুল খাটবার লইছি, রাজা মশয় এতদিন কিছু কয় না, আইজ ক্যা কয়, রাজ্য ছাইড়া বাড়ী যা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সুমতি দেবীর কথা তাহাদের মনে পড়িল। তখন তাহারা এই রাজার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশে চলিল। যাইবার সময়ই বাজার হইতে পান সুপারি ইত্যাদি পুজোপকরণ লইয়া পথে এক স্থানে পুজা করিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় মহাদেবের সঙ্গে নারদমুনি রথারোহণে শূন্য পথে কৈলাসে যাইতেছিলেন। এই পুজা দেখিয়া মুনিবর দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মামা, এত সকালবেলা কোন্ দেবতার পুজা অয়, আমি তা দেইখা আমু।

এই বলিয়া মুনিবর রথ হইতে অবতরণ করিয়া পুজার স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে, তোমরা এত সকালে কোন্ দেবতার পুজা করবার লইছ? এই পুজার ফল কি? তাহারা কহিল, সুমতি ঠাইক্‌রাইনের পুজা করবার লইছি। এই পুজা করলে নির্ধইনার ধন অয়, নিপুত্রার পুত্র অয়, যে যা বাঞ্ছা করে তার তাই অয়। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন, হেঁ, এই দেবতার এই বর। আমার মামী দুর্গা যদি মামা মহাদেবকে দেইখা আইল ভাইল না করে, সোনার সিংহাসন নিয়া মামাকে বইরা নেয়, তাইলে আমি এই পুজা করুম।

মানস করিয়া মুনিবর কিছু অগ্রসর হইয়া দেখেন, দুর্গা সত্যই সোনার সিংহাসন মাথায় নিয়া সোনার গাড়ু হাতে নিয়া মহাদেবের নিকট আসিতেছেন। ইহা দেখিয়া মুনিবর কিঞ্চিৎ মৃদু হাসি হাসিলেন। নারদের হাসি দেখিয়া দুর্গা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্যা ভাইগ্‌না, তুমি হাসলা যে। নারদ বলিলেন, আমার এক দেবতার কথা মনে উঠল, তাই হাস্‌লাম। এই দেবতার বড় গুণ। তার কাছে যে, বাঞ্ছা কইরা মানস করে তার সেই ফলে। আমি মানস করছিলাম যে, যদি আমার মামী মামাকে দেইখা আইল ভাইল না করে, তাইলে আমি এই দেবতার পুজা করুম্। অখন দেখি আমার মানস ফলছে। তখন নারদ পান সুপারি প্রভৃতি পুজোপকরণ দ্বারা নিয়মমত পুজা করিলেন। নারদকে পুজা করিতে দেখিয়া ও তাঁহার নিকট দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া দুর্গা বলিলেন, যদি আমার কার্তিক গণেশ দেশে ফিরা আসে, তাইলে আমি এই পুজা করুম।

এদিকে দুর্গার মানসের বিষয় সুমতি ঠাকুরাণী জানিতে পারিয়া কার্তিকের ও গণেশের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, তরা এক যুগ বার বছর ধইরা তর মাকে ছাইড়া আইয়া রইছস্। এখন তগর মার কাছে যা।

কার্তিকেয় ও গণেশ কহিলেন, আমরা সমুদ্র পার হৈতে ডরাই। তখন সুমতি ঠাকুরাণী কুকুরের বেশ ধরিয়া সমুদ্র পার হইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা সুমতি ঠাকুরাণীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পার হইয়া বাড়ী আসিয়া দুর্গাকে 'মা' বলিয়া ডাক দিলেন। অনেকদিন পর দুর্গা পুত্র মুখে 'মা' শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগকে কোলে লইয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসার পর, কেমনে আসিয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কার্তিকেয় ও গণেশ কহিলেন, মা গ, এক বুড়ী আমাগ সমুদ্র পার কইরা দিছে। দুর্গা সেই দেবতা কে; তাহা বুঝিতে পারিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে কড়ার চুণ, কড়ার পান ইত্যাদি পুজোপকরণ দ্বারা সুমতি ঠাকুরাণীর পূজা করিলেন; তদবধি নরলোকে এই পূজা প্রচলিত হইল। (ঢাকা জিলা হইতে সংগৃহীত, প্রতিভা, আষাঢ়, ১৩৩২ সাল)

মন্তব্য

এই কাহিনীর সংলাপগুলি ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার কথ্য ভাষায় রচিত। বন্দুলা শব্দের অর্থ ক্রীতদাস। ইহারও মূল অভিপ্রায় দেব-সেবার পুরস্কার (Reward for service of God, Q. 21): দৈবের অনুগ্রহে এখানে ক্রীতদাসেরাও মুক্তি লাভ করিল। এখানে আরও একটি বিষয় দেখিতে পাওয়া গেল যে, নারদ এবং দুর্গা ইহারাও দৈব কৃপার ভিখারী। সুতরাং ইহারা পৌরাণিক দেবদেবী নহেন, বরং সাধারণ বাংলার নরনারী। দৈব অনুগ্রহে দুর্গার শিবের প্রতি অনাদরের ভাব দূর হইল; কার্তিক গণেশ ঘরে ফিরিয়া আসিল।

৫

গাদের মূল্য

এক তেলেনী ও তার এক পুত্র; নিজ ব্যবসায় দ্বারা অতি কষ্টে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে। একদিন আইত্যান কাইত্যান করিয়াছে। সাতদিন যাবৎ অনবরত গাদ্‌লা নামিয়াছে। মাও উপবাস, ছেলেও উপবাস। দিনটা হঠাৎ একটু সুবিধা হইলে, মা ছেলেকে এক পাত্রপূর্ণ গাদ্‌ দিয়া বলিলেন, উহা বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনিও।

পিছিল পথে চলিতে চলিতে ছেলে অকস্মাৎ আছাড় খাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হস্তস্থিত মৃৎপাত্র ভাঙ্গিয়া গাদ্‌ কর্দমে মিশ্রিত হইয়া পড়িল। নিরুপায়, অনশনক্লিষ্ট বালক ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রন্দন কি ?' —তার ক্রন্দনে ভাদ্রমাস্থা নদীর জল উজান বহিয়া চলিল। ইহাতে সুবারিষ ঠাকুরাণী ব্যথিত হইলেন। বাঁশগাছের গোড়ায় বসিয়া সুবারিষ ঠাকুরাণী বলিলেন, তুই কাঁদিস নারে! মাটির উপরকার কিছু গাদ উঠাইয়া হাটে নিয়া যা। উহাই বেশী মূল্যে বিক্রয় হইবে

সুবারিষ ঠাকুরাণী তাঁহার জন্যও কিছু বীচি-পূর্ণ কলা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। সে হাটে পৌছিতেই তাহার গাদ অধিক মূল্যে বিক্রীত হইলে সে তাহার বিনিময়ে ধান, কলা, গুড় ক্রয় করিয়া আনিল। প্রত্যাবর্তন পথে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া সে ডাকিয়া বলিল, তোমার দ্রব্য নিয়া যাও।

তখন সুবারিষ ঠাকুরাণী নিজ মূর্তি ধরিয়া বলিলেন, তোর মাকে সমস্তই দিয়া বলিবে যেন বিধিমত আমাকে পূজা করে।

ছেলের আহ্লাদের সীমা নাই। বাটী প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার মাকে আনুপূর্বিক সে সমস্ত কথা নিবেদন করিলে, তাহার মা বিধিমত পূজা করিলেন। ঠাকুরাণীর অনুগ্রহে তেলেনীর বহু ধন-কড়ি হইল ও সে বাটীতে মূল্যবান ঘর-দরজা নির্মাণ করাইল। এদিকে এক নাপিত ঝাইড়ায় হিংসায় রাজবাড়ী গিয়া জানাইল যে, তেলেনী তাঁহার অর্ধেক সম্পত্তি নিয়া গেল। রাজা তেলেনীকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। তিনিও তাহার উপদেশ ও বিধিমত সুবারিষ ব্রত করিলেন। ব্রত শেষে স্বর্গ হইতে সোনার

রথ আসিয়া রাজারাণীকে নিয়া গেল। রাজাও অর্ধেক সম্পত্তি তেলেনীর ছেলেকে দিয়া গেলেন। সে কুটনীকে চুণকালী দিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।—মৈমনসিংহ (প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী সংগৃহীত)।

মন্তব্য

তেলেনী এখানে তিলি বা তৈল ব্যবসায়ীর পত্নী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আশ্বিন মাসে কয়েকদিন যাবৎ অনবরত বর্ষা হইলে তাহাকে পূর্ব মৈমনসিংহের উপভাষায় 'আত্যান' এবং কার্তিক মাসে হইলে তাহার 'কাত্যান' বলে। গাদ্‌লা শব্দের অর্থ বর্ষা। গাদ এখানে তেলের ময়লা। বীয়া গাছ এক প্রকার বন্য গাছ, ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ায় ইহার প্রয়োজন হয়। ইহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম এখানে স্বুবারিষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যত্রও বীয়া গাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'গোপীচন্দ্রের গানে' দেখা যায়, মহাদেব বা গ্রাম্য ওঝা মাণিকচন্দ্র রাজাকে অভিশাপ দিবার সময় বীয়া গাছের সহায়তা লইতেছেন—

একটা বিয়ার ঝোপ আনেন উগারিয়া।
লাংটি চিপি শাপ দেন রাজাক মঙ্গলবার দিনা ॥

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সং, পৃঃ ৬

তারপর বীয়ার ডাল দিয়া দন্ত মার্জনা করিবার ফলে গোপীচন্দ্রের দেহ হইতে লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল —

বিয়ার ডাল যে একদা হস্তে করিয়া।
দন্তখিরণ কর পন্থে বসিয়া,
আপনেএ রাইয়ত প্রজা যাইবে ফিরিয়া। —ঐ, পৃঃ ১৬৮

কাহিনীটি সুযোগ ও ভাগ্য (Chance anx Fate) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত।

ব্রাহ্মণের দুঃখ

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। ব্রাহ্মণীর সঙ্গে এক গোয়ালিনীর সই ছিল। একদিন ভিক্ষা করিতে করিতে ব্রাহ্মণ এক গৃহে দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন ব্রতিনী ব্রত করে। ব্রতের ফলশ্রুতি ও রীতি শিক্ষা করিয়া স্বগৃহে আগমন করতঃ ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে সমস্তই বিবৃত করিলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণী ব্রত আরম্ভ করিলেন। গোয়ালিনী তাহার নিকট হইতে ব্রত শিক্ষা করিল। গোয়ালিনী সইয়ের বাড়ী আসিয়া এক সঙ্গেই ব্রত আরম্ভ করিল। উভয়েরই প্রথম দুই চারিদিন যথারীতি ব্রত অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাহ্মণী শৈথিল্য আরম্ভ করিলেন। একদিন গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল, সই! আজ ব্রত না করার কারণ কি? ব্রাহ্মণী বলে, আজ ব্রত করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছি। সকালে জল-ভাত খাইয়া ফেলিয়াছি। পুনরায় একদিন জিজ্ঞাসিত হইলে বলে, আর একদিন করিব; পান-সুপারি খাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু গোয়ালিনী প্রত্যহ ব্রত করিয়া আসিতেছে। এইরূপে অগ্রহায়নের প্রতিপদ উপস্থিত হইল। গোয়ালিনী স্বগৃহে সমস্ত আয়োজন করিয়া, ব্রাহ্মণ-গৃহ হইতে স্ব-অর্চিত গুটি নিতে আসিলে, ব্রাহ্মণী বিনা কারণে বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। নানারূপ অনুরোধ ও প্রার্থনায় ব্রাহ্মণী গোয়ালিনীকে গুটিগুলি দিলেন। ব্রাহ্মণী অর্ধপক্ক পিষ্টক দ্বারা অতি সংক্ষেপে ব্রত শেষ করিয়া সন্ধ্যার পুর্বেই আহার সমাপন পুর্বক শয়ন করিল। গোয়ালিনী ভালরূপ আয়োজন সহকারে ব্রত উদ্‌যাপন পুর্বক উলুধ্বনি দিয়া কথা বলিতে লাগিল।

এদিকে হরিসঙ্কট ঠাকুর ব্রাহ্মণগৃহে আসিয়া দেখেন সমস্ত অন্ধকার। ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া হরিসঙ্কট ব্রাহ্মণীকে অভিশাপ দিলেন। গোয়ালিনীর গৃহে গমন পুর্বক হরিসঙ্কট, ধূপধূনার গন্ধ, প্রদীপ ও নৈবেদ্য দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিলেন। ব্রতিনীকে ধনের বর, পুত্রের বর দিয়া ঠাকুর বলিলেন, ব্রাহ্মণের ধন গোয়ালগৃহে আসুক ও গোয়ালিনীর দুঃখ দুর্দশা ব্রাহ্মণীর উপর বর্তুক্। অতি শীঘ্রই ব্রাহ্মণীর দুর্দশার সূচনা হইল। ধার্মিক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর গঞ্জনায় পথে মেলা দিল। দেখে, দিনের নাগাল পায় কিনা।

যাইতে যাইতে বহুদূর গেলে পথিমধ্যে এক সুপারি গাছ ডাক দিয়া বলিল, 'ব্রাহ্মণ কোথা যাও ?' 'ঠাকুরের উদ্দেশে।' 'ঠাকুরকে পাইলে জিজ্ঞাসা করিও ত কোন্ পাপে আমি সুপারি-গুচ্ছ মস্তকে বহন করিতেছি, সুপারি পড়ে না, ঝরে না, কোন দেবকার্যে লাগে না। কিরূপে আমার কষ্ট দূর হইবে ?'

ব্রাহ্মণ সম্মতি জানাইয়া কতক দূর গমন করিলে, একটি ভারবাহী লোক জিজ্ঞাসা করিল, 'ঠাকুর, হরিসঙ্কটকে জিজ্ঞাসা করিও ত কোন পাপে আমার মাথার বোঝা নামানো যায় না'? তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আরও কতক দূর গেলে, ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইল একটি স্ত্রীলোকের পিছনে একটি পিঁড়ি সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। স্ত্রীলোকটি বলিল, 'ব্রাহ্মণ, দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিও ত কোন পাপে আমার এই দুর্দশা ?' পথিমধ্যে অন্য এক ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ হইলে ব্রাহ্মণী বলিল, 'ওগো বাউল, হরিঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও ত কোন পাপে আমার ঠোঁটের চুণ কিছুতেই দূর হয় না ?'

যাইতে যাইতে বহুদুর গিয়া এক নদীর পাড়ে ব্রাহ্মণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল। নির্জন স্থান। মানুষের গতাকর্ম নাই। এমন সময় একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে লাঠিতে ভর দিয়া নদীর পাড় বাহিয়া যায়। সে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে ? এখানে এরূপে পড়িয়াছ কেন ?

ব্রাহ্মণ তাহার দুঃখের কাহিনী সমস্তই বর্ণনা করিলে, বুড়া বলিল, 'ওঠ, আমিই হরিসঙ্কট ; সংসার অইল চুনের ফুটা—কেবল রইল খোটা। তোর বৌ আমাকে অপমান করায় তার প্রতিশোধ নিলাম, বিধিমত পূজা দিলে তোর দুঃখ দূর হবে।'

ব্রাহ্মণ ঠাকুরের পায় পড়িয়া অপরাধ মার্জনা ভিক্ষা করিয়া পথের বন্ধুদের কথা জিজ্ঞাসা করিল। হরিসঙ্কট বলিলেন, কেহ কোন জিনিষ যাজ্ঞা করিলে, সমর্থ হইলে দিতে হয়। এই গাছ পুর্বজন্মে মানুষ ছিল। হরিসঙ্কট ব্রতের জন্ম তাহার নিকট ব্রতিনী সুপারি প্রার্থনা করিলে, সমর্থ হইয়াও সে দেয় নাই। সেই পাপে এ জন্মে তার এই দুর্দশা ; কোন ভাল লোক দেখিয়া দান-ধর্ম করিলে বৃক্ষ-জন্ম হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই গাভী অন্য জন্মে এক স্ত্রীলোক ছিল, ব্রতের জন্য এক ব্রতিনী তাহার নিকট দুগ্ধ প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত না হওয়ায় এই জন্মে কপিলা হইয়া জন্মিয়াছে। যদি ভাল লোক দেখিয়া দান-ধর্ম করে, তবে গো-জন্ম হইতে উদ্ধার হইয়া যাইবে। এই যে লোকটা সে অন্য জন্মে অন্যের মস্তক হইতে বোঝা নামানোর সাহায্য করিতে প্রার্থিত হইয়াও, সাহায্য

করে নাই। এই পাপে তার এই দুর্দশা। পরের কোন উপকার করিলে তাহার কষ্ট দূর হইবে। এই যে স্ত্রীলোকটি, সে অন্য জন্মে এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের স্ত্রী ছিল। কেহ তাহার গৃহে আসিলে, বসিতে বলিত না; সেই পাপে, এই দুর্দশা। এই ব্রাহ্মণী অন্য জন্মে পরনিন্দা, পরের সঙ্গে বাদ-বিবাদ করিত, সেই পাপে তার ঠোঁটে চুণ। ভাল রূপ দানকর্ম করিলে সকলেরই শান্তি হইবে।'

এই সমস্ত কাহিনী অবগত হইয়া ব্রাহ্মণ গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সে প্রতি পথিক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় ও সমস্ত কথা বলে। পথিকবন্ধুরা তাহাকে ভাল মানুষ মনে করিয়া দানধর্ম করিতেই, যার যার দুঃখ দূরীভূত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণ দানলব্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা সাড়ম্বরে হরিসঙ্কটের পূজা সমাপনে ধন-দৌলতে সুখী হইল।' —মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা হইতে শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত—ঐ।

মন্তব্য

বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বৃক্ষ (Talking Tree F 811·15) অভিপ্রায়টি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। তারপর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাহায্যকারী (Supernatural Helpers N 810) অভিপ্রায়টিও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

সুবুদ্ধি

এক ভিক্ষাসুর ব্রাহ্মণ। তাহার একমাত্র মেয়ে, মেয়ে বিবাহিতা; কিন্তু স্বামিগৃহে যায় না। তাহাকে কিছুতেই স্বামী গৃহে নিতে পারে না। মা-বাবা, পাড়া-প্রতিবেশী তাহাকে কত প্রকারে প্রবোধ ও উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সে কিছুতেই কর্ণপাত করে না।

ব্রাহ্মণ একদিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছে। ভিক্ষা করিতে করিতে এক বাটীতে আসিয়া দেখিল, কয়েকজন মেয়ে একসঙ্গে এক ব্রতের আয়োজন করিতেছে; ব্রাহ্মণ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, 'এই ব্রত করিলে কি হয়?' তখন ব্রতিনীগণ বলিল, 'এই ব্রত করিলে অবিবাহিতের বিবাহ হয়। অপুত্রার পুত্র হয়, নির্ধনের ধন হয়, বন্ধন মোচন হয়, কাটামাথা জোড়া লাগে, কুমতি গিয়া সুমতি হয়, যে যা মনস্কামনা করে, তাহা সিদ্ধ হয়।'

ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া এইস্থানেই মানসিক করিল ও বলিল, 'যদি আমার মেয়ে জামায়ের বাড়ীতে যায়, তবে এই ব্রত করিব।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, 'এই ব্রতের কি নিয়ম?' মেয়েরা বলিল 'তেল, সুপারী, পান, চিনি, সিন্দুর এই সমস্ত উপকরণ।' ব্রতের অন্যান্য রীতিও মেয়েদের নিকট হইতে ব্রাহ্মণ জানিয়া আসিলেন। সেইদিন ব্রাহ্মণ বাড়ী যাইতে না যাইতেই মেয়ে তাহার মাকে বলিল, 'মাগো, আমি জামাইর ঘরে যাই?' তখন তাহার মা বলিল, 'তোমার ইচ্ছা হইলে যাও।' তখন মেয়ে তেল দিয়া চুল আঁচড়াইয়া সিন্দুর দিল এবং পান খাইতে খাইতে মাকে প্রণাম করিল ও পাল্কীতে উঠিয়া স্বামিগৃহে গেল। এদিকে ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিল, 'মানসিক করিতেই সুমতির কৃপায় মেয়ে জামায়ের বাড়ী গেল; এই ব্রত করিলে না জানি কি হয়।'

ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী মিলিত হইয়া এই ব্রতের যখন আয়োজন করিয়াছেন, তখন শিব এই পথেই কুচুনি পাড়া যাইতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি কর?' তাহারা বলিল, 'আমরা সুমতি ব্রত করি। এই ব্রত করিলে অবিবাহিতের বিবাহ হয়, কুবুদ্ধির সুবুদ্ধি হয়, কুমতির সুমতি হয়, বিপদ উদ্ধার হয়, হারান বউ ফিরে পাওয়া যায়।' তখন শিব বলিলেন, 'আমিও পাঁচ পয়সার মানসিক করিলাম, যদি গৌরী আমার গৃহে ফিরে আসেন,

তবে আমিও এই ব্রত করিব।' তাহার পর শিব কুচুনি পাড়া চলিয়া গেলেন। শিব কুচুনি পাড়া হইতে বাড়ী গিয়া দেখিলেন, তাহার অন্ধকার পুরীতে বাতি জলিয়াছে; ভূতালয় দেবালয় হইয়াছে, মণিমুক্তাতে উলুধ্বনি পড়িয়াছে।

শিব এই সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, 'আমার শ্মশানপুরী এমন দেবপুরী হইল কেন আজ?' শিব দুই ডাক দিয়া বলিলেন, 'আমার অন্ধকার পুরীতে আলো জ্বালাইয়াছ কে? উত্তর দাও, তিন ডাকের সময় উত্তর না দিলে ভস্ম করিব।'

তিন ডাকের সময়ে গৌরী, মণিমুক্তা, পশুপাখী, গাছপালা সকলেই 'উলু উলু উলু' করিয়া জোকার দিয়া উঠিল। গৌরী প্রদীপ হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন ও শিবকে নিছিয়া পুছিয়া ঘরে আনিলেন। এই সব দেখিয়া শিব ভাবিলেন, 'এই ব্রতের কি মহিমা—মানসিক করিতেই গৌরী আসিয়া আমার বাড়ী আলো করিয়াছে। এই ব্রত করিলে না জানি কি হয়।' তখন শিব গৌরীকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলেন ও গৌরীর জন্য এই ব্রতের আয়োজন করিলেন, গৌরীও তাঁহার কথামত এই ব্রত সম্পাদন করিলেন। গৌরী ও শিবের সংসার সুখে পূর্ণ হইল। তখন হইতেই এই ব্রত জগত সংসারে বিদিত হইল।' —প্রাগুক্ত

মন্তব্য

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, গৌরীর সুবুদ্ধি উদয়ের জন্য স্বয়ং শিবকেও ব্রত করিতে হইতেছে। সুতরাং এই শিব কিংবা তাঁহার পত্নী গৌরী যে সাধারণ গৃহস্থ এবং গৃহস্থবধূ ব্যতীত আর কেহই নহেন, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। 'হারান বউ ফিরিয়া পাওয়া' বিষয়টিও এখানে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। ইহার মধ্য দিয়া সমসাময়িক সামাজিক অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হারান বউ ফিরিয়া পাওয়া যে ব্রতেরও লক্ষ্য হইতে পারে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। ইহা মধ্যযুগের বাংলার সাধারণ সমাজ-জীবনের কথা। সুযোগ ও ভাগ্য (chance and Fate N) এক অলৌকিক সাহায্যকারী (Supernatural Helpers N 810) ইত্যাদি বিষয় ইহারও অভিপ্রায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

৮

বিশ্বাস

এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী। মৃত্যুর পূর্বে একমাত্র মেয়েকে সঙ্কটতারিণী ব্রত শিক্ষা দিয়া গেলেন। তারিখানুযায়ী তাহার মেয়ে এই ব্রত সম্পাদন করিত। কারণ, ব্রত গ্রহণ করিলে, অশৌচ বা অসুখ বিসুখ ব্যতীত তাহা ছাড়া যায় না। তাহার বিবাহের রাত্রিতে এই ব্রতের তারিখ পড়ায় কিরূপে ইহা সম্পন্ন করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। বাসর ঘরে গভীর রাত্রে বর ঘুমাইলে পর ঐ মেয়ে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিল। ঘরের আল্পনা হইতে আট চিম্‌টি চাল জল দ্বারা একত্র করিয়া তিনটি পিষ্টক তৈয়ারী করিল। তাহার পর প্রদীপের শিখায় তাহাদের গরম করিয়া শক্ত করিল। ঘরের এক কোণে সংকরতানী ঠাকরুণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সে সভক্তি প্রণাম জানাইল ও 'কথা' বলিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিল।

এদিকে বর নিদ্রাভঙ্গে চুপ করিয়া সমস্ত দেখিল ও ভয় পাইল। যখন নববধূ পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিল, তখন তাহার বর তাহাকে গলায় চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'যদি বাঁচিতে চাও, তবে বল তুমি কে? ডাকিনী, ভূত, পিশাচ, পরী, নাগিনী না দেবতা? এই সমস্ত কি করিয়াছ?'

সে তখন সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিল ও বরের এই দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি পাইল। শ্বশুরালয়ে ফিরিবার পথে নদীতে ভয়ানক ঝড় উঠিল; তখন তাহার স্বামী তাহাকে বলিল, 'এখন দেখা যাবে তোমার সংকরতানীর কিরূপ মহিমা।' তাহার ঐকান্তিক প্রার্থনায় সংকরতানী সদয়া হইলেন। ধীরে ধীরে সমস্ত দুর্যোগ থামিয়া গেল।

কতদূর যাওয়ার পর তাহার বর বলিল, 'এখানে ডাকাতের ভয় আছে, তোমার সমস্ত অলঙ্কার আমাকে দাও, সাবধানে রাখি।' তাহার সমস্ত অলঙ্কার এক পুটুলিতে রাখিয়া নদীতে সে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'এখন দেখা যাবে, ঠাকরুণের কিরূপ মাহাত্ম্য।' মনের দুঃখ মনে চাপিয়া নিরাভরণা মেয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। নিরলঙ্কারা নববধূকে দেখিয়া সকলে নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। সে আর কি করিবে? সর্বদা কাঁদে, ঘুমায় না, পেট ভরিয়া খায় না; কিন্তু প্রকৃত কথা বরের ভয়ে কাহাকেও বলে না।

এইরূপে পাকস্পর্শের দিন উপস্থিত হইল। বৌ-ভাত উপলক্ষে ভৃত্য বাজার হইতে এক বোয়াল মাছ খরিদ করিল। ঐ মেয়ে মাছ কুটিতে যাইয়া তাহার মধ্যে অলঙ্কারগুলি পাইল। কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমস্তই লুকাইয়া রাখিল। রান্না শেষ হইয়া গেলে, ঐ মেয়ে সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিয়া পরিবেষণ করিতে গেল। তাহার অলঙ্কার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহার বর ছিল 'সন্দেহাত্মা' লোক। নানারূপ সন্দেহ করিয়া পাতে ভাত রাখিয়াই উঠিয়া পড়িল। অন্য নিমন্ত্রিত লোকজনই কিরূপে খাইবেন? তাঁহারাও উঠিয়া পড়িলেন। কাহারও নিকট কিছু না বলিয়া ঐ মেয়ের স্বামী শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

এদিকে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি, শ্বশুর-শাশুড়ী পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েকে নানারূপে গঞ্জনা দিতে লাগিল। মেয়ে আর কি করিবে? পাকঘরে একা একা বসিয়া সমস্ত গঞ্জনা সহ্য করিতে লাগিল ও কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া বলিল, 'দোহাই সংকরতানী মা, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' রাত্রে সংকরতানী বরের বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন, যন্ত্রণায় সে শ্বাস বন্ধ হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ আরম্ভ করিল ও মরিবার উপক্রম হইল। তখন সংকরতানী তাহাকে স্বপ্নে বলিলেন, 'তুই যদি এই রাত্রেই রান্না-ভাত সকলকে নিয়া গ্রহণ না করিস্, তবে তোর যন্ত্রণা আরও বাড়িবে, তোর বংশ লোপ হইবে; এই বৌ নির্দোষ।'

সে শীঘ্র শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া সকলকে সমস্ত কথা জানাইল ও অভ্যাগত ব্যক্তিদের আনয়ন করিল। অধিক রাত্রে যখন সকলে ভাত খাইতে বসিয়াছে, তখন তাহারা দেখিতে পাইল, বাসি ভাত হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। সকলে তখন নববধূর খুব প্রশংসা ও জয়-জয়কার করিল। ব্রত-বিমুখ বর তাহার নিকট সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া তখন হইতে ঐ মেয়েকে খুব ভালবাসিল ও সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

এই রূপে দিন যায়, কিছু দিন পর মেয়ের এক পুত্র সন্তান হইল। শিশু দাদামহাশয় ও দিদিমার যত্নে ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিল। বৌয়ের শ্বশুর নিজ বাড়িতেই এক পুকুর কাটাইবে। লোকজন কাজ আরম্ভ করিল। কিন্তু বহু দিন কাজ করার পরও 'শুক' উঠে না। একদিন ঐ গৃহস্বামী স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার একমাত্র পৌত্রকে ঐ পুকুরে বলি দিয়া পূজা দিলে শুক উঠিবে। স্বপ্ন দেখিয়া বৃদ্ধ শয্যা ছাড়িয়া উঠেন না। সকলে নানারূপ অনুরোধ

ও ডাকাডাকির পর ঐ বিষয় বলিলেন। এই নিষ্ঠুর কাজ করিতে বাড়ির সকলের অসম্মতি হইল। শুধু তাহার মা দেবতার আদেশ মনে করিয়া পুরোহিত ও লোকজন ডাকাইয়া জাঁকজমকে ছেলেকে বলি দিয়া ঐ পুকুরের মধ্যে পূজা দিল। সমস্ত পুকুর জলে পূর্ণ হইল।

সমস্ত গৃহ শোকাচ্ছন্ন। বৃদ্ধ দাদা, দিদিমণি ও ছেলের পিতা শোকে ম্রিয়মান। কিন্তু ঐ মেয়ের মন আশায় ভরপুর। এই ঘটনার তিন দিন পর সে ঐ পুকুরে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে ঘাট হইতে উঠিবার সময় সংকরতানী ঠাকুরাণী তাহার ছেলেকে কোলে নিয়া জল হইতে উঠিলেন ও তাহার কোলে ছেলেকে দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। মা, ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলে বাড়িতে জয়-জয়কার পড়িল। মরা দেহে যেন প্রাণ-সঞ্চার হইল। বাটীস্থ সকলে ঐ মেয়েকে দিয়া খুব ধুমধামে সংকরতাণী ব্রত করাইলেন। তখন হইতে এই ব্রত জগতে বিদিত হইল।' —প্রাগুক্ত

মন্তব্য

ইহার অভিপ্রায়ের মধ্যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাহায্যকারী (Supernatural Helper N 810) ও নরবলি (Human Sacrifice S 260.) উল্লেখযোগ্য। দৈবকে প্রসন্ন করিবার জন্য নরবলির কথা যেমন এদেশে ব্যাপক প্রচলিত আছে, তেমনি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য শিশুহত্যার কথাও প্রচলিত আছে।

গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের প্রবৃত্তি সম্ভবতঃ একদিন কোন আদিম জাতির মধ্যে সমুদ্রের জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছিল। পুকুরে জলের শুক বা প্রস্রবণ সৃষ্টির ইহাই উদ্দেশ্য।

৯

সোনার ঘর

'এক রাজা ছিল। একদিন দাসী ও দাসী-পুত্র চিন্তা করিল রাণীর প্রতি রাজার কিরূপ ভক্তি আছে, তাহা পরীক্ষা করিবে। এইরূপ সংকল্প করিয়া. দাসীপুত্র সুফাই নফরে বলিল, 'রাণী মাগো, তোমার কত সম্পদ; কোন কথায় তোমার অভাব আছে? রাজাকে কহিয়া একটি সোনার ঘর বাঁধিয়া তাহাতে বাস কর না?' রাণী এইরূপ ইচ্ছা রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন, রাজা এক সুমনোহর সোনার ঘর তৈয়ার করাইলেন। রাণী সম্পদ-নারায়ণ ব্রত করিতেন। আর একদিন সম্পদ-নারায়ণ ব্রত সমাপনান্তে রাণী দাসীকে বলিলেন, 'ঝি গো, দেখিয়া আস তো রাজা আমার জন্য কিরূপ ঘর তৈয়ারী করিয়াছেন?'

দাসী সোনার ঘর দেখিয়া নিজেই তাহাতে থাকিবার লোভ মনে স্থান দিল। মনে ভাবিল, এইরূপ ঘর যদি তাহাদের হইত, তাহাতে না জানি কত সুখ হইত। এই মনে করিয়া চিন্তা করিল, যাঃ, নিজেদেরই যখন হইল না, তখন রাজা-রাণীর মধ্যে বিচ্ছেদ লাগাইয়া দেই।

এইরূপ ভাবিয়া দাসী রাণীকে আসিয়া বলিল. 'রাণী মাগো, রাজা যে ঘর তৈয়ার করিয়াছেন, তাহা দেখিলে ফকিরের বাড়ী বলিয়া মনে হয়; আমরা ভাবিয়াছিলাম, সোনার দালান হইবে, চারিদিকে ফুলের বাগান থাকিবে, চুয়া-চন্দনে বাড়ী লেপিয়া রাখিবে।'

এই কথা শুনিয়া রাণী মনে মনে রাজার উপর বিরক্ত হইলেন। আর একদিন রাণী ব্রত সমাপনান্তে একভাগ নৈবেদ্য জলে দিলেন, একভাগ ব্রাহ্মণকে দিলেন এবং অবশিষ্ট রাজাকে খাইতে দিলেন। রাজা খাইতে বসিয়া বলিলেন, 'তোমার জন্তে সোনার ঘর তৈয়ার করিয়াছি, আর তুমি রাজ-বাড়ীতে এই ভিক্ষুকের ব্রত-পালি আরম্ভ করিয়াছ।' এইরূপ বলিয়া ব্রতের সমস্ত দ্রব্য পদাগ্রে দূরে ফেলিয়া দিলেন।' —প্রাগুক্ত

মন্তব্য

এই কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য এই শ্রেণীর কাহিনীর অনুরূপ। অর্থাৎ এই অপরাধে রাজার সর্বস্ব বিনাশ হইবে, তারপর নিজের ভুল বুঝিয়া সম্পদ নারায়ণের ব্রত করিয়া পুনরায় সবই ফিরিয়া পাইবে। সুতরাং ইহার অভিপ্রায় অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সাহায্যকারী (Supernatural Helper)।

নিদানের সাথী

'এক গোয়ালিনী ও এক রাণী পরস্পর সই ছিলেন। উভয়ের এরূপ বন্ধুত্ব ছিল যে একজনের আর একজনকে না দেখিলে একদণ্ডও তিষ্ঠিতে পারে না; একজন অন্যকে মুখের পানের অংশও অর্ধেক না দিয়া গলাধঃকরণ করিত না। এই রাণী সম্পদ নারায়ণ ব্রত করিতেন। আর একদিন এই রাণী ব্রত পাতিয়া বসিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোয়ালিনী আসিয়া বলিল, 'সই গো, আমাকে এই ব্রত শিখাইয়া দেও।'

রাণী তখন ব্রতশেষে হাতের ডোর খুলিয়া সরলভাবে গোয়ালিনীর হাতে বাঁধিয়া দিয়া ব্রতের সমস্ত বিষয় তাহাকে জানাইয়া দিলেন। উভয়ে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। ইহা দেখিয়া নারায়ণ ঠাকুর রাণীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই রাজা অন্ধ হইয়া গেল, রাণীর হাতে গোদ, পায়ে গোদ, গলায় গলগণ্ড নামিয়া স্বরূপ কুরূপে পরিণত হইল; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সিপাই লোক-লস্কর ও আত্মীয় স্বজন সমস্তই মারা গেল। রাজার রাজ্য গেল, ফকিরের বেশে রাণী সহ দেশ বিদেশে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে রাজা আপন বোনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সকলে বলিল, 'তোমার ভাই আসিয়াছে, বাহিরে আসিয়া দেখ।' তাহার ভগ্নী বলিল, 'না, ও আমার ভাই না, আমার ভাই রাজা, সে আসিবে তক্তে, দোলায়, রথে, সিপাই লোক-লস্কর থাকিবে অগণ্য। আসিবার সময় কাঠের পুতুল খলখলি হাসিবে, ময়ূরে পেখম ধরিবে, স্বর্গে হইবে শঙ্খের ধ্বনি, মঞ্চে পড়িবে জোকার, ভোমরায় ধরিবে রোল। এই দুইটি ভিক্ষুক কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহাদের এক তোলা চাউল, এক তোলা ডাল দিয়া বাটীর বাহিরে স্থান দেও, রাত্রি প্রভাতে বিদায় দেও।'

এই বিষয় শুনিয়া রাজা রাণীকে বলিল, 'দেখ নিনাদে পড়িয়া আসিয়াছি বলিয়া আপন বোনও এই কথা বলে। তুমি কি কাজ করিলে, নিজের সম্পদ পরকে দিয়া, পরের বিপদ ডাকিয়া আনিলে। নিনাদে বন্ধুর বাড়ী, সুনাদে ভগ্নীর বাড়ী। এই স্থানে কিছুই গ্রহণ করিব না। গাঁটের পান-সুপারি খাইব, শুইয়া বসিয়া রাত কাটাইব, চাউল ডাল পুঁতিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইব।'

এই কথা বলিয়া রাজা শ্বশুরালয়ে গেলেন। সেখানেও রাজা এইরূপ ব্যবহার পাইলেন। অবশেষে বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা বন্ধু-গৃহে আদর-যত্নে কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিন বন্ধুর এক ছেলেকে নিয়া রাজা বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় কাঠের এক ময়না খপ্ করিয়া ছেলের গলার হার ছড়াটি গিলিয়া ফেলিল। এই কথা তাহার বন্ধু বিশ্বাস করিবে না মনে করিয়া রাজা গোপনে রাণী সহ ভিন্ন দেশে পলাইয়া গেলেন। যাইতে যাইতে অন্য রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মাঠের ধারে বটবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মনোদুঃখে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। কয়েকটি রাখাল বালক পথের ধারে রাজার করুণ ক্রন্দনের কাহিনী জানিল। তাহাদের কথানুসারে রাজা ও রাণী ঐ দেশে রাজবাড়ীতে দাস ও দাসীর কাজ আরম্ভ করিলেন। রাণীর গহণাপত্র ধোয়া, রাজপুত্রকে নিয়া থাকাই পূর্ব রাণীর কাজ। একদিন রাণী ঘাটে রাজপুত্রের হার ছড়াটি ধুইতে গেলেন। তখন এক চিল তাহা ছোঁ মারিয়া নিয়া গেল। দাসী-রাণী রাজাকে সমস্ত কথা বলিলেন। কিন্তু রাজা তাহা বিশ্বাস না করিয়া রাজ্য হইতে উভয়কে দূর করিয়া দিলেন। উভয়ে যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন।

একদিন রাণী পথের ধারে নদীতে অনেক মেয়েলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি কর?' তাহারা বলিল 'সম্পদ নারায়ণ ব্রত শেষ করিয়া ডোঙা ভাসাইতে আসিয়াছি।' তখন হঠাৎ রাজার চৈতন্য আসিলে রাণীকে বলিলেন, 'তুমিও এই ব্রত করিতে; আমি সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনি, এখানেই ব্রত সমাপন কর।'

বহু কষ্টে রাজা সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিলে, নদীর পাড়েই রাণী ব্রত সম্পূর্ণ করিলেন। ব্রতশেষের সঙ্গে সঙ্গেই একখানা রথ উপস্থিত হইল। তাঁহারা এই রথারোহণে নিজ রাজ্যাভিমুখে রওনা হইলেন। সেই রাজ্যের রাজা মনে মনে বলিল, 'এই রাজা ও রাণী নিনাদে পড়িয়া আমার গৃহে দাসদাসী ছিল, আমিও তাহার বাড়ীতে থাকিয়া দাসের কাজ করিয়া ঋণ শোধ করিব।' সে তখন এই রথের পশ্চাতে আরোহণ করিয়া চলিল। রাজা পথে বন্ধু, ভগ্নী ও শ্বশুরালয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া, 'সুদানের সাথী সকলে, নিদানের সাথী কেহই না' বলিয়া লজ্জা দিল ও পূর্বাপর সমস্ত কথা বলিয়া গেলেন। নিজ পুরীতে আসিয়া দেখেন, গভীর অরণ্য, যতদূর চক্ষু যায়, আকাশ জমিনে জঙ্গল, খস্খসিয়ার ঝাড়, খুনার ভাড়, ভেদালিয়ায় শিকড় মেলিয়াছে, দূর্বায় শাক্ মেলিয়াছে, দিনের বেলায় পশু-পক্ষী রোদন করে। রাজা লোক ডাকাইয়া সমস্ত পরিষ্কার করাইয়া

সম্পদ নারায়ণ ব্রত করিলেন ও দূর্বার জল সমস্ত রাজ্যে ছিটাইয়া দিলেন। হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সিপাই লোক-লস্কর যেমন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল, সমস্ত রাজ্য ধন-দৌলতে, লোকজনে পূর্ণ হইয়া 'জয়ময়' হইয়া উঠিল।

এই ব্রত যে করে, তাহার নিদান গিয়া সুদান হয়, অন্ধের চক্ষুদান হয়, যে যা মনস্কামনা করে, সিদ্ধ হয়।' —মৈমনসিংহ, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার'।

মন্তব্য

ইহা সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate N.) এই সাধারণ অভিপ্রায়ের অন্তর্গত হইলেও কতকগুলি বিশেষ অভিপ্রায়ও ইহার মধ্যে আছে। অস্বাভাবিক ঘটনা (Extraordinary Occurences F 900) ইহার একটি বিশেষ অভিপ্রায় টম্‌সন Extra-ordinary Swallowing নামে একটি অভিপ্রায়ের নির্দেশ করিয়াছেন (F 910). কাঠের ময়নার সোনার হার গিলিয়া খাইবার বিষয় তাহারই অনুরূপ। অবশ্য চিলে নদীর ঘাট হইতে সোনার হার ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবার ঘটনা অস্বাভাবিক নহে; সুতরাং এই অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১১

বন্ধন-মুক্তি

'এক বিধবা ব্রাহ্মণী ও তাহার এক ছেলে। মা ছেলেকে কিছু চরকা-কাটা স্বতা বিক্রয় করিয়া তাহার পরিবর্তে অন্য দ্রব্য আনিতে বাজারে পাঠাইলেন। বড় দরিদ্র, কষ্টের সংসার। শুভচনাই ঠাকরুন ছদ্মবেশে পথে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কি নিয়া যাস্?' ছেলে বলিল, 'কিছু স্বতা নিয়া বাজারে যাই,' শুভচনাই বলিলেন, 'আমার জন্যে কিছু পান-স্বপারি, সিন্দূর, তৈল আনতে পারবি?'

ছেলে বলিল, তাহার অর্থাভাব, ঐ সমুদয় দ্রব্য আনিতে পারিবে না। ঠাকুরাণী বলিলেন, 'আজ তোর স্বতা খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় হইবে।' ঈশ্বরের কি ইচ্ছা—সে হাটে যাওয়া মাত্রেই সমস্ত স্বতা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইল, নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সে ক্রয় করিল ও ঠাকুরাণীর নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ নিয়া ফিরিবার পথে ঐ স্থানেই আসিয়া বলিল, 'তোমার দ্রব্যাদি নিয়া যাও।'

তখন খাড়াশুভচনাই ঠাকুরাণী নিজমূর্তি ধরিয়া ব্রাহ্মণ-তনয়ের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'এই পান-স্বপারি, তেল-সিন্দূর যেন একটা রেকাবে নিয়া তোর মা দাঁড়াইয়া আমার নাম করিয়া জোকার দেয়। ঐ সমস্ত যেন নিজে ব্যবহার করে ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করে।'

সে বাড়ী আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে ব্রাহ্মণী রবি ও বৃহস্পতিবারে শুভচনাইকে পুজিতে আরম্ভ করিল ও ধনে জনে অল্পদিনেই স্বখী হইল।

এরূপে দিন যায়, ঐ দেশেই একদিন এক গোয়ালিনী তাহার পুত্রবধূকে বলিল, 'মাগো, আমি দৈ বেচিতে পাড়ায় যাই, তুমি মাঠা পাক দিয়া ঘরে বার বৎসরের যে বন্দিনী আছে, তাহাকে খাওয়াইও।' এই কথা বলিয়া গোয়ালিনী প্রস্থান করিল।

এদিকে বৌ মাঠা পাক দিতে গিয়া হঠাৎ ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অনন্যোপায় পুত্রবধূ শাশুড়ীর গঞ্জনার ভয়ে নিকটস্থ পিত্রালয়ে একটি ভাঁড় আনিতে গেল। তাহার মা বলিলেন, 'তোকে দিবার মত ভাঁড় এখানে নাই; বাড়ী ফিরিয়া শ্বশুরের বাটার চূণ, শাশুড়ীর বাটার স্বপারি, আর জামাইর বাটার পান দিয়া আমার কথামত খাড়া শুভচনাইর ব্রত করিলে ও ব্রতের ফুলদূর্বার জল ভাঙ্গা ভাঁড়ের উপর ছিটাইয়া দিলে উহা জোড়া লাগিয়া ঠিক হইয়া যাইবে।'

এই সমস্ত কাজ নির্দেশ মত সম্পাদন করিতেই ভাঁড়টি পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এইদিকে বন্দিনী যথাসময়ে খাইতে না পাইয়া ক্রোধে কিছুই খাইল না। ঐ গোয়ালিনী বাটী আসিয়া বন্দিনীর ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বন্দিনী বলিল, 'তুমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাওয়ার অল্পকাল মধ্যেই বৌ ভিন্ন-পুরুষের সঙ্গে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়।' শাশুড়ী এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া পুত্রবধূকে মারিতে উদ্যত হইল। বৌ বলিল, 'আমার কথা আগে শুনুন।' তখন পুত্রবধূ আদি-অন্ত খুলিয়া শাশুড়ীকে বলিলে শাশুড়ী বলিলেন, 'আন্ দেখি তোর শুভচনাইর পান-সুপারি। খাইয়া দেখি, ঠাকুরানীর কিরূপ মাহাত্ম্য।' বৃদ্ধা গোয়ালিনী ব্রতের পান-সুপারি গ্রহণ মাত্রেই ষোল বৎসরের যুবতীর মত সুন্দরী হইল। বন্দিনীও এই পান-সুপারি মুখে দিতেই বার বৎসরের বন্ধন মুক্ত হইয়া কিরূপে যে অন্তর্ধান হইল, কেহ জানিতেও পারিল না। তখন হইতেই এই ব্রত দেশে-বিদেশে বিদিত হইল।' এই ব্রত যে করে, তার জরা গিয়া যৌবন হয়, বন্ধন মোচন হয়, যে যা মনস্কামনা করে, তা সিদ্ধ হয়।

মন্তব্য

বার বছরের বন্দিনী বলিতে গৃহের ক্রীতদাসী বুঝায়; ইহা সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate N) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। তারপর ইহাতে পার্থিব সম্পদ্ লাভ করিবার জন্য দেব-সেবা অভিপ্রায়টিরও (Ceremonies and prayers at unearthing of treasure) ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শক্তিলাভ

'এক দেশের রাজা তীর্থে যাইবেন, কাজেই দেশের যত রাঢ়ী, বুড়ী, বৌ-ঝিয়ারী সকলেই তীর্থে যাইবার সঙ্কল্প ; করিল যাহাতে পথে কোন বিপদ না হয়, হাত-রথ ভাল থাকে সে জন্যে 'রাঢ়ী-বুড়ী' মিলিত হইয়া রথাইচণ্ডীকে 'পূজন' আরম্ভ করিল। এদিকে রাজা তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন, 'তোমাদের এত দেরী হইলে আমি অপেক্ষা করিব না, তাহার পর আমি যাব গাড়ী-ঘোড়ায়, হাতীতে, পাল্কীতে, রথে—আমার আবার হাত-রথ ভাল থাকিবার জন্য ব্রতের প্রয়োজন কি?'

এই না কথা বলিয়া অন্য সকলকে রাখিয়া তিনি তীর্থে 'মেলা' দিলেন। গেলে হইবে কি?—অর্ধপথে গিয়াই তাঁহার গাড়ী-রথ মাটিতে বসিয়া পড়িল। আঘাত খাইয়াও তাহারা চলে না। বেহারা, সিপাহী, লোক-লস্কর অর্ধপথে গিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত কারণে রাজা তীর্থে যাইতে না পারিয়া মনোদুঃখে রথের উপরে বসিয়া রহিলেন। এদিকে দেশের যত রাঢ়ী-বুড়ী, ছোট-বড় পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই রথাইচণ্ডীকে পূজিয়া ভাল হাত-রথে তীর্থে গিয়া দান-ধর্ম করিল। বাড়ী ফিরিবার পথে তাহারা বিস্ময়ে অবাক হইয়া দেখিল যে, রাজা পথে আট্‌কিয়া রহিয়াছেন।

রাজা তাহাদের দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা রথাইচণ্ডীর কৃপায় ভাল হাত-রথে তীর্থ করিয়া আসিলে। আর আমি হতভাগ্য, তাহা পারিলাম না। এইবার রাজ্যে গিয়া ভালরূপে তাঁহার পূজা করিব।' এই কথা বলিতেই রথ মাটি হইতে উঠিয়া রাজ্যের দিকে রওনা হইল। হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর শরীরে অসুরের মত বল পাইল ও দেখিতে দেখিতে সকলে রাজ্যে ফিরিয়া আসিল। রাজাও রাঢ়ী-বুড়ীর উপদেশ মত ব্রত সম্পাদন করিয়া সমস্ত দেশের লোককে ভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। তখন হইতেই এই ব্রত জগৎ-সংসারে বিদিত হইল। রাজাও ভাল হাত-রথে তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই ব্রত যে করে, সে সাতজন্ম ভাল হাত-রথে সংসারধর্ম করিতে পারে, সমস্ত তীর্থে ভাল হাত-রথে জন্ম ভরিয়া ঘুরিতে পারে।' —মৈমনসিংহ, প্রাগুক্ত

১৩

শাঁখারী

একদা কৈলাসে পার্বতীর অভাবে মহাদেবের চারিদিক শূন্য বোধ হতে লাগলো। কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে শ্বশুরালয়ে যাওয়াও অপমান। অনেক ভেবে চিন্তে মহাদেব স্থির করলেন, এক শাঁখারীর বেশ ধারণ করেই যাওয়া যাক্; কারণ, কিছুদিন পূর্বে পার্বতী শাঁখা পরতে চেয়েছিলেন।

অবশেষে মহাদেব এক শাঁখারীর বেশ ধারণ করে গিরিরাজের বাড়ী উপস্থিত হলেন।

এদিকে শাঁখারী এসেছে শুনে পার্বতী বড় সুখী হলেন। রাণী মেনকা শাঁখারীকে বাড়ীর ভিতর আসতে বল্লেন। পার্বতী একটু ঘোম্‌টা টেনে শাঁখা পরতে বসলেন। শাঁখারীর আনন্দের সীমা নাই। কতবার হাত টিপছেন, তেল মাখাচ্ছেন, শাঁখা পরাচ্ছেন। পার্বতীকে দেখে মহাদেবের আশা মিটে না।

নূতন শাঁখা পরে পার্বতী মাতাকে প্রণাম করলেন। শাঁখারী মেনকা রাণীকে বলিলেন, 'আমি শাঁখার দাম চাইনে।' বেলা অনেক হয়েছে, যদি অনুমতি হয়, তবে এখানেই আজ স্নানাহার করবো।

পার্বতী শাঁখা পরবার সময়েই মহাদেবকে চিনতে পেরেছেন, তিনি পরম যত্নে নিজে বেঁধে শাঁখারীকে ভোজন করালেন।

দেবতার চরিত্র বুঝা কঠিন। সেইদিন রাত্রে মহাদেব নিজ মূর্তিতে পার্বতীর শয়ন-গৃহে দেখা দিলেন। পার্বতী মহাদেবকে দেখিয়াই বলিলেন, 'তখন তোমার ছদ্মবেশে আসা ঠিক হয়নি।'

তদুত্তরে মহাদেব বললেন—'নিমন্ত্রণ না পেলে আমি কি করে আসি?'

সেই দিন রাত্রেই পার্বতীর এক কন্যা প্রসব হলো। পার্বতী লজ্জিত হয়ে মহাদেবকে বললেন, 'তুমি যে এখানে এসেছ, তা আর মা বাপের কাছে না বলে উপায় কি? জান তো এ স্বর্গ নয়, মর্ত্যে আছি।'

তদুত্তরে মহাদেব বললেন, 'তোমার সে ভয় নাই, আমি এখনি কন্যা সঙ্গে করে কৈলাসে যাচ্ছি। মহাদেব তাই করলেন।

কিন্তু কত দূর রাস্তায় কন্যাটি বলল, 'বাবা, মাকে না দেখে থাকতে পারব না। আমি মর্ত্যেই থাকবো।'

মহাদেব কন্যাটিকে আদর করে 'বুড়ী' বলে ডাকতেন। অবশেষে 'বুড়ী'র কথামতই মর্ত্যে কোন বনে যেয়ে এক শেওড়া গাছে তাঁকে রেখে বললেন, "বুড়ী, তুই এখানেই ' ' তুমি মর্ত্যে 'বনদুর্গা' বলে পুজা পাবে। মর্ত্যের লোক তোমার ব্রত না করলে সব নিষ্ফল হবে।'

একদিন এক শাঁখারী ঐ রাস্তায় শেওড়া গাছের তলা দিয়ে শাঁখা বেচতে যাচ্ছিল; অমনি বনদুর্গা শেওড়া গাছ থেকে হাত বড়িয়ে বললেন—'শাখারী, আমাকে শাঁখা পরিয়ে দাও।'

তদুত্তরে শাঁখারী বলল, 'দাম না দিলে শাখা দিব না।'

তখন মা বনদুর্গা বললেন—'তবে তোর মঙ্গল হবে না।' শাঁখারী 'মা বনদুর্গার' চাতুরী বুঝতে না পেরে গাওয়াল ফেরতা হয়ে বাড়ী গিয়ে দেখে—তাহার স্ত্রী, পুত্র, রক্তবমি ও রক্তভেদ করে একেবারে অজ্ঞান। পরে শাঁখারীরও সেই দশা হ'ল।

তখন শাঁখারীর চৈতন্য হল এবং অনেক কষ্টে সেই শেওড়া গাছের তলায় গিয়ে কাতরস্বরে বলল, 'মা, তুমি কে? শাঁখা পরতে চেয়েছ? হাত বাড়াও, আমি শাঁখা দেব।'

তখন বনদুর্গা সদয় হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন যে, 'আমি বনদুর্গা, আমাকে শাঁখা পরাও।' শেওড়া বনের ভিতরে ঐ যে ব্রাহ্মণের বাড়ী দেখা যায়, সেই বাড়ী দাম চাও। বলিও, ছিকার উপর সরায় পয়সা আছে, শেওড়া গাছ তোমার মেয়ে শাঁখা পরেছে, দাম দাও।'

শাঁখারী সেই ব্রাহ্মণ বাড়ী গিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে সব কথা খুলে বলল। ব্রাহ্মণের ত মেয়ে নেই, সে শুনে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। পরে বুঝতে পারল যে, এ নিশ্চয়ই কোন দেবতার ছলনা। ব্রাহ্মণ শাঁখারীকে সঙ্গে নিয়ে সেই শেওড়া গাছের তলায় গিয়ে হত্যা দিল। তখন আদেশ হল যে, 'আমি বনদুর্গা, বৈশাখ মাসে শনি কিংবা মঙ্গলবারে বিধবারা চিড়া খেয়ে এই ব্রত করবে। তা হলে শোক, দুঃখ, অশান্তি, অভাব কিছুই থাকবে না। শাঁখারীও বাড়ি গিয়ে ভক্তিসহকারে পুজা দিল, তার স্ত্রী-পুত্র সব ভাল হল এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল। ক্রমে দেশে ব্রত প্রচারিত হলো।' —ঢাকা, বিক্রমপুর, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৩৮ সনে সংগৃহীত।

মন্তব্য

এই কাহিনীর শেষাংশটি বাঁকুড়া জিলার ছাতনা গ্রামে বাশুলীদেবীর নামে প্রচলিত। বাংলা দেশের অন্যত্রও বিভিন্ন লৌকিক দেবীর নামে অনুরূপ ভাবে শাঁখা পরিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শিবের শাঁখারী সাজিবার কথা নানা লৌকিক ছড়া ও শিব-মঙ্গল বা শিবায়ন কাব্যগুলিতে শুনিতে পাওয়া যায়। যে ভাবে ইহাতে বনদুর্গা নামে শিবের এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। অভিপ্রায়ের মধ্যে ইহাতে ছদ্মবেশে ছলনার (Deception by disguise K1800—K1899) ইঙ্গিত আছে।

বিপদের দিনে

এক রাজা আর এক রাণী পাশা খেলেন। রাজা পণ করিলেন, খেলায় যদি রাণী জিতেন, তবে রাণীকে সোনার পুরী তৈয়ার কৈরা দিবেন। খেলায় রাণীই জিতিলেন। কয়েক দিন যায়, রাণী বল্লেন, কই, আমারে না সোনার পুরী তৈয়ার কৈরা দিবেন ? রাজা কামার ডাইক্যা পুরী তৈয়ার কইরা রাণীরে বল্লেন, দেখ গিয়া, তোমার পুরী তৈয়ার হৈছে।

রাণী সইরে নিয়া সোনার পুরী দেখ্‌তে গেলেন ; সোনার পুরী দেইখা সই বল্ল, রাণী, তোমার সম্পদ আমারে দেও, আমার বিপদ তুমি নেও। রাণী তখন আইচ্ছা বইলা, তার সম্পদ সইরে দিল, সইর বিপদ নিজে লইয়া বাড়ী আস্‌তে রাজার সঙ্গে দেখা হৈল।

রাণীর হাতে ছিল সম্পদলক্ষ্মী বস্তের ডোর। সম্পদলক্ষ্মীর ছলনায় রাজার মনে অহঙ্কার হইল। আমি অত বড় রাজা, আমার রাণীর হাতে সূতার ডোর ! এই বইলা ডোরগাছ টাইনা ছিঁড়া ফেল্লেন।

এই হইতে তাগোর নানারকম বিপদ হইতে লাগল। রাজার হাতীশালে হাতী মরে—ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে!—রাজ্যের লোকজন, ধনদৌলত যত আছে, সব বিনাশ হইল। রাজার হাতে গোদ, পায়ে গোদ, চোকে ঢেলা, কানে ঘা হইল। পুরীতে খস্‌খইসা লতের ঝাড়্ গুনা লতের ভার বাঁধল। এই পুরীতে আর থাকৃতে না পাইরা রাজা বল্লেন, চল, মহাদেবী! তোমার মা-বাপের বাড়ীতে যাই।

মা-বাপের বাড়ী গিয়া দাসদাসীকে বল্ল, তোমার ঠাকুর ঠাইরেনেরে বল গিয়া, তাগর ঝি-জামাই আস্‌ছে। দাস-দাসী গিয়া খবর দিল,—আপনাগো ঝি নাকি কে, জামাই নাকি কে, তারা আইছে। মা-বাপ আইসা দেইখা বল্ল, এই বুঝি আমার ঝি ! আর এই বুঝি আমার জামাই ! আমার যে দিন ঝি-জামাই আবে, সে দিন সোনার দোলা আবে, সোনার ঘোড়া আবে। হাস-হাসী কেলি করবে। ময়ুর পেখম খুলবে। ঢুপী নৃত্য করবে। গন্ধর্বে গীত গাইবে। দাস-দাসী বাতাস করবে। শাঁখারী শাঁখা বানাইবে। দুধের পুষ্কর্নি দিবে। কড়ির জাঙ্গাল দিবে। কাপড়ের আন্ধারী টানাবে ; তবে তো আমার ঝি-জামাই আবে, কই থাইকা জানি এক বেটা-বেটী আইছে।

একসের চা'ল দেও, আজ্জের ডাইল দেও, এক বেগুনের লবণ দেও, এক বেগুনের তেল দেও, এক বেগুনের মরিচ দেও, এক পাজা লাকড়ি দেও, একটা পাতিল দেও, বাইর মণ্ডবে বাসা দেও, রাইত পোহাইলে বিদায় দেও।

রাজা এইগুলি পাইয়া, মণ্ডবে এক গাতার ভিতর রাইখা তার উপর মাটী দিলেন। আর রাণীকে বল্লেন, সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেউ নাই। আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদ আইনা বিড়ম্বনা পাইলাম। চল, রাণী, তোমার কন্যার বাড়ী যাই। কন্যা, মাসী, পিসি, সই, সবের বাড়ী হইতেই এই রকমে ফেরৎ আইলেন। তখন আর কোন উপায় না দেইখা রাজা তান্ বন্ধুর বাড়ী গেলেন। গিয়া দাসদাসীকে বল্লেন, তোমাগর ঠাকুর ঠাইরেনেরে বল গিয়া, তাদের বন্ধু-বন্ধাইন আইছে। তারা গিয়া খবর দিল। রাজার বন্ধু আইসা রাজরাণীকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

রাণী তার বন্ধুর ছাওয়াল তুইলা কোলে লইলেন। রাণীর ছোঁয়ায় ছাওয়ালের গায়ের সোনার অলঙ্কার রাঙ্ হইয়া গেল; রাণী রাজাকে গিয়া বল্ল, আমি বন্ধুর ছাওয়াল তুইলা কোলে কর্‌তেই ত তার গায়ের সোনার অলঙ্কার রাঙ্ হইয়া গেল। বন্ধু না জানি কয় যে, আম্‌রা বিপদে পইড়া সোনার অলঙ্কার বদলাইয়া দিছি; চল, আমরা এইখান হইতে চইলা যাই।

তখন রাজারাণী এক পুষ্কর্ণীর পাড়ে গিয়া বইসা রইলেন। কয়জন দাসী সেই ঘাটে জল আনতে গেছে। রাজরাণী তাগরে বল্ল, ওগো, তোমরা কার দাসী? বুড়া এক দাসী বল্‌ল, আমরা অই বেশ্যার দাসী।

আচ্ছা, বুড়া, তুমি গিয়া তোমার ঠাইরানরে কও, আমাদের রাখেন কি না।

বুড়া দাসী গিয়া বেশ্যাকে বলিল, পুকুরপারে দুই জন লোক বইসা আছে। তাদের রাখবেন কি না, তারা জানত চাইছে।

বেশ্যা বল্ল, আচ্ছা, নিয়া আইস। বুড়া দাসী গিয়া রাজারাণীকে লইয়া আইল। বেশ্যা রাজাগো জিগাইল, তুমি কি কাজ কর্তে পার? রাজা বল্লেন, হাট করতে পারি, বাজার করতে পারি, এক টাকা দিয়া পাঁচ টাকার সদায় কিনতে পারি। রাণীরে জিগাইল, তুমি কি কত্তে পার গো। রাণী বল্ল, চুল বানতে পারি, সাজ করাইতে পারি, অলঙ্কার মাজতে পারি, ঘর গুরতে পারি, কেবল কেওর পাতের আইটা খাই না, কেবল কেওর পাতের আইটা ছুঁই না।

বেশ্যা বল্ল, আচ্ছা বেশ থাক। এই দিন চৈত্র মাসের সংক্রান্তি, আজ সম্পদ-লক্ষ্মীর বত্ত। বেশ্যা রাজাকে বাজারে পাঠাইল। রাণীকে বল্ল গয়না মাজতে।

রাণী ঘর শুর্‌তে দেখ্‌লেন, একটু পিটালি পড়িয়া আছে। রাণী ডাইন হাতে ঘর শুরতে শুরতে বাঁ হাতে বাসি পিটালীটুক দিয়া একটি ময়ূর বানাইলেন। ময়ূর গিয়া গয়না গিলা ফেল্ল। রাণী ত দেইখা তাজ্জব। বেশ্যার কাছে গিয়া বল্ল, ঠাইরেন গো, ভয়ে বলুম্ না নির্ভয়ে বলুম্। বেশ্যা কইল, নির্ভয়ে কও। রাণী কইল, আমি পিটালী দিয়া একটা ময়ূর বানাইছিলাম, সেইটা গিয়া আপ্‌নার গলার হার ছড়া খাইয়া ফেল্‌ছে।

বেশ্যা এই কথা বিশ্বাস করিল না, রাগের চোটে রাণীকে মাইরা, বইকা বাইর কইরা দিল। রাণী গাঙ্গের পাড় গিয়া বইসা রইল। রাজা গাঙ্গ পার গিয়া বল্লেন, উঠ, ছান্ কর। চল, বাড়ী যাই। রাণী বল্লেন, আমি আর এই বাড়ী যাম্ না। রাজা বল্লেন, কি করবে, আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদে বিড়ম্বনা পাইলাম; যে আছিল আমার দুয়ারের বেশ্যা, তার গুণে হইল প্রাণরক্ষা। এখন উঠ, চল যাই। অনেক সাধাসাধির পর রাণী উঠিয়া ছান করতে গাঙ্গে গেল। সেখানে রাণী দেখ্‌ল, কয়জন বস্তি সম্পদলক্ষ্মী বত্ত কইরা সেই ঘাটে নির্মালি ফালাইতে আসছে।

রাণী জিগাইল, তোমরা কি বত্ত করূছ গো। তারা বল্ল, সম্পদলক্ষ্মীর বত্ত। রাণীর তখন সম্পদলক্ষ্মীর বত্তের কথা মনে হইল। রাণী বল্ল, অখন কৈ আর কি পাইবেন। এই দেখেন গাঙ্গ দিয়া একটা সূতার নাটাই ভাইসা যায়। আমারে নাটাই আইনা দেন। রাজা সাঁতার দিয়া সূতার নাটাই আইনা দিলেন। রাণী তখন ত্রিশ নাল সূতা লইয়া একটা ডোর তৈয়ার কল্লেন। বত্তের আর আর জিনিস কৈ পাইবেন? সম্পদলক্ষ্মীর উদ্দেশে পন্নাম কইরা ডোর হাতে দিলেন।

ডোর হাতে দিতেই সম্পদলক্ষ্মীর কৃপা হইল। সোনার দোলা, সোনার ঘোড়া রাজারাণীর জন্য আইসা উপস্থিত হইল। রাজা বল্লেন, চল আমরা বেশ্যার সঙ্গে দেখা কইরা যাই। রাজারাণী বেশ্যার সঙ্গে দেখা করত্তে গেলেন। তারা বল্লেন, আমরা ত বাড়ী যাইতে চাই। বেশ্যা বল্ল, বাড়ী যাইতে চাও, যাও। তখন রাণী পিটালীর ময়ূরের পেটটা ছিড়্যা সোনার হাড়-ছড়া বাইর কইরা দিয়া তারা বিদায় হইল।

বেশ্যা তাহার পাছে পাছে লোক পাঠাইয়া বল্ল, দেখ, তারা কিছু নিয়া টিয়া যায় নি। লোক গিয়া দেখে যে, তারা রাজ্যের রাজারাণী। তখন দৌড়াইয়া আইসা বেশ্যাকে বল্ল, অরাত আর কেওই নয়—তারা যে রাজা আর রাণী।

তখন বেশ্যা গলবস্ত্র হইয়া রাজারাণীর পায়ের তলে পল্ল, আর বল্ল, রাজা মশয়! পরিচয় দিতেন, তবে ভাণ্ডারী রাইখা দিতাম, তেল দিতে, দাই রাইখা দিতাম জল দিতে, গাই রাইখা দিতাম দুধ খাইতে। না জানাইয়া কেন আমায় এত আক্কেল দিলেন! অখন আমারে কি করবেন, করেন। রাজা বল্লেন সঙ্গের বেশ্যা সঙ্গে লও। রাজারাণী রওনা হইলেন। রাজা বল্লেন, চল তোমার মা-বাপের বাড়ী হইয়া যাই, মা-বাবার বাড়ী গিয়া দাসদাসীদের বল্লেন, খবর দেও। মা-বাবা আইসা দেইখা বল্ল, এই ত আমার ঝি, এই ত আমার জামাই আসছে। এই ত দেখ্ সোনার দোলা—সোনার ঘোড়া আস্‌ছে। হাস-হাসী কেলি করছে। ময়ূর পেখম ধরছে। ঢুপী নৃত্য করছে। গন্ধর্ব গীত গাইছে। দাসদাসী বাতাস করছে। শাঁখারী শাঁখা বানাইছে। বাইনা ঘর বানাইতেছে। দুধের পুষ্কর্ণী হইছে। কড়ির জাঙ্গাল দিছে। কাপড়ের আঙ্গারী টানাইছে।

এই ত আমার ঝি-জামাই আস্‌ছে। সপ ফেল, পাটী ফেল, ঝিক বসাও—জামাইক বসাও। মেড়া মার, খাসী মার, ঝিক খাওয়াও—জামাইক খাওয়াও। বুচকা ভইরা কাপড় আন, বাটা ভইরা টাকা আন, ঝিক দেও, জামাইক দেও। রাজা বল্লেন, বুচকা ভইরা কাপড়, বাটা ভইরা টাকা দিয়া কি করুম্? বিপদে পইড়া আইছিলাম, এক সের চাইল, আজ্জের ডাইল, এক বেন্নের তেল, এক বেন্নের নুন, এক বেন্নের মরিচ, এক পাঞ্জরা লাকরী, একটা পাতিল দিছিলা। বাইর মণ্ডপে বাসা দিছিলা—রাইত পোহাইতে বিদায় দিছিলা। তোমার জিনিস তুমি নেও, মণ্ডপ ঘরের মাইজাল হইতে জিনিসগুলি তুইলা রাণীর মা-বাপরে দিয়া বল্লেন, সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেওই নাই। আপনার সম্পদ পরকে দিলাম, পরের বিপদ বিড়ম্বনা পাইলাম। যে আছিল আমার দুয়ারের বেশ্যা, তার গুণে হইল প্রাণ রক্ষা। চল, মহাদেবী, তোমার কন্যার বাড়ী যাই। এম্‌নে এম্‌নে কন্যা, মাসী, পিসী, সই সকলের বাড়ী হইতে দেখা কইরা শেষে বন্ধুর বাড়ী গেল। দাস-দাসী গিয়া খবর জানাইল।

বন্ধু-বন্ধাইন আইসা রাজারাণীরে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। আর বল্ল, বন্ধু, সেইবার আসছিলেন, না কইয়া চইলা গেলেন। এইবার কয় দিন থাইকা যান। সপ্ পাইড়া, পাটী পাইড়া বসাইলেন, মেড়া খাসী মাইরা খাওয়াইলেন। বুচকা ভইরা কাপড়, বাটা ভইরা টাকা দিলেন। ব্যাভার আচার করলেন। তারপর রাজারাণী বাড়ী গেলেন।

এই দিন বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি। রাণী বল্লেন, আজ আমার সম্পদলক্ষ্মীর বত্ত। কি কি লাগবে রাজা জিজ্ঞাস্ করলেন। পান, সুপারি, কলা, নাইরকল, আতপ চাউল, মিঠাই, মণ্ডা, দই, দুধ যা যা লাগবে, রাণী সব বল্ল। এইবার সোনার ডোরের কথাও কইল। রাণী বত্তের আয়োজন করলেন। ব্রাহ্মণ আইসা পূজা কইরা দক্ষিণা লইয়া গেলেন। রাণী তার পর রাজার 'বানা' দিলেন, রাজার হাতের গোদ, পায়ের গোদ, চোখের ডেলা, কানের ঘাঁও সব গেল। আর সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই লোকলস্কর সব হইল।—ঢাকা, (মণীন্দ্রকিশোর সেন কর্তৃক ১৩২৩ সালে সংগৃহীত, প্রতিভা, ১৩২৪)

মন্তব্য

কাহিনীটি ঢাকা বিক্রমপুর পরগণার কথ্যভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় ভাগ্যের বিপর্যয় (Reversal of Fortune L.) ইংরেজিতে একটি অভিপ্রায় আছে, তাহার বিষয় অহঙ্কারী রাজাদের লাঞ্ছনা (Proud king displaced by angel, L 411). এই বিষয়ে বলা হইয়াছে, 'Kings are so in the habit of assuming command that they, sometimes lose all humility and need to be given a lesson.' (Stith Thompson, *The Folktale*, *ibid*, p. 268) এখানেও রাজার অহঙ্কারের কথাই বলা হইয়াছে,—'আমি অতবড় রাজা, আমার রাণীর হাতে সূতার ডোর।' ইহারই শাস্তি স্বরূপ তাহাকে এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

শনির দৃষ্টি

লক্ষ্মী আর শনি দুই জনের মধ্যে বিবাদ,—কে বড়, কে ছোট। লক্ষ্মী বলেন, আমি বড়, শনি বলেন আমি।

বিবাদের আর মীমাংসা হয় না। শেষে তাঁরা রাজা শ্রীবৎসের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কে বড়, কে ছোট, তার বিচার হইবে।

রাজা তো মহা মুস্কিলে পড়িলেন। দুই জনই দেবতা, দুই জনই তাঁর কাছে সমান, কাকে তিনি ছোট, কাকে বড় বলিবেন? কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা তাঁদের বিদায় দিলেন—আর একদিন এর বিচার করিবেন।

তাই তো, দেবতার বিচার মানুষকে করিতে হইবে। এ যে ভয়ানক কথা। রাজা ভারি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

রাণী চিন্তা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, এর জন্য আবার তুমি ভাবছ? এক কাজ কর, দুখানা পাট তৈরী করে রাখ—একখানা সোনার, আর একখানা রূপার। আর একদিন তাঁরা যখন আসবেন, তুমি ওগুলোতে তাঁদের বসতে বলবে, তাঁদের বসা থেকেই কে বড়, কে ছোট তার পরীক্ষা হয়ে যাবে, তোমায় আর কিছু বলতে হবে না, কেবল ইঙ্গিত করবে।

রাজা তাই করিলেন। তৎক্ষণাৎ কারিগর ডাকিয়া দুইখানা সিংহাসনের ফরমাস দিলেন, সিংহাসন তৈয়ারী হইল।

দিন কয়েক পরেই লক্ষ্মী আর শনি আসিয়া আবার উপস্থিত। রাজা মহাসমাদর করিয়া তাঁদের বসিতে বলিলেন, তাঁরা বসিলেন। শনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলুন, এইবার আমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট।'

রাজা শ্রীবৎস গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, 'আমি আর কি বলব—আপনাদের বিচার তো আপনারাই করেছেন, আসনই তার প্রমাণ।'

শুনিয়াই তাঁরা নিজেদের আসনের দিকে চাহিলেন। চাহিয়াই লক্ষ্মীর খুসীর সীমা নাই, শনির তো মহারাগ। লক্ষ্মী বসিয়াছেন সোনার পাটে, আর শনি কি না রূপার পাটে। 'এ্যা, শনিকে ছোট করা। দেখি লক্ষ্মী তোকে কদ্দুর রক্ষা করতে পারে!' বলিয়াই শনি রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন, আস্তে আস্তে লক্ষ্মীও বিদায় হইলেন।

ভয়ে ভয়ে রাজার দিন কাটে, কখন শনি আসিয়া কণ্ঠে ভর করেন। এক দিন হইল কি—শ্রীবৎস স্নান করিয়া জলের ঘটিটি পাড়ে রাখিয়াছেন, এমন সময় শনি একটা কালো কুকুরের রূপ ধরিয়া সেই ঘটিতে মুখ দিলেন। রাজা আর তা লক্ষ্য করিলেন না; না করিয়া সেই জলেই সন্ধ্যা-মন্ত্র জপ করিলেন। এই তো তাঁর কপাল ভাঙ্গিল, শনির কোপ-দৃষ্টিতে তিনি পড়িয়া গেলেন।

রাজার রাজকাজে আর মন বসে না। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কেউ কাউকে মানে না, কারো কথা শুনে না, বাদ-প্রতিবাদ লাগিয়াই আছে। রাজা যদি ভাল করেন, লোকে মন্দ ভাবে; যে কখনো চোখ তুলিয়া চায় নাই, সেও মারিতে আসে। চার দিকে কেবল অশান্তি অঘটন। দিনে পেঁচায় ডাকে, রাত্রিতে কাক! কারো ভাল দিকে মন যায় না, ভাল কথা মুখ দিয়া আসে না। কেবল কুরুচি কুকথা কুকাণ্ড!

শ্রীবৎস চিন্তাকে ডাকিয়া বলেন, 'রাণী, আমরা নিশ্চয়ই শনির কোপে পড়েছি। এখন থেকে আমাদের আর কল্যাণ নেই; চল দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাই।'

রাজারাণী যুক্তি করিয়া একদিন কি করিলেন, না, কাউকে কিছু বলিয়া নিশারাত্রিতে তাঁরা রওনা হইলেন। কোথা যাইবেন, কিছু ঠিক ঠিকানা নাই। রাণী চিন্তা সঙ্গে করিয়া একটা পোঁটলায় দুখানা সোনার থাল, দু'খানা গ্লাস, দুখানা বাটি, আর কয়েকটা মোহর লইলেন। পথের সম্বল, কোথায় কি পাইবেন!

যাইতে যাইতে তাঁরা অনেক দূর গেলেন। গিয়া, একস্থানে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় দেখেন কি, সামনে প্রকাণ্ড বড় এক হাওর, কূল নাই, কিনারা নাই, কেবল একজন লোক একটা ডিঙ্গি লইয়া আনাগোনা করিতেছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে, মাঝি ভাই, আমরা বড় বিপদে পড়েছি। তোমার ডিঙ্গাখানা দিয়ে কি আমাদের পার করে দিতে পার?

মাঝি উত্তর করিল, 'হা, পারি। তবে আমার ডিঙ্গি বড় ছোট, তোমাদের দুজনকে ধরবে না।'

রাজারাণী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কাকে রাখিয়া কে আগে যাইবেন? হাওরের তো কূল-কিনারা দেখা যায় না। আবার একটি পোঁটলাও আছে। তারই বা কি করিবেন?

মাঝি আবার বলিল, 'তবে এক কাজ কর, তোমাদের ও পোঁটলাটা আগে দাও, তারপরে দেখব'খন দুজনকে একসঙ্গে নেওয়া যায় কিনা।'

রাজারাণী ভাবিলেন, 'এ মন্দ নয়, আগে পোঁটলাটাই থাক্। তার পর আমরা।'

তাঁরা পোঁটলাটা ডিঙ্গিতে তুলিয়া দিলেন। কিন্তু এ কি! কোথায় হাওর, কোথায় ডিঙ্গি, কোথায় মাঝি? নিমেষে সব অদৃশ্য হইয়া গেল। সামনে মস্ত বড় একটা মাঠ পড়িয়া আছে! রাজারাণীর তখন আর কোন আপশোস্ রহিল না, তাঁরা বুঝিতে পারিলেন, ইহা শনিরই কাণ্ড, তাঁরই ছলনা! তাঁরা আবার হাঁটিতে লাগিলেন।

রাত্রি গেল, দিন গেল, আবার সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। রাজারাণীর পা আর চলে না, ক্ষুধায় তাঁরা অবশ হইয়া পড়িলেন। দেখিলেন, কয়েক জন জেলে ঝাঁকি জাল দিয়া মাছ ধরিতেছে। রাজা তাদের অনুরোধ করিলেন, 'ভাই সকল, আমরা সারা দিনের উপবাসী, আমাদের যদি মাছ কয়টা দিতে পারতে—

জেলেরা বিরক্তিভরে উত্তর দিল—'ভারি তো খাইয়ে! সারা দিন জাল ফেললাম, একটা পেলাম না, এখন তোদের দিব মাছ।'

এক বৃদ্ধ জেলের কেমন যেন মমতা হইল, সে বলিল, 'আচ্ছা ফেল্ না একবার জাল—লোকটাকে ভাগ্যিবান্ বলেই মনে হয়, ওর বরাতে যদি দু-একটা আসে। সারা দিনই তো গেছে।'

এক জেলে অগত্যা জাল ফেলিল। তাই তো জাল যে আর পাড়ে উঠাইতে পারে না—এত মাছ পড়িয়াছে। জেলেদের তখন আনন্দের সীমা রহিল না· তারা লাফালাফি দাপাদাপি করিয়া জাল গুটাইল—মাছ ভরতি।

রাজা আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না, কেবল একটা শোল মাছ চাহিয়া লইলেন। জেলেরা ভাবিল, 'লোকটা কি বোকা, অথচ ওর কি বরাত। এত মাছ থাকতে চাইল কিনা শোলমাছ।'

রাণীকে মাছটা পোড়াইয়া লইতে বলিয়া রাজা স্নান করিতে গেলেন। রাণী মাছটা পোড়াইয়া লইয়া ধুইতেছেন, আর ভাবিতেছেন—হায়, ছিলাম রাজারাণী, দু'দিনেই কি না কাঙ্গালিনী। এই হাতে রাজাকে আমি কত দেবদুর্লভ জিনিসই না পরিবেষণ করেছি; সোনার থালে, সোনার বাটীতে কত অন্নব্যঞ্জনই না খাইয়েছি, আর আজ কি না তাঁকে দিতে হবে একটা আলুনি আধপোড়া শোলমাছ। অদৃষ্টের কি ফের!'

ও মাঃ! পোড়া মাছটাও হঠাৎ লাফ দিয়া জলে চলিয়া গেল। রাণী তো অবাক! তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, রাজাকে কি বলিবেন? তিনি

হয়তো ভাবিবেন, ক্ষুধার জ্বালায় রাণী একাই মাছটা খাইয়া ফেলিয়াছে, মরা মাছে লাফ দেয় ? কে বিশ্বাস করিবে ?

স্নান করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া রাজা আসিলেন, দেখিলেন, রাণী কাঁদিতেছেন। সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'এর জন্য তুমি কাঁদছ ? এও যে শনির কাণ্ড তাও কি জান না ? চলো চলো।'

সে রাত্রিতে শ্রীবৎস ও চিন্তা এক কাঠুরিয়ার বাড়ী গিয়া অতিথি হইলেন, না, কিছুদিন সেখানেই রহিলেন। কাঠুরিয়ারা রোজ সকালে কাঠ কাটিতে বনে যায়, সারা দিন কাঠ কাটিয়া হাটে বিক্রী করে, আর সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে। রাজাও তাদের সঙ্গী হইলেন।

কাঠুরিয়ারা কাটে আজে বাজে কাঠ, বোঝা হয় বড়, পরিশ্রম হয় বেশী, পয়সা পায় অল্প। রাজা বাছিয়া বাছিয়া কাটেন চন্দন কাঠ, অল্প পরিশ্রমে সামান্য কাঠেই পয়সা হয় বেশী।

কাঠুরিয়াদের সঙ্গে রাজা এখন রোজ বনে যান, চিন্তা থাকেন বাড়ী। বেশ সুখেই তাদের দিন কাটে ; তাদের কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে সকলেই তাঁদের সুনজরে দেখে, ভালবাসে। না, আরো কারণ আছে—তাঁরা আসিয়াছেন অবধি কাঠুরিয়াদের সংসারে যেন সচ্ছলতা দেখা দিয়াছে। সকলেই বলাবলি করে, এঁদের রাইশ খুব ভাল ! নইলে আগে আমাদের দিন চলে নাই, এখন এত পয়সাকড়ি হচ্ছে কি ক'রে ?

রাজা মধ্যে মধ্যে কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান, চিন্তা পাক করেন, এমন সুস্বাদু পাক তারা কখনো খায় নাই, যেন মা অন্নপূর্ণার হাত।

শনি কিন্তু তাঁদের পিছনে পিছনেই আছেন। তিনি দেখিলেন, রাজা-রাণীও ভারি সুখে পড়িয়া গিয়াছে ! ভাবিলেন, 'এদের সুখের ঘর ভাঙতে হবে'।

এক সদাগর বাণিজ্যে যায়। শনি কি করিলেন, না, জিনিসপত্রে বোঝাই তার নৌকা চড়ায় আটকাইয়া দিলেন ; আর নিজে এক গণকের বেশ ধরিয়া পাঁজি-পুঁথি বগলে লইয়া নদীর পাড়ে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিলেন।

সদাগর মাঝি মাল্লা লইয়া অনেক ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করিল ; কিন্তু নৌকা নড়িল না। শেষে তারা দেখে কি, এক গণক। জিজ্ঞাসা করিল, ওহে গণকঠাকুর ! আমাদের নৌকাটা যে চড়ায় আটকে গেল। একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি ?

শনি ঠাকুর পুঁথির পাতা উল্টাইয়া বলিলেন, 'হাঁ, পারি। যদি কোন সতী নারী তোমাদের নৌকা এসে ছোঁয়, তবেই তা' চলবে।'

সওদাগর অমনি লোকজন লইয়া কাঠুরিয়াদের পাড়ায় গিয়া উঠিল, এক এক করিয়া তাদের বৌদের আনিয়া নৌকায় তুলিল ; কিন্তু নৌকা এক চুলও নড়িল না, সকলই শনির খেলা। তারা মুখ কালো করিয়া চলিয়া গেল।

সদাগর গণককে আবার আসিয়া ধরিল, 'কই, ঠাকুর? আপনার গণা যে মিথ্যা হয়ে যায়। নৌকা তো কেউ চালাতে পারল না। তবে কি বলতে চান দেশে সতী নাই?

শনি আবার পুঁথির পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কহিলেন 'হা, সতী এথাতেই আছে, আরো খুঁজে দেখ।'

সদাগর তখন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, দেখিল, রাণী চিন্তা যান নাই। সদাগর তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল ; কিন্তু তিনি যাইবেন কি করিয়া? শ্রীবৎস যে ঘরে নাই! তাঁর বিনা অনুমতিতে তিনি কি করিয়া যান?

সদাগর তখন একেবারে পায় পড়িল, কাঠুরিয়া রমণীরাও অনেক বলিল, চিন্তা আর না গিয়া পারিলেন না। তিনি শ্রীবৎসকে মনে মনে চিন্তা করিয়া জলে নামিলেন, না, নৌকাটি আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিলেন। সকলে অবাক হইয়া দেখিল, সাধুর ডিঙ্গা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুহূর্তে সদাগরের মাথায় এক দুষ্টবুদ্ধি খেলিল, তাও শনিরই খেলা, সে চিন্তাকে জোর করিয়া নৌকায় উঠাইয়া লইল, আবার চড়ায় ঠেকিলে কে উদ্ধার করিবে?

চিন্তা তখন গলায় আঁচল জড়াইয়া করযোড়ে সূর্যকে ডাকিলেন, 'ঠাকুর, আমি যদি সতী নারীই হয়ে থাকি, মুহূর্তে তুমি আমার রূপলাবণ্য সব নাও, আর গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিতে আমায় অস্পৃশ্যা করে রাখ।' সূর্যদেব তাই করিলেন।

এদিকে রাজা শ্রীবৎস সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, কাঠুরিয়াও আসিল। সকলেই হায় হায় করিয়া উঠিল, আজ থেকে আমরা লক্ষ্মীছাড়া হ'লাম। রাজা কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না ; তিনি বুঝিলেন, এও শনির কাণ্ড। শনির ইচ্ছাতেই এরূপ হইয়াছে।

রাজা একদিন কাউকে কিছু না বলিয়া কাঠুরিয়াদের পাড়া হইতে চলিয়া গেলেন। চিন্তাকে আর কোথায় খুঁজিবেন, কি করিয়াই বা খুঁজিবেন? সাধু সদাগরের কত ডিঙ্গাই তো নদী দিয়া যায়, আসে ; কাকে তিনি ধরিবেন, কেই বা ধরা দিবে?

ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের দুঃখে রাজার দিন যায়। মধ্যে মধ্যে আকাশবাণী শুনেন—'কই রাজা—তোমার লক্ষ্মী কই? তাকে না তুমি সোনার সিংহাসন দিয়ে বড় করেছিলে? এখন সে কোথায়?'

রাজা শুনেন আর ভাবেন, 'হায়, শনির কোপে না জানি আরো কত দুর্গতি কপালে আছে? রাজ্য গেল, চিন্তা গেল, ধন-মান সবই গেল, বাকী আর রইল কি?'

ওদিকে চিন্তা সওদাগরের নৌকার এক কোনায় পড়িয়া আছেন। ঐ যে রূপলাবণ্য ছিল তাঁর শরীরের, কিছু নাই, কুষ্ঠব্যাধিতে একেবারে গলিয়া গিয়াছে। দূর হইতে সদাগরের দাসী বাঁদী খাবার দিয়া আসে, দূর হইতে জিজ্ঞাসাবাদ করে। চিন্তা কিছুই বলেন না; ইচ্ছা হয়তো খান, নইলে যেখানের যা,' সেখানেই পড়িয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে কেবল শ্রীবৎসের কথা চিন্তা করিয়া চোখের জল ফেলেন।

শ্রীবৎস এখন এক কামধেনু গাইয়ের আশ্রয়ে আছেন। তার তিনি সেবাযত্ন করেন, দুধ খান, আর গোবর দিয়ে ঘুঁটে বানান; না, ঘুঁটের সঙ্গে দুই একটা ইটও তৈয়ার করেন। কামধেনুর দুধে-চোনায় মাটি ভিজে। ক্ষুরের চাপে কাদা হয়, রাজা তাই ছানিয়া মাখিয়া এক একটা ইট তৈয়ার করেন, নিজে নাম লিখিয়া এক সঙ্গে দুইটা জোড়া দিয়া রাখেন। এক দিন হঠাৎ দেখেন কি— তাঁর তৈয়ারী ইট সব সোনার হইয়া গিয়াছে। এ কি কাণ্ড! খুসীর তাঁর সীমা রইল না। না হইবে কেন? রাজার হাত, রাজার মন, কামধেনুর দুধ— খাঁটি সোনা হইবে—তা আর এমন কি?

শনি দেখিলেন, রাজার রাজ্য গেল, কিন্তু তাঁকে তো নিঃস্ব করা গেল না। এখন আবার সোনার ইটে তিনি বেশ ধনী হইয়া উঠিতেছেন। আচ্ছা, মজা দেখাইতেছেন।

একদিন শ্রীবৎসের ইচ্ছা হইল, ইটগুলি বিক্রী করেন। তিনি সেগুলি নিয়া নদীর পাড়ে জড় করিলেন। এক সদাগর নৌকা বাহিয়া যায়, রাজা ডাকিলেন, সোনার ইট নিবে গো, সোনার ইট? সোনার ইটের কথা শুনিয়া সাধু আশ্চর্য হইয়া গেল। তার ভারি লোভ হইল; সে লোকজন লইয়া রাজাকে মারিয়া ধরিয়া সব ইট নিয়া নৌকায় তুলিল। আরো কি করিল, না, শ্রীবৎসকেও উঠাইয়া নিয়া ধাক্কা দিয়া মধ্য নদীতে ফেলিয়া দিল। রাজা 'হা চিন্তা' 'হা চিন্তা' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ভগবানের কি চক্র—এই নৌকারই এক কোনায় ছিলেন রাণী চিন্তা। তিনি হঠাৎ তাহার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—তবে কি ইনি রাজা শ্রীবৎস! নইলে আমার নাম আর কে জানবে? তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর শিয়রের বালিশটা রাজার সামনে জলে ফেলিয়া দিলেন। রাজা তাই ভর দিয়া যাইতে যাইতে এক মালিনীর কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন, এই মালিনী যে, সে সেইদেশের রাজকন্যার রোজ ফুল যোগায়, মালা গাঁথে। বাগানে ফুল হয় না, গাছপালা সব শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু রাজকন্যা তো আর বুঝেন না। তিনি মালিনীকে রোজ ভাল ভাল ফুলের জন্য তাড়া দেন।

সেদিন সহসা মালিনী দেখে কি,—ঐ যে মরা ছিল গাছপালা—সব নূতন পাতায় নূতন ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, চার দিক গন্ধে আমোদিত! ভ্রমরার রোলে কিছু আর শোনা যায় না। মালিনী ভাবে, 'এর কারণ কি?' খুঁজিয়া দেখে, পাগলের মত মোচ-দাড়িওয়ালা একটা লোক বাগানে বসিয়া আছে।

—'কে জানে হয়ত ওরই আসায় এমন হয়েছে! তাহলে সে লোকটা বড় ভাগ্যবন্ত দেখছি!'

রাজার যত্নের সীমা নাই। মালিনীর সঙ্গে তিনিও এখন ফুল তুলেন, মালা গাঁথেন। মালিনীর মন খুসীতে ভরিয়া যায়; সে রোজ গিয়া সে ফুল, সে মালা রাজকন্যাকে দিয়া আসে। রাজকন্যা ভদ্রা জিজ্ঞাসা করেন, কি মালিনী, তুমি যে বল, তোমার বাগানে ফুল হয় না। তবে এখন এত ফুল আন কোত্থেকে? বাঃ! মালাও যে এখন বেশ গাঁথতে শিখেছ! বাঃ, বাঃ, কি সুন্দর মালা!

মালিনী কোন কথা বলে না, কেবল হাসে। এদিকে শ্রীবৎসের শনির দশা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। একদিন তিনি কি করিলেন, না নিজের অলক্ষেই নিজের নাম মালায় লিখিয়া দিলেন। খুসিতে ভরা ভদ্রার মন। মালিনী এখন নিত্য নূতন ফুল জোগায়, নূতন মালা গাঁথে। সেদিন মালা হাতে লইয়া রাজকন্যার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি গম্ভীর হইয়া গেলেন। মালায় যে শ্রীবৎসের নাম। এ কোন্ শ্রীবৎস?

রাজা শ্রীবৎসকে স্বামিরূপে পাইবার জন্য ভদ্রা ছোটবেলা থেকেই তপস্যা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন মালায় শ্রীবৎসের নাম দেখিয়া তাঁর ভারি সন্দেহ হইল। তিনি মালিনীর কুটিরে আসিবেন কেন? ভদ্রা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হা মালিনী, এ মালা তুমি কোথায় পেলে?'

মালিনী হাসিয়া উত্তর দেয়—'পাব কোথায়? আমি গেঁথেছি।'

'মিথ্যা বলিস নে, এখনি গর্দান নেব!'

মালিনী একটু ভয় পাইয়া গেল; সে আর গোপন করিতে পারিল না, বলিল, 'দেখ আমার কুটীরে এক সাধুপুরুষ এসেছেন, তাঁরি এ মালা গাঁথা।

ভদ্রা আরও গম্ভীর হইয়া গেল!—'তুই আজ যা মালিনী, তোর আর মালা আনতে হবে না।'

রাজকুমারী ভদ্রার স্বয়ংবর সভা। দেশ-বিদেশ হইতে কত জ্ঞানী গুণী আসিয়াছিলেন! মালিনীর মুখে সব কথা শুনিয়া শ্রীবৎসেরও ইচ্ছা হইল, যাইবেন—গেলেন। সোনার কান্তি শরীর তাঁর কালো হইয়া গিয়াছে! কত বৎসর ধরিয়া ক্ষৌরী করেন না, স্নান করেন না! হাতে চিমটা, মাথায় জটা, মুখে মোচ-দাড়ি, গায় ময়লা কাঁথা! তিনি কি করিলেন, না, সভায় না গিয়া রাজবাড়ীর সামনে এক উলির তোপায় গিয়া বসিয়া রহিলেন।

ভদ্রা মালা চন্দন হাতে লইয়া সভায় আসিলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত প্রত্যেক রাজারই পরিচয় দেওয়া হইল, কিন্তু কারো দিকে তাঁর মন গেল না। এমন সময় দৈবাবাণী শুনিলেন কি,—'তুমি যার ধ্যান করছ, সে ঐ তোমার বাড়ীর সামনে উলির তোপে বসে আছে।'

ভদ্রা রাজসভা ছাড়িয়া সেদিকেই গেলেন, গিয়া, যথারীতি মালাচন্দন দিয়া শ্রীবৎসকে পতিত্বে বরণ করিলেন। এদিকে তো সভায় ছি-ছি টি-টি পড়িয়া গেল!—কোথাকার কে একটা পাগল, তার গলায় কিনা মালা-চন্দন! কি অপমান! কি অপমান! আমরা আর এক মুহূর্তও এখানে থাকব না'—এই সব বলিয়া সকলে যার যার রাজ্যে চলিয়া গেল।

বাপ মায় আর কি করিবেন,—এখন মেয়ে যাকে বরণ করিয়াছে! তবে তাঁরাও খুব অপমান বোধ করিলেন। রাজবাড়ীর ধারেই পৃথক্ এক কুটীর বাঁধিয়া দিলেন,—সেখানেই ভদ্রা ও শ্রীবৎস থাকেন। শ্রীবৎসও নিজের পরিচয় দেন না, ভদ্রাও তাঁকে বিরক্ত করেন না।

এদিকে রাজার এক নাতির অন্নারম্ভ। তাঁর সাত ছেলে হরিণ শিকারে যাইবে; শ্রীবৎসও ঠিক করিলেন—যাইবেন।

রাজপুত্রেরা বনে গিয়া সারা বন পই-পই করিয়া খুঁজিল, কিন্তু একটা হরিণও কোথাও দেখিতে পাইল না। সকলের মুখই ভার। ব্যাপার কি? এমন তো কোন দিনই হয় নাই! শেষে তারা দেখে কি—এক সাধু চিমটা

গড়িয়া আগুনের কুণ্ড করিয়া বসিয়া আছেন, আর বনের যত হরিণ তাঁর চার দিকে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। রাজপুত্রেরা তখন সাধুর কাছে গিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সাতটা হরিণ চাহিল—না দিলে চলিবে না।

সাধু বলিলেন, 'হাঁ দিতে পারি, কিন্তু একটা সর্ত আছে—আমি তোমাদের প্রত্যেককে এই চিমটা পুড়িয়ে মার্গে একটা করিয়া দাগ দিব, যদি আপত্তি না থাকে, হরিণ নিতে পার।'

সাত ভাই ভাবিল—'আর দিক না দাগ, কাপড়ের নীচেই তো পড়ে থাকবে,—কে-ই বা দেখবে।' তারা সাধুর প্রস্তাবে রাজি হইল। সাধু তাদের এক এক জনকে চিমটা পুড়িয়া এক একটা দাগ দিলেন, আর হরিণ দিয়া বিদায় করিলেন। এই সাধু আর কেহই নয়—ভদ্রার স্বামী শ্রীবৎস। শালা সম্বন্ধীরা বনে তাকে চিনিতে পারিল না।

অবশেষে শ্রীবৎসও তিনটা হরিণ নিয়া কুটীরে ফিরিলেন, না, সেগুলি রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুত্রেরা আশ্চর্য হইয়া গেল,—তাদের হরিণ আনিতে এত বেগ পাইতে হইল; আর ভদ্রার স্বামী কি না কোথা হইতে কখন তিনটা হরিণ নিয়া আসিল! অনেক কথাবার্তার পর শ্রীবৎস বলিলেন, 'তোমরা যে সাতটা হরিণ এনেছ বলে গর্ব করছো, তাও তো আমারই অনুগ্রহে।' শুনিয়া সাত ভাই একে অপরের মুখের দিকে চায়, মনে মনে বলে,—তবে কি তাদের ভগ্নীপতিই সেই সাধু। আমন্ত্রিতে বাড়ী ভরতি। অপমানের ভয়ে তারা জোরের সহিত বলিল—'না, কারো অনুগ্রহে আমরা হরিণ আনিনি, নিজেরা শিকার করে এনেছি।' শ্রীবৎস হাসিয়া বলেন, 'মার্গের চিহ্নেই তো তার প্রমাণ রয়েছে।' আর যায় কোথায়? চিমটা পোড়া দাগের কথা সকলে জানিয়া লইল। চার দিকে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

মহা ধুমধামে অন্নারম্ভ শেষ হইল। শ্রীবৎসেরও শনির দশা শেষ হইতে আর বেশী বাকি নাই। একদিন তিনি ভদ্রাকে বলিলেন 'দেখ, এভাবে বসে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না। এক কাজ কর—তোমার বাবাকে বলে আমাকে একটা কাজ দাও,—নদী দিয়ে সাধু সদাগরের যত ডিঙ্গা যাবে, আমি সেগুলি পরীক্ষা করে দেখবো, আর মালপত্র আদায় করবো।'

শ্রীবৎস এখন তাই করেন। পাইক প্যাদা লইয়া নদীর ঘাটে থাকেন; যত নৌকা যায়, থামান, থামাইয়া নিজে তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন, দস্তুর মতো

কর-মাশুল আদায় করেন। এইরূপে দিন যায়, রাজার উদ্দেশ্য আর পূর্ণ হয় না। শেষে একদিন সেই সাধুর ডিঙ্গা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। শ্রীবৎস দেখিলেন, এই ডিঙ্গাতেই আছে তাঁর সোনার ইট ও রাণী চিন্তা। সদাগরকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিলেন, নৌকার জিনিসপত্র সব আটক রাখিলেন, সোনার ইট-গুলি কেবল নামাইয়া আনিলেন।

রাজবাড়ীতে খবর গেল,—এক ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। নদীর পাড় লোকে লোকারণ্য। সকলেই জিজ্ঞাসা করে 'ব্যাপার কি?' রাজ-দরবারে শ্রীবৎস সব কথা প্রকাশ করিলেন,—কি করিয়া সদাগর তাহাকে মারিয়া ধরিয়া সোনার ইটগুলি কাড়িয়া লয়, কি করিয়া তাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়,—সব কথা বলিলেন।

সদাগর প্রতিবাদ করে—'না মহারাজ, আমি ওসব কিছুই করিনি, সোনার ইট যা দেখছেন, সবই আমার।'

শ্রীবৎস বলিলেন, 'বাদ-প্রতিবাদের দরকার নাই, ইটগুলি জোড়া আছে, সদাগর যদি জোড় ভাঙতে পারে, তবে ওরই হবে।'

সদাগর তখন এক একটা ইট হাতে লইয়া অনেক চেষ্টা করিল, মাটিতে আছড়াইল, কিন্তু জোড় খুলিতে পারিল না।

এইবার শ্রীবৎসের পালা, তিনি এক একখানা ইট হাতে লন, আর অমনি তা' দুই ভাগ হইয়া যায়। সকলে দেখিয়া অবাক্। আরও অবাক্ হইল,—ইটের গায় 'শ্রীবৎস' নাম লেখা। সকলেরই সন্দেহ হইল—তবে কি ইনিই রাজা শ্রীবৎস?

ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রীবৎসের শনির দশার দশ বৎসর শেষ হইয়াছে। তিনি আর কিছুই গোপন রাখিতে পারিলেন না। সকলেই তাঁর পরিচয় পাইল। শনির কোপে তিনি ও চিন্তা যত কষ্ট পাইয়াছেন। সকলে সব কথা শুনিল। শীঘ্রই নৌকা হইতে চিন্তাকে উঠাইয়া আনিয়া সদাগরকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। চিন্তা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করিয়া তাঁর রূপ-যৌবন আবার ফিরিয়া পাইলেন। ভদ্রার বাপ, মা ও ভাইদের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁরা এতদিন শ্রীবৎসকে চিনিতে না পারিয়া কতই না অযত্নে অবহেলায় রাখিয়াছেন!

শ্রীবৎসেরও সোনার কান্তি শরীর হইল। তিনি ও চিন্তা ও ভদ্রা দুই রাণীকে লইয়া নিজ রাজ্যে রওনা হইলেন। রাজ্যের যত লোক, তাঁহাদিগকে

মহা সমাদরে গ্রহণ করিল, শ্রীবৎস আবার পাত্রমিত্র লইয়া রাজপাটে বসিলেন, ষোড়শ উপচারে শনিদেবের পূজা করিলেন, রাজ্যের শ্রী ফিরিয়া আসিল। দেশে দেশে শনিদেবের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল।

—মৈমনসিংহ (কামিনীকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত) মাসিক বসুমতী ভাদ্র, ১৩৫৬।

মন্তব্য

অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে শনিগ্রহকর্তৃক রাজা শ্রীবৎস ও মহিষী চিন্তার যে নিগ্রহের কাহিনী বর্ণিত আছে, ইহা তাহারই একটি বাঙ্গালী সংস্করণ মাত্র। শনি পাপগ্রহ, ইহার দশায় মানুষ যে কি ভাবে অকারণ নিগ্রহ সহ্য করিয়া থাকে, এই কাহিনীতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। তথাপি ইহার মধ্যেও লোক-কথার কতকগুলি সুন্দর অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হইয়াছে। বাংলার লৌকিক প্রণয়-কাহিনীতে নায়ক-নায়িকার মধ্যে গোপনে প্রেম-সঞ্চার করিবার কার্যে মালিনী চরিত্র সর্বদাই সহায়ক হইয়া থাকে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এই অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়াই রচিত হইয়াছিল। এখানেও শ্রীবৎস ও ভদ্রার মধ্যে প্রণয়-সৃষ্টিতে মালিনীর ভূমিকা সেই সূত্র হইতেই আসিয়াছে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে এখানে প্রেম-সঞ্চার (Falling in Love, T. 10) ইহার একটি অভিপ্রায়। স্বয়ম্বর সভায় শ্রীবৎসের কণ্ঠে মাল্যদানের মধ্যে Unusual Marriage (T. 100) অভিপ্রায়টিও ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর অপহৃতা পত্নীর পুনরুদ্ধার এবং দাম্পত্য জীবনে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠাও ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। কিন্তু সুযোগ এবং ভাগ্য (Chance and Fate) অভিপ্রায়টিই ইহাতে সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে।

১৬

শোকহীনার শোক

(ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষায় সংগৃহীত)

এক বাম্নী হরিপরমেশ্বরের বর্ত করে। ভ্রাতৃপর্তিবদের চুয়া চন্দন রাখে, দ্বিতীয়ার দিন গোডা পাকায়, ফিরা অমাবস্যার দ্বিতীয়ার দিন রাইত্ পুজা দেয়। বর্তের দিন বত্রিশ কাডা দান বানে, বত্রিশটা দৌল্লা বানায়, ছারাইল গুয়া দেয়, বিরা বান্দা পান দেয়, ফানা গুদ্ধা কলা দেয়, দুদের পুক্কুনি দেয়, কাপ্‌রের চান্নি দেয়, গির্তের বাত্তি দেয়, নৈবিদ্য দেয়, জয় জোকারে বাদ্য বাণ্ডে রাইত্ পোয়ায়, বেনে দেবদা বিসর্জন করে।

বাম্নীয়ে এই রকমে বর্ত করে, গোয়ালনী আইয়া কয়, "হৈ কি কর?" "আমি হরি পরমেশ্বরের বর্ত করি।" "এই বর্ত করলে কি অয়?" "নির্দন্যার দন অয়, আপুত্রার পুত্র অয়, যে যে বর্ মাগে, সে সে বর্ পায়।" "তবে আমিঅ এই বর্ত কৈরাম্।" "আমি বাম্‌নের মা'গ, বামনের জি, আমি সে পারি বর্ত কর্তাম্। তুই গোয়াল্যার মা'গ, গোয়াল্যার জি, তুই নি পারবি বর্ত কর্তি?" রাইত্ পোহাইলে রান্দ্‌বি, রাইত পোহাইলে খাইবি, রাইত্ পোহাইলে দৈএর পোসার লৈয়া যাইবি," কয়, "না আমিঅ বর্ত কৈরাম"। রাইত পোহাইল, গোয়াল্‌নী আইয়া কয়, "হৈ আমিঅ বর্ত কৈরাম, তুমি বর্তের কতা কও।'

"আমি কোডা কোডা পান খান খাইছি, বর্তের কতা না কইতাম্ পারছি; কাইল্ আইয়া বর্তের কতা হুনিচ্।" কাইল আইয়া কয়, "হৈ বর্তের কথা কও।" "আইজা দুদের চাচি খান্ খাইছি, বর্তের কতা না কইতাম্ পারছি; কাইল আইয়া বর্তের কতা হুনিচ্।" পরদিন— "লোয়াইতের ক্ষীরা চিরা খাইছি—।" পরদিন—"রুইতের কোলে, মাগুরের জোলে খাইছি······।" পরদিন—"আইডা দুদে চাম্পা কলায় খাইছি···।" "নিত্যাই তুমি ছোচা খাইবা, ডগা খাইবা, বর্তের কতা না কইতা পারবা, আমার ঠাকুর আমারে দেও, তোমার ঠাকুর তুমি নেও।" গোয়ালনীয়ে জয় জোকারে বাদ্য বাণ্ডে ঠাকুর মাতাত্ কৈরা বারীত্ লৈয়া গেল্। জানৌক, না জানৌক, এক অমাবৈস্যার দ্বিতীয়ার দিন গোডা পাকাইল্, আর এক অমাবস্যার দ্বিতীয়ারে বর্ত কল্ল।

মাস বৈরা কতা কৈল্, আচল্ পাত্যা বর লৈল্। বর্তের দিন দুই বোল বত্রিশ কাডা দান বান্‌ল······ছারাইল গুয়া দিল্······কাপরের চান্নি দিল্···জয় জোকারে বাদ্য বাণ্ডে······পর্তিমা বিসর্জ্জন কল্ল।

বর্তের দিন রাইত্ ঠাকুর আইল্ 'পুজা খাইত্অ। বাম্নীর বারীত, গিয়া দেখে, বাম্নী খাইয়া লৈয়া জি পুত্ লৈয়া ফুইয়া রইছে, পর্দিম নিব্যা রইছে। গট্লা কাত্যোয়া রইছে, নৈবিদ্যি থান্ ছিট্যা বিট্যা রইছে।

গোয়াল্যার বারীত্ গিয়া দেখে, গর বৈরা পুজা দিছে, দুপ, পর্দিমের গন্ধে গর আমোদ্ করছে। গোয়াল্যার বারীর পুজা খাইয়া ঠাকুর সন্তুষ্ট অইল্; গোয়াল্যারে বর দিল্, বামনেরে শাপ দিল্।

বাম্নীয়ে দিবা রাত্র কান্দে কাডে। বাম্নের আউরা পাউরা গোদ অইল্ চ'কুঅ কেতুর্ অইল্, আইডা পাতার ছানি অইল্, বেরণের ঠুনি অইল্; দিনে বাত্ কলঙ্কে পানী জুরে না।

বামনীয়ে কান্দে কাডে; গোয়ালনী আইয়া কয়, "হৈ তুমি দিকি কান্দ কাড, আমারঅ কান্তাম্ ইচ্ছা করে।" "আমি কান্দি শোকে দুককে, তুই কান্দবি কিসের দুক্কে?" "আমার কান্তাম ইচ্ছা করে।" "রাজার বেডা মৈরা রৈছে, তার চিতাল্অ কান্দ্ গিয়া। রাজার দান্ খেত্ মৈরা রৈছে, হেইখান্অ পৈরা কান্দ্ গিয়া। রাজার পাট হস্তী মৈরা রৈছে তারে দৈরা কান্দ্ গিয়া।"

ইতান্অ পৈরা এক কুয়া দুই কুয়া তিন কুয়া দিতেঅই সকল জিয়া উট্লো। দান্ খ্যাতে দিব্য ছড়া মেল্ল, আডের লোক লস্কর সব জিয়া উট্লো। রাজার বেডা জিয়া উট্লো। মায় দুয়ারঅ বৈছে। দেখে পুত্ আইয়ে। জয় জোকারে, বাদ্যে, বাণ্ডে, অ্যাগ্যা পুচ্ছ্যা গরুঅ নিল্।

গরুঅ নিয়া কয়, "রাজা মশয়, তুমি ছাশে ছাশে ডেরা দেও, তোমার পুত্ কেবা মাল্ল' কেবা জিয়াইল্অ, তোমার আট্ কেবা বাঙ্ল্অ কেবা বয়াইল্অ......।" রাজা ডেরা দিল্। দুর্গৎ গোয়া'ল্যা গিয়া ডেরাত্ দল্ল। "রাজা মশয়, এক স'য় দুই জানি না। গোয়াল্নী সম্পদের বার হৈত্অ না পাইরা তোমার ইতান্অ পৈরা কান্দছিল। ইতান্ জিয়া উট্ছে।" "কি পুণ্যের ফলে তাই এই বর পাইল্?" "হরিপরমেশ্বরের বর্ত্ত কৈরা।" রাজা সাত দেশ সাত রাজ্য দিয়া গোয়াল্যার ঐশ্বর্য বারাইয়া দিল্। দিন দিন হরিপর্মেশ্বরের বরে রাজার ঐশ্বর্য বারতে যায়, গোয়াল্যার ঐশ্বর্য বারতে যায়। রাজমইষীঅ বর্ত করে, গোয়ালনীঅ বর্ত করে।

বামনে বামনীরে কয়, "লাডিখান্ আর তেনাখান্ দে, আমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেখ্যা আই।"

"বুরা বামন, কৈ পৈরা মর্তা যাইবা।" "এই জীবনের দয়ে মরণ বালা।" চা'রডা চাউল আছে জাল দিয়া দেই, খাইয়া যাও, বাত্ চা'রডা রান্দ্‌লো। বাম্‌নে ছান্ সন্দ্যা পুজা কৈরা বাত চা'রডা খাইল্।...একটু পান খাইল্, এট্‌টু তামুক খাইল্। তার পরে লাভিলা আত্‌অ নৈল্, ছাতিখান্ মাতাত্ দিল্, তেনা খান্ পিঙ্‌অদিল্—বামন পদ্ দিল্। গাডার আগে যাইতে অই গোয়ালনীয়ে কয়, "হৈয়া, কৈ যাও?" "আগে বারাইয়া পাছে গডাইছে তার উপর বদ্ দিয়া মর্তাম্ যাই।" কয়, "নিশোগ্ গোয়ালনীর ল্যাগ্যা শোক খুজ্যা আইয়।" কদ্দুর যায়,—নল বাঙ্গে হাস্ খায়, খাগ বাঙ্গে জল্ খায়।

এক বামনের লগে দেখা অইয়া কয়, "ঠাকুর কৈ যাও? "আগে···যাই।" 'আমারে ক্যান যজমানে আচরে না, জিজ্ঞাস কৈরা আইঅ।" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো। আর কদ্দুর যায়—"নল বাঙ্গে হাস্ খায়, খাগ্ বাঙ্গে জল খায়"—ইন্দ্রের পাচ কন্যার লগে দেখা। "ঠাকুর কৈ যাও?" "আগে···যাই।" 'আম্‌রা কা আতাআতি কান্দাকান্দি কৈরা মরি, বিয়া মুক্তি গডে না?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো।

মু'ষ্যার লগে দেখা অইল্, মুষ্যা কয়, ঠাকুর কৈ যাও?" "আগে বারাইয়া পাছে গডাইছে তার উপর বদ্ দিয়া মর্তাম যাই।" এম্‌নে বেপাইরা, তে'ল্যা, কুমাইরার লগে দেখা অইল্। কয়, "আম্‌রায় কিয়েরে জিনিস বিকি কিনি অয় না?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো।

একৃতে কাডা বন্‌অ পৈরা টে টে করে—কয়, "ঠাকুর কৈ যাও?" আমি কা কাডা বন্‌অ পৈরা টে টে করি?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো।"

এক তাই কাডায়, পুরায়, তুলে জিনাইয়ে গলাত্ দিয়া রৈছে, চুনের টোপা মুখ্‌অ খৈয়া রৈছে, তিম্বের পোতা মাতাত্ লৈয়া রৈছে। কয় "ঠাকুর কৈ যাও।" আমি কা ইতান্ এর্তাম্‌অ পারি না লামাইতাম্‌অ পারিনা?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো।

এক তাইর পাথাল্‌অ পাও রৈছে,—পিরী লাগ্যা রৈছে। তাই দেখ্যা কয়, "ঠাকুর কৈ যাও?" "আগে বারাইয়া পাছে গডাইছে তার উপর বদ্ দিয়া মর্তাম্ যাই।" "আমারে কা সেতেঅ না সামালেঅ না, বনে বনে ফিরি?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো। অমর্ত কল গাছটার লগে দেখা অইয়া কয়, "ঠাকুর কৈ যাও?" "আগে বারাইয়া পাছে গডাইছে তার উপর বদ্ দিয়া

মর্তাম যাই।' "আমার কা ফল মানুষেঅ খায় না, পশু পক্ষীয়েঅ খায় না, গাছ অদরে, বন্‌অ জরে ?" বামনে গিরো বাইন্দ্যা লইলো।

এই রকমে রাজার পাট হস্তীর লগে দেখা, একটা পুষ্করিণির লগে দেখা, একটা গরের লগে দেখা। পাট হস্তীডা কয়, "ঠাকুর, আমারে কা সেভেঅ না সামালেঅ না, বনে বনে ফিরি ?" পুষ্করিণিডা কয়, "ঠাকুর, আমার কা জল মনুষ্যেঅ আচরে না, পশু পক্ষীয়েঅ খায় না ?" গরটা কয়, "ঠাকুর আমার তলে কা ছন্ পাতাঅ দেয় না, মনুষ্যঅ থাকে না ?" বামনে সকল গিরো বাইন্দ্যা লইলো।

যাইতে যাইতে বামন্ গাঙ্গের পারে গেল্। গাঙ্গের মধ্যে একটা কুমুইর বাস্তা রইছে। কুমুইররে কৈল্, "কুমুইর, আমারে পার কৈরা দে।" দুই জন পার করি, এক জন খাই, তোমারে কেম্‌নে পার কৈরাম্।" "ঠাকুরের কাছ থ্যাকা বর্, দন্ মাগ্যা আন্যাম্ জলের তল্ আইবি, মাছঅ খাইবি ; আমারে পার কৈরা দে।" পার কৈরা দিল্ বাম্‌নেরে।

হেই পারঅ যাইতেতই ডাক্ পল্ল, "ছুচিরা আইছে, ডগীরা আইছে।" কেঅ গচা মারে কেঅ ইডা। "দোয়াই ঠাকুরের, আগে বারাইছ, পাছে গডাইছ, তাইর বাইগ্ গোয়ালনীরে দিছ—বর, দন্ দিয়া দণ্ডত দেও, না অইলে তোমার পদের তলে বদ্ দিয়া মৈরাম্।"

দুই দিন দৈরা বামন্ ঠাকুরের মন্দিরের দুয়ার পাতালে পৈরা রৈছে। বামনঅ ওডেনা ঠাকুর্‌অ মন্দিরের কেওয়ার্ মেলে না। ঠা'কুরাণ ঠাকুরেরে কৈল্, "বামন দুয়ার পাতালে পৈরা আছে, তারে বর্, দন্ দিয়া দেও।" তারে আমি কিছু বর্ দন্ দিতাম্ না।' "না দিয়া পারতাঅ না ; তুমি যেমন দেব্‌দা সেঅ ব্রাহ্মণ। তার আস্তা বক্তি না থাকলে তোমার পা'র তলে কেমনে আইছে এই বাগ্ বৈষ্ ঠেল্যা।"

ঠাকুরানের পেচাল হৈত্অ না পাইয়া ঠাকুর মন্দিরের কেওয়ার্ মেল্যা বাইর্ অইল্। দুই পাও চাইপ্যা বামনে দল্‌লো। "দোয়াই ঠাকুরের, আগে বারাইছ, পাছে গডাইছ, তাইর বাইগ গোয়াল্‌নীরে দিছ—বর্, দন দিয়া দেওত দেও, না অইলে তোমার পদের তলে বদ্ দিয়া মৈরাম্।" "তোর বউরে ক' গিয়া" ছোডা ছোডা পান্ খাইত্অ, আউডা দুদের চাচি খাইত, লোয়াইতের ক্ষীরা চিরা খাইত্অ, রুইতের কোলে মাগুরের জোলে খাইত্অ, আউডা দুদে চাম্পা কলায় খাইত্অ।

"যা তোর বউরে ক' গিয়া আগের মত বর্ত কর্ত, তোর আবার ঐশ্বর্য পুত, ঐশ্বর্য দন্ অইব।"

ঠাকুর-ঠাকরাণের নমস্কার কৈরা বামন্ গাওতোলা দিয়া উটলো, কইল্, "ঠাকুর আরঅ তো কত সংবাদ আনছি।"

"কেন বামনেরে যজমানে আছরে না?" "প্রতিপদেরে পুজা দিছে, দ্বিতীয়ারে পুজা না দিছে, হেই অপরাদে এমন অইছে। প্রতিপদেরে পুজা না দিব, বালা বামন্ চাইয়া দান দক্ষিণা করব; তবে পাপ যাইব।

"বারৈয়া, মুগ্ধা, বেপাইরা, গোয়াল্যা, কুমাইরা, তেল্যার কেন পান, ডাল, চাউল, কাপড় লতা, গি, গট, মুছি বিকি অয় না?"

এক পোণের সামিগ্রী ডুনা মুলে বেচ্যা লইছে। হেই অপরাদে এমন অইছে, আইনের সামিগ্রী আইনের বেচ্, বর্তের দিন এই সকল সামিগ্রী যোগাইব। বালা বামন চাইয়া দান দক্ষিণা করব, তবে পাপ যাইব।

"এক তে কিয়েরে কাডা বনঅ পৈরা টে টে করে?"

"কাণা মানুরে কাডা বন্ দেখাইয়া দিছে, বালা পত্ না দেখাইছে। কানা মানুরে বালা পত্ দেখাইয়া দিব, এক যুগ বার বছর বালা বামনের দাস্যতা করব, তবে পাপ যাইব।"

"এক তাই কেন্ তুলে জিনাইয়ে গলাত্ দিয়া রৈছে, চুনের টোপা মুখঅ লৈয়া রৈছে, তিষের পোজা মাতাত্ লৈয়া রৈছে?"

"তাই এক তানে দিয়া আর তানে লৈছে। হেই তুলে জিনাইয়ে গলাত্ দিয়া রৈছে,চুনের টোপা মুখঅ লৈয়া রৈছে। তিষের পোজা মাতত্ লৈয়া রৈছে। যেই তানে আনে হেই তানে দিব। তাই গুরু জনের ঠোডঅ চুণ দেক্যা ডাক্যা না কইছে, চুন দেক্যা ডাক্যা কইব। তাই গুরু জনের মাতাত্ তিষ দেক্যা ডাক্যা কইব। বালা বামনের এক যুগ বার বছর দাস্যতা করব। তবে পাপ যাইব।"

"এক তাইর কিয়রে পাখালের মধ্যে পাও রৈছে,—মধ্যে পিরী রৈছে?"

"তাই আতে আগুন না বেরাইছে পায় আগুন বেরাইছে। আতে আগুন বেরাইব, পায় আগুন না বেরাইব। বালা বামন্ চাইয়া এক যুগ বার বচ্ছর দাস্যতা করব। বর্মারে নমস্কার করব, বর্মারে ক্ষীর দিব। গুরু জন মাডিত্ বৈছে, তাই পিরীত বৈছে, গুরুজন পিরীত বৈব, তাই মাডিত্ বৈব।"

"কপালী গাইডার দুদ্ কিয়েরে ভেকায়অ খায় না। মনুষ্যেঅ খায় না?"

"বর্তের দিন বর্তিরা আইছিল দুদের ল্যাগা ; পাতিল বৈরা দুদ না দিছে, ভেকার ল্যাগা দুদ্ রাখছে। বর্তের দিন পাতিল বৈরা দুদ্ দিব, ভেকার লাগ্যা দুদ্ না রাখব। এক যুগ বার বচর বামনে দুদ্ বোগ করব—তবে পাপ যাইব।"

"অমর্ত ফল গাছটার ফল কেন্ মানুষঅ খায় না, পশু পক্ষীয়েও খায় না, গাছ অদরে, বন্অ জরে ?"

"ক্ষুদাতিয়া বামন্ আইছিল্ ফল খাইতঅ। বাম্‌নেরে ফল না দিছে। বামনের শাপে ফল তিতা অইয়া রইছে। ক্ষুদাত্তিয়া বাম্‌নেরে ফল দিব। গাছের তলে সাত রাজার দন্ আছে, গাও তোলা দিয়া দিব—বাম্‌নে তুল্যা নিব—তবে বালা অইব।"

গরটায় কেন্ মনুষ্যেঅ থাকে না, ছন্ কুজঅ দেয় না ?"

"পুষ্কনিডার জল কেন্ মনুষ্যেঅ আচারে না, পশু পক্ষীয়েঅ খায় না"

"জলঅ হিয়াল্ কুত্তায় লগ্‌গি করছে, মনুষ্যে কুল্‌কুলা করছে। ছাডাইয়া কাডাইয়া বালা বামন্ দেখ্যা দান দক্ষিণা করব, জলের তলে সোনার পাডা পুতা আছে ; বালা বামনেরে তুল্যা দিব, তবে তার পাপ যাইব।"

"রাজার পাট হস্তীরে কেন্ সেতেঅ না সামালেঅ না ; বনে বনে ফিরে ?"

"বর্তিরা ঠাকুর মাতাত্ লৈয়া যাইত্অ লইছিল্। ছোতরার আগে আন্‌ত চাইছে, মার্ত চাইছে, বয়াস্কার দেখাইছে—হেই···অইছে। বর্তিরারে ছোত্‌রার আগে আন্‌ব, নিব, নমস্কার করব। এক যুগ বার বচ্ছর বাম্‌নে চৈর বেরাইবা ,তবে পাপ যাইব।"

"তাইরা হরিপরমেশ্বরের বর্ত কৈরা ঠাকুর বিসর্জন করছে ; গরুয়ে পরাইছে হেই······অইছে। ফিরা বর্ত করব, তুরুই নিয়া ঠাকুর বিসর্জন করব। বালা বামন্ চাইয়া বিয়া বইব—তবে পাপ যাইব।"

এইবার বামন্ ঠাকুর-ঠাক্‌রানেরে নমস্কার কৈয়া গাভার আগে আইল্। আইয়া ফিরা গেল্।

আর্অ দুইখান কতা রইছে, ঠাকুর, নিশোগ্ গোয়াল্‌নীয়ে, শোক চাইছে। কুমুইর তে দুই জন পার করে, এক জন খায়, জলের তলঅ অয়না, মাছঅ খায় না।"

চাল্অ গুজ্যা এরব, সব মূর্চ্ছা খাইয়া থাকব, সৈত্অ না পাল্‌লে জল্অ ফালাইয়া দিব। সকল জিয়া উঠব। কুমুইর তে বর্তের বর্তীর হার ছরা খাইছে, ওগলাইয়া মাজ্যা বালা বামন্ চাইয়া দিব, তবে তার পাপ যাইব।

ঠাকুর-ঠাকরাণের নমস্কার কৈরা আবার গাঙের পারঅ আইল্। "কুমুইর, আমারে পার কর।" "দুই জন পার করি একজন খাই, তোমারে কেমনে পার কৈরাম।" ঠাকুরের কাছতে বর দন্ মাগ্যা আন্ছি, জলের তল্অ অইবি, মাছঅ খাইবি।" কুমুইর পার কৈরা দিল। এই পার্অ আইয়া কয়, "তুই বর্তীর হার ছরা খাইছত্। ওগলাইয়া মাজ্যা বালা বামন্ চাইয়া দিবি, তবে তোর পাপ যাইব।"

"ঠাকুর, তুমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেক্যা আইছ, তোমারতে বেশী পায়াম্ কৈ, তুমিঅই লৈয়া যাও।" হার ছরা ওগ্লাইয়্যা মাজ্যা বাম্নের গলাত্ তুল্যা দিল্। সমুদ্রের কুমুইর্ সমুদ্রে পল্ল, জলের তল্ অইল্, মাছ্অ খাইল। শাপ মুক্ত অইল।

গরটার লগে দেখা অইয়া কয়, "ঠাকুর আমার সম্বাদখান?"

"অমাবস্যার দিন চালের ছন্ খাওয়াইয়া খরকা খাইছে। হেই অপরাদে এমন অইছে। চালের ছন্ চাল্অ থাকব, বালা বামন্ চণ্ডী পরাইব, শিবপুজা করব তবে পাপ যাইব।"

"ঠাকুর, তুমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেক্যা আইছ, তোমারতে বেশী পায়াম কৈ, তুমি চণ্ডী পৈরা, শিবপুজা কৈরা দক্ষিণা লৈয়া যাও।"

ঠাকুর গর্অ চণ্ডী পল্ল, শিবপুজা কল্ল, গর্ শাপ মুক্ত অইল্।

পুকুইরটা বামনেরে দান দক্ষিণা কল্ল, সোনার পাডা পুতা তুল্যা দিল, গাছটা গাও তোলা দিয়া সাত রাজার দন তুল্যা দিল, গাইডা, আতিডা বামুনের লগ্ লইল্, যে তাইর পাথালঅ দাও আছিল্, সেই তাই তুলে জিনাইয়ে গলাত্ লৈয়া আছিল, চুনের টোপা মাতাত লৈয়া আছিল, তাইরা"। ঠাকুর, তুমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেক্যা আইছ, তোমরতে বেশী পায়াম কৈ, তুমিঅই লৈয়া যাও।" এই কথা কৈয়া বাম্নের লগ্ লৈল্।

যেই তে কাডা বন্অ পৈরা টে টে করছিল্ হেই তেঅ বাম্নের লগ্ লৈল্। তেল্যা, মুন্ডা, বেপাইরা বামনেরে দান দক্ষিণা কল্ল। তার পর অইল বামনের লগে দেখা, বাম্নের কৈল্ "তুমি পর্তিবদরে পুজা দিছ, দ্বিতীয়ারে পুজা না দিছ, দ্বিতীয়ারে পুজা দিবা পর্তিবদরে পুজা না দিবা; বালা বামন, চাইয়া দান দক্ষিণা করবা, তবে তোমার পাপ যাইব। বাম্নে কৈল, "ঠাকুর, তুমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেক্যা আইছ, তুমিঅই লৈয়া যাও।" বাম্নেরেই দান দিল, শাপঅ মুক্ত অইয়ে, তার পরে ইন্দ্রের পাচ কন্যার লগে দেখা—"ঠাকুর আমরার

সম্বাদ খান্?" বামনে কৈল "হরিপমেশ্বরের বর্ত কৈরা দুরুই নিয়া ঠাকুর বিসর্জন না করছ, কাছে ঠাকুর বিসর্জন করছ, গরুয়ে পারাইছে, মাইনষে পারাইছে—দুরুই নিয়া ঠাকুর বিসর্জন করবা, বালা বামন চাইয়া বিয়া বৈবা, তবে পাপ যাইব। "ঠাকুর, তোমারতে বালা পায়াম কৈ, তুমি ঠাকুরের পাদপদ্ম দেক্যা আইছ, তুমি অই লৈয়া যাও।" বামনের লগ লৈল।

বামনে ইন্দ্রের পাচ কন্যা বিয়া কৈরা, দাস দাসী লৈয়া, দেশ দোল কুম্‌তলি কৈরা, গণ্ডা বাজাইয়া, রাজার পাট হস্তী চৈরা সাত দেশ সাত রাজ্য লৈয়া পত্ দিল।

যাইতে যাইতে গাডার আগে গেল্। গোয়ালনীয়ে দান্ গাডে, দেখে বাম্‌ন আইয়ে, "হৈ গো, হৈয়া আইয়ে।" "তরে দেবদায় রং দিছে, রং কর্। বামন্ এক স্থখ বারঅ বছর দৈরা নিরুদ্দেশ—বাগে খাইছে না বৈষে খাইছে, তার খোজ নাই—আইজ কৈ থাক্যা বামন্ আইয়ে।" "আগো হাচৈ হৈ, বাইর অইয়া দেখ্, বামন আইয়ে।"

গোয়ালনীর পেচালে বাইরে আইয়া দেখে হাচৈ বামন্ আইয়ে। জয় জোকারে বাম্‌নেরে আন্‌ত গেল্। "ছুচি, ডগী, তর্ ছোচামি, তর্ ডগামি—আমি কত কৈরা ঠাকুরের কাছ থাক্যা বর, দন্ খুজ্যা আন্‌ছি, তুই আমার বাইর্ অ।" "যে অপরাদ্ করছি করছি, ঠাকুরের পদের তলে রইচি—আগ্যা পুচ্ছ্যা গর্অ নিল্।

অলক্ষ্মী দূর অইল্, লক্ষ্মী আইয়া গর্ লৈল্।
হাত পুত তের নাতি
রাইত্ পোয়াইলে হেই অতি
আনন্ ছাইড়া কানন নাই,
বালা ছাইড়া বুরা নাই।

বাম্‌নের ঐশ্বর্য বাল্‌ল। স্থন পাতিলে, চুন পাতিলে দিন যায় না। গোয়ালনী আইয়া কয়, "হৈরা অ আমার শোগ্ খান্?"

আট আঙ্গুল, আট আঙ্গুল, ষোল আঙ্গুল চন্দন কাষ্ঠ চাল্অ গুজ্যা এর। তাই বারীত্ আইল্, আইয়া আট আঙ্গুল আট আঙ্গুল, ষোল আঙ্গুল, চন্দন কাষ্ঠ চাল্অ গুজ্যা এল্‌ল, আতি আল্অ আতি মল্‌ল, গোরা আল্অ গোরা মল্‌ল, হাত্ পুত্ তের নাতি হগ্‌গল্ বদ্ অইল্। হগল্অই দেখে মরা, একৃঅ না দেখে জিয়াতা। সাত দিন সাত রাইত, দৈরা কান্দ্‌তে

কান্দ্‌তে মাতায়অ দেয় না, কপালেঅ দেয় না। বাম্‌নের বারীতে্‌ অইয়া বাম্‌নের পাও পৈরা কইল্‌, "তুমি কি কৈরা আমার ইতান্‌ মাইরা এরছ আমার ত আর মাতায় দেয় না, আমার ইতান্‌ জিয়াইয়া দেও। না অইলে আমি রাজার দুয়ারঅ পৈরা দোয়াই দেই। তুমি আমার কাছে শোগ্‌ চাইছ, শোগ্‌ আন্যা দিছি। তাই গিয়া রাজার কাছে পৈরা দোয়াই দিল্‌—"বাম্‌নে কি কৈরা আমার ইতান্‌ মাইরা এরছে জিয়ায়অ না, আমার কান্দ্‌তে কান্দ্‌তে কানে কপালে অ দেয় না।" রাজা বুজল, বুজ্যা বাম্‌নেরে ডাক্যা আন্‌ল, "দুর্গৎ গোয়াল্যার মাগের কেচ্‌ কেচি হোন্‌অ কিয়েরে, ইতান্‌ কা জিয়াইয়া দেও না।" "রাজা মশয়, কাডঅ, মারঅ, এক স'য় দুই জানি না। আমি অপার দুক্‌কে ঠাকুরের কাছে যাইতাম্‌ লইছি, আমার কাছে শোগ্‌ চাইছে, শোগ্‌ আন্যা দিছি। বালা কেম্‌নে দেম্‌। "শোগ্‌ যেমন আন্‌ছ বালাঅ আন্‌ছ আছে, জিয়াইয়া দেও না।" "সৈত্‌অ না পাল্‌লে আট আঙুল, আট আঙুল ষোল আঙুল চন্দন কাষ্ঠ জলঅ ফালাইয়া দেউক্‌, হগ্‌গল্‌ জিয়া উড্‌ব।" বারীত আইয়া জল্‌অ ফালাইয়া দিল্‌। তাইর আতি আল্‌অ আতি অইল্‌, গোরা আল্‌অ গোরা অইল্‌, সাত পুত্‌তের নাতি অইল্‌, হগ্‌গল্‌ জিয়া উট্‌ল, জিয়াইয়া তাই বাম্‌নের পাও পল্‌ল, "মাগ্‌গো মা, ঠাঁকুরঅই বাপ্‌ ঠাকুরানঅই মা, ঠাকুরে লোকেরে কত রঙ্গ দেখাইল্‌।"

"হৈ গো, লও গো আমরা চার জন রত্‌অ উট্যা স্বর্গ যাই।" তারা চাইর জন রত্‌অ উট্যা স্বর্গ গেল্‌। ঠাকুর ইন্দ্রের রত্‌ নেত্তের কাওরাল স্বর্গ থাক্যা পাডাইয়া দিল্‌। বাম্‌না, বাম্‌নী, গোয়াল্যা, গোয়াল্‌নী, রত্‌অ উট্যা স্বর্গ গেল, পুতে, বউয়ে, নাতিয়ে যুগে যুগে পরমেশ্বরের সেবা কল্‌ল।

—ত্রিপুরা (গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য কর্তৃক ১৩১৮ সালে সংগৃহীত, 'প্রতিভা', মাঘ, ১৩১৮)

মন্তব্য

ইহার প্রধান অভিপ্রায় অপূর্ব অভিলাষ; শোকহীনা গোয়ালিনী দেবতার নিকট হইতে শোক পাইবার জন্ত বর চাহিয়া আনিতে বলিল। পরে তাহা সহ্ করিতে না পারিয়া তাহা হইতে মুক্তি চাহিল।

সঙ্কট ত্রাণ

এক ধনী সওদাগর; তার সন্তান হয় না। পরে সঙ্কট-তরানীর ব্রত করিয়া সওদাগরের স্ত্রী একটি মেয়ে প্রসব করিল। মেয়ে হওয়ার পরই সওদাগর বাণিজ্যে গেল। বাণিজ্যে গেলে বার বৎসর আর দেশে ফিরিতে নাই। এই বার বৎসর মেয়ে আবিয়াতা রহিল। সওদাগর বার বৎসর পর দেশে আসিল। মা মেয়েকে বলিল, "তুঈ কারৎ উঠ্যা থাক, অতবড় মাইয়া আবিয়াতা দেখ্‌লে রাগ্‌ অইব,"। মেয়ে তাহাই করিল।

সওদাগর খাইতে বসিয়াছে। মিটু মিটু করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। সওদাগরের সঙ্গে সওদাগর-পত্নী কেবল কথাই বলিতেছে, আলোটি প্রায় নিব নিব হইয়াছে। তখন মেয়েটি কার হইতে এক টুকরা লাকড়ি দিয়া প্রদীপের শলিতাটি বাড়াইয়া দিল। সওদাগর মাত্র মেয়ের হাতটি দেখিয়া চমকাইয়া উঠিল, পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল "এ কে?" প্রথমটা পত্নী চাপিয়া গেল। সওদাগরের মনে নানা সন্দেহ হইল, সওদাগর রাগিয়া উঠিল। সওদাগরের রাগ দেখিয়া পত্নী অবশেষে সকল কথা খুলিয়া বলিল, কন্যাটিও 'কার' হইতে নামিয়া আসিল।

সওদাগর এত বড় মেয়ে দেখিয়া বলিল, "কি, আমার মাইয়া অত বড় অইয়া রইছে! কাল সকালে প্রথম যার মুখ দেখি, তার কাছেই এই মাইয়া বিয়া দিমু।" এই অস্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা শুনিয়া সওদাগরপত্নী ও সওদাগর-কন্যা উভয়েই অন্তরের সহিত সঙ্কট-তরানীকে ডাকিতে লাগিল। এই বার বৎসর কিন্তু সঙ্কট-তরানীর কথা কাহারও মনে ছিল না। বিপদে পড়িয়া সমস্ত দেবভক্তি আজ জীবন্ত ও সজাগ হইয়া উঠিল। দুইজনেই প্রাণের সমস্ত একাগ্রতা দিয়া দেবীকে ডাকিতে লাগিল ও তাঁহার ব্রত করিল।

আর এক দেশের এক সওদাগর-পুত্র হরিণ-শিকারে এই সওদাগরের দেশে আসিয়াছিলেন। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সওদাগর-পুত্র সমস্ত লোকজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও দিশাহারা হইয়া মাত্র দুইজন লোক সঙ্গে রাত্রে সওদাগরের বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। তাহার বৈঠকখানায় আসিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল, গোলমাল শুনিয়া সওদাগরের পত্নী

একজন দাসী পাঠাইয়া দিলেন। দাসী সকল কথা শুনিয়া আসিয়া সওদাগরের স্ত্রীর নিকট বলিল।

সওদাগর-পত্নী শুনিল, ভোর না হইতেই সওদাগর-পুত্র নিজদেশে চলিয়া যাইবেন; তখন তিনি দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ইহাতে তাহাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তিনি যত সকালেই যান, অবশ্য বাড়ীর কর্তার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইবেন।

তখনও ভোর হয় নাই। কাকগুলি তখনও ডাকিতে আরম্ভ করে নাই, মাত্র বিবিধ পক্ষীর মধুর কলরব গ্রামান্তের বৃক্ষ-কুঞ্জ হইতে আকাশে ভাসিয়া আসিয়া সুপ্ত নরনারীর ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেছে। সওদাগর-পুত্র আসিয়া বাড়ির কর্তা সওদাগরকে ডাকিতে লাগিল। বাহিরে আসিয়া প্রথমেই কর্তা এক সওদাগর-পুত্রের মুখ দেখিলেন; তখন সওদাগর তাহাকে বলিলেন, "তুমি এখন যাইতে পারিবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।"

সকাল হইল। সওদাগর হাত মুখ ধুইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন এবং সওদাগর-পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা বলিলেন। সওদাগর-পুত্র ত শুনিয়া অবাক্। যাহা হউক, তাহাকে বাধ্য হইয়া সেই দিনই সওদাগরের কন্যাকে বিবাহ করিতে হইল। প্রথম প্রথম আগন্তুক একটু আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু তাহার আপত্তি শুনে কে? সওদাগর-পুত্র বলিয়াছিল, "আমার ত মা-বাপ আছে, তাহাদের অনুমতি ছাড়া ও তাহাদিগকে না জা·াইয়া আমি কিরূপে বিবাহ করি; কিন্তু কতকটা সকলের অনুরোধে ও কতকটা কন্যার সৌন্দর্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরে বিবাহ করিতে সম্মত হইল।

আজ রবিবার। বাসর-শয্যা, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে; তাই আর সঙ্কট-তরানীর কথা কাহারও মনে নাই। আজ তাঁহার ব্রত হয় নাই। তখন দেবী সঙ্কট-তরানী ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া মেয়েটির দুই গালে বেশ করিয়া দুইটি চপেটাঘাত করিলেন এবং ব্রত করে নাই বলিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন।

কন্যা তখনই শয্যা হইতে উঠিল, কুলার মাথায় "নিছুনী পিছুনী"র গুড়ি লইয়া তিনটি ছোট্ট পিঠা করিল, পিঠা তিনটি প্রদীপের শীষে সেকিয়া লইল এবং দূর্বার আগায় জল দিয়া দেবীর পূজা করিল। এ সমস্ত জিনিষ বাসর ঘরে বিবাহের কুলায়ই ছিল; সুতরাং ব্রত করিতে মেয়েটির কোন কষ্টই হইল না।

সওদাগর-পুত্র মাত্র শুইয়াছিল, তখনও ঘুমায় নাই। সে এই সব কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এই সব কি করলা?" প্রশ্ন শুনিয়া কন্যা স্তম্ভিত হইল, কিরূপে সে বরের সঙ্গে কথা বলিবে! আবার সঙ্কট-তরানীকে ডাকিতে লাগিল। দেবী আদেশ করিলেন, "কোন লজ্জা নাই, তুই সকল কথা ক।" দেবীর আদেশ পাইয়া বরকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। সওদাগর-পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "এই ব্রত করলে কি অয়?" কন্যা বলিল, "নির্ধন্যার ধন অয়, অপুত্রার পুত্র অয়, অন্ধলের চক্ষু অয়, আরাইল ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোড়া লয়।"

আচ্ছা বুঝ্যাম, তুমি কেমন বর্তের বর্তিনী, আমি আইছি ঘোড়ায় যদি যাইতে পারি লায়।"

কন্যা আবার একাগ্রচিত্তে সঙ্কট-তরানীকে ডাকিতে লাগিল। ভোর হইলে সওদাগর-পুত্র গিয়া কামার দোকানে বসিল। অমনি মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। দুপুর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল। পাক-সাক হইল, পাত্ত হইল, সকলের ডাক পড়িল, জামাইর ডাক পড়িল। কোথায়? জামাই বাড়ীতে নাই। তখন কন্যা দাসীকে বলিল, "কামার দোকানে খোঁজ কর।" দীঘি হইতে একখান নৌকা তোলা হইল এবং এই নৌকায় জামাই কামার দোকান হইতে বাড়ী আসিল।

বর ও কন্যা নৌকা সাজাইয়া বিবাহের প্রচুর যৌতুক লইয়া দেশে যাত্রা করিল। মাত্র একজন দাসী কন্যার সঙ্গে গেল। সাতদিন সাত রাত্র নৌকা বাহিয়া সওদাগর-পুত্র বাড়ীর নিকট একটা বড় নদীতে আসিয়া পড়িল। এই নদীর পারেই সওদাগর-পুত্রের বাড়ী। নদীতে পড়িয়াই সওদাগর-পুত্র দাসীকে বলিল, "দেখ, সমস্ত অলঙ্কার খুল্যা দিতে কও, এই নদীতে ডাকাইতের ভয়।" তদনুসারে কন্যা গায়ের সমস্ত গহনাপত্র খুলিয়া দিল। সওদাগর-পুত্র অলঙ্কারগুলি ও বিবাহের শাড়ীটি একটি পানের বাটায় আটকাইয়া নদীতে ফেলিয়া দিল। কন্যা এই বিপদে আবার সঙ্কট-তরানীকে মনে করিল ও যাহাতে গহনাপত্রগুলি রক্ষা পায়, তার জন্য দেবীর চরণে প্রাণের আকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল।

কিছুকাল পরেই সওদাগর পুত্রের নৌকা ঘাটে লাগিল। লোকে মেয়ে দেখিয়া কানাকানি করিতে লাগিল, "ওমা! এ কেমন মাইয়া! গায় একখানা গয়না নাই, পরনে একখান শাড়ী নাই। সওদাগরের পোলা এ কেমন মাইয়া বিয়া কৈরা আনল।"

বাড়ীর লোকেরা নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সওদাগর পুত্র কোনই উত্তর দিল না। তাহারা সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া বলিতে লাগিল, "এইটা কার মাইয়া না কার মাইয়া জানি পোলাটা বিয়া কইরা আনল!"

মেয়ের পাকস্পর্শ হইবে। বহু লোক-জনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। বাড়ীর কর্তা পুকুরে জাল ফেলাইলেন। একটা পুঁটিও জালে উঠিল না। তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। নূতন বৌ দাসীকে দিয়া শ্বশুরের নিকট বলিয়া পাঠাইল, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা যে বড় গাঙ্গ দিয়া আইছি, হেই গাঙ্গে জাল ফেলান, বড় মাছ উঠব।" সংবাদ পাইয়া বৌ মনে মনে সঙ্কট-তারিণীকে ডাকিতে লাগিল। সওদাগর অবিলম্বে নদীতে জাল ফেলিবার বন্দোবস্ত করিলেন। একটা প্রকাণ্ড বোয়াল মাছ উঠিল। সওদাগরের আর আনন্দ ধরে না! কিন্তু কি সর্বনাশ! মাছ যে কাটা যায় না! দা, কুড়ালি কিছুই মাছের গায়ে বসে না। নূতন বৌ বলিয়া পাঠাইল, "মাছটা পিছদুয়ারে পাঠাইয়া দেন, আমি কাটমু।" মাছ আসিল। বৌ বলিল, "একটা মশৈর টাঙ্গাইয়া দাও। আমি মশৈরের তলে মাছ কাটমু।"

বৌর কথা মত মশারি খাটান হইল। বৌ সঙ্কট-তরাণী দেবীকে স্মরণ করিয়া মাছ কাটিতে গেল। মাছের গলা কাটা মাত্রই পেট হইতে অলঙ্কার ও শাড়ীর পেটিকা বাহির হইয়া পড়িল। মাছ কাটা শেষ হইলে দাসী জল আনিয়া দিল। বৌ হাত পা ধুইয়া অলঙ্কার ও শাড়ী পরিয়া মশারির মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলের মনেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগিয়া উঠিল।

বৌ স্বয়ং রান্না করিল; কিন্তু এই সকল আলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া নিমন্ত্রিত সকলেই স্থির করিল, কেহই এই বৌর হাতের রাঁধা খাইবে না। যে এই অমানুষিক কাণ্ড করিতে পারে, সে মানুষ নয়, নিশ্চয়ই ভূত বা পিশাচ। ভূতের রাঁধা কে খাইবে? ফলে তাহাই হইল। সময় মত রান্না হইলে বাড়ীর কর্তা সকলকে ডাকিলেন, নানা প্রতিবন্ধক দেখাইয়া কেহই আসিল না। কেহ বলিল, "আমার পেটের অসুখ।" কেহ বলিল "আমার জ্বর।" কেহ বলিল "নিমন্ত্রণ খাইলে আমার সয় না।"

এবার বৌ প্রাণের সমস্ত ভক্তি ও সমস্ত একাগ্রতা একত্র করিয়া আকুল ভাবে সঙ্কট-তরাণী দেবীকে ডাকিতে লাগিল, "মা, আমার এই কলঙ্ক দূর কর।"

আর কি রক্ষা আছে! সঙ্কট-তরাণী দেবী রাত্রে সকলকে বিছানায় যাইয়া চড়াইতে লাগিলেন ও নির্বংশ হওয়ার ভয় দেখাইলেন। সকলে তৎক্ষণাৎ খাইতে আসিল। কর্তা বলিলেন, "ভাত তরকারি সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর ভদ্রলোককে খাওয়ান যায় না।" সকলে কিন্তু জেদ করিতে লাগিল, আমরা এখনই খাইব। নূতন বৌ পরিবেশন করিবে! ভদ্রলোকের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কর্তা বৌকে বলিলেন, "মা, তুমি বলিলে সকলকেই বসিতে বলি।" বৌ বলিল, "সকলকেই বসাইয়া দেন, চিন্তা করিবেন না। ভাত তরকারি সমস্তই গরম আছে।" কি আশ্চর্য! সকলে খাইতে বসিয়া দেখিল, সমস্ত জিনিসই গরম রহিয়াছে—যেন এখনই রান্না হইয়াছে। খাইয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "এমন রাঁধা আমরা জীবনে আর খাই নাই।"

নূতন বৌর একটি ছেলে হইয়াছে। সওদাগর একটা প্রকাণ্ড দীঘি কাটাইয়াছিল; কিন্তু দীঘির জল উঠে না। পাড়ে পাড়ে ফল ফুলের সুন্দর বাগান, সুন্দর সুন্দর ঘাটলা; কিন্তু দীঘির তল ধু ধু করিতেছে, জল নাই! সওদাগর কিছুই স্থির করিতে পারে না! এক দিন পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, আমার বংশে এ যে একটা ভয়ঙ্কর কুকীর্তি রহিয়া গেল!" পুত্র বলিল, "আপনার বৌকে জিজ্ঞাসা করুন।" বৌ বলিল, "আপনি একদিন ছান কৈরা দীঘির পারে 'হর্ত্যা' দেন, যা শোনেন, আমারে কৈবেন।" শ্বশুর তাহাই করিল। সাত দিন পরে গঙ্গার আদেশ হইল, "তোর নাতি কাট্যা দিলে দীঘিত্ জল উঠ্ব।"

আদেশ শুনিয়া সওদাগরের প্রাণ শুকাইয়া গেল। যে আশাটুকু ছিল, তাহাও শেষ হইল। বৃদ্ধ খাওয়া-দাওয়া পরিত্যাগ করিল। নিদ্রাদেবীও বৃদ্ধকে তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিলেন। অনেক পিড়াপিড়িতে বৃদ্ধ পুত্রের নিকট গঙ্গার আদেশ-বাণী ব্যক্ত করিল। বৌ কিন্তু কিছুই জানিল না।

দীঘি প্রতিষ্ঠা হইবে। দেশ-বিদেশের পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। যে দীঘিতে এতকাল জল উঠে না, কি সাহসে সওদাগর সেই দীঘির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, কি জানি একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিবে ইহা মনে করিয়া বহু লোক আসিল—নিমন্ত্রিত আসিল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে—যাহাদের ঠেকা ছিল, তাহারাও আসিল। আর বহু অনিমন্ত্রিতও আসিল—দেখিতে।

বৌ ত রান্নাঘরে রাঁধার কাজে ব্যস্ত। বহুলোক খাইবে। ছেলের কথা বৌর আর মনে নাই। ছেলে খুড়িয়া খুড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রতিষ্ঠার দেবকার্য হইয়া গেল। সওদাগরের পুত্র সকলের অলক্ষ্যে আপন ছেলেটিকে

দীঘির মধ্যে লইয়া গিয়া কাটিয়া দিল। কাটা মাত্রই দীঘির তল হইতে হু হু শব্দে জল উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত মধ্যে কানায় কানায় দীঘি ভরিয়া গেল। সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। এত দিনে সওদাগরের কলঙ্ক ঘুচিল, পাপ দূর হইল, পরকালের স্বর্গ-পথ সুগম হইল।

ছেলেটিকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মায়ের সন্দেহ হইল। ছেলের মা বলিল, "আমি নূতন দীঘিতে গিয়া গা ধুইমু। লোক জনের খাওয়া দাওয়া চুইকা গেছে, গা ধুইয়া আমি একটু শুইয়া থাকমু।"

শ্বশুর প্রথমে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিল—কত দেশের কত লোক আসিয়াছে—কোণের বৌ কেমন করিয়া বাহিরের দীঘিতে স্নান করিবে? পুত্র কিন্তু বাধা দিল না। ছেলের মা দীঘিতে নামিয়া সাঁতার দিয়া গিয়া ডুবের বাঁশ ধরিল। বাঁশ ধরা মাত্রই সঙ্কট-তরাণী তাহার দুই গালে দুই চর দিয়া বলিল 'পোলা কাট্যা দিছে সকালে, আমি এত্থন কোল্‌খ লইয়া বৈয়া রইছি—তোর এত্‌খনে পোলার পোজ অইছে?" বলিয়া ছেলেটি মায়ের কোলে দিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। ছেলে কোলে লইয়া যখন সওদাগর-বধূ দীঘির পাড়ে উঠিল, তখন এক মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সওদাগর বাদ্যে-ভাণ্ডে বৌকে ঘরে আনিলেন—নাতি ফিরিয়া পাইয়া সওদাগর বিশেষ আনন্দিত হইল। কলঙ্ক ঘুচিল, শোক গেল, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে যেন নূতন জীবন পাইতে লাগিল।

অনেক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাগানের গাছগুলি বড় হইয়াছে। অসংখ্য ফলের গাছ—তাজা, নবীন, সবুজ, সুন্দর। কিন্তু একটা গাছেও ফুল ফোটে না, ফল ধরে না। লোকে সওদাগরের নাম লয় না। যার গাছে ফল ধরে না, তার নাম লইলে অমঙ্গল হয়। সওদাগরের আবার একটা নূতন দুঃখের সূচনা হইল। কত কষ্টে, কত সাহস করিয়া এক কলঙ্ক দূর হইয়াছে! সে কথা মনে হইলে এখনও তার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে—প্রাণের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহিয়া যায়।

সওদাগর আবার 'হত্যা' দিল। সাত দিন পরে আবার আদেশ হইল—"তোমার নাতি বাগানত কাট্যা দেও, বাগান ফলন্ত অইব।"

সওদাগর আবার দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণ পাঠাইল। এবার পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী লোক হইল। সওদাগরের সমস্ত ব্যাপারই অলৌকিক। এবার না জানি আর একটা কি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে!

ব্যাপারের দিন আসিল। বৌ রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। দীঘির পারে যজ্ঞ হইতেছে। দেবকার্য শেষ হইলে পর সওদাগরের পুত্র এবারও অলক্ষ্যে আপন

ছেলেটিকে আনিয়া বাগানে গাছের আড়ালে কাটিয়া দিল। কাটিয়া দেওয়া মাত্র ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল—ফলের গাছ মুকুলের ভারে নুইয়া পড়িল। ভ্রমর গুন্‌ গুন্‌ করিতে লাগিল, পক্ষীকুল কলস্বরে বৃক্ষকুঞ্জ মুখর করিয়া তুলিল। গাছে গাছে, ফুলে ফুলে যেন একটা নূতন জীবনের সঞ্চার হইল। সৌন্দর্য-গৌরবে রস-সম্পদে, গন্ধ-সম্ভারে, ছন্দ-গুঞ্জনে উদ্যানভূমি সচেতন হইয়া উঠিল।

লোকজনেও খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, লোকের গঞ্জনাও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। তখন অবসর হইয়া ছেলের মা খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলে ত কোথাও নাই! এঘর ওঘর, এবাড়ী সেবাড়ী, এপথ-ওপথ, গাছের ঝোপ, বাঁশের ঝোপ তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ হইল, ছেলে মিলিল না। মায়ের মনে আবার সন্দেহ আসিল। এবার কাহাকেও না বলিয়া সওদাগরের পুত্রবধূ ফুল বাগানে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবা মাত্রই একটি সুন্দর গোলাপ-কুঞ্জে ছায়া-শীতল অন্তরালে পুত্র কোলে দেবীকে দেখিতে পাইল। দেবী দুই গালে দুই চড় দিয়া মায়ের কোলে ছেলে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "দুই বার দুই বার পোলা বাঁচাইলাম আর বাঁচাইমু না।"

মাতা দেবীর পায়ে পড়িয়া অশ্রুজলে মায়ের চরণ দুটি ধুইয়া দিল। একটিও কথা বলিল না। দেবী আশীর্বাদ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সওদাগর-পুত্র দেখিল সঙ্কট-তরানীর বরে সত্য সত্যই "অপুত্রার পুত্র হয়, আরাইল ধন ঘর লয়, কাটা মাথা জোড়া লয়।" তখন হইতে সঙ্কট-তরানী দেবীর প্রতি তাহার হৃদয়ের ভক্তিস্রোত অবাধবেগে ছুটিয়া বাহির হইল এবং তখন হইতেই পৃথিবীতে সঙ্কট-তরানীর ব্রতের প্রচার হইল।

—ত্রিপুরা(গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য ১৩২১ সালে সংগৃহীত—প্রতিভা,আশ্বিন-কার্তিক,১৩২১)

মন্তব্য

ইহার মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ দেখিব, তাহার নিকটই কন্যা সম্প্রদান করিব; দ্বিতীয়তঃ হৃত ধন-রত্ন মৎস্যের উদর হইতে উদ্ধার (N 211.1); তারপর পুকুরে জলের উৎস সন্ধান করিবার জন্য নরবলি এবং সর্বশেষে বৃক্ষের ফল এবং ফুল-শূন্যতা দূর করিবার জন্য নরবলি।

উদ্ধার চণ্ডী

এক ছিল গৃহস্থ। গৃহস্থ অবিবাহিত যুবক। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। মায়ের সকল আদেশ অম্লান চিত্তে পালন করিলেও, বিবাহের প্রস্তাবে সে কিছুতেই কর্ণপাত করিত না। আর কোন অভাব না থাকিলেও. শুধু পুত্রবধূর চাঁদমুখ দর্শনে বঞ্চিত বলিয়া মায়ের প্রাণে শান্তি ছিল না।

গৃহস্থের দেবদ্বিজে অচলা ভক্তিপরায়ণতা, অতিথি সৎকারে যত্নশীলতা, পরোপকারে পরমোৎসাহশীলতা ইত্যাদি সদ্‌গুণে সকলেই তাহাকে বিশ্বাস করিত, সকলেই তাহাকে মানিয়া চলিত। অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহার পরামর্শ ছাড়া কোন কাজই করিত না।

যুবক গৃহস্থ পরম সাধু, কালে হয়ত সে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবে, তাই বুঝি তাহার বিবাহে মন নাই ; এইরূপ জল্পনা কল্পনা দশ জনে করিত ; ইহা শুনিয়া মায়ের মন আরও অস্থির হইত। পুত্রের সান্ত্বনা বাক্যে বৃদ্ধা মাতা কিছুতেই প্রবোধ মানিত না।

চিরদিন কাহারও সমান যায় না। সাধুগণও সময়ের ফেরে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকেন। কয়েক বৎসর অজন্মার দরুণ প্রায় সকলেই এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িল যে, রাজকর, এমন কি, পরিবারের ভরণ-পোষণের সংস্থান করাও অনেকেরই সাধ্যাতীত হইল। খাজনা অনাদায় হেতু রাজকর্ম্মচারিগণের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত, ক্ষুধায় কাতর স্ত্রীপুত্রাদির বিষাদ-কালিমা-লিপ্ত বদনমণ্ডল দর্শনে ব্যথিতচিত্ত প্রজাবৃন্দ দিশাহারা হইয়া পড়িল। সদ্‌যুক্তির নিমিত্ত সাধু গৃহস্থের নিকট সকলেই যাতায়াত করিতে লাগিল। এ খবর সত্বরই প্রধান রাজকর্মচারীর কর্ণগোচর হইল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, যুবকের পরামর্শেই প্রজাগণ খাজনা বন্ধ করিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ও কোনও কুটিল লোকের কুমন্ত্রণায় রাজপ্রতিনিধি তাহাকে বিদ্রোহী এবং আরও এক গর্হিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। সহসা একদিন বন্ধনাবস্থায় সে রাজবাটীতে নীত হইল। বিচারে তাহার শূল-দণ্ডাদেশ

হইল। কু-লোকের কূট চক্রান্তজালে পড়িয়া পরার্থপর সাধু গৃহস্থ প্রাণ হারাইতে বসিল। তাহার মুক্তির নিমিত্ত প্রজাবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টা যত্ন নিষ্ফল হইল। তাহারা মনে করিল,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৃহস্থের বৃদ্ধা জননী কাঁদিয়া আকুল হইল।

যথাসময়ে গৃহস্থ বধ্যভূমিতে নীত হইল। শূলে দিবার পূর্বে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, তাহার কোন কিছু দেখিবার. শুনিবার কিংবা খাইবার ইচ্ছা আছে কিনা। উত্তরে সে বলিল যে, কচি শিশুর সরল হাসিমাখা সুন্দর মুখ এবং গো-বৎসের লম্ফ প্রদান পূর্বক ক্রীড়া দেখিবার বাসনা তাহার বলবতী। অমনি তাহাকে সশস্ত্র প্রহরিগণের সঙ্গে তাহার অভিলাষ পূরণার্থ পাঠান হইল। এক বাটীতে উপস্থিত হইয়া হুলুধ্বনি শ্রবণে যুবক জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তথায় উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত হইতেছে। এই ব্রতে কি ফল লাভ হয়, এই প্রশ্ন করায় ব্রতিনী কহিলেন যে, বিপদ কালে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কাতরভাবে মা চণ্ডীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে ও ব্রত মানস করিলে বিপন্মুক্ত হওয়া যায়। তখনই সাধু গৃহস্থ তাহার নিকট ব্রতের নিয়ম প্রণালী জানিয়া লইল ও ভক্তিপূত মনে মানস করিল যে, যদি সে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে প্রতি বৎসর যথা নিয়মে তাহার মাতাকে দিয়া সে উদ্ধার চণ্ডী ব্রত করাইবে।

প্রহরী বেষ্টিত গৃহস্থ উক্ত বাড়ী হইতে অপসারিত হইতে না হইতেই খবর আসিল যে, তখনই তাহাকে রাজ-সমীপে যাইতে হইবে। রাজা তাহার গৃহস্থের কথা বিশ্বস্ত লোকমুখে অবগত হইয়া, সে যে নির্দোষ, তাহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইবা মাত্র তিনি গৃহস্থকে মুক্তি দিলেন এবং এমন বোধহীন বিচারককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিলেন। রাজা যুবকের প্রার্থনানুসারে দুঃস্থ প্রজাবৃন্দকে অবস্থা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত কর দিতে হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন।

উদ্ধার চণ্ডীর কৃপায় উদ্ধার পাইয়া সাধু গৃহস্থ হৃষ্টচিত্তে বাটী প্রত্যাবর্তন করিয়া বৃদ্ধা জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। হারানিধি পাইয়া মায়ের প্রাণ শান্ত হইল।

যথাসময়ে যথানিয়মে গৃহস্থের মাতা ভক্তিসহকারে উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত করিলেন। ব্রত মাহাত্ম্য শ্রবণে গ্রাম গ্রামান্তরের কুললনাগণ এই ব্রত করিতে আরম্ভ করিলেন।

পুত্র মায়ের আগ্রহাতিশয্যে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু মাতৃমন সন্তুষ্ট রাখিবার মানসে, বিবাহে সম্মত হইল। এক শুভদিনে, শুভ লগ্নে গৃহস্থ বিবাহ করিল। সুন্দরী, সচ্চরিত্রা পুত্রবধূ পাইয়া বৃদ্ধা মাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না। লক্ষ্মী বউ ঘরে আসিলে, শ্বশ্রূর সহিত সেও উদ্ধার চণ্ডীর ব্রত আরম্ভ করিল। ধন-পুত্রাদির অধীশ্বর হইয়া সাধু গৃহস্থ সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। —ঢাকা (যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ১৩২৯ সালে সংগৃহীত, অর্চনা, ফাল্গুন, ১৩২৯)

মন্তব্য

লোক-কথার বিশেষ কোন অভিপ্রায় কাহিনীটির মধ্য দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নাই ; সেইজন্য কাহিনীটি একটু প্রাণশক্তিহীন। তবে সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate, N.) অভিপ্রায়টীর ইহাতে সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই দৈবভাব-ভারাক্রান্ত কাহিনীটির একটি প্রধান মানবিক গুণ এই যে, মৃত্যুকালে গৃহস্থ হরিনাম উচ্চারণ কিংবা গুরুর চরণ দর্শন করিতে না চাহিয়া শিশুর হাসিমাখা মুখ ও গো-বৎসের উল্লম্ফনের আনন্দ দৃশ্য দেখিতে চাহিয়াছিল। শিশুর ভিতর দিয়া নূতন জীবন মর্ত্যলোক নামিয়া আসে। তাহার নূতন জীবনের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষ মৃত্যুর বিভীষিকা ভুলিয়া যায়। কাহিনীর এই কথাটির ভিতর দিয়া ইহার একটু সাহিত্যগুণ বিকাশলাভ করিয়াছে ; নতুবা ইহা সম্পূর্ণ বিশেষত্বহীন হইত।

১৯

ইচ্ছামতী

একদা কৈলাসপর্বতে মহাদেব ও দুর্গাদেবী পাশাখেলায় রত ছিলেন। কামদেব তাঁহাদের ক্রীড়া দেখিতেছিলেন। খেলায় হার হইল মহাদেবের। ইহাতে কামদেবকে হাসিতে দেখিয়া তিনি রুষ্ট হইলেন ও তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন,—"তোর দেহ এই মুহূর্তে কুষ্ঠগ্রস্ত হউক।" তদ্দণ্ডেই কামদেব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন এবং দেবাদিদেবের আদেশে মর্ত্যের কোন এক বনমধ্যে এক কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে একদিন হরগৌরী কৈলাস হইতে শূন্যপথে অন্য স্থানে যাইতেছিলেন। উক্ত কুঁড়ের নিকটবর্তী হইলে তাঁহারা কামদেবের কাতর প্রার্থনা শুনিতে পাইলেন। কামদেব রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতেছিলেন,—"প্রভু, দয়া করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন এবং এই ঘৃণ্য রোগ হইতে আমাকে মুক্তি পাইবার উপায় বলিয়া দিন।" ইহা শুনিয়া ভগবতীর চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি মহেশ্বরকে বলিলেন,—"কামদেব লঘু পাপে গুরু দণ্ড ভোগ করিতেছে। যাহাতে সে সত্বর রোগ-মুক্ত হয়, তাহা আপনাকে করিতেই হইবে।" মহাদেব ভগবতীর কথা অমান্য করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই আড়াই হাত একখানা কাগজে পুর্ণিমা ব্রতের কথা ও নিয়মাদি লিখিয়া কাকাসুরার দ্বারা কামদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং তাহাকে জানাইলেন যে, উক্ত কাগজখানা সে যেন যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। তাহাকে ইহাও জানান হইল যে, পৃথিবীতে এক রাজার এক অবিবাহিতা বয়স্থা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে এবং সেই কন্যা বিবাহের পর পুর্ণিমা ব্রত করিলে, সে ব্যাধি-মুক্ত হইয়া চিরসুখে কালযাপন করিতে পারিবে। কামদেব ইহা অবগত হইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন এবং কাগজখানা সযত্নে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে সেই রাজা একদিন মধ্যাহ্নকালে আহারের পর নিজের শয়নগৃহে পালঙ্কের উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় রাণীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে রাণী তাহাকে বলিলেন,—"ইচ্ছামতীর যে বিবাহের বয়স পার হইতে চলিল, সেদিকে ত আপনার কোন লক্ষ্যই নাই।

একমাত্র মেয়ে আমাদের রূপে-গুণে সে অতুলনীয়া। রাজা হইয়া তাহারও যদি সময়মত বিবাহ দিতে না পারেন, তবে ইহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?" রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আমি থাকি নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে, তুমিও তো আর কোন দিন একথা আমাকে মনে করাইয়া দেও নাই। সে যাহা হউক, আগামী কল্যই ইচ্ছামতীর স্বয়ংবরের দিন ধার্য হউক।"

সেই দিনই সর্বত্র এ বিষয়ে জানান হইল। পর দিবস যথাসময়ে নানা স্থান হইতে ইচ্ছামতীর পাণিপ্রার্থী নরপতিগণ রাজবাটীতে উপনীত হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপবেশন করিলেন। কুষ্ঠগ্রস্ত কামদেবও এ খবর পাইয়া অতি কষ্টে তথায় উপস্থিত হইয়া সভার এক কোণে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

যথাকালে সুসজ্জিত পরমাসুন্দরী রাজকন্যা মাল্যাদি হস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া বর-মনোনয়নে রত হইলেন। শত শত সুশ্রী যুবক সেখানে উপস্থিত। সকলেই রাজকন্যার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। কিন্তু তাহাদের কেহই তাহার মনোনীত হইল না। নানাদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া, অবশেষে কামদেবের নিকট উপাস্থিত হইলেন ও তাঁহাকেই উপযুক্ত মনে করিয়া ইচ্ছামতী তাঁহারই গলদেশে মাল্যদান করিলেন। ইহা দেখিয়া সকলেই আশ্চার্যান্বিত হইলেন। উপস্থিত যুবকগণ টিটকারি দিতে দিতে রাজবাটী হইতে প্রস্থান করিলেন। ইচ্ছামতী পিতামাতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন এবং ঠাট্টা বিদ্রূপকারিগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। রাজা নিরুৎসাহ হইলেন। আমোদ-আহ্লাদ করিবার প্রবৃত্তি কাহারও রহিল না। বিনা আড়ম্বরে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল।

বিবাহের কয়েক দিন পরই কামদেব পত্নীসহ নিজ কুটীরে উপস্থিত হইলেন। স্বামী মহাব্যাধিগ্রস্ত; তাহাতে যেমন ইচ্ছামতী দৃক্‌পাতশূন্য, রাজার মেয়ে হইয়া পর্ণকুটীরে বাস করাতেও তাঁহার তদ্রূপ চিত্তক্ষোভ জন্মিল না। সত্বরই কামদেব সকল বিষয় জানাইয়া রাজকন্যার হাতে সেই সযত্ন-রক্ষিত কাগজখানা দিলেন ও পূর্ণিমা ব্রত করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন।

রাজকন্যা কালবিলম্ব না করিয়া ভক্তি সহকারে যথানিয়মে ব্রত করিলেন। ব্রতের ফলে শীঘ্রই স্বামী রোগমুক্ত হইলেন। আবার ব্রত করিবার পর তাঁহাদের দরিদ্রাবস্থা দূরীকৃত হইল। তৃতীয় বার ব্রত করিবার পরই ইচ্ছামতী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে তিনি এক পরম সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। উপযুক্ত সময়ে মহাসমারোহে পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন কর্ম সুসম্পন্ন হইল।

বিবাহের পর হইতেই কন্যার দুরবস্থার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া রাণী সর্বদা অশান্তিতে কালযাপন করিতেছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে কন্যার সংবাদ লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনতিবিলম্বেই রাজা মেয়ের খোঁজে স্থানে স্থানে লোক পাঠাইলেন। অচিরেই খবর আসিল যে, নীরোগ সুশ্রী স্বামী ও সোনার চাঁদ ছেলে সহ রাজপ্রাসাদের ন্যায় সুন্দর বাটীতে তাঁহারা সুখে বাস করিতেছেন। এ সুসংবাদ পাইয়াই রাজারাণী হৃষ্টচিত্তে লোক-লস্করসহ কন্যা, জামাতা ও নাতীকে দেখিবার জন্য বাটী হইতে রওনা হইলেন।

জামাতার আলয়ে উপনীত হইয়া তাঁহারা কন্যা, জামাতা ও নাতীকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইলেন। রাণী মেয়ের নিকট তাহার সুখ-সৌভাগ্যের কারণ অবগত হইলেন এবং তাহার অনুরোধে সুসন্তান কামনা করিয়া ভক্তিপূতমনে সেই স্থানে পূর্ণিমা ব্রত করিলেন। ইহার কয়েক দিন পর রাণীর গর্ভসঞ্চার হইল। ইচ্ছামতীর ইচ্ছানুসারে তিনি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা লোক-লস্করাদি সহ নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

উপযুক্ত সময়ে রাণীর একটি সুসন্তান জন্মিল। এই শুভ সংবাদ অচিরেই রাজার নিকট প্রেরিত হইল। এই সুসমাচারে রাজার আনন্দের সীমা রহিল না। সত্বরই তিনি জামাতার বাটীতে যাইয়া হৃষ্টমনে পুত্রের চাঁদ মুখ দর্শন করিলেন। কিছুকাল পর তিনি রাণী ও পুত্রাদিসহ নিজ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে মহা আড়ম্বরে ছেলের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। রাজা পুত্রের নাম রাখিলেন যুবরাজ।

রাজা বার্ধক্যে উপনীত হইলে পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রাণীর সহিত ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করিলেন।

—ঢাকা (যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত, অর্চনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩১).

মন্তব্য

কাহিনীটির প্রধান অভিপ্রায় অসম বিবাহ বা unusual marriage. এখানে স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কামদেবকে ইচ্ছামতী বরমাল্য দান করিয়াছেন। সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। দৈবদোষে যেমন কামদেবের কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল, দৈবের আশীর্বাদেই তাঁহার রাজ কন্যাকে লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল।

ব্রতের ফল

এক ব্রাহ্মণ। তাহার বৃদ্ধ বয়সে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মেয়েকে কোলে রাখিয়াই ব্রাহ্মণ ইহলীলা সংবরণ করেন, তাই ব্রাহ্মণী অতি কষ্টে মেয়েকে ভিক্ষা-লব্ধ অন্নে পরিবর্ধিত করিয়াছেন। এইরূপে মেয়ের বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে। হইলে কি হইবে? কোন স্থান হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে না। একদিন ব্রাহ্মণী ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাটীতে আসিয়া ব্রাহ্মণী দেখিলেন, কয়েকজনে ব্রত পাতিয়া বসিয়াছে। ব্রাহ্মণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি কর গো?' ব্রতীবোনেরা বলে, 'আমরা উদয়-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করি', 'এই ব্রত করিলে কি হয়?' 'এই ব্রত করিলে অবিবাহিতের বিবাহ হয়, নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রার পুত্র হয়, কাটামাথা জোড়া লাগে, যে যা মনস্কামনা করে, সিদ্ধি হয়।' ব্রাহ্মণী চণ্ডীদেবীকে প্রণতি নিবেদন করিয়া মনে মনে বলিলেন, তাঁহার মানসিক রহিল, মেয়ের বিবাহ হইলে, এই ব্রত ভালরূপে সম্পাদন করিবেন। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা, ব্রাহ্মণী স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া কোন এক মঙ্গলবারে শাক-ভাত দ্বারা উদয়-মঙ্গলাকে পূজিতেই বিবাহের এক প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝোল-ভাত দ্বারা ব্রত করিতেই বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক হইল। ডাল-ভাত দ্বারা ব্রত সম্পূর্ণ করায়, বিবাহের সমস্ত আয়োজন সংগৃহীত হইল। পথ্য-ভাত দ্বারা ব্রত সম্পাদনে বিবাহের 'নাইয়রী' আসিয়া উপস্থিত হইল। দুধ-ভাত দ্বারা ব্রত উদ্‌যাপনে বর বন্ধুবান্ধবসহ কন্যাগৃহে আসিয়া বিবাহ-কার্য সম্পাদন করিল।

বিবাহের শেষে বর ব্রাহ্মণকন্যা সহ নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেল। এইরূপে দিন যায়। মেয়ের অদৃষ্ট মন্দ, তাই অনিয়মেই 'ব্রত পালি' আরম্ভ করিল। ভর্তৃগৃহে ব্রাহ্মণকন্যার এক পরমা সুন্দরী দাসী ছিল। তাহার সঙ্গে বরের গুপ্ত-প্রণয় সংঘটিত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে দাসীর নানা সূত্রে ঝগড়ার সৃষ্টি হইল। বরও দাসীর পথ গ্রহণ করে এবং তাহার সুখবিধানের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে। যখন যন্ত্রণা বেশী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, তখন ব্রাহ্মণী মেয়েকে নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'অনিয়মে ব্রত করায় তোর কপাল ভাঙ্গিয়াছে।'

ব্রাহ্মণী পুনরায় দুহিতার সঙ্গে যথারীতি ব্রত আরম্ভ করিলেন। যখন শাক-ভাত দ্বারা ব্রত করিলেন, তখন তাহারা শুনিতে পাইলেন, ঐ দাসী পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ঝোল-ভাতের সময়ে দাসীর রোগ মারাত্মক। যখন পথ্য-ভাত দ্বারা ব্রত সম্পন্ন করিলেন, তখন শুনিতে পাইলেন, বৈদ্য কবিরাজে আশা ছাড়িয়াছে।' দুধ-ভাতের সময়ে—দাসীর প্রাণ-বায়ু কখন বহির্গত হয় ঠিক নাই। সংবাদ আসিল, এই মেয়ে দাসীকে দেখিবার জন্য যাইতে পারে। ব্রাহ্মণী মেয়েকে সম্পূর্ণরূপে ব্রত সম্পাদন না করিয়া কোথাও যাইতে দিবে না। দৈ-ভাত দ্বারা ব্রত শেষ করিতেই ব্রাহ্মণী শুনিতে পাইল, দাসী সংসারলীলা সংবরণ করিয়াছে। এদিকে দাসীর শোকে ব্রাহ্মণ পাগলের বেশ ধারণ করিল। শ্মশানের কার্য সম্পূর্ণ করিয়া সে দাসীর একখানা অস্থি গলদেশে ধারণ-পূর্বক গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মায়-ঝিয়ে ব্রত ছাড়েন না। আবার এক বৎসর পর অগ্রহায়ণ মাস আসিল। উভয়েই শাক-ভাত দ্বারা চণ্ডীর ব্রত করিলেন। এদিকে মেয়ের বর নানা দেশ পর্যটন করিয়া বহুলোকের গঞ্জনা ও অশ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইল। হঠাৎ তাহার মনে ব্রাহ্মণ মেয়ের কথা উদয় হইল।

ঝোল-ভাতের ব্রত শেষে ব্রাহ্মণ গলার অস্থি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পত্নী-গৃহে যাইতে মনস্থ করিল। ডাল-ভাতের ব্রতশেষে, ব্রাহ্মণকুমার ব্রাহ্মণীর মেয়ের জন্য নানা দ্রব্য ক্রয় করিল। পথ্য-ভাত ব্রতশেষে,—বর শ্বশুরালয়ে রওনা হইল। দুধ-ভাত ব্রতশেষে ব্রাহ্মণ সে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন ব্রাহ্মণী ও মেয়ে দৈ-ভাতের ব্রত উদ্‌যাপন করিল, তখন ঐ ব্রাহ্মণ শ্বশুর-গৃহে উপনীত হইয়া তাহার শ্বশ্রূমাতাকে আহ্বান করিল। তখনও ব্রত শেষ হয় নাই। ব্রাহ্মণী ভালরূপে ব্রত সমাপন করিয়া, আড়াইখানা ভিন্ন কাজ করতঃ, প্রসাদ গ্রহণান্তর, বরকে নিছিয়া পুছিয়া ঘরে আনিল। কিছুদিন শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিয়া ব্রাহ্মণ, ভার্যাসহ নিজগৃহে আসিলেন। ব্রাহ্মণ-তনয়া প্রতি বৎসর যথারীতি উদয়-মঙ্গলচণ্ডী ব্রত সমাপন করতঃ ধনে-জনে সুখী হইল। —মৈমনসিংহ (প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার')

মন্তব্য

এখানে দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাসঘাতকতা (Faithlessness in Marriage T. 230) এবং দাসীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ের মধ্য দিয়া অবৈধ যৌন সম্পর্ক (Illicit sexual relations T. 470) অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

একগুঁয়ে বৌ

এক ব্রাহ্মণ, তাহার সন্তান হয় আর মরে—বাঁচে না। অতঃপর এক সন্তান হইলে জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সন্ধ্যায় ঐ গৃহে একটি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। সে ঐ গৃহে রাত্রি যাপনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বলিল, 'আমি অতি দরিদ্র, একটি কুটীরই আমার সম্বল; নবজাত সন্তানসহ আমরা তিনজন অতি কষ্টে এখানে দিন কাটাই; তোমাকে কোথায় স্থান দিব ?' ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ দরজাতে শুইয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিলে গৃহস্বামী বলিল, 'আমাদের সন্তান জীবিত থাকে না, দরজাতে শয়ন করিলে আর কোন অনিষ্ট হয় কে জানে ?' ভিক্ষুক বহু বাদানুবাদের পর বলিল, 'সন্তানের যাহাতে কোন্ অনিষ্ট না হয়, সে দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।' অবশেষে ব্রাহ্মণ তাহাতে সম্মতি দিলেন।

এদিকে গভীর রাত্রে চিত্রগোবিন্দ ঠাকুর (করমপুরুষ) আসিয়া অশৌচ গৃহের দরজায় দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন, 'দরজায় কে শুইয়াছ ? দোয়ার ছাড়, আমি ভিতরে যাব।' ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বলিল, 'তুমি কে' ? ঠাকুর বলিলেন, 'আমি করমপুরুষ। গৃহে প্রবেশ করিব, কাজ আছে।' সে বলিল, 'গৃহস্থ ব্রাহ্মণের সন্তান থাকে না। আমি বহু কষ্টে আজ রাত্রিযাপনের অনুমতি পাইয়াছি। কি কারণে গৃহে যাইতে চাও, না জানাইলে দরজার পথ ছাড়িব না।' ঠাকুর বলিলেন, 'শীঘ্র দরজা ছাড়, প্রভাত হওয়ার বেশী দেরী নাই, কোন্ সময় লিখিব ?' ব্রাহ্মণ বলিল, 'যাহা লিখ, যদি আমাকে বলিয়া যাও, তবে পথ ছাড়িব, নতুবা নহে।' করমপুরুষ অনন্যোপায় হইয়া স্বীকৃত হইলেন।

গৃহে প্রবেশ করিয়া চিত্রগোবিন্দ শিশুর মস্তকের পিছন দিয়া লিখিলেন ও সম্মুখ দিয়া দেখিলেন। এইরূপ কতক সময় লিখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। যাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ দরজাতে ঠাকুরকে ধরিয়া বলিল, 'বল, কি লিখিয়াছ ?' তাহার অনুনয়ে ঠাকুর তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'বার বৎসর বয়সে বিবাহের শুভরাত্রিতে এই শিশুকে বাঘে খাইবে।' এই কথা বলিয়া করমপুরুষ অন্তর্ধান হইলেন।

বার বৎসর বয়সে, ব্রাহ্মণ এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ সাব্যস্ত করিল। লোভে পড়িয়া ব্রাহ্মণের মতিচ্ছন্ন হইল। বর-

কন্যার জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুগঠিত লোহার মাঞ্জস তৈয়ার করিয়া, শুভরাত্রে ব্রাহ্মণ বর-কন্যাকে তাহাতে শোয়াইল। নানা কথাবার্তার পর হঠাৎ এক সময় ব্রাহ্মণ-কুমার হাসিয়া উঠিল। কন্যা বলিল, 'কেন হাস?' বর বলিল 'এম্‌নি।' 'না, আমি সুন্দরী না, আমার বুদ্ধি কম, এই জন্য হাস।' ব্রাহ্মণ-কুমার বলিল, 'না'। কন্যা হাসির কারণ জানিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; শেষে জিদ্ আরম্ভ করিল। বর কত প্রকারে তাহাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সমস্তই নিস্ফল হইল। অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বে বলিল, 'শুনিয়াছি, আমাকে আজ বাঘে খাইবে। বল ত, কিরূপ সুরক্ষিত হইয়া সুখে আছি, আমাকে কিরূপে বাঘে খাইবে?' কন্যা বলিল, 'বাঘ কিরূপ?' বর নানাভাবে তা ক বাঘ চনাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু জেদী মেয়ে ছাড়িবার নহে; বলে, 'আমাকে মাটিতে আঁকিয়া দেখাও।' বর আঁকিয়া দেখাইতে চাহে না। কিছু কিছু ভয় যে না আছে, এমন নয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা মেয়ের আগ্রহাতিশয্যে বর সমস্ত গৃহ জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড বাঘ মৃত্তিকাতে অঙ্কিত করিল; কিন্তু চক্ষুদান দিল না। কন্যা বলিল, 'চক্ষুদান দেও।' বর দেয় না। কন্যা বরকে বাঘের চক্ষুতে তারকা চিহ্নিত করিতে বাধ্য করিল। চক্ষু আঁকিতেই এক প্রকাণ্ড বাঘ সেই ঘরেই অবয়ব ধারণ করিয়া বরকে কামড়াইয়া ধরিল। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকুমার প্রাণত্যাগ করিল। কন্যা বাসর ঘরে চীৎকার আরম্ভ করিলে সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, বরের মৃতদেহ মৃত্তিকাতে অবলুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। বাড়ী জুড়িয়া কান্নার রোল পড়িয়া গেল। —মৈমনসিংহ (প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার')

মন্তব্য

এই কথাটির প্রধান অভিপ্রায় একগুঁয়ে বধূ (Obsinate Bride T 255.) এই প্রকার এক'গুয়ে বর কিংবা স্বামী অভিপ্রায়ও থাকিতে পারে। দাম্পত্য জীবনেও এই প্রকার একগুঁয়ে পত্নী অভিপ্রায়-মূলক বহু কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। এক'গুয়েমির পরিণাম সর্বত্রই শোকাবহ হয়। মানব-চরিত্রের বিশিষ্ট একটি গুণ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বাসর-গৃহে বরের বিপদ (Danger to husband in bridal Chamber T 172) অভিপ্রায়টিও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়—এই নীতি-বাক্যও ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

২২

দেবতার লোভ

এক ছিল দুখাই ও তাহার মা। বড় কষ্টে তাহারা দিনাতিপাত করিত। দিনান্তে সকল দিন ভাতও জুটিত না। এমনি দুঃখে কষ্টে তাহাদের মা ও ছেলের দিন যায়। দুখাই রাজার বাড়ী গরু চরাইত, আর দুখাইর মা লোকের বাড়ী ধান ভানিত; চাউলের খুদ আনিত, মাছের কাটাকুটা আনিত। এই দিয়াই কোনো রকমে মায়ে বেটায় চাহিয়া চিন্তিয়া পেট ভরাইত।

একদিন দুখাইর মা চাউলের খুদ ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া একটুকু গুড় সঙ্গে দিয়া নারিকেলের মালায় করিয়া দুখাই-এর খাওয়ার জন্য সঙ্গে দিয়া দিল। দুখাই তাহা লইয়া মাঠে গরু চরাইতে গেল। দুপুর বেলা ক্লান্ত দুখাই শিয়রের কাছে মায়ের দেওয়া খাবার রাখিয়া না খাইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। এমন সময় ক্ষেত্রপাল ঠাকুর ঐ পথ দিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শনিবার দিন লোকের বাড়ী বাড়ী পুজা লইতে চলিয়াছেন। দুখাই-এর ক্ষুদ ভাজা দেখিয়া ঠাকুর লোভ সামলাইতে পারিলেন না। একটু একটু করিয়া সবটাই খাইয়া ফেলিলেন। একটুকু পথ যাইয়া ঠাকুরের মনে হইল,—"আরে, দুখাইএর মা তাহাকে খাইবার জন্য যাহা দিয়াছিল, সবই তো আমি খাইয়া ফেলিলাম—এখন দুখাই উঠিয়া খায় কি!"—এই ভাবিয়া, কাছে ছিল চেঙ্গা ঝোপা গাছ, ঠাকুর ঐ গাছের গোড়ায় সোনার চাকা থুইয়া চলিয়া গেলেন। আর দুখাইকে স্বপ্নে কহিলেন— "আরে দুখাই, চেঙ্গা ঝোপার নীচে তোরে দিয়া গেলাম। উহা ভাঙ্গাইয়া খাইস, ফুরাইবে না।"

দুখাই জাগিয়া উঠিয়া দেখে তাহার চাউলের গুঁড়িও নাই, জলও নাই!— তাহার মায়ের এত কষ্টের সামগ্রী কে খাইয়া গেল! হঠাৎ তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। দুখাই চেঙ্গা ঝোপা গাছের গোড়া উঠাইয়া লাল মাটির চাকা পাইল। সে উহা যে কি, বুঝিল না—লইয়া গেল রাজার বাড়ী। রাজা কহিলেন, —"আরে দুখাই, তুই ইহা কোথায় পাইলি?"—এই বলিয়া দুখাইএর বুকে পাথর চাপা দিয়া আটকাইয়া রাখিল।

দুখাইএর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষেত্রপাল ঠাকুর রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। "আমি ঐ সোনার চাকা দুখাইকে দিয়াছি। শীঘ্র উহা দিয়া দে।

নতুবা তোকে নির্বংশ করিব।" রাজা জাগিয়া উঠিয়া লোকজনকে কহিলেন, "দুখাইকে ছাড়িয়া দে, আর ঐ সোনার চাকা ভাঙ্গাইয়া উহার দামে মোহর দিয়া দে।"

দুখাই সোনার মোহর লইয়া মায়ের কাছে গেল। মা তো সোনা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কহিল, "বাবা, এ-সকল তুই কোথায় পাইলি? তোরে যে রাজায় বান্ধিয়া লইবে।" তখন দুখাই একে একে সব কথা মায়ের কাছে খুলিয়া বলিল। ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের কথা, রাজার কাছে শাস্তির কথা, তারপর রাজা তাহাকে টাকা-পয়সা দিয়া ছাড়িয়া দিবার কথা।

শুনিয়া টুনিয়া দুখাইএর মা টাকা-পয়সা সব মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিল। তারপর একদিন দুখাই তাহার মাকে বলিল,—"মা, চল না একদিন মামার বাড়ী বেড়াইতে যাই। নয়া ধানের পিঠা পায়েস খাইয়া আসি। মায় ছেলেতে বেড়াইতে যায়।

পথে মামারা ক্ষেতে হালচাষ করে। বোন ও ভাগিনাকে দেখিয়া তাহারা খুব খুশী। সাত ভাইএর বোন—কত আদরের। ভাইরা বাজার হইতে মাছ-দুধ কত কি আনিয়া দিল। বধূরা সাত বোনে মিলিয়া অনেক রান্না করিল। দুপুরে সাত ভাই আসিয়া খাইতে বসিল। বোন্‌কে খাইতে বলিল। বোন্ বলিল, সে বধূদের সঙ্গে বসিবে। সাত ভাই ক্ষেতে চলিয়া গেলে বধূরা ননদ ও ভাগিনাকে খাইতে দিল শুধু ক্ষুদের জাউ, আর কিছুই না। দুখাইএর মা কান্দিয়া কাটিয়া ঐ ক্ষুদের জাউ একখানি কলার পাতায় বান্ধিয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিল।

কান্দিয়া কাটিয়া দুখাইর মা দুখাইকে লইয়া বাড়ী ফিরিল। তারপর মাটি খুঁড়িয়া টাকা পয়সা উঠাইয়া জমি জমা করিতে লাগিল। চার ভিটিতে চার দালান তুলিয়া, পুষ্করিণী কাটিয়া দুখাইর মা দুখাইএর বিবাহ দিল।

তখন একদিন দুখাই বলিল, "মা, চল, এবার আর একবার মামার বাড়ী যাই।" মা বলিল, "না বাবা, আর আমাকে বেড়াইবার কথা বলিও না।" দুখাই তবু মানিল না। মাকে লইয়া মামার বাড়ী চলিল। আবার সাত ভাই ক্ষেতে হাল চাষ করে। বোন্ ও ভাগিনাকে দেখিয়া তাহারা খুশী হইয়া সেই বারের মত বাজার করিয়া আনিল। সাত বউএ মিলিয়া আবার কত কিছু রান্না করিল। আবার সাত ভাই খাইতে বসিয়া বোনকে ডাকিল। এবার দুখাইএর মা দুখাইকে লইয়া ভাইদের সঙ্গেই ভাত খাইতে বসিল। এবার

সাত বউএর পারশের ঠেলা দেখে কে! কে কত মাছ ভাজা, কে কত মাছের রসা, কে কত পায়েশ পিঠা খাওয়াইতে পারে! দেখিয়া শুনিয়া দুখাই বলিল—

সেই মামা সেই মামী সেই পুকুর পাড় ঘর।
আইজ কেনে গো, মামী, দুধের মধ্যে সর॥

দুখাই এই কথা বারে বারে বলিতে লাগিল, আর তাহার মা কান্দিতে লাগিল। তখন সাত ভাই জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো, দুখাই এই কথা কেন বলে? আর বইন, তুমিই বা কান্দ কেন?" তখন দুখাইর মা গত বৎসরের সব কথা বলিয়া সেই মাটির তলার চাপা খুদের জাউ আনিয়া দেখাইল। দুখাইর মা বলিল, "সেইদিন দুখাই ছিল গরীব, তাই মামীরা খুদের জাউ দিয়াছে। আর আজ দুখাই-এর কপাল ফিরিয়াছে, তাই মামীরা পিঠা পায়েসের পাহাড় দিয়াছে।

তৈলের মাথায় তৈল দিতে বেশী লাগে না।
ধোয়া মাথায় তৈল দিয়া কুলান যায় না।"

তখন সাত ভাই-এ মনের কষ্টে মনের ঘৃণায় বধূদিগকে শাস্তি দিল।

তখন দুখাই মামা-মামীদের নিমন্ত্রণ করিল। মামা-মামী দুখাইএর বাড়ী গিয়া ক্ষেত্রপাল ঠাকুরের দয়া দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেত্রপালের ব্রত করিল। দুখাই দেশে দেশে ঢোল দিল, "অগ্রহায়ণ মাসের শনিবারে ক্ষেত্রপালের পূজা কর, আর ক্ষুদভাজা দাও।"

ধানে চাউলে ভরা ক্ষেত।
সুবর্ণে ভরুক ভাই-এর পেট॥

সেই হইতে দেশে দেশে লোকে ক্ষেত্রপালের ব্রত করে।

—মৈমনসিংহ (সেরপুর), গোপাহেমাঙ্গী রায় কর্তৃক সংগৃহীত

মন্তব্য

সাধারণত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া কোন কোন সময় ধন দান করেন। (Ceremonies and prayers at unearthing of Treasure N 554.) বহু দৈব অনুগ্রহমূলক কাহিনীর ইহাই অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, দেবতা লোভ বশতঃ গোপনে এক দরিদ্র বালকের আহার্য চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিলেন; সেইজন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিলেন। দেব চরিত্রের গুণটুকু লক্ষণীয়। তার পর দরিদ্র ভাগিনেয়ের প্রতি মামার ব্যবহার বাংলার পারিবারিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

২৩

সুখে অরুচি

এক বিধবা গোয়ালিনীর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। সাত ছেলে ও মেয়েটিকে নিয়া গোয়ালিনী অতি কষ্টে দিন কাটাইত। গোয়ালিনীর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। দু'বেলা আহার জোটে না। কোন প্রকারে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা মেয়ে ও ছেলে সাতটিকে মানুষ করিতে লাগিল। গোয়ালিনীর ব্যবসায়ও বন্ধ; কাজেই তাহার এতগুলি ছেলেপিলের আহার জোটান বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িল। সে নিজে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখন ছেলে কয়টিকে মানুষ করিয়া তাহাদের বিবাহ করাইয়াছে। কিছুদিন যায়, একদিন এক ব্রাহ্মণ-কন্যার সহিত গোয়ালিনী সই পাতাইল। সইএর অবস্থা বেশ ভাল। তাঁহার সাহায্যে গোয়ালিনী অনেক সময় অনেক উপকার পাইতে লাগিল। একদিন গোয়ালিনী ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সই, তোমার এত ঐশ্বর্য কিসে হইল?' সই বলিল, 'আমার একটি ব্রত আছে, সেই ব্রতের ফলে আমার এত ঐশ্বর্য হইয়াছে।' গোয়ালিনী বলিল, 'সই, এ ব্রত অন্য কেহ কি করিতে পারে না?' ব্রাহ্মণী বলিল, 'কেন পারিবে না? মনের ঐকান্তিক ভক্তির সহিত মা চণ্ডীকে ডাকিলে অবশ্যই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সকলেই তাঁহাকে ডাকিতে পারে।' গোয়ালিনী বলিল, 'আমি এই ব্রত করিব, ব্রতের উপকরণাদি আমাকে বলিয়া দাও। আমার আর কষ্ট সহ্য হয় না।'

সই বলিল, 'এ ব্রত করিতে বিশেষ কিছু ব্যয় করিতে হয় না। তুমি এ ব্রত অনায়াসেই করিতে পার। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হইবে। আর যতকাল জীবিত থাকিবে, এই ব্রত ভঙ্গ করিতে পারিবে না।' গোয়ালিনী তাহাতেই স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মণী তখন নিয়মাদি বলিয়া দিলেন। একটি কলার 'মাইজে'র আগায় সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া 'মাইজ' বসাইতে হইবে। 'মাইজে'র মধ্যে একটি জবাফুল, ধান, দূর্বা ও একটি ফল দিবে। দৈ, ক্ষীর ইত্যাদি নৈবেদ্য দিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া মা চণ্ডীর উদ্দেশে এই সকল উৎসর্গ করিবেন। এই ব্রত করিয়া ব্রতী ভাত ভিন্ন অন্য সমস্তই খাইতে পারে।'

গোয়ালিনী তাহাই করিল। বৈশাখ মাস পড়িলেই প্রত্যেক মঙ্গলবারই এই ব্রত করিতে লাগিল। সে যে দিবস প্রথম ব্রত করিল, সেই দিনই দৈ বেচিয়া অনেক পয়সা পাইল। চণ্ডীমায়ের বরে গোয়ালিনীর কোন কিছুরই অভাব নাই। ধনদৌলত ও লোকজন ইত্যাদিতে উহার বাড়ী ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। এইরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র ও পুত্রবধূদের লইয়া, আমোদে আহ্লাদে দিন যায়।

কিছুদিন পরে গোয়ালিনী একদিন সইকে বলিল, 'সই, আমার এত ঐশ্বর্য আর সহ্য হয় না। টাকা পয়সার ঝন্ঝন্, লোকজনের এত হাসিগল্প, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, হাতীশালায় হাতী, এসব আর আমি দেখিতে শুনিতে পারিতেছি না। কত বৎসর যাবৎ কান্না কাহাকে বলে, জানি না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে।' সই এ কথা শুনিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইল, 'এ ব্রত করার পর হইতে তোমার দুঃখ ঘুচিয়াছে, কত সুখ-সম্পদে বৌ, ঝি, ছেলেপেলে নিয়া দিন কাটিতেছে; তুমি এ ব্রত ভাঙ্গিও না।' গোয়ালিনী তাহা মানিল না। ব্রাহ্মণী শেষটায় বিরক্ত হইয়া তাহাকে ব্রত ভঙ্গ করিতে বলিলেন। গোয়ালিনী নিজে আর ব্রত করে না। বধূদের সকলকেও এই ব্রত করিতে নিষেধ করিয়াছে। বড় বৌ কিন্তু লুকাইয়া ভিন্ন ঘরে ব্রত করিল। মা চণ্ডী প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সুখশান্তি বজায় রাখিলেন। এদিকে গোয়ালিনী নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে কাঁদিয়া বলিল, "সই, ব্রত তো ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু ইহাতেও যে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। আমি কাঁদিবার সুযোগ পাইলাম না। আমাকে কাঁদিবার উপায় বলিয়া দাও।' ব্রাহ্মণী বলিল, "রাজার বাড়ীতে একটি হাতী মরিয়াছে, তুমি উহাকে উপলক্ষ করিয়া কাঁদিতে থাক।" গোয়ালিনী তাহাই করিল। হাতীকে ধরিয়া কাঁদিবা মাত্র হাতী বাঁচিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া অবাক। রাজার নিকট খবর গেল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গোয়ালিনীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। গোয়ালিনী সইএর নিকট গিয়া বলিল, "সই, আমি এবারও শোক করিতে পারিলাম না, আমি কাঁদিবামাত্র হাতী বাঁচিয়া উঠিল। শীঘ্র আমাকে কাঁদিবার উপায় বলিয়া দাও।" ব্রাহ্মণী রাগ করিয়া বলিল, "কেন, আমি তো তোমাকে আগেই বলিয়াছিলাম যে, তোমার এত সুখ শান্তি ভাল লাগিবে না।" গোয়ালিনী বলিল, 'না সই, আমি কোন কথা শুনিব না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।" ব্রাহ্মণী বলিল, 'যদি তোর একান্তই কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, মেয়ের বাড়ী বিয়ের লাড্ডু পাঠাইয়া দে।'

গোয়ালিনী তাহাই করিল। একটি লোক দিয়া এক হাঁড়ী বিষের লাড়ু পাঠাইয়া দিল। এ'বার গোয়ালিনী মনে করিল যে এখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিবে। এদিকে লোকটি লাড়ুর হাঁড়ী নিয়া যাইতে লাগিল। পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মা চণ্ডী এই লোকটির জন্য ব্রাহ্মণের বেশে পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তুমি ঐ পুকুরে স্নানাদি করিয়া আইস। আমি তোমার হাঁড়ীর প্রহরী রহিলাম।' লোকটি স্নান করিতে গেল। ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, আমার ভক্তের হৃদয়ে যেন শোক প্রবেশ করিতে না পারে, তাই ঠাকুরের বরে বিষের লাড়ু অমৃতের লাড়ু হইয়া রহিল। লোকটি আসিয়া তাহার হাঁড়ী লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিল। সকলেই এই জিনিস খাইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল; আর বলিয়া দিল, "দিদিমাকে, মাকে বলিও যেন আরও কিছু লাড়ু পাঠাইয়া দেন।" গোয়ালিনী সেইদিন কিছুই আহার করে নাই। কতক্ষণে মেয়ের মৃত্যুর বার্তা নিয়া আসিবে, সেই আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু লোকটি আসিয়া বুড়ীকে তাহার আশানুরূপ বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। গোয়ালিনীর কান্না হইল না, মেয়ে ও নাতি-পুতি মরে নাই। কৈ তারা মরবে, আর বুড়ী প্রাণ ভরে কাঁদবে, তাহা না হইয়া বিপরীত হইল। এই মঙ্গল বারেও বড় বৌ লুকাইয়া ব্রত করিয়াছিল। গোয়ালিনী ধীরে ধীরে সইয়ের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত। "সই, আমার সাধ মিটিল না। বিষের বড়ীতে মেয়েটা মরে নাই।" ব্রাহ্মণী এবারও অনেক বুঝাইল। গোয়ালিনী তাহা শুনিল না। তখন ব্রাহ্মণী বলিল, "বড় বৌ কিংবা তোমরা কেহই আগামী মঙ্গলবারে ব্রত করিও না।" তাহাই হইল; সেই মঙ্গলবারে কেহই আর ব্রত করিল না।

মঙ্গলচণ্ডীর শাপে গোয়ালিনীর যে যেখানে ছিল, সকলেই সেখানে মরিয়া রহিল। গোয়ালিনী আর কাহাকেও জীবিত না পাইয়া প্রাণ ভরিয়া কান্না আরম্ভ করিল। এরূপ ভাবে সাত রাত্রি, সাত দিন অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কাঁদিতে পারে না। তাহার আবার সকলকে পাইতে ইচ্ছা হইল। পুত্রবধূদের নিয়া আবার সংসারের সাধ হইল। সে সইকে ডাকিতে লাগিল। সই আসিয়া বলিল, "কেন, এখন আবার আমাকে ডাকিতেছ কেন? বসিয়া সাধ মিটাইয়া কাঁদ।" তখন গোয়ালিনী সইএর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "সই, আমার সকল সাধ মিটিয়াছে, আমি আর কাঁদিতে পারিব না। আমার আবার সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করে। কি করিয়া আমি

আবার সকলকে পাইব, সে উপায় বলিয়া দাও।" তখন সই বলিল, 'আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর, তবে আবার তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।' তখন গোয়ালিনী আবার ব্রত করিল। মঙ্গলচণ্ডীর মঙ্গল ইচ্ছায় গোয়ালিনীর সকল বাঁচিয়া উঠিল। আবার পূর্ব সুখশান্তি ফিরিয়া আসিল। সোনার মঙ্গলচণ্ডী গড়াইয়া পুত্রবধূদের ব্রত করাইল।

—ঢাকা, বিক্রমপুর, (সরযূবালা গুহ কর্তৃক সংগৃহীত, বিক্রমপুর পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সাল)

মন্তব্য

পূর্বোল্লিখিত 'শোকহীনার শোক' কাহিনী ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি কাহিনীর একই অভিপ্রায়—অপূর্ব অভিলাষ। নিরবচ্ছিন্ন সুখের জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দুঃখের স্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য মানুষ এখানে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তারপর গৃহস্থের সাত ছেলে ও এক মেয়ে অভিপ্রায়ও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থের সাত ছেলে ও এক মেয়ে থাকা যেমন সৌভাগ্যের লক্ষণ, এখানে প্রথমে তাহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়া তাহা সত্য হইয়াছে। তারপর সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় দেবীসাধনা (Ceremonies and prayers at unearthing of treasure N. 564) অভিপ্রায়টিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বিষের লাড়ুর অমৃতে পরিণতি ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহাতে যে সই পাতিবার কথা আছে, তাহাও বাংলা সামাজিক জীবনের দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান্। ব্রাহ্মণী এবং গোয়ালিনীতে এখানে সই পাতানো হইয়াছে। সই পাতাইলে উভয় সইয়ের সমান সামাজিক অধিকার দেখায়, পরস্পর অস্পৃশ্যতাবোধও থাকে না।

২৪

লক্ষ্মীমতী

একদেশে এক ভগবানচন্দ্র রাজা। তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীমতী কন্যা। একদিন লক্ষ্মীমতী স্বপ্ন দেখে, সে যেন নিরাকুলির কথা কহিতেছে। এই স্বপ্নের পর হইতে লক্ষ্মীমতী প্রত্যেক শনিবারে ও মঙ্গলবারে নিরাকুলির কথা কহিত। কতকদিন পরে লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইল। দশ মাস পরে একটি ছেলে হইল।

ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর। আবার লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইয়াছে। একদিন সে নিরাকুলির ব্রত করিবার জন্য সমস্ত জোগাড় করিল। ভগবানচন্দ্র রাজা আসিয়া তাহার সমস্ত ফেলিয়া দিল। লক্ষ্মীমতী খুব রাগিয়া গেল এবং রাজাকে কহিল—আমার নিরাকুলিটা তুমি কেন ফেলিলা? আজ তোমার রাজত্ব সব যাইবে! এই কথা কহিয়া লক্ষ্মীমতী রাগ করিয়া সে দিন ব্রত করিল না। সেই রাত্রেই রাজার রাজত্ব সব গেল! নিরাশ্রয় ভগবানচন্দ্র রাজা লক্ষ্মীমতী ও তাহার ছেলেটি পুরী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে এক বনে গিয়া পড়িল। ভোরে উঠিয়া দেখে কোথায় রাজবাড়ী! তাহারা এক বনে পড়িয়া আছে। বিপদের উপর বিপদ,—এমন সময় লক্ষ্মীমতীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীমতী কহিল—রাজা, এখন আমার উপায় কি? রাজা কহিল, আর উপায় কি? এখানেই প্রসব হউক। লক্ষ্মীমতী নিরাকুলির নাম স্মরণ করিয়া সেই বনেই একটি ছেলে প্রসব করিল। প্রসবান্তে কাতর হইয়া লক্ষ্মীমতী রাজাকে কহিল,—আমার বড়ই পিপাসা হইয়াছে—আমার জন্য একটু জল লইয়া আইস।

রাজা নদীর পারে জল আনিতে গেল। এক দেশের এক রাজা মারা গিয়াছিল, তাহার রাজহস্তী চারিদিকে ঘুরিতেছিল—যাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে তাহাকেই নিয়া সেইখানে রাজা করিবে। ভগবানচন্দ্র জল আনিতে যাইয়া সেই হাতীর সম্মুখে পড়িল। তাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিয়া তাহাকে রাজহস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া গেল।

এদিকে লক্ষ্মীমতী জলের আশায় বসিয়া আছে। রাজা আর আসে না। অবশেষে পিপাসায় অস্থির হইয়া সে বড় ছেলেকে কহিল, তুই এখানে বসিয়া থাক্, আমি রাজাকে তল্লাস করিয়া আসি, আর স্নান করিয়া আসি। লক্ষ্মীমতী

অনেক খুঁজিয়াও রাজাকে না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতে স্নান করিতে গেল। এক ব্যাপারীর নৌকা নদীর এক কোণে ছিল। আর সারা নদী শুকাইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীমতী কহিল, দেখ হে ব্যাপারী, তোমার নৌকাখানা একটু সরাও, আমি স্নান করি। ব্যাপারী কহিল,—আমার নৌকা নড়ে না, তুমি সরাইয়া স্নান করিতে পারিলে কর। লক্ষ্মীমতী বাঁ' হাতে নৌকা ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া স্নান করিল—নদী ভরিয়া জল হইল! ব্যাপারী কহিল, তুমি কে আমাদের নৌকা নাড়িলা? লক্ষ্মীমতী কহিল, আমি লক্ষ্মীমতী কন্যা। ব্যাপারী দেখিল যে, এই কন্যা সঙ্গে থাকিলে আর নৌকা ঠেকিবার ভয় থাকিবে না, তাই সে লক্ষ্মীমতীকে জোর করিয়া ধরিয়া নৌকায় তুলিল। লক্ষ্মীমতী কত মিনতি করিল, কহিল, আমাকে ছুঁইস না, আমার অশৌচ, আমার একটি ছেলে হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারী তাহা মানিল না। তখন লক্ষ্মীমতী নিরুপায় হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। কহিল, হে ভগবান, আমার সমস্ত সৌন্দর্য সব তুমি নেও, আমাকে কুরূপ, কুৎসিত কর। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীমতীর সমস্ত রূপ চলিয়া গেল। ব্যাপারী তাহার এই দশা দেখিয়া তাহাকে নৌকার পাটাতনের নীচে স্থান দিল এবং নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এদিকে ছেলে দুইটি সেই বনেই আছে। সেই দেশে এক গোয়ালার একটি কপিলেশ্বরী গাই আছে। গোয়ালা ভোরে গাই ছাড়ে, সেই বনে ছুটিয়া গিয়া গাই ছেলে দুইটিকে দুধ দেয়। এইরূপে কতকদিন যায়,—গোয়াল ভাবে, গাই কোথায় যায়, আর আগের মত দুধ দেয় না কেন, তাহা দেখিতে হইবে। একদিন গোয়ালা গাই ছাড়িয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। গিয়া দেখে, গাই এক বনের মধ্যে দুটি ছেলেকে দুধ দিতেছে। গোয়ালা কহিল, কিহে বাছারা, তোমরা এখানে কেন? বড় ছেলেটি কহিল, আমার—

বাপ গেছে জল আনতে সেও আসে নাই।
মা গেছে স্নান করিতে সেও আসে নাই।
যে গুণে আছে গোয়ালের কপিলেশ্বরী গাই।
চারিটি বানের দুগ্ধ খেয়ে বাঁচি দুই ভাই॥

গোয়ালা কহিল, এখন তোমরা কোথায় যাইবে? ছেলে দুইটি কহিল, আমাদের যে নেয়, সে আমাদের বাপ-মা, তার সঙ্গেই যাই। গোয়ালা ছেলে দুইটিকে আর গাইটিকে লইয়া বাড়ী আসিল। বাড়ী আসিয়া সে গোয়ালিনীকে

কহিল—দেখ, তোর জন্ম কি একটি জিনিস্ আনিয়াছি। গোয়ালিনী ছেলে দুইটিকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল—কোথায় এই দুটি ছেলে পাইলা? গোয়ালা সমস্ত বিবরণ বলিল। গোয়ালিনী এখন পেটে একটা ধামা বাঁধিয়া রাজার বাড়ী দধিদুগ্ধ লইয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল,—ওলো বাবা গোয়ালিনী, তোর আবার কবে গর্ভ হইয়াছে? গোয়ালী কহিল, ঠাকুরুণ, এই মাসে দশ মাস। গোয়ালিনী বাড়ী আসিল, আসিয়া একটি কুকুর কাটিয়া ছেলেটির গায় রক্ত মাখাইয়া দিল। তাহার পরদিন চারিদিকে খবর গেল যে, রাজার বাড়ীর গোয়ালিনীর একটি ছেলে হইয়াছে ও আর একটি ছেলেকে পোষ্য আনিয়াছে। শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত।

কতকদিন পরে ছেলে দুইটি বড় হইল। গোয়ালা রাজাকে বলিয়া কহিয়া ছেলে দুইটিকে নিয়া ঘাট মাঝির কাজে দিল। দৈবক্রমে সেই ব্যাপারীর নৌকাও ঘাটেই আসিয়া লাগিল। একদিন রাত্রে ছোট ছেলেটি কাঁদে, বড়টি বলিল—আয় আমরা বাপ মায়ের কথা কহি। বড়টি দুঃখের কথা কহিতে লাগিল, ছোটটি শুনিতে লাগিল। সেই লক্ষ্মীমতী কন্যা তাহাদের কথা শুনিয়া সারারাত্র কাঁদিল। তাহার পরের দিন ব্যাপারীরা রাজার কাছে গিয়া কহিল, আমাদের নৌকায় একটি মেয়ে আছে—আপনার ঘাটমাঝি ছোড়া দুইটা রাত্রে তাহাকে মারিয়াছে। ছেলে দুইটিকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহারা বলিল,—আমরা তাহাকে দেখিও নাই। লক্ষ্মীমতীকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাল কাঁদিয়াছ কেন গো? লক্ষ্মীমতী কহিল, আপনার ঘাট মাঝি ছেলে দুটির কথা শুনিয়া কাঁদিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে ছেলে দুইটি কি কথা বলিয়াছিল, তাহা সমস্ত বলিল,—রাজার পূর্বের কথা সব মনে হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সব জানিতে পারিলেন। রাজা গোয়ালাকে পুরস্কৃত করিয়া তাহার নিকট হইতে ছেলে দুইটিকে গ্রহণ করিলেন, রাজপুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল। লক্ষ্মীমতী স্নান করিয়া স্বামী পুত্র নিয়া নিরাকুলির কথা কহিল। সেই রাত্রে রাজা পূর্ব রাজত্বও ফিরিয়া পাইল এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে লাগিল।

—ঢাকা, বিক্রমপুর, ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সংগৃহীত, 'বিক্রমপুর পত্রিকা', কার্তিক, ১৩২০ সাল

মন্তব্য

ইহাতে সর্বপ্রথম যে অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাগ্যের বিপর্যয় (L. Reversal of Fortune)। দৈব কার্যে অবহেলার জন্য রাজার ঐশ্বর্য লোপ পাইল। বিপদের মধ্যে জল আনিতে গিয়া পরস্পরের বিচ্ছেদ,—স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ, ভাইভগিনীতে বিচ্ছেদ, মাতপুত্র কিংবা পিতাপুত্র বিচ্ছেদ, মাতা ও কন্যা, পিতা ও কন্যায় বিচ্ছেদ, ভাইয়ে ভাইয়ে বিচ্ছেদ ইত্যাদি বাংলা লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়। এই বিচ্ছেদের মধ্য দিয়া সাধারণতঃ একজনের সৌভাগ্য সূচিত হয়; আর একজনের দুর্ভাগ্যের মাত্রা বাড়িয়া যায়। এখানে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পুনরায় রাজা হইল, কিন্তু বালক-বালিকা পিতৃহীন ও পরে মাতৃহীন হইল। নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য নিজের চেষ্টায় কিংবা দৈব সহায়তায় কুৎসিৎ আকৃতি ধারণ করাও ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। তারপর বিপদে সাহায্যকারী পশু (Friendly Animal B 300) অভিপ্রায়টিও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

দুইখ্যা

এক বিধবা, তার একটি মাত্র ছেলে। পিতৃহীন বলিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে দুইখ্যা নামে সম্বোধন করে। অতি কষ্টে দিন চলে। মা সুতা কাটিয়া দেয়—দিনের খোরাক তাহাতেই নির্বাহ হয়। আর একদিন দুঃখী হাটে চলিয়াছে—পথে একটি বটগাছ, সে গাছ হইতে কে যেন বলিল, "আজ তোর সুতো অমূল্য হবে। সুতো বেচে আমার জন্যে তেল সিঁদুর আনিস্।" সত্য সত্যই সেদিন দুঃখী হাটে যাইয়া সুতো বিক্রী করিয়া অনেক টাকা পাইল। সে মনের আনন্দে বহু জিনিসপত্র কিনিয়া নৌকা ভরিয়া লইয়া বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। তেল সিঁদুর কিনিতে তাহার ভুল হইয়া গেল। নৌকা আর চলে না। হঠাৎ তাহার মনে হইল, তেল সিঁদুর ত কেনা হয় নাই। সর্বনাশ। অমনি সে নৌকা ফিরাইয়া বাজারে যাইয়া তেল সিঁদুর কিনিয়া আনিল এবং ঐ যে বটগাছ—সেই বটগাছ তলায় তেল সিঁদুর রাখিয়া বলিল, "কে আমাকে তেল সিঁদুর আনিতে বলিয়াছিলেন? আমি তেল সিঁদুর আনিয়াছি, এই দেখুন।'

বটগাছে ছিলেন আকুলি ঠাক্রুন—তিনি হাসিয়া বলিলেন "আমার তেল-সিঁদুর লাগিবে না, তোর মাকে বলিস্, শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে উঠান লেপিয়া পিঁড়ি, ঘট, আমা সরা দিয়া যেন আকুলির কথা বলে, তবে তোদের সব দুঃখ দূর হবে।" দুঃখীর মা সামনের শনিবার আকুলির কথা বলিল, তাহার সব দুঃখ দূর হইল। গ্রামের লোক আসে নাই, তাদের অমঙ্গল হইল। শেষে সকলে আসিয়া আকুলির নিকট প্রার্থনা করিল, "আমার মঙ্গল হউক, আমি আকুলির কথা শুনিব।" এইরূপে আকুলির কথা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

ফল কি? অবিবাহিতার বিয়ে হবে, আটকুঁড়ির ছেলে হবে, দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর হবে।

—ঢাকা, বিক্রমপুর, ভুবনমোহিনী দাসী, 'বিক্রমপুর পত্রিকা' ১৩২০

মন্তব্য

সপ্তাহের মধ্যে শনি এবং মঙ্গলবার ঐন্দ্রজালিক (magical) শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হয়। কৃষ্ণ-ইন্দ্রজাল (Black Magic) অনুষ্ঠান করিবারও ইহারা উপযোগী। আমা সরা, কাঁচা সরা বা আমা হাঁড়ীও কৃষ্ণ-ইন্দ্রজাল অনুষ্ঠানের যোগ্য পাত্র বিশেষ।

সুবচনির হাঁস

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর একটি মাত্র ছেলে, তাহার নাম দুইখ্যা। দুইখ্যা এক রাজবাড়ীতে একশো আটটি হাঁস পালিত। উহার মধ্যে একটি হাঁস খোঁড়া ছিল। এক নাপিত-দূত রাজাকে ক্ষৌরী করিতে যাওয়ার সময় দুইখ্যাকে বলিল,—"এত হাঁস চরাও, চল, আজ আমরা ঐ খোঁড়া হাঁসটি মারিয়া খাই।"

তদুত্তরে দুইখ্যা বলিল—"আমি হাঁস মারিলে রাজা আমার গরদান নিবেন।" পুনরায় নাপিত-দূত বলিল,—রাজা কি আর হাঁস গণিতে আসিবে? চল, একটি হাঁস মারিয়া খাই।"

নাপিত-দূতের কথায় ঐ খোঁড়া হাঁসটি দুইখ্যা গোপনে মারিয়া ফেলিল। পরে বাড়ী যাইয়া মাতাকে উহা রাঁধিয়া দিতে বলিল। ব্রাহ্মণী দুইখ্যাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, "কেন এই কার্য করিলে? রাজবাটীর লোকেরা জানিতে পারিলে তোমার ও আমার উভয়েরই সর্বনাশ করিবে।" দুইখ্যা কিছুতেই মানিল না। মাতা অগত্যা ঐ খোঁড়া হাঁসের ঝোল রন্ধন করিয়া দিল; পরে দুইখ্যা তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিল। ঐ হাঁসের পালকগুলি ছাই গাদার মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

পরে একদিন নাপিত-দূত এ সংবাদ রাজার কাছে বলিল। রাজা দেখিলেন, হংসপালের মধ্যে খোঁড়া হাঁসটি নাই। দুইখ্যাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দুইখ্যা তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। রাজার আদেশে চারিদিকে অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। অবশেষে জানিতে পারিলেন, দুইখ্যাই হাঁস মারিয়া খাইয়াছে।

রাজা হাঁস মারার কথা শুনিয়া দুইখ্যার মাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে,—"দুইখ্যার মা, তোমার দুইখ্যা নাকি একটি হাঁস মারিয়া খাইয়াছে!"

তদুত্তরে দুইখ্যার মা বলিল,—"রাজা মশয়! আমি ইহার কিছুই জানি না"। পরে দুইখ্যার মা দুইখ্যারে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইখ্যা বলিল, "না মা; আমি মারি নাই, নাপিত-দূত আমার নিকট দিয়া যাওয়ার

সময় মারিয়াছে। পরে নাপিত দূত যাইয়া চালাকি করিয়া রাজার নিকট হংস মারার বিষয় বলিয়াছে।"

এদিকে দুইখ্যার মা কাঁদিয়া আকুল। অনেক দিন হইতেই দুইখ্যার মার ঘরে সুবচনি স্থাপিত ছিল। দুইখ্যার মা সুবচনির একজন সেবিকা, তাড়াতাড়ি দুইখ্যার মা ঘাটে যাইয়া ডুব দিয়া উঠিয়া যোড়হস্তে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, —"মা, সুবচনি, তুমি জানিও, তোমাকেই রোজ রোজ পুজি। তুমি ছাড়া আর আমার এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কেহই নাই।" পরে বাড়ী আসিয়া দুইখ্যার মা একখানা কলার মাইজ কাটিয়া তাতে তৈল, সিন্দুর, পান, সুপারী দিয়া সুবচনি মার পূজা করিয়া আসিলেন। আর দুইখ্যারে বলিল, "হাঁসের পাখাগুলি কোথায় রাখিয়াছ, দেও, আমি হাঁস জিয়াইয়া দেই।"

পরে দুইখ্যা হাঁসের পাখাগুলি আনিয়া মাতার নিকট দিল। দুইখ্যার মা সুবচনি ঘট হইতে পাখাগুলির উপর তিনবার জলের ছিটা দেওয়া মাত্রই হাঁসটি বাঁচিয়া উঠিল। পরে তৈল-সিন্দুর দিয়া হংসপালের মধ্যে ছাড়িয়া দিল।

এদিকে রাজা এক সভা ডাকাইয়া দুইখ্যা ও তাহার মাকে ডাকাইয়া আনিলেন। সভায় সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দুইখ্যারে গরদান নিব, না জেলে বন্দী করিয়া রাখিব।" ইহা শুনিয়া দুইখ্যার মা রাজার নিকট বলিল, "রাজা মশয়! আমার দুইখ্যারে উচিত বিচার করিয়া বধ করেন। আপনার একশত আটটি হাঁস আছে কি না, জানিয়া দেখুন, পরে দুইখ্যারে বধ করেন।"

তখন রাজা বলিলেন,—"আমার কাছে একবার হাঁসগুলি গণিয়া দেখাওত?" তদনুসারে দুইখ্যার মা রাজার নিকট হাঁসগুলি গণিয়া দেখাইল— ঠিক একশত আটটি হাঁসই আছে। "দেখুন ত, রাজা মশয়! আমার দুইখ্যারে কেন বধ করিতে চাহিয়াছিলেন?"

পরে সভাস্থ সকলে বলিল "এরূপ রাজার সভাতে আর আমরা আসিব না।"

দুইখ্যার মার কাতরতা দেখিয়া সুবচনি দেবী প্রসন্ন হইয়া ঐ দিন রাত্রে রাজাকে যাইয়া স্বপ্ন দেখাইলেন, অচিরাৎ দুইখ্যাকে মুক্ত করিয়া দিতে এবং অর্ধেক রাজ্য দিয়া রাজকন্যার সহিত উহার বিবাহ দিতে, নতুবা তাহার রাজ্য ধন-জন সব ছারখার হইবে। দেবীর আদেশ পাইয়া রাজা মশয়

দুইখ্যারে মুক্ত করিলেন। দুইখ্যার মার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় দুইখ্যার মা বলিল,—"আমার দুইখ্যার কোন দোষ নাই। দুইখ্যা নাপিত-দূতের কথায় হাঁস মারিয়াছিল। আমি সুবচনি ছাড়া আর কিছুই জানি না। সুবচনি মার আমি একজন সেবিকা। তাঁহার অনুগ্রহে তৈল সিন্দুর দিয়া মরা হাঁসটি বাঁচাইয়াছি।'

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন,—"দুইখ্যা, সত্যি করিয়া বল ত কে হাঁস মারিয়াছিল? আমি রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিব এবং আমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিব।"

তদুত্তরে দুইখ্যা শপথ করিয়া বলিল "নাপিত-দূতের কথায়ই আমি হাঁস মারিয়াছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন।"

পরে নাপিত-দূতকে ডাকিয়া আনিয়া রাজা মশয় তাহাকে শাস্তি দিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কন্যাকে দুইখ্যার সহিত বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে রাজত্বের অর্ধেক প্রদান করিলেন। দুইখ্যাকে টাকাকড়ি ও দালান-কোঠা তৈয়ার করিয়া দিলেন। দুইখ্যার অবস্থা ফিরিল ও সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।

বিবাহান্তে একদিন রাজা মহাসমারোহে কলার মাইজ, আমের পল্লব, পান সুপারী, তৈল, সিন্দুর ও নানাবিধ উপকরণ দিয়া সুবচনির ব্রত করিলেন। রাজ্যেও প্রচার করিয়া দিলেন যে,—"সুবচনী ব্রতকথা সকলে শুনিবে ও তৈল সিন্দুর সধবাকে দিবে, যে ভক্তিপুর্বক ব্রতকথা কয় ও শুনে সুবচনি মা তাহার মনোবাঞ্ছা পুর্ণ করেন।"

—ঢাকা, বিক্রমপুর, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত, অর্চনা, আশ্বিন, ১৩৪০

মন্তব্য

১০৮ সংখ্যার মধ্যে ঐন্দ্রজালিক শক্তি আছে বলিয়া অনুভূত হয়। অষ্টোত্তর শতনাম কীর্তনীয় এবং অষ্টোত্তর শত বর্ষ মানুষের আয়ু কল্পিত হয়। ১০৮ সংখ্যক বলি বা পুষ্পোপহারে তান্ত্রিক দেবীপূজাও এই উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়। এখানেও হাঁসের সংখ্যা ১০৮। মৃত জীবনের পুনর্জীবন দান, ইহার অন্যতম অভিপ্রায়।

কাহার ভাগ্যে কে খায়

কোন এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্ত্রী ভিন্ন সংসারে আর তাঁহার কেহই ছিল না। তিনি লেখাপড়া ভালরূপ জানিতেন না। ভিক্ষা করিয়া কোন মতে সংসার চালাইতেন। কোন দিনই ভিক্ষা করিয়া তিনি আধ সেরের অধিক চাউল পাইতেন না। যে দিন ভিক্ষা একেবারেই মিলিত না, সেদিন ব্রাহ্মণ ও তাহার স্ত্রী অনাহারেই থাকিতেন। টাকা-পয়সার অভাবে তাঁহাদের খাওয়া-পরা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সদাসর্বদাই অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইত। তাঁহারা বাস করিতেন জীর্ণ পর্ণ কুটীরে, শয়ন করিতেন তৃণ-শয্যায়, পরিধান করিতেন ছিন্ন মলিন বসন। ভিক্ষাই যাহার বৃত্তি, তিনি কখনও সুখ-শান্তির আশা করিতে পারেন না; যেখানে সেখানে তাঁহাকে সামান্য কারণেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। গ্রামে গ্রামে সারাদিন ঘুরিয়া, দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করিয়া. মাত্র দুই চারিটি সদাশয় ব্যক্তির বাড়ীতেই ভিক্ষুক যৎসামান্য ভিক্ষা পাইয়া থাকেন; অধিকাংশ বাড়ী হইতেই তাঁহাকে বাক্যবাণে জর্জরিত হইয়া ফিরিতে হয়। এই সব জ্বালা-যন্ত্রণা ব্রাহ্মণকে অহরহঃ নীরবে সহ্য করিতে হইত, কেন না, তাঁহার না ছিল একঘর যজমান বা শিষ্য; বিদ্যাও ততটা ছিল না যে চাকুরী করিতে পারিবেন। কাজেই এই হেয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াই তাঁহাকে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত।

এইরূপে বহুকাল চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের এখন বৃদ্ধাবস্থা। এখন আর পূর্বের ন্যায় হাঁটিতে পারেন না, রোদ-বানও আর সেরূপ সহ্য হয় না, দৃষ্টিশক্তিও কমিয়া গিয়াছে। তাই তিনি একদিন ব্রাহ্মণীকে বলিলেন যে, একজন সঙ্গী ছাড়া তাঁহার আর দূর-দূরান্তরে গমনা গমনের ক্ষমতা নাই। জল-চল একটি বালক পাইলেই তাঁহার চলিবে এবং তাহারই সন্ধান তাঁহাকে করিতেই হইবে। ব্রাহ্মণী তাঁহার এই প্রস্তাবে মত দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইয়া ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া পড়িলেন। এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাস্তার ধারে এক গাছতলায় একটি বালককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে বালকটি জাতিতে কায়স্থ এবং বড় গরীব;

বৃদ্ধা মা ভিন্ন সংসারে আর তাহার কেহই নাই। তিনি ছেলেটিকে তাঁহার সঙ্গে রাখিতে চাহিলে সে সম্মত হইল, তখনই তিনি তাহাকে লইয়া তাহার মায়ের নিকট যাইয়া এই প্রস্তাব করিলেন। বৃদ্ধাও ইহাতে সম্মতি দান করিলেন। ব্রাহ্মণ খুশী হইয়া ছেলেটিকে লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেদিন অল্পকালের মধ্যেই ব্রাহ্মণের ভিক্ষা মিলিল প্রচুর পরিমাণে। এক গাছতলায় বসিয়া তাহারা কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। তাহার পর ভিক্ষার ঝুলিটি ভাল করিয়া বাঁধিয়া, বালকের মাথায় চাপাইয়া দিয়া, তাহার সহিত ব্রাহ্মণ বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন,—ব্রাহ্মণী বিরস বদনে গালে হাত দিয়া ঘরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে যাইয়া তিনি বলিলেন,—"গিন্নি! এই ছেলেটিকে ভগবান মিলাইয়া দিয়াছেন। এর মাথা হইতে মোটটি নামাইয়া লও।" ঝুলিটি ঘরে নিয়া খুলিয়া দেখিয়া ব্রাহ্মণী বড়ই খুসী হইলেন।

এই দিন হইতে প্রত্যহই ব্রাহ্মণ আশার অতিরিক্ত ভিক্ষা পাইতে লাগিলেন, তাঁহার সংসার এখন একটু ভালই চলিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুকাল চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে খুবই ভালবাসিতে লাগিলেন। বালকটির সঙ্গলাভের দিন হইতেই তিনি বেশী পরিমাণে ভিক্ষা পাইতে থাকায়—যে যে স্থানে পুর্বে এক মুষ্টিও ভিক্ষা মিলে নাই—শুধু লাঞ্ছিত হইয়াই ফিরিতে হইয়াছে, সে সব স্থানেও চাহিবা মাত্রই গৃহস্বামী অকাতরে ভিক্ষা দিতে থাকায়, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই বালকটি ভাগ্যবান; ইহার সঙ্গলাভেই তাঁহার দুঃখ-দুর্দশার অনেকটা অবসান হইয়াছে; একে সদাসর্বদা নিজের কাছে রাখিতে পারিলে সদুপায়ে রোজগার করিয়া সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতে পারিবেন। বালকটি ব্রাহ্মণের আদর-যত্ন লাভ করিল বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণীর স্নেহলাভে বঞ্চিত হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের সংসারে শুধু খরচই বাড়িয়াছে। তাই তিনি তাহার প্রতি নানারূপ কুব্যবহার করিতে লাগিলেন। খাওয়া-পরা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। তবু সে চলিয়া গেল না দেখিয়া একদিন তিনি, ব্রাহ্মণের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, ছেলেটিকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে গেলেন। এ দিন পুর্বের ন্যায় শুধু আধ সের চাউল লইয়া বিমর্ষচিত্তে সন্ধ্যার পর তিনি গৃহে ফিরিলেন। আগের মত আবার তাঁহারা নানা অভাবে বিষম কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

এবার দুঃখ-দৈন্যের জ্বালায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একেবারে মুসড়িয়া পড়িলেন। বাল্যাবধি দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ করিয়া বৃদ্ধকালে যদিও তিনি সুখের মুখ দেখিলেন, তাহাও ভাগ্যদোষে স্থায়ী হইল না। দুই চারি দিন কতকটা শান্তিতে বাস করিতে না করিতেই আবার তাঁহাকে সেই পূর্বদশায় পড়িতে হইল। আজকাল ভিক্ষা করিয়া কোন দিন তিনি কিছু পান, কোনদিন খালি হাতেই ফিরিতে হয়। কোন দিন অর্ধাহারে, কোন দিন অনাহারেও তাঁহাদিগকেও থাকিতে হয়।

একদিন ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"গিন্নি কাহার ভাগ্যে কে খায়, তাহা তুমি বুঝিলে না। সেই ছেলেটি আসিবার পর হইতেই আমাদের খাওয়া-পরার কষ্ট ঘুচিয়াছিল; আবার যেদিন আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছ, সেদিন হইতেই সেই দারুণ কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। আমি কাল প্রাতে বাহির হইয়া প্রথমেই সেই বালকটির খোঁজ করিব। যদি তাহার দেখা পাই এবং বলিয়া কহিয়া আবার তাহাকে আনিতে পারি, তবেই গৃহে ফিরিব; নতুবা গহন বনে চলিয়া যাইব।"

পরদিন সেই বালকটির যে গ্রামে বাড়ী, সেই গ্রামের দিকে ব্রাহ্মণ রওনা হইলেন। সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় ঐ বাড়ীর খিড়কির দ্বার হইতে এক মহিলা তাহাকে বলিলেন, —"ঠাকুর! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আপদুদ্ধারিণী ব্রতটি করাইয়া দিয়া যাইবেন?" ব্রাহ্মণ কোমল স্বরে বলিলেন,—"মা! আমি ত এ ব্রত কোন দিন করাই নাই। বিশেষতঃ, আমি স্নান-আহ্নিকও করি নাই।" মহিলা বিনীত ভাবে কহিলেন—"এ ব্রতে আপনি শুধু দেবী ভগবতীর অর্চনা করিবেন। আর যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা আমি করিব। আপনি বাড়ী আসুন। তাহার পর তেল মাখিয়া স্নান করিয়া পূজাটি করিয়া দিন। আজ পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় এ পর্যন্তও যখন আসিয়া পৌছাইলেন না, তখন তাঁহার আগমন আশা করা বৃথা। আপনাকে দেবীই মিলাইয়া দিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ স্নান-আহ্নিক করিয়া পূজা করিলেন। তৎপর আহার করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি ব্রতিনীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই ব্রত যে নিয়মে করিতে হয় এবং ইহা করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহা জানিয়া লইলেন। ব্রতিনী পাত্র হইতে তুলাটুকু লইয়া ব্রাহ্মণের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, যে কামনা করিয়া যখন তিনি এই তুলাটুকু আঁচল হইতে খুলিবেন, ইহা দ্বারা তাঁহার তাহা সিদ্ধ হইবে।

এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই ব্রাহ্মণের সেই বালকটির সহিত দেখা হইল। তাহাকে অনুরোধ করা মাত্রই সে মায়ের অনুমতি লইয়া আসিয়া বৃদ্ধের কাছে পুনঃ নিযুক্ত হইল। বালককে সঙ্গে লইয়া তিনি এক দোকানে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীকে স্মরণ করিয়া আঁচলের গাঁইট খুলিয়া তুলার পরিবর্তে পাইলেন এক টুক্‌রা সোনা। এই ব্যাপারে বৃদ্ধ বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি সোনার টুক্‌রাটি দোকানদারকে দিয়া উহার বদলে চাউল, ডাল ইত্যাদি চাহিলেন। দোকানদারের স্বভাব খুব ভাল। সে সোনার খণ্ডটি দেখিতে দেখিতে বলিল, "ঠাকুর! ইহার বিনিময়ে আপনি খুব বেশী পরিমাণ জিনিস পাইবেন। আজ চাউল, ডাল, তেল, লবণ ইত্যাদি কিছু কিছু লইয়া যান; কাল ধামা, তেলের ভাঁড় প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া আসিবেন, সকল দ্রব্যই রীতিমত ভাবে দিয়া দিব।" তিনি তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেও দরকারী জিনিসপত্র কিছু কিছু ব্রাহ্মণের চাদরে বাঁধিয়া দিলে, বালকটি তাহা মাথায় লইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রিয় সঙ্গীকে লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় তাঁহারা বাড়ীতে পৌঁছিলেন।

আহারের পর ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে সকল বিষয় বলিলেন। ব্রাহ্মণী সেই রাত্রেই আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার ও সদা সুখে শান্তিতে কালযাপন করিবার কামনা করিয়া পরদিন হইতে প্রত্যহ আপদুদ্ধারিণীর ব্রত করিতে মানস করিলেন এবং দেবীর উদ্দেশে করযোড়ে প্রণাম করিলেন। এবার তিনি বালকটিকে আদর যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরদিবস ব্রাহ্মণ বালকটিকে সঙ্গে লইয়া দোকানে গেলেন এবং তথা হইতে ব্রতের উপকরণাদি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রচুর পরিমাণে বাড়ী আনিলেন। সেদিন খুব ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণী আপদুদ্ধারিণী ব্রত করিলেন। ভক্তিসহকারে দেবীর অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণ দেবীর চরণে নিবেদন করিলেন— "মা! আর যেন কখনও আমাকে ভিক্ষা না করিতে হয়। আমি যেন আজীবন সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতে পারি।" ব্রতশেষে ব্রতিনীও দেবীর চরণে প্রার্থনা করিলেন—"মা! বৃদ্ধ স্বামী ও আমার সন্তানতুল্য এই ছেলেটিকে চিরসুখে রাখিও। আমি যেন এদের লইয়া চিরসুখে ঘর-সংসার করিতে পারি।"

ব্রাহ্মণ যে সমস্ত জিনিসপত্র দোকান হইতে আনিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু কিছু লইয়া দেবীকে স্মরণ করিয়া ছোটখাট একখানি দোকান খুলিলেন। দেবীর কৃপায় দিন দিন দোকানের উন্নতি হইতে লাগিল।

আজকাল তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি রাজার বাড়ীর ন্যায় সুদৃশ্য বড় বাড়ী করিয়াছেন। এখন তিনি বাস করেন মনোহর অট্টালিকায়, শয়ন সুকোমল শুভ্র শয্যায়, আহার করেন মূল্যবান পাত্রে, নানাবিধ মুখরোচক উত্তম খাদ্য। এখন তিনি স্নান করেন সরোবরে, প্রাতে বৈকালে পায়চারি করিয়া বেড়ান রমণীয় উপবনে, কাজকর্ম উপলক্ষে দূর-দূরান্তরে যাতায়াত করেন গাড়ীতে চড়িয়া। সকল সময়ই বালকটি তাঁহার সঙ্গী। ইহাকে না হইলে তাঁহার একদণ্ডও চলেন। ব্রাহ্মণী এখন যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই অনায়াসে পাইতে পারেন। কিন্তু তিনি বহুমূল্য অলঙ্কার বস্ত্রাদির জন্য লালায়িত নহেন। স্বামী ও পুত্রতুল্য বালকটি সুখে থাকুক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহাদের সুখেই তাঁহার সুখ। এখনও তিনি তাঁহাদিগকে নিজে যত্নসহকারে রাঁধিয়া ও পরিবেশন করিয়া খাওয়ান। দেবীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। প্রায় সময়ই তিনি বলিয়া থাকেন,—'ভাল মন্দ নাহি জানি, যা' করেন মা আপদুদ্ধারিণী'।

কতক দিন পর ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা হইল পিত্রালয়ে যাইবার। একথা তিনি স্বামীকে জানাইলেন; তাঁহাকে ও ছেলেটিকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ শ্বশুরালয় যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণী স্বামী ও ছেলেটির সঙ্গে পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। সেখানে খুব আদর যত্নের সহিত তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। প্রায় সময়ই ব্রাহ্মণীকে "ভাল মন্দ নাহি জানি, যা' করেন মা আপাদুদ্ধারিণী"—এই কথা বলিতে শুনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূরা একদিন তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাদের নিকট দেবীমাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেন, "দেবীর প্রতি যাহার অচলা ভক্তি, তাঁহার কখনও আপদ-বিপদ ঘটে না এবং দৈবক্রমে ঘটিলেও, দেবীর কৃপায় অবশ্যই সে তাহা হইতে উদ্ধার পায়।" বাড়ীর কেহই তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। পরীক্ষার্থ সেই দিনই তাঁহার ভ্রাতারা এক ভয়ানক অপকর্ম করিয়া বসিলেন।

ব্রাহ্মণ বাহির বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে দিবানিদ্রা যাইতেছিলেন। বৈকাল বেলা শ্যালকেরা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, তিনি তখনও নিদ্রিত। একজনের হস্তে ছিল একখানা ধারাল ছোরা। তিনি তাহা দ্বারা তৎক্ষণাৎ ভগ্নীপতিকে নিহত করিলেন। তখনই রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল। বিছানা রক্তে রঞ্জিত হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া সেই গুণধর

ভালকেরা আতঙ্কে চুপি চুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বৈকালবেলা রোজই ব্রাহ্মণ বাড়ীর ভিতর যাইয়া জলযোগ করিতেন। এদিন বারবার খবর পাঠান হইল; কিন্তু তিনি আসিলেন না এবং যাহাকে পাঠান যায়, সেই আসিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলে না। ইহাতে ব্রাহ্মণীর প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি উদ্বিগ্ন মনে নিজেই বাহির বাড়ী গেলেন এবং সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া এই ভীষণ কাণ্ড দর্শনে অধৈর্য হইয়া, স্বামীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—"মা আপদুদ্ধারিণী! কি দোষে তোমার সেবকের আজ এ দুর্দশা হইল! জানি না, কি অপরাধ করিয়াছি। তোমার সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা কর, মা, কৃপাময়ী। কৃপা করিয়া আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও।" ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি তখনও মনে মনে বলিতেছিলেন—"ভাল-মন্দ নাহি জানি, যা' করেন মা আপদুদ্ধারিণী।"

এমন সময় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন পরমাসুন্দরী এক রমণী। তিনি কোমল স্বরে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—"মা! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আপদুদ্ধারিণী দেবী ভগবতীর নাম স্মরণ করিয়া এখনই এক ঘটি জল লইয়া আইস এবং দেবীর শ্রীচরণে তোমার স্বামীর জীবন প্রার্থনা করিয়া সেই জল তাহার শরীরে ছিটাইয়া দাও। তাহা হইলেই তোমার স্বামী পুনর্জন্ম লাভ করিবে।" এই কথা শুনিয়া তখনই তিনি পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া স্বামীর দেহে ছিটাইয়া দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ জীবিত হইলেন। ব্রাহ্মণী স্বামীর জীবনলাভে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। ইহার পর তিনি সেই অপরূপ রূপবতী মহিলার খোঁজ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বড়ই আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং ভাবিলেন,—কে এই রমণী।

ব্রাহ্মণীর পিত্রালয়ে থাকিবার সাধ মিটিয়া গেল। তিনি সত্বরই স্বামী ও ছেলেটি সহ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী আসিয়া তিনি খুব সমারোহে আপদুদ্ধারিণী ব্রত করিলেন।

দেবীর কৃপাতেই যে ব্রাহ্মণের এরূপ ধনসম্পত্তি লাভ হইয়াছে, নিহত হইয়াও তিনি পুনর্জীবিত হইয়াছেন এবং পরমানন্দে কালযাপন করিতেছেন, তাহা গ্রাম-গ্রামান্তরে সকলেই বুঝিতে পারিল। দিকে দিকে দেবীর মাহাত্ম্য

প্রচারিত হইতে লাগিল। নানা স্থানের হিন্দু রমণীগণ ভক্তি সহকারে আপদুদ্ধারিণী ব্রত করিতে লাগিলেন।

—ঢাকা, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী সংগৃহীত, অর্চনা, পৌষ, ১৩৩৪

মন্তব্য

জলচল শব্দের অর্থ জল আচরণীয়, অর্থাৎ যে জাতির হাতে ব্রাহ্মণ জল পান করিতে পারে। বৌদ্ধ জাতকের যুগ হইতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের গল্প ভারতীয় লোক-সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বাংলার ব্রতকথায় তাহারই ঐতিহ্যের ধারা সক্রিয় আছে। শ্যালক কর্তৃক ভগ্নীপতিকে হত্যা করিবার কাহিনীর মধ্যে জামাতার সঙ্গে পরিবারের যে প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষমূলক সম্পর্ক, তাহার ইঙ্গিত প্রকাশ পাইয়াছে। জামাই ঠকানোর মধ্যে তাহাই একটু লঘু আকার ধারণ করে মাত্র। মৃতের পুনর্জীবন দান ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। জল দ্বারা এখানে পুনর্জীবন দান করা হইয়াছে। ইহাকে ইংরাজীতে Water of Life (E 80) অভিপ্রায় বলা হয়। ইহাতে সুযোগ ও ভাগ্য (Chance and Fate N.) অভিপ্রায়টিও ব্যক্ত হইয়াছে।

আকুলী-সুকুলী

সকল দেব-দেবীই মর্ত্যলোকে পূজা পাইয়া থাকেন; কিন্তু আকুলী ও সুকুলী দেবীর অর্চনা নরলোকে হয় না। তাঁহারা দুই ভগ্নী যে দেবী ভগবতীর কন্যা ও তাঁহাদের মাহাত্ম্যও যে অপরাপর দেব-দেবী অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, তাহা, এমন কি, তাঁহাদের নাম পর্যন্তও মনুষ্যমাত্রই অবগত নহে; এই কারণে তাঁহারা বড়ই দুঃখিতা।

একদিন তাঁহারা এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা মা ভগবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"মনুষ্যলোকে এক অতি দরিদ্র ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ আছেন। তোমরা সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর মনে কোন উপায়ে তোমাদের প্রতি ভক্তি জন্মাইতে পারিলে ব্রাহ্মণ-পত্নী তোমাদিগকে অর্চনা করিবেন এবং সেই সময় হইতেই তোমরা নরলোকে পূজা পাইতে থাকিবে। ইহা বলিয়া তিনি তখনই তাঁহাদিগকে সেই ব্রাহ্মণের নাম-ধাম বলিয়া দিলেন। তাঁহারা সত্বরই ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক মর্ত্যলোকে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

একদিন দিবা দ্বিপ্রহরের পর সেই ব্রাহ্মণ আহার করিয়া বিশ্রামের ইচ্ছায় গৃহে প্রবেশ করিবার সময় দুইটি পরম রূপলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনারা? কোথা হইতে এবং কি জন্যই বা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাটীতে এমন সময় পদার্পণ করিয়াছেন?" ইহার উত্তরে আগন্তুকদের একজন কোমল কণ্ঠে বলিলেন,—"আমাদের বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক নাই; আমরা অতিথি, ক্ষুধায় ও পথশ্রমে কাতর হইয়া, বৃথা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া, অবশেষে তোমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। শীঘ্র আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দাও। ক্ষুধার জ্বালায় আমরা অস্থির। শুনিলাম যে, তুমি বড় ধার্মিক; অতিথি-সৎকার করিয়া পুণ্য অর্জন কর।" ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে সে নারী নহেন। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন,—"আপনারা যখন এই দরিদ্রের

বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন সাধ্যানুসারে আপনাদের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। আপনারা বারেন্দায় উঠিয়া বসুন।" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বারেন্দায় দুইখানা আসনে বসাইয়া, রান্নাঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া ব্রাহ্মণী নিজের আহারের উদ্যোগ করিতেছেন। তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন,—"দুইটি অতিথি উপস্থিত, অতএব আগে এই অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা অতিথি-ভোজন হউক। পরে তুমি রান্না করিয়া আহার করিও।" গৃহিণী এ প্রস্তাবে অসন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু স্বামীর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া স্বীয় আহার্য দুইখানা থালায় সাজাইতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ অতিথিদিগকে গৃহের মধ্যে লইয়া দুইখানা আসনে বসাইলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। অন্নে হাত দিয়াই অতিথিদের একজন ব্রাহ্মণীকে বলিলেন,—"কিছু গরম ভাত নিয়া আইস; এগুলি বড়ই ঠাণ্ডা।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণী কহিলেন—"হাঁড়িতে ভাত আর নাই। এখন রান্না না করিলে গরম ভাত মিলিবার আর উপায় নাই। আপনারা আহারে বসিয়াছেন ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। অতএব, এই অন্নই ধীরে ধীরে আহার করিতে থাকুন; আমি শীঘ্রই আবার ভাত রাঁধিয়া দিই।" এ কথার উত্তরে সেই রমণী বলিলেন—"আর রান্না করিতে হইবে না। হাঁড়িতেই গরম ভাত আছে, নিয়া আইস।" ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন ও যন্ত্রচালিতের ন্যায় রান্নাঘরে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, বাস্তবিকই হাঁড়িভরা ভাত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণী ভাতে হাত দিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, উহা বেশ গরম; যেন এইমাত্র রান্না করা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা উভয়েই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সেই অন্ন তাহাদিগকে পরিবেশন করা হইল। তাঁহারা আহার করিতে লাগিলেন। ভোজনকালে তাঁহারা নানারূপ তরকারি, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন ইত্যাদি চাহিয়া ব্রাহ্মণীকে রন্ধনগৃহে পাঠাইতে লাগিলেন। তিনিও সেই সমুদায় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন ও সমস্ত দ্রব্যই পরিবেশন করিয়া অতিথি ভোজন করাইলেন। তাঁহারা আহার অন্তে আচমন করিয়া বারান্দায় বসিয়া তাম্বূল চর্বন করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই দুই অতিথি নিশ্চয়ই মানবী

নহেন ; ছদ্মবেশে দুই দেবী তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"আপনারা দয়া করিয়া আপনাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানে আমাদিগের বিস্ময় দূর করুন।" ইহা শুনিয়া অতিথিদের একজন বলিলেন, "ব্রাহ্মণ আমরা দুই ভগিনী, দেবী ভগবতীর কন্যা। আমাদের নাম আকুলী ও সুকুলী দেবী।" তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ নিজেদের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আকুলী দেবী বলিলেন—"ভক্তি সহকারে আমাদের পূজা করিলে, ও চিরকাল আমাদের প্রতি তোমাদের শ্রদ্ধা থাকিলে তোমরা আজীবন সুখে থাকিবে।" ব্রাহ্মণী ব্রতের নিয়মাদি জিজ্ঞাসা করায় সুকুলী দেবী তাঁহাকে তাহা সবিস্তারে বলিলেন। আবার তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া দেবীরা অন্তর্হিতা হইলেন।

যথা সত্বর ব্রাহ্মণী ব্রত করিলেন। তিনি স্বামী-পুত্রাদি সহ সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এক প্রতিবেশিনী নারী ব্রাহ্মণীর প্রথম ব্রতের দিন তাঁহার আহ্বানে ব্রত-স্থানে না যাওয়ার পর হইতেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। ব্রত-স্থানে না যাওয়ায় বড়ই অন্যায় হইয়াছে ও দেবীদিগের কোপেই রোগ-যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে মনে করিয়া, বধূ ব্রত মানস করিলেন। ইহার পরই তিনি রোগমুক্ত হইলেন ও ভক্তিসহকারে ব্রত করিলেন।

দেবীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দরিদ্র গৃহস্থ ললনাগণ ব্রত করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ধনিগৃহের রমণীরা দেখিয়া শুনিয়াও এ ব্রত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন না। ইহাতে দেবীরা চিন্তিত হইলেন ও উভয়ে পরামর্শ করিয়া এক উপায় স্থির করিলেন।

একদিন এক সওদাগর বাণিজ্য করিয়া দেশে ফিরিলেন। ধন-রত্নাদিপুর্ণ নৌকা নদীর ঘাটে লাগান হইল। তাঁহার আগমনবার্তা বাড়ীতে পাঠান হইল। এই সুসংবাদ পাইয়া সওদাগরের স্ত্রী আহ্লাদিত মনে অন্যান্য মহিলা-গণের সহিত ঘাটের দিকে গমন করিলেন। তিনি ঘাটে উপস্থিত হইবা মাত্রই সওদাগর, মাঝি-মাল্লা ও জিনিসপত্রাদিসহ নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। ইহা দেখিয়া সওদাগরের স্ত্রী কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সকলেই ভাবিল যে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল। বিনা বাতাসে যে কিরূপে নৌকাখানি জলে ডুবিয়া

গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। খবর পাইয়া অনেকেই সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টাও করিল; কিন্তু কেহই সওদাগর প্রভৃতিকে উদ্ধার করিতে পারিল না। এমন সময় দৈববাণী হইল,—সওদাগরের পত্নী আকুলী ও সুকুলী দেবীর ব্রত মানস করিলে সওদাগর ও মাঝি প্রভৃতি সহ নৌকা আপনিই ভাসিয়া উঠিবে। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া সওদাগরের স্ত্রী ব্রত মানস করিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌকাখানা ভাসিয়া উঠিল। নৌকায় উপবিষ্ট সওদাগর স্বীয় স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া, আনন্দিত মনে তীরে পদার্পণ করিয়া, তাঁহার সম্মুখীন হইয়া হাসিমুখে তাহাকে কুশল প্রশ্নাদি করিলেন। পত্নী পতিকে পাইয়া ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। সওদাগর স্বীয় স্ত্রী ও অন্যান্য সকলের সহিত আনন্দে বাড়ী পঁহুছিলেন।

সত্বরই সওদাগরের স্ত্রী খুব ঘটা করিয়া ব্রত করিলেন। সওদাগর স্ত্রী পুত্রাদিসহ সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধনীরগৃহের মহিলাগণও এই ব্রত করিতে লাগিলেন।

—ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'অর্চনা' ১৩৩০

মন্তব্য

লৌকিক দেবদেবীগণ সর্বদাই নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকেন। সেই সূত্রেই আকুলী, সুকুলী ভগবতী বা দুর্গার কন্যা বলিয়া দাবী করিয়াছেন। কাহিনীটি দৈব ও ভাগ্য মূল অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। অবহেলিত দৈবের প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার বিষয়ে ইহার সঙ্গে সত্যপীরের পাঁচালীর কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। সম্পদলাভের জন্য দৈবকে প্রসন্ন করিবার অভিপ্রায়ও ইহাতে বর্তমান রহিয়াছে।

কৃতজ্ঞ দেবতা

এক ছিল গৃহস্থ। সে ছিল অতি দরিদ্র। সংসারে এক স্ত্রী ভিন্ন তাহার আর কেহই ছিল না। গৃহস্থ 'কামলা' খাটিয়া কোনরূপে সংসার চালাইত। সন্তান হইবার বয়স গেল, তবু গৃহস্থের স্ত্রীর কোন সন্তান জন্মিল না। তাই সকলে তাহাকে 'বাঁঝা' বলিয়া ধারণা করিল। এ সংসারে সন্তান লাভের ইচ্ছা সকলেরই সমান। একে গরীব, তাহাতে আবার নিঃসন্তান; তাই দম্পতির মনে শান্তির লেশও ছিল না।

কয়েক বৎসর পর গৃহস্থের স্ত্রী গর্ভবতী হইল। স্বামি-স্ত্রী অতিশয় খুশি হইল। তাহারা মনে করিল যে, দেবতার কৃপায় তাহাদের ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়াছে। যথাসময়ে গৃহস্থের স্ত্রী একটি সুসন্তান প্রসব করিল। পুত্রের চাঁদ-মুখ দর্শনে দম্পতির আহ্লাদের সীমা রহিল না। নিজেরা না খাইয়া তাহারা সন্তানকে খাওয়াইত। ছেলের কান্না শুনিলে, তাহারা দিশাহারা হইয়া পড়িত। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। শিশুটিও ক্রমে বড় হইতে লাগিল।

কালক্রমে গৃহস্থ ইহলীলা সংবরণ করিল। গৃহস্থের স্ত্রী একমাত্র বালক পুত্রকে লইয়া বিষম মুস্কিলে পড়িল। তাহাদের দিন চলা ভার হইয়া পড়িল। স্বামীর ভিটায় বাস করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, পেটের দায়ে অত্যল্প কাল মধ্যেই পুত্রসহ সে তাহার ভাইদের সংসারে গেল। ভ্রাতারা তাহাকে বলিল যে, ছেলের সহিত সে তাহাদের সংসারে আসিয়া ভালই করিয়াছে। ছেলেটির বড় বেশী কাজ করিতে হইত না। বাড়ীর রাখাল কোনদিন অনুপস্থিত থাকিলে, সেইদিন তাহাকে গরু চরাইতে হইত। আর প্রত্যহ সময় মত মামাদের জন্য ক্ষেতে আহার্য দ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইত। ভাইয়েরা ভগ্নী ও ভাগিনেয়কে অনাদর করিত না; কিন্তু বধূদের কেহই তাহাদিগকে দেখিতে পারিত না। ছেলেটি মামীদের প্রদত্ত কদর্য খাদ্যের যতটা পারিত গলাধঃকরণ করিত; বাকীটা ফেলিয়া দিত। সে সর্বদাই তাহাদের বাক্যবাণে জর্জরিত হইত। মাতা নিজের জ্বালা-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিত, পুত্রকে সান্ত্বনা দিত ও সময় সময় চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। ভগ্নী ভ্রাতৃবধূদের কুব্যবহারের কথা

ভ্রাতাদিগকে কখনও বলিত না এবং ছেলেকেও একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু বধূরা স্বামীদের নিকট ননদ ও ভাগিনেয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলিত। গৃহস্থদেরও ভগ্নী, ভাগিনেয়ের প্রতি আদরের মাত্রা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। একদিন ছেলেটি মামাদের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া একটি ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইল, যেন কেহ বলিতেছে—"কে হে তুমি, এ সব উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছ? আমি অনাহারে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। ঐ সমস্তই আমার আহারের নিমিত্ত এখানে রাখিয়া যাও।" বালক বলিল—"এ সব আমি মামাদের নিমিত্ত লইয়া যাইতেছি, তোমাকে দিলে তাহারা খাইবে কি?" ইহার উত্তরে ছেলেটি শুনিল—"তোমার মামারা ত বাড়ী গিয়া দুপুর বেলায়ও খাইবে; ওগুলি আমাকেই দাও। তোমার মঙ্গল হইবে। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করা মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য।" বালক নিজে ক্ষুধায় কাতর থাকিলেও মামাদের খাদ্য হইতে এক মুষ্টিও সে কখনও মুখে দিত না। কিন্তু অপরের অনাহার কষ্টের কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত বিগলিত হইল, সে কর্তব্য-ভ্রষ্ট হইল। তখন সে বলিল—"অন্নব্যঞ্জনাদি রাখিব কোথায়?" উত্তর হইল —"রাখিয়া যাও এই বিন্না ছোবের কাছে।" বালক তথায় খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। ছেলেটি একাদিক্রমে তিন চারি দিন আহার্য দ্রব্যাদি উক্ত স্থানে রাখিয়া আসায় তাহার মামাদের ঐ কয়দিনই সকাল বেলায় খাওয়া হইল না। তাহারা প্রতিদিনই তাহাকে খাওয়ার জিনিস না লইয়া যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে ভাল-মন্দ কিছুই বলিত না। ক্রমান্বয়ে তিন চারি দিন ক্লেশভোগ করিয়া মামারা রাগে অগ্নিশর্মা হইল। তাহারা একদিন দ্বিপ্রহরে বাড়ী আসিয়া ভাগিনেয়কে তিরস্কার করিল ও প্রহারে জর্জরিত করিল এবং তাহাকে ও তাহার মাতাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল।

মাতাপুত্র কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল এবং কিয়ৎকালের মধ্যেই সেই ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি বড় গাছের তলায় উপবেশন করিল। ছেলেটি মায়ের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তৃণ-শয্যায় শয়ন করিল। মাতা বসিয়া বসিয়া ছেলের শরীরে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কি করিবে, কোথায় যাইবে, ইত্যাদি চিন্তা করিতে লাগিল। উভয়েই নীরবে অবস্থান করিতে লাগিল। হঠাৎ সেই ঝোপের নিকট হইতে কে যেন ছেলেটিকে সম্বোধন করিয়া

বলিল,—"হে বালক! তোমাদের দুর্গতির কারণ আমিই। কিন্তু তোমাদের দুঃখের অবসান অচিরেই হইবে। এইখানেই তোমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাক এবং সন্ধ্যার পর বিল্ব ছোবাটির সন্নিকটস্থ মাটি খুঁড়িয়া সাতটি ঘটি উঠাইও। দেখিতে পাইবে সাতটিই মোহর পূর্ণ। সমস্ত মোহরই তুমি লইও এবং রাত্রির মধ্যেই মায়ের সঙ্গে নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিও।" ইহা উভয়েই শুনিল এবং সন্ধ্যার পর দুইজনে মিলিয়া, কথিত স্থান খুঁড়িয়া, সাতটি মোহরপূর্ণ ঘটি পাইয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

গৃহস্থের পুত্রকে এখন আর বালক বলা যায় না। সে এখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে এবং প্রাসাদতুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তাহাতে মায়ের সহিত বাস করিতেছে। তাহার বাড়ী কর্মচারী ও দাসদাসীতে পূর্ণ; সে এখন বহু ধানের মালিক। এখন সে সকলের সম্মানের পাত্র, প্রতিপত্তি তাহার যথেষ্ট, সে পরম সুখে কাল যাপন করে, সে এখন নূতন জমিদার বলিয়া পরিচিত। তাহার বাড়ীর সম্মুখে একটি পুষ্করিণী খনন করা হইবে এবং নানা স্থানে জানান হইয়াছে যে, মজুরদিগকে প্রতি সাঝি মাটীর মজুরি বাবদ সাঝি ভরিয়া কড়ি দেওয়া হইবে।

এদিকে নূতন জমিদারের মামাদের অবস্থা অতিশয় হীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা উক্ত সংবাদ পাইয়া কড়ির আশায় মাটী কাটিতে আসিল। বাড়ীর সরকার নূতন জমিদারের আদেশানুসারে, যে কেহ মাটী কাটিতে আসিত, তাহাকেই কাজে লাগিবার পূর্বে মনিবের নিকট উপস্থিত করিত। তাহার মামাদিগকেও তাহার নিকট উপস্থিত করিল। নূতন জমিদার তাহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, কিন্তু তাহারা কেহই তাহাকে নিজেদের ভাগিনেয় বলিয়া চিনিতে পারিল না। নূতন জমিদার সরকারকে বলিল যে, তাহাদের মাটী কাটিতে হইবে না। তাহাদের পরিধানের নিমিত্ত সত্বর নূতন কাপড় আনিতে ও স্নানের যোগাড় করিয়া দিতে তাহাকে আদেশ দিলেন। তাহারা সন্দেহপূর্ণ চিত্তে স্নান করিয়া কাপড় পরিধান করিবা মাত্রই অন্দর-মহলে নীত হইল। তখন তাহারা কিছু ভীত হইল। নূতন জমিদারের সহিতই তাহারা আহার করিতে বসিল। কথাপ্রসঙ্গে ভাগিনেয় মামাদিগকে নিজ পরিচয় দিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিল। তখনই ভগ্নী আসিয়া ভাইয়েদের সহিত দেখা করিল। ভাগিনেয় ও ভগ্নীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহারা বড়ই লজ্জিত হইল। কেন না, তাহারা ভাগিনেয়কে প্রহার করিয়া ও ভগ্নীকে তিরস্কার

করিয়া নিজেদের বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল। আহারান্তে সেই দিনই নূতন জমিদার মামীদিগকে নিজ বাটীতে আনিল। মামীরা ভাগিনেয়ের বাটীতে আসিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া পরম পুলকিত হইল। তাহারা তাহাকে খুব আদর যত্ন করিতে লাগিল। এখন ভাগিনেয়েরও সে অবস্থা নাই, মামীদেরও সে কুভাব নাই। নিজেরা রাঁধিয়া সকল ভাল জিনিসই ভাগিনেয়কে খাওয়াইতে পারিলেই এখন মামীরা খুশি হন।

একদিন নূতন জমিদার মাতুলদের সহিত খাইতে বসিয়াছে। মামীরা পরিবেশন করিতেছে। তাহারা ভাল জিনিসের বেশীর ভাগই ভাগিনেয়ের পাতে দিতেছে। যখন সম্পূর্ণ দুধের সরই তাহার পাতে দেওয়া হইল, তখন সে মৃদুহাস্য করিয়া বলিল—

"সেই মামা সেই মামি, পুকুর পারে ঘর,
ভাগ্নেকে দুধ দিতে হাতে রাখছ সর?"

মামারা এই কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় ভাগিনেয় মামীদের মন্দ ব্যবহারের কথা বলিল। শুনিয়া মামী ও মামাদের সকলেরই লজ্জায় মাথা হেঁট হইল। কিন্তু নূতন জমিদার ও তাহার মাতা নানা মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে তুষ্ট করিলেন।

মাতা এক শুভদিনে শুভলগ্নে পুত্রকে বিবাহ করাইয়া এক অতি সুন্দরী বধূ ঘরে আনিলেন। তাঁহার সকল সাধ পূর্ণ হইল। ক্ষেত্রঠাকুরের কৃপায় তাঁহাদের কোন দুঃখই রহিল না। বৃদ্ধা জননী পুত্র, পুত্রবধূ সহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

—ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'অর্চনা' আষাঢ়, ১৩৩০

মন্তব্য

ভাগ্যের বিপর্যয় (L Reversal of Fortune) ইহার মূল অভিপ্রায়। 'দেবতার কৃতজ্ঞতা'ও ইহার অন্যতম অভিপ্রায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনে মাতুল ও মাতুলানীর সঙ্গে দরিদ্র ও নিরাশ্রয় ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাস্তব পরিচয়ের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

সম্পদের বার ভাই

এক রাজা আর এক রাণী। রাজার আজলা ধন-দৌলত দালান-কোঠা, মানুষ জন। রাজারাণী সুখে আছেন—থাকেন—এমন ভাবে দিন যায়। বৈশাখ মাস। রাণী সম্পদ-নারায়ণ ব্রত কর্তে ইচ্ছা কল্লো। রাণী ত্রিশটি সুতার নাল, পান-সুপারী, ক্ষীরের লাড়ু, ফুলদূর্বা, তুলসী, কাঁচা গুঁড়ির পিঠা দিয়া আগডী (আগা) পাতে ব্রত পাতিলেন। রাজা কিছুই জানেন না, অন্দরে আসিয়া দেখেন "আগডী পাতে" ব্রত পাতা, দেখে রাজা চটিয়া লাল, রাজার রাগ—সকলে ভয়ে কম্পমান। রাজা উঠাইয়া ফেলিয়া টেলিয়া দিলেন এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "আমার রাজবাড়ীতে এ খুদকুঁড়ার ব্রত কেন? আমার অভাব কিসের? সোনা রূপা যা ইচ্ছা তা দিয়া বর্ত হইতে পারে, কেন কেবল দূর্বা তুলসী দিয়া বর্ত কর্বো" ইত্যাদি। রাণীর ব্রত পণ্ড হল, রাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

সাতদিন যাইতে না যাইতেই রাজত্ব বন্ধ বিচার-আচার সয়সভা পলংপাট সব বন্ধ। উজীর-নাজির পাত্র-মিত্র সব রাজার রাজপুরী শূন্য করিয়া চলিল। আজ হাতীশালে হাতী যায়, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে। ধনে জনে মানে গুণে রাজার সেই আজলা রাজপাট শূন্য—রাজ্যের রাজশ্রী পলাইয়া গেল।

এখন রাজা আর রাণী এই নিঝুম রাজপুরীতে আছেন। রাজার রাজপাট ধূলায় লুটায়। সেই নিঝুম রাজপুরীতে আর তুইটি প্রাণী কেমনে থাকেন? তাঁরা মনে করলেন, চল, আমরা আমাদের মেয়ের বাড়ীতে যাই। যাওয়ার জন্য রাজা ও রাণী বাড়ী থেকে বেরুলেন। দেখেন চারদিক শূন্য। কেহ জিজ্ঞাসাটিও করে না। চলিতে লাগিলেন—কিন্তু কতক্ষণ চলিবেন, রাজা রাণীর হাঁটিয়া যাওয়া মোটেই অভ্যাস নাই, ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। লোকজন আসিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে—রাজা কাঁদেন, রাণী কাঁদেন। ক্রমে মেয়ের বাড়ীর নিকটে গেলেন, মেয়ের দাসীমহলে খবর গেল, ক্রমে মেয়ের কানে কথা উঠিল,—"আপনার পিতামাতা এসেছেন।" মেয়ে অবাক। "না তা হবে কেন, আমার বাপ রাজা, তিনি আসলে লোকলস্করে দেশ ভরবে, চতুর্দিক

কেবল রম্ রম্ ঝম ঝম করবে, কত দাসদাসী লোকজন বাদ্যভাণ্ড কত আসবে। কে আসছে কে জানে; তাকে ভিতর বাড়ীতে আসতে দিও না, বাহিরে বন্দোবস্ত করে দেও।"

রাজা ও রাণী মেয়ের উত্তর পাইয়া অবাক্; ভাবিলেন, "সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেহই নাই।" অগত্যা সেখানে আর জলগ্রহণ না করিয়া মেয়ের প্রদত্ত চাউল ডাইল মেয়ের বাড়ীতে গর্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। আসতে আসতে ভাবিলেন, "কি করি—একবার বন্ধুর বাড়ীটাও দেখে আসি।" তাঁহারা বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন, সেখানেও সেই উত্তর—"কোনখান হতে বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছে, তাকে বাহিরে খাইতে দেও।" রাজারাণী উত্তর শুনিয়া কিছুকাল বসিয়া কাঁদিলেন। কি করেন, 'সম্পদের বার ভাই, বিপদে কেহই নাই।' খাওয়া হল না, সেখানেই চাউল ডাইল গর্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, এখন করি কি? অগত্যা নিকটবর্তী এক বাদশাহের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া বাদশাহের দরবারে গেলেন। বাদশাহের দরবারে পাত্রমিত্র সব বসিয়াছেন। রাজা নিবেদন করিলেন, "আমি ও আমার স্ত্রী বাদশাহের সরকারে থাকিতে চাই। আমি সেরেস্তায় লেখাপড়া করব ও আমার স্ত্রী অন্দরে কাজকর্ম করবে।" বাদশাহ্ তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য করিলেন।

রাজা সেখানে কাজকর্ম করেন, রাণী ঘর লেপেন, উঠান ঝাড়ু দেন, বেগম যখন যাহা আদেশ করেন, তাহা পালন করেন—এই তাঁর কর্ম। আছে—থাকে—খায়, এইরূপ কয় দিন যায়। এক দিন বেগম রাণীকে ডেকে বল্লেন, "আমার এই অলঙ্কারগুলি পুকুর থেকে পরিষ্কার করে নিয়ে আয়"—এই বলিয়া বাটাভরা সোনার অলংকার বাহির করিয়া রাণীর হাতে দিলেন, রাণী ধুইবার জন্য ঘাটে লইয়া গেলেন। সবগুলি অলংকার ধুইয়া শেষ করিয়াছেন, এমত সময় এক রাঘব বোয়াল বাটাসহ অলংকারগুলি গিলিয়া গভীর জলে চলিয়া গেল। রাণী ভয়ে অস্থির, কি করে উপায় নাই। রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়া বেগমকে জানাইল, বেগম রাণীকে চোর ধাওর ইত্যাদি ভাষায় গালি গালাজ করিতে লাগিল এবং বাদশাহ্ আসিলে তাহার গর্দান লইবে বলিয়া ভয় দেখাইল। রাজা গ্রাম হইতে কাজ টাজ সারিয়া বাড়ী আসিলে রাণী তাহাকে বিস্তারিত জানাইলেন এবং তাঁহারা পলাইয়া যাওয়াই নিরাপদ মনে করিয়া পলাইয়া গেলেন।

রাজা, রাজ্যশূন্য রাজপাটশূন্য আজ এক বৎসর। আবার বৈশাখ মাস আসিতেছে। রাণী এবারও সম্পদ-নারায়ণ ব্রত কর্তে চাইলেন। রাজা কোন আপত্তি করিলেন না, গৃহে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া ব্রতের আয়োজন করিলেন। রাণী তখন দূর্বা তুলসী কাঁচাপিঠা লাড়ু করিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত ব্রত সমাপন করিয়া হাতে ডোর বাঁধিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার রাজশ্রী ফিরিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে চতুর্দিকে লোক-লস্কর, দাস-দাসী বাদ্য-ভাণ্ড কোথা হইতে আসিতে লাগিল; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া বাঁধিল, রাজ-ভাণ্ডার মণিমাণিক্যে ভরিয়া উঠিল, আবার রাজপুরী ধনে জনে উছলিয়া পড়ে; লোকলস্করে রাজপুরী অষ্টপ্রহর কম্পমান।

রাজা রাজ্য পাইয়া আবার কন্যার বাড়ী যাইতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যময় সাড়া পড়িয়া গেল—সকল ভাঙ্গিয়া যেন কন্যার বাড়ী ছুটিল। এবার জামাতা বাড়ীঘর সাজাইলেন--লোকজন আমন্ত্রিত হল। রাজা কন্যার বাড়ীতে গিয়া বলিলেন, "সম্পদের বার ভাই, বিপদের কেহ নাই। তোমার বাড়ীতে বিপদে পড়ে এসেছিলাম, তখন আমাকে বাহিরে খেতে দিয়েছিলে"—সেই চাউল ডাইল তুলিয়া দেখাইলেন। জামাতা লজ্জিত হইলেন। পরে বন্ধুকেও এইরূপ লজ্জা দিয়া আসিলেন।

এখন বাদশাহের বাড়ীতে চলিলেন। রাজ-অতিথি দেখিয়া বাদশাহ্ যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য জেলে নামিল—প্রথম ক্ষেপেই প্রকাণ্ড রাঘব বোয়াল। রাণী নিজ হস্তে মাছ কাটিতে চাহিলেন, কাটিয়া তাহার পেটেই অলঙ্কারসহ বাটা পাইলেন। অনন্তর রাণী বেগমের সঙ্গে দেখা করিলেন, অলঙ্কার সহ বাটা তাঁহাকে ফেরত দিলেন। দেখিয়া বেগম অবাক, "এযে আমার এক দাসী চুরি করিয়া পলাইয়াছিল, আপনি পাইলেন কেমনে?"

রাণী বলিলেন, "আমিই সেই দাসী, দৈব দুর্ঘটনায় পড়িয়া আপনার শরণাগত হই ও দাসীপনা কাজে নিযুক্ত হই, তখন পুকুরের এই রাঘব বোয়াল তাহা গিলিয়া ফেলে। আজ তাহা কাটিয়া এগুলি বাহির করিলাম ও আপনাকে দিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম, সম্পদের বার ভাই, বিপদে কেহই নাই।" রাণী কন্যার কথা, বন্ধুর কথা এবং বাদশাহের কথা আনুপুর্বিক সব বলিলেন। রাজার ব্রতভঙ্গের কথাও বলিলেন। তখন বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেমনে আবার রাজপাট ফিরে পেলেন?"

রাণী উত্তর করিলেন, "দুঃখে কষ্টে আবার সম্পদ-নারায়ণ ব্রত করেছি, তাতেই এই হারানো ধন প্রাপ্ত হইলাম। এই ব্রত করিলে নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রকের পুত্র হয়, যে যা কামনা করিয়া ব্রত করে, তার সে কামনা পূর্ণ হয়।

—মৈমনসিংহ, নরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'প্রবাসী' কার্তিক, ১৩১৬

মন্তব্য

Stith Thomson-এর Motif-Index-এ Extra-ordinary swallowing বা অলৌকিক গলাধঃকরণ নামক একটি অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে। বাংলার বহু লোক-কথায় রাঘব বোয়াল কর্তৃক স্বর্ণ অলঙ্কার গলাধঃকরণ এবং ইহার উদর হইতে তাহার পুনরুদ্ধারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্‌' নাটকের দুষ্মন্ত প্রদত্ত আংটি রোহিত মৎস্য কর্তৃক গলাধঃকরণের বৃত্তান্ত অনুরূপ লোক-কথা হইতেই আসিয়াছে। রাঘব বোয়াল সর্বগ্রাসী মৎস্য; সুতরাং তাহার পক্ষে যে কোন বস্তুই গলাধঃকরণ অলৌকিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কুমীরের পেট হইতে অনেক সময় স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া যায়, কারণ, অলঙ্কার পরিহিতা নারীর শবদেহ কুমীর গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। রাঘব বোয়াল সম্পর্কেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

নিষ্ঠুরতার কথা

প্রত্যেক দেশেরই লোক-কথার একটি বৃহৎ অংশের অভিপ্রায় আত্মীয়-স্বজনের নিষ্ঠুর আচরণ। প্রত্যেক দেশেরই সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই তাহার মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়িয়া উঠে; সেইজন্য এই বিষয়ে সর্বত্র একটি সাধারণ নীতি অনুসরণ করা হয় না। এমন কি, সামাজিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক জীবনের সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়; সেইজন্য আত্মীয়-স্বজনের নিষ্ঠুরতার আচরণের মধ্য দিয়া এক যুগে সম্পর্কের যে বিশেষ রূপের পরিচয় প্রকাশ পায়, অন্য যুগেই হয়ত তাহার অস্তিত্ব থাকে না। খৃষ্টধর্ম প্রচারের পূর্বে ইউরোপে যখন বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখনকার সমাজে সপত্নীদিগের মধ্যে পরস্পর যে নিষ্ঠুর আচরণ প্রকাশ পাইত, কিংবা সতীনের সন্তানদিগের উপর যে রকম নির্মম অত্যাচারের কাহিনী রচিত এবং প্রচারিত হইত, খৃষ্টধর্ম প্রচারের পরে ইউরোপের সমাজ হইতে বহুবিবাহ প্রথা লুপ্ত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রেণীর কাহিনী সমাজ-জীবন হইতে আর জন্মলাভ করিবার সুযোগ পাইতে পারে নাই; কেবলমাত্র অত্যাচারিত মানবতার প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি বশতঃ এই শ্রেণীর কাহিনীগুলি সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনেও এই প্রকার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। সতীন, সৎমা এমন শাশুড়ী-ননদের সঙ্গেও পারিবারিক জীবনে যে সম্পর্ক একদিন ছিল, আজ আর তাহা নাই। সুতরাং ইহাদের আচরণমূলক কাহিনী প্রাচীন সমাজ-জীবনেরই বিশিষ্ট পরিচয় নির্দেশ করে, পরিবর্তিত সমাজ-জীবনের কোন পরিচয় তাহাতে পাওয়া যায় না।

বাংলা লোক-কথায় যে সকল নিষ্ঠুর আচরণমূলক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যাচারিত চরিত্র সতীনের সন্তান কিংবা বধূ, এবং অত্যাচারী-চরিত্র প্রধানতঃ সৎমা ও শাশুড়ী। ভাজের উপর ননদের অত্যাচারের কাহিনীও দুই একটি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ননদ বিবাহের পর পরের সংসারে চলিয়া যায় বলিয়া তাহার অত্যাচার অনেকটা সীমায়িত হইয়া থাকে। শাশুড়ী সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন বলিয়া তাঁহার

আচরণ যখন নির্মম হইয়া উঠিত, তখন বধূর জীবনে দুর্গতির অন্ত থাকিত না, সেইজন্য এই শ্রেণীর কাহিনী সংখ্যার দিক দিয়া অধিক। কিন্তু সতীনের পুত্র কিংবা কন্যার উপর সৎমার অত্যাচারের কাহিনীই সর্বাধিক শুনিতে পাওয়া যায়। বহুপত্নীক স্বামীর সংসারে কোন কোন সময় বিশেষ কোন পত্নী তাহার সতীনদিগের উপর অত্যাচার করিবার বিশেষ সুযোগ লাভ করে; কিন্তু এই অধিকার তাহার স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না; সেইজন্য এই শ্রেণীর কাহিনীতে সহজেই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়া থাকে। ভারতবর্ষ হইতে এই শ্রেণীর কাহিনী ইউরোপেও গিয়া প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন। এমন কি, বিমাতার অত্যাচরমূলক যে Cinderella-র গল্পটি সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, তাহাও যে একদিন ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্ত্য দেশে গিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কাহিনীর একটি শাশ্বত মানবিক আবেদন আছে। সবল অত্যাচারী এবং দুর্বল অত্যাচারিতের কাহিনী পৃথিবীর আদিম কাহিনী; বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্য দিয়া ইহার ধারা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে; সেইসূত্রে ইহাদের ব্যাপক প্রচার হইয়া থাকে। বাংলার লোক-কথায়ও এই শ্রেণীর কাহিনীই সর্বাধিক।

দুই একটি কাহিনীতে দরিদ্র পিতৃহীন ভাগিনেয়ের উপর মাতুলানীর অত্যাচারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু মাতুলের অত্যাচারের কথা নহে। বাংলার পারিবারিক জীবনের সম্পর্কগুলি গভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্যান্য বিভিন্ন রূপ, যেমন, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির মধ্য দিয়াও মাতুলানীর সঙ্গে এই সম্পর্কের বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে। লোক-কথাতেও তাহারই ছায়াপাত হইয়াছে মাত্র।

রমুনা-যমুনা

(ঢাকা জিলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার কথ্যভাষায় সংগৃহীত)

এক ভিক্ষুৎ গিরস্থ বামন আছিল। দুইটা মাইয়া থুইয়া বউটা মৈরা গেল। মা মৈরা যাওনে কন্যা দুইটা করে কি; ভিক্ষা-শিক্ষা করিয়া আওলা খায়, আলুনি খায়, ঢগর ঢগর পানি খায়। কেচ্‌রা ফুল কলমী ফুল, দিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের পুজা করে। সেই কন্যা দুইটার মধ্যে একটার নাম রমুনা, আর একটার নাম যমুনা। রমুনা বড়, যমুনা ছোট। রমুনা যে, সে বড় আব্বর। যমুনা যে, সে বড় চালাক। তারা বাপের কষ্ট দেখিয়া বড় দুঃখী ছিল। যমুনা রমুনারে কইল, 'দিদি যে পরে নিলেও নিব. যমে নিলেও নিব, লও বাবার আধসের চাউলের থিত্‌ কৈরা থুইয়া যাই। রাজা যে সত্য করুছে যার মুখ দেখ্‌বে তার নিকটেই কন্যা দান করবে, লও বাবারে হেই খানে পাটাই।" তখন তারা বাবারে কইল, "বাবা, তুমি ফোটাফাটি কইরা রাজবাড়ী যাও না?" তখন ভিক্ষুৎ বামন কইল, "মাগো, আমার তিন কাল গেছে, আর এক কাল আছে, আমি আর বিয়া করুম না।" মাইয়াগ কথায় শেষে রাজবাড়ীতে যাইতে স্বীকৃত হইল। তখন বামন রাজবাড়ী যাইয়া ভিক্ষা চাইল। ভাণ্ডারিরা ভিক্ষা আনিবার জন্য রাজার কাছে গেল। রাজা মশয় ভাণ্ডারিগরে কইল, "বামনরে বসবার দেগা।"

তারপরে রাজা মশয় আইয়া কইল, "ভিক্ষুৎ বামন, তুই বিয়া করস্ না? আমার মাইয়া বিয়া কর।" বামন কইল, "না, আমি করুম না; আমি বুড়া।" রাজা কইল, "না তুই বুড়া না, পর্বতের চুড়া। এ কথা কে শুনে কে জানে—তোর বিয়া করতেই হইব।" রাজার কথায় বামন বিয়া করল, বিয়া কইরা দুঃখের মধ্যে সুখ পাইল। তার সেয়ানা থাইয়া দুইটার কথা একেবারে ভুইলা গেল। মাইয়া দুটায়—

আওলা খায় আলুনি খায়
ঢগর ঢগর পানি খায়॥

কেচরা ফুল কল্‌মি ফুল দিয়া পুজা করে, তারপর লক্ষ্মীনারায়ণ সেই বামনেরে বাড়ীর কথা স্মরণ করাইয়া দিল, তখন ভিক্ষুৎ বামন রাজার কাছে কইল, "আমার দুইটা মাইয়া থুইয়া আইছি, আমি বাড়ী যামু।" রাজা মশয়

কইল, "হাপ যথায় লেঙ্গুরও তথায়।" বামন পাল্কী কইরা বাড়ী আইল, সঙ্গে অনেক লোকজন আইল। দেশের লোকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "রমুনা যমুনা ল, তোর বাপ বিয়া কইরা বউ লইয়া বাড়ীতে আইবার লইছে।" তারা কইল, "অনেক দিন ধইরা বাবা বাড়ীতে থেনে গেছে, রাজা কি কাইটাই মারল, না কি করল, বুঝলাম না। বাবা আমাগ ফালাইয়া এক দিনও কোনখানে থাকে না; সেই বাবা বার বছর ধইরা রইছে—আমাগ কথা একবার মনেও করে না।" তারপর বাড়ী আইলে তারা বলল, "বাবা, তুমি এতদিন ধইরা আমাগ ছাইড়া রইছ, আইজ একরাত্র বাড়ী থাক"। বামন কইল, "মাগ, আমি সেই সময় তো কইছিলাম, আর বিয়া করুম না।"

কন্যাগ কথায় বামন বাড়ী থাইকা রাজার বাড়ী থেনে যে লোকজন আইছে তার খাওয়ার যোগাড় করল। এদিকে লক্ষ্মীনারায়ণের ব্রতের ফলে রমুনা যমুনা একজনের পাতে ভাত দিতে একশ জনের পাতে পড়ত। এক জনের পাতে ডাইল দিতে একশ জনের ডাইল পড়ত। রাজার লোকজন বেশ পরিতুষ্ট হৈয়া খাইয়া রাজবাড়ী চইলা গেল। রাজা মশয় জিজ্ঞাস করল, "মানুষজন, তোরা ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী কেমনে খাইলি।" তারা কইল, "রাজা মশয়, ডরাইয়াও কমু, না, না ডরাইয়াও কমু, না নির্ভয়ে নির্ভয়ে কমু। তোমার রাজ-সরকারেও এত খাই নাই।" তারপর একমাসে কানাকানি, সাতমাসে জানাজানি, বামনের এক সুন্দর ছাওয়াল হৈল। মাইয়া দুইটা ভাইডারে লইয়া পুজা করে, এমন হামকুড়া হিক্‌ছে, বেবাক ফেইলা দেয়। কন্যারা কইল, ওগো সতাই, ভাইয়েরে টান দেও, আমরা পুজার সকল কাম করমু।" "কি। আমার বাপে পুজা করে কত হাতী দান করে, কত ঘোড়াদান করে, এগুলা কি লো, আওলা খায়, আলুনি খায়, ঢগর ঢগর পানি খায়"। রাজকন্যা পোলারে মাইরা ধইরা বাপের বাড়ী খবর দিল। সেইখান থিকা পাল্‌কী আইয়া পোলারে লইয়া গেল। যায় কতদিন, বামনের আর ভাল লাগে না। নিত্য ভিক্ষা করে, এই দিন বামন পোলা আন্‌বার গেল। রাজা কইল, "তর মাইয়া দুইটা বনে দে। তবে সে তুই পোলা নিতে পারবি। বামন মাইয়াগ কাছে রাজার কথা কৈল। মাইয়ারা কৈল, "পরে নিলেও নিব, যমে নিলেও নিব। ভাইয়েরে বাড়ী আন। আমাগ বনে দেও।"

তারপর বামন পোলা বাড়ীতে আন্‌ল। বামন মাইয়া দুইটারে কৈল, "মাগো, তোগ কি খাইবার মনে লয়? তারা কৈল, "ভাল মাছের ঝোল খাই

না, পিঠা-পরমান্ন কি, তা জানি না।" বামন ভিক্ষা করিয়া একটা বড় চিতল মাছ আনিল। ধান শুকাইয়া পরমান্ন করিল। সতাই দুই মাইয়ারে বিছানা কৈরা শোয়াইয়া থুইল; মনে ভাবতে লাগল, "ভিক্ষুৎ বামন বাড়ী আইতে আইতে তারা ত উঠব অনে। উইঠা পোড়াটা দেও, দুচারটা দেও এই কইবে। যেইরু লাইগা এত কৈরা খাওয়াইলাম, এত কৈরা দিলাম, ছাইকপালীরা এত খাইলেও উঠব অনে"। কন্যারা কৈল, "তুমি সতাই এত গাইল পার কে? যে পর্যন্ত আছি, করমুই। শেষে তুমি যা মনে লয়, কইর'।" তারপর ভিক্ষুৎ বামন বাড়ী আইল। রমুনা বাপেরে সন্ধ্যা করবার জন্য ছিপ-কোষা দিল। সতাই দেইখা কয়, "কিলো, ছাইকপালীরা দেখি উঠছে।" বামন কইল, "মা তোমরা শুইও না।" বামন দুই কন্যারে হাঁটুর উপর বসাইয়া আর না আর না করিয়া খাওয়াইল; কইল, "কাল মাসী-পিসীর বাড়ী যাইও।" তারা কইল, "যামু; যার কালে আছিল না মাসী-পিসী, সতাইর কালে দেখি মাসী-পিসী।" তারপর রাইত থাকতে উঠল, বাপেরে ডাক দিল। বাবা, "লও যাই মাসী-পিসীর বাড়ী।" তারপর লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা না করিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ইহাতে লক্ষ্মীনারায়ণ তাগরে অভিশাপ দিল, সেই শাপে তাগ' এই হইল—যে জিনিস লইতে চায়, তাই এক রকমে না এক রকমে নষ্ট হইয়া যায়।

তারা পথে যাইতে নল ভাঙ্গে জল খায়, ঘাগর ভাঙ্গে শাক খায়। কন্যা দুইটা বাবারে কইল, "আর ত হাঁটবার পারি না।" বামন কইল, "ঐ যে গুয়া গাছ দেখা যায়, ঐ তোগ' মাসীর বাড়ী, ঐ যে তালগাছ দেখা যায়, ঐ তোগ' পিসীর বাড়ী।" "আর বড় বেলা নাই, আমাগ' ঘুম আসে।" ইহা শুইনা ভিক্ষুৎ বামন সেই জঙ্গলে বইসা দুই হাঁটু পাইতা দিল, তার মধ্যে কন্যারা ঘুমাইল। বামন দুইটা ইটার চাকা তাগ' মাথার তলে দিয়া বাড়ী চইলা গেল। হাপে শোবায়, বাঘে ডাকে, তা হুইনা মাইয়া দুইটার ঘুম ভাঙ্গল। রমুনা কইল, "উঠছে রে যমুনা—দেখছে বাবারে সাপে খাইল, না বাঘে খাইল।" যমুনা কইল, "হাপেও খায় নাই, বাঘেও খায় নাই। বাবা সতাইর বুদ্ধে আমাগ' বনে দিছে।"

রাইত পোয়াইল। আইলারা ধান কাটবার লইছে; মাইয়া দুইটা কইল, "ভাই, আমাগ একুশ ছড়া ধান দিবা।" এই কথাটা কইবার পর তাগ' ক্ষেত আগুনে পুইড়া গেল। তারা তাগরে মাইরা, ধইরা, কিলাইয়া, গুতাইয়া খেদাইয়া দিল। একজন তেঁতুল পারবার লইছিল, তার কাছে গিয়া কইল,

"ভাই, আমাগ' কয়েক ছড়া তেঁতুল দিবা? আমরা লক্ষ্মীনারায়ণের পুজা করমু।" এই কথা কইবার পর তার সকল তেঁতুল কাপার কুনারা হইয়া গেল। সেখানেও কিল গুতা খাইল। তার পর কুমার বাড়ী গিয়া পাঁচটি কুচিমুচি চাইল। কুমারের পুইন ফুইট্যা গেল। কুমারও মাইরা ধইরা খেদাইয়া দিল। তারপর গেল কেচরা ফুল ও কলমী ফুল তুলতে। সে ছিল আটু জলে, সে গেল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে, সে গেল অথাই জলে—অতিকষ্টে তুলল। ফুল তুইলা লক্ষ্মীনারায়ণের পুজা করল। তারপর আইলার কাছে গেল। আইলারা কইল, "মা আইছ, ধন আইছ, যত পার হেত নেও।" তারা কইল, "নিবার আইছি না; দিবার আইছি, কাইল যে দিছ, তা শোধ দিবার আইছি।" তারা একুশ ছড়া ধান নিল। আইলারা সমস্ত ধান নিল। আইলারা সমস্ত ধান নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী গেল। ভিক্ষুৎ বামন মনে মনে কইল— "আমার যে দুইটা বউনা মাইয়া আছে, তারা লক্ষ্মীনারায়ণের পুজা করবার লইছে, এইতে এত ধান আমার বাড়ী আসছে।" তারপর তেঁতুলআলার কাছে গেল, সেও কইল, "মা আইছ, না ধন আইছ; যত পার হেত নেও।" তারা কইল, "নিতে আইছি না, দিতে আইছি; কাইল যে দিছিলা তা শোধ দিবার আইছি।" এই কইয়া তারা কয়েক ছড়া নিল। সেই সমস্ত তেঁতুল নিয়া ভিক্ষুৎ বামনের বাড়ী দিয়া আইল। এই মত কুমার বাড়ীতেও গেল। একটা চাইয়া সাতটা ঘটি পাইল। শেষে গেল কেচরা কলমী ফুল তুলতে। যে ছিল অথই জলে, সে আইল বুক জলে। যে ছিল বুক জলে, সে আইল আটু জলে। তারা অনেক ফুল তুলল। সেইখানে দেখল কি, মোহরের মাইট আছে। তারা সেইটা লইয়া বাপের কাছে গেল, বলল কি— "বাবা, আমাগো সোনার লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তি বানাইয়া দেও। সোনার খুচমুচি বানাইয়া দেও। একটা ভিন্ন কুইড়া ঘর বানাইয়া দেও। আমরা এইটাতে থাকমু।" তখন সতাই দেইখা কইল, "ও মা, এই কিলো! এই-গুলারে হাপেও খায় নাই, বাঘেও খায় নাই।" তখন তারা কইল, "কি সতাই, বক'কে? আমরা থাকবারও আসি নাই, খাইবারও আসি নাই। বাবার কাছে দুইটা কথা কইবার আইছি।"

তারপর তারা আবার বনে চইলা গেল। সেখানে গিয়া রাখাল পোলাপানেরে কইল, "আমরা একটা টাকা দিবনে, আমাগ' একটা কুইড়া ঘর বানাইয়া দেও।" তারা দেখাদেখি ঘর বানাইয়া দিল।

কয়েকদিন গেলে পর তারা নল ভাঙ্গে জল খায়, খাগর ভাঙ্গে শাস খায়। লক্ষ্মীনারায়ণের পুজা করে। এই ভাবে তাগ' দিন যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ মনে ভাবল, "আমি এই তাগরে কতদিন পহর দিমু।" তখন এক দেশের এক রাজারে শিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। হেই রাজার পাটরাণী ছিল সাত জন। তাগর জালায় রাজা সব সময় অস্থির থাকৃত। রাজা কইলেন, "সদ্ধিকারী, চল, আমরা শিকারে যাই।" সদ্ধিকারী বিয়া করে নাই। রাজার লগে শিকারে আইল। শিকারও হৈল না, শুকারও হৈল না। তখন তারা জল-পিপাসায় প্রাণে মরে। রাজা সঙ্গের লোকজনরে কইল, "দেখ, মানুষজন, আমাগ' দুইটা ঘোড়া নিয়া তোমরা দেখ, কৈ জল আছে। আমৃরা দুই জন এই জাগায় থাকি।" লোকজনে দেখল, অনেক দূরে চিল কাউয়া উড়তেছে। হেথানে গিয়া দেখে যে সামনে দিঘি, পাছে দিঘি, তার উপর দুই ঠ্যাং থুইয়া সোনার ভাং হাতে নিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বইসা আছেন। লোকজন জল আনতে লইছে, এমন সময় লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর বল্ল, "এই জাগায় জল পাবি না।" লোকজন কইল, "আমাগ রাজা ও সদ্ধিকারী জল পিপাসায় মরতেছে।" ঠাকুর কইল, "মরুক আর বাঁচুক, তাতে আমার কি? ঐ যে দেখ দুইটি কন্যা বইসা আছে, যারা মাথা চাওয়াচাওয়ী করতেছে, তাগর কাছে যাও। তারা তোমাগ' জল দিবে।"

তারা কন্যার কাছে গেল। মাইয়ারা জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা আচরণী, না অ-আচরণী।" তারা কইল, "আমরা আচরণী"। মাইয়ারা আড়াই হাত চুল মাইপা জল ভইরা দিল। ঐ জল রাজা খাইল, সদ্ধিকারী খাইল, পাইক-শাইক সকলে খাইল। যে জল-গারু, সেই জল-গারুই রইল। যে জায়গায় সেই জল-গারু পড়ল, সেখানে পুষ্করিণী হৈয়া গেল। রাজা ও সদ্ধিকারী কইল, "ঐ মানুষজন, তোরা কি জানস্।" তারা কইল, "আমরা কিছু জানি না। দুইটা কন্যায় আমাগ, জল দিছে।"

রাজা ও সদ্ধিকারী লোকজনের লগে সেই কন্যার কাছে গিয়া হাজির হইল। গিয়া দেখে তারা মাথা চাওয়াচাওয়ি করতেছে। তারা তাগর চুল ধইরা কইল, "তোরা ভূত না প্রেত?" তারা কইল, "আমরা ভূতও না, প্রেতও না।" ইয়া শুইনা রাজা ও সদ্ধিকারী ভিক্ষুৎ বামনরে দুই বাটী ভইরা টাকা দিয়া রাজা রমুনারে ও সদ্ধিকারী যমুনারে বিয়া করল। কয়েক দিন পর রমুনার পোলাপান হইল। রমুনা যা করৃত, সতীনগ' জালায় তা সামাই

হইত না। সদ্দিকারীর বউ যা করত, তা সাযাই হইত। একদিন রমুনা লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করবার লাইগা পোলা সতীনগ কাছে থুইয়া পূজার বেবাক আয়োজন কইরা লইছে, এমন সময় সাত সতীনে যুক্তি কইরা পোলা ছাইড়া দিল। পোলা পূজার জিনিস লণ্ডভণ্ড করতে লাগল। তখন রমুনা পোলারে মধ্যম থামে বাইন্ধ্যা পূজা করতে লাগল। রাজা আইসা দেইখা রাগে লাথি দিয়া পূজার জিনিস সকল ফালাইয়া দিল। এর লাইগা লক্ষ্মীনারায়ণের কোপে রাজার সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ নষ্ট হইয়া গেল।

রাজা সদ্দিকারীরে জিজ্ঞাস করল, "আমিও বৌনা কন্যা বিয়া করছি, তুমিও বৌনা কন্যা বিয়া করছ, তবে আমার কেন এত দুখ, তোমার কেন এত সুখ।" এই বইলা রাজা সদ্দিকারীরে কইল, "তুমি আমার বৌনা স্ত্রী আর তার পোলাটারে কাট, আমি তাগর্ রক্ত দিয়া স্নান করমু।" এই হুইনা সদ্দিকারী মহা বিপদে পড়ল। রাজা স্ত্রীরে ও পোলারে কাটবার জন্য সদ্দিকারীর হাতে দিল। স্ত্রী কইল, "এখন বা রাজার মতিচ্ছন্ন হইছে, পরে আপশোষ করব। এখন বিলাই কুত্তা কাইটা তার রক্ত দিয়া রাজারে ছান করাও।" সদ্দিকারী তাই করল। রাজা মনে করল, "তার স্ত্রীপুত্র গেছে।" এই দিকে বহু কষ্টে রাজার স্ত্রী ভিক্ষা কইরা খাইতে লাগল। একদিন তার পোলা গিয়া মাসীর সঙ্গে দেখা করল। মাসী বৈন্-পোরে চিনতে পাইরা পরম যত্ন করতে লাগল। লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুর পথে, ঘাটে, মাঠে রাজা যেখানেই যায়, তার নানা বিঘ্ন বিপদ ঘটাইতে লাগল, প্রাণে মারল না।

রাজা তখন মনে মনে ভাবতে লাগল, "যে দিন আমি লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা নষ্ট করছি, সেই দিন থেইকা আমার কপাল ভাঙ্গছে; আমি আবার ঠাকুরের পূজা করমু।" এই বইলা যখন রাজার সুমতি হইল, তখন ঠাকুরের কোপ গেল। রাজারও স্ত্রীপুত্রের কথা মনে হৈল। শেষে রাজা ভক্তিভরে ঠাকুরের পূজা কইরা হারাধন সকল পাইল।

অথন রাজা পূর্বসম্পদ্ পাইয়া মহা ধুমধামে পূজা করল। দেখাদেখি দেশময় পূজা প্রচার হৈল। —মহিমচন্দ্র নন্দী, ঢাকা, 'প্রতিভা', চৈত্র, ১৩২১ সাল

মন্তব্য

ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার নিকটই কন্যা সম্প্রদান করিব, রাজার সাধারণ এই প্রতিজ্ঞা এই কাহিনীর প্রথম অভিপ্রায়। সতীন

কন্যাকে বনবাসে পাঠাইবার দাবী ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহা হইতেই নিষ্ঠুরা বিমাতা (cruel step-mother, তুলনীয় Cinderella) অভিপ্রায়টিও আসিয়াছে। শত্রুর রক্তে স্নান করিবার অভিপ্রায়টিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তের প্রতি ঘাতকের সহানুভূতি এবং তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়া তাহাদের পরিবর্তে শৃগাল কুকুরের রক্ত দেখাইয়া দণ্ডাদেশ কারীকে ছলনা করাও ইহার অভিপ্রায়।

মধ্যম থাম (পৃ ৩৪০) অর্থ বাসগৃহের মধ্যস্থলের যে থামটির উপর ঘরের চালটি স্থাপিত থাকে। ইহারই নিম্নাংশকে মৃত্তিকা এবং গোময় দ্বারা লেপিয়া তাহার নীচেই সকল প্রকার লৌকিক দেবদেবীর পূজাচার পালন করা হয়। ইহাকে পূর্ববাংলায় মধ্যমপালা মধ্যম খুঁটি, মধ্যম থাম ইত্যাদি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। উড়িষ্যার শবর জাতির মধ্যে ইহার উপজাতীয় নাম 'গোমা'। তাহাদের মধ্যেও ইহারই চারিপাশে নানা উপজাতীয় দেবদেবীর পূজোপকরণ সাজাইয়া পূজা করিবার রীতি প্রচলিত আছে। বাসগৃহের চালের ইহা একটি প্রধান নির্ভর বলিয়া ইহা সর্বদাই ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হয়।

এখানেও রমুনার সন্তানের সংখ্যা সাত। লোক-শ্রুতিতে সাত সংখ্যাটিকে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়; পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও সাত সংখ্যাটি তাহা হইতেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সেইজন্য সাত ভাই, সাত বোন ও সাত সন্তানের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কাজ-কর্মচারী হিসাবে সন্ধিকারী বলিয়া কাহারও বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানে সন্ধিকারী অর্থে মন্ত্রী বলিয়া মনে হইতেছে। কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের কার্যে যাহারা সন্ধিস্থাপন করিবার জন্য মধ্যস্থতা করে তাহাদিগকেও বুঝাইতে পারে।

২

যমুনা ও ঝমুনা

এক গ্রামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দুইটি কন্যা জন্মিবার পর তাঁহার পত্নী পরলোকগতা হন। মেয়ে দুইটির নাম যমুনা ও ঝমুনা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণের একান্ত অনুরোধে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। নূতন গৃহিণী সংসারে প্রবেশ করিয়াই মেয়ে দুইটিকে নানারূপ যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা বিমাতার স্নেহের কণামাত্রও লাভ করিতে পারিল না। মেয়ে দুইটির সুখ-সুবিধার জন্য ব্রাহ্মণ পুনরায় বিবাহ করিলেন; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। কালক্রমে নূতন গিন্নী বৃদ্ধ পতিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। কন্যা দুইটির প্রতি পিতা আর ফিরিয়াও চাহেন না। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

যমুনা ও ঝমুনা ঈড়াত্রলী ব্রত করিত। ইহা তাহাদের বিমাতার সহ্য হইত না। একদিন ব্রতের পর গৃহিণী পতিকে বলিলেন,—"তোমার এই সৃষ্টিছাড়া মেয়ে দুইটির কাণ্ড-কারখানা আমি যে আর চক্ষে দেখিতে পারি না। কি যে এক অদ্ভুত ব্রত করে এরা। ব্রত ত নয়, ভাল খাওয়া-দাওয়ার একটা অছিলা মাত্র। এ ব্রত বৎসরে একদিন করিলে হয় না; প্রতি মাসেই, তাহাও আবার দুই দিন করা হয়। সন্তান হইবার বয়স আমার চলিয়া গেল। এরূপ ধারণা হয় যে. আমার সন্তান না হইবার কামনা করিয়াই এই ডাকিনীরা এই ব্রত করে। তুমি এ দুইটির শীঘ্র বিবাহ দাও; নতুবা যেখানে ইচ্ছা, সেখানে পার কর। এরা এখানে থাকিলে আমি সত্বরই বাপের বাড়ী চলিয়া যাইব। ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও।" নূতন গিন্নীর রূপমোহে অন্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন, "দুই একদিনে ত আর মেয়েদের বিবাহ দেওয়া যাইবে না। তা কালই আমি তাহাদিগকে বহুদূরে যে কোন স্থানে রাখিয়া আসিব, যেন তাহারা এখানে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পুনরায় উৎপাত করিতে না পারে। তোমার সুখের জন্য তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে, তাহাই আমি করিব।"

পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ মেয়েদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তোমাদের মাসী খবর পাঠাইয়াছেন, সেখানে তোমাদিগকে লইয়া যাইতে। তাহার নাকি তোমাদিগকে দেখিবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাদের কাপড়-চোপড় গুছাইয়া লও। এখনই রওনা হইতে হইবে।" তাহাদের মাসী কোথাও আছে বলিয়া তাহারা আর কখনও কাহারও নিকট শুনে নাই। আজ পিতার মুখে এই নূতন

কথা শুনিয়া কন্যারা আশ্চর্যান্বিত হইল। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে তাহারা পিতৃ-আদেশ পালন করিল।

ব্রাহ্মণ কন্যা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া দুই তিন দিন পথ চলিয়া শেষ দিবস সন্ধ্যার পূর্বে এক গ্রামে এক মঠের নিকট আসিয়া তথায় সে রাত্রিতে থাকিবার নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। মঠের সন্ন্যাসী তখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন। পথশ্রমে কাতর মেয়েরা পিতার হাঁটুতে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। সুযোগ বুঝিয়া পিতা মেয়েদের মাথা অতি সন্তর্পণে মাটীতে রাখিয়া, তাহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসীর আশ্রমের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া তথা হইতে তস্করের ন্যায় প্রস্থান করিলেন। যখন সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হইল, তখনও নৈশ অন্ধকারে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হয় নাই। সাধু পুরুষ বাহিরে আসিয়া নিদ্রিতা যমুনা ও ঝমুনাকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, এই দুইটি পরমা সুন্দরী কিশোরী এখানে আসিল কিরূপে। তিনি পুনর্বার ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয় জানিতে পারিলেন ও তাহারা জাগরিত হইলে বলিলেন,—"তোমরা তোমাদের বিমাতার চক্রান্তে পিতা কর্তৃক এই স্থানে পরিত্যক্ত হইয়াছ। তিনি মূঢ়ের ন্যায় তোমাদিগকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, কোন ভয় নাই তোমাদের। এখন হইতে আমি তোমাদিগকে কন্যাবৎ প্রতিপালন করিব। তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" তিনি তাহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন, যমুনা ও ঝমুনা তখন হইতে সন্ন্যাসীর আশ্রমে নিরাপদে বাস করিতে লাগিল।

ইহার অনেক কাল পর একদিন সেই দেশের রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধু কোতোয়াল পুত্র এই মঠের নিকটবর্তী বনে হরিণ শিকারে আসিয়া পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মঠে উপস্থিত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট জল চাহিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাদিগকে বসিতে আসন দিয়া, যমুনা ও ঝমুনাকে যাইয়া বলিলেন,—"তৃষ্ণার্ত্ত রাজপুত্র ও কোতোয়াল পুত্র এখানে উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদিগকে দুইজনকে দুইটি পাত্র দিতেছি। উভয়ে নিজেদের একগাছি করিয়া চুল ছিঁড়িয়া পাত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সুবাসিত শীতল জলে পাত্র দুইটি পূর্ণ করিয়া বিনীতভাবে তাহাদিগকে দিয়া আসিবে।" এই বলিয়া তিনি অপর গৃহ হইতে একটি সোনার ও একটি রূপার পাত্র আনিলেন এবং প্রথমোক্তটি রাজপুত্রকে জল দিবার নিমিত্ত যমুনার হস্তে ও দ্বিতীয়টি কোতোয়ালের পুত্রকে জল দানার্থ ঝমুনার হাতে দিলেন।

দুই ভগ্নী জলপাত্র হস্তে সন্ন্যাসীর সহিত রাজপুত্রদের নিকট আসিলেন। যমুনা রাজপুত্রকে ও ঝমুনা কোতোয়ালের পুত্রকে জলপাত্র দিলেন। দুই বন্ধুর তখন পাত্রের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহারা তখন কিশোরীদিগকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন নাই। জল পান করিতে উদ্যত হইয়া উভয়েই দেখিতে পাইলেন, জলের উপর চুল ভাসিতেছে। তাঁহারা উহা হাতে রাখিয়া, এক নিঃশ্বাসে জলপান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিলেন ও পরে চুল মাপিয়া দেখিলেন যে, দুইটিই দৈর্ঘ্যে আড়াই হাতের অধিক। তখন তাঁহারা সম্মুখে দণ্ডায়মানা সুন্দরী কিশোরীদ্বয়কে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই দীর্ঘ কেশ দুইগাছি নিশ্চয় ইহাদের। রাজপুত্র যমুনা ও কোতোয়াল পুত্র ঝমুনার সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তাঁহারা সন্ন্যাসীর সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সাধুপুরুষের ইঙ্গিতে দুই ভগ্নী নিজেদের গৃহে চলিয়া গেলেন। কথা-প্রসঙ্গে কিশোরীদের পরিচয় অবগত হইয়া সন্ন্যাসীর নিকট রাজপুত্র যমুনার ও কোতোয়াল পুত্র ঝমুনার পাণি প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাগ্রহে তাহাদের এ শুভ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সত্বরই খুব আড়ম্বর সহকারে তাঁহাদের বিবাহ হইল। বিবাহের পর দুই বন্ধু স্ত্রী সহ নিজেদের বাড়ী গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে রাজাও রাজপুত্র এবং কোতোয়াল পুত্রের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

অসীম সুখের অধিকারিণী হইয়া রাণী যমুনা ব্রতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ব্রত-ভঙ্গ করায় দেবী তাঁহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। দেবীর কোপে রাজ-সংসার ক্রমেই ছারেখারে যাইতে লাগিল। কোতোয়াল মহিষী ঝমুনা নিয়মিত ভাবে ভক্তিসহকারে ব্রত করিয়া আসিতেছেন। কোতোয়ালের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হইতেছে।

কালক্রমে রাজার পথের ভিখারী হইতে আর বড় বেশী বিলম্ব রহিল না। কোতোয়াল অগাধ ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। তাঁহার উন্নতিতে রাজার ঈর্ষা জন্মিল। রাজা বন্ধুকে শত্রুবৎ মনে করিতে লাগিলেন।

ঝমুনা মনে করিলেন যে, তাঁহার দিদি নিশ্চয়ই ব্রত করে না। তাহা না হইলে তাঁহাদের এরূপ দুর্গতি হইতে পারে না। একদিন তিনি তাঁহার দিদিকে নিজ বাটীতে লইয়া আসিলেন এবং কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, বাস্তবিক তিনি অনেক দিন হইতে ব্রত করেন না। ঝমুনা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ব্রত করাইতে সম্মত করাইলেন। যথাসময়ে রাণী ব্রত করিলেন।

রাজার দুঃখ-দুর্গতিও ক্রমশঃই দূর হইতে লাগিল। রাজারও সুমতি ফিরিয়া আসিল। বন্ধুর প্রতি ঈর্ষার ভাব আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তাঁহারা দুই বন্ধুতে পূর্বের ন্যায় আমোদ-আহ্লাদে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন যমুনা যমুনাকে কথায় কথায় বলিলেন,—"আমরা নিজেরা ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি; কিন্তু আমাদের পিতৃদেব আর্থিক অভাবে ও বিমাতার কটু বাক্যে না জানি কত কষ্ট পাইতেছেন। চল না বোন্, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" ঝমুনা দিদির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, উভয়ে উভয়ের পতির অনুমতি লইয়া যথা সত্বর লোক-লস্করাদি সহ উত্তম শকটে আরোহণ করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ বহুকাল পর কন্যাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। বিমাতা মেয়েদের ঘর-বরের কথা শুনিয়া সুখ অনুভব করিলেন। তিনি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতে লাগিলেন। কষ্ট বিদূরিত হইল। দুই ভগ্নী কিছুকাল পিত্রালয়ে বাস করিয়া একদিন পিতা ও বিমাতার নিকট বিদায় লইয়া নিজেদের বাটীতে চলিয়া গেলেন।

—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা, 'অর্চনা', ভাদ্র, ১৩৩১

মন্তব্য

ইহাতে নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক পিতা আত্মীয়ের অনুরোধে বিবাহ করিয়াছেন, সুতরাং পূর্ববর্তী কাহিনীটি অপেক্ষা যে তাহা অধিকতর আধুনিক, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মাসীর বাড়ী লইয়া যাইবার কথা বলিয়া বনে বিসর্জন করিয়া আসিবার বিষয় বাংলা লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। সন্ন্যাসীর আশ্রমের সম্মুখে বনবাস দিবার বিষয়টিও আধুনিক। মৈমনসিংহ হইতে সংগৃহীত কাহিনীতে দেখা যায়, নির্জন অরণ্যে এক বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে তাহাদিগকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিসর্জন দিয়া পিতা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাত্রি সমাগত হইতে হিংস্র বন্য পশু হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্বত্থ বৃক্ষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহাদিগকে তাহার কোটরে আশ্রয় দিয়াছিল। এই পরিকল্পনায় লোক-কথার গুণ অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। সুদীর্ঘ কেশ দেখিয়া কেশবতীর প্রতি অনুরাগ লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়।

নিষ্ঠুরা বিমাতা

এক সওদাগর ছিলেন। এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী পরলোকগতা হন। সওদাগরের তখনও যৌবনাবস্থা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে, নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে হইল। নূতন গিন্নী সতীন পুত্রকন্যাকে প্রথম দর্শনাবধিই মন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহা সওদাগরের নজর এড়াইল না। ছেলেমেয়ের মুখ চাহিয়া তিনি বাণিজ্যের নিমিত্ত দেশান্তর গমনে ক্ষান্ত রহিলেন।

অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। নূতন গিন্নীর যথাক্রমে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছে। ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া বহুদিন বাড়ী বসিয়া থাকায় সওদাগরের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে। পত্নীর কথায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বাণিজ্যে গমন করিতে হইল। রওনা হইবার পূর্বে স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান হইয়া, প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়ের খাওয়া-পড়ার সুবিধার জন্য মোদক বাড়ীতে গোপনে টাকা রাখিয়া যান। তিনি রওনা হইবার পর হইতেই নূতন গিন্নী সতীন পুত্র-কন্যার প্রতি দুর্ব্যবহারের মাত্রা দিন দিন বাড়াইতে লাগিলেন। সৎমায়ের আদেশে তাহাদিগকে সারাদিন মাঠে মাঠে ছাগল-ভেড়া চরাইতে হইত। বিমাতা তাহাদিগকে খাইতে দিতেন দুই বেলা দুই মুষ্টি কদর্য খাদ্য, শুইতে দিতেন দাইয়ের সঙ্গে ঢেঁকিশালে তৃণশয্যায় আর সামান্য ত্রুটিতে দিতেন নিদারুণ শাস্তি।

দাই এই সব দেখিত শুনিত এবং তাহাদের সহিত চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। তাহাদিগকে সকলই নীরবে সহ্য করিতে হইত। বিমাতা জানিতে পারিয়া তাহাদের মোদক বাড়ীর খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে তাহারা বনে বনে ঘুরিয়া সুস্বাদু ফলের যোগাড় করিয়া তাহাতে ক্ষুধা দমন করিত। নূতন গিন্নী জানিতে পারিয়া সেখানকার সব ফলের গাছ সমূলে বিনষ্ট করিলেন।

অতিকষ্টে তাহারা সময় কাটাইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে তাহাদের ছাগল ভেড়া হারাইয়া গেল। তাহারা খুঁজিতে খুঁজিতে এক গৃহস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি হইয়াছে। সেই বাড়ীতে তাহারা অতিথি হইল। অগ্রহায়ণ মাস। সেদিন রবিবার। হুলুধ্বনি শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক মহিলা বলিলেন যে, তাহারা নাটাইচণ্ডীর ব্রত করিলেন। এই ব্রতের ফল কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর করিলেন যে, যাহার যে কামনা, তাহা সফল হয়।

মেয়েটি তাহাদের নিকট নিয়ম-প্রণালী জানিয়া ও তাহাদের সাহায্যে বাপ যেন শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আইসে এই কামনা করিয়া নাটাইচণ্ডীর ব্রত করিলেন।

যথাসময়ে তাহারা ছাগল-ভেড়া পাইল। তিন চারদিন পর তাহাদের বাপও বাড়ী ফিরিলেন এবং সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া কৌশলে তাহার স্ত্রীকে ভূগর্ভে জীবন্ত অবস্থায় প্রোথিত করিলেন। মেয়ে বড় হইয়াছে। এক সুশ্রী বুদ্ধিহীন সওদাগর-পুত্রের সহিত তিনি খুব ঘটা করিয়া মেয়ের বিবাহ দিলেন।

যথাসময়ে সওদাগর-পুত্র স্ত্রী-সহ বাড়ী রওনা হইল। পূর্বে সে স্ত্রীর নিকট নাটাইচণ্ডীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছিল। পরীক্ষার্থ স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি একটি ঝাঁপিতে ভরিয়া জলে ফেলিয়া দিল। তাহার স্ত্রীও দেবীকে উহা ফিরিয়া পাইবার কামনা জানাইল।

কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। সওদাগর-কন্যার একটি পুত্র হইয়াছে। ছেলের অন্নপ্রাশন ও শ্বশুরের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা খুব সমারোহে সম্পন্ন হইবে। কর্মের পূর্বদিন শ্বশুর স্বপ্নে দেখিলেন, দেবতার আদেশ—পৌত্র কাটিয়া রক্ত না দিলে পুষ্করিণীর জল শুদ্ধ হইবে না। পুত্রবধূর অজ্ঞাতসারে দেবতার আদেশ পালন করা হইল। কাজের দিন একটি বৃহৎ বোয়াল মাছ দেখিয়া বধূ সাধ করিয়া উহা নিজে কাটিলেন ও পেটের ভিতর হইতে তাহার অলঙ্কারপূর্ণ ঝাঁপিটি পাইয়া উদ্দেশে দেবীকে প্রণাম করিলেন। এদিকে স্তন্য পান করাইবার ইচ্ছায় পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া কাহারও নিকট না পাইয়া, ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সেই পুকুরের ধারে উপনীত হইবা মাত্র দেবী তাহার পুত্রকে কোলে লইয়া জল হইতে উঠিয়া উহাকে তাহার কোলে দিলেন ও তাহাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

—যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা, 'অর্চনা', মাঘ, ১৩২৯

মন্তব্য

বিমাতার নিষ্ঠুরতা ইহার মূল অভিপ্রায়। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সতীনের সন্তানদিগকে নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবার কাহিনী নিতান্ত সাধারণ। দুষ্কার্যের শাস্তিও (Misdeed punished) ইহার অভিপ্রায়। স্ত্রীকে জীবন্ত সমাধি দিবার কথা তাহা হইতে আসিয়াছে। তারপর শিশুপুত্রকে বলি দিয়া পুকুর প্রতিষ্ঠা এবং বোয়াল মাছের স্বর্ণলঙ্কার গলাধঃকরণ এবং তাহার পুনরুদ্ধারও ইহার অভিপ্রায়।

৪

রুকনা ও ঝুকনা

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রুকনা ও ঝুকনা নামে দুই কন্যা ছিল। অতি তুচ্ছ অপরাধে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বনবাস দিয়াছিল। বন্যজন্তুর ভয়ে তাহারা এক বটবৃক্ষের কোটরে আশ্রয় লইল। কিছুক্ষণ পরে সেই বটবৃক্ষের তলায় কয়েকটি অপ্সরা আসিয়া ইতুপুজা করিতে লাগিল। রুকনা ঝুকনা তাহাদিগকে অনুনয় করিয়া ইতুপুজার ফল জিজ্ঞাসা করিলে অপ্সরারা বলিল, "ইতুপুজা করিলে ধনলাভ হয়, দেহ নীরোগ হয়।"

কন্যা দুইটি তাহাদের নিকট ইতুপুজা শিক্ষা করিয়া বনমধ্যে যথারীতি ইতুর পূজা করিল। তাহাদের দরিদ্র পিতা ধনবান্ হইল এবং পুত্রলাভ করিল।

ঘটনাক্রমে কন্যারা পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিল। রুকনা বিবাহের পর অহঙ্কার বশতঃ ইতুপুজা পরিত্যাগ করায় সে সমস্ত ধনসম্পদ্ হারাইল। কিন্তু ঝুকনা বিবাহের পরও ইতুপুজা ছাড়ে নাই। সে ধনজন লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। অবশেষে নিঃস্বা ভগিনীকে আশ্রয় দিয়া তাহাকে পুনরায় ইতুপুজার উপদেশ করিল। রুকনা পুনরায় ইতুপুজা করিয়া ধনজন ফিরিয়া পাইল।

ব্রাহ্মণও ধনী হইয়া মদগর্বে ইতুপুজা পরিত্যাগ করিয়া সর্বস্ব হারাইল। পরে কন্যার উপদেশে পুনরায় ইতুপুজা করিয়া সর্বস্ব ফিরিয়া পাইল। ঝুকনা ইতুর কৃপায় ইহকালের সকল সুখ ভোগ করিয়া পরিণত বয়সে স্বামিপুত্র রাখিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

—সুখময় সরকার, বাঁকুড়া, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৬১

মন্তব্য

এখানে লক্ষ্য করিবার একটি বিষয় এই যে, কাহিনীর মূল কথা অন্যান্য অনুরূপ কাহিনীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইলেও দেবতার নামটি সর্বত্রই পরিবর্তন হইতেছে। দেবতার চরিত্র অভিন্ন, কিন্তু নাম পৃথক্; এই পার্থক্য কেবল পূর্ববঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গেই নহে, পূর্ব বঙ্গেরও বিভিন্ন স্থানে এক নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। ইতু শব্দটি আদিত্য হইতে আসিয়াছে। সেইজন্য দেবতাটি যে সর্বত্রই সূর্য, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পিতার প্রবঞ্চনা

এক ছিল ব্রাহ্মণ। তার ছিল দুই মেয়ে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে আনে—কোনদিন পেট ভরে খাবার জোটে, কোনদিন জোটে না। এমনি করে দিন চলছিল। সেই দেশে ছিল এক রাজা। রাজা মেয়ে দেখতে পারে না মোটে। ছেলে হলে খুব আদর করে, কিন্তু মেয়ে হলে মেরে ফেলতে হুকুম দেয়। এমনি করে অনেক মেয়েকে জন্ম থেকেই মেরে ফেলেছে। একবার একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে জন্মাল। রাজা হুকুম দিল, মেরে ফেলবার জন্য। ধাইএর খুব মায়া হল মেয়েটির ওপর। সে লুকিয়ে রেখে দিল ও মানুষ করতে লাগল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। রাণী বললেন, রাজাকে দেখাতে হয়, তা না হলে জানতে পারলে সবাইকে ধরে গর্দান নেবেন।

রাজা খেতে বসেছেন। বার তের বছরের মেয়ে এসে পাতে নুন দিয়ে গেল। রাজা মুখ নীচু করে খাচ্ছিলেন। মাথা তুলে দেখলেন, অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে পিছু ফিরে চলে যাচ্ছে। রাণীকে ডেকে বললেন, এ মেয়েটি কে? আগে তো কোনদিন দেখিনি। রাণী তখন সব খুলে বললেন। রাজা তো রেগে অস্থির। তার হুকুম অমান্য করে, এত বড় সাহস! তিনি বললেন, "আগামীকাল ভোরে উঠে যার মুখ দেখব, তারই সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব; রাজত্বের অর্ধেকও তাকে দিয়ে দেব।"

এই খবর রাজ্যের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বামুনের দুই মেয়ে ভাবল—বাবা যদি রাজকন্যাকে বিয়ে করে, তবে তাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না—বাবাকেও ভিক্ষে করতে হবে না। বামুন বাড়ী এলে তারা বাবাকে ঐ কথা বলল। বামুন প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না। বলল, "তোদের খুব কষ্ট হবে, আর এত বয়সে বিয়ে করা ঠিক নয়।" কিন্তু মেয়েরা জোর করাতে বামুন অবশেষে রাজী হল। মেয়েরা বামুনকে খুব ভোরে ডেকে দিল। বামুন রাজবাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। রাণীর মনে খুব ভয় ছিল, না জানি মুদ্দোফরাস কে না কে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা বামুনকে দেখতে পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল ও রাজত্বের অর্ধেকও দান করল। রাণীর মনেও শান্তি হল।

রাজকন্যা বামুনী হয়ে এল। সে কিন্তু মেয়ে দুটোকে মোটে দেখতে পারে না। খেতে দেয় না। বামুনের কানে রোজ ওদের নামে নিন্দে ঢালে। বলে, ওদের তাড়িয়ে দাও। একদিন বামুন অতিষ্ট হয়ে বলল, 'আচ্ছা, তবে ওদের

বনে দিয়ে আসব।' মেয়েদের তো আর সে কথা বলতে পারে না। বলল, "চল, তোদের মামাবাড়ী বেড়িয়ে নিয়ে আসি।" মেয়েরা সঙ্গে চলল। চলতে চলতে ওরা গহন অরণ্যে প্রবেশ করল। ব্রাহ্মণ মেয়েদের বলল, "আয় আমরা একটু বসি।" মেয়ে দুটি ক্লান্ত হয়ে বাপের হাঁটুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বামুন ওদের মাথা দুটি মাটিতে রেখে একটা কুকুর যাচ্ছিল তাকে কেটে রক্ত চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে বাড়ী চলে গেল। মেয়েদের ঘুম ভাঙতেই দেখে চারিদিকে রক্ত ছড়ান, ছাতাটা ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে। বাঘে বাবাকে নিয়ে গেছে, ভেবে দুজনে কাঁদতে লাগল।

রাত হয়ে আসছে। বিরাট বট গাছকে বলল, "বটবৃক্ষ, তুমি দুফাঁক হয়ে আমাদের দুজনকে রাত্তিরের মত আশ্রয় দাও।" বটগাছ ফাঁক হয়ে গেল, ওরা দুজনে ওর মধ্যে ঢুকে বসে রইল। সারারাত ধরে কত পশু গাছের চারদিকে মানুষের গন্ধ পেয়ে ঘুরতে লাগল। কিন্তু কিছু করতে না পেরে চলে গেল। পরদিন ভোরে ওরা গাছের ফোঁকর থেকে বেরিয়ে এল। বড় বোন বলল, "দেখ, মা আমাদের সঙ্কটার ব্রত করত, কলাপাতায় তুলসী, আর চালের খিচুড়ি দিয়ে। আমরাও করি।" কিছুদূরে যেতেই কলাগাছ চোখে পড়ল। তাহলে নিশ্চয়ই কাছে পুকুর আছে ভেবে এগিয়ে গেল। দেখে সত্যিই জল আছে, আর তুলসী গাছও পড়ে আছে একটা। ধুলোর খিচুড়ি বানিয়ে ওরা কালাপাতায় ভোগ দিয়ে সঙ্কটাকে উৎসর্গ করল। অমনি ধুলোর খিচুড়ি সত্যি খিচুড়ি হয়ে গেল। ওরা দুজনে সেই প্রসাদ খাচ্ছে, এমন সময় রাজপুত্র আর কোটালপুত্র শিকার করতে করতে ঐখানে উপস্থিত হল। তাদেরও মেয়ে দুটি প্রসাদ খেতে দিল। রাজপুত্রের ওদের খুব ভাল লাগল। সে ছোট মেয়েকে আর কোটালপুত্র বড় মেয়েকে বিয়ে করে বাড়ী নিয়ে চলল।

ছোট মেয়ে রাজবাড়ী এসে ধনৈশ্বর্য পেয়ে ব্রত করার কথা ভুলেই গেছে। রাজবাড়ীর সব হাতী ঘোড়া টাকাকড়ি নষ্ট হয়ে গেল। ওর এক ছেলে হয়েছিল, সে আজ আর খেতেও পায় না। কোটাল-বৌ কিন্তু নিয়মিত সঙ্কটার ব্রত করে—আর রাজার সম্পত্তি নীলামে উঠলে কোটাল তা কিনে নেয়। একদিন রাজার ছেলেকে মাসীর বাড়ী পাঠিয়ে দিল কিছু খাবার আনতে। কোটাল-বৌ তো কেঁদে ফেলে ওর দশা দেখে। জিজ্ঞেস করল, তোর মা ব্রত করে কি না। সে বলল করে না। তখন ছেলের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু পথ থেকে কে কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

কোটাল-বৌ তখন ছোটবোনকে নিজের কাছে নিয়ে এল। ওকে বলল, তুই আর ব্রত করিস না বলেই তোর এই দশা হয়েছে। তুই আবার ব্রত কর, সব সম্পদ্ ফিরে পাবি। ছোটবোন দিদির সঙ্গে পুজো করে তার সব রাজত্ব ফিরে পেলো। রাজা বৌকে নিতে এলে তাকেও কোটাল-বৌ বলে দিল ব্রত করবার জন্য। —শ্রীহট্ট, ১৯৬২

মন্তব্য

কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মারিয়া ফেলিবার রীতি একদিন পৃথিবীর বহু আদিম জাতির মধ্যে সামাজিক ভাবেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতের টোডা (Toda) নামক উপজাতির মধ্যে ইহাই প্রথা ছিল। বাংলা দেশের কোন উপজাতির মধ্যেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য অতি সহজে কন্যা সন্তানকে বধ করিবার কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। 'ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার নিকটই কন্যা দান করিব'—অভিপ্রায়টি ইহাতেও বর্তমান। ইহার সঙ্গে গতানুগতিক অর্ধেক রাজত্ব দিবার কথা যুক্ত হইয়াছে। এখানে বিমাতার প্ররোচনায় পিতা শুধু নিষ্ঠুর হন নাই, প্রতারকও হইয়াছেন। কুকুর কাটিয়া রক্ত ছড়াইয়া নিজে বাঘের হাতে নিহত, হইয়াছেন, তাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন। কাহিনীটি পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু শিবির হইতে ১৯৬২ সনে শ্রীমতী সুষমা পালিত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীহট্টের কথ্যভাষা ইহাতে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

৬

উম্‌নো-ঝুম্‌নো

এক দেশে এক বামুন আর বামনী ছিল। তারা ছিল ভীষণ গরীব। একদিন বামুনের পিঠে খাবার ইচ্ছে হয়েছে। বামুন তার ইচ্ছের কথা বামনীকে জানাল। বামনী বললে, "চাল, ডাল, তেল, নুন সব এনে দাও। আমি তোমায় পিঠে কোরে দোব।" তখন বামুন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সব এনে দিল। বামুন-বামনীর দুটো মেয়ে ছিল—উম্‌নো আর ঝুমনো। বামুন বামনীকে বলেছিল যে তার পিঠে থেকে যেন কেউ না খায়। বামনী তাই উম্‌নো-ঝুমনোকে ঘুম পাড়িয়ে পিঠে করতে বসল। এদিকে বামুন একটা দড়ি নিয়ে ঘরের মাচার উপর ওঠে বসে রইল। বামনী একটা করে পিঠে তৈরী কোরে যেই ভাজে, বামুন অমনি তার দড়িতে একটা গিঁট দেয়। এদিকে পিঠের শব্দে উমনো-ঝুমনোর ঘুম ভেঙে গেল। তারা তার মার কাছে থেকে একটা কোরে পিঠে চাইল। কিন্তু বামনা তাদের তা দিতে চায়নি; কারণ, বামুন জানতে পারলে তাদের বনবাসে দেবে। কিন্তু তারা কথা শুনল না। জোর করে দুখানা পিঠে খেল।

এদিকে পিঠে করতে করতে ভোর হয়ে গেল। তখন বামুন একটা কলাপাতা কেটে পিঠে খেতে বসল। বামনী সব পিঠে গুছিয়ে দিলে। বামুন একটা কোরে পিঠে খায়, আর একটা কোরে দড়ির গিঁট খোলে। এইভাবে দু'খানা পিঠে কম পড়ল। বামুন খুব রেগে গেল। বলল, 'রাক্ষসী, মেয়েদের সব খাইয়েছ।' সকাল বেলা মেয়েরা ঘুম থেকে উঠলে বামুন তাদের বলল, মাসীর বাড়ী যাবি। তারা কখনও মাসীর বাড়ী যায়নি। খুব আনন্দের সঙ্গে তারা রাজী হয়ে গেল। বামুন তাদের নিয়ে এক বনের মধ্যে গেল। যেতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মেয়ে দুটো বলল, "বাবা, আমরা আর হাঁটতে পারছি না।" তখন বামুন তাদের মাথা তার কোলে রেখে ঘুমোতে বলল। সারাদিন তারা কিছু খায়নি। তারা খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। বামুন তাদের মাথা দুটো ইটের উপর রেখে চারিদিকে আলতার নুড়ি, শাঁখের গুঁড়ি ছড়িয়ে চলে এলো। অনেক রাত্তিরে বাঘ-ভাল্লুকের চিৎকারে তাদের ঘুম ভেঙে গেল। তারা উঠে দেখলে, তাদের বাবা সেখানে নেই। উম্‌নো বললে, "বাবাকে বাঘে খেয়েছে। ঝুমনো একটু চালাক ছিল। সে বলল, "না রে, বাবাকে বাঘে খায়নি। আমরা পিঠে খেয়েছিলুম বলে বাবা আমাদের বনবাসে দিয়েছে।" তখন তারা এক

বটগাছের কাছে গিয়ে বলল," "হে বটগাছ, আমাদের মা আমাদের দশমাস দশদিন গর্ভে স্থান দিয়েছে : তুমি আমাদের এক রাত্তির স্থান দাও।" বটগাছ ফাঁক হয়ে গেল।—তারা তার মধ্যে ঢোকার পর গাছের ফাঁক বন্ধ হয়ে গেলো। পরের দিন সকাল বেলা গাছের ভেতর থেকে বেরিয়ে তারা সোজা যেতে লাগল। কিছুদূর যাবার পর তারা দেখলে মুনিকন্যারা মাটির সরার উপর ঘট গাছ গাছড়া রেখে কি পুজো করছে। তাদের দুজনকে দেখে ঘট সমস্ত উল্টে গেল।

মুনিকন্যারা চীৎকার করে উঠল, "কেরে মহাপাপী, সামনে আয়, তা না হলে ভস্ম করে দেব।" তখন তারা দু'বোনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মুনিকন্যারা জিজ্ঞেস করল, "কে তোরা ? এখানে কেন ?" তারা বলল, "আমরা এক বামুনের মেয়ে। পিঠে খেয়েছিলুম বনে বাবা আমাদের বনবাস দিয়েছে।" ঋষিকন্যারা তাদের পুকুরে চান কোরে আসতে বলল। পুকুরে তারা গিয়ে পৌছতেই পুকুরের জল শুকিয়ে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। তাদের কথা শুনে মুনিকন্যারা তাদের একটা দুর্বোর আংটি দিল, যেটা পুকুরে ফেলে দিলে আবার জল উঠবে। তারা চান করে এসে ইতুঠাকুরের পুজো করল। ঋষি-কন্যারা তাদের ইতুঠাকুরের কাছে বর চাইতে বলল। তারা ইতুর কাছে বর চাইল,—'ওউড়ি চউড়ি দক্ষিণ দউড়ি কড়ি হোক। আমার বাবার হাতিশালে হাতি হোক, ঘোড়াশালে ঘোড়া হোক। রাজা মন্ত্রী স্বামী হোক।' মুনিকন্যারা তাদের প্রসাদ দিল, আর তাদের বাড়ী চলে যেতে বলল। উমনো-ঝুমনো বলল, আমরা তো রাস্তা জানি না, বাড়ী যাব কি করে ?

মুনিকন্যারা তাদের সোজা রাস্তা ধরে যেতে বলে দিল। তারা দু'বোনে চলতে চলতে দেখলে এক জায়গায় অনেক কল্‌মী শাক হয়েছে। তারা সেই কলমী তুলতে লাগল। সেই শাক তুলতে তুলতে তারা একটা সোনার ঘট পেলো। সেই ঘট নিয়ে তারা বাড়ী পৌছল। বামুন তাদের দেখে বলল, "এই অপয়া মেয়েদুটো আবার এসেছে। এরা চলে যাবার পর আমাদের সুখ হয়েছিল।" তখন ঝুমনো বলল, "অত অহংকার কোরো না। আমরা ইতু পুজো করেছি। তাই তোমার এত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হয়েছে।" বামুন বলল, "ও ঘট কোথা থেকে এনেছ ? ফেলে দিয়েস। ওটার জন্যে আমার হাতে দড়ি পড়তে পারে।" সেইকথা শুনে তারা সেই কলমী বনে ঘট ফেলে দিয়ে এলো। সেই ঘট আবার নিজেই ফিরে এল।

এরকম ভাবে তারা থাকে। একদিন সেই দেশের রাজা মৃগয়া করতে এলো। সারাদিন ঘুরে ঘুরে তাদের জল তেষ্টা পেয়ে গেল। কোথায়ও জল পায় না। শেষে বামুনের মস্ত বাড়ী দেখে সেখানে সেই রাজা জল চাইল। তখন ঝুমনো সেই ইতু ঘটে কোরে জল দিল। রাজাতো রেগেই আগুন। এতো লোকজন, এটুকু জল তার কি হবে? ঝুমনো বললো, "রাজা মশাই, আপনি রাগ করছেন কেন? খেয়েই দেখুন না।" রাজা সেই ঘটে জল খেয়ে দেখে ঘটের জল আর ফুরোয় না। রাজার লোকজন. হাতি-ঘোড়া সবাই খেয়েও সেই ঘটের জল আর ফুরোয় না। তারা অবাক্ হয়ে গেল। রাজা বামনকে বলল, রাজা আর রাজার পাত্র তারা দুজনে দুই মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। শুনে, বামনের খুব আনন্দ হলো। বামুন রাজার সঙ্গে উমনোর আর মন্ত্রীর সঙ্গে ঝুমনোর বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের পরদিন মেয়েরা শ্বশুরবাড়ী যাবে, বামুন তাই তাদের জিজ্ঞেস করল, "মা, তোমরা কে কি খেয়ে যাবে?" উমনো বলল, "আজকে শ্বশুর বাড়ী যাব মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে, ছাঁচি পান খেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাব।"

ঝুমনো বলল, "আজ ইতুপুজোর দিন। আমি নিরামিষ খেয়ে ইতুঘট মাথায় নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাব।" তারপর দুজনে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। উমনো যেদিক দিয়ে যায়, সেদিকে মানুষ মরে, ছড়া পড়ে কান্নাকাটি শোনা যায়। ঝুমনো যেদিক দিয়ে যায়, সেদিকে চুয়া চন্দনের ছড়া পড়ে। হাসি আমোদ দেখা যায়। রাজার মা সোনার বরণডালা নিয়ে বরণ করতে এলেন। সেই সোনার থালা পেতলের হয়ে গেল। রাজার মা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বউ ঘরে তুলল। মন্ত্রীর মা পিতলের বরণডালা নিয়ে বউ বরণ করতে এলো। সে থালা সোনার হয়ে গেল। মন্ত্রীর মা আদর করে বউ ঘরে তুলল। এদিকে রাজার সমস্ত ঐশ্বর্য দিন দিন নষ্ট হয়ে যেতে লাগল, আর মন্ত্রীর দিন দিন উন্নতি হতে লাগল। এদিকে বামুন একদিন বামনীকে বলল, "তুইতো পুজো করিস। ঠাকুরের কাছে বর চেয়ে নে না যে আমাদের একটা ছেলে চাই। ছেলে হলো ও বড় হোলো। বামুন ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করল।

বামুন আর ছেলে বেরিয়ে যাবার পর বামনী দরজা বন্ধ কোরে পুজো করতে বসল। সেদিন ইতুপুজোর দিন ছিল। এদিকে অর্ধেক রাস্তা যাবার পর বামুনের ছেলের মনে পড়ল যে সে যাঁতি আনে নি। বামুন আবার ফিরে এল। দরজা বন্ধ দেখে বামুন খুব রেগে গেল। বাড়ীতে ঢুকে বামনীকে পুজো করতে দেখে

পুজোর ঘট লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর বামুন জাঁতি নিয়ে ফিরে এসে দেখে ডাকাতে তাদের সমস্ত কেড়ে নিয়ে চলে গেছে। তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গেল। বামুন ফিরে এসে বামনীকে আবার ইতুপুজো করতে বলল। বামনী বলল, 'এ বছরে আর হবে না।'

বামনী একদিন বামুনকে বলল, "মেয়ের বাড়ী যাও না, গিয়ে কিছু চেয়ে নিয়ে এস।" বামুন ঝুমনোর বাড়ীর খিড়কি ঘাটে একটা ঝিকে বলল, "ঝুমনোকে ডেকে দাও। আমি তার বাবা।" ঝুমনো বাপকে খুব যত্ন কোরে অনেক জিনিসপত্তর দিয়ে পাঠিয়ে দিল। রাস্তায় ডাকাতে আবার সব কেড়ে নিয়ে গেল। বামুন বাড়ী এসে বামনীকে সব কথা বলল। এবার বামুন বামনীকে মেয়ের বাড়ী যেতে বলল। বামনী ঝুমনোর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। ঝুমনো মাকে আটকে রেখে দিল, বলল, "আসছে বছর ইতুপুজো করে তারপর যাবে।" এদিকে রাজা ক্রমশই রাণীর উপর রেগে যেতে লাগল।

একদিন তার মন্ত্রীকে বলল, "ও রাণী আমার চাই না। ওকে কেটে আমায় রক্ত দেখাও।" মন্ত্রী উমনোকে ছেড়ে দিয়ে কুকুরের রক্ত রাজাকে দেখাল। উমনো ঝুমনোর বাড়ী গিয়ে হাজির হোলো। ঝুমনো মাকে আর বোনকে তার কাছে রেখে দিল। ইতুপুজোর আগে ঝুমনো তাদের দুজনকে বলল, "কাল অগ্রাণ মাসের রবিবার ইতু পুজো, তোমরা উপোস করে থেকো।" পরের দিন তাদের ডাকতে তারা বলল, "যা, আমরা তোর ছেলের খাবার থেকে সকালবেলা খেয়ে ফেলেছি। এইভাবে তারা প্রায় প্রতি পুজোর দিনই কিছু-না-কিছু খেয়ে ফেলে। তখন ঝুমনো তাদের নিজের কাছে চুলে চুল বেঁধে নিয়ে শু'ল। তারপর সকাল বেলা তিনজনে ইতুপুজো করে ঠাকুরের কাছে বর চেয়ে নিল। রাজার আর বামুনের অবস্থা আবার ফিরে গেল। রাজা মন্ত্রীকে বলল, "আমার রাণীকে খুঁজে এনে দাও।" মন্ত্রী ঝুমনোকে সেই কথা বলল। ঝুমনো তাকে বলল, "রাজাকে বোলো রাজার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কলাগাছ পুঁতে কড়ির জাঙ্গাল দিয়ে তাবু ফেলে সাজিয়ে দিতে।" তারপর উমনো রাজার বাড়ী ফিরে এলো। পথে যেতে যেতে দূর্বা শেকড় লেগে উমনোর পা কেটে গেল। রাজা আবার হাড়ীর মাথা আর তাদের মার চোখ নিয়ে নিলেন। কিছুদিন পরে রাজার বাপের শ্রাদ্ধ। উমনোর ইতুপুজো করা হয়নি। সারাদিনের পর উমনো ইতুপুজো করে ভাবছে, কাকে ডেকে কথা শুনবে। কেউতো এখনও উপোস করে নাই। খুঁজে দেখা গেল, বুড়ী হাড়িনী উপোস কোরে আছে।

তাকে ডেকে উমনো কথা শুনল। তারপর ঠাকুরের প্রসাদ তার ছেলেদের জন্য দিল। হাড়িনী ছেলেদের কথায় কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তারা কি আর বেঁচে আছে, মা। তুমি যেদিন বাড়ীতে আসছিলে, সেদিন তোমার পা কেটে গিয়েছিল, রেগে রাজা তাদের গর্দান নিয়েছে। রাণী শুনে বলল, 'তুমি·ইতুঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর। তাহলে তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে।' হাড়িনী পুজোর পর বাড়ী গিয়ে দেখে, তার ছেলেরা সব ঘরে বসে রয়েছে।

রাজা এইসব দেখে শুনে উমনোকে বলল, "চল না এবার স্বর্গে যাই"। "এখন নয়, আরও কিছুদিন পরে—" উমনো বলল। উমনো ঝুমনো বামুন বামুনীর তারপর পৃথিবীতে ইতুপুজো প্রচারিত হোলো। রাজা রাজ-পাত্র হাড়িনী সবাই মিলে পুজো করল। রাণী স্বর্গে চলে গেল। —২৪ পরগণা, ১৯৬২

মন্তব্য

একটি দূর্বার আংটি পুকুরে ফেলিয়া দিবার ফলে যে পুকুরে জল উঠা, তাহা ইন্দ্রজাল বা magic অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। রাজা ঘটের জল পান করা সত্ত্বেও ঘটের জল যে ফুরায় না, তাহাতে অক্ষয় পাত্রের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। অক্ষয় পাত্র এবং অক্ষয় তূণের কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। দণ্ডদাতার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত দেখিবার সাধ লোক-কথার নিতান্ত সাধারণ অভিপ্রায়। এই ক্ষেত্রে সর্বত্রই ঘাতক দয়া পরবশ হইয়া দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্তের পরিবর্তে শিয়াল কুকুরের রক্ত দেখাইয়া থাকে। দণ্ডদাতার ক্রোধ উপশম হইলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পুনরায় দেখিবার সাধও দণ্ডদাতার স্বাভাবিক একটি অভিপ্রায়। সেই ক্ষেত্রে ঘাতক মৃত বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিয়া দণ্ডদাতার নিকট হইতে পারিতোষিক লাভ করিয়া থাকে। ইহাও রূপকথার একটি সাধারণ আভপ্রায় মাত্র।

দুই বোন

এক ব্রাহ্মণ। তার দুই ছোট মেয়ে রেখে ব্রাহ্মণী মারা গেলেন। দুই মেয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করে দিন কাটায়। একবেলা ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণ যা পায়, সারাদিন ভিক্ষা করলেও তাই পায়। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বেরিয়েছে। ব্রাহ্মণের দুই মেয়ে ঘরে যে সামান্য ধান ছিল, রৌদ্রে শুকুতে দিয়ে পাশের বাড়ী সূর্যব্রত হচ্ছিল তার কথা শুনতে গেল। ব্রতকথা শুনে এসে দেখে যে সমস্ত ধান কাক-পক্ষীতে খেয়ে গেছে ; ঘরে আর একটি দানাও নেই। কি করবে ভেবে না পেয়ে কাঁদতে বসে গেল তারা। এমন সময় এক ভিখারী এসে ভিক্ষে চাইল। মেয়ে দুটি বলল্, 'আমাদের যা ছিল, সব পাখীতে খেয়ে গেছে। আমাদের আর কিছু নেই—ভিক্ষে দেব কি ?' ভিখারী তাও বলল্, 'যা আছে তাই দাও। খুঁজে দেখ এক কণা চাল হয়ত পাবে, তাই আমাকে এনে দাও।' মেয়ে দুটি বল্ল, 'কেন বিরক্ত করছো, আমাদের কিছু নেই আমরা জানি।' বুড়ো ভিখারী জেদ করতে লাগল—'দেখ না চালের ভাণ্ডটা খুঁজে—এক কণা চাল নিশ্চয়ই পাবে।' বিরক্ত হয়ে বড় মেয়েটি চালের পাত্র খুঁজে দেখে দুটি চাল পড়ে আছে। তাই সে নিয়ে এলো। ভিখারী একটি চাল নিজে নিল। আর একটি চাল দুখণ্ড করে মেয়েটির হাতে দিয়ে বল্ল, 'একটি কণা চালের পাত্রে রেখে দাও, আর অর্ধেক কণা হাঁড়িতে চাপিয়ে রান্না কর।' ভিখারী আরো বল্ল, 'প্রতি রবিবার ২১ ছড়া ধান, ২১টি কলমী ডগা, ২১টি কলাই শাকের আগা, ধান দূর্বো প্রদীপ জেলে সূর্যব্রত কোরো। তবে আর কোন দুঃখ থাকবে না তোমাদের।'

ছোট মেয়ে বল্ল, 'আধখানা চাল তা আবার কেউ রান্না করে নাকি ? ও তুই ফেলে দে।' বড় মেয়ে বল্ল, 'রেঁধেই দেখি, বলে গেল বুড়ো।' বড় মেয়ে আধটুকরো চাল চালের হাঁড়িতে রেখে আর আধ টুক্রো হাড়ী চাপিয়ে গরম জলে ছেড়ে রান্না করল। তারা তো দেখেই অবাক, হাড়ি-ভর্তি ভাত হয়ে গেল। ওদিকে চালের পাত্রটাও চালে ভরে রয়েছে। এদিকে সেদিন ব্রাহ্মণ খুব দেরী করছে ফিরছে। দুই বোনে খুব ভাবছে। ওরা বল্ল, 'চল, আমরা রাস্তায় গিয়ে দেখি, বাবার এত দেরী হচ্ছে কেন ? দেখে দূরে ব্রাহ্মণ আসছে, তার হাতে কাঁধে বহু পুটলী ভর্তি। ভার বয়ে নিয়ে আসতে পারছে

না। মেয়েরা জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কি বাবা, আজ তোমার এত দেরী হল কেন ফিরতে?'

ব্রাহ্মণ বলল, আজ এত ভিক্ষে পেয়েছি যে বয়ে আনতে পারছি না, রাস্তায় থেমে-থেমে আসছে হয়েছে, তাই এত দেরী হল। মেয়েরা বলল, তুমি চান করে এসে ভাত খেয়ে নাও। ব্রাহ্মণ তো অবাক, ভাত পেলো কি করে মেয়েরা? মেয়েরা বলল, 'সে অনেক কথা, খেয়ে নাও, তার পর বলছি।' খাওয়া দাওয়ার পর তারা বলল যে পাখীতে সব ধান খেয়ে গিয়েছিল, তার পর এক ভিখারী এসে ভিক্ষে চাইল। দু'টি মাত্র চাল ছিল, একটি সে নিল, অপরটি দু'টুকরো করে এক টুকরো চালের ভাঁড়ে, অপর টুক্‌রো রাঁধতে বলল। রেঁধে দেখি হাঁড়ি ভর্তি ভাত হয়ে গেছে—ওদিকে ভাণ্ড ভর্তি চাল হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ বলল, 'আর কি বলেছে ভিখারী?' ওরা বলল যে সূর্যব্রত করতে হবে প্রতি রবিবার—ধান ছড়া, কলমী ইত্যাদি দিয়ে।

ব্রাহ্মণের মেয়েরা সূর্যব্রত করে। ব্রাহ্মণের আর কোন দুঃখ নেই। মেয়েরা ভাবে তাদের মা নেই, মা পেলে বড় ভাল হয়। ব্রত করে মায়ের কামনা জানায়।

একদিন এক রাজা, মেয়ের বিয়ে হয় না বলে প্রতিজ্ঞা করল, আজ ভোরে উঠে যার মুখ দেখব, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। রাণী বলে, 'ভোরে তো মালী আসবে, তার সঙ্গেই কি শেষে মেয়ের বিয়ে দেবে?' রাজা বলেন, 'তাই-ই দেব।' ব্রাহ্মণের মেয়েরা এই কথা শুনতে পেয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, আমাদের তো মা নেই, তুমি রাজার মেয়েকে বিয়ে কর, আমরা দুজনে মা পাই।' ব্রাহ্মণ বলে, তাহলে তোদের বড় কষ্ট হবে—সে কি আমি করতে পারি? মেয়েরা তাও জেদ করতে লাগল। অবশেষে বাধ্য হয়ে ব্রাহ্মণ রাজ-বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে রইল। পরদিন ভোরে রাজা ব্রাহ্মণকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিলেন।

কিছুদিন বাদে রাজকন্যা ব্রাহ্মণের কনে মেয়েদের নামে কান ভাঙাতে লাগল, মেয়েরা এই করে, ওই করে, আমাকে দেখতে পারে না, তুমি ওদের বনবাসে দাও। ব্রাহ্মণ কিছু বলে না। একদিন পুকুরে দুইবোন জলে ঝাঁপাচ্ছে শেষে মারামারি করতে লাগল। ছোট মেয়ে বলল, 'আমাকে মারবি না, আমি তো নিজের ভাগ্যে খাই—তুই মারবার কে?' বড় মেয়ে ব্রাহ্মণের কাছে এই কথা বলে দিল যে ছোট বলছিল যে সে নিজের ভাগ্যে

খায়। ব্রাহ্মণ ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কার ভাগ্যে খাস্?' ছোট মেয়ে জবাব দিল, 'নিজের ভাগ্যে খাই।' বড় মেয়েকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, 'আমি তোমার ভাগ্যে খাই।' ব্রাহ্মণ ছোট মেয়ের কথায় রেগে গেল। বলল, 'চল তোদের মাসীর বাড়ী বেড়াতে নিয়ে যাই। ছোটমেয়ে বলল, 'মা থাকতে মাসীর নাম শুনি নি, সৎমা পেয়ে মাসীর কথা শুনছি।' ব্রাহ্মণ বলল, 'তোদের মাসী তোদের যেতে বলেছে। চল, তোরা আমার সঙ্গে।'

ছোটমেয়ে দিদিকে বলল, 'এতদিন মাসীর কথা শুনিনি, আজ মাসী এলো সৎমা আসাতে। আমাদের বাবা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এই বলে দুজনে কুলো ভর্তি করে ব্রতের উপকরণ সঙ্গে নিয়ে চলল। তিনজনে চলছে বনের মধ্য দিয়ে। চলেছে ত চলেইছে। পথের যেন আর শেষ নেই। দুই বোন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে—আর চলতে পারছে না। ব্রাহ্মণ বলল, 'তোরা আমার হাঁটুতে মাথা দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। ওরা দুজনে তাই করল। মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে ব্রাহ্মণ চারধারে পানের পিচ ফেলে দিয়ে ওদের সেখানে রেখে বাড়ী চলে গেল। ঘুম ভেঙে বড়মেয়ে বলল, 'দেখ বাবাকে বোধ হয় বাঘে খেয়ে ফেলেছে।' ছোট বোন খুব চালাক, সে বলল, 'দূর, ওতো পানের পিচ, বাবা আমাদের ফেলে রেখে চলে গেছে।' দুজনে মনের দুঃখে সেই বনের মধ্যেই থেকে গেল। সামান্য জায়গা পরিষ্কার করে বাস করতে লাগল। পাশের পথ দিয়ে লোকজনেরা কাঠ, পাতা, ছন নিয়ে যায়। ওরা তাদের কাছে একটা বাঁশ বা পাতা চায়, ঘর বানাবার জন্য। তারা না দিয়েই এগিয়ে যেতে থাকে। একটু দূরে গিয়ে আর চলতে পারে না। ফিরে এসে কাঠ বা বাঁশ দিলে তবে তারা পথ চলতে পারে। এমনি করে দুই বোনের ঘর তৈরী হয়ে গেল। সেখানে তারা বাস করে, আর নিয়মিত ব্রত করে।

একদিন এক রাজপুত্র এসে জল চাইল। বড়মেয়ে বলল, 'আমরা কুমারী মেয়ে, আমাদের হাতে কি তুমি জল খাবে?' রাজপুত্র বলল, 'না।' বড় মেয়ে বলল, 'তবে আমাকে বিয়ে কর।' রাজপুত্র মাথায় জল ছিটিয়ে দিয়ে বড়মেয়েকে গন্ধর্ব মতে বিয়ে করে সেখানেই বাস করতে লাগল। ক্রমে ওদের অবস্থা খুব ভাল হয়ে গেল। ছোট মেয়ের এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হল। শ্বশুর বাড়ী যাবার সময় বড়মেয়ে তাকে খুব করে বলে দিল, সে যেন ব্রত করতে ভুলে না যায়। কারণ, ব্রত করেই এত সুখ-সম্পদ্ লাভ হয়েছে তাদের।

ছোটবোন সে কথা শুনল না। ব্রত না করেই সে খেয়ে নেয়। দাসীরা জল তুলে দেয়—তাতে সে চান করে। কিছুই করতে হয় না। ক্রমে ওদের অবস্থা খারাপ হতে লাগল, এমন সময় ছোট বোন বড় বোনের বাড়ী গেল বেড়াতে। বড় বোন ওকে আবার পুজো করতে বলল। ছোটবোনের স্বামী ওকে এসে নিয়ে গেল। তাদের সব সম্পদ্ নষ্ট হয়ে গেছে, বাড়ী ঢুকতে গিয়ে ছোটবোনের কাপড় দেউড়ীতে বেঁধে গেল ছিঁড়ে। রাজপুত্র তাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিল। বনে গিয়ে তার একটি ছেলে হোল। কিন্তু খুব কষ্টে তার দিন কাটে। ছেলেকে একটুকরো কাপড় দিয়েও ঢাকতে পারে না—এমনই দারিদ্র্য। ক্রমে সেই ছেলে পাঁচ-ছ বছরের হোল। একদিন ছেলেকে সে বলল, 'তোর এক বড় মাসী আছে—তার কত সুখ। দাসীরা সব করে দেয়। তুই সেখানে গেলে অনেক খাবার দেবে—যত্ন করবে।' ছেলে বলল, 'আমি সেখানে যাব, মা।' মা তাকে বলল, 'তুই প্রথমে ঘাটে বসে থাকিস। দেখবি চারটি দাসী জল ভরে নেবে। তাদের কিছু বলবি না। শেষে এক বৃদ্ধা এসে জলের কলসী ভ'রে তুলে দিতে বলবে। তুই তখন এই আংটিটা সেই কলসীতে ফেলে দিস। তবে দিদির সব কথা মনে পড়বে।'

ছেলে অনেক ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সেই পুকুর পাড়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। দেখল, ক্রমে ক্রমে চারজন দাসী জল নিয়ে চলে গেল। পরে এক বুড়ী এল জল নিতে। সে তো জলভরে তুলতে পারছে না। ছেলেকে দেখে বলল, 'আমাকে এই কলসীটা তুলে দেবে, বাছা।' সে তুলে দিয়ে তার মধ্যে আংটি ফেলে দিয়ে পুকুর ঘাটে বসে রইল। বড়মেয়ে চান করতে গিয়ে আংটি পড়ল কোলের উপর। দাসীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'জল আনবার সময় ঘাটে কে ছিল?' সে তো ভয়ে বলতেই চায় না, তারপর বলল, 'একটি ছোট ছেলে বসে ছিল।' 'শিগগির তাকে খুঁজে নিয়ে আয়!' দাসী গিয়ে তাকে নিয়ে এল। বড়মেয়ে নাপিত ডেকে ছেলেকে চুল নখ কেটে, চান করিয়ে ভাল কাপড় পরিয়ে ভাল ভাল খাবার খেতে দিল। তারপর বলল, 'তুমি আমার কাছেই থাক।' ছেলে বলল, 'সে মাকে ছেড়ে থাকবে না—মা একা বনে পড়ে আছে।' মাসী তাকে অনেক খাবার-দাবার সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। পথে আসতে আসতে এক বুড়ো সব কিছু কেড়ে নিয়ে গেল। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এসে মাকে সব কিছু বলল। মা বলল, 'কি করবি বল। আমরা দুজনেই যাব।' ওরা একদিন দুজনে এসে ঘাটের পাশে বসে রইল। দাসীরা জল নিয়ে

চলে গেলে বৃদ্ধা দাসী এলো জল নিতে। ওদের দেখে সে কলসী তুলে দিতে বললে। ছোট মেয়ে কলসীর মধ্যে আংটি ফেলে দিল। বড় বোন চান করার সময় আংটি পেয়ে ওদের ডেকে পাঠাল। ছোট বোনকে আদর যত্ন করে খাওয়াল। শেষে বলল, 'তুই ব্রত ছেড়েছিস বলে তোর এত কষ্ট। আমরা দুধভাত দিলেও তা ছাইভাত হ'য়ে যায়। তুই ব্রত কর। আগামী রবিবারে আর খাস না। ব্রত সেরে খাবি।'

ব্রতের দিন বড়বোন ছোট বোনকে ডাকল। ছোট বোন বলল, সে ভুলে খেয়ে ফেলেছে। বড়বোন বলল, 'আগামী দিন মনে রেখে উপোষ করে থাকিস। তা না হলে দুঃখ ঘুচবে না তোর কিছুতেই। তোকে তোর ছেলেকে ভাত দিলে হয়ে যায় ছাই।' পরের দিন বড়বোন ডাকল, 'চল, ব্রত করিগে যাই।' ছোটবোন বলল, 'দিদি, আজও ছেলেকে খেতে দেবার সময় খেয়ে ফেলেছি।' এমনি করে তিন রবিবার কেটে গেল। শেষে বড়বোন বলল, 'আজ তোকে আঁচল দিয়ে বেঁধে রাখব—কিছুতেই খেতে দেব না।' ব্রতের সময় বলল, 'তুই চান করে আয়—তোকে নৈবেদ্য দিতে হবে না—আবার হয়ত খেয়ে নিবি—তাহলে আমার পুজোও নষ্ট হবে।' এইভাবে ছোট বোন ব্রত করল। সেদিন থেকে তার ভাত আর ছাই হয়ে যায় না। ব্রত করে সে কামনা করল—অস্মরণ রাজার স্মরণ হোক, যুবরাজ্যের স্মরণ হোক।

বড়বোন বলল, 'তুই আমার কাছেই থাক, আমার আর কে আছে। তোর স্বামী মনে না করুক—আমার এখানে তুই থাকবি।' ব্রত করাতে ছোট-বোনের স্বামীর এতদিনে রাণীর কথা মনে পড়ল। সে লোক পাঠাল বনের মাঝে—রাণীর খোঁজে। সে লোক খুঁজতে খুঁজতে তাদের বড় মেয়ের বাড়ীতে দেখতে পেলো। বাড়ী গিয়ে রাজাকে বলল, 'আপনার একটি সুন্দর ছেলে হয়েছে।' রাজপুত্র এই কথা শুনে রাণীকে নিতে চলে এল। বড় মেয়ে বলল, 'নিয়ে যাবে ভাল কথা; কিন্তু ব্রতকরা ছেড়ো না। আমাদের সব সুখ সব শান্তি ব্রত করে পেয়েছি।' ছোট বোন ব্রত না করাতে কষ্টে পড়েছে। তুমি ব্রত করতে বাধা দিও না।

বৌ ও ছেলেকে নিয়ে রাজপুত্র বাড়ী আসছে। দেখে সবাই বলল, 'বনকুমারী একবার এসে সব ধ্বংস করেছে, আবার না জানি কি হয়।' এবার কিন্তু ছোটমেয়ে সূর্যব্রত নিয়মিত করে চলে। আস্তে আস্তে তাদের সব সম্পদ্ ফিরে এলো। তারা সুখে দিন কাটাতে লাগল।—নোয়াখালি, ১৯৬২

মন্তব্য

একুশ সংখ্যাটিকে এখানে ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত বিরল না হইলেও খুব ব্যাপক নহে। আঞ্চলিক কোন লোক-শ্রুতি অনুসারে তাহা আসিয়া থাকিবে। ইহাতেও ঘুম হইতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার নিকট কন্যা দান করিব, অভিপ্রায়টি বর্তমান আছে। 'কাহার ভাগ্যে খাই'—ইহা একটি সাধারণ লোক-অভিপ্রায়। এই সকল ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ কন্যারা সর্বদাই বলিবে পিতার ভাগ্যে খাই, কিন্তু একমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা বলিবে যে সে নিজের ভাগ্যে খায়। পিতার সকল ক্রোধ ইহার ফলে কনিষ্ঠা কন্যার উপর বর্ষিত হইবে, পরিণামে অবশ্য ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কাহিনীতে এই অভিপ্রায়টি অর্থহীন। কারণ, জ্যেষ্ঠা কন্যা পিতার ভাগ্যে খায় বলিলেও তাহাকে বনবাস দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবান্তরভাবে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। সেক্সপীয়রের নাটক King Hear-এর কাহিনীটিও লোকশ্রুতি হইতে আগত। কনিষ্ঠ কন্যা অধিকতর বুদ্ধিমতী এই অভিপ্রায়টিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বাধা-নিষেধ বা Taboo অভিপ্রায়টিও ইহাতে আছে।

জয়া-বিজয়া

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। তার বৌ ছিল না। জয়া এবং বিজয়া নামে তার দুই মেয়ে ছিল। মেয়েরা বাবাকে আবার বিবাহ করিতে বলিল। মেয়েদের কথায় বাবা আবার বিবাহ করিল। নতুন মাকে পাইয়া মেয়েদের খুব আনন্দ হইল। কিন্তু এদিকে মা কিন্তু মেয়েদের দেখিতে পারে না। বিমাতা একদিন ব্রাহ্মণের কাছে মেয়েদের বনবাস দিয়া আসিবার জন্য প্ররোচনা দিল। বিমাতার প্ররোচনায় বাধ্য হইয়াই ব্রাহ্মণ একদিন মেয়ে দুটোকে বলিল যে, তোমাদের মাসীর বাড়ী দিয়া আসিব। বড় মেয়ে জয়া একটু বোকা ছিল। সেত মাসীর বাড়ী যাইবে শুনিয়া খুবই খুসী। কিন্তু ছোট মেয়ে বিজয়া বুঝিতে পারিল যে বিমাতার প্ররোচনায় তাহাদের বনবাস দেওয়া হইবে। কারণ, সে বলিল যে এতবড় হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন ত' আমাদের মাসীকে দেখি নাই। সে যাহাই হোক, ব্রাহ্মণ একদিন সকাল বেলায় মেয়েদের লইয়া রওয়ানা হইল। তাহার সঙ্গে করিয়া একটা ভাঙা ছাতা ও এক শিশি আলতা লইল। অনেক দূর যাওয়ার পর প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। অনেকখানি হাঁটার পর তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। বিশ্রামের জন্য কাছেই এক বটগাছের তলায় বসিল। মেয়ে দুটো এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে সন্ধ্যা ঘনাইয়া রাত্রি আসিল। মেয়ে দুইজনকে ঘুমাইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহাদের চারিদিকে আলতা ছড়াইয়া দিয়া ভাঙ্গা ছাতি ফেলিয়া রাখিয়া ঐখান হইতে চলিয়া গেল।

গভীর অরণ্যে বাঘ, ভালুকদের ডাকে মেয়ে দুইটার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা ভীষণ ভয় পাইল এবং বটগাছটাকে হাত যোড় করিয়া বলিল, "তুমি যদি সত্যের বটগাছ হইয়া থাক, তবে আজকের মত আমাদের আশ্রয় দাও।" তখন বটগাছ তাহার একটা ডাল তাহাদের সম্মুখে নামাইয়া দিল। মেয়ে দুইটা ঐ ডালের উপরে উঠিয়া বসিল।

এদিকে এক দেশের রাজার ছেলে ও মন্ত্রীর ছেলে শিকারে বাহির হইয়াছিল। শিকার করিতে আসিয়া তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া এই বটগাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের দুইজনার হাতে চুল আসিয়া পড়িল। চুল দেখিয়া তাহারা খুব অবাক্ হইয়া গেল। এই গভীর অরণ্যে কোন মানুষের

বাস নাই ; কিন্তু এইখানে মানুষের চুল আসিল কি করিয়া ? এই কথা বলাবলি করিতে করিতে হঠাৎ উপর দিকে তাকাইয়া দেখে তুইটি সুন্দরী মেয়ে বসিয়া আছে। মন্ত্রীর ছেলে মেয়ে তুইটাকে জিজ্ঞেস করিল, তোমরা এই গভীর অরণ্যে দেবী না মানবী ? ছোট মেয়ে উত্তর করিল, আমরা মানুষ। বিমাতার পরামর্শে বাবা আমাদের বনবাস দিয়াছে। মন্ত্রীর ছেলে আর রাজার ছেলে মেয়ে তুইটিকে বিবাহ করিল। ছোট মেয়েকে মন্ত্রীর ছেলে ও বড় মেয়েকে লইয়া রাজার ছেলে দেশে রওয়ানা হইয়া গেল। ছোট মেয়ের বনবাস দেওয়াতে কোন তুঃখ নাই। সে খুব আনন্দে সংসার করিতেছে এবং মন্ত্রীর সংসারে খুব উন্নতি ও স্বচ্ছলতা দেখা গেল। কিন্তু বড় বোন সংসারের কোন খোঁজ খবর রাখে না ; সারাদিনই কেবল কান্না কাটি করে। এই সবের জন্য রাজার ছেলের মনে শান্তি নাই। সে একদিন মন্ত্রীর ছেলেকে ইহার কারণ জিজ্ঞেস করিল। মন্ত্রীর ছেলে তাহাকে বুদ্ধি দিল যে, 'তুমি কতগুলি সরষে রৌদ্রে দিয়া সেইগুলি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ করিয়া পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া থাকিও।' পরদিন রাজার ছেলে তাই করিল। রাজার ছেলেকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া জয়া ঘর হইতে ছুটিয়া এই কথা বলিতে বলিতে আসিল যে, বাবার শোকে আমি এতই বিভোর যে স্বামীর সঙ্গে কোনদিন কথাও বলিতে পারিলাম না। কিন্তু স্বামী ত মরিয়া যাইতেছে। তখনই রাজার ছেলে উঠিয়া বসিল এবং তাহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। জয়া বলিল যে, বাবা আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল ; কিন্তু তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। রাজার ছেলে মন্ত্রীর ছেলেকে এই কথা বলিল। মন্ত্রীর ছেলে রাজার ছেলেকে আর একটি কাজ করিতে বলিল। সে বলিল, তুমি একটা পুকুর কাট এবং ঢোল পিটাইয়া দাও সমস্ত দরিদ্র লোকের মধ্যে যে এক ঝুড়ি মাটি কাটিবে, তার বদলে এক ঝুড়ি কড়ি নিয়া যাইবে। অনেক দরিদ্র লোক দলে দলে মাটি কাটিতে আসিল এবং প্রত্যেককেই রাণীর কাছে নিয়া দেখানো হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে তাহার বাবা আছে কিনা ?

ঐদিকে বিমাতা ব্রাহ্মণকে মাটি কাটিবার জন্য বলিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ এত দরিদ্র ছিল যে, ঐখানে পরিয়া যাওয়ার মত কোন কাপড় ছিল না। ব্রাহ্মণীর কাপড়খান্না পরিয়াই সে তখন বেলা শেষে মাটি কাটিতে গেল। কিন্তু তাহাকে মাটি কাটিতে না দিয়া রাণীর কাছে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল। রাণী লোকটিকে তাহার বাবা বলিয়া চিনিতে পারিল। রাণী তখন তাহার বাবাকে হলুদ, গন্ধ তেল দিয়া স্নান করাইল। ব্রাহ্মণ এই সব দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, তোমরা কে? জয়া বিজয়া বলিল, আমরা আপনার মেয়ে। আপনি আমাদের যে বনবাস দিয়াছিলেন, আমাদের বাঘে খায় নাই।

ব্রাহ্মণ খুব খুশী হইল। বড় মেয়ে বাবাকে খুব ভালভাবে খাওয়াইল এবং ঐদিন তাঁহাকে আর যাইতে দিল না। পরদিন বাবাকে অনেক ধনদৌলত এবং কাপড়-চোপড় দিয়া লোকসহ পাঠাইয়া দিল। এখন বড় মেয়ের আর কোন দুঃখ নাই। সে এখন সংসার দেখা শুনা করে।

জ্যৈষ্ঠ মাস যায়, আষাঢ় মাস আসে, সংক্রান্তি দিন কর্মপুরুষের ব্রত করিবার জন্য বিজয়া খইয়ের ছাতু, নাড়ু ইত্যাদি তৈরী করিল। জয়া যখন খইয়ের ছাতু করিতেছিল, রাজা ইহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আমি রাজা, আমার বাড়ীতে সোনারূপার ছাতু হইবে। জয়া সোনারূপা দিয়াই ছাতু করিল। ব্রত করিবার জন্য দুইবোনে সই পাতিল। জয়া তাহার ছেলেকে দিয়া ছাতু, কাঁঠাল, আম দিয়া ছোট বোনের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। ছোট বোনও বড় বোনের ছেলেকে ছাতু, আম কাঁঠাল খাইতে দিল। কিন্তু ছেলে যেই ঐগুলি খাইতে যাইবে, অমনি সব ছাই হইয়া গেল। তখন মাসী তাহাকে আর খাইতে না দিয়া অনেক খাবার তাহার সঙ্গে ভাঁড়ে করিয়া পাঠাইয়া দিল। কিন্তু মাঝ রাস্তায় আসিতেই বিরাট এক চিল আসিয়া সেইগুলি নিয়া গেল এবং দৈববাণী শুনিতে পাইল যে, তোমার মা বাবা কর্মপুরুষকে নিন্দা করে। সইয়ের ছাতুর বদলে সোনা-রূপার ছাতু করে। আমার পূজার জিনিষ তোদের বাড়ী যাইতে পারিবে না। ছেলে তখন মাকে গিয়া সমস্ত কথা বলিল। মা ছোট বোনকে ইহা বলিল। বিজয়া তখন খইয়ের ছাতু দিয়া কর্ম-পুরুষ ঠাকুরের পূজা দিতে বলিল। জয়া খইয়ের ছাতু আম, কাঁঠাল প্রচুর পরিমাণে দিয়া কর্মপুরুষ ঠাকুরের পূজা দিল। তাহার পর হইতেই রাজার সংসারে উন্নতি হইতে লাগিল এবং দেশে দেশে কর্মপুরুষের ব্রতকথা প্রচার হইতে লাগিল। ইহার ধারা এখনও রহিয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরই জ্যেষ্ঠ মাস যায় আষাঢ় মাস আছে সংক্রান্তি দিন এই ব্রত করা হয়।

—ত্রিপুরা, ১৯৬২ সন

মন্তব্য

ইহাতে কনিষ্ঠা কন্যা যে অধিকতর বুদ্ধিমতী এই অভিপ্রায়টি প্রকাশ পাইয়াছে। মাসীর বাড়ী অভিপ্রায়টি ইহাতেও আছে। মাসীর নাম মা থাকিতেও শুনিতে পায় নাই; সুতরাং আজ মাসী কোথা হইতে আসিল? এই সাধারণ

বুদ্ধি বড় বোনের নাই, ছোট বোনের আছে। লোক-কথার ছোটবোনের চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব। ভাগ্যের বিপর্যয়ও ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। পরিত্যক্তা কন্যা দৈবাৎ ধন-সম্পদের অধিকারিণী কিংবা রাজরাণী হইলে পর সন্তান পরিত্যাগকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার একটি সুনির্দিষ্ট প্রণালী আছে; সেই প্রণালীটিরই এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা এই যে, আশাতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়া রাজবাড়ীতে এক পুকুর কাটিবার আয়োজন করা হইবে। তাহাতে দরিদ্র পিতা আসিয়া মজুরী প্রার্থনা করিবে, সেখানেই কন্যা ও পিতার পরিচয় হইবে। ইহা বাংলা লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু শিবির হইতে কাহিনীটি সংগৃহীত।

৯

রমুনা-ঝমুনা

এক যে ব্রাহ্মণ—তাঁর দুই কন্যা। কন্যা দুইটির নাম রমুনা ঝমুনা। কন্যা দুইটি রাখিয়া মাতা স্বর্গে গেলেন। ব্রাহ্মণ কন্যা দুইটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসীদের অনুরোধে ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করিলেন। সৎমা কন্যা দুইটিকে দুই চক্ষের কোণেও দেখিতে পারে না। ব্রাহ্মণের আর সুখ নাই।

কন্যা দুইটি যেখানে যায়, সেইখানেই লোকের অমঙ্গল হয়, এইজন্য কেহই দেখিতে পারে না। কন্যা দুইটি জ্বালায়-যন্ত্রণায় কাহিল হইয়া গিয়াছে। ফোঁড়া পাঁচড়ায় গা খসিয়া পড়ে। সৎমা সর্বদাই গেন্ গেন্ করে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এই কষ্ট ত আর দেখা যায় না। মাসীবাড়ীর নাম করিয়া এক জঙ্গলে রাখিয়া আসি। দেবতার দয়া থাকে বাঁচিবে, দয়া না থাকে, তাহা হইলে কি হইবে?—ব্রাহ্মণ আর ভাবিতে পারিলেন না। এক অরণ্যের মধ্যে কন্যা দুইটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ যাওয়ার সময় পানের পিচ্ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ছোট মেয়েটি ভাবিল, মাসীবাড়ীর নাম করিয়া বাবা যন্ত্রণা এড়াইলেন। কন্যা দুইটি অরণ্যে বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন—'তোমরা কাঁদিও না। তোমাদের ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। যাহারা ফোঁড়া পাঁচড়া হইয়া দুঃখ কষ্ট পায়—আপনার জন যাহাদিগকে ছাড়িয়া যায়, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করি। যাহারা আমার পূজা করে, তাহাদের ফোঁড়া পাঁচড়া দূর হয়, দিব্য কান্তিপুষ্ট শরীর হয়—সব দুঃখ দূরে যায়। তোমরা আমার পূজা করিও, তবেই সকল দুঃখ দূরে যাইবে। অগ্রহায়ণ কি মাঘ মাসে রবিবার কিংবা বৃহস্পতিবার একুশটি দোলা-পিঠা-পায়স দিয়া আমার পূজা করিতে হয়।'

কন্যা দুইটি নিকটে কোন ক্ষেত হইতে ধান কুড়াইয়া আনিয়া দোলা তৈয়ার করিল, তারপর ইয়াতল-পরমেশ্বরের পূজা করিল, তাহাদের পূজায় ইয়াতল-পরমেশ্বর ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন।

একদিন এক দূর দেশের রাজপুত্র আর সওদাগর-পুত্র সেই বনে শিকার করিতে আসিয়া পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কোথাও জল পান না।

অবশেষে বনের ভিতর এক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের একটু জল দিন, ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে।" ঠাকুর অমনি পাত্র হইতে একটু জল ঢালিয়া দিলেন। প্রথমে রাজপুত্র রাগ করে বল্লেন, "এতটুকু জলে কি হবে?" তদুত্তরে ইয়াতল ঠাকুর বল্লেন—"আগে খেয়েই দেখ না, দরকার হয়ত আরও দিব।" রাজপুত্র আর সওদাগর-পুত্র পেট পুরিয়া জলপান করিতেছে, কিন্তু পাত্রের জল আর ফুরায় না।

তখন তাঁরা ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ে বল্লেন, "ঠাকুর আপনি কে?"

তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বল্লেন, "আগে তোমরা আমার মেয়ে দুইটিকে বিয়ে কর, আমার পরিচয় দিব।" রাজপুত্র ও সওদাগরের পুত্র তাতেই সম্মত হলেন। বনেই গন্ধর্বমতে বিয়ে হল। পরে ব্রাহ্মণ আপন পরিচয় দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

এদিকে রাজপুত্র ও সওদাগর-পুত্র রমুনা ও ঝমুনাকে বিবাহ করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। রমুনা ব্রতের ঘটটি যত্নের সহিত সঙ্গে নিলেন; রমুনা মনে ভাবল, আমি রাজরাণী হয়েছি, 'আমার এসব নিয়ে কাজ কি?' এই বলে এক লাথি মেরে ঘটটাকে ভেঙ্গে ফেললেন। তখন থেকেই রমুনার ঘাড়ে অলক্ষ্মী এসে অধিষ্ঠান হল। যে পথ দিয়ে রাজপুত্র ও রমুনা গমন করলেন, সেই পথে কেবলই অমঙ্গল দেখতে পান—কোন বাড়ীতে আগুন লেগেছে; কাউকে শ্মশানে নিয়ে চলেছে; কারো পুকুরের জল শুকিয়ে গিয়েছে। আর যে পথে সওদাগর-পুত্র ও তাহার স্ত্রী ঝমুনা গমন করলেন, সে পথে কেবলই উৎসব ও আনন্দ, কারো বাড়ী বিয়ের বাজ্না হচ্ছে ইত্যাদি। রাজপুত্র-রাণী ঝমুনাকে নিয়ে রাজধানীতে পৌছা মাত্রই রাজপুত্রের মা মারা গেলেন। দেশে অরাজক কাণ্ড হয়ে উঠল। রাজপুত্র রাজত্ব হারিয়ে বিবাগী হয়ে বনবাসে চলে গেলেন। পরে রাণী রমুনা বড়ই কষ্টে দিনপাত করতে লাগলেন। একদিন খাওয়া জুটে ত অন্যদিন জুটে না। আর ঝমুনা যে ঘরে গিয়েছে, অর্থাৎ সওদাগর-পুত্রের ঘরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ধন-দৌলত ক্রমশঃই বাড়তে থাকে। হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসীতে তাদের বাড়ী জাঁকজমকে ভরপুর হ'ল।

কতকদিন পরে রাণী রমুনা নানা কষ্টে একদিন সওদাগর-পুত্রের বাড়ীর পুকুরের পাড়ে বসে রইলেন। সওদাগর-বাড়ীর দাসীরা পুকুর থেকে জল নিয়ে যায়। এমন সময় রাণী রমুনা জলের কলসীর ভিতর নিজের হাতের আংটী ফেলে দিলেন। সওদাগরের স্ত্রী ঝমুনা সেই কলসীর জল দ্বারা

স্নান করা মাত্রই ঐ পিতলের আংটী সোনা হয়ে গেল ;. কারণ, রাণী ঝমুনার প্রতি ছিল লক্ষ্মীর দৃষ্টি। সওদাগরের স্ত্রী দাসীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কার সোনার আংটী চুরি করে এনেছিস?' তদুত্তরে দাসী বলল, 'পুকুর পাড়ের এক গরীব বেচারীর আংটী এনেছি।' পরে তিনি আংটী হাতে নিয়ে তার দিদি রমুনার আংটী বলে চিনিতে পারলেন এবং আংটী খুব যত্ন করে ঘরে এনে রাখলেন। ইয়াতল ঠাকুরের কোপে এসব হয়েছে ভেবে দিদি রমুনাকে ইয়াতলি ব্রত করাবেন স্থির করলেন।

তখন অগ্রহায়ণ মাস, রবিবার দিন, দিদি রমুনাকে ইয়াতলি ব্রতের জন্য আয়োজন করতে এবং উপবাসী থাকতে বললেন। কিন্তু রমুনাকে অলক্ষ্মী পাওয়ায়, তিনি ফাঁকি দিলেন, "আজি আমি ভাত খেয়ে ফেলেছি।" ঝমুনা পরের রবিবার আবার ব্রতের দিন স্থির করলেন, ঐ দিনও রমুনা বলল— "আজও আমি পান খেয়ে ফেলেছি।" সুতরাং আর ব্রত করা হয় না, অবশেষে ঝমুনা স্থির করলেন—"দিদিকে ব্রতের পূর্বদিন ঘরের থামের সঙ্গে বেঁধে রাখবেন।"

পরের রবিবার তাই করলেন,—ঐ দিন ব্রত নিয়ম মত করলেন, কিন্তু নারায়ণের কোপ থাকায় তিনি ব্রতিনীর অঞ্জলি নিতে চান না। তখন ঝমুনা ইয়াতল ঠাকুরের উদ্দেশ করে বললেন,—"ইয়াতল ঠাকুর, হয় দিদির পুজা গ্রহণ কর, আর না হয় আমাকেও দিদির মত কর।" পরে ইয়াতল ঠাকুর আর কি করেন, ভক্তের কথা ঠেল্‌তে পারেন না, পুজা গ্রহণ করলেন এবং খুসী হয়ে রমুনাকে বর দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

ইয়াতলি ব্রতের বরে রাজা দেশে ফিরে এলেন, তাঁর রাজত্বও পুনরায় ফিরে পেলেন। রাজারাণী সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলেন।—অর্চনা, মাঘ, ১৩৪০

মন্তব্য

এখানে দেবতার নামটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ববর্তী একটি কথায় এই দেবতাকেই ঈড়াত্রল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইনি পৌরাণিক কোন দেবদেবী নহেন ; এমন কি, ইহার নামটির মধ্যেও সংস্কৃতের কোন প্রভাব অনুভব করা যায় না। অক্ষয় জলপাত্রের অভিপ্রায়টি এখানেও বর্তমান। কাহিনীটির আর কোন বিশেষত্ব নাই।

১০

করম ঠাকুর

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তাহার দুই মেয়ে, জয়া আর বিজয়া। জয়া বয়সে কিছু বড়, আর বিজয়া ছোট। জয়ার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম, আর বিজয়া খুব চালাক-চতুর। তাহাদের বাড়ীর নিকটেই এক রাজবাড়ী ছিল। তাহারা প্রত্যহই রাজবাড়ীতে গিয়া রাজকন্যার সঙ্গে কড়ি খেলিত। একদিন কড়ি খেলিতে খেলিতে একটি কড়ি বাহিরে পড়িয়া গেল। বাহিরে বহুক্ষণ অনুসন্ধানের পর রাজকন্যা কড়িটি পাইল। রাজা সর্বদা বাহিরের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। অন্দরের খবর বড় একটা রাখেন না। ঘটনাচক্রে সেই সময় রাজা বাড়ীর ভিতরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ রাজকন্যা তাঁহার সম্মুখে পড়ায় তিনি বিস্মিত হইয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এত বড় বয়স্থা মেয়ে তাঁহারই। তখন তিনি বলিলেন, 'আমার মেয়ে এত বড় হইয়াছে! যাঃ, কাল সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া প্রথম যাহাকে দেখিব, তাহার সঙ্গেই মেয়ে বিবাহ দিয়া দিব, আর দেরী করিব না।' ভোরে মালীই প্রথম বাড়ীতে আসে। রাজকন্যার অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিয়া রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। জয়া-বিজয়া এই কথা জানিয়া পিতাকে বলিল, 'বাবা গো, এত বড় হইলাম, আমাদের দুঃখের কপাল, মা কিরূপ দেখিলাম না, পেট ভরিয়া খাইলাম না, একখানা ভাল কাপড়ও পরিলাম না। তুমি যদি রাজবাড়ীতে বিবাহ কর, তবে আমাদের দুঃখ দূর হইবে।' ব্রাহ্মণ হাসিলেন ও বলিলেন, 'ইহা কি সম্ভব?' জয়া বিজয়া তখন রাজবাড়ীর ঘটনা ভাঙ্গিয়া বলিল। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'রাজবাড়ীতে বিবাহ করিলে মেয়েদের দুঃখ বাড়িবে বৈ কমিবে না।' কিন্তু মেয়েরা তাঁহাকে ছাড়িল না; অনেক অনুরোধ করিয়া ভোরেই রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

এদিকে ব্রাহ্মণ রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন বাগানেই সাজি হাতে নিয়া ফুল তুলিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজা ঘুম হইতে জাগিয়া দরজা খুলিলেন ও ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। ধূমধামে ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজা নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ রাজকন্যাসহ গৃহে আসিলেন। জয়া-বিজয়ার আমোদের সীমা নাই। কিন্তু হইলে কি হইবে, জয়া-বিজয়ার দুঃখের কপাল! রাজকন্যা হইয়াছেন বিমাতা। জয়া-বিজয়াকে দেখিতে পারেন না। বড় ঘরের মেয়ে

অহঙ্কারে ফাটিয়া মরে, মাটিতে পা ছোঁয়ায় না, কথায় কথায় জলিয়া উঠে। দাসী-বাঁদীর কাজ করিয়াও জয়া-বিজয়ার শান্তি নাই। এইরূপে দিন যায়, রাণীর গঞ্জনায় জয়া-বিজয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আর একদিন করমাদি ব্রত সমুপস্থিত। রাজবাড়ী হইতে কত জিনিস যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিল, তাহার 'লেখাজুখা' নাই। এইদিন রাজকন্যা ব্রাহ্মণকে বলিল, 'আজই মেয়ে দুইটাকে বনবাসে দিবা, যদি না দেও, বাবাকে কহিয়া তোমার গর্দান লইব।' রাজকন্যা একেলা-একেশ্বর পিতৃগৃহে ছিল, বেশী লোকজন দেখে নাই; তাই একা সব ভোগ করিতে চায়। ব্রাহ্মণ কি আর করিবে—ডরে-ভয়ে করমাদির দিনে মেয়ে দুইটিকে নিয়া পথে মেলা দিল। যাইতে যাইতে বহু দূরে এক গভীর বনের ধারে তাহারা উপস্থিত হইল। সেখানে এক বটগাছের নীচে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুদূর হাঁটিয়া আসিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় জয়া-বিজয়া ব্রাহ্মণের ক্রোড়ে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল; এই অবসরে ব্রাহ্মণ বৃক্ষ-নিবাসী দেবতাকে, চাঁদ-সূর্যকে, আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গভীর রাত্রে জয়া-বিজয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইলে পিতাকে না দেখিয়া তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাদের কান্না দেখে কে। চারিদিকে শুধু হিংস্র জন্তুর শব্দ, আর নানা দৃশ্য। ভয়ে তাহাদের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল। জয়া-বিজয়া বলিল, 'সত্যযুগের বটগাছ যদি হও, তবে আমাদের মাথায় তুলিয়া লও।' বটগাছ অমনি ধীরে ধীরে মাথা নোয়াইয়া তাহাদের উঠাইয়া লইল।

জয়া-বিজয়া বটগাছে উঠিতেই তাহাদের মনে হইল, সে দিন করমাদি ব্রত। সেখানে উঠিয়া তাহারা 'বানা' বদল করিল। এদিকে পরদিন এক রাজার পুত্র ও আর এক কটোয়ালের পুত্র শিকার করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় ঐ বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। অল্পক্ষণ পরে কয়েক বিন্দু উষ্ণ অশ্রু ও একটি দশহাত দীর্ঘ এবং আর একটি আটহাত দীর্ঘ চুল রাজপুত্রের ও কোতোয়ালের পুত্রের উপর পড়িল। তাহারা উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'তোমরা মানুষ না দেবতা, ভূত না পিশাচ, সত্বর বল, নতুবা রক্ষা নাই।' জয়া-বিজয়া নিজেদের বৃত্তান্ত তাহাদের নিকট বলিল। রাজপুত্র ও কোতোয়াল পুত্র তাহাদের নিজ গৃহে নিয়া গেল। রাজপুত্র জয়াকে ও কোতোয়াল-পুত্র বিজয়াকে বিবাহ করিল। এইরূপে দিন যায়, আর একদিন করমাদি ব্রত উপস্থিত। ব্রত শেষে জয়া রাজাকে গুড়া খাইতে দিলেন; কারণ, স্ত্রী ব্যতীত অন্যে খাইতে দিলে

স্বামীর কর্ম ভাল হয় না। সেই সময় এক ঢুলী রাজাকে গুড়া খাইতে দেখিল। সে বাড়ী আসিয়া এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বলিল, 'হায়, রাজাও গুড়া খায়।' কিছুদিন পর ঐ ঢুলী গাছটি কাটাইয়া এক ঢোল প্রস্তুত করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, যেখানেই সে ঢোল বাজায়, ঢোলে বাজনার তালে তালে বলে—'হায়, রাজাও গুড়া খায়।' এইরূপে রাজার কুৎসা চারিদিকে প্রচারিত হইল। আর এক বৎসর করমাদি ব্রত আসিলে রাজা জয়াকে ব্রত করিতে নিষেধ করিলেন। বিজয়া ইহা জানিতে পারিয়া ভর্ৎসনা করিয়া জানাইল—

'ছারের বোন্ ছারে গেলা, করমপুরুষ নিন্দিলা।
করমপুরুষ নিন্দনি, তিন তেলা পিন্দনি।'

এদিকে রাজপুরীতে বাতি জলে না, মানুষ মরে, গাভীর গর্ভ নষ্ট হয়, বাছুর থাকে না, টাকশালে টাকা থাকে না, বাড়ীঘর বনজঙ্গলে ভরিয়া থাকে, রাজ্যের মধ্যে অকালে ব্যারামের উৎপন্ন হয়; এইসব দেখিয়া শুনিয়া রাজপুত্র কোটায়াল পুত্রকে বলিল, 'এই বনের ভিখারিণীকে বনে দিয়া আস, তাহার বাতাসে মাটি জলিয়া যায়, আমার রাজ্য উৎসন্ন গেল।'

কোতোয়ালপুত্র রাজপুত্রকে প্রবোধ দিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুই হইল না। সে আর কি করিবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুদিনের খাদ্যদ্রব্য সহ জয়াকে এক ডিঙ্গাতে উঠাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল। জয়ার ক্রন্দনে বসুমতী ফাটে। এই সময়ে জয়ার সন্তান সম্ভাবনা ছিল। ভাসিতে ভাসিতে ডিঙ্গা অনেক দূর গেল। যাইতে যাইতে এক বাড়ীর ঘাটে সংলগ্ন হইল। এই বাড়ীতে এক মালী ও মালিনী বার বৎসর যাবৎ অন্ধ হইয়া ছিল। বাগান শুষ্ক হইয়া কাঠ হইয়াছিল। ডিঙ্গা সেই ঘাটে পৌছিল, তখনই মালী ও মালিনী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। বাগান ভরিয়া পাতায় পাতায়, ডালে ডালে অজস্র ফুল ফুটিয়া উঠিল। কোকিলে ডাকা সুরু করিল, ভোমরায় রোল ধরিল। তাহাদের আনন্দের সীমা নাই। ঘাটে গিয়া তাহারা জয়ার ডিঙ্গা দেখিল ও সমস্ত বৃত্তান্ত জয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল। তাহারা জয়াকে নিজগৃহে আনিয়া সন্তানবোধে প্রতিপালন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সে গৃহে জয়ার এক সন্তান হইল, এইদিকে জয়া মালা গাঁথিয়া দেয়, আর মালিনী বাড়ী বাড়ী গিয়া বিক্রী করে। জয়া গৃহে থাকিয়া ছেলেকে নিয়া দিন কাটায়। একদিন মালিনী বিনা সূতের একটি মালা নিয়া বহুদূরে কোতোয়ালের বাড়ী গিয়া বিক্রী করিল। বিজয়া মালা দেখিয়া বলিল, 'ইহা জয়া ব্যতীত অন্যে

গাঁথিতে পারে না।' বিজয়া অনুসন্ধানে জয়ার সংবাদ পাইল। মালিনীও বাড়ী আসিয়া বিজয়ার কথা বলিল। অনেকদিন পর পুনরায় করমাদি ব্রত উপস্থিত। জয়া মালিনীর নিকট বিজয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাই নিজ আংটি তাহার ছেলের হাতে দিয়া মাসীর বাড়ী পাঠাইয়া দিল। ছেলে এই আংটি দ্বারা তাহার মাসীকে পরিচয় দিল।

করমাদির প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জয়ার ছেলে কিছু আশীর্বাদ নিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, করম ঠাকুর তখন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সমস্ত প্রসাদ ও আশীর্বাদ হরণ করিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিয়া তাহার মাকে সমস্ত বিষয় জানাইল। জয়া ভাবিল, ইহা করম পুরুষেরই কাজ। এদিকে জয়াও করম ঠাকুরের ব্রত করিয়া প্রণাম জানাইল। বহুদির পর সেদিন রাজার প্রাণ জয়ার জন্য কাঁদিয়া উঠিলে কোতোয়ালকে বলিলেন—'যে জয়াকে আনিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে অজস্র ধনদৌলত দিব।' কোতোয়াল বিজয়াকে ইহা জানাইলে বিজয়া বলিল, 'আমি বোন্ জয়ার সংবাদ দিতে পারি, রাজা যদি আমার বাড়ী হইতে রাজবাড়ী পর্যন্ত কড়ির জাঙ্গাল দেন, দুধের পুকুর কাটান এবং নানা সাজ-সরঞ্জামে পথ সাজান।' কোতোয়ালের মুখের এই কথা শুনিয়া রাজা অনুরূপ ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে বিজয়া জয়াকে আনাইয়া ভালরূপে পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া রাজগৃহে পাঠাইয়া দিল। রাজপুরী বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, তাই রাজা মালীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং ক্রোধে তাহার সাত পুত্রের প্রাণদণ্ড দিলেন। এইদিকে হঠাৎ তাহার মনে হইল যে আজ করমাদি ব্রত। তখনই রাণীর নির্দেশানুসারে ব্রতের আয়োজন করিলেন।

ব্রত শেষ হইতে রাত্রি অধিক হইল। জয়া সমস্ত রাজ্যে অনুসন্ধান করিয়াও 'বানা' বদলানের জন্য ব্রতিনী পাইল না; যেহেতু ইতিমধ্যে সকলেই ব্রত শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। সে অনেক অনুসন্ধানে উপবাসী মালিনীর সংবাদ পাইয়া 'বানা' বদলানের অনুরোধ জানাইল। মালিনী বলিল, 'যে আমার ছেলের প্রাণদণ্ড দেয়, তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।' জয়ার অনুরোধ ও প্রলোভনে মালিনী স্বীকৃত হইয়া জয়ার সঙ্গে 'বানা-বদল' করিল। অমনি তাহার সাত ছেলে যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। ঘরবাড়ী ধনে পূর্ণ হইল। মালিনীর আহ্লাদের সীমা কি?—এদিকে জয়ার পিতার কষ্টের কথা মনে হওয়াতে তাহাকে নিজ বাড়ীতে আনিল এবং অনেক ধনদৌলতে বাড়ী-ঘর

পূর্ণ করিয়া দিল। তাহারও দুঃখ দূর হইল।—পূর্ব মৈমনসিংহ, শ্রীপ্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী সংগৃহীত, 'ব্রত ও আচার।'

মন্তব্য

ইহার একটি প্রধান অভিপ্রায় ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ (Magic Tree)। সেই গাছের নীচে দাঁড়াইয়া ঢুলী বা ঢোল্ বাদক বলিয়াছিল মাত্র যে 'রাজাও গুড়া খায়।' তাহার ফলে সেই গাছের ডালে তৈরী ঢোল বাজাইবা মাত্র কেবলই এই সুর শুনা যায়—'রাজাও গুড়া খায়।' সুতরাং এই বৃক্ষ শ্রবণশক্তি-সম্পন্ন এবং বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন (Talking Tree) উভয়ই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঢোলকটিকেও বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন (Talking Drum) বলিয়া মনে করা যায়। এখানে বটবৃক্ষকে শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কারণ, নিরাশ্রয় বালিকাদিগের কাতর প্রার্থনা তাহর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। অশ্বত্থ বৃক্ষের শ্রবণ-শক্তির কথা মধ্যভারতের আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপক শুনিতে পাওয়া যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল খাদ্য নহে, কেবলমাত্র ইহার ছায়দান হইতেই ইহাকে পরোপকারী বলিয়া মনে করা হয়। ইহার বিষয়ে বহু লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে।

'বানা বদল' করা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দুই জন ব্রতিনীর মধ্যে পরস্পর ব্রতের নৈবেদ্য বিনিময়ের নাম বানা বদলানো; কোন কোন লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানে ইহা আবশ্যক। বিমাতার বাধ্য পিতার হৃদয়হীনতা অন্যান্য কাহিনীর মত ইহাতেও লক্ষণীয়।

শীত-বসন্ত

এক ধনী সওদাগরের একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি পৃথক্ এক বাড়ীতে বাস করিত। একদিন একটি টুন্‌টুনি পাখীর ডিম আনিয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিল। ডিমটি ফুটিয়া এক সুন্দরী মেয়ের জন্ম হইল। মেয়েটি গোপনে বাহির হইয়া পুত্রটির খাদ্য খাইয়া আবার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। ষোলো বছর এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সওদাগর-পুত্র ইহার কিছুই জানিত না। কিন্তু তার খাদ্য কম পড়া দেখিয়া গোপনে অনুসন্ধান করিয়া মেয়েটির সন্ধান পাইল এবং তাহার রূপ দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিল। তাহাদের দুইটি পুত্র জন্মিল। বড়টির নাম শীত, ছোটটির নাম হইল বসন্ত। সময়কালে শীতের বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে স্ত্রীর মৃত্যু হইল এবং সওদাগর-পুত্র পুনরায় বিবাহ করিল। সৎমা বড় ছেলেদের মোটেই সহ্য করিতে পারিত না এবং নানাভাবে অত্যাচার করিত।

একবার একটি ছেলে অদ্ভুত একটি মাছ লইয়া আসিল; যে উহা খাইবে, তাহার হাসির সঙ্গে মাণিক এবং অশ্রুবিন্দুর সঙ্গে মুক্তা ঝরিবে। সওদাগর অনেক মূল্য দিয়া উহা কিনিয়া লইলেন এবং স্ত্রীকে উহা রন্ধন করিতে দিলেন—শীতের স্ত্রী মাছের গুণটি শুনিয়া নিজের স্বামী এবং দেবরকে উহা খাওয়াইয়া কিছু গহনা সমেত তিনজনে বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন এক গভীর অরণ্যে তাঁহার একটি পুত্র জন্মিল। শীত জল আনিতে দূরে এক সরোবরে গেল। তাহার ললাটে রাজটীকা দেখিয়া সেই রাজ্যের রাজহস্তী তাহাকে পিঠে করিয়া লইল এবং দেশবাসী তাহাকে সিংহাসনে বসাইল।

প্রতিরাত্রে সেখানকার রাজার মৃত্যু হয়—পরদিন আবার নূতন রাজার অভিষেক হয়। কেহই ইহার কারণ জানিত না। শীত সারাদিন রাজত্ব করিয়া রাত্রে রাণীর ঘরে ঢুকিল, কিন্তু ঘুমাইল না। রাণী ঘুমাইয়া পড়িলেন। শীত জাগিয়া দেখিতে পাইল, রাণীর বাম নাকের মধ্য হইতে একটি সরু সূতা বাহির হইয়া আসিতেছে—একটি দীর্ঘ সূতা। তাহা বাহিরে আসার পর ধীরে ধীরে মোটা হইয়া একটি ভয়ংকর সর্পের আকার ধারণ করিল, তারপর শীতকে গ্রাস করিতে আসিল। শীত প্রস্তুত হইয়াই ছিল—তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাতে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। রাণীও যেন অত্যন্ত স্বস্তিতে বহুক্ষণ নিদ্রা গেলেন। সকালে শীতকে জীবিত দেখিয়া রাজ্যে আনন্দের বন্যা বহিল এবং

শীতকেই স্থায়ী রাজা করা হইল। আশ্চর্য এই যে, গভীর অরণ্যে স্ত্রীপুত্র ভাইকে ত্যাগ করিয়া আসার কথা তাহার মনেও হইল না।

এইদিকে শীতকে ফিরিতে না দেখিয়া বসন্ত নদীর ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটি বণিক্ নৌকা করিয়া যাইতেছিল। সে নিকটে আসিয়া দেখিল বসন্তের চোখের জলে মুক্তা ঝরিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া দেশে চলিয়া গেল। বসন্তকে কাঁদাইয়া মুক্তা এবং হাসাইয়া মাণিক সংগ্রহ করিয়া বণিক্ প্রভূত ধনসঞ্চয় করিল—বসন্তের অবস্থা মৃতপ্রায় হইল।

স্বামী কিংবা দেবর কাহাকেও না দেখিয়া মৃত-প্রায় স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই অবসরে সেই রাজ্যের কোতোয়াল ছেলেটিকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। সকালে উঠিয়া অসহায় স্ত্রী নদীতে আত্মহত্যা করিতে গেলেন। সেই সময় এক দয়ালু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া আশ্রয় দিলেন।

কিছুকাল পরে কোতায়ালের চুরি করিয়া আনা ছেলেটি হৃষ্টপুষ্ট এক দুর্দান্ত যুবকে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশেই তাহারা বাস করিত। ব্রাহ্মণের পালিতা কন্যা বসন্তের স্ত্রীকে দেখিয়া যুবক মোহিত হইল ও বিবাহ করিতে চাহিল। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। যুবকটি ভীষণ প্রকৃতির ছিল। মেয়েটি চুরি করিতে মনস্থ করিয়া একদিন ব্রাহ্মণের গোয়াল ঘরের চালে উঠিল। ঠিক সেই সময় দুইটি বাছুর কথা বলিতেছিল; একজন বলিল, এই কোটাল-পুত্র তাহার আপন মাতাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। শুনিয়া কোটাল-পুত্র চমকিত হইল। বাছুরটি তাহার সঙ্গীকে শীত-বসন্তের কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। তাহা শুনিয়া সেই যুবক তৎক্ষণাৎ রাজার কাছে গিয়া নিজেকে রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিল এবং সকল ঘটনা বিবৃত করিল। শীত সকল কথা স্মরণ করিলেন, তারপর আপন স্ত্রীকে আনাইলেন, বসন্তকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন আর বণিক্‌টিকে জীবন্ত কবর দিলেন। তারপর সুখে স্ত্রী-পুত্র ভাইকে লইয়া রাজত্ব করিলেন।

মন্তব্য

অস্বাভাবিক উপায়ে পাখীর ডিম ফুটিয়া মানুষের জন্ম, ঘুমন্ত রাণীর নাকে প্রতিরাত্রে সর্পের আবির্ভাব, অশ্রুজলে মুক্তার ঝরণা, বাক্‌শক্তি সম্পন্ন বাছুর কাহিনীটির অভিপ্রায়।

১২

অত্যাচারী

এক বুড়ী বামনী। তার বেটার বউ ধর্মপুকুর বর্ত করিবে; পুকুর খুঁড়িয়া নিয়াছে, পূজার সকল জোগাড় করিয়াছে, এমন সময় বুড়ী আসিয়া পা দিয়া লাথি মারিয়া পুকুর ভাঙ্গিয়া দিল। বউ কি করে? কলার বাগানের ভিতর গিয়া আবার পুকুর তৈয়ারী করিল, পূজার সব আবার জোগাড় করিয়া লইয়া পূজায় বসিবে, এমন সময় বুড়ী সেখানেও গিয়া বলিল, "আবাগীর বেটী, ছাই-কপালী, আবার এখানে আসিয়াও ঐ করিতেছিস্?" বুড়ী এই না বলিয়া আবার পুকুর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বউটি গিয়া তখন পাকের আখার পাশে আবার পুকুর খুঁড়িয়া পূজার যোগাড় করিল এবং বৈশাখ মাস গোটা সেই খানেই ব্রত করিল।

দিনক্ষণ হইল, বুড়ী কিছুদিন পর মরিয়া গেল। বুড়ী এদিক ওদিক ঘুরিয়া কোন জায়গায় জল পায় না, পিপাসায় কণ্ঠা শুকাইয়া আসে। জল জল করিয়া সর্বদাই ঘুরে। উপায় না পাইয়া একদিন তার ছেলেকে স্বপ্ন দেখাইল যে; "দেখ্, তোর বৌ ধর্মপুকুর বর্ত করেছিল, আমি পা দিয়ে তার পুকুর ভেঙ্গে দিয়েছিলাম, তাকে বর্ত কর্তে দেই নাই। সেইজন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিতেছি, কোথাও জল পাই না। তুই তোর বৌকে বলিস্ যেন আবার সেই বর্ত করে, আর আমার নামে সেই ঘট উৎসর্গ করিয়া দেয়, তবেই আমি জল পাইব।" ছেলে পরের দিন ভোরে উঠিয়া তার বৌকে সব কহিল, আর পূজার ঘট জোগাড় করিয়া দিল। বৌটি মন দিয়া পূজা করিয়া একমনে বসিয়া কথা শুনিল ও একটি ঘট শাশুড়ির নামে উৎসর্গ করিয়া দিল। বুড়ী সেই হইতে জল পাইতে লাগিল।

—রঙ্গপুর, গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র কর্তৃক সংগৃহীত, সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (রঙ্গপুর-শাখা), ১৩১৫।

মন্তব্য

অন্যায়ের দণ্ড (Misdeed punished) ইহার মূল অভিপ্রায়। পুত্রবধূ এবং শাশুড়ীর সম্পর্কের চিরন্তন কাহিনী ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৩

মৃতের তৃষ্ণা

এক যে সওদাগর, আর তার মা। সওদাগরের মা সওদাগরকে বিয়ে করিয়ে বৌ আনলেন। বৌ যে যমপুকুরের ব্রত করত, তাতে সওদাগরের ধন, জন, দৌলত বাড়তে লাগল।

যম-দুয়ারে কাঁটা পড়ল, লোকজন কেউ আর অকালে মরে না। সওদাগরের সংসার ভরা লোক।

সওদাগরের মায়ের ঘটে কি কুবুদ্ধি হল। একদিন সওদাগরের বৌ চুপি চুপি ব্রত করছেন, সওদাগরের মা তাই দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবল—বৌ বুঝি আমার ছেলেকে 'যো' করে। পরে সওদাগরের মা বৌকে ডেকে বল্ল,—কি লো। বৌ পুটপুটাল্? আমাকে খাবি, না আমার পুতকে খাবি!

তুই রোজই সকালে উঠে উঠানে যমপুকুর কাটিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়িস্। আমি যে তোর ভাব বুঝি না।

এই কথা বলে সওদাগরের মা বুড়ি ধেয়ে আসে, ধেয়ে যায়, পায়ের হোঁচট দিয়ে ব্রতের সব ফেলে দিল, উকুর-পুকুর বুজাইয়া দিল, সওদাগরের বৌর ব্রত নষ্ট হ'ল।

এইরূপে বছর বছরই সওদাগরের বৌ'র ব্রতের উপকরণ ভেঙ্গে ফেলতে লাগল। কাজেই সওদাগরের বৌর ব্রত আর হয় না।

ব্রত না করতে পারায়—আজ সওদাগরের গাই মরে, কাল সওদাগরের বাছুর মরে, পরশু সওদাগরের মাল্লা মরে। সওদাগর বল্লেন, "একি যত সব কুলক্ষণ।"

এরূপে কয়েকদিন পর সওদাগরের মা মারা গেলেন। সওদাগর খুব দান-ধ্যান করে মায়ের শ্রাদ্ধ করলেন।

করলে কি হবে? সওদাগরের মা'র মরে গিয়েও শান্তি নাই। স্বর্গে ঠাঁই পায় না, পাতালে ঠাঁই পায় না। জলের পিপাসায় সওদাগরের মা 'তিন পৃথিবী' ঘুরে মরে, কোথাও একফোঁটা জল পেল না।

'যমপুকুর ব্রত' ভেঙেছে, জল কেন খেতে পাবে?

শেষে—এইরূপে দিন যায়, রাত যায়, রাত প্রভাত হয় হয়, এইরূপ সময়ে সওদাগরের মা সওদাগরকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বললেন,—"বাপুরে! যমপুকুর ব্রত ভেঙ্গেছিলাম, এখন জল পাই না, ঠাঁই পাই না!—বৌকে দিয়ে পুনরায় যমপুকুর ব্রত করাও, তবে আমার প্রেতাত্মার উদ্ধার হ'বে। নতুবা আমার এত শ্রাদ্ধ ব্যয় কিছুতেই কিছু হইবে না।

স্বপ্ন দেখে সওদাগর নিদ্রা হ'তে উঠ্‌লেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন,—"হা গো! কথা কি সত্যি"?

—তদুত্তরে সওদাগর-স্ত্রী বললেন,—হাঁ, যতবারই ব্রতের যোগাড় করেছিলাম, ঠাকুরাণী এসে যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে দিতেন। কিসে কি হয়েছে, তা'তো বলতে পারি না। এখন সোনার যমের মা, চিল, কাক, কুমীর তৈয়ার করে দেও, পুনরায় ব্রত করে দেখি।

সেই দিন আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। যমপুকুর ব্রতের দিন। সওদাগর তাড়াতাড়ি করে রোদ উঠ্‌তে না উঠ্‌তে সেঁকরা কারিকর ডেকে আনলেন,—যমের মা, কাক, চিল সব গড়িয়ে দিলেন। সওদাগর-স্ত্রী সেই সকল দিয়ে ব্রত করলেন।

সওদাগরের বৌর হাতের ঘটির জল ধারে পড়ল, যমপুকুর ভরে উঠল। সওদাগরের মা বুক ভরে সেই জল পান করে আত্মা ঠাণ্ডা করে স্বর্গে গেলেন।—বিক্রমপুর, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'অর্চনা', ভাদ্র, ১৩৩৯

মন্তব্য

শাশুড়ী বধূদিগকে নানাভাবে অত্যাচার করিয়া থাকেন, এই অত্যাচারের দণ্ড স্বরূপ পরলোকে গিয়া তাহাদের মুক্তি হয় না, তাহাদের আত্মার মুক্তির জন্ম বধূদিগকেই ব্রত করিতে হয়। ইহাও দুষ্কর্মের শাস্তি (Misdeed punished) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, লোককথায় অত্যাচারী বলিতে প্রধানতঃ শাশুড়ীই বুঝায়। অত্যাচারী শাশুড়ীরা মৃত্যুর পর কঠিন দণ্ডভোগ করিয়া থাকে, ইহা কল্পনা করিয়া অত্যাচারিতা বধূগণ একটু মানসিক সান্ত্বনা পায় মাত্র।

শাশুড়ীর দণ্ড

এক গৃহস্থ, তার সাত ছেলে। বড় সংসার, গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, ধনে-জনে গৃহস্থের মত বড় আর সে গ্রামে কেউ ছিল না। তার ছয় ছেলের বিবাহ হইয়াছে। এইবার ছোট ছেলের বিবাহ। খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। একটি ছোট দিব্বি সুন্দর বউ ঘরে আসিল।

সে বউটি যমপুকুর ব্রত করিত। আজ সেই আশ্বিনের সংক্রান্তির দিন। ছোট বউ যমপুকুর ব্রতের আয়োজন করিয়া তুলসী গাছের নীচে বসিয়া ব্রত করিতেছে, এমন সময় শাশুড়ী দেখিতে পাইল। দেখিয়াই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বউ এ কি করে! তাই আসিয়া সে ব্রতের উদ্যোগ পা দিয়া ফেলিয়া দিলেন। বউ আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না; শুধু কাঁদিতে লাগিল। বউ-এর ব্রত ভাঙ্গা গেল; সঙ্গে সঙ্গে কুলক্ষণও দেখা দিল। আজ গোয়ালে গাই মরে, কাল বছুর মরে; আজ চাকর মরে, কাল চাকরানী মরে, চারিদিকে কেবল অমঙ্গল। দিন কয়েকের মধ্যেই গৃহস্থের স্ত্রী মারা গেল, মা মারা গেল। সাত পুত্রে খুব দান-ধ্যান করিয়া ব্যয় বাহুল্য করিয়া মায়ের শ্রাদ্ধ করিল। করিলে কি হয়? মরিয়া এখন শাশুড়ী স্বর্গেও ঠাঁই পান না, মর্ত্যেও না। জল-পিপাসায় তিনি পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও এক ফোঁটা জল পাইলেন না।

শেষে দিন যায়, রাত যায়, আর পিপাসায় ছট্‌ফট করেন। কোথায় যায়? পরে তার ছোট ছেলেকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, 'বাবা, আমি বড় কষ্টে আছি, কোথাও এক ফোঁটা জল পাই না, যেখানে যাই, জল শুকাইয়া যায়। আমি বউমার যমপুকুর ব্রত ভাঙ্গিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দশা। বৌকে দিয়া যমপুকুর ব্রত করাও। এত ব্যয় বাহুল্য করিলেও কিছু হইবে না।'

স্বপ্ন দেখিয়া ছোট পুত্র অস্থির। কি করে? তখন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "মা আসিয়া আমায় বলিয়া গেলেন, তিনি নাকি তোমার ব্রত ভাঙ্গিয়াছিলেন? তা সে ব্রত আবার তোমায় করিতে হইবে, নতুবা তিনি জল-পিপাসায় ছট্‌ফট করিতেছেন।"

সেই দিন আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। যমপুকুর ব্রতের দিন তখন। তখন ছোট ছেলে ও বউ উঠিলেন। রোদ উঠিতে না উঠিতেই সোনার

চিল কাক তৈয়ারী করিয়া ব্রতের উদ্যোগ করিলেন। ব্রত সমাপ্ত হইতে না হইতেই তার শাশুড়ী জল পাইতে লাগিলেন। এখন যেখানে যান, প্রাণভরে পিপাসা মিটাইয়া জল পান করেন। জল খাইয়া শাশুড়ী স্বর্গে গেলেন।

—মৈমনসিংহ, 'সৌরভ,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২

মন্তব্য

সাত ছেলে অভিপ্রায়টি ইহাতে প্রথমই ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর ছোট ছেলে (Successful youngest son) এবং ছোট বউ (youngest daughter-in-law) অভিপ্রায়ও ইহাতে আছে। এখানে গৃহস্থের সাত ছেলের কথা উল্লেখ করা হইলেও পুত্র বধূ বলিতে একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র বধূরই উল্লেখ করা হইয়াছে, অন্য পুত্রবধূদিগের কোন উল্লেখ নাই। বিজয়িনী ছোট বউ (Successful youngest daughter-in-law) অভিপ্রায়টিতে অন্যান্য পুত্রবধূ গৌণ ও অস্পষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র কনিষ্ঠ বধূটিই বিশেষ চরিত্র-রূপে প্রকাশ পায়, ইহাতে তাহাই হইয়াছে।

দুষ্কার্যের শাস্তি ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহাকেই ইংরেজিতে Misdeed Punished অভিপ্রায় বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, ব্যয় বাহুল্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেই যে প্রেতাত্মার মুক্তি হয়, এই শাস্ত্র বাক্য ইহাতে বিশ্বাস করা হয় নাই। যমের উদ্দেশ্যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা না করিলে প্রেতযোনি হইতে মুক্তি নাই। যম পুকুর ব্রত তাহারই রূপক। ক্ষুদ্র পুকুর বৃহৎ পুকুরেরই প্রতীক। বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সমাজে জলদান ও ছায়াদান শ্রেষ্ঠ পুন্যকর্ম ছিল, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও বৃক্ষ রোপণের তাহাই উদ্দেশ্য। সমাজ হইতে বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হইবার পরও ধর্মীয় আচারের মধ্যে তাহার কিছু কিছু সংস্কার বর্তমান রহিয়া গিয়াছে; ইহা তাহার একটি রূপ।

১৫

শাশুড়ীর সুমতি

এক গোয়ালিনী তাহার পুত্রবধূকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সামান্য ত্রুটিতেই বধূ শাশুড়ীর বাক্যবাণে জর্জরিত হইত। গোয়ালিনী প্রায়শঃই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোল বেচিতে যাইত। যাইবার পূর্বে বধূকে শাশুড়ী যে সকল কাজের ফরমাইস দিত, সেই সমুদয় কর্ম তাহার একার পক্ষে সম্পন্ন করা কঠিন হইত। গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়াই, 'একাজ করা হয় নাই, ওকাজ ভাল হয় নাই' ইত্যাদি বলিয়া তর্জন গর্জন করিয়া পাড়াশুদ্ধ কাঁপাইয়া তুলিত। বধূ শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করিত না; নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিয়া মনের দুঃখ গোপন করিত।

একদিন শাশুড়ী বধূকে এত অধিক কাজের ভার দিয়া গেল যে, ইহার অর্ধেকও তাহার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। বধূ কাজের চাপে ও শাশুড়ীর ভয়ে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সে যথাশক্তি কাজ করিতে লাগিল। মনের দুঃখ সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না; নয়নজলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে যখন ধান ভানিতে ব্যাপৃত, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর; কাজের ঝঞ্ঝাটে তখন সে অনাহারে ছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে, বিষাদিত মনে সে কর্মই করিতেছিল; এক মুহূর্ত অবসরও তাহার ছিল না। এমন সময় রক্তবসনা, নানালঙ্কার-বিভূষিতা এক অতি রূপবতী রমণী তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিষাদিনী বধূর প্রতি করুণাপূর্ণ নয়নে চাহিয়া সুকোমল স্বরে বলিলেন— "তোমার কোন ভয় নাই, সুমতি দেবীকে স্মরণ করিয়া তুমি কাজ করিতে থাক। অতি অল্প সময়ে তোমার গৃহস্থালীর সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে।" ইহা বলিয়াই সেই পরমাসুন্দরী নারী তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

যথাসময়ে গোয়ালিনী গৃহ-প্রত্যাগত হইয়া বধূর কার্যের কোন ত্রুটি ধরিতে পারিল না। তৎপর দিবস বধূর উপর আরও অধিক কাজের চাপ পড়িল। সেদিনও সেই রমণী আসিয়া সেইরূপ আদেশ দিয়া গেলেন। বধূটি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়া গেলেন, 'আমি সুমতি দেবী। আমাকে আরাধনা করিলে তোমার শাশুড়ীর কুবুদ্ধি লোপ পাইবে, সে তোমাকে কখনও

তিরস্কার করিবে না। তোমাদের সংসারে দুঃখের লেশও থাকিবে না।' বধূ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রতের নিয়ম-প্রণালী জানিয়া লইল, দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

সেদিনও গোয়ালিনী গৃহে ফিরিয়া দেখিতে পাইল যে, বধূ সকল কর্মই উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছে। তাহার পরও ক্রমান্বয়ে তিন দিন কাজের ভার অতি মাত্রায় বাড়াইয়া বধূর কর্ম সম্পাদনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোয়ালিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কিরূপে সে এত অধিক কাজ একা সম্পন্ন করিতে-পারিয়াছে। বধূ উত্তর করিল যে, স্থমতি দেবীর কৃপায় সে সমস্ত কাজ অত্যল্পকালের মধ্যে সমাধা করিয়াছে। তখন হইতে গোয়ালিনীর বধূর প্রতি বিদ্বেষ ভাব দূর হইল। যথাসময়ে তাহারা উভয়ে স্থমতি দেবীর ব্রত করিল। গোয়ালিনী পুত্র, পুত্রবধূসহ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

গোয়ালিনীর প্রমুখাৎ দেবীর মাহাত্ম্য অবগত হইয়া প্রতিবেশিনী নারীগণ এই ব্রত করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে স্থমতি ঠাকুরাণীর ব্রত নানা স্থানে প্রচারিত হইল। —যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 'অর্চনা,' কার্তিক, ১৩৩০

মন্তব্য

শাশুড়ী-পুত্রবধূর সম্পর্কের একটি মৌলিক পরিচয় কাহিনীটিতে প্রকাশ পাইয়াছে। কোন কারণ ব্যতীতই এখানে শাশুড়ী বধূকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। ব্রতকথা শ্রেণীর রচনাগুলি অনেক সময়ই একদেশ-দর্শী। বধূর মনোভাবও যে শাশুড়ীর প্রতি বিরক্তিপূর্ণ, তাহা ইহাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। শত অত্যাচারেও বধূ এখানে শাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী। ইহা অবাস্তব মনে হইতে পারে। তবে হৃদয়হীনা শাশুড়ীর প্রতিও একদিন সমাজে বধূর কোন কিছু করিবারই উপায় ছিল না। সেই অসহায় অবস্থা ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকিবে।

মামীর তাড়না

এক ভাগিনেয় তাহার মামার সংসারে থাকিত। মামা ভালবাসিলেও মামী তাহার দুধে জল মিশাইয়া দিত ও তাহাকে নানারূপ যন্ত্রণা দিত; কিন্তু সে কিছুই বলিত না। একদিন মামীর তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া ভাগিনেয় বনে প্রস্থান করিল। তথায় রাজহস্তী তাহার কপালে রাজটীকা দেখিতে পাইয়া তাহাকে শুণ্ডধারা তুলিয়া লইয়া গিয়া শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিল—সে রাজা হইল। অনেক অনুসন্ধানে ভাগিনেয়কে না পাইয়া মাতুল চলিয়া যান। ভাগিনেয় একদিন দীর্ঘিকা খনন-জন্য বহু শ্রমজীবী আহ্বান করে, তন্মধ্যে মাতুলকে দেখিয়া কৃতজ্ঞ ভাগিনেয় সমাদরের সহিত তাহাকে রাজপ্রাসাদে লইয়া যায় এবং পাল্কীযোগে মাতুলানীকেও আনয়ন করে। পরে মাতুল ও ভাগিনেয় একত্রে আহারে বসিলে ভাগিনেয় মামীকে লক্ষ্য করিয়া একটি শ্লোক পাঠ করে—

সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুর পারে ঘর,
এখন কেন গো, মামী, তোমার দুধে পড়ে সর॥

মামা ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভাগিনেয় সমুদয় খুলিয়া বলিল, মামা তখন তাহার স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ভাগিনেয় তাহা নিবারণ করিয়া উভয়কে যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

—ঢাকা, বিক্রমপুর; 'প্রবাসী', মাঘ, ১৩১১

মন্তব্য

বাংলার বহু ছড়ায়, প্রবাদে, লোক-কথায় অসহায় ভাগিনেয়ের প্রতি মাতুলানীর অত্যাচারের কথা নানাভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাংলার সমাজ-জীবনের একটি বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সহজেই অনুভূত হয়। মাতুলানীর সঙ্গে ভাগিনেয়ের সম্পর্ক দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথমতঃ অত্যাচারী অত্যাচারিতের সম্পর্ক, দ্বিতীয়তঃ পরিহাস-রসিকতার সম্পর্ক (Joking relationship)। প্রথমটি হইতেই দ্বিতীয়টির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনস্তাত্ত্বিকগণ স্থির করিয়াছেন।

১৭

বিষ্ণুপদ

এক বিধবা ব্রাহ্মণীর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম বিষ্ণুপদ। অভাবের জ্বালায় ব্রাহ্মণী নিরুপায় হইয়া তাহার ভাই-এর নিকট আসিয়া বাস করিতে লাগিল। মামার বাড়ীতে বিষ্ণুর দুঃখকষ্টের সীমা নাই। প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা সে মাঠে গরু লইয়া চাষের কাজ করে, দিনের শেষে মামার বাড়ী ফিরিয়া মামীর হাতে আধপেটা শুকনা ভাত খায়। তাও তরকারী জুটে না, খানিকটা নুন দিয়া অতি কষ্টে খায়। বিষ্ণুর কষ্টে তাহার মা নীরবে অশ্রু বিসর্জন করে, আর ভগবানকে ডাকে। একদিন বিষ্ণুর খাওয়ার কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার মা দুধের একটু সর আনিয়া বিষ্ণুর পাতে দিল। মামী তাহা দেখিতে পাইয়া বিষ্ণু ও তাহার মাকে যাচ্ছে-তাই গালাগালি দিল এবং স্বামীকে লাগাইয়া ননদ ও ভাগ্নেকে তাড়াইয়া দিল।

বিষ্ণু ও তাহার মা মাঠের ধারে এক গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেইদিন ছিল অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার। তাহাদের দুঃখে ক্ষেত্রদেবীর মনে দয়া হইল। ক্ষেত্রদেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে তাহাদের কিছু ধান দিয়া গেলেন এবং একটি কুঁড়ে ঘর দেখাইয়া তাহাতে বাস করিতে বলিলেন। বিষ্ণু সেই ধান কিছু বিক্রয় করিয়া খাবার জিনিস কিনিল, কিছু ঐ কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। সেই সব ধানের বীজ হইতে ক্ষেতভরা সোনার ধান ফলিল। জমিদারের কানে খবর গেল। জমিদার তাঁহার কন্যার সঙ্গে বিষ্ণুর বিবাহ দিলেন। ক্ষেত্রদেবীর দয়ায় বিষ্ণু ও তাহার মায়ের সব অভাব ঘুচিয়া গেল। বিষ্ণু রাজার ন্যায় সাত মহলা বাড়ী তৈয়ারী করিতে লাগিল। এইদিকে বিষ্ণুর মামা-মামীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাহারাও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া বাড়ী তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত হইল। বিষ্ণুর মা তাহাদের বড় আদর যত্ন করিয়া ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। আবার অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার আসিল। এইবার বিষ্ণু ক্ষেত্রব্রত করিবার পদ্ধতি মামা-মামীকেও বলিয়া দিল। ক্ষেত্রব্রত করিলে মাম-মামীরও দুঃখ ঘুচিল। বিষ্ণুপদ মস্ত বড় একজন রাজা হইলেন। কিন্তু রাজা হইয়াও প্রতি বৎসর পরম সমারোহে তিনি ক্ষেতব্রত করিতেন। —ঢাকা, ১২৬২

মন্তব্য

ইহাতেও মামীর অত্যাচারের উল্লেখ আছে। এই সকল অত্যাচারের কাহিনীর একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, অত্যাচারিত ভাগিনেয় শেষ পর্যন্ত ভাগ্য বিপর্যয়ের ফলে রাজা হয় এবং মামীর প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পরিবর্তে তাহাকেও শেষ পর্যন্ত ভাগ্যোন্নতিতে সাহায্য করে। কেবল মাত্র একটি অর্থপূর্ণ বাক্য দ্বারা মামার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। তাহাই দুইটি কবিতার পদের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পূর্ববর্তী কাহিনীটিতে পদ দুইটির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে।

শঙ্খসুন্দর

এক দেশে এক সদাগর ছিল। তার এক পুত্র আর কন্যা। ছেলের নাম শঙ্খমণি, মেয়ের নাম কুঁজি। ছেলের বয়েস হলে সদাগর ছেলের বিয়ে দিলেন। মেয়ে কুঁজো বলে তার আর বিয়ে হল না। এর মধ্যে সদাগর মারা গেলেন। বাপের মৃত্যুর পর সদাগর-পুত্তুর শঙ্খমণি বিলাসে গা ভাসালেন। বাণিজ্যে তার কোনো মনই নেই। কিন্তু দিলে নিলেই লক্ষ্মীর বর। সদাগর পুত্তুরের বিলাসিতার ফলে ধন যায়, ঐশ্বর্য যায়। তাই এখন 'মূলে ধনে উবে, দিনে দিনে ডুবে'।

শঙ্খের মা সদাগরণী ছেলেকে কত বুঝান, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন, আর বলেন, বাণিজ্যে না গেলে যে লক্ষ্মী থাকে না। মায়ের গাল খেয়ে ছেলে রাগ করে তিন বছর সমুদ্রে পাড়ি দিল তার আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। সদাগরণীর দুঃখের আর সীমা, পরিসীমা থাকে না। মেয়ে বৌ নিয়ে কোনো রকমে কষ্টে-সিষ্টে দিন কাটে। একদিন এক বক এসে খবর দিল, যাগযজ্ঞ না করলে এমনি করেই লক্ষ্মী ছেড়ে যাবে, আর জলের তলায় চোদ্দ ডিঙা মধুকর রয়েছে, তা সে এখন হয়েছে সাপ কুমীরের বাসা। এই কথা শুনে সদাগরণী কাঁদতে কাঁদতে কালীদহের পাড়ে এসে উপস্থিত হলেন। পাড়ে গিয়ে দেখলেন

এক রাজার বেটা মোহনলাল
তার সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল
সেই রাজার বেটা পক্ষী মারে
এক এক তীরে ষোলশ আট গণ্ডা পক্ষী ঝুরে পড়ে।

সদাগরণী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, শঙ্খমণির খবর জানো? রাজার পুত্র বললেন, ঐ পাড়ে পদ্ম ভাঙে ক্ষীর খায়, নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, আর তিন প্রহরে তিনবার বাঁশী বাজায়। ছেলের কাছে গিয়ে ছেলেকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে বাণিজ্য যাত্রা করবার জন্যে অনুরোধ করে এবং কর্ণধার মাঝির কাছে গিয়ে চোদ্দ ডিঙা মধুকর তুলতে অনুরোধ জানায়। শঙ্খমণি কর্ণধার মাঝির কাছে চলল। এই দেখে রাজার বেটা মোহনলাল বললো, পদ্ম খায়, বাঁশী বাজায়, সেও শঙ্খমণি বাণিজ্যে যায়। এইকথা বলতে না বলতেই রাজার বেটার তীরে মরা পাখী জেগে ওঠে। কালীদহের জলে হাঁসের ডিম ফুটে

ওঠে। এরই মধ্যে একটি হাঁস, হাঁসের রাজা মাণিক হংস হয়ে উত্তর না পূর্বে কোন্ মুখে উড়ে গেল।

শঙ্খমণি কর্ণধার মাঝিকে ডেকে পূজা অর্চনা করে, সকলের অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করল। কর্ণধার মাঝির সাতপুত্র মধুকর বাইতে লাগল। যাবার সময় শঙ্খমণি স্ত্রী শক্তিসুন্দরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। শক্তিসুন্দর তিন তিন বছর ধরে চোকের জলে মালা গেঁথে আপন গলায় পরতো। স্বামীকে দেখে শক্তি কত কাঁদলেন, শঙ্খ কত বোঝালেন। তারপর শক্তিকে মা বোনের হাতে সঁপে দিলেন। যাবার সময় শক্তিকে বলে গেল, বারো বছর আমি আসবো না, দিনটুকু যে ভাবেই থাকো, রাতে চার কবাট একদম খুলবে না, এই খড়্গ তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, মোমের বাতি আগলে বসে থাকবে। দেব আসুক, যক্ষ আসুক, মানব দানব আসুক, কপাট তুমি কিছুতেই খুলবে না। শক্তির হাতে খড়্গ পড়তেই দিক্‌পবন ডেকে উঠল, মধুকর চোকের পলকে কালীসাগরে মিলিয়ে গেল।

যেতে যেতে জলপথে ছ'মাস কেটে গেল। ছ'মাসে মাল্লা মাঝি প্রথম ডিঙ্গী ভিড়ালেন। শঙ্খ তাদেরকে পাকসাক করতে আদেশ দিয়ে স্নানপূজা সেরে ভারত-পুরাণ পড়তে মন দিলেন। যে বটগাছের তলায় বসে শঙ্খ ভারত-পুরাণ পড়ছিলেন, সেই বটগাছে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী পাখি থাকত। বেঙ্গমা বেঙ্গমীকে ডেকে বললো, এই শঙ্খ সাধুর ঘরে নীল মাণিক রাজার জন্ম হবে। বেঙ্গমী সে কথা বিশ্বাস করল না। বেঙ্গমা বললো, নদীর পারে মাণিকহংস করে আজই শঙ্খসাধু ঘরে ফিরে যাবে। হলোও তাই। রাত্রে শঙ্খসাধু শক্তিসুন্দরের ঘরের কাছে এসে কপাটে ধাক্কা দিলো। শক্তিসুন্দর স্বামীর আদেশে কিছুতেই কপাট খুললো না। শঙ্খসাধু দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে খড়্গের আঘাতে তার দেহ রক্তাক্ত হল। আর শক্তি কাঁদতে লাগল। সুস্থ হয়ে শঙ্খ বললে,

বাণিয়ার ঘরে শক্তি নীল রাজার জন্ম কথা—যেন না যায় কারো কাণে—
প্রহর থাকিতে যাবো আমি, শক্তি, থেকো সাবধানে।

শক্তি বললো, যাবার সময় তুমি মা বোনের সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। দেখা করার আর সময় হল না। শঙ্খ সাধু মাণিকহংস করে চলে গেলেন। সকাল না হতে হতেই কুঁজির চোখে পড়লো বৌয়ের ঘরের কপাট ভাঙা। সে সাত পাড়া জড় করে বৌয়ের কুৎসা প্রচার করতে লাগল। শক্তিকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে। সদাগরণী তার সঙ্গে যোগ দিলে। বনবাসিনী হল

শক্তি। বনে বনে ঘুরে তার দিন কাটে। একদিন রাত্রে এক কাঠুরিয়ার সন্ধান পেল শক্তি। শক্তিকে সে মা বলে, মায়ের জন্যে কুঁড়ে বেঁধে দিল, ক্ষিধের আহার যোগাতে লাগলো। একদিন শক্তি এক চন্দন কাঠের ডাল দিয়ে কাঠুরিয়াকে বললো, যদি বেনের মত বেণে পাও, তবে ডাল তাকে দিয়ো। কাঠুরিয়া আদেশ পালন করতে চলে গেল। কাঠুরিয়া শহরে গিয়ে বেনে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, আর শঙ্খে ফুঁ দেয়। আয় বেণে, সায়বেণে, গন্ত বেণে মস্ত বেণে সকল বেণের দুয়োরে গেল, কিন্তু পেল না বেণের মত বেণে।

কাঠুরিয়াকে ঘরে না ফিরতে দেখে কাঠুরাণী ব্যস্ত হয়ে জঙ্গলের দিকে গেল। সেখানে শক্তিকে দেখে বললে, চাঁদের পেটে চাঁদ পুর্ণিমা, ভয় নাই, ভয় নাই, বনে তোমায় দেখতে পাই, মাগো, তুমি কার ঝিয়ারী, কার বৌ কার চাকের ভরা মৌ—শুনে শক্তি কাঠুরের কাঠ নিয়ে শহরে যাওয়ার কথা বলতে কাঠুরাণী তাকে সতীন বলে ভুল করলো। কাঠুরাণী তারপর শক্তির কুঁড়ের দরজায় আঘাত করতেই শক্তি দুয়ার খুলে দিলে, তাকে দেখেই শক্তি মূর্ছা গেল। কাঠুরাণী মনে মনে চিন্তা করল, সতীনকে ওষুধ করাতে হবে। টিকি-টিকি তাতে ইন্ধন জোগালো—বললো রাজপুরে যা, ডাকিনী আছে নিয়ে আয়, ওষুধ বিষুধ করাব। কাঠুরাণী তিন গাল হেসে রাজপুরীতে গেল।

রাজপুরীতে রাজা আছেন মোহনলাল, সঙ্গে চলে ভেড়ার পাল, রাজার রাণীর ছেলে হয়, ছেলে হয় সোরগোল পড়ে, কিন্তু আসলে রাণীর ছেলে হয় না। ওঝা মন্ত্রতন্ত্র সবই বিফলে যায়। একদিন অনেক কৌশল ক'রে কাঠুরাণী দাই মালিনীর সঙ্গে দেখা করে। দাই রাজার ছেলের জন্মের অপেক্ষায় ছিল, তা যখন হল না, দাই আর কাঠুরাণী বনে গেল।

এদিকে শক্তির কোলে ভুবন আলো করে নীলমাণিক জন্ম নিয়েছে। দাই আর কাঠুরাণী সাতাশ চোরের সাহায্য নিয়ে নীলমাণিককে চুরি করে রাজ-বাড়ীতে নিয়ে এল। শক্তি জেগে উঠে দেখে ছেলে নাই। সে পাগল হয়ে বনে বনে ফিরতে লাগলো। আর ঠিক সেই সময় শঙ্খসাধুর গলা থেকে শঙ্খের মালা ছটাস্ করে ছিঁড়ে জলে পড়ে গেল।

দাই আর কাঠুরাণী রাজবাড়ীতে রাণীর আঁতুড়ঘরে গিয়ে দেখে যে রাণী এক মরা ছেলে প্রসব করে মারা গেছেন। কেউ তখন কিছু জানতে পারে নি। দু'জনে মরা রাণী মরা পুতকে খিড়কীর দরজা দিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। আর এদিকে ঝঙ্কার দিল, ছেলে হল ছেলে হল। কাঠুরাণী

রাণী হল, নীলমাণিক তার ছেলে। রাজ্যে হুলস্থুল পড়ে গেল। রাজ্যের রাজা ভেড়ার গাল নিয়ে ফেরেন, নীলমাণিক বড় হয়ে রাজ্যপাঠ হাতে নিল।

শঙ্খমালা ছিঁড়ে গেলে পর শক্তির কথা ভুলে গেলেন শঙ্খ সাধু। দেশের কথাও ভুলে গেলেন। কেবলই বাণিজ্য করে ফেরেন শঙ্খসাধু। রাজপুত্র নীলমাণিক আপন রাজ্য পরিক্রমা করতে গিয়ে পথে শঙ্খমালা কুড়িয়ে পেলেন। শঙ্খমালা সমুদ্রের তলা থেকে মাণিকহংস পেয়েছিল, তা রেখে দিয়েছিল হংসিনী। হংসের বাচ্চারা ঝগড়া করতে গিয়ে তা মাটিতে পড়ে যায়। নীলমাণিক আশ্চর্য হলেন মালা দেখে এবং সেই মালা গলায় দিয়ে রাজপুরীতে গেলেন।

শক্তি মনের দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল। সাগরবুকে শক্তি বারো বছর অচেতন হয়ে রইল। সাগররাণী শক্তিকে জল থেকে তুলে তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্বামীকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে বলে দিলেন।

কাঠুরিয়াও অনেক সন্ধান করে এক বন্দরে এসে শঙ্খ বাজাতে লাগলেন। শঙ্খসাধুর চোদ্দ ভরা তাতে কেঁপে উঠলো। তারপর সেই চন্দনকাঠে শ অক্ষর দেখে সাধুর শক্তির কথা মনে পড়লো। সাধু তখন কাঠুরেকে নিয়ে ঊর্ধ্বগতিতে।

এদিকে শক্তিকে রাজপুরীতে দেখে কাঠুরাণী প্রমাদ গুণলেন। বাঁদী দাসীকে দিয়ে এক গর্তের মধ্যে ফেলে পাথর চাপা দিল। ওদিকে মাণিক নদীর ঘাট দিয়ে ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে যাবার জন্যে রাজার সিপাই লস্কর—সাধুকে ধরে এনে ফাটক দিল।

স্নান করতে গিয়ে পাথরের তলায় মাণিক নীল মায়ের সন্ধান পেলেন। তার মন কেমন করতে লাগল। কিন্তু কে যে তার আসল মা, তা প্রমাণ করার জন্যে নীল সভা ডাকল। সভায় পাথরের তলা থেকে যে মাকে পাওয়া গেছে, সেই আসল মা বলে প্রমাণ হল। কাঠুরাণী লজ্জায় মুখ লুকাল। মাণিক হংস সভায় সব কাহিনী প্রকাশ করল। সাধু শঙ্খ আজ রাজপিতা, তাকে সম্মান করে সভায় আনা হল। নীলমাণিক মা বাবাকে ফিরে পেল। আর দাই কাঠুরাণী না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেল। তারপর সাধু, শক্তিসুন্দর-নীল মাণিক আপন দেশে ফিরলো। সওদাগর প্রতিদিন কত দুঃখ পাচ্ছিলেন, আর কুঁজি বেশ জাঁক করেই বৌএর কেড়ে নেওয়া গয়না পরে আনন্দেই ছিলেন। সাধু মা বোনকে শক্তির কথা জিগ্যেস করলেন। মা মাটিতে পড়ে গেলো। বোন কুৎসা রটালো। সাধু মাকে নায়ে তুলে নিলেন।

আর বোনকে বললেন, সাঁতার, কেটে আয়। গয়না কাপড় মাথায় নিয়ে কুঁজি সাঁতার দিতে লাগল, আর কালীদহের কুমীর কুঁজির ঠ্যাং ধরে টান দিল। কাঠুরিয়া শহরের কোটাল হল।

সাত সন্তান কর্ণধার মাঝি চোদ্দ ডিঙা মধুকর সাজিয়ে রাখে। মাণিকহংস রাজবাড়ীর ক্ষীর সর খায়। রাজা যে মোহনলাল তার চেৎ ভেৎ নেই। ভেড়ার পাল হারিয়ে, তপস্যায় চলে গেলেন। মা, ঠাকুমা, বাপ নিয়ে নীল রাজা রাজত্ব করতে লাগলেন।

মন্তব্য

ইহার প্রধান একটি অভিপ্রায় বাকৃশক্তি সম্পন্ন পাখী (Talking Bird)। ইহারা সাধারণতঃ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে। বেঙ্গমা-বেঙ্গমী শব্দটি বিহঙ্গমা-বিহঙ্গমী শব্দ হইতে জাত। ইহারা রূপকথার জগতে অর্থাৎ কল্পনার জগতের পক্ষী-পক্ষিণী।

শক্তিসুন্দর ও শঙ্খসদাগরের এই কাহিনীটির সঙ্গে আসামের মণিপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ লোক-কথা থৈবী ও খাম্বার কাহিনীর যোগ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহাতেও পত্নীর সতীত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য আসিয়া ভ্রম বশতঃ পত্নীর হস্তে স্বামীর মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল। এখানেও শক্তিসুন্দরকে যে আদেশ করিয়া শঙ্খকুমার বিদেশে গিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ শক্তিসুন্দরের হাতেই শঙ্খকুমার আহত হইয়াছেন।

ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন হার ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। যতদিন পর্যন্ত শঙ্খ সাধুর গলায় শঙ্খমালা ছিল, ততদিন তিনি শক্তির কথা স্মরণ রাখিয়াছেন, মালা ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাকে ভুলিয়া গেলেন। অত্যাচারের কাহিনীর মধ্যে অত্যাচারী সর্বদাই কঠিন দণ্ড লাভ করিয়া থাকে, ইহাতেও শেষ পর্যন্ত তাহা হইয়াছে।

১৯

অনাচারী

এক ছিল রাজা। একদা আশ্বিনের সংক্রান্তি দিবস তাঁহার পুত্রবধূ উঠান, ঘর ইত্যাদি গোময়লিপ্ত করাইতেছেন দেখিতে পাইয়া ও ঐ দিন মৎসাদি রন্ধন হইবে না শুনিয়া তিনি রাগভরে বলিলেন,—"এসব কি অনাচার হইতেছে আমার বাড়ী? কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, আজ মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ? এসব অশাস্ত্রীয় ব্যাপার আমার বাড়ীতে হইতে দিব না। আমি এখনই মাছ আনাইতেছি।" এই বলিয়া রাজা বাহির মহলে চলিয়া গেলেন। কিছুকাল পরই বড় বড় অনেক মাছ বাহকেরা আনিয়া রন্ধনশালার নিকটে রাখিল। ইহা দেখিয়া রাজপুত্রবধূর মনে শঙ্কা জন্মিল। তিনি শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বাড়ীতে মাছ আনা হইল, এখন কি উপায় হইবে?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"মাছ রাঁধিতে বলা হউক, রাজা ও আর সকলে উহা আহার করুক শুধু তুমি ও আমি উহা আহার করিব না। তাহা হইলেই কোন অনিষ্ট হইবে না।"

যথাসময়ে রাজা ও আর সকলেই মৎস্যাদি আহার করিলেন। শাশুড়ী ও পুত্রবধূ নিয়ম পালন পুর্বক ব্রত করিলেন। সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ী ঘিয়ের প্রদীপে আলোকিত করা হইল। রাত্রে শাশুড়ী ও বধূ উভয়ের কেশের অগ্রভাগে ও বস্ত্রাঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া এক শয্যায় শয়ন করিলেন। ভোরের বেলায় গ্রন্থিমুক্ত হইয়া বধূ অন্দর মহলের পশ্চাতে যাইয়া একটা মৃত দাঁড়কাক দেখিতে পাইলেন। তখনই তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন—"আপনি কাল বাড়ীতে মাছ আনাইয়াছিলেন এবং আপনারা সকলেই তাহা খাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি এবং শ্বশ্রূমাতা তাহা খাই নাই। গতকল্য সমস্ত ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করাইয়াছি বলিয়া ও আমরা উভয়ে নিয়ম-পালনপুর্বক গার্শী ব্রত করিয়াছি বলিয়া বাড়ীতে অলক্ষী প্রবেশ করিতে পারে নাই। আমাদের দুইজনের কেহ যদি রাত্রিতে একাকী বাহির হইতাম, তাহা হইলে মহা অনিষ্ট ঘটিত। তাই আমরা চুলে ও আঁচলে গাঁইট বাঁধিয়া এক শয্যায় শুইয়াছিলাম। আমাদের উভয়ের কেহ রাত্রিতে ঘরের বাহির হইলেই একটা দাঁড়কাক বাড়ীতে প্রবেশ করিত, সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষীও প্রবেশ করিয়া

বাড়ীখানায় প্রবেশ করিত। আপনি আমার সঙ্গে যাইয়া একটা মৃত দাঁড়কাক দেখিলেই আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হইবে।"

শ্বশুর পুত্রবধূর সঙ্গে যাইয়া সেই কাকটা দেখিলেন ও আহ্লাদের সহিত বলিলেন—"মা! তুমিই আমার রাজ্যের রাজলক্ষ্মী স্বরূপা। তোমার ন্যায় পুত্রবধূ যাহার ঘরে আছে, তাহার রাজ্যে অলক্ষ্মী কিছুতেই প্রবেশ করিতে পারে না। তুমি নিয়মমত বৎসর বৎসর ব্রত করিও। ব্রতের দিন তুমি যাহা করিতে নিষেধ করিবে, তাহা কেহই করিবে না।—ঢাকা, 'অর্চনা', চৈত্র, ১৩৩০

মন্তব্য

নিদ্রিত অবস্থায় প্রতারণা করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া কেশে কেশে গিঁট বাঁধিয়া কিংবা আঁচলে আঁচলে গিঁট বাঁধিয়া স্বামি-স্ত্রীর এক শয্যায় শয়ন বাংলা লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়। কাক মৃত্যু সংবাদবাহী, দাঁড়কাক সম্পর্কে নানা বিশ্বাস এদেশের সমাজে প্রচলিত আছে; এখানে দাঁড়কাক অলক্ষ্মীর বাহন।

সোহাগী

এক গৃহস্থ, তাহার দুই স্ত্রী; সোহাগী ও এরি। এরির রূপ কদাকার, বুদ্ধিও অল্প। সোহাগী চালাক-চতুর ও সুন্দরী। তাই গৃহস্থ সোহাগীকে আদর যত্ন করে। আর এরি রান্না, বাড়া-চিড়া ঘর-দুয়ার লেপা, যাবতীয় কাজ করে; কিন্তু কিছুতেই স্বামী ও সোহাগীর মন পায় না। স্বামী এরিকে দিবারাত্র ভর্ৎসনা করে, ভাত কাপড় দেয় না ও সময় সময় মারপিট করে। এইভাবে দিন যায়— একদিন এক-কথা দু-কথায় সোহাগী এরিকে চুলে ধরিয়া এরূপ আঘাত করিতে লাগিল যে, সমস্ত প্রাঙ্গণে সে গড়াইতে লাগিল। তাহার যন্ত্রণাপুর্ণ চীৎকারে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হইল। কিন্তু সোহাগী সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। এদিকে স্বামীও সমস্ত দেখিতেছে; কিন্তু কিছুই বলিতেছে না। অবশেষে আঘাতে সে এরূপ পীড়িত হইল যে, হামাগুড়ি দিয়া প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এরি কী আর করিবে? পিত্রালয়েও তাহার কেহ ছিল না। তাই অতি কষ্টে একটি প্রতিবেশীর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বহুদিন সেই বাড়ীতে থাকিয়া তাহাদের আদর যত্নে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, গৃহে গৃহে ভিক্ষা দ্বারা প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়। আর একদিন ভিক্ষা করিতে বহুদূরে এক দেশে গেল। সেই দেশে কোন এক বাড়ীতে এরি দেখিতে পাইল যে কয়েকজন ব্রতিনী এক ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছে। এরি বলিল, 'তোমরা কি ব্রত কর'? তাহারা বলিল, 'আমরা সিদ্ধেশ্বরী ব্রত করি'। 'এই ব্রত করিলে কি হয়?' 'এই ব্রত করিলে নিদানের সুদান হয়, নির্ধনের ধন হয়, যে যা মনস্কামনা করে, তা সিদ্ধ হয়। এরি তাহাদের নিকট হইতে ব্রতের নিয়ম সমূহ শিক্ষা করিয়া গেল। সে দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া কিছু ধন সংগৃহীত করিল ও স্বামিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার ভিন্ন ঘরে ব্রতের আয়োজন করিল। বিধিমত ব্রত শেষ করিয়া যখন এরি 'কথা' বলিতেছিল, তখন রাত্রিকাল। অন্যে যাহাতে দেখিতে না পায়, সেজন্য গভীর রাত্রে এরি ব্রত করিতেছিল। এদিকে কয়েকজন ডাকাত সাতরাজার ধন চুরি করিয়া আনিয়া তাহার ঘরের পেছনে বসিয়া হিসাব মিলাইতেছিল। কিন্তু অনেক সময় পর্যন্ত হিসাব ঠিক করিতে না পারিয়া পরস্পর ঝগড়ায় মত্ত হইল। এরি ব্রতশেষে কথা সম্পূর্ণ করিয়া

কুলাতে বাড়ি দিল। ডাকাতের দল এই শব্দ শুনিতে পাইয়া যে যাহা পারিল সঙ্গে নিয়া পলায়ন করিল। এরি ডাকাতদের পলায়নের শব্দ শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম জানাইল।

ঘরের পেছনে আসিয়া অজস্র ধন দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সমস্ত রাত্রি হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া ধন নিজ গৃহে আনয়ন করিল। রাত্রি শেষে নিদ্রা যাওয়াতে এরির উঠিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার স্বামী তাহাকে ডাকিতে লাগিল। . এরি ঘরের দরজা খুলিতেই গৃহস্থ অসংখ্য ধন-রত্ন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেল। সে সমস্ত ঘটনা গৃহস্থকে বলিল। গৃহস্থ ধনরত্ন দেখিয়া ও সিদ্ধেশ্বরীর মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাকে নিজগৃহে আনয়ন করিল। তখন তাহার আদর যত্নের সীমা কি? এরি তখন আদরের স্ত্রী, সোহাগী হইল তখন দাসী। তখন হইতেই এরির দুঃখ দূর হইল।

—পুর্বমৈমনসিংহ, শ্রীপ্রফুল্ল চরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার।'

মন্তব্য

ইহাতে দৈবকে প্রসন্ন করিয়া সম্পদ লাভের জন্য পুজা ও প্রার্থনা (N 554 Ceremonies and Prayers at unearthing of treasure) অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। ডাকাতের পরিত্যক্ত সম্পদ লাভ করিয়া ভাগ্য পরিবর্তনের কথাও অনেক লোক-কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়। দুর্বল এবং অসহায় চরিত্র এই ভাবেই সম্পদ লাভ করিয়া তাহাদের দুর্গত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পায়।

অশোকা

এক মুনি তপস্যা করিয়া কুটীরে ফিরিতেছিলেন, দেখিলেন, অশোক গাছের তলায় এক হরিণী একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে, ধ্যানে জানিলেন, এ সন্তান তাঁহারই। কন্যা দেখিয়া মুনির মমতা হইল, কন্যাটিকে কাপড়ে জড়াইয়া নিজের কুটীরে লইয়া আসিলেন। অশোক গাছের তলায় পাইয়াছিলেন বলিয়া নাম রাখিলেন অশোকা। অশোকা ক্রমে ক্রমে বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। একদিন এক রাজা হরিণ শিকার করিতে আসিয়া ঐ কন্যাকে দেখিলেন। রাজা খোঁজ লইয়া জানিলেন, ঐ কন্যা মুনির। তখন রাজা মুনির নিকটে গিয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবেন এই প্রার্থনা জানাইলেন। মুনি সম্মত হইলে অশোকার সহিত রাজার বিবাহ হইল। রাজা অশোকাকে রাজধানীতে লইয়া চলিলেন। যখন অশোকা রাজার সহিত চলিয়া যান, তখন মুনি অশোকাকে কতকগুলি অশোক ফুলের বীচি দিলেন। বলিলেন যে, মা, রাজার আরও অনেক রাণী আছে; সুতরাং তুমি কখন কি অবস্থায় থাকিবে বলা যায় না। এই ফুলের বীচি পাল্কির দুই ধারে ছিটাইতে ছিটাইতে যাও, দুই ধারে গাছ হইবে। যদি কখন দুঃখ পাও, তবে ঐ গাছ দেখিতে দেখিতে এখানে আসিবে। এই বলিয়া কন্যাকে বিদায় করিলেন।

অশোকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়া রাজা দিনরাত্রি অশোকার মহলে থাকিলেন, আর রাজকার্যও দেখিলেন না, কি অন্য রাণীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিলেন না। ইহাতে অন্য রাণীদের মনে হিংসা হইল। তাহারা অশোকার শত্রুতা-সাধনের উপায় খুঁজিতে লাগিল। অশোকার সন্তান-সম্ভাবনা হইল। রাজা তখন অন্দরমহল সহিত তাঁহার বাহিরের ঘরের সহিত একটি ঘণ্টা বাঁধিলেন। অশোকাকে বলিলেন, তোমার যখন প্রসব বেদনা উঠিবে, তখন তুমি এই দড়ি ধরিয়া টানিলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে, আমি আসিব। আসিয়া সব ব্যবস্থা করিব।

এদিকে রাণীরা রাজা যখন বাহিরে থাকিতেন, তখন অন্দরমহলে ঢুকিয়া অশোকার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন। রাণীরা অশোকাকে বলিলেন, তুমি আমাদের ছোট বোন। তোমার সন্তান হইবে, আমরাই তোমাকে প্রসব

করাইব। রাজাকে বলিও। অশোকা রাজাকে বলিল যে আমার দিদিরাই আমাকে প্রসব করাইবেন। রাজা সম্মত হইলেন। তখন রাণীরা সর্বদা অশোকার মহলে যাতায়াত করিতে লাগিল। একদিন রাণীরা ঐ ঘণ্টার দড়ি দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি? অশোকা বলিল যে, আমার বেদনা উঠিলে ঐ দড়ি টানিলে ঘণ্টার শব্দ হইবে, তখন রাজা আসিবেন। রাণীরা তখন সময়ে অসময়ে যখন তখন ঐ দড়ি ধরিয়া টানিতেন এবং কে টানিয়াছে তাহা অশোকাকে রাজার নিকট বলিতে নিষেধ করিতেন।

রাজা ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিলেই তাড়াতাড়ি অন্দরমহলে ছুটিয়া আসিতেন। আসিয়া দেখিতেন, কিছুই না। অশোকাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, যদি বেদনা উঠে নাই, তবে আমাকে ডাকিলে কেন, অশোকা রাণীদের ভয়ে কিছুই বলিতেন না, চুপ করিয়া থাকিতেন।

বারম্বার ঐরূপ হওয়াতে রাজা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রাণীদের প্রতারণা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাণীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। যে দিন সত্য সত্যই প্রসব-বেদনা উঠিল, সে দিন অশোকা বারম্বার ঘণ্টার দড়ি ধরিয়া টানিলেও রাজা আসিলেন না। অশোকা প্রসব-বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। রাণীরা তখন সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া অশোকার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ কষ্ট পাইয়া অশোকা একটি সুন্দর পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু অচৈতন্য অবস্থায় থাকার জন্য অশোকা কিছুই জানিতে পারিল না। রাণীরা তখন পুর্ব পরামর্শ অনুসারে একটি নূতন হাঁড়িতে করিয়া শিশু-সন্তানটিকে হাঁড়িতে পুরিয়া সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল এবং একটি কাঠের পুতুলকে রক্ত মাখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা আসিলেন, তখন রাণীরা রাজাকে কাঠের পুতুল দেখাইল। রাজা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এ দিকে মুনি তখন নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় ঐ হাঁড়ি আসিয়া তাঁহার গায়ে লাগিল। মুনি ধ্যান করিয়া জানিতে পারিলেন যে ঐ হাঁড়িতে অশোকার পুত্র আছে। তৎক্ষণাৎ ঐ পুত্রটিকে কাপড়ে জড়াইয়া নিজের তপোবনের কুটীরে লইয়া গেলেন এবং যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন।

এদিকে এক বৎসর পরে অশোকার আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহাকেও রাণীরা ঐরূপ প্রণালীতে হাঁড়িতে পুরিয়া জলে ভাসাইয়া দিল এবং

রাজাকে কাঠের পুতুল দেখাইল। রাজার ঘৃণা হইল; কিন্তু রাজা অশোকাকে কিছুই বলিলেন না।

এদিকে মুনি সে ছেলেটিকেও লইয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। পর বৎসর অশোকা এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। রাণীরা পুর্বের মত তাহাকে হাঁড়িতে পুরিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন এবং রাজাকে কাঠের পুতুল দেখাইলেন। রাজা এইবার আর সহ্য করিলেন না। অশোকাকে পরিত্যাগ করিলেন। হুকুম দিলেন, তাঁহার গোহাল বাড়ীতে একটি কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করিয়া তাহাতেই অশোকাকে রাখিবে এবং সামান্য চাউল ডাইল তাহাকে প্রতিদিন রাঁধিয়া খাইতে দিবে। এত দিনে রাণীদের মনোবাঞ্ছা পুর্ণ হইল। রাজরাণী ভিখারিণী হইল। কিন্তু রাজা কিংবা অশোকা রাণীদের চক্রান্ত কিছুই জানিতে পারিলেন না। মুনি পুর্বের মত অশোকার কন্যাটিকেও লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

অশোকা গোহাল বাড়ীতে কুঁড়ে ঘরে বাস করিতে লাগিল। তেল অভাবে মাথায় জটা পড়িল, গায়ে খড়ি উড়িল, বস্ত্র অভাবে শতচ্ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া রহিল। দিন রাত ঘরের মধ্যে বসিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিত। এক দিন ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখিল বাড়ীর বাহিরে দুই ধারে অশোক ফুলের গাছ সার বাঁধিয়া চলিয়াছে। তখন মনে পড়িল, এ গাছ তো আমারই হাতের। গাছগুলি তখন বেশ বড় বড় হইয়াছে। তখন মনে পড়িল, বাবা যে বলিয়াছিলেন, যদি কোন দিন দুঃখ পাও, তবে এই গাছ দেখিয়া আমার কাছে আসিও। অশোকা অমনি চলিতে আরম্ভ করিল। গাছ দেখিয়া ক্রমে তিনি মুনির তপোবনে প্রবেশ করিল। মুনির তপোবনে কয়েকটি ছোট ছোট বালকবালিকা ছিল, তাহারা পাগল মনে করিয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। মুনি ধ্যানে জানিতে পারিলেন যে, অশোকা আসিয়াছে। অমনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া শিশুদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, কাহার গায়ে ঢিল ছুঁড়িতেছ, ও যে তোমাদের মা।

তখন অশোকাকে সকল বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মায়ের পরিচয় করিয়া দিলেন। মুনির যত্নে অশোকা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। অশোকা ছেলেমেয়ে লইয়া মুনির তপোবনে রহিল। ছেলে মেয়েরা একটু বড় হইলে মুনি সকলকেই এক একটি কাঠের ঘোড়া তৈয়ার করিয়া দিলেন এবং কি করিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়া নগরে পাঠাইলেন। ছেলে-

মেয়ে তিনটি রোজ নগরে গিয়া রাজবাড়ীর অন্দরের পুষ্করিণীতে ঘোড়া লইয়া খেলা করে। ঘোড়াকে জল খাওয়ায়, জল ঘোলা করে, জল ছিটায়। রাণীরা ঐ ঘাটে স্নান করে। রাণীরা আসিয়া দেখিল, তিনটি বালক-বালিকা ঘাটে খেলা করিতেছে। কাঠের ঘোড়াকে জল খাওয়াইতেছে। বলিতেছে, পিও পিও, কাঠের ঘোড়া, জল পিও। রাণীরা বলিল, কাঠের ঘোড়াকে জল খাওয়াইতেছ, কাঠের ঘোড়া কখন জল খায়? ছেলেমেয়েগুলি অমনি বলিল, মানুষের পেটে কখন কাঠের পুতুল হয়? এই কথা শুনিয়া রাণীদের মনে সন্দেহ হইল—অশোকার ছেলেমেয়ে নয় ত! রাণীদের মনে ভয় হইল। রাণীরা তখন শিশুদের তাড়াইবার চেষ্টা করিল। বলিল, তোমরা কেন এ ঘাটের জল নষ্ট করিতেছ, তোমরা এ পুকুরে আর কখন আসিও না। তাহারা বলিল, আমরা কিছুতেই যাইব না। তখন রাণীরা গিয়া রাজার কাছে নালিশ করিল, তিনটি ছেলেমেয়ে অন্দরের ঘাটে আসিয়া কাঠের ঘোড়া লইয়া জল ঘোলা করে, আমাদের গায়ে জল ছিটাইয়া দেয়, আমাদের গালাগালি করে।

রাজা হুকুম দিলেন, এখনই ধরিয়া আনিয়া হাজির কর। তখন রাজার পাইক বরকন্দাজ ছুটিয়া গিয়া বালক-বালিকা তিনটিকে ধরিয়া রাজার কাছে লইয়া আসিল।

রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা রাণীদিগকে গালাগালি করিয়াছ কেন, তাহাদের গায়ে জল দিয়াছ কেন? তাহারা বলিল, আমরা রাণীদের কিছুই করি নাই। আমরা কাঠের ঘোড়াকে জল খাওয়াইতে-ছিলাম; রাণীরা বলিলেন, কাঠের ঘোড়াকে জল খাওয়াইতেছ কেন, কাঠের ঘোড়া কি জল খায়, আমরা বলিয়াছি, মানুষের পেটে কি কাঠের পুতুল হয়, এই কথা বলিয়াছি, আর কিছুই করি নাই।

রাজা শুনিবা মাত্র চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমাদের বাড়ী কোথায়, তোমাদের বাপ মা আছে কিনা। তাহারা বলিল, আমাদের মা আছে, বাপ নাই, আমরা এই নগরের বাহিরে বনের মধ্যে থাকি। তখন রাজা বলিলেন, তোমাদের সঙ্গে গিয়া তোমাদের বাড়ী দেখিয়া আসি, চল।

তখন রাজা বালক-বালিকার সঙ্গে মুনির তপোবনে প্রবেশ করিলেন। মুনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক-বালিকাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ কি? রাজা বলিলেন, না, আমি জানি না, উহারা কাহার সন্তান। তখন মুনি

বলিলেন, উহারা তোমারই সন্তান। তুমি এমনই নির্বোধ যে মানুষের পেটে যে কাঠের পুতুল হইতে পারে না, তাহা একবার খোঁজ করিয়াও দেখিলে না। আমার মেয়ে অত্যন্ত সরল, সে বনের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছে, সংসারের ছলনা চাতুরী প্রবঞ্চনা কিছুই জানে না। বিনা অপরাধে তাহাকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছ। আমি আর তাহাকে পাঠাইব না, তুমি রাজধানীতে ফিরিয়া যাও।

তখন রাজা মুনির পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মুনি কোন ক্রমেই মেয়েকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। রাজা কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। মুনি বলিলেন, ঐ রাণীরা বাড়ীতে থাকিলে আমি কখনই মেয়ে পাঠাইব না। রাজা বলিলেন, আমি গিয়া রাণীদের ব্যবস্থা করিয়া ইহাদিগকে লইয়া যাইব। এই বলিয়া রাজা চলিয়া গেলেন।

বাড়ী গিয়া রাণীদের ডাকিয়া আনিয়া বিচার করিয়া রাণীদের নির্বাসনে পাঠাইলেন এবং পুত্রকন্যা সহিত অশোকাকে বাড়ী লইয়া আসিলেন।

—পাবনা, বিমলা দেবী সংগৃহীত

মন্তব্য

ইহাতে প্রথমই অস্বাভাবিক জন্ম অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। অশোকা হরিণীর গর্ভজাত এবং মুনির ঔরসজাত কন্যা। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরও অনুরূপ ভাবেই জন্ম হইয়াছিল। রামায়ণের কাহিনীতে লোক-কথার প্রভাব আছে। পথের নির্দেশ জানিবার জন্য ফল-ফুলের বীচি পথের দুই পাশে ছড়াইয়া যাওয়াও লোক-কথার অন্যতম অভিপ্রায়। অন্দর মহলের সঙ্গে রাজ-দরবারের শিকলের মধ্য দিয়া যোগাযোগ রক্ষা করা এবং তাহার অপব্যবহারের কথা সাতভাই চম্পার কাহিনীটিতেও শুনিতে পাওয়া যায়। পরিত্যক্ত শিশু বা Abandoned child অভিপ্রায়টিও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। দুষ্কার্যের শাস্তি বা Misdeed punished ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। লোক-কথার সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যায়কারিণী রাজরাণী হইলেও শাস্তিলাভ না করিয়া যায় না ; রাজা এখানে কোন দয়াধর্ম দেখান না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্বুদ্ধিতার কথা

বাংলার লোক-কথার একটি প্রধান অংশকে নির্বুদ্ধিতার কথা বলিয়া উল্লেখ করা যায়। এই সকল কাহিনী সাধারণতঃ কৌতুক-রসমিশ্রিত। সেই জন্য কেহ কেহ ইহাদিগকে হাস্য-রসাত্মক কাহিনীরও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। বাংলার সামাজিক এবং পারিবারিক জীবন হইতে এক শ্রেণীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া ইহারা প্রধানতঃ রচিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে জামাতার চরিত্রই প্রধান। জামাতার সঙ্গে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের যে সম্পর্ক, তাহাতে তাহাকে নানাভাবে যে নির্বোধ বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহার একটি গূঢ় অর্থ আছে। জামাতা পরিবারের একজন প্রচ্ছন্ন শত্রু; কারণ, পরিবারের একটি কন্যাকে সে উদ্বাহ করিয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ সে কন্যা উদ্বাহনকারী অপহারক (abductor)। যদিও এই অপহরণ কর্মের মধ্যে সামাজিক সমর্থন আছে, তথাপি ইহা পরিবারস্থ সকলের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ক্রমে ক্রমে বেদনা সহিয়া যায়; কিন্তু বেদনার অনুভূতি সেখানে অস্বীকার করা যায় না। সেইজন্য জামাতার প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন আক্রোশের ভাব থাকিয়াই যায়। সেই ভাব কখনও জামাই ঠকানো কিংবা শ্যালক-শ্যালিকাদিগের জামাইর প্রতি দৈহিক উৎপীড়নরূপে, কখনও বা জামাইর চরিত্রে নির্বুদ্ধিতার পরিকল্পনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। জামাইকে নির্বোধ মনে করিয়া পরিবারস্থ লোক যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তাহাতেই তাহার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা-গ্রহণ সফল হয়। সেই জন্য জামাইর নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে প্রত্যেক দেশেই অসংখ্য কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

এই শ্রেণীর কাহিনী উদ্ভাবনের আরও কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ পৃথিবীর সকল দেশেই শাশুড়ী জামাতার সম্পর্কটি একটি জটিল সম্পর্ক। পৃথিবীর অনেক উপজাতির মধ্যেই জামাই কর্তৃক শাশুড়ীর মুখ দেখা নিষেধ (taboo)। আমাদের দেশেও একদিন তাহাই ছিল। সে দিনও বাংলার পরিবারে শাশুড়ীরা জামাতার সম্মুখে সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া সমুখে বাহির হইতেন, কদাচ জামাতার সঙ্গে কথা বলিতেন না। ইংরাজিতে ইহাকে avoidance বলে। শাশুড়ী-জামাতা avoidance বা বাক্যালাপ পরিহার বহুদেশের আদিবাসীদের মধ্যে

এখনও প্রচলিত আছে। বাক্যালাপ পরিহার হইতে জটিল মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া নানাভাবে দেখা দেয়। জামাতাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করা তাহারই একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র।

শাশুড়ী জামাতা সম্পর্কিত অনেক লোক-কথা অনেক সময় শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করিয়া যায়, ইহারও একটি সুগভীর সমাজতত্ত্ব-মূলক কারণ আছে। তবে তাহা এখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

বোকা জামাইর গল্পের মধ্যে ঘর-জামাইর বোকামির গল্পই সর্বাধিক শুনিতে পাওয়া যায়। ঘর-জামাই বাংলার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে একটি উপসর্গের মত। যে পরিবারে সে বাস করে, সেই পরিবারের কাহারও সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সে জড়িত নহে; সুতরাং তাহার সেখানে অবস্থান অনধিকার প্রবেশেরই মত। ইহার উপরই তাহার নির্বুদ্ধিতার কাহিনী প্রধানতঃ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। আধুনিক সাহিত্যেও বাংলার নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ঘরজামাই সম্পর্কে 'জামাই বারিক' নামে যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহার জীবন যেমন বাস্তব, তেমনই কৌতুক-রসাশ্রিত; জামাইর নির্বুদ্ধিতার জীবন্ত রূপ তাহাতে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

ঘর-জামাই যাহার গৃহে পালিত হয়, তাহারও সামাজিক অপমান প্রকাশ পায়। কারণ, অপদার্থ এবং আত্মসম্মানবোধ বিসর্জন দিতে না পারিলে কেহই ঘর-জামাই হইতে পারে না। ইহাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিতে গিয়া শ্বশুর শাশুড়ী প্রতিবেশীদিগের নিকট যে কতভাবে উপহাসাস্পদ হন, তাহাও কাহিনীগুলির মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

বাংলার সমাজে ঘর-জামাইর কাহিনীর ব্যাপকতার একটি প্রধান কারণ, এ' দেশের কুলীন সমাজ। কুলীনেরা প্রধানতঃ ঘরজামাই। কন্যাগত কুল বলিয়া এই দেশের অনেক সমৃদ্ধ পরিবারকে কুলীনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকেও কন্যাসহ ঘরেই রাখিতে হইত। তাহাদিগকে লইয়া সমাজে নানা কৌতুককর কাহিনী রচিত হইয়াছে।

এ' দেশের সমাজের বিশ্বাস ঘর-জামাই মাত্রই নির্বোধ, দরিদ্র, অকর্মণ্য এবং অপদার্থ। নতুবা নিজের পিতৃসংসার ছাড়িয়া সে আসিবে কেন? এইজন্যই সে নির্বুদ্ধিতার কাহিনীর নায়ক।

কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বোকা ঘর-জামাইয়ের একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এক ঘর-জামাই রাত্রে শ্বশুরের ক্ষেতের ফসল পাহারা দিত। একদিন রাত্রিকালে সে একটি হাতী দেখিতে পাইল, হাতীটি স্বর্গ হইতে নামিতেছিল। ইহা যখন পুনরায় স্বর্গে উঠিয়া যাইতেছিল, তখন সে ইহার লেজ ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল, এই ভাবে সে স্বর্গে উঠিয়া গেল, পরের দিন সেই হাতিরই লেজে ধরিয়া স্বর্গ হইতে মাটিতে নামিল। তাহার স্বর্গ-ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়া তাহার গ্রামবাসীরাও স্বর্গ ভ্রমণের অভিলাস জানাইল। সে গিয়া হাতির লেজ ধরিল এবং গ্রামবাসীরা একজন আর একজনের কোমরে জড়াইয়া ঘর-জামাইকে ধরিয়া রহিল। ঝুলন্ত অবস্থায় একজন গ্রামবাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল, স্বর্গ দেখিতে কেমন, তখন ঘর-জামাই ভ্রমবশতঃ হাতীর লেজ ছাড়িয়া দিয়া হাত নাড়িয়া দেখাইতে গেল, স্বর্গ কেমন। তাহাতে সকলেই ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

এক ঘর-জামাই তাহার শ্বশুরের সঙ্গে নদীতীরে বেড়াইতে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, শ্বশুর মশাই, নদী যে এত গভীর, ইহার মাটিগুলি কোথায় গেল? শ্বশুর মহাশয় জবাব দিলেন, ইহার কিছু আমি খাইয়াছি, আর কিছু তোমার পিতা খাইয়াছেন। ইহা গভীর ব্যঙ্গাত্মক।

ঘর-জামাইর কাহিনীর পর পেটুক ও লোভী জামাতার কাহিনীও সুবিদিত। বাংলার পারিবারিক জীবনে জামাতা এবং শ্বশুরের মধ্যে প্রায়ই অর্থের অসমতা থাকে। শ্বশুর ধনী, জামাতা প্রায়ই দরিদ্র; কারণ, কৌলীন্যই তাহার কারণ। সেইজন্য ধনী শ্বশুর-গৃহে দরিদ্র জামাতার লোভের বিষয় লইয়া বহু কাহিনী রচিত হইয়াছে।

শ্বশুর-গৃহে গিয়া জামাতা অন্ধভাবে মায়ের উপদেশ পালন করিয়া হাস্যাস্পদ হইবার বহু কাহিনীও শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহের রাত্রে জামাতার নানা হাস্যকর আচরণ লইয়াও বহু কাহিনী রচিত হইয়াছে। বিবাহ রাত্রে জামাই ঠকানো এবং শ্যালিকার কানমলা ইহাদেরই অঙ্গ। রাতকানা জামাইর কাহিনী অবলম্বন করিয়া আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্যে অমৃতলাল বসু কর্তৃক একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক রচিত হইয়াছে। বোকা স্বামীর কাহিনীও নির্বুদ্ধিতার কাহিনীর একটি প্রধান অংশ।

জামাই ব্যতীতও বামুন, তাঁতী বা জোলা এবং পশুর মধ্যে বাঘের চরিত্র অবলম্বন করিয়াও নির্বুদ্ধিতার অসংখ্য কাহিনী রচিত হইয়াছে।

১

মটকী

এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, তার সাত ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের নাম মটকী। মেয়ের মাথায় তিনখানি করিয়া মটুক ফোটে, একখানা স্বর্গে যায়, এক থানা মর্ত্যে যায়, একখানা কেটে রাখে, তাই দিয়েই খাওয়া পরা চলে। এক দুই করে বার বৎসর যায়; মটকীর মা ছেলেদের বলিল যে মটকী হ'তেই খাওয়া পরা, এখন একজন অবোধ গোবোধ দেখে এনে মটকীকে বিয়ে দাও; দিয়ে মটকীকেও ঘরে রাখ।

ভাইরা তখন বর খুঁজিতে বাহির হইল। বাহির হইয়া দেখে নদীর ধারে একটি গাছের উপর বসিয়া একটি ব্রাহ্মণ যে দিকে নদী, সেই দিকের ডাল কাটিতেছে। পড়িলে স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, সে বোধ নাই। তখন তাহারা বলিল, যে ডালে বসে, সেই ডালই কাটে, তার তুল্য বোকা আর নাই। আমরা একেই নিয়ে গিয়ে মটকীর সঙ্গে বিয়ে দেব।

তখন ভাইরা ব্রাহ্মণটিকে বলিল ওহে, তুমি নেবে আমাদের সঙ্গে এসো। ব্রাহ্মণ বলিল, মার আমার দ্বাদশী, সেই জন্য কাঠ কাটছি। আমার নাম কালিদাস। তখন হইতে তাহারা তার অবোধ কালিদাস নাম রাখিল। বাড়ীতে লইয়া গিয়া, ডাকিল, মা! আমরা এক অবোধ ব্রাহ্মণ এনেছি। সে নদীর ধারে যে ডালে ব'সেছিল, সেই ডালই কাটছিল; ইহা হইতে আর অবোধ নাই; ইহার সঙ্গে বোনটির বিয়ে দাও। মা তার মটকীর বিয়ে দিলেন।

মটকীর ভোর রাতে মাথায় তিনটি সোনার মটুক ফোটে, একটি স্বর্গে যায়, একটি পাতালে যায় ও একখানি সোনার ঝারির জল মটকীর মুখে ছিটে দিয়ে মাথায় বাতাস করে, মায় ভেঙ্গে রেখে দেয়। এমনি করে দিন যায়। একদিন মোয়া নাড়ু হেঁকে যাচ্ছে; নাতিরা বলিল, দিদিমা, মোয়া নাড়ু খাব। দিদিমা বলিলেন, হাঁ! সাতে পাঁচে খায়, মোয়া নাড়ু চায়, যা! মোয়া খেতে হবে না। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে গিয়া বলিল, মা মোয়া নাড়ু হেঁকে যাচ্ছিল, আমরা খাইতে চাহিলাম। দিদিমা বলিলেন, সাতে পাঁচে খায়, মোয়া নাড়ু চায়—যা, খেতে হবে না।

তখন মটকী বলিল, 'যার খায় যার পরে তার ছেলেদের এই বলে', দাঁড়াও আর মটুক দেবো না। রাত্রে কালিদাসকে বলিল, দেখ, শেষ রাত্রে আমার মাথায় তিনটি করে সোনার মটুক ফোটে; তুমি আমার মাথার শিয়রে

এক ঝারি জল রাখিবে, একখানি পাখা রাখিবে; রেখে শেষ রাত্রে উঠে মুখে জলের ছিটে দিবে, মাথায় বাতাস দিবে, দিয়ে একখানি ভেঙ্গে রাখিবে, অপর দুইখানি যে থাকিবে, তাহার এক খানি স্বর্গে যাবে, এক খানি মর্ত্যে যাবে। দরজা দিয়ে শুইও।

মটকীর কথা মত কালিদাস প্রস্তুত হইয়া রহিল। শেষ রাত্রে দেখে যে ঘরময় আলো হ'য়ে উঠেছে, তাড়াতাড়ি উঠে মটকীর মুখে জলের ছিটা দিল, সোনার ঝারির জল দিল, দিয়ে একখানি মটুক ভেঙ্গে রাখিল, অপর দুইখানির একখানি স্বর্গে গেল, একখানি মর্ত্যে গেল। ভোর রাতে দরজা খুলে শুয়ে রইল। পরে শাশুড়ী এসে দেখেন—ওমা! আজ ত মটুক নাই। কি হইল, এইরূপ মনে মনে করিতেছেন। তার পর দিনও দেখেন যে মটুক নাই। অবোধ কালিদাস না সুবোধ হইয়াছে। ছেলেদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কালিদাসকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন।

বিকালে মট্‌কী চুল বাঁধিতেছে, একটা কাক কা কা করিয়া সামনে এলো, চিরুণী ছুঁড়িয়া মারিতে কাকটা সোনার চিরুণী লইয়া উড়িয়া গেল, মট্‌কী অমনি তার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে চলিল। কাক চিরুণীটা এক জায়গায় দামের মধ্যে ফেলিয়া দিল। মটকী দাম সরাইয়া চিরুণী খুঁজিতে খুঁজিতে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতে পাইল, কাদা সরাইয়া দেখে যে, ওমা! কালিদাসকে না ভাইরা এখানে দামের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়াছে, তাড়াতাড়ি কাদা ধুইয়া বাড়ীতে লইয়া গেল। কালিদাস সুস্থ হইলে মটকী বলিল, তোমার বাড়ীতে লইয়া চল, এখানে আর থাকিব না। কালিদাস বলিল, আমার বাড়ীতে এক বুড়ী মা আছেন, এত দিন বেঁচে আছেন কি না, কে জানে। মটকী বলিল, চল সেখানেই যাই। তখন মটকী ছেলেদের লইয়া কালিদাসের সঙ্গে তার বাড়ী চলে গেল।

কিছুদিন বাদে তাহারা নিজের গ্রামে গিয়া পৌছিল। কালিদাসের মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ মত হয়েছেন। পাড়াপ্রতি বেশীরা আসিয়া বলিল, ও বুড়ী, তোর বৌ ছেলে নাতিরা এসেছে, বেরিয়ে এসে ত্যাখ।

বুড়ী বলিল, হ্যাঁ, কোন্ দিন কালিদাস নদীতে ডুবেছে, আর আসবে! তাহারা বলিল, তুই বাহিরে এসেই দেখ। তখন বুড়ী আসিয়া দেখিল, সত্যই ত কালিদাস বউ নাতিরা সব এসেছে। আহ্লাদে তাড়াতাড়ি ঘরে তুলিল। এমনি করে কিছুদিন যায়। বুড়ী সব যায়গায় যায়, আর শুনে—ঘাট কার না মটকীর, হাট কার না মটকীর, পথ কার না মটকীর। শুনিয়া শুনিয়া বুড়ীর

হিংসা হইল, বলিল, সবই মটকীর, আমার কালিদাসের কিছুই না। বুড়ী করিল কি—দুই ছেলে নিয়া সোনার ভাটা হাতে দিয়া কুমোরের মাটির পণের মধ্যে বসাইয়া আসিল—এই মনে ক'রে যে পণে আগুন দিলে ছেলেরা মরে যাবে। কুমোর সকালে উঠে পণে আগুন ধরাতে যায়, আগুন আর জলে না, অনেকক্ষণ পরে কচি ছেলের হাসি শুনে দেখে যে মটকীর দুই ছেলে দুই সোনার ভাটা লইয়া খেলা করিতেছে। সর্বনাশ! এখনি না দুই ছেলে পুড়ে মরে যেত, দেবতার কোপে পড়ে ত আমার সর্বনাশ হ'ত! এই না ব'লে দুই ছেলেকে কোলে করিয়া মটকীর কাছে গিয়া বলিল, মা, এখনি না আমার সর্বনাশ হ'তো! তোমার দুই ছেলে না পোণের মধ্যে গিয়ে খেলা করছে। ভাগ্যে পোণে আগুন ধরে নাই। মটকী জানিতে পারিলেন, শাশুড়ীর এই কাজ, তখন মনের দুঃখে বলিলেন—

মায় মারল স্বামী,
শাশুড়ী মারল পুত।
কার কথা কারে কব
মটকী অবধূত॥

এই না বলিয়া ছেলেদের ঘর-সংসার বুঝাইয়া দিয়া নিজেরা সংসার ত্যাগ করিলেন। —পাবনা, বিমলা দেবী ১৩৪০

মন্তব্য

সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী কবি কালিদাস সম্পর্কিত প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে তাহার মত মূর্খ আর ছিল না, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই কাহিনীটি রচিত হইয়াছে। কালিদাস এখানে ঘর-জামাই; শেষ পর্যন্ত মটকীর বুদ্ধির উদয় হইবার ফলে ঘর-জামাইর জীবন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজের সংসারে ফিরিয়া আসিল। মটকীর শাশুড়ীর আচরণটি অত্যন্ত মানবিক। পুত্রবধূর খ্যাতি তাহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্ময়কর ঘটনা বা Marvel ইহার প্রধান অভিপ্রায়। মানুষের মাথা হইতে প্রতিদিন তিনটি সোনার মুকুট ফুটিয়া বাহির হইত, ইহাই ইহার বিস্ময়কর (marvel) অভিপ্রায়। পাশ্চাত্ত্য উপকথার হংসের স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিবার সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে।

২

ছুতোরের খাট

এক ছুতোর ছিল, তার ছিল এক স্ত্রী ও এক মেয়ে। ছুতোরের স্ত্রী ভারী কুঁদুলে। একবার ছুতোরের ভারী অসুখ হয়েছিল। তার ফলে সে মারা গেল। তখন ছুতোরণী পরের বাড়ী ধান ভেনে কাটাতে লাগলো। ছুতোরের মেয়ে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠলো। তখন ছুতোরণী পাড়ার আর সব ছুতোরকে বললে, আমার মেয়েটার এবার বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দাও।

কিন্তু ছুতোরণীর কুঁদুলে স্বভাবের কথা শুনে কেউ তার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী হলো না। শেষে পাড়ার এক বোকা ছুতোরের ছেলেকে ছুতোরণীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের দেবার ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু ছেলেটা বড় কুঁড়ে। সে বললে, আমি বিয়ে করবো না। পাড়ার লোকজনের অনুরোধে সে অবশেষে রাজী হলো এবং বললে, আমি বাপু কোন কাজ কর্ম করতে পারবো না। ছুতোরাণী বললে, তাই হবে। ছুতোরাণীর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

ছুতোরণীর জামাই বসে বসে থাকত। কোন কাজকর্ম করত না। একটা কাকও তাড়াত না। ছুতোরণী তার পাড়াপড়শীদের সে সব কথা বললো। তারা সবাই জামাইকে বকাবকি করলো। একদিন পাড়ার জোয়ান ছেলেরা বনে কাঠ কাঠতে গেল। ছুতোরণীর জামাইকেও সঙ্গে নিয়ে গেল। সে বনে গিয়ে একটা রসালো গাছের ডাল কেটে বসে রইলো। সন্ধ্যের সময় বাড়ী ফিরলো ডালটা নিয়ে।

বাড়ী এসে সে শাশুড়ীকে বললে, আজ রাতে আমি কাজ করব। একটা তেলের বাত্তি জ্বালিয়ে দিয়ো এবং শ্বশুরের যন্ত্রপাতিগুলো বের করে দিয়ো। সারারাত জেগে ছুতোরণীর জামাই একটা ছোট খাট তৈরী করলো এবং সেটা নিয়ে হাটে বিক্রি করতে গেল। কিন্তু সেটা এত ছোট যে কেউ কিন্‌লো না। বরং সকলে দেখে হাসলো। সে দেশের রাজার একটা নিয়ম ছিল যে হাটের কোন জিনিস যদি বিক্রি না হয়, তবে সেটা উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তিনি কিনে নিতেন।

ছুতোরের খাটটাও রাজার বরকন্দাজ এসে কিনে নিয়ে গেল এবং ছুতোরকে রাজার সঙ্গে দেখা করতে বললো। রাজা দাম দিতে চাইলে ছুতোর

বললে, এর আর কি দাম দেবেন। আপনি ব্যবহার করুন। পরে দাম দেবেন।

রাজা সে রাতে খাটটায় শুতে গেলেন। কিন্তু এত ছোট খাট যে তাতে ঘুমানো যায় না। রাজার চোখে ঘুম নেই। প্রথম প্রহরে রাজা দেখলেন খাটের একটি পায়া খট্‌খট্ করে বেরিয়ে পড়লো এবং বাকি তিনটি পায়াকে বললো, তোরা একটু আমার দিকটা ঠেকা দিস। আমি একটু ঘুরে আসি। এভাবে বাকী পায়াগুলো প্রহরে প্রহরে বেরিয়ে পড়ল।

রাজা সব শুনলেন। একটি একটি পায়া তাদের রাতের অভিজ্ঞতা বলতে লাগলো। রাজা সব কথা শুনলেন। প্রথম পায়ার সঙ্গে রাতে দেখা হয়েছিল এক যক্ষের। যক্ষের অজস্র মোহর। সেগুলো সে বেলগাছের তলায় বসে আগলাচ্ছে। দ্বিতীয় পায়ার সঙ্গে রাক্ষসের দেখা হলো। তৃতীয় পায়ার সঙ্গে খোক্কসের দেখা হলো। চতুর্থ পায়া দেখলো একটা কেউটে সাপ রাজার জুতোর মধ্যে বসে আছে। সব কথা রাজা শুনলেন।

ভোর হয়ে এলো। রাজা তার সিপাইদের সব বললেন এবং যক্ষের মোহর, কেউটে সব সকালে দেখলেন। রাজা খুসি হয়ে ছুতোরকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে প্রচুর মোহর উপহার দিলেন। এইভাবে বোকা জামাই বড়লোক হয়ে গেল। তার আর কিছু কষ্ট রইলো না। পাড়ার লোক দেখে অবাক হলো। ছুতোরণী তার বোকা জামাইকে দ্বিগুণ আদর করতে লাগলো। এইভাবে সুখে বাকী জীবন কাটিয়ে দিল।

মন্তব্য

ইহার মূল অভিপ্রায় ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন (Magic) খাট। সংস্কৃত কথাসাহিত্য 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'র প্রভাব ইহাতে সক্রিয়। এখানেও নায়ক ঘর-জামাই।

৩

টিপ্‌টিপি

এক গ্রামে এক তাঁতী ছিল। তার মাত্র একটি ছেলে ; নাম তার দুলাল। ছেলে দেখতে শুনতে বেশ : স্বভাব খুব নম্র। যে যা বলে সে তাই করে। আজকাল সে পাশের গাঁয়ে পড়তে যায় পায়ে হেঁটে। আর তাদের গাঁয়ের আর ছেলের সবাই যায় ঘোড়ায় চড়ে। দুলালের ঘোড়া না থাকায় সবাই তাকে ঘোড়া ধরা করায়। তবে এক আধবার চড়তে দেয়। কিন্তু এইভাবে ঘোড়া ধরা তার ভাল লাগল না। তাই সে একদিন তার বাবাকে বললো, "বাবা, আমাকে ঘোড়া কিনে দাও, না তো। আমি পাঠশালায় যাবো না।"

বাবা বললেন, "আচ্ছা, বাবা, তা হবে। আমি তোর জন্যে একটি ঘোড়ার ডিম কিনে নিয়ে আসবো। ডিমের ঘোড়া খুব সতেজ ও সবল হবে।" এই বলে তার বাবা কেবল একশত এক টাকা নিয়ে ঘোড়ার ডিমের খোঁজে বেড়িয়ে পড়লো। গাঁয়ে ঢুকে হাঁকতে হাঁকতে যায়, "ঘোড়ার ডিম আছে গো, ঘোড়ার ডিম আছে গো।" তবে সত্যকারের ঘোড়ার ডিম তো নাই। তাই কেউ কেউ এসে বলে; "কোথাকার পাগলা রে।" বহুরূপী দুনিয়া। উত্তম, মধ্যম, অধম—সকলেরই বাস এখানে। কয়েক দিন ঘোরার পর একদিন এক ধূর্তবাজ লোক এসে বললো, "হ্যাঁ, ঘোড়ার ডিম আছে, তবে দাম লাগবে একশো এক টাকা। তার কমে দেবো না।" কোথাও না পেয়ে কেবলরাম তাতেই স্বীকার হলো।

তখন লোকটা বললো, "আজতো আর হবে না। আজ আমার বাড়ীতে থাক ; কাল খুব সকালে শুচি হয়ে ডিম নিয়ে চলে যাবে। ডিম খুব ভাল, পক্ষীরাজ ঘোড়ার ডিম। নিয়ে যাবার সময় ডিম নিয়ে মলত্যাগ বা প্রস্রাব করা হবে না, আর মাটিতে ঠেকান হবে না ; মাটি স্পর্শ করা মাত্র বাচ্চা হয়ে ছুটতে থাকবে। যত দেরী করে বাচ্চা তোলাবে, বাচ্চা তত সবল ও সতেজ হবে। বাড়ী গিয়ে আঁধার ঘরে টুলির উপর কয়েকদিন রাখার পর বাচ্চা তোলাবে, তা'হলেই ঠিক হয়ে যাবে।" এই সমস্ত উপদেশ দেওয়ার পর তাঁতীকে আচ্ছা করে পচা ঘিয়ের লুচি মিষ্টি ইত্যাদি খাইয়ে দিলে। যাতে তাঁতী ঘন ঘন দাস্ত যায়। তারপর তাঁতী ঘুমিয়ে পড়লো।

আর এদিকে সেই লোকটা একটা বড় চাল কুমড়াকে বেশ করে খড়ি মাখিয়ে আরও সাদা করে নাকে তেল দিয়ে আরামে ঘুমাতে লাগলো। টাকা কয়টি সে বুদ্ধিমানের মত আগেই নিয়ে রেখেছে।

তারপর ভোর হলে তাঁতীকে ডিমটি দিয়ে নিয়মগুলি পুনরায় স্মরণ করিয়া দিল। তাঁতী চাল কুমড়াটি নিয়ে চলতে লাগল।

পথে যেতে যেতে তাঁতীর পেট গোঁ করে ডেকে উঠেছে। বরুণ দেবের অত্যধিক চাপে অস্থির। বেগ আর সামলানো যায় না। ডিম নিয়ে ওকর্ম করা নিষেধ, আবার মাটিতেও রাখা হবে না, অথচ বরুণ দেবের দারুণ পীড়াপিড়ি, কি করে, নিকটবর্তী একটা বেনার ঝাড়ের উপর ডিমটি রেখে সেখানেই মাটিত বসে গেলো। এখন হয়েছে কি, সেই ঝাড়ের মধ্যে ছিল এক গর্ত, আর তাতে ছিল এক শিয়াল। এখন সেই ফড়্ ফড়্ ফড়াম্ করে শব্দ করা, আর অমনি সেই গর্ত থেকে বেরিয়ে শিয়ালটা দিল এক ছুট্। তাঁতীর প্রস্রাব তখন বাতায়। ডিমটা গর্তে ঢুকে গেছে আর শিয়ালটা ছুটছে। অতএব তাঁতী মনে করলো, ঘোড়ার বাচ্চা ছুটছে। তখন সেও লাগলো ছুটতে। প্রকাণ্ড বড় মাঠ। তাঁতী যত ছোটে, শিয়াল তত ছোটে। মেঘে তখন টিপ টিপ করে জল পড়ছে। সারাদিন ছুটাছুটির পর শিয়াল কোথায় লুকিয়ে গেলো, তাঁতী তাকে দেখতে পেলে না।

কি করে, তাঁতী হতাশ। আহা, কি সুন্দর আর কি সবল বাচ্চা! অনেকটা রাত্রিতে তাঁতী এক গাঁয়ে এক মোড়লের চালায় আশ্রয় নিলে। সারাদিন এত পরিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও শোকে, দুঃখে, ও ক্ষুধায় তাঁতীর আর ঘুম আসে না। সে চুপ করে বসে বসে ভাবে, তার ঘোড়ার বাচ্চা কোন দিকে গেলো। এমন সময় হয়েছে কি, সেই বাড়ীর একটা ছেলে বলছে, "বাবা, বাবাগো, বাইরে যাবো, ও বাবা বাইরে যাবো।" তখন প্রায় দুপুর রাত। আর টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। তার বাবা উঠে বলছে "ধেত্তুর ছেলে, কেরে, বাইরে যাব, নাই বাঘার ভয়, টিপটিপির ভয় বেশী। টিপটিপ করে জল পড়ছে আর ও বাইরে যাবো।"

সেই সময় একটা বাঘ মোড়লের ঘরের পাশ দিয়ে চলতে চলতে মোড়লের কথা শুনে ভাবতে ভাবতে আসছে, যে বাঘের ভয় নাই, টিপটিপির ভয় বেশী; তাহলে টিপটিপ তো আমার চেয়ে শক্তিশালী। যাক বাপু, তার সঙ্গে যেন আমার দেখা না হয়। ভাবতে ভাবতে বাঘ যেই একটু এগিয়ে এসেছে

আর তাঁতী তড়াক করে বাঘের উপর চড়ে "পেয়েছি রে" বলে জোরে চীৎকার। বাঘের তখন আত্মারাম প্রায় খাঁচা-ছাড়া, আর মোড়লের পুত্র তখন বিছানা সুবাসিত করছে। বাঘ প্রাণের বিকুলীতে ছোটে। আর তাঁতী বলে, "যতই ছোটো, আর তোমাকে ছাড়ছি না।" এইভাবে বাঘ সারা রাত্রি ছুটে বেড়ায়, আর তাঁতী কেবলরাম তার পিঠে বসে খামচে ধরে থাকে বাঘটাকে আর দাস্ত প্রস্রাব সব কিছু সেই বাঘের উপরে হয়।

তারপর যখন সকাল হলো, তখন ঘোড়ার চেহারা দেখে তাঁতীর আক্কেল গুড়ুম্। সর্বনাশ, একি! এ যে বাঘ। এখন কি করি! নামলে তো বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলতে পারে। কিছুক্ষণ পরে বাঘ একটা বট গাছের নীচে দিয়ে ছুটতেই তাঁতী বট গাছের নামায় ধরে গাছে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আর ওদিকে বাঘও টিপটিপির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলো। একটি বানর বাঘকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, "বাঘ ভাই, বাঘ ভাই, অত ছুটছিস্ কেন?" বাঘ বললে, "ভাই এক টিপ্‌টিপির পাল্লায় পড়ে, আজ সারারাত বড় কষ্ট পেয়েছি। বটগাছের গোড়ায় এসে সেই ছেড়েছে, অমনি আমি দে ছুট।" "টিপ্‌টিপি আবার কি হে? তুমি দাঁড়াও আমি দেখে আসি, সে কত বড় বীর" এই বলে বানর সেই গাছের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু বাঘ আর সেখানে দাঁড়ালো না। কি জানি, যদি আবার এসে ধরে।

বানর গাছের গোড়ায় এসে কারও দেখা না পেয়ে ইতস্তত খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করল। পরে গাছের উপর এঁডাল সেডাল করে খুঁজলো; কিন্তু কোথায় কোন টিপ্‌টিপি, কি কোন জনপ্রাণীর সন্ধান সে পেলে না। অবশেষে সে এসে গাছের গোড়ার নিকট পা ঝুলিয়ে বসে বসে চিন্তা করতে থাকে। বানরটা যেখানে বসেছিল, সেখানেই ছিল এক কোটর। তাঁতী ভয়ে জড়সড় হয়ে সেই কোটরে বসেছিল। এখন গত্যন্তর না দেখে একান্ত মরিয়া হয়ে সাহসে নির্ভর করে চট করে বানরের লেজটা ধরে বোঁ বোঁ করে ঘুরাতে লাগলো। এইভাবে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে গাছে এক ঘা দিয়ে একটানে বানরটাকে একশো হাত দূরে নিক্ষেপ করলো। বানরের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত, আর শরীর ঘুর্ণমান। সে এতক্ষণে বুঝতে পারলো যে বাঘ তাকে মিথ্যা কথা বলেছে। এটা টিপটিপি নয়, এর নাম "ঘুরোন চরকি"; কিন্তু দুঃখের বিষয় চেহারাখানা দেখতে পেলাম না; তবে আর দেখেও কাজ নাই, কোনও রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। এই বলে একটু দম সামলে সে দৌড়তে লাগলো।

তারপর বানরকে দৌড়তে দেখে এক ভালুক জিজ্ঞাসা করলো, "আরে ভাই বানর, অত ছুটছিস কেন?" তখন বানর বলতে লাগলো, "এক মিথ্যাবাদী বাঘ আমাকে বললো যে, একটা টিপ্‌টিপি সারারাত কষ্ট দিয়ে সকালে গিয়ে ঐ গাছে উঠলো। তারপর, ভাই, তার কথায় গিয়ে দেখি—কোথা টিপ্‌টিপি, সে এক প্রকাণ্ড ঘুরোন চরকি—টান চরকি শুদ্ধ। সে কি ঘুর্ণি, সে কি টান! শালা বাঘ আমাকে শুধু শুধু যন্ত্রণা দিলে। তার সঙ্গে দেখা হলে এর উচিত শাস্তি তাকে দেবো"।

তখন ভালুক বললো, "আচ্ছা থাক, আমি একবার দেখে আসি, সেই টিপ্‌টিপিই বা কত বড়, আর ঘুরোন চরকিই বা কত বড়। এই বলে ভালুক চললো; কিন্তু গাছে উঠলো না। গোড়াতে দাঁড়িয়ে হাঁজর ফাঁজর করতে লাগলো। তাঁতী কিন্তু ইতিপূর্বে কতকগুলো শুকনো ডালপালা ভেঙ্গে কোটরের কাছে গাদা করে রেখেছিলো। তারপর ভালুককে আসতে দেখে আবার কোটরে ঢুকলো। ভালুক যখন পালালো না, তখন সে ডালপালা সমেত ভালুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর ভালুক অমনি "ওম খপ্" করে এক দৌড়ে পগাড় পার। তার ভয়ানক রাগ হলো বানরের উপর। ওরে বাবা, এ তো উপর চাপা, ডালপালাসহ উপর চাপা।

তারপর ভালুকের সঙ্গে এক ধূর্ত শিয়ালের দেখা। ভালুকের দৌড়বার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভালুক তাকে আনুপুর্বিক সমস্ত ঘটনা বললো। আর বললো যে বাঘ এবং বানর উভয়েই মিথ্যাবাদী। তাহারা উভয়েই তার নিকট ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে। শিয়াল কোনও রকমে ভালুককে আশ্বস্ত করে উপর চাপার খোঁজে বেরুল এবং গাছের নিকট গিয়ে সে যা দেখলো, তা উপর চাপাও নয়, ঘুরোন চরকিও নয় এবং বাঘের টিপটিপিও নয়, সেটা একটা আদৎ মানুষ। শিয়াল তার নিকট গিয়ে বললো, "এই বেটা মানুষ, এই বার তোর কি হয়?" তাঁতী তো মহা ফাঁপরে পড়লো। সে একে একে, যথাক্রমে বাঘ, বানর, ভালুকের হাত থেকে নিজ বুদ্ধিবলে ও কলে-কৌশলে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। পুনরায় যে তাকে শিয়ালের হাতে পড়তে হবে, এ ছিল তার কল্পনার বাইরে। অতএব সে শিয়ালকে দেখে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর শিয়াল আবার তাকে বললো, তুই আমার তিনজন বন্ধুকে কষ্ট দিয়েছিস্; আজ আমি তোকে খাব। তাঁতী কি আর করবে, অনন্যোপায় হয়ে বললে, "তা

খাও, তবে আমি আজ দুই দিন কিছু খাইনি। আমাকে একটু জল খেতে অবসর দাও। শিয়াল বললো, "যা বেটা মরবি তো, তা একটু জল খেয়ে আয়, মাংসটাও একটু নরম হবে।" তাঁতী জল খেয়ে এলো। শিয়াল বললো, "আচ্ছা এইবার তোকে খাব।"

"আচ্ছা, আমি একটু নেচে নিই।"

"আচ্ছা নাচ"। তাঁতী তখন নাচতে লাগলো। খালি পেটে জল যাওয়ার জন্য পেটে ভটাং ভটাং শব্দ হতে থাকে। তখন শিয়াল জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা, ভাই, তোর পেটের ভিতর ওটা কিসের শব্দ?" তাঁতী বললো, আমার বাবা ছোট বেলায় আমাকে বুনো কুকুরের ডিম খাইয়েছিল, এইবার সেই বাচ্চা হবে।" শিয়াল তখন "একটু দাঁড়া, আমি পালাই" বলে এক দৌড়।

তাঁতী তখন কোনও রকমে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে একশো এক টাকা আক্কেল সেলামি দিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। আমার গল্প শেষ হয়ে গেলো।

—মুর্শিদাবাদ, ১৯৬৩

মন্তব্য

বাংলার উপকথার কতকগুলি সাধারণ অভিপ্রায় ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তবে তাঁতী চরিত্রটি এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বাংলার উপকথায় তাঁতী বা জোলা নির্বুদ্ধিতার প্রতীক; কিন্তু এখানে সে বুদ্ধি বলে নিজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে এবং কতকগুলি বুদ্ধিমান পশু, এমন কি, শিয়ালকে পর্যন্ত প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার কারণ কি? তাঁতী নির্বোধ হইলেও মানুষের নিকট নির্বোধ, পশুর নিকট নির্বোধ নহে। ইহা আধুনিকতার লক্ষণ হইতে পারে। কিংবা ব্যক্তিবিশেষের হস্তক্ষেপের জন্যও হইতে পারে। তবে কোন নির্বোধ চরিত্র যখন বুদ্ধিমানের মত আচরণ করে, তখন কাহিনীতে কৌতুকরস বৃদ্ধি পায়। কৌতুক রস কাহিনীটির প্রধান রস, অসঙ্গতি কৌতুক রস সৃষ্টির সহায়ক। টিপটিপির চরিত্রের সঙ্গে 'টুনটুনির বই'-এর সঙ্কলিত বাঘের উপর টাগ চরিত্রটির ঐক্য আছে। 'ঘোড়ার ডিম' সম্পর্কে মন্তব্য পরে দ্রষ্টব্য।

৪

জগদম্বা

ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণ অতি বোকা, ব্রাহ্মণীটি যেন রণচণ্ডী। একদিন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বামুনি আজ বুঝি তুই পিটে ভাজবি?" ঘরে সেদিন চাল বাড়ন্ত। ব্রাহ্মণী তেলে বেগুনে জলিয়া খ্যাংরা হাতে ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিয়া উঠিলেন। মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ বনগামী হইলেন। বনে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দেখা। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকেন, লেখাপড়া শিখেন, দিনে রাতে পড়েন। পড়িতে পড়িতে একদিন ভাবিলেন, আমি এখন একজন মস্ত বড় পণ্ডিত। ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণের ভারী আনন্দ হইল। সন্ন্যাসীকে না জানাইয়া একদিন বাড়ীর দিকে চলিলেন।

বাড়ীর অঙিনায় পা দিয়াই ব্রাহ্মণ শুনিলেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ। ব্রাহ্মণ চুপ করিয়া শব্দ গুণিয়া চলিলেন। এক কুড়ি এক—আর শব্দ নাই। এইবার ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী দেখিল, সারা অঙ্গে তিলক ফোঁটা কাটিয়া ব্রাহ্মণ হাজির। ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "বামনি, আমি অনেক ভারী বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছি।" ব্রাহ্মণী আমলই দিতে চায় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "জানিস না তো, তাই বলছিস্, জানলে এতক্ষণে এক কুড়ি এক বড়া সাজিয়ে নেমন্তন্ন!" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "সে কি, জানলে কি করে?" ব্রাহ্মণী বলিলেন— "যেখানে যেই বড়া ভাজুক, বিদ্যের গুণে সবই আমি বলতে পারি।" ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিদ্যার গুণ সারা পাড়ায় রটাইয়া দিল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের বিদ্যা সারা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ব্রাহ্মণের সুখেই দিন যায়। এর হাত গণেন, ওর চুরি ধরেন। দেশময় তাঁহার সুখ্যাতি। একদিন মতি ধোবার গাধাটি হারাইয়া গেল। মতি ব্রাহ্মণকে ধরিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে সারা গ্রাম ঘুরিয়া গাধা খুঁজিলেন; কিন্তু পাইলেন না। মতিকে বলিলেন, "ওরে চণ্ডী, আজ জেগেছেন, আজ পাবি না। কাল এসে গাধা নিয়ে যাস্।" মতি চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভাবিয়া অস্থির। এইবার বুঝি সব জারিজুরি ভাঙিয়া যায়। অনেক রাত্রে বাইরে কিসের শব্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণী বলিল, "বুঝি চোর এসেছে। নিত্য পরের বাড়ীর চোর ধরে বেড়াও, আজ নিজের ঘরের চোর ধরতে হবে।"

ব্রাহ্মণ আর কি করেন। ভয়ে ভয়ে দুর্গা দুর্গা জপিতে জপিতে চোর ধরিতে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে গ্যাঁ-গ্যাঁ-ঘ্যাঁ-ঘ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ শব্দ উঠিল। ব্রাহ্মণী প্রদীপ লইয়া আসিয়া দেখিলেন, বামুনে গাধায়—ঝড় কম্পন, কুকুর-কুণ্ডলী। গাধার গলার দড়ায়, বামুনের গলায় ফাঁসি লেগে গেছে। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল—"কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কিছু না, ব্রাহ্মণ জপে বসেছিলেন। মতির গাধা ফিরিয়ে এনে এখন একটু অস্থির হয়েছেন। কাজটা ত কম শক্ত নয়।" মূর্ছা ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মণ উঠিয়া বসিলেন। পরদিন মতি গাধা পাইয়া ভারি সুখী। ব্রাহ্মণের নাম-যশ আরো বাড়িয়া গেল। ক্রমে এই কাহিনী রাজার কানেও গেল।

রাজকন্যার লক্ষ টাকার হার চুরি গিয়াছে। ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল। রাজার আদেশ—হার গণিয়া দিতে পরিলে পুরস্কার, না পারিলে গর্দান। ব্রাহ্মণের এইবার বিষম বিপদ। সারা রাত আই ঢাই, চোখে ঘুম নাই। "হায়! হায়! মা জগদম্বা, এই ছিল তোর মনে! শেষ পর্যন্ত ধনে প্রাণে মারিলি।"

ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশ দিয়া রাজবাড়ীর জগা মালিনী যাইতেছিল। ব্রাহ্মণের স্বগতোক্তি শুনিয়া জগার প্রাণ উড়িল, জগা ছুটিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া ধরিল—"দোহাই বাবাঠাকুর, আর এমন কাজ করব না। আমায় রক্ষা কর। রাজকন্যার হার আমি নিয়েছিলাম। রাজার কানে আমার নামটি করো না, ঠাকুর।" ব্রাহ্মণ বুঝিলেন কি হইতে কি হইয়াছে, জগদম্বার নাম নিতে জগা ধরা দিয়াছে। এইবার ব্রাহ্মণকে আর পায় কে? বলিলেন—"যা বেটা, তোর আর ভয় নেই। হার নিয়ে খিড়কী পুকুরের ধারে পাঁকের মধ্যে হাঁড়ি করে রেখে দিবি।" জগা ছুটিয়া গিয়া তাহাই করিল।

পরদিন ব্রাহ্মণ রাজসভায় বসিয়া টিকি নাড়িয়া নানাভঙ্গীতে শত শত পুঁথি পাতা উল্টাইলেন, গণিয়া গণিয়া আঙ্গুল ক্ষয় করিলেন। তারপর বলিলেন, "রাজামশায়, পেয়ে গেছি। হার আছে ঐ পুকুরের কাদায়।" পুকুর তোলপাড়, কাদার তলায় ভাঁড়, ভাঁড়ের মধ্যে ঝলমলে হার। ব্রাহ্মণের কপাল খুলিয়া গেল। সিংহাসন ছাড়িয়া রাজা আসিলেন ব্রাহ্মণের কাছে। রাজভাণ্ডার উজাড় করিয়া ধন-রত্ন, মণি-মুক্তা আনিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণের এখন ত্রিতল প্রাসাদের সোনার খাটে বিছানা, তেলে ভাণ্ডার ভেসে যায়, ব্রাহ্মণীও ভারী খুসী। রোজই ব্রাহ্মণ পিটা খায়, আর ব্রাহ্মণীর সেবা পায়।

মন্তব্য

স্ত্রীকর্তৃক লাঞ্ছিত নির্বোধ লোকের পরিণামে সৌভাগ্য লাভ করা সকল দেশেরই লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। কালিদাসের কবিত্বলাভের কাহিনী এই অভিপ্রায়েরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কালিদাস সরস্বতীর সাধনা করিয়া যথার্থই কবিত্বলাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই তাঁহার সৌভাগ্যোদয় হইয়াছিল; কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যালাভ করিয়া আসিলেও সেই বিদ্যা দ্বারা সৌভাগ্যলাভ করিতে পারেন নাই, দৈব তাহার সৌভাগ্য বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। তাহার ফলে কাহিনীটির কৌতুক রস বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর কাহিনীতে কৌতুকেরই আবশ্যক। দৈবাৎ মুখ দিয়া অপরাধীর নাম উচ্চারিত হইয়া গেলে অপরাধীর স্বীকারোক্তি ও আত্মসমর্পণ লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়। আরও একটি কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়, রাণীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া এক নাপিত রাজাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। রাজাকে ক্ষৌর করিবার কালে রাজা অন্য প্রসঙ্গে এমনি একটি কথা বলিলেন। তাহাতে নাপিত রাজা এই ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাইয়াছেন ভাবিয়া রাজার নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

৫

কাঁকলাস

এক ব্রাহ্মণ তার এক কচি বেটা ছেলে রাখিয়া মরিয়া গিয়াছে। বিধবা মা পৈতা কাটিয়া বিক্রী করে, আর যে দুই-এক পয়সা পায়, তাই দিয়া কোন রকমে দুঃখে কষ্টে ছেলেটিকে লালন পালন করিয়া থাকে। এই রকমে ক্রমে ছেলেটি আট নয় বছরের হইল; তার লগুণ দেওয়ার সময় আসিল: এই দুঃখে কষ্টে চারিটি পেটের ভাত জোটে না, লগুণ দিতে হইলে কিছু টাকা পয়সা দরকার, বাম্‌নী ভাবিতে লাগিল কোথায় পয়সা পাইবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পরে ঠিক করিল যে কিছু জল খাওয়ার জোগাড় করিয়া তার ছেলেটিকে দিয়া রাজার নিকট পাঠাইয়া দিবে। এই না ঠিক করিয়া লগুণ বিক্রির যে দুই এক আনার পয়সা ছিল, তাহা দিয়া বাজার হইতে একটু দুধ, কিছু মিষ্টান্ন আনিয়া একটু জল খাবার জোগাড় করিয়া ছেলেকে কহিল, বাবা, এই জলখাবারটুকু লইয়া তুমি একবার রাজার কাছে যাও। ছেলে কহিল, আমি রাজাকে চিনি না; আমি যাইতে পারিব না। তখন মা কহিল, রাজবাড়ী যাও, যাইয়া সভার মধ্যে দেখিবে, যে উচ্চ আসনে বসিয়া আছে, সেই রাজা। তাহাকেই জলখাবার দিও, আর রাজা দয়া করিয়া যাহা দেয় লইয়া আসিও।

ছেলেটি একখানি রেকাবে করিয়া সেই জলখাবার লইয়া রাজবাড়ী গেল। রাজবাড়ী যাইয়া বাড়ীর চারিদিক্‌ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উঁচু আসনে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরার পর দেখিল যে একটি গাছের উপর একটি কাঁকলাস বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া ছেলেটি কহিল, 'মা তোমাকে জল খাইতে দিয়াছে, তুমি নামিয়া আসিয়া জল খাও।' কাঁকলাস কহিল, 'না, আমাকে ত দেয় নাই রাজাকে দিয়াছে।' ছেলে কহিল, 'না, তোমাকেই দিয়াছে।' তখন কাঁকলাস নামিয়া আসিল, আসিয়া ঠোক্‌রাইয়া ঠুক্‌রাইয়া যা একটু পারিল খাইল, আর ছিটাইয়া ফেলিল; তারপর কহিল, তুমি আজ যাও, কাল আবার আসিও। ছেলেটি রেকাব লইয়া বাড়ী আসিলে তাহার মা তাহাকে কহিল, বাবা! রাজাকে জল খাইতে দিয়াছিলে? রাজা তোমাকে কি কহিল? ছেলে কহিল, রাজা জলটল খাইয়া আমাকে আবার কাল তাহার বাড়ী যাইতে কহিল,

মা ভাবিল, হায়, একেই ত আমার এই অবস্থা। লগুনের পয়সা যাহা ছিল, সব খরচ করিয়া কালকার জলখাবার জোগাড় করিয়াছিলাম। আজ আবার পয়সাই বা পাই কোথায়, আর জোগাড়ই বা করি কি দিয়া। তারপর গাঁয়ের মধ্যে গেল, যাইয়া এর কাছে ওর কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া যে কয়টি পয়সা পাইল, তাই দিয়া আবার একটু জল খাওয়ার জোগার করিয়া ছেলেকে পাঠাইয়া দিল। সেদিনও ছেলে গিয়া দেখিল যে সেই গাছের উপরেই কাঁকলাস বসিয়া আছে। তখন তাহাকে ডাকিয়া জল খাইতে দিল। কাঁকলাস জলটল যেমন তেমন করিয়া খাইয়া ছিটাইয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে কহিল যে, দেখ, আমি তোর নিকট জল খাইয়া বড়ই সন্তোষ হইয়াছি, এখন আমি তোর একটি উপকার করিব। আমি ঐ রাজহস্তীর নাকের মধ্যে ঢুকিলেই হাতী চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে। রাজা যখন শুনিবে যে তার হাতীর এই রকম হইয়াছে, তখন সোনার চাঙ্গর ফিরাইয়া দিবার কথা কহিবে। কহিবে যে, এই বলিয়া চাঙ্গর ফিরাইয়া দাও যে, যে লোক আমার এই হাতী ভাল করিবে, তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিব। আর বড় রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিব। যখন চাঙ্গর ফিরিবে, তখন তুমি সেই চাঙ্গর ধরিও। তারপর তোমাকে রাজবাড়ী নিয়া গেলে তুমি সেই রাজহস্তীর চারিদিকে কাপড়ের কাণ্ডারী দিও, মধ্যে একটি শিলপাটা ও কিছু কিছু গাছ গাছড়া লইও এবং ঠুক ঠাক করিয়া তাহা বাঁটিতে থাকিও। যখন সুবিধা হইবে তখন হাতীর কানের কাছে যাইয়া কহিও—"ঠাকুর ঠুকুর কাঁকলাস, আমি বামুন বরু।" আমি সেই কথা শুনিলেই বাহির হইয়া যাইব, হাতী উঠিয়া খাড়া হইবে। রাজা হাতী ভাল হওয়ার কথা শুনিলেই তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিবে ও রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিবে। তুমি সুখে স্বগৃহে কাল কাটাইবে।

এই কথা বলিয়া কাঁকলাস যাইয়া রাজহস্তীর কানের মধ্যে ঢুকিল, হাতী চিৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। রাজা সেই কথা শুনিয়া চাঙ্গর ফিরাইয়া দিতে কহিল। কহিয়া দিল যে, যে আমার এই হাতী ভাল করিবে, তাহাকে অর্ধেক রাজত্ব লিখিয়া দিব, আর আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিব। চাঙ্গর সব গাঁ ঘুরিল, কেহই ধরিল না, সেই বামনের ছেলে যাইয়া চাঙ্গর ধরিল। তখন রাজার লোকেরা কহিল, তুমি একটি ছেলেমানুষ, তুমি হাতী ভাল করিতে পারিবে না। তখন ছেলেটি কহিল, আমি পারিব। সেই কথা শুনিয়া সকলে বামনের ছেলেকে লইয়া রাজবাড়ী গেল। যাইয়া হাতীর

চারিদিকে একটি কাপড়ের কাণ্ডারী দিল, মধ্যে একটি শিলপাটা রাখিয়া কিছু গাছ গাছড়া আনিয়া তাহাতে ঠুক্ ঠাক্ করিয়া ছেঁচিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হাতীর কানের কাছে মুখ নিয়া যাইয়া কহিল, "ঠাকুর ঠুকুর কাঁকলাস, আমি বামন বক্ক" ; এই না শুনিয়া কাঁকলাস কান হইতে বাহির হইয়া পলাইল। হাতী উঠিয়া খাড়া হইল।

হাতী ভাল হওয়ার কথা শুনিয়া রাজা সেই ছেলেকে নিয়া গেল, যাইয়া নাপিত দিয়া তাহাকে কামাইয়া কাজাইয়া সাফ করিল, তেল তুল মাখাইয়া স্নান করাইল, ভাল ভাল পোশাক পরাইয়া রাজপুত্রের রকম করিয়া সেই বাড়ীতেই রাখিল। কিছুদিন পর বড় রাজকন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া দিল। বামুন-পুত খাইয়া দাইয়া পরম সন্তোষে রাজপুত্রের মত সেই রাজবাড়ীতে থাকে। মা যে দুঃখিনী হইয়া কোথায় থাকিল, তাহা যে ভুলিয়া গেল।

একদিন মেয়ে জামাতায় ঘরে বসিয়া পাশা খেলিতেছে, এমনি সময় মা লক্ষ্মী ছলনা করিয়া করুণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন, সেই কাঁদার রব শুনিয়া জামাতা কন্যাকে কহিল, রাখ রাখ পাশা, কে কাঁদিতেছে, আমাকে শুনিতে দাও। কন্যা কহিল, উহা শুনিয়া কি হইবে? যার পুত্রশোক হইয়াছে, সে কাঁদে ; যার পতিশোক হইয়াছে, সে কাঁদে ; যার পুত্র বিদেশে, সে কাঁদে ; যার পতি বিদেশে, সে কাঁদে, ও কাঁদাকাঁদী শুনিয়া কি হইবে, তাই আমরা খেলি। রাজ-জামাতা কহিল, তবে আমার মাওত এই রকম করিয়া আমার জন্য কাঁদিতেছে ; আমি এখন তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি। তবে রাজকন্যা আমি যে তা কালই বাড়ী যাইব।

এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা পরদিন তাহার বাপকে কহিল, বাবা—বাবা, তোমার জামাতা তার বাড়ী যাইতে চায়, কালই যাইবে। রাজা কহিল, মা! সে আর কি! তার মা বাড়ীতে আছে, তার যাওয়াই দরকার। এই না কহিয়া অর্ধেক রাজত্ব বাঁটিয়া দিলেন, লোকজন হাতী-ঘোড়া থরে থরে সঙ্গে দিলেন, কন্যাকেও যাইতে কহিয়া দিলেন। নানারকম বাদ্য লইয়া রাজ-জামাতা ও রাজকন্যা তাহার বাড়ীর দিকে চলিল। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পৌছিলে, সেই গাঁয়ের লোকেরা বাদ্য হাতী ঘোড়ার রবে চমকিয়া উঠিল, সকলেই দৌড়াদৌড়ী করিয়া দেখিতে গেল যে, কে আসিতেছে ; যাইয়া দেখিল যে, বামন বক্ক আসিতেছে, সকলেই যাইয়া তার মাকে কহিল যে, বক্কর

মা! তোমার বেটা এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিতেছে। ঐ শুন, তাহার বাদ্য বাজন শুনা যাইতেছে।

বরুর মা কহিল, আরে কপাল। আমি আবার বেটা পাব কোথায়, কে কোথায় লইয়া গিয়াছে, তারই খোঁজ নাই; পায়ে বেড়ী, হাতে দড়ী, গলায় জিঞ্জির দিয়া কোন না কোন রাজা কোথায় তাহাকে ফেলাইয়া রাখিয়াছে। তোরা বেটা বেটা করিয়া কেন আমার নিবান আগুন জ্বালাইতেছিস্, কেন আমাকে ঠাট্টা করিতেছিস। আমি আর বেটাগর কোথায়? বুড়া বামনীর, এতদিন ছেলেকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুটি চক্ষুই অন্ধ হইয়াছে।

ক্ষণিকক্ষণ পরেই হাতীঘোড়া, লোকজন রাজকন্যাকে লইয়া হাকে কটক শুদ্ধ তার পুত্র সেই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই বাড়ীর মধ্যে গেল। যাইয়া দেখে, তার মা তার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে অন্ধ হইয়াছে, তখনও বসিয়া বসিয়া ছেলের কথা মনে উঠায় করুণ কাঁদিতেছে। বরু রাজকন্যাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর মধ্যে যাইয়াই মাকে কহিল, মা, আমি আসিয়াছি। অন্ধ মা কহিল, কে রে বরু আসিয়াছিস্? বরু কহিল, হাঁ মা, আমিই আসিয়াছি। এই কহিয়া মাকে কহিল, মা, ধর, এই আমার হাতের আঙ্গুলটা লও, লইয়া ইহা চক্ষে ছোঁয়াও ও ছোঁওয়াইলেই তোমার চকের ছানি কাটিয়া যাইবে, তুমি দেখিতে পাইবে।

মা সেই আঙ্গুলটা চক্ষে ছোঁয়াইল, দিব্য চক্ষু পাইল। তখন ঘরের মধ্যে যাইয়া কি দিয়া বেটা-বউকে বরিয়া বরিয়া লইবে, তাহাই খুঁজিতে লাগিল। লক্ষ্মীর দৃষ্টি হইয়াছে, তার সে তালপাতার কুঁড়ে ঘর গিয়াছে, উয়ারী চুয়ারী দক্ষিণ দুয়ারী ঘর হইয়াছে, রাম লক্ষ্মণ গোলা হইয়াছে। দাস-দাসী হাতী-ঘোড়া বাড়ী ভরা হইয়াছে। ঘরের মধ্যে যাইতেই চালুন বাতী পাইল, বেটাবউকে ধরিয়া ঘরে তুলিল। পরমসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

—গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র, রঙ্গপুর, 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' (রঙ্গপুর শাখা), ১৩১৪

মন্তব্য

নির্বোধের সৌভাগ্যলাভ ইহার মূল অভিপ্রায়। কৃতজ্ঞ পশু বা সাহায্যকারী পশুও ইহার অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভূতের ভয়

এক নাপিত ও এক তাঁতির মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। একদিন নাপিত তাঁতিকে বলিল, ভাই বন্ধু, এসো আমরা দুজনে একটা কারবার করি। তাঁতি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেল এবং কি কারবার হইবে দুইজনে মিলিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল ; স্থির হইল যে তাহারা ধান চালের কারবার করিবে। তখন দুইজনে বাড়ী হইতে টাকাকড়ি আনিয়া কারবার আরম্ভ করিল।

কারবার আরম্ভ হইবার পূর্বে দুইজনের মধ্যে ব্যবস্থা হইল যে নাপিত-বন্ধু ধান গাছের ডগা লইবে আর তাঁতি বন্ধু, ধানগাছের গোড়া লইবে। কিছুদিন পরে যখন ধান পাকিল, তখন নাপিত ধানগাছের ডগা কাটিয়া লইল এবং তাঁতিকে ধানগাছের গোড়া কাটিয়া দিল। তাঁতি তাহা লইয়া বাড়ী গেল।

তাঁতির আত্মীয়স্বজন তাহার এই বোকামীর জন্য ভৎর্সনা করিতে লাগিল। মনের দুঃখে তাঁতি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে নাপিত-বন্ধুর সহিত দেখা হওয়ায় মনের দুঃখে তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল। নাপিত সব শুনিয়া দুঃখিত হইয়া দুইজনেই একত্রে যাইবে স্থির করিল। তখন নাপিত-বন্ধু একখানি ক্ষুর আর তাঁতি-বন্ধুকে একখানি আয়না আনিতে বলিয়া বাড়ী হইতে রওনা হইল। কিছুদূর যাইবার পর সন্ধ্যা হইল। চারিদিকে অন্ধকার। দুইবন্ধু রাত্রিতে কোথায় থাকিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময় কিছুদূরে একটি বিরাট বড় বাড়ী দেখিয়া তাহারা সেই বাড়ীতেই যাইয়া আশ্রয় লইল।

রাত্রি যখন খুব গভীর, তখন একটি ভূত আসিয়া বলিল, আমার বাড়ীতে কেরে? ভূতের কথা শুনিয়া তাঁতি তো ভয়েই অস্থির, সে তাড়াতাড়ি সেই স্থান হইতে পালাইয়া গেল।

বন্ধুকে পলাইতে দেখিয়া নাপিত ভূতকে শোনাইয়া তাহাকে বলিল, ভয় কি বন্ধু। সামান্য একটা ভূতকে দেখিয়া তোমার এত ভয়, আমার থলিটার মধ্যে অমন কত ভূত রহিয়াছে। কথা শুনিয়া ভূতের ভয় হইল সে নাপিতের কাছে গিয়া ভূত দেখিতে চাহিল, ধূর্ত নাপিত তখন আয়নাটি বাহির করিয়া ভূতের সম্মুখে ধরিল। আয়নাতে নিজের মূর্তি দেখিয়া ভূত নিতান্ত ভীত

হইয়া বলিল, আমাকে মারিও না, আমি তোমার উপকার করিব। তোমার যাহা প্রয়োজন আনিয়া দিব।

নাপিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এখনই আমার সহস্র মোহর আনিয়া দাও। ভূত নিমেষের মধ্যে সহস্র মোহরপূর্ণ একটি থলে আনিয়া নাপিতের হস্তে প্রদান করিল। তখন নাপিত বলিল, আরও একটি কাজ করিতে হইবে। আমার বাড়ীর উঠানে একটা প্রকাণ্ড মরাই বাঁধিয়া তাহাতে ধান ভরিয়া দিতে হইবে। আদেশ পাইয়া ভূত চলিয়া গেল। নাপিত তখন বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

নাপিত বাড়ী আসিয়া সব কথা স্ত্রীকে খুলিয়া বলিলে তাহার স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সেই রাত্রেই সহসা উঠানে একটি প্রকাণ্ড মরাই বাঁধা হইল। ভূতকে এত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া তাহার এক বন্ধু বলিল, তুই বোকার মত এত পরিশ্রম করিতেছিস, নাপিত তোর কি করিবে ?

ভূত বলিল. বিশ্বাস না হয়, আমার সহিত চল্, দেখবি, সে কত ভূত ধরিয়া রাখিয়াছে। বলিয়া সে বন্ধুকে লইয়া নাপিতের বাড়ী আসিল। ধূর্ত নাপিত পূর্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি জানালা দিয়া একটি আয়না ধরিল, তাহাতে নিজের বিকট মূর্তি দেখিয়া ভূতের বন্ধু খুব ভয় পাইয়া গেল, সে তৎক্ষণাৎ নাপিতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিল। নাপিত এইরূপ চালাকি করিয়া ভূতদের সাহায্যে খুব ধনবান হইল। এদিকে তাঁতি ভূতের ভয়ে কোনক্রমে বাড়ীতে আসিয়া বাঁচিল। —বটতলার ছাপা পুঁথি হইতে

মন্তব্য

কাহিনীটি আধুনিক এবং বিশেষত্বহীন। প্রথমতঃ বোকা তাঁতীর কথা লইয়া ইহার সূচনা হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহার কথা আর শুনিতে পাওয়া গেল না। নাপিতের ধূর্ততার কথাই প্রাধান্য পাইয়া গেল। আয়নাতে নিজের মুখ দেখিয়া ভয় পাওয়া ভূতের বোকামিরই একটি নিতান্ত সাধারণ অভিপ্রায় মাত্র। এই কাহিনীর মধ্যে আরব্য উপন্যাসের আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ প্রমুখ কাহিনীর প্রভাব অনুভব করা যায়। তবে তাঁতী এবং নাপিতের বোকামি ও ধূর্ততার কথা বাংলার লোক-কথার সংস্কার হইতেই আসিয়াছে।

৭

বোকা-বুকি

এক দেশের এক রাজার সাত ছেলে ছিল। ছয় ছেলে বেশ উপযুক্ত এবং বুদ্ধিমান ছিল, কিন্তু ছোট ছেলেটি একেবারে বোকা ছিল। বোকার জন্য ছোট ছেলের নাম বোকাই থাকিয়া গেল। বোকার বয়স হইলে তাহার বিবাহ হইল এবং বোকার বউকে সবাই বুকি বলিত।

বোকার একটি ছেলে হইয়াছে; কিন্তু বোকার কোন আয় নাই। সেইজন্য অন্য বড় ভাইরা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এদিকে বোকার বউয়ের আবার ছেলে হইবে। বোকা এখন মনের দুঃখে বনে চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকিও বলিল যে সেও তাহার সঙ্গে যাইবে। তাহার উত্তরে বোকা বলিল, 'তুই কোথায় যাবি? তোর একটা ছেলে কোলে এবং একটা ছেলে পেটে আছে।' তবুও বুকি বলিল যে সে যাইবেই। তখন বোকা তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে রাজী হইল এবং দুইজনে ছেলেটিকে নিয়া বাড়ীর বাহির হইল।

বাড়ীর বাহির হইয়া তাহারা হাঁটিতে লাগিল এবং হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যার সময় আসিয়া এক গভীর জঙ্গলে পৌছিল। সেই গভীর জঙ্গলে তাহারা রাত্রিতে থাকিবে বলিয়া স্থির করিল। রাত্রি বেশী হইলে বুকির প্রসব বেদনা উঠিল এবং বোকাকে বলিল, তুমি এখন একটা ব্যবস্থা কর। বোকা বলিল, আমি এখন এই গভীর জঙ্গলে কি করিব? তোকে আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে আমার সঙ্গে আসিস না, তখন তুই আমার কথা শুনিস নাই। তবু বুকি বলিল যে তাকে এখন একটা ঘর তৈয়ার করিয়া দিতেই হইবে, তা না হইলে বুকির খুব অসুবিধা হইবে। অগত্যা বোকা সেই গভীর বনের ভিতর নল খাগড়া দিয়া ঘর তৈয়ার করিয়া দিল এবং সেই ঘরে বুকির একটি ছেলে হইল। শীতের জ্বালায় এবং জল পিপাসায় বুকির প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তাই বুকি বোকার কাছে জল ও আগুন চাহিল। তখন বোকা বড় ছেলেটি বুকির কাছে রাখিয়া জল ও আগুন খুঁজিতে বাহির হইল।

যে দেশে বোকা ও বুকি গিয়া পৌছিয়াছিল, সেই দেশের রাজা মারা গিয়াছিলেন। রাজবাড়ীর রাজহস্তী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল যে, যাহার মাথায়

রাজটীকা জ্বলিবে বা কপালে রাজটীকা দেখা যাইবে, তাহাকে হাতী তাহার শুঁড়ে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে বসাইবে। বোকার কপালে রাজটীকা দেখিতে পাইয়া হাতী তাহাকে লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে বসাইল। তাহার যে এককালে স্ত্রীপুত্র ছিল, সেইকথা তাহার একেবারে মন হইতে চলিয়া গেল, রাজসিংহাসনে বসিবার সঙ্গে সঙ্গে। এদিকে বুকি দেখিল, সেই যে বোকা জল আগুন আনিতে গিয়াছে, আর আসিল না এবং রাত্রি ভোর হইয়া গেল। বুকি তখন বড় ছেলেটির কোলে ছোট ছেলেটিকে দিয়া বলিল, তুই এখানে বস, দেখি আমি একটু জল পান করিতে পারি কিনা, আমার জল-পিপাসায় প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। বোকা যে গেল আর তো ফিরিল না।" বুকি বাহির হইয়া গেল এবং বহু দূরে একটি মস্ত বড় সাগরের মত দেখিল। সাগরের নিকটে গিয়া দেখিল যে তাহাতে জল নাই শুধু একটি নৌকা রহিয়াছে ঘাটের নিকটে। যখন বুকি বাঁ হাত দিয়া নৌকাটাকে ঠেলিয়া দিল, তখন সাগরের মধ্যে জল দেখা দিল এবং নৌকা চলিতে শুরু করিল—বুকি আঁজলী ভরিয়া জল পান করিতে লাগিল। সেই নৌকার মধ্যে কোন এক দেশের সওদাগর বসিয়া ছিল। সে বহুকাল হইল বাণিজ্যে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু এখানে আসিয়া নৌকা ঠেকিয়া রহিয়াছে বলিয়া সে অনেক দিন হইল আর অন্য স্থানে যাইতে পারিতেছিল না। তাই সওদাগর বলিল, 'ওরে মাঝি মাল্লারা, ঐ স্ত্রীটিকে নৌকায় উঠাইয়া নে এবং যেখানে নৌকা ঠেকিবে, সেইখানে গিয়া নামাইয়া দিবে।' সুতরাং মাঝি মাল্লারা আসিয়া বুকির হাত ধরিল এবং তাদের সঙ্গে যাইতে বলিল। বুকি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহা ছাড়া আরও বলিল যে, "হে মা নিরাকুলই, তোমার গলিত কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্থরূপ আমাকে দাও এবং আমার এই অপুর্ব রূপ তুমি নাও।" এই বলিবার সঙ্গে সঙ্গে মাঝি মাল্লারা দেখিল যে সেই অপুর্ব রমণীর গায়ে গলিত কুষ্ঠ রোগ, তাহার উপর মাছি ভন ভন এবং পোকা ছ্যার ছ্যার করিতেছে। মাঝি মাল্লারা এই কথা সওদাগরকে বলিল, তবুও সওদাগর তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইতে আদেশ করিল। সুতরাং বুকিকে নৌকায় তুলিয়া জল-ডগরায় রাখিয়া দিল; নৌকা চলিতে লাগিল। কিছুদুর যাইতে না যাইতে মাঝি মাল্লারা সেই পচা গন্ধে টিকিতে পারিল না; এই কথা তাহারা সওদাগরকে বলিল। তারপর আরও কিছুদুর যাইবার পর সেই নৌকা আসিয়া একটি রাজ্যের ঘাটে পৌছিল। সওদাগর বলিল, "এটাকে এইঘাটে নামাইয়া দে।"

এদিকে ঐ রাজ্যের যে গোয়ালা অর্থাৎ যে গোয়ালা বোকার রাজবাড়ীতে দুধ, ঘি এবং মাখন দিত—সে যেই গরু দুইয়া ছাড়িয়া দিত, অমনি গরুটি একটি বিল ডিঙ্গাইয়া অপর পারে যাইত। তারপর যখন বিকালে গরু বাড়ী আসিত, তখন গোয়ালা আর দুধ দুইয়া দুধ পাইত না। গরুটি বিল ডিঙ্গাইয়া ওপারে যাইয়া একটি বড় বট গাছের তলায় গিয়া শুইয়া পড়িত। তখন সেই বোকা-বুকির ছেলে দুইটি গরুর দুধ পান করিত। ছোট ছেলেটা গরুর বাঁট চুষিয়া খাইত এবং বড় ছেলেটি দুধ দুইয়া পান করিত এবং কচুর পাতায় করিয়া দুধ জমা করিয়া রাখিয়া দিত। গরু যখন বিকালে ফিরিয়া আসিত, তখন দুধ হইত না, ফলে রোজ রোজ রাজবাড়ীতে দুধ কম পড়িত। রোজ রোজ দুধ কম পড়িবার ফলে বোকা গোয়ালিনীকে রাজবাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খুব বকিয়া দিল। গোয়ালা বাড়ীতে আসিয়া গোয়ালনীকে খুব বকিল এবং বলিল, "তুই নিশ্চয় অন্য কোথাও দুধ বিক্রি করিস্, যার জন্য রোজ দুধ কম পড়ে। তুই আর অন্য কোন জায়গায় দুধ বিক্রি করিস না, তা হলে আমাদের আর ভাল রোজগার হ'বে না।" এই কথায় গোয়ালনী রাগিয়া গেল; কারণ, সে অন্য কোথাও দুধ বিক্রি করে না। গোয়ালা বলিল, "আচ্ছা আমি তাহলে গরুর পিছে পিছে যাব এবং দেখব যে কেহ নিশ্চয় দুধ দুইয়া নেয় এবং যে দুধ দুইয়া নেয়, তাকে ধরব।"

তারপর গোয়ালা গরুকে ছাড়িয়া দিয়া গরুর পিছন পিছন চলিল এবং যাইতে যাইতে দেখিল যে গরুটি একটি বিল পার হইতেছে, তখন গোয়ালা দৌড়াইয়া গিয়া গরুর লেজ ধরিয়া সেও বিল পার হইল। বিল পার হইয়া গিয়া গোয়ালা দেখিল যে গরুটি একটি বট গাছের তলায় শুইয়া পড়িল। গোয়ালা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল যে ছেলে দুইটি গরুর দুধ কি ভাবে পান করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া গোয়ালা দৌড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং বাজা গোয়ালনীকে বলিল, "দেখ গোয়ালনী, আমরা একটা জিনিস পেয়েছি, সে ধন আমাদের নাই।" কারণ, তাদের কোন ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া তাদের মনে বড়ই দুঃখ ছিল এবং পাড়া প্রতিবেশী তাদের বাজা গোয়ালা গোয়ালনী বলিয়া ডাকিত।

ছেলেপুলের কথায় বাজা গোয়ালনীর আনন্দ হইল বটে, তবুও সে বলিল, "আরে না গোয়ালা, ছেলে দুইটা আমরা আন্‌ব না। কার-না-কার জিনিস, আমরা নিয়া শেষে গর্দান যাবে।" গোয়ালা ছেলে

দুইটিকে নিজেদের ছেলে বলিয়া পরিচয় দিবে বলিয়া নিজেদের বাড়ীতে আনিতে চাহিয়াছিল এবং তাহার উত্তরে বাজা গোয়ালনী, গোয়ালাকে এই কথা বলিয়াছিল। তখন গোয়ালা বলিল, "আচ্ছা, কাল আমি যাব এবং ছেলে দুইটাকে জিজ্ঞাসা করে আস্‌ব।" পরদিন গোয়ালা আবার গরুর পিছে পিছে সেই জায়গায় গিয়া পৌঁছিল এবং গাছের আড়ালে গিয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। বড় ছেলেটা দুধ দুইয়া খাইতেছে এবং কচুর পাতায় জমা করিয়া রাখিয়া দিতেছে, আর ছোট ছেলেটি বাঁট চুষিয়া খাইতেছে। তখন গোয়ালা ছেলে দুইটির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কোথা হতে এলে, তোরা কার ছেলে?" বড় ছেলেটি বলিল, "আমার মা-বাবা কোথায় গেছে জানি না, তাই আমরা এই বনের ভিতরে কুঁড়ে ঘরেই থাকি এবং এই গরুর দুধ খাই।" গোয়ালা বলিল, "আমি যদি তোদের নিয়ে যাই, তবে তোরা যাবি?" এই কথায় বড় ছেলেটি যাইতে স্বীকার করিল। তারপর গোয়ালা বাড়ীতে আসিয়া সব কথা গোয়ালনীকে বলিল এবং এও বলিল "তুই সন্ধ্যার সময় পেটে একটা ধামা বেঁধে তার উপর কাপড় জড়াইয়া, মাথায় একটা ঘোলের হাঁড়ি নিয়া প্রতিবাড়ীতে যাবি।"

সেই কথা অনুযায়ী গোয়ালনী পেটে ধামা বাঁধিয়া, মাথায় ঘোলের হাঁড়ি নিয়া প্রতি বাড়ী ফিরিতে লাগিল। পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তখন বলিতে লাগিল, "ও বাজা গোয়ালনী, এ তোর কবে হ'ল?" বাজা গোয়ালনী বলিল, "শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, কেবা কি করে এবং কেবা কি বলে, এই তো দশ মাস।" পাড়া প্রতিবেশীর খুব আনন্দ হইল যে বাজা গোয়ালনীর ছেলেপুলে হবে, তাই সবাই তাকে লেবুটা, কে ওবা মুড়ির মোয়া, কেও বা চিঁড়ের মোয়া দিতে লাগিল। এইরূপে প্রত্যেক বাড়ী ঘুরিয়া বাজা গোয়ালনী বাড়ী ফিরিল। এদিকে রাত্রি হইয়া গেল। মধ্য রাত্রে বাজা গোয়ালনীর বাড়ীতে সাত ঝাঁক উলুধ্বনি পড়িল এবং সবাই মনে করিল যে বাজা গোয়ালনীর নিশ্চয় ছেলে হইয়াছে। পরদিন সকালে সকলে বাজা গোয়ালনীর ছেলে দেখিতে আসিল। বাজা গোয়ালনী বড় ছেলেটিকে লুকাইয়া রাখিয়া ছোট ছেলেটিকে বার বার ঘুরাইয়া দেখাইতে লাগিল যে তাহার যমজ ছেলে হইয়াছে। কারণ, গোয়ালা সেইদিন সন্ধ্যা বেলা বোকা-বুকির ছেলে দুইটাকে লইয়া আসিয়াছিল এবং সেই ছেলে দুইটিকে নিজ সন্তান বলিয়া পরিচয় দিল—ঐরূপ একটি ছল করিয়া যে বাজা গোয়ালনীর যমজ ছেলে

হইয়াছে। এইরূপ গোয়ালনীর দুধ, ঘি, মাখন খাইয়া ছেলে বড় হইতে লাগিল। বড় ছেলেটিকে অল্প খাইতে দিয়া এবং ছোট ছেলেটিকে বেশী খাইতে দিয়া দুইটি ছেলেকে এক সমান করিয়া তুলিল এবং ইহাতে ছেলে দুইটি যমজ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এদিকে বোকা যে রাজ্যের রাজা, সেই রাজ্যের রাজার মা মারা গিয়াছে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গোয়ালার রাজবাড়ীতে ডাক পড়িল, দই, মিষ্টি তৈয়ার করিবার জন্য। তখন গোয়ালার খুব জ্বর হইয়াছিল, বলিল যে সে এখন আর মাল তৈয়ার করিতে পারিবে না। কিন্তু গোয়ালার ছেলে দুইটি বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা গোয়ালাকে বলিল, "বাবা, তুমি জিনিস তৈরী করার ভার নাও, আমরা সে জিনিস তৈরী করে দিব এবং রাজার বাড়ী পৌছিয়ে দিব।" সুতরাং গোয়ালা জিনিস তৈয়ারী করিবার ভার নিল এবং গোয়ালনী ও ছেলে দুইটি মিলিয়া দই, মিষ্টি, ক্ষীর এবং সন্দেশ তৈয়ারী করিল। পরদিন সকালে তাহারা দুই ভাইয়ে মিলিয়া বাঁকে মিষ্টি নিয়া রাজবাড়ীর দিকে রওনা দিল। এই রাজবাড়ী ও গোয়ালনীর বাড়ীর মধ্যবর্তী স্থানে সেই গলিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বুকি থাকিত এবং গোবর কুড়াইয়া এবং ঘুঁটে বিক্রি করিয়া সে তাহার জীবন যাপন করিত। ঐ ঘুঁটে কুড়ানীর ঘরের সাম্‌না দিয়া যখন ঐ ছেলে দুইটা যাইতেছিল, তখন ছোট ছেলেটি একটি গান ধরিল,

"বাপ গেছে আনে, মা গেছে বানে,
আমরা দুই ভাই রইলাম বট বৃক্ষের তলে।
গোয়ালনীর ছিল কপিলেশ্বরী গাই,
দুধ খাইয়া বাঁচলাম আমরা দুই ভাই।"

গোবর কুড়ানী বুড়ী ঘরে বসিয়া এই গান শুনিল। ছেলে দুইটি গান গাহিতে গাহিতে মিষ্টি নিয়া রাজবাড়ী পৌছিল। রাজবাড়ীতে খাওয়া দাওয়া হইতে লাগিল এবং সবাই মিষ্টি খাইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এত সুন্দর দই মিষ্টি গোয়ালা কোনদিন তৈরী করিতে পারে না। গোয়ালার ছেলেরা খুব ভাল মিষ্টি তৈয়ার করেছে।"

রাজবাড়ীতে খাওয়া শেষ হইতে হইতে রাত্রি অনেক হইল এবং সেই অনেক রাত্রেই ছেলে দুইটা খাওয়া দাওয়া সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঐ গানটাও গাহিতেছিল। অন্ধকার রাত্রি বলিয়া ঐ গোবর কুড়ানী বুড়ী নিজের বাড়ীর সাম্‌নে একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়াছিল। এখান দিয়া যখন

তারা যাইতেছিল, তখন গোবর কুড়ানী বুড়ী বলিল, "ওরে তোরা যখন রাজবাড়ীতে যাইতেছিলি, তখন যে গানটা করছিলি, সেই গানটা একবার কর না। তোরা এত রাত্রে বাড়ীতে না গিয়া আমার ঘরে আসিয়া বস এবং রাত্রি ভোর হইলে বাড়ী ফিরিয়া যাস।"

এই কথায় বড় ছেলেটি রাজী হইল; কিন্তু ছোট ছেলেটি কিছুতে রাজী হইতে চায় না; বড় ছেলেটির মায়ের কথা মনে ছিল বলিয়া সে খুব করিয়া ছোট ভাইকে বুঝাইল যে এই অন্ধকার রাত্রে বাড়ীতে না ফেরাই উচিত। রাত্রে এখানে ঘুমাইয়া নিয়া ভোর হইতে না হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। তারপর অন্ধকার রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে ছোটভাই রাজী হইল, তাহারা গিয়া সেই বুড়ীর ঘরে বসিল, তবে ছোট ছেলেটি বলিল যে, যদি বুড়ী কাঁদে, তবে সে ঘরে বসিবে না, বা গানও করিবে না। কারণ, বুড়ী ঐ গান শুনিবার পর হইতে খুব কাঁদিতেছিল। তখন বুড়ী বলিল যে সে কাঁদিবে না। নিজের ছেঁড়া কাঁথা দিয়া তাহাদের বিছানা করিয়া দিল। ছেলে বিছানায় শুইবার পর বুড়ী আবার বলিল সেই গানটা করিবার জন্য। তখন ছোট ছেলেটি বাধ্য হইয়া সেই গান ধরিল:—

"বাপ গেছে আনে মা গেছে বানে,
আমরা দুই ভাই রইলাম বটবৃক্ষের তলে।
গোয়ালনীর ছিল কপিলেশ্বরী গাই,
দুধ খাইয়া বাঁচলাম আমরা দুই ভাই।"

এই গান করিয়া ছেলে দুইটি ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু বুড়ীর চোখে ঘুম নাই। সে ছেলে দুইটির শিয়রে বসিয়া সারারাত ধরিয়া কাঁদিল, ওদের মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বুড়ী তাহার বুক ভাসাইল, মনে মনে ঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে লাগিল এবং বলিল, "হে ঠাকুর, যদি সত্য ধর্মের কাল হয় এবং আমি যদি সতী হই, তবে আমি যেন আমার এই ছেলে দুইটিকে ফিরিয়া পাই।"

রাত্রি ভোর হইতে না হইতে বুড়ী রাজবাড়ী ছুটিল, তখনও ছেলে দুইটি ঘুমাইতেছে। বুড়ী রাজবাড়ীতে গিয়া, রাজবাড়ীর যে ঢোল, তাহা বাজাইল। এই ঢোল বাজাইয়া প্রত্যেকে নিজেদের অভাব অভিযোগ রাজাকে জানায়। এই ঢোল বাজাইয়া বুড়ী বলিল, "রাজা মহাশয় আমি উচিত বিচার চাই।" বুড়ীর এই কথা শুনিয়া রাজবাড়ীর মন্ত্রী হইতে

আরম্ভ করিয়া ঝি পর্যন্ত সবাই হৈ চৈ করিয়া উঠিল এবং বলিল, "ঘুঁটে কুড়ানী বুড়ীর আবার কিসের উচিত বিচার।" এইসব গণ্ডগোল শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা ওকে ওর অভিযোগ বলবার সুযোগ দাও, বা কিই বা বুড়ীর অভাব, তাহা শোনা হউক প্রথমে, তার উচিত বিচার করা যাবে।"

বুড়ী রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "মহারাজ, এই ছেলে দুইটি আমার, ওরা গোয়ালার ছেলে নয়।" এই কথা শুনিয়া আবার সকলে হৈচৈ করিয়া উঠিল। মহারাজের কিন্তু এখন কিছু কিছু পূর্বস্মৃতি মনে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাই রাজা হুকুম দিলেন, "যাও, সবাই গোয়ালা-গোয়ালনীকে ডেকে আন।" গোয়ালার কাছে রাজবাড়ীর লোক গিয়া বলিল, "মহারাজ গোয়ালাকে ডাকিয়াছে।" কথা শুনিয়া গোয়ালনী চিৎকার শুরু করিয়া দিল এবং বলিল "আমি আগেই জান্‌তাম যে আমার ছেলেদের ঘরের বার করলেই নিশ্চয়ই একটা না একটা কিছু হবে। সেইজন্যই আমি ওদের ঘরের বার করতাম না। এখন রাজবাড়ীতে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে।" গোয়ালার খুব অসুখ থাকায় সে বলিল, "আমার তো খুব অসুখ আমি যেতে পারব না, রাজাকে বলে দিও গিয়ে।"

তখন রাজবাড়ীর লোকেরা গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। মহারাজ তখন গোয়ালাকে চালি করিয়া নিয়া আসিবার আদেশ দিলেন। সুতরাং বাঁশের চালি করিয়া গোয়ালাকে আনা হইল। গোয়ালনীও গোয়ালার পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল। গোয়ালা-গোয়ালনী আসিলে রাজা বলিলেন, "এই ছেলে তোমাদের নয়, গোবর কুড়ানী বুড়ীর ছেলে।" উত্তরে গোয়ালনী বলিল, "কে না জানে যে এই ছেলে পেটে নিয়া আমি প্রত্যেক বাড়ীতে ঘুরে বেড়িয়েছি।" রাজা বলিলেন এই কথায় কোন কিছু হইবে না, ভাল করিয়া বিচার করিব। বিচারে যে জয়ী হইবে, তাহারই হইবে এই ছেলে। রাজবাড়ীর কথা বলিতে দেরী হয়, কিন্তু সে কথার কাজ করিতে দেরী হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে একটা পুকুর কাটা হইয়া গেল এবং দুধ দিয়া পুকুর ভরা হইয়া গেল। পুকুর ভরা হইলে রাজা বলিলেন, এক পারে ছেলে দুটি দাঁড়াইবে এবং অপর পারে গোয়ালনী ও গোবর কুড়ানী বুড়ী দাঁড়াইবে। যার বুকের দুধ গিয়া ছেলেদের মুখে পড়িবে, তারই নিজের ছেলে বলিয়া ইহারা এ'রা পরিচিত হইবে। তখন ঘুঁটে কুড়ানী বলিল, "আচ্ছা, আমি এই পুকুরে একটা ডুব দিবা উঠি।" পুকুরে নামিয়া গোবর কুড়ানী বুড়ী সূর্যদেবকে বলিল, "সূর্যদেব, তোমার গলিত

কুষ্ঠ-তুমি ফিরিয়ে নাও এবং আমার সেই রূপ এবং তেজ আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি যেন আমার ছেলেদের ফিরে পাই।" এই বলিয়া সে ডুব দিয়া স্নান করিয়া পারে উঠিল এবং উঠার সঙ্গে সঙ্গে সকলে যে আগে ছিল গলিত কুষ্ঠ আর এখন হইল অপূর্ব সুন্দরী রাজরাণীরূপেই তাহাকে মানায়। পুকুর হইতে উঠিয়া যেই সে দুধ টিপিয়া ধরিল, অমনি ওপারে দণ্ডায়মান ছেলেদের মুখে গিয়া তাহা পড়িল এবং মুখ বুক দুধে ভাসিয়া গেল, ছত্রিশ নালে দুধ গিয়া ওদের মুখে পড়িতে লাগিল। এদিকে গোয়ালনী তাহার দুধ টিপিতে টিপিতে রক্ত বাহির করিয়া ফেলিল; কিন্তু দুধ আর বাহির হইল না। সকলেই দেখিল যে গোবর কুড়ানী বুড়ীর দুধ গিয়া ছেলেদের মুখে পড়িয়াছে। রাজার বিচারে সেই হইল ছেলেদের মা; যদিও এখন গোবর কুড়ানী বুড়ী আর সেইরূপ নাই, সে এখন অপূর্ব সুন্দর রমণী।

এইবার রাজার মনে পড়িল যে কি ভাবে তাহার স্ত্রী ও পুত্রকে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। এই সব দৃশ্য দেখিয়া গোয়ালনী পাছড়া পাছড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং বলিল, "এই ছেলে আমার।" রাজা বলিলেন, "হ্যাঁ ছেলেদের প্রতি আমারও যেরূপ অধিকার, তোমারও সেইরূপ অধিকার থাক্‌বে। কারণ তুমি না থাক্‌লে হয়ত আমি আমার এই ছেলেদের পেতাম না। তবে তোমরা মরলে আমার এই ছেলেরা তোমাদের শ্রাদ্ধ করবে এবং গয়াতে গিয়ে পিণ্ড দিবে। এখন এই স্ত্রী পুত্র আমার কাছেই থাক্‌বে।" তারপর ছেলেদের হলুদ জলে স্নান করাইয়া স্ত্রীকে রাজার পাশে বসান হইল, ছেলেরা হইল সেই দেশের রাজপুত্র। —পাবনা, বিমলা দেবী, ১৩৪০

মন্তব্য

এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে বিভিন্ন অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমেই রাজার বিজয়ী কনিষ্ঠ পুত্র (Successful youngest son)। সাধারণতঃ কনিষ্ঠ পুত্রের দৈহিক কিংবা মানসিক ত্রুটি কিছু থাকিবেই, তারপর তাহা সত্ত্বেও তাহারা শেষ পর্যন্ত অন্যান্য ভাইদিগের তুলনায় অধিকতর গৌরব লাভ করিবে। ইহাতে তাহাই হইয়াছে। তারপর জল আনিতে গিয়া পতি এবং পত্নীর মধ্যে কিংবা ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভগিনীতে ভ্রাতায়, পিতায় পুত্রকন্যায় বিচ্ছেদ লোক-কথার স্বাভাবিক অভিপ্রায়। দুগ্ধদাত্রী গাভীর করুণায় অসহায় শিশুর জীবন রক্ষাও ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। অসম্মানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সুন্দরী নারীর কুশ্রীতে রূপান্তরও ইহার অভিপ্রায়।

৮

নিরেট বোকা

এক রাজার বাড়ীর কাছে এক শিয়াল থাকত। রাজার ছাগলের ঘরের পিছনে তার গর্ত ছিল। রাজার ছাগলগুলো ছিল খুব সুন্দর আর মোটা-সোটা। রাজার রাখালের ভয়ে শিয়াল তাদের খেতে পারত না। গর্তের ভিতর থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে ছাগলের ঘরে এসেও সে বাচ্চাগুলোকে খেতে পেল না। বরং ধরা পড়ে গেল। রাখালেরা শিয়ালকে বেঁধে রেখে গেল, বলে গেল, এ বেটাকে নিয়ে তামাসা করা যাবে, তারপর মারা হবে।

রাখালেরা যেই চলে গেল, তখনই সেইখান দিয়ে এক বাঘ যাচ্ছিল। বাঘ শিয়ালকে ডেকে বলল, কি ভাগ্নে, এখানে বসে কি করছ? শিয়াল বললে, বিয়ে করছি। বাঘ বললে, কনে কৈ, লোকজন কোথায়? শিয়াল বললে, কনে তো রাজার মেয়ে, লোকজন তাকে আনতে গেছে। বাঘ বললে, তুমি বাঁধা কেন? 'আমি কিনা বিয়ে করতে চাই নি, সেইজন্যে রাজার লোকজন আমাকে বেঁধে রেখে গেছে।' বাঘ বললে, 'নেহাত যখন তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, তখন আমায় বেঁধে রেখে যাও না।' শিয়ালের বাঁধন বাঘ খুলে দিলে বাঘ বাঁধা রইল। শিয়াল যাবার সময় বলে গেল, মামা শ্যালারা এসে হাসি ঠাট্টা করবে, তুমি যেন চটো না।

রাখালেরা বাঘকে দেখতে পেয়ে খুব মারধোর দিলে। বাঘ হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল, তারা বাঘকে আরো বেদম প্রহার দিল। মার খেয়ে বাঘ দড়ি ছিঁড়ে পালাল।

বনের ভিতরে এক জায়গায় করাতীরা করাত দিয়ে কাঠ চিরত। একটা মস্ত কাঠ আধখানা চিরে রেখে, সেইখানে গোঁজ মেরে করাতীরা চলে গেল। এই সময় বাঘ বনের ভিতর এসে দেখে শিয়াল সেই আধচেরা, কাঠখানার উপরে বসে বিশ্রাম করছে।

শিয়াল তাকে দেখে বললে, কি মামা বিয়ে কেমন হল?

বাঘ বললে, না ভাগ্নে, ওরা বড্ড বেশী ঠাট্টা করে।

শিয়াল বললে, তা বেশ করেছ, এখন এস, দুজনে বসে গল্প স্বল্প করি। বলতেই বাঘ লাফিয়ে কাঠের উপরে উঠেছে, আর বসেছে ঠিক সেইখানটাতে ঠিক যেখানটায় কাঠটা খুব হাঁ করে আছে। তার লেজটা সেই ফাঁকের ভিতর

ঢুকে ঝুলে রয়েছে। শিয়াল দেখলে এবারে কাঠ থেকে গোঁজা খুলে নিলে বেশ তামাসা হবে। সে কায়দা করে গোঁজা খুলে নিলে. বাঘের লেজটা তাতে আটকে গেল। আর কাঠ থেকে লাফ দিতেই বাঘের লেজ ফটাং করে ছিঁড়ে গেল। শিয়াল দুষ্টুমি করে বললে, মামা গেলুম। তখন দুজনে কচুবনের ভিতরে শুয়ে রইল। বাঘকে কৌশল করে কচু খাওয়াতে বাঘের মুখ কুট কুট করতে লাগল, গাল গলা ফুললো। পনেরো ষোল দিন বাদে শিয়াল গা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। বাঘ জিগ্যেস করলে, ভাগ্নে, তুমি সারলে কি করে? শিয়াল বললে নিজের হাত পা চিবিয়ে নিলুম। তারপর যেই অসুখ সেরে গেল, হাতটা আবার গজালো। বাঘ সত্যি সত্যি নিজের হাত পা চিবিয়ে গেল, আর তিন চারদিনের মধ্যে ভয়ানক ঘা হয়ে শুকিয়ে মরে গেল।

মন্তব্য

আপাত দৃষ্টিতে কাহিনীটির মধ্যে হিতোপদেশের কাহিনী 'বানর-কীলক-কথা'র প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্বেও বাংলার উপকথায় বাঘ ও শিয়ালের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহাতে একদিকে শৃগালের ধূর্ততা ও বাঘের নির্বুদ্ধিতার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। একজনের চতুরতার সঙ্গে আর একজনের নির্বুদ্ধিতা যে ভাবগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, তাহাতেই এই শ্রেণীর কাহিনীর গুণ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা মূলতঃ তাহাই। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সঙ্কলিত 'টুনটুনির বই'য়ে গল্পটি প্রকাশিত হইবার ফলে ইহা সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে সহজেই প্রচারিত হইয়াছে।

৯

ইঁড়ি-মিড়ি-কিড়ি

এক বুড়ো চাষী, তার নাম বুদ্ধুর বাপ। সে প্রতিদিন ধানের ক্ষেত পাহারা দিত, আর বাবুই তাড়াতো। ঠকঠকির আওয়াজ শুনে বাবুই পালাতো না। মনের আনন্দে ধান খেত। একদিন সে রেগে মেগে বললে, বেটাদের যদি ধরতে পারি, তবে ইঁড়ি মিড়ি কিড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেবো। ইঁড়ি মিড়ি কিড়ি বাঁধন বলে কোনো জিনিস নেই। একদিন বুদ্ধুর বাপ বাবুই তাড়াতে এসে ইঁড়ি, মিড়ি, কিড়ি বাঁধনের কথা বলিতে আরম্ভ করল।

পাশে ছিল এক বাঘ, তার বেজায় ভাবনা হল। সে ভাবলে, তাই তো এটা আবার কি নতুন রকমের জিনিস, এমন বাঁধনের কথা তো কখনো শুনিনি। বাঘ আস্তে আস্তে ধান ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এসে, বুদ্ধুর বাপকে ডেকে বললে, ভাই, একটা কথা আছে। বাঘ দেখে বুদ্ধুর বাপ খুব ভয় পেল। কিন্তু বাঘকে তা বুঝতে দিল না। বাঘ বললে, তোমার এ যে কি একটা যেন বাঁধন আছে, তা একটিবার দেখতে হচ্ছে। বুদ্ধুর বাপ বললে, একটা খুব বড় আর মজবুত থলে, এক গাছি খুব মোটা আর লম্বা দড়ি, আর একটা মস্ত মুগুর চাই। বাঘ বললে, এ আর আনতে কতক্ষণ। তারপর সে হাটের দিকে গেল, পথে তিনজন খইওলা বড় বড় থলে খই নিয়ে যাচ্ছিল, তারা বাঘকে দেখে খইভর্তি থলে ফেলে পালালে। দড়ির জন্যে বেশী দূর যেতে হল না, গরু বাঁধা দড়ি মাঠ থেকে নিয়ে নিলে। তারপর বাঘ পালোয়ানদের আখড়ায় গিয়ে মুগুর নিয়ে এল।

এইবার বুদ্ধুর বাপ বললে, তুমি একটি বার এই থলের ভিতর এস দেখি। বলতেই বাঘ ঢুকল থলের ভিতর, বুদ্ধুর বাপ থলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সেই বাঘ শুদ্ধ থলে খুব জোর করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। মুগুর দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মারতে লাগল। বাঘ নীরবে সেই মার সহ্য করল, মুখে কিছু বলল না, পাছে নিন্দে হয়। তারপর বাঘ না চেঁচিয়ে পারল না, খানিক বাদে গোঙাতে আরম্ভ করল, শেষে স্থির হয়ে গেল। বুদ্ধুর বাপ ভাবল, বাঘ বুঝি মরে গেছে। বাঘটাকে খুলে ক্ষেতের ধারে ফেলে দিয়ে এল। বাঘ কিন্তু মরে নি। তার গায়ে গতরে খুব ব্যথা। বাঘ মনে মনে ভাবল, বুদ্ধুর বাপকে

ঢুকে ঝুলে রয়েছে। শিয়াল দেখলে এবারে কাঠ থেকে গোঁজা খুলে নিলে বেশ তামাসা হবে। সে কায়দা করে গোঁজা খুলে নিলে. বাঘের লেজটা তাতে আটকে গেল। আর কাঠ থেকে লাফ দিতেই বাঘের লেজ ফটাং করে ছিঁড়ে গেল। শিয়াল দুষ্টুমি করে বললে, মামা গেলুম। তখন দুজনে কচুবনের ভিতরে শুয়ে রইল। বাঘকে কৌশল করে কচু খাওয়াতে বাঘের মুখ কুট কুট করতে লাগল, গাল গলা ফুললো। পনেরো ষোল দিন বাদে শিয়াল গা ঝাড়া দিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল। বাঘ জিগ্যেস করলে, ভাগ্নে, তুমি সারলে কি করে ? শিয়াল বললে নিজের হাত: পা চিবিয়ে নিলুম। তারপর যেই অসুখ সেরে গেল, হাতটা আবার গজালো। বাঘ সত্যি সত্যি নিজের হাত পা চিবিয়ে গেল, আর তিন চারদিনের মধ্যে ভয়ানক ঘা হয়ে শুকিয়ে মরে গেল।

মন্তব্য

আপাত দৃষ্টিতে কাহিনীটির মধ্যে হিতোপদেশের কাহিনী 'বানর-কীলক-কথা'র প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলার উপকথায় বাঘ ও শিয়ালের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ইহাতে একদিকে শৃগালের ধূর্ততা ও বাঘের নির্বুদ্ধিতার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। একজনের চতুরতার সঙ্গে আর একজনের নির্বুদ্ধিতা যে ভাবগত বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, তাহাতেই এই শ্রেণীর কাহিনীর গুণ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা মূলতঃ তাহাই। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সঙ্কলিত 'টুনটুনির বই'য়ে গল্পটি প্রকাশিত হইবার ফলে ইহা সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে সহজেই প্রচারিত হইয়াছে।

৯

হঁড়ি-মিড়ি-কিড়ি

এক বুড়ো চাষী, তার নাম বুদ্ধুর বাপ। সে প্রতিদিন ধানের ক্ষেত পাহারা দিত, আর বাবুই তাড়াতো। ঠকঠকির আওয়াজ শুনে বাবুই পালাতো না। মনের আনন্দে ধান খেত। একদিন সে রেগে মেগে বললে, বেটাদের যদি ধরতে পারি, তবে ইঁড়ি মিড়ি কিড়ি বাঁধন দেখিয়ে দেবো। ইঁড়ি মিড়ি কিড়ি বাঁধন বলে কোনো জিনিস নেই। একদিন বুদ্ধুর বাপ বাবুই তাড়াতে এসে ইঁড়ি, মিড়ি, কিড়ি বাঁধনের কথা বলিতে আরম্ভ করল।

পাশে ছিল এক বাঘ, তার বেজায় ভাবনা হল। সে ভাবলে, তাই তো এটা আবার কি নতুন রকমের জিনিস, এমন বাঁধনের কথা তো কখনো শুনিনি। বাঘ আস্তে আস্তে ধান ক্ষেত থেকে বেরিয়ে এসে, বুদ্ধুর বাপকে ডেকে বললে, ভাই, একটা কথা আছে। বাঘ দেখে বুদ্ধুর বাপ খুব ভয় পেল। কিন্তু বাঘকে তা বুঝতে দিল না। বাঘ বললে, তোমার এ যে কি একটা যেন বাঁধন আছে, তা একটিবার দেখতে হচ্ছে। বুদ্ধুর বাপ বললে, একটা খুব বড় আর মজবুত থলে, এক গাছি খুব মোটা আর লম্বা দড়ি, আর একটা মস্ত মুগুর চাই। বাঘ বললে, এ আর আনতে কতক্ষণ। তারপর সে হাটের দিকে গেল, পথে তিনজন খইওলা বড় বড় থলে খই নিয়ে যাচ্ছিল, তারা বাঘকে দেখে খইভর্তি থলে ফেলে পালালে। দড়ির জন্যে বেশী দূর যেতে হল না, গরু বাঁধা দড়ি মাঠ থেকে নিয়ে নিলে। তারপর বাঘ পালোয়ানদের আখড়ায় গিয়ে মুগুর নিয়ে এল।

এইবার বুদ্ধুর বাপ বললে, তুমি একটি বার এই থলের ভিতর এস দেখি। বলতেই বাঘ ঢুকল থলের ভিতর, বুদ্ধুর বাপ থলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। তারপর সেই বাঘ শুদ্ধু থলে খুব জোর করে দড়ি দিয়ে বাঁধল। মুগুর দিয়ে ধাঁই ধাঁই করে মারতে লাগল। বাঘ নীরবে সেই মার সহ্য করল, মুখে কিছু বলল না, পাছে নিন্দে হয়। তারপর বাঘ না চেঁচিয়ে পারল না, খানিক বাদে গোঙাতে আরম্ভ করল, শেষে স্থির হয়ে গেল। বুদ্ধুর বাপ ভাবল, বাঘ বুঝি মরে গেছে। বাঘটাকে খুলে ক্ষেতের ধারে ফেলে দিয়ে এল। বাঘ কিন্তু মরে নি। তার গায়ে গতরে খুব ব্যথা। বাঘ মনে মনে ভাবল, বুদ্ধুর বাপকে

ভাল না হয়, আর রাঁধুনিকে খাব। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকেই হালুম হালুম করতে লাগল। এদিকে ভাইবোন গ্রামে পৌঁছতেই সারা গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে।

মন্তব্য

ইহার মূল অভিপ্রায় পশুর সহিত মানুষের বিবাহ এবং মানবীর গর্ভে পশু সন্তান উৎপাদন (Marriage of person to animal B 600–B 699)। এখানে পশু স্বামীর পত্নী মানবী, ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতও হইতে পারে ; অর্থাৎ মানুষের পশু পত্নী থাকিতে পারে এবং তাহার গর্ভে মানব-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিতে পারে। রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির এই ভাবে জন্ম হইয়াছিল। মধ্য ভারতের আদিবাসীদিগের মধ্য হইতে এই শ্রেণীর কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (Verrier Elwin, *Myths of Middle India*, London, 1949, XVIII, 5.)। এই সকল ক্ষেত্রে পশু সাধারণ রূপক চরিত্রও হইতে পারে, অর্থাৎ মানবীর বাঘ স্বামী অর্থে বাঘের মত হিংস্র, প্রতিহিংসা-পরায়ণ ও ক্রোধী চরিত্রের মানুষ স্বামীও বুঝাইতে পারে। উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'য়ে প্রকশিত হইয়া কাহিনীটি ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে।

১১

মামা-ভাগ্নে

বাঘ মামার সঙ্গে শিয়াল ভাগ্নের বড় ভাব। শিয়াল একদিন বাঘকে নেমন্তন্ন করলে; কিন্তু তার জন্যে কোনো খাবার তোয়ের করলে না। বাঘ যখন খেতে এল, তখন বললে, মামা, একটু বস, আর দুচার জন যাদের নেমন্তন্ন করেছি, তাদের ডেকে নিয়ে আসি। শিয়াল সেই যে গেল, আর বাড়ী ফিরল না। বাঘ শিয়ালকে বকতে বকতে বাড়ী ফিরে গেল। তারপর একদিন বাঘ শিয়ালকে নেমন্তন্ন করলে। শিয়ালকে মস্ত মস্ত মোটা মোটা হাড় খেতে দিলে বাঘ। শিয়ালের চারটে দাঁত ভেঙে গেল। বাঘ আবার ঐ রকম হাড় খেতে খুব ভালবাসে। সে মনের সুখে হাড় খেয়ে নিল, আর বললে, কি ভাগ্নে, পেট ভরলো তো। মনে মনে শিয়ালের ভয়ানক রাগ হল। ভাবল, বাঘ মামাকে যদি জব্দ না করতে পারি, তবে আমার নাম নেই।

শিয়াল সে দেশ ছেড়ে চলে গেল। নতুন দেশে আখের ক্ষেতে খুব আখ খেত। চাষীরা বিপদে পড়ে এক খোঁয়াড় প্রস্তুত করলে। চাষীরা যখন খোঁয়াড় তোয়ের করছে, তখন শিয়াল বললে এ ঘরে মামাকেই মানায়। তারপর দিন সে বাঘকে গিয়ে বললে, রাজার ছেলের বিয়ে, সেখানে আমি গান গাইব, তুমি বাজাবে, আর খাব যা তার তো কথাই নেই। রাজা পালকী পাঠিয়ে দিয়েছে, 'যাবে মামা'?

বাঘ বললে তা আর যাব না। বাঘকে শিয়াল আখের খেতে নিয়ে এল। খালি খোঁয়াড় দেখে বললে, পাল্কি পাঠিয়েছে, বেয়ারা পাঠায়নি। শিয়াল বললে, আমরা উঠে বসলেই বেয়ারা আসবে। বাঘ বললে পাল্কীর যে ডাণ্ডা নেই! শিয়াল বললে, ডাণ্ডা তারা সঙ্গে আনবে। একথা শুনে বাঘ যেই খোঁয়াড়ের ভিতর ঢুকেছে, অমনি ধড়াস করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শিয়াল বললে, আমি কি করে ঢুকবো, বাঘ বললে তোমার ঢুকে কাজ নেই। আমি নেমন্তন্ন খাইগে। শিয়াল বলল, বেশ, তাই হবে। শিয়াল চলে গেল। চাষীরা এসে দেখলো, বাঘ মশাই খোঁয়াড়ের ভিতর। তারা খোন্তা, বল্লম এনে বাঘকে মেরে ফেলল।

মন্তব্য

কাহিনীর প্রথম অংশের সঙ্গে ঈশপের উপকথার একটি কাহিনীর ঐক্য আছে।

১২

সাধে বাদ

এক ছিল গরীব বামুন। তাঁর ঘরে এক ব্রাহ্মণী, আর একটি ছোট মেয়ে ছিল। তাঁদের কষ্টে সৃষ্টে দিন কাটতো। ব্রাহ্মণ যা ভিক্ষে করে নিয়ে আসত, তাইতে কোন মতে চলে যেত। একদিন পাশের বাড়ী পায়েস রান্না হয়েছে দেখে, ব্রাহ্মণের মেয়ের খুব পায়েস খেতে ইচ্ছে হলো। সে বাড়ী এসে মাকে বলল, 'পায়েস খাব।' শুনে মা কাঁদতে লাগলেন, যাদের ভাত দুটি ভালো করে জোটে না, তাদের পায়েস খাওয়া অলীক স্বপ্ন মাত্র। তাই মা কাঁদতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে কাঁদবার কারণ জিজ্ঞেস করলো। ব্রাহ্মণী মেয়ের পায়েস খাওয়ার ইচ্ছের কথা বললেন। ব্রাহ্মণ তক্ষুণি গ্রামে গিয়ে পায়েসের জোগাড় করে আনলেন। ব্রাহ্মণী এমন সুন্দর পায়েস রাঁধলেন যে তার ভুরভুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত হল। এক কাক সেই পায়েসের গন্ধ পেয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ীর এক চালে বসে রইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের মেয়ে প্রায় সব পায়েসটুকু খেয়ে ফেললেন, বাকী যেটুকু পায়েস রইল, তা ব্রাহ্মণী খেলেন।

কাক ভারী রেগে গেল। সে বনে গিয়ে এক বাঘকে বললে, ব্রাহ্মণের একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, তার সঙ্গে বিয়ে হলে ভারী ভাল হয়। বাঘ তো খুব রাজী। তখন বাঘের কাছ থেকে কাক রোজ লেবু নিয়ে যেত মিথ্যে মিথ্যে করে ব্রাহ্মণকে দিবে বলে। একদিন কাক জানিয়ে দিয়ে গেল, বাঘ ব্রাহ্মণের বাড়ী বিয়ে করতে আসবে। সেই শুনে ব্রাহ্মণ পাড়া পড়শীকে ডেকে বললে। বাঘ যেদিন বিয়ে করতে এল, তাকে পাড়া পড়শীরা কুয়োর ভিতরে কৌশলে ফেলে দিয়ে গরম তেল ঢেলে দিলে। বাঘ মরে গেল, আর কাককে পাড়ার লোকরা ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলল।

মন্তব্য

পশুর মানবী বিবাহ করিবার সাধই কাহিনীটির একমাত্র অভিপ্রায়। বাংলার লোক-শ্রুতি অনুযায়ী কাক ধূর্ততম প্রাণী। কিন্তু কাক এখানে কোন সাধ পূর্ণ করিতে পারে নাই; বরং শেষ পর্যন্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছে। সুতরাং কাহিনীটির মধ্যে ঈশপের উপকথার কাক চরিত্রের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। ঈশপের উপকথায় কাক বোকা।

১৩

ঘোড়ার ডিম

এক ছিল জোলা। তার এক আদুরে ছেলে ছিল। সে যা চাইত, না নিয়ে ছাড়ত না। একদিন এক বড়মানুষের ছেলে জোলার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তা দেখে জোলার ছেলে জোলাকে বললে, বাবা আমাকে একটা ঘোড়া কিনে দাও। জোলা বললে, আমি গরীব মানুষ, ঘোড়া কি করে আনব। ঘোড়া কিনতে অনেক টাকা লাগে। ছেলে বললে, তা হবে না, ঘোড়া কিনতে অনেক টাকা লাগে, তা আমি কি জানি, ঘোড়া আমায় এনে দিতেই হবে। এই বলে ছেলে নেচে নেচে কাঁদল, বাপের হুঁকো কলকে ভেঙে দিল, শেষে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে।

জোলা পড়ল ভারী বিপদে। অনেক খোঁজাখুজি করে বাড়ীতে কিছু টাকা পেলে। সেই টাকা কাপড়ে বেঁধে ঘোড়া কিনতে হাটে গেল। হাটে গিয়ে ঘোড়াওলার কাছে দর করতে গিয়ে দেখল, ঘোড়ার দাম পঞ্চাশ টাকা; কিন্তু তার কাছে আছে মোট পাঁচ টাকা। সেইখানে দুজন লোক ঝগড়া করছে। একজন আর একজনকে বলছে 'ঘোড়ার ডিম হবে।' জোলা ছিল ভারী বোকা। সে শুনেই জিজ্ঞেস করলে, ঘোড়ার ডিম কোথায় পাওয়া যায়? সেইখানে এক দুষ্ট লোক ছিল। সে জোলাকে বললে, আমার সঙ্গে এস আমার ঘরে ঘোড়ার ডিম আছে। তার কাছে ছিল একটা ফুটি, তা দেখিয়ে বললে, দেখ না কেমন ফেটে রয়েছে, এর থেকে ছানা বেরুবে। দুষ্ট লোকটা তার কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করে নিলে। জোলা ফুটির ভিতরে লাল অংশটুকু দেখে ভাবলে, যখনই ছানাটা পালাতে চাইবে, তখনই সে খপ করে ধরে ফেলবে। চাদর বেঁধে তাকে ধরে নিয়ে যাবে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে জোলার খুব তেষ্টা পেল। নদীর ধারে ফুটিটা রেখে যেই জল খেতে গিয়েছে, অমনি কোত্থেকে এক শিয়াল এসে ফুটিটা খেতে আরম্ভ করলে। এমন সময় জোলা তাকে দেখতে পেয়ে বললে, সর্বনাশ আমার ঘোড়ার ছানা পালাল। শিয়ালকে ছুটে ধরা জোলার কম্ম নয়। ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে জোলা পথ হারিয়ে গেল। অনেক কষ্টে এক বুড়ির বাড়ীতে জোলা আশ্রয় নিলে। সেই বাড়ীতে বুড়ি আর বুড়ির নাতনী থাকতো। একটি ঘরে তারা শুতো, অপর ঘরটি জোলার জন্যে ছেড়ে দিলে। একটা বাঘ

জোলার বাড়ীর পিছনে রোজ আসত। বুড়ি জানতে পেরে সেখানে নিজেও আসত না, নাতনীকেও আসতে দিত না। কিন্তু নাতনীটি জোলার কাছে তার ঘোড়ার ডিমের কথা ভাল করে শোনবার জন্যে সে আবার তার কাছে যেতে চাইল। বুড়ি তাকে বললে, 'না মা যাসনে, বাঘে-টাগে ধরে নেবে।'

বাঘে-টাগে এমনি করে লোকে বলে থাকে। টাগ বলে আসলে কোনো জন্তু নেই। বাঘতো সে কথা জানে না, টাগের কথা শুনে ভাবনায় পড়ল। সে ভাবল, টাগ নিশ্চয় কোনো ভূত, জানোয়ার বা রাক্ষস হবে। এমন সময় সেই জোলা ভোর হয়েছে কি না দেখবার জন্যে বাইরে এসেছে। এসেই সে বাঘকে দেখে ভাবল, ঐ রে আমার ঘোড়ার ছানা বসে আছে। অমনি সে ছুটে গিয়ে বাঘের নাকে মুখে গলায় কাপড় জড়িয়ে তড়াক করে তার পিঠে গিয়ে উঠে বসল। বাঘ ভাবল নিশ্চয় তাকে টাগে ধরেছে। আর জোলা ভাবছে তার ঘোড়ার ছানা। বাঘ ছুটছে, আর বলছে দোহাই টাগদাদা আমার ঘাড় থেকে নামো, তোমাকে পুজো দেবো।

জোলা জানে না, বাঘ তাকেই টাগ বলছে। জোলা ভাবছে, সে কি করে পালাবে। এমন সময় বাঘ এক বটগাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। সে গাছের ডালগুলি খুব নিচু। জোলা খপ করে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। আর তাড়াতাড়ি গাছে উঠে গেল। জোলা আর বাঘ দুজনেই বললে, বড্ড বেঁচে গিয়েছি। এখন জোলা ভাবছে, নিচে তো বাঘ, কেমন করে সে ঘরে যাবে। আর এদিকে বাঘের চোখ বাঁধা দেখে চার পাঁচটা বাঘ এসে ব্যাপারটি জিগ্যেস করল।

বাঘ বললে, আমাকে টাগে ধরেছিল। এখন টাগের পুজো দিতে হবে। এই কথা শুনে সব বাঘে মিলে টাগের পুজো করতে লাগল। জোলা অত বড় বড় বাঘ দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। পাতার আড়ালে জোলা লুকিয়ে ছিল বলে বাঘেরা তাকে দেখতে পেল না। গাছের ডালে জোলার কাপড় ঝুলছিল। পাতার জন্যে ভাল করে দেখতে না পেয়ে তাকেই লেজ বলে মনে করছে। লেজ দেখে বুড়ো বাঘ বললে, ওঠা নিশ্চই ভয়ানক জানোয়ার টাগ হবে। এই কথা শুনে বাঘেরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

জোলা গাছ থেকে নেমে বাড়ী এল। জোলাকে দেখে তার ছেলে বললে কই, বাবা, ঘোড়া কই, জোলা তার গালে ঠাস করে চড় মেরে বললে. 'এই নে ঘোড়া'।

মন্তব্য

দেশ বিদেশের লোক-সাহিত্যে নির্বুদ্ধিতার কাহিনীতে চাল কুমড়াকে ঘোড়ার ডিম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (Pumpking thought to be an Ass's Egg, G 1172.1)। মার্কিন দেশ হইতে ইহার যে একটি পাঠান্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ *Folk-Lore* (London) পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখানে আনুপূর্বিক উদ্ধৃতিযোগ্য।

'In a recent conversation with my mother-in-law Mrs William A Ramsey, at her home in East Liverpool, Ohio, she told me the story of a joke which had been played on one of the early residents of the area. A Mr. Shalley, from Cheshire, England, and a Mr Leak from London, came to Liverpool to make their homes. Leak, the younger of the two men, exhausted his capital when he purchased his plot of land which lay in the valley of small creek. He realized that he would need a horse, and knowing little of farm animals, or how he might become the owner of a horse, he sought the advice of his older friend. Shalley, knowing the young man's ignorance, decided to play a joke on him. Pointing to a pumpkin, he told Leak that it was the egg of a horse, and he offered the pumpkin to his friend. He instructed Leak to place the pumpkin in a sunny spot and to sit on it until it hatched. The young man went off to his farm with the pumpkin, and Shalley collected a group of his friends to watch the ignorant city boy trying to hatch a colt from the pumpkin. When the men arrived at Leak's farm, they took care to keep out of his sight. They discovered him sitting on the pumpkin which he had carefully placed on the side of a hill. Hardly able to restrain their laughter, the men were ready to rush upon the young man with shouts of laughter when they saw him get off the egg to examine it. In his excitement, he dislodged the pumpkin which began to roll down the hill. As it gathered speed it bounched into the half rooted stemp of a tree and broke into pieces. The noise and impact disturbed a rabbit which was resting nearby. The rabbit bounded down the hill. Leak, supposing the rabbit was the colt from the egg, ran after it. Here Coltie, here Coltie, come to papa he called.........,

(Vol. *LXIII*, P 37, 1952.)

শাশুড়ীর লাঞ্ছনা

এক গ্রামে এক দরিদ্র চাষীবৌ ও তার পুত্র বাস করতো। পুত্রটি ছিল অত্যন্ত বোকা। সামাজিক আচার আচরণ সে কিছুই জানতো না। ভালো করে বসা বা গুছিয়ে কাপড় চোপড় পরাও সে জানতো না। কিন্তু এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও সে পার হয়ে গেল বিয়ের বাজারে। এক মধ্যবিত্ত কৃষক কন্যার সঙ্গে বোকা চাষার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর জামাইএর নিমন্ত্রণ হল শ্বশুরবাড়ীতে। অপেক্ষাকৃত ধনী শ্বশুরের বাড়ী যাবার পূর্বে তার মা বোকা ছেলেকে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। আর বিশেষ করে শিখিয়ে দিলে শ্বশুর বাড়ীতে যখন খেতে দেবে তখন যেন সে আসন পিঁড়ি হয়ে পা মুড়ে বসে এবং ভুলেও যেন উবু হবে না বসে, ওটা শিষ্টাচার নয়।

বোকা চাষা বাবু সেজে গেল শ্বশুরবাড়ী। আসবার সময় মা বলে দিয়েছিলেন, সকলকে প্রণাম করতে। কাজেই সে একধার থেকে সকলকে প্রণাম করল, এমন কি, নিজের অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীকে পর্যন্ত।

যাই হোক, যথাসময়ে আহারের জন্য ডাক পড়ল। বহু যত্ন করে মধ্যবিত্ত চাষী শ্বশুর জামাইকে একখানা বড় পিঁড়ি দিল বসবার জন্য। বোকা জামাই বহু চেষ্টা করে তার উপর পা মুড়ে বসল। অনভ্যস্ত অবাধ্য পা দুটি বারবার তার বিরুদ্ধাচরণ করে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে যখন শাশুড়ী ঠাকরুণ বড় জাম বাটী করে একটি বড় রুইমাছের মাথা দিয়ে মাছের ঝোল নিয়ে তার পাতের কাছে এলেন, তখন মৎস্যদর্শনে অন্যমনস্ক বোকা জামাইএর অবাধ্য পা সজোরে গিয়ে লাগল, অবনত শাশুড়ীর মুখে এবং মাছের বাটী স্থান লাভ করল উঠানে—ভাত, তরকারী ছত্রাকার হয়ে গেল। শ্বশুর ভীষণ রেগে গেল এই ভেবে যে এত যত্ন করা সত্ত্বেও জামাই কি না লাথি মারল শাশুড়ীর মুখে। তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই-ই হল। অর্ধচন্দ্র দিয়ে জামাইকে বিদায় করা হল।

কাঁদতে কাঁদতে বোকা চাষার ছেলে ফিরে এলো তার মার কাছে। মা সব শুনে বহু কষ্টে আবার সব মিটমাট করে দিলেন। —২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

পূর্ব মৈমনসিংহ অঞ্চলে ইহার একটি পাঠান্তর প্রচলিত আছে। শাশুড়ী যখন জামাতাকে পরিবেষণ করিতেছিলেন, তখন একটি বিড়াল জামাইর থালার নিকট আসিয়া তাহার পাতের মাছের মুড়াটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইতেছিল। ক্রুদ্ধ জামাতা খড়ম দিয়া যখন তাহার মাথায় প্রহার করিতে গেলেন, তখন খড়মের ঘা বিড়ালের মাথায় না পড়িয়া পরিবেষণকারিণী অবনতমুখী শাশুড়ীর মাথায় পড়িল। শাশুড়ী আর্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্বশুর এবং শ্যালকেরা আসিয়া জামাতাকে 'বিশেষ' সংবর্ধনা জানাইল। অনুরূপ বোকা জামাই শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া অনুরূপ ভাবে লাঞ্ছিত হইবার কাহিনী বাংলার প্রায় সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়।

জামাতার আসন সম্পর্কে উপদেশ বিষয়ে আর একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। শ্বশুর বাড়ীতে প্রথম আসিবার সময় মা তাহাকে উচ্চাসনে বসিবার কথা বলিয়াছিলেন। সে মায়ের আদেশ পালন করিতে গিয়া শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া এক উইয়ের ঢিপির উপর বসিয়াছিল, কোন কোন গল্পে শুনা যায়, ঘরের চালের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল (Type 1685B.)

বোকা জামাইর হাতে শাশুড়ীর লাঞ্ছনার আরও কাহিনী পূর্ব বাংলার নানা স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। এক গাড়োয়ান তাহার শাশুড়ীকে গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। পথে যখন শুনিতে পাইল, গরুর চাকা ক্যা ক্যা শব্দ করিতেছে, তখন সে মনে করিল, গরুর গাড়ী মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। গাড়ীকে জলপান করাইবার জন্য শাশুড়ী শুদ্ধ গাড়ী সে জলে ডুবাইল। ফলে শাশুড়ীর মৃত্যু হইল (J 1872·0·1)। গাড়োয়ান এখানে ঘর জামাই। বোকা স্বামীর হাতে স্ত্রীরও প্রায় অনুরূপভাবে মৃত্যুর অনেক কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায় (J 2489·11).

১৫

চালতা মসুর ডাল

এক গ্রামে এক বোকা ছিল। সে জাতিতে ছিল কৃষক। বহু চেষ্টায় এক অতি দরিদ্র চাষার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হল। যখন সে বিয়ের পর দ্বিরাগমনের জন্য শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন তার মা তাকে বলেছিল, শ্বশুর বাড়ী কি খাওয়ায় এসে বলতে।

বোকা তো মহা আনন্দে শ্বশুর বাড়ী গেল এবং সেখানে তাকে প্রচুর পান্তা, নুন লঙ্কা, তেঁতুল আর দেওয়া হল গামলা খানেক চাল্‌তা দিয়ে রান্না করা মুসুরির ডাল। খাওয়ার আনন্দে বোকা মার কথা ভুলে যা পেল সব একসঙ্গে হাপুস হুপুস করে খেতে লাগল।

তারপর খেয়ে উঠে যখন আঁচাতে যাবে, তখন নিজের বৌকে যা যা খেল সব নাম জিজ্ঞাসা করে নিল এবং বাড়ীর পথে চলতে চলতে শুধু মনে রইল চাল্‌তা-মুসুর ডাল-এর কথা। এই নাম মুখস্থ করতে করতে যখন সে অন্য-মনস্ক হয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ সে একটা ডোবার মধ্যে পড়ে গেল। ডোবার জলে হাবু ডুবু খেতে খেতে সে ভুলে গেল তার চাল্‌তা-মুসুর-ডাল-এর নাম।

অতি কষ্টে সাম্‌লে উঠল একজনের সহায়তায় উঠেই সে ডোবার জলে কি যেন খুঁজতে আরম্ভ করল, লোকটি তখন রেগে গিয়ে বলল, 'ইস্‌, এমন করে পচা পাঁক ঘাটছ কেন, বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে যেন মুসুর ডাল পচা গন্ধ।' বোকা তৎক্ষণাৎ জল থেকে লাফিয়ে উঠে এলো এবং প্রাণপণে নিজের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল এই বলে, 'পেয়েছি, পেয়েছি চালতা-মুসুর-ডাল।'

—২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

বাংলা দেশে এক শ্রেণীর লোক-কথা প্রায় সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মধ্যে জামাইকে প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাইবার সময় মা, ভাজ কিংবা ভগ্নীরা কতকগুলি উপদেশ দিয়া থাকে; উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে গিয়া বোকা জামাই শ্বশুর বাড়ীতে অপদস্থ হয়। ইহাতে শ্বশুর বাড়ীতে অপদস্থ হইবার কথা না থাকিলেও শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে অপদস্থই হইবার কথা আছে।

লাল সুতো

এক ছিল বোকা তাঁতী। তার ছিল চার ছেলে। তাদের সকলেরই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। তাঁতীর নিজের স্ত্রীও জীবিত ছিল। অতএব তাঁতীর বেশ সুখেই দিন কাটছিল। কিন্তু একদিন সেই গ্রামে এল এক জ্যোতিষী। তাঁতী ছুটে গেল গণনা করাতে এবং গণনা-শেষে বাড়ী ফিরে এলো অতি বিমর্ষ ভাবে। স্ত্রী এবং ছেলেরা তার এই বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। তাঁতী বলল যে, জ্যোতিষী গণনা করে বলেছে, যেদিন তার মুখ দিয়ে লাল সুতো বেরোবে সেদিনই তার মৃত্যু হবে। ছেলেরা সে খবর পেয়ে মৃত্যু-পথযাত্রী পিতাকে নানাবিধ জিনিস খাওয়াতে লাগল। একদিন তাঁতী বললো, তার ইচ্ছা হয় তাল খেতে। তখুনি ছেলেরা ছুটলো তাল আনতে। তাল এলে তাঁতী তালের বড়া, তালের রুটি, এমন কি, কাঁচা তাল দলা পাকিয়ে চুষে খেল এবং এই সময় একটি তালের রোঁয়া তার দাঁতে লেগে রইল। খাওয়া শেষে মুখ ধোওয়ার সময় তাঁতীর হাতে লাগল সেই তালের লালচে রোঁয়া, লাল সুতো ভেবে তাঁতী সেখানেই পড়ে গেল চোখ বুজে। ছেলেরা ছুটে এলো এবং পিতার কাছে সব শুনে তারাও ভীত হল। তাঁতী তখন তাদের বললো যে, তাঁতীকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে পুতে রাখতে, শুধু মুখটা বার করে রাখতে বলল, কারণ, মৃত্যুর তো আর বেশী দেরী নেই। ছেলেরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই করল।

সেদিন ছিল অন্ধকার রাত। একদল ডাকাত চলেছিল সেই শ্মশানের ওপর দিয়ে ডাকাতি করতে। তাঁতীর মাথায় পা লেগে একজন পড়ে গেল এবং ব্যথা পেয়ে তাঁতীও চেঁচিয়ে উঠল। তখন ডাকাতরা তাকে তুললো এবং তার কাহিনী শুনে তাকে সঙ্গে নিল কাজ হাঁসিলের জন্য। একটা গ্রামে ঢুকে এক গৃহস্থ-বাড়ীর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে ডাকাতরা তাকে বলল যে খুব ভারী ভারী জিনিস নিয়ে আসতে। তাঁতী বহু খুঁজে একটা বড় শিল নোড়া কোন রকমে টেনে আনল। ডাকাতরা বলল, ওসব নয়, ভারী ভারী জিনিস বাজিয়ে আনতে; যেমন, কাঁসার জিনিস। তাঁতী তখন এক ঘরে কোন রকমে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা মস্ত ভাঙ্গা কাঁসর পেল এবং প্রচণ্ড শব্দে সেটা বাজাতে লাগল; কারণ, তাকে সেই রকম নির্দেশ দেওয়া ছিল। এদিকে বাড়ীর লোকেরা উঠে পড়ল, ডাকাতরাও

তাঁতীকে ফেলেই পালাল। গৃহস্থরা তাঁতীকে ধরে সব শুনে বুঝলো এ বোকা। তখন তারা তাকে বলল, তুমি আমাদের বাড়ী থাক, গরু দেখাশোনার কাজ করবে। তাঁতী তাতেই রাজী। একদিন দুধ দুইয়ে সে যখন উনানে জ্বাল দিচ্ছে, তখন গৃহস্থদের মা এসে বসল আগুন পোহাতে, কারণ, সেটা ছিল শীতকাল। অতি অল্পক্ষণ পরেই বৃদ্ধা ঘুমিয়ে পড়ল এবং হাঁ করে নিঃশ্বাস নেওয়ায় তার মুখ থেকে একটা বিকৃত আওয়াজ বেরোতে লাগল।

তাঁতী ভাবল, বুড়ী দুধ খেতে চাইছে এবং সে কেবলই বলতে লাগল—'দাঁড়াও না, বাপু, দিচ্ছি, বড় গরম দুধ ফুটছে, ঠাণ্ডা করে দেব।' কিন্তু যখন তাতেও সেই শব্দ থামল না, তখন সেই বোকা তাঁতী এক হাতা গরম দুধই বুড়ীর হাঁ করা মুখে ঢেলে দিল। বুড়ীর চীৎকারে তার ছেলেরা এসে ব্যাপার দেখে অবাক। তাঁতীর বক্তব্য শুনে তাকে খুব মারলো। অবশেষে বোকা তাঁতীকেই মায়ের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে দিল—যাতে পোড়া ঘায়ে মাছি মশা না বসে। তাঁতী দেখলো, দলে দলে মাছি এসে পোড়া জায়গায় বসছে এবং হাত দিয়ে বার বার তাড়াতে কষ্টও হচ্ছে। তখন উঠে গিয়ে একটা বড় মুগুর নিয়ে এলো এবং মনে মনে বলল, এইবার যখন এক ঝাঁক বসবে, অমনি একঘায়ে সব শেষ করবো। হলোও তাই, এক ঝাঁক মাছির সঙ্গে মুগুরের আঘাতে বুড়ীও মারা গেল। তখন ছেলেরা রেগে গিয়ে তাকে খুব মার ধর করল এবং বুড়ীর দেহ মাদুরে জড়িয়ে চাপিয়ে দিল তারই ঘাড়ে। তাঁতী এগিয়ে চললো, ছেলেরা পেছনে। পথিমধ্যে মাদুরের ভিতর থেকে বুড়ীর মৃতদেহ পিছলে পড়ে গেল পথে, তাঁতী তা জানতেও পারল না। শ্মশানে এসে যখন দেখল, মাদুর ফাঁকা, তখন ছুটলো বুড়ীর খোঁজে। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে তার নজরে পড়ল একটু দূরে এক পটল ক্ষেতে এক বুড়ী কুঁজো হয়ে পটল তুলছে।

তাঁতী একটা বেল কাঠ নিয়ে ছুটে গেল সেদিকে এবং রেগে গিয়ে বলল—'কি, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি পটল তুলছ এখানে?' বলেই সেই চেলা কাঠের বাড়ী মারল বুড়ীকে এবং সেই বুড়ীও মারা গেল, তখন সেই বুড়ীকে এনে তাঁতী শুইয়ে রাখল মাদুরে।

এদিকে ছেলেরা আসবার সময় দেখে পথে পড়ে আছে তাদের মার দেহ। ভাবল তাঁতী বোধ হয় ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেছে। মৃতদেহ তুলে নিয়ে শ্মশানে এসে আর একটা বুড়ীকে দেখে অবাক্। তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করল, কেন সে তাদের মার মৃতদেহ ফেলে পালিয়ে এসেছে, আর এই-ই বা কে? তাঁতী যা

বলল, শুনে তো তাদের চক্ষুস্থির। এখন কি বা করবে? দুজন বুড়ীকেই এক চিতায়, দাহ করে তারা বাড়ী ফিরল এবং তাঁতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিল।

—২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

তাঁতীর নির্বুদ্ধিতার জন্য তাঁতীর বৃদ্ধা জননীর মৃত্যুর প্রায় অনুরূপ কাহিনী আরও প্রচলিত আছে। একটি কাঁচি রৌদ্রে গরম হইয়া গিয়াছিল, একজনের পরামর্শে তাঁতী ইহাকে জলে চুবাইয়া ঠাণ্ডা করিয়াছিল। তারপর বাড়ীতে আসিয়া যখন দেখিল, জর হইয়া বৃদ্ধা মায়ের শরীর গরম হইয়াছে, তখন সে তাহার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া নদীর জলে চুবাইতে লইয়া গেল; নদী পর্যন্ত পৌছিবার পুর্বেই তাহার মৃত্যু হইল।

লোক-কথায় বুড়ী চরিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। বয়সের জন্য তাহাকে কোন প্রকার সম্মান দেখান হয় না; বরং তাহার বয়স-জনিত দৈহিক অসামর্থ্যের জন্য তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করা হয়। সে সমাজের কোন সহানুভূতি লাভ করিতে পারে না। এখানেও দুইটি বুড়ীর নির্বিচার মৃত্যু সংঘটিত করিয়া কৌতুক রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সুগভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে।

তৃষ্ণার্ত আত্মা

এক ছিল বোকা বামুন। সে ছিল খুব গরীব। একদিন সে শুনলো পিঠে বলে একটা জিনিস আছে খাবার। সেও অমনি সেইটা খাবার জন্য খুব ব্যাকুল হল। গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে সে পিঠে খেতে চাইল। কেউই তাকে পিঠে খাওয়াতে পারল না; কারণ, সেটা পিঠের সময় ছিল না। অনেক ঘুরে অবশেষে ক্লান্ত বামুন রাস্তায় যাকে দেখল, তাকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোথায় পিঠে পাওয়া যায়। একটি লোক বামুনের বোকামি বুঝতে পেরে বলল যে, এই পথ দিয়ে সোজা গেলে এক বন দেখা যাবে, সেই বনের ভিতর এক কুঁড়ে ঘর আছে। সন্ধ্যে হলে ঐ কুঁড়ের দরজায় তিনবার টোকা দিলে একজন স্ত্রীলোক বলবে, 'তুমি এসেছো?' তখন 'হুঁ' বলে ঘরে ঢুকবে। তারপর পিঠে পাবে।

বামুনও তাই বিশ্বাস করে সন্ধ্যের সময় গেল সেই কুঁড়েতে। সেখানে বাস করতো এক খারাপ স্ত্রীলোক। তার স্বামী পিতৃশ্রাদ্ধ করতে গয়ায় গিয়েছিল এবং স্ত্রীলোকটির ঘরে রোজ সন্ধ্যায় একজন আগন্তুক আসত। যাই হোক, বোকা বামুন পিঠের লোভে সেখানে প্রবেশ করল। স্ত্রীলোকটি তাকে বলল, তক্তার তলায় খাবার ঢাকা আছে, জল আছে, খাও। বামুন মনে মনে খুব খুশী হয়ে ঢাকা খুলে খেতে বসল। পাত্রে ছিল ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি। বামুন ভাবল, এগুলোকেই পিঠে বলে। অতএব সে গোগ্রাসে তাই গিল্‌তে লাগল। এমন সময় সেই নিয়মিত লোকটি এলো এবং সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, 'এই, দরজা খোল্'। স্ত্রীলোকটি তখন আলো ধরে দেখল, প্রথমটি ভিন্ন ব্যক্তি; তাকে জোর করে তক্তার তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে সে দ্বিতীয় লোকটিকে খুব খাতির করে বসাল এবং বামুনের সেই পরিত্যক্ত রুটি-ডাল খাওয়াল। খাওয়া প্রায় শেষ, এমন সময় স্ত্রীলোকটির স্বামী গয়া থেকে ফিরে এলো এবং স্ত্রীর কাছ থেকে একটু জল চেয়ে খেয়ে বাইরে দাওয়াতে শুয়ে রইল।

এদিকে বোকা বামুন জল খাবার সময় পায় নি। তার খুব জল তেষ্টা পেয়েছে। সে খুব মিহি স্বরে বলল, আমি একটু জল খাব। স্ত্রীলোকটি তাকে জল দিল। পরক্ষণেই দ্বিতীয় জন জল চাইল উচ্চৈঃস্বরে। তাকেও জল

দিল স্ত্রীলোকটি। তার স্বামী জিজ্ঞেস করল, ঘরে ওসব কি আওয়াজ পাই? স্ত্রীলোকটি বলল—'ওসব তোমার পিতা-পিতামহের তৃষ্ণার্ত আত্মা। রোজ আমার কাছ থেকে জল চায়।' স্বামী সব শুনে খুব চিন্তিত হল এবং স্থির করল পুনরায় গয়ায় যাবে।

এদিকে ঘরের ভিতর উভয়ের জল পানের পরিমাণ এত অধিক বাড়ল যে অল্পকাল মধ্যেই কল্‌সীর জল ফুরিয়ে গেল। তখন বোকা বামুনের নাকি সুরের কাঁদুনিতে অতিষ্ট হয়ে স্ত্রীলোকটি তাকে একটি ঝুনা নারিকেল দিল। কিন্তু বামুন সেটা ভাঙবার কোন জায়গা পাচ্ছিল না। বহু অন্বেষণের পর দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশস্ত কেশবিরল মস্তকে পাথর ভেবে বামুন সেই নারকেল ফাটাল এবং সেই আঘাতে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি প্রচণ্ড চীৎকার করে দরজা খুলে পালাল, বোকা বামুনও তার অনুসরণ করল। —২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

ব্রাহ্মণ লোক-কথায় সাধারণতঃ লোভী এবং দরিদ্র, কিন্তু সর্বত্র বোকা নহে। তবে লোভ-পরবশ হইয়া অনেক সময় বোকামি করিয়া থাকে, এখানেও তাহাই করিয়াছে। টাক মাথাকে পাথর মনে করিয়া তাহার উপর নারিকেল ভাঙিবার কথা আরও কয়েকটি লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর কাহিনী বাংলার লোক-কথার খুব বেশি নাই। তবে বোকা স্বামীর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর কাহিনী কিছু কিছু শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে স্বামীর বোকামির কোন পরিচয় নাই। এই শ্রেণীর কাহিনী বহিঃপ্রভাবের ফল।

বোকা ভূত

এক ছিল নাপিত। তেমন রোজগার পাতি করতে পারত না বলে তার স্ত্রী যৎপরোনাস্তি তাড়না করতো। এই রকম একদিন অত্যাচার চরমে উঠল। স্ত্রীর সম্মার্জনীর জ্বালায় সেদিন নাপিত মনের দুঃখে ক্ষুর-কাতান সমেত গৃহত্যাগ করল। সে মরবে বলে স্থির করল বহু। জায়গা ঘুরে এক শ্মশানে উপস্থিত হয়ে সে দেখল সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এইবার তার মনে ভয় হল। সে ভুলেই গেল যে, সে মরতে এসেছে। যাই হোক ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে নাপিত শ্মশানের পশ্চিম দিকের বড় বটগাছটার তলায় বসল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। সারাদিন খাওয়া নেই, হাঁটাহাঁটিও হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু সে সুখনিদ্রা অল্পক্ষণ পরেই টুটে গেল, এক বিশ্রী নাকি সুরের উক্তিতে। কে যেন বটগাছের উপর থেকে বলছে—হেঁ, হেঁ, এইবার নামি নীচে! ওঁ! আজ খুব মজা করে খাওয়া যাবে। আজ নাপিতের ঘাড়ের মাংস খাঁব' ইত্যাদি। নাপিতের তখন হৃদ্‌কম্প উপস্থিত। সত্যিই বুঝি পিতৃদত্ত প্রাণটা আজ দিতে হয়। কিন্তু সে জাতিতে নাপিত। শাস্ত্রে বলে নাপিতের চেয়ে ধূর্ত হয় না। নাপিত তখন সাহস সঞ্চয় করে তার বাক্‌স থেকে বার করল তার ব্যবহার্য আয়নাখানা এবং ক্ষুরটি। তারপর কাঁচিটায় কচ্‌ কচ্‌ শব্দ তুলে বলল, আয় নেমে আয় দিকি! তোকে পেলেই আমার কাজ, অর্থাৎ ভূত ধরার কাজ শেষ হয়। আজ রাজবাড়ীতে 'ভূত বলি'র পুজা, তোকে ধরার জন্যই তো বসে আছি।

বোকা ভূত স্বর পাল্টে বলে, কঁই তোঁ, ,কেঁমন ভুঁত ধঁরেছিস্। নাপিত তৎক্ষণাৎ আয়নাটা গাছের দিকে সমান করে ধরল এবং ভূতটি তাতে তার নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আঁতকে উঠল। তখন কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল, দোঁহাই, ভাই, তুঁই আমায় ধরে নিয়ে যাস্ নি, আমায় কাঁটিস নি! তুঁই যা চাইবি আমি তাই তোকে দোব। দোঁহাই ভাই, আঁমায় বাঁচা। তখন নাপিত তার সুযোগ যথাযথ গ্রহণ করলো এবং বলাই বাহুল্য আর স্ত্রীর সম্মার্জনী তার পিঠে পড়েনি। —২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

আয়নাতে ছবি দেখিয়া ভূতের ভয় পাইবার কথা পূর্বেও বলিয়াছি।

বেঁড়ে বাঘ

এক বনে ছিল এক শিয়াল। একদিন গৃহস্থ বাড়ীতে চুরি করে হাঁড়ি খেতে গিয়ে সে ধরা পড়ল এবং গৃহস্থ ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার লেজটি কেটে নিয়ে তাকে ছেড়ে দিল। সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে গিয়ে উঠল তার নিজের ডেরায়। কিন্তু বনের পশুরা রেহাই তাকে দিল না। যখনই সে বেরোত, তখনই তারা পিছু পিছু ছুটত, আর বলতো বেঁড়ে-বেঁড়ে-বেঁড়ে শিয়াল।

একদিন সে একটা ফন্দি আঁটল। তখন সবে সন্ধ্যে হয় হয়। শিয়াল তার গর্তের চারধারে ঘুরে ঘুরে চীৎকার করে বলতে লাগল, সাবধান, সাবধান সব। তার সেই প্রচণ্ড চীৎকার শুনে বনের সমস্ত পশু ছুটে এলো। শিয়াল তখনও সেই ভাবে চীৎকার করছে। এমন সময় এলো বনের অধিবাসী এক লেজহীন বাঘ। জাতিতে কুলীন বলে তাকে কেউ বেঁড়ে বলতো না।

শিয়াল তখন বলল, এই বনে শিকারী আসছে, সে দেখে এসেছে; অতএব নিরুপায়। উদ্‌ভ্রান্ত পশুগণ তখন তারই পরামর্শ চাইল। শিয়াল পরামর্শ দিল গাছে উঠে আশ্রয় নিতে। যখন একে অপরের পিঠে উঠে গাছের নাগাল পেতে চাইল। যখন শিয়াল দেখল, সে খুব উঁচু হয়েছে, প্রায় ছুঁই ছুঁই করছে গাছের মগডাল, তখন সে সব নীচের মোটা বেড়ে বাঘকে চুপি চুপি বলল, ওরা তোমায় ধরিয়ে দেবার জন্য তোমায় সব নীচে রেখেছে; কারণ, তোমাকেই বেশী দরকার। রাজ্যে বেঁড়ে বাঘের মাংস খুব দরে বিক্রী হচ্ছে। এইসব শুনে বেঁড়ে বাঘ ভয়ে দিল গা নাড়া, আর হুড়মুড় করে সব বাঘগুলি পড়ে গেল। উপযুক্ত সাজা হয়েছে দেখে শিয়ালও পলায়ন করল। —২৪ পরগণা, ১৯৬৬

মন্তব্য

লেজকাটা শিয়াল ও বাঘের গল্প পৃথিবীর নানা দেশেই নানাভাবে প্রচলিত আছে। এই শ্রেণীর কোন কোন কাহিনীতে একটি নীতিকথা থাকে; কিন্তু এই কাহিনীতে তাহা নাই; ইহা সাধারণ কৌতুকের কাহিনী। বাঘের নির্বুদ্ধিতা লইয়া যে সকল কাহিনী রচনা করিয়া এই জাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।

কৃতজ্ঞতা

এক নাপিত। নদীর এ-পারে তার বাস। তাকে রোজই যেতে হ'ত নদীর ওপারে রোজগারের জন্য। সেদিনও তাকে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। নদীর ধারের কাছে এসে ভাবছে, যদি একটা নৌকা পাওয়া যেত, ভালই হ'ত। হঠাৎ শুনতে পেল, নদীর চর থেকে একটা কুমীর তাকে ডাকছে। নাপিত ভায়া, রোজই তোমায় দেখি এপার ওপার করতে, তাই তুমি তো আমার চেনাই। যদি একটা কাজ করে দাও, ভাই, বড় ভাল হয়। আমার গতকাল খেয়ে শরীরের এমন অবস্থা যে নড়েচড়ে যে জলে গিয়ে পড়বো, সে ক্ষমতা নেই। তুমি একটু জল পর্যন্ত আমায় নিয়ে যাবে, ভাই। কথা দিলাম, আমার যতটুকু ক্ষমতা, তাই দিয়ে তোমায় সাহায্য করবো।

নাপিত বললো, তোমায় বয়ে নিয়ে যাওয়া তো খুব কষ্টের ব্যাপার হে, তা কি আমি পারবো? কুমীর তার উত্তরে বললো, একটু চেষ্টা করলেই পারবে ভাই, আমার কাছে কিছু গহনা আছে, তার ভাগ তোমায় দেব।

শুনে নাপিতের লোভ হ'ল। দিনকার রোজগার আর যেন সহ্য হয় না, যদি কিছু গহনা পাওয়া যায়, মন্দ কি! নাপিত অনেক ভেবে চিন্তে রাজি হ'ল শেষ পর্যন্ত।

কুমীরকে কাঁধে নিয়ে নাপিত আস্তে আস্তে নেমে চলেছে জলের দিকে। হাঁটু জলে নেমে নাপিত জিজ্ঞাসা করলো, এবার ছেড়ে দেবে কিনা—কুমীর বললো, না আরেকটু পরে। এভাবে কুমীর নাপিতকে গলা জলে নিয়ে গেল। নাপিতের তখন কেমন সন্দেহ হতে লাগল। সে কিছুতেই এগুবে না, গলাজলে এসে পড়েছে, এর পর আর কি করে এগুবে? কুমীর তখন নাপিতকে বললো, তোমাকে এগোতেও হবে না, পিছতেও হবে না, এবার তোমায় আমি খাব।

নাপিত দেখে মহাবিপদ। সে বললো, কুমীর ভাই, এ কি করে হয়? আমি উপকার করলাম, তুমি বললে আমায় গহনা দিবে, আর এখন বলছো খাবে? যদিও বা খাও, বিনা বিচারে খাবে কেমন করে? আচ্ছা ঐ ঝুড়িটা ভেসে আসছে, ওটাকে জিজ্ঞাসা করা যাক।

নাপিত তখন ঝুড়িটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, ঝুড়ি, তুমিই বলতো, কুমীরের কি আমার খাওয়া উচিত? আমি ওকে বয়ে নিয়ে এলাম,

উপকার করলাম, আর এখন ও আমায় খাবে বলছে! তুমি বলোত, ভাই, কেমন এ বিচার।

ঝুড়িটা এদিকে এক গৃহস্থ বাড়ী থেকে আসছিল। সে বাড়ীর বৌ ঝুড়িটাকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তাতে ঝুড়িটা সমস্ত মানুষ জাতির উপর রেগে আছে। ঝুড়ি উত্তর করলো, দেখ, আমি তো এতদিন গৃহস্থের উপকারে লেগে এলাম, যতদিন আমায় শক্তি অক্ষুন্ন ছিল, ততদিন আমার কি যত্ন! আর দেখ, আমার যখন একটু ভাঙ্গন ধরেছে, তেমনি কিনা আমায় জলে ফেলে দিয়েছে। অতএব কুমীরের এ সুযোগ হারান উচিত নয়। এই বলে ঝুড়ি চলে গেল।

নাপিতের দশা প্রায় যায় যায়। কুমীর তো আনন্দে আটখানা। সে বলে, এবার তবে তোমায় খাব। নাপিত বলে, ভাই, একটা মাত্র সাক্ষীতে কি বিচার চলে? ঐ যে পারে গরু চড়ছে, চল তাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্। নাপিত গরুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, খুলে বললো সব ঘটনা—এবার তবে কুমীরের কি করা উচিত, গরু ভাই? গরুর জীবনেও ছিল ঠিক এম্নি অভিজ্ঞতা, মানুষ জাতি তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, তার প্রতিশোধ নেবার এই পরম সুযোগ। সে বললে, অন্যায়টি কোথায়? এই দেখত আমায়; যতদিন পেরেছি, ততদিন কৃষকের সেবায় এসেছি, জীবনটা শেষ পর্যন্ত দিতেই হ'ল। এখন বয়স হয়েছে, আর আগের মত খাটতে পারি না, তাইতে কিনা কৃষক একবারও আমার দিকে ঘুরে দেখে না; মাঠে মাঠে ছেড়ে দিয়েছে চরে চরে খেতে হ'চ্ছে, এ জীবন থাকা আর না থাকা, একই কথা। তাই কুমীর যদি তোমায় খায়, খুব একটা অন্যায় হবে না। এই না বলে গরু চলে গেল।

নাপিত তখন প্রাণের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তবুও সে শেষবারের মত বললো, কুমীর ভাই, শেষ বারের মত আমাকে আরেক জনকে সাক্ষী মানতে দাও। ইতিমধ্যে বনের ভিতর থেকে একটি শিয়াল বেরিয়ে নদীর কাছে জল খেতে এসেছে। নাপিত তখন নিরুপায় হয়ে শিয়ালকেই সাক্ষী মানলো। শিয়ালকে ডেকে নাপিত সব কথা খুলে বললো। নাপিতের কথা শুনে শিয়াল তো বিশ্বাসই করে না; বলে, এটা কি করে সম্ভব, নাপিত কি কখন কুমীরকে ঘাড়ে করে আনতে পারে? এ অসম্ভব। নাপিত তাকে যতই বোঝায়, সে ততই বলে অসম্ভব কথা বলবে না। হ্যা, শিয়াল বিশ্বাস করতে পারে যদি নাপিত দেখায় কেমন করে সে ঘাড়ে করে কুমীরকে নিয়ে এলো। নাপিতের এখন মরণ-বাঁচন সমস্যা; তাই সে আবার কুমীরকে ঘাড়ে করে নদীর চরে নিয়ে এলো।

শিয়াল তখন নাপিতকে বললো, এইবার তুমি কুমীরকে এখানে নামিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাও। নাপিতও তাই করলো।

শিয়াল আর নাপিতে খুব ভাব হ'ল। শিয়াল বললো, আমি তোমায় বাঁচিয়ে দিলাম এবার তুমি আমায় কি খাওয়াবে বল? নাপিত বললো, আমার তো সঙ্গে কিছু নেই, তবে তোমার নিমন্ত্রণ রইল, তুমি আমার বাড়ী এসো, তোমায় ছাগল মুরগী খাওয়াবো। শিয়াল বললো, আমি তো তোমার বাড়ী চিনি না, কি করে যাব? তখন নাপিত বললো, আচ্ছা বেশ, আমি তোমায় কাল এসে নিয়ে যাব। একদিন যায়, দুদিন যায়, নাপিত আর আসে না শিয়ালকে নিতে, শিয়াল রোজই নাপিতের খোঁজ করে। একদিন হঠাৎদেখা হয়ে গিয়েছে। তখন শিয়াল নাপিতকে বললো, তুমি তো বেশ ফাঁকি দিয়ে গেলে আমায়, আজ তোমায় পেয়েছি যখন তোমাকেই খাব। নাপিত তখন শিয়ালকে বললো, তোমায় নিয়ে যাবার কথা ছিল, নিয়ে যখন যাইনি, দোষ তো আমারই, তবে কি জান, গতকাল রাতে দুটো কুকুর খেয়ে ফেলেছি, সেগুলি হজম হয়নি, পেটের ভিতর কেউ কেউ করছে। তুমি একটু দূরে যাও, আমাকে কুকুরগুলি বার করতে দাও, তারপর আমায় খেও। কুকুরের কথা শুনে শিয়াল খুব ভয় পেল, প্রাণের মায়ায় তখন সে একছুটে বনের ভেতর চলে গেল। নাপিত নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলো। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

কাহিনীটি একটু নীতিমূলক; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও লোক-কথার সকল বৈশিষ্ট্যই ইহাতে রক্ষা পাইয়াছে। বিশ্বাসঘাতক বন্ধু কাহিনীটির মূল অভিপ্রায়। উপকারী বন্ধুর অভিপ্রায় ইহা হইতেই আসিয়াছে। বাংলার উপকথায় কুমীর সাধারণতঃ বোকা, কিন্তু এখানে বিশ্বাসঘাতক। বৃহদাকার জীব মাত্রই বাংলার উপকথায় বোকা। যেমন বাঘ, হাতী, কুমীর ইত্যাদি। কিন্তু এখানে কুমীরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা অন্য কোন সূত্র হইতে আসিয়া থাকিবে। বাংলার লোক-কথায় নাপিতও ধূর্ত। এখানে কুমীরের মত হিংস্র জীবকে তাহার কাঁধে করিবার মত বোকামির কথাও অন্য কোন সূত্র হইতে আসিয়াছে।

মৎস্যপুরাণ

এক গ্রামে এক তাঁতী ছিল। সে একদিন ভাবল যে নদীতে মাছ ধরতে যাবে। সকাল বেলা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেলো। সারাদিন বসে তিনটি ছোট ছোট মাছ ধরল; তারপর ভাবল, আমি দুটো মাছ খাব, আর বৌ একটা খাবে। বাড়ীতে ফিরে বৌকে মাছগুলি দিল। খাবার সময়ে তাঁতী-বৌ তাঁতীর পাতে একটা মাছ দিল। তখন তাঁতী রেগে বলল, আমি মনে মনে ঠিক করেছি, আমি দুটো খাব; তুমি আমাকে একটা দিলে কেন? তখন তাঁতী-বৌও রেগে উত্তর দিল, আমি সেই সকাল থেকে বসে বসে ভাবছি যে আমি দুটো খাব, তুমি একটা খাবে।

এরকম ঝগড়া হোতে দুজনে ঠিক করল যে দুজন দু'ঘরে শোবে; তারপর যে আগে কথা বলবে, সে একটা খাবে। দু'জনে দু'ঘরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কেউ আগে কথা বলে না, তা হোলেই একটা মাছ খেতে হবে। এমনি ভাবে কয়েকদিন গেলো; কিন্তু কেউ কথা বলে না। তখন গ্রামের লোক ভাবল, এদের বোধ হয় কিছু হোয়েছে, তা না হোলে কেন দরজা-টরজা খোলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সবাই মিলে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে দেখে, দু'জনে দু'ঘরে শুয়ে আছে। কিন্তু ডাকাডাকি করতে কেউ সাড়া দেয় না। তখন সবাই ভাবল, ওরা নিশ্চয় মরে গেছে, গ্রামের লোক তখন ওদের শ্মশানে নিয়ে গেলে দাহ করতে। তাদের চিতার ওপর সাজিয়ে দেওয়া হোয়েছে; কিন্তু তখনও ওদের মধ্যে কেউ কথা বলছে না। এমন সময় তাঁতী-বৌএর চুলে আগুন লাগাতেই সে চেঁচিয়ে বাড়ীর দিকে বলতে বলতে দৌড় দিল, আমি একটা খাব, একটা খাব। বৌ-এর কথা শুনে তাঁতীও এবার এই বলে দৌড় দিল, আমি দুটো খাব, দুটো খাব।

এখন যারা দাহ করতে এসেছিলো, তারা ওদের একটা খাব, দুটা খাব শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড় দিল। তারপর ভয়টা একটু ভাঙ্গতে আবার যখন একত্র হোল, তখন ভাবল, আমরা সবাই দলে ঠিক আছি তো, না তিনজন কম পড়লাম! তারপর তারা নিজেদের মধ্যে গোনা শুরু করল; কিন্তু গোনবার সময় প্রত্যেকেই নিজেকে বাদ দিয়ে গুন্‌ল, তখন ওরা ভাবল, নিশ্চয়ই একজনকে খেয়েছে। এমন সময়, সেখান দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক

যাচ্ছিল। তাকে তারা বিচার করতে ভার দিল। সে তখন ওদের সারি দিয়ে দাঁড়াতে বলল; তারপর প্রত্যেককে একটা করে ঘুসি মেরে দেখল যে ওরা সংখ্যায় ঠিকই আছে। গ্রামে ফিরে তারা দেখল, তাঁতী আর তাঁতী-বৌ মনের সুখে মাছ-ভাত খাচ্ছে। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

দুইজনের মধ্যে যে আগে কথা বলিবে সে প্রতিযোগিতায় পরাজয় স্বীকার করিবে, ইহা লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় এবং প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিবার আগ্রহাতিশয্যে নিজেকে মৃত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া, এমন কি, চিতাশয্যা পর্যন্ত আরোহণ করার বৃত্তান্তও বাংলার নানা হাস্যরসাত্মক কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত এই সকল ক্ষেত্রে কাহাকেও পরাজয় স্বীকার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। চুলে আগুন লাগায় তাঁতীবৌ পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু এমন কচিৎ ঘটিয়া থাকে।

নিজেকে বাদ দিয়া গণনা করাও লোক-কথার আর একটি অভিপ্রায়। ইহাতে এক সংখ্যা কম হইবার ফলে নানাপ্রকার হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইংরেজিতে এই অভিপ্রায়টি Counting wrong by not counting oneself (J. 2031)। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে—'such stories of absurd calculations are essentially literary, though one or another of them is occasionally found in all Europe, in India, and even in European tradition in America' (S .Thompson, p. 92)

তাঁতীর লোভ

এক ছিল বোকা তাঁতী। একদিন সে কাঠ কাটতে বের হল। রাস্তায় সাত চোরের সঙ্গে দেখা। সাত চোর তাঁতীকে বলল, যদি আমাদের দলে এসে চুরি কর, তা'হলে তুমি বড় লোক হয়ে যাবে। বোকা তাঁতী ভাবলে, মন্দ কি, যদি চুরি করলেই বড়লোক হওয়া যায়, তাহলে আমি চুরিই করব। সে বললে, হ্যাঁ, আমি রাজী আছি।

সেই দিন রাত্রে সাত চোরের সঙ্গে বোকা তাঁতী চুরি করতে বের হল। প্রথমে এক বাড়ীতে ঢোকার আগে সাত চোর তাঁতীকে বললে, যে সমস্ত বাসনপত্র খুব ভারী, সেগুলো নিয়ে আসবি। বোকা তাঁতী দুটো ভরতি মাটির কলসী নিয়ে এসে বললে, এই যে ভারী কলসী নিয়ে এসেছি। সাত চোর বললে, তুই একটা বোকা। মাটির কলসী দিয়ে কি হবে? যাক, যা হবার তা হয়েছে, এবার যে বাড়ীতে ঢুকবি, সেখান থেকে যে জিনিস দিয়ে বাজান যায়, তাই নিয়ে আসবি।

বোকা তাঁতী এবার এক বাড়ী থেকে একটা ঢাক চুরি করে নিয়ে এল। সাত চোর বললে, না, তোকে দিয়ে কিছু হবে না। এবার সবাই মিলে একবাড়ীতে যাব। কিছুদূরে এক বাড়ীতে গিয়ে সাত চোর সাত ঘরে ঢুকল। তাঁতীও একটা ঘরে ঢুকে দেখলে, একটা বুড়ি ঘুমিয়ে আছে, তার পাশে দুটো পাত্র আছে। পাত্র দুটোর একটাতে চাল, আর একটাতে দুধ। বোকা তাঁতী ভাবলে দুধ আর চাল দিয়ে পায়েস তৈরী করে খেলে কেমন হয়? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ঘরের এক কোণে উনুন ছিল। সেই উনুন জ্বালিয়ে তাঁতী পায়েস রাঁধতে বসল। এদিকে বুড়ি নাকে শব্দ করে করে ঘুমচ্ছিল। তাঁতী ভাবলে বুড়ি বুঝি পায়েস চাইছে। তাই সে বললে, পায়েস হোক তারপর দেব। বুড়ির নাকের শব্দ তাতে কমল না। তাঁতী আবার বললে, বলছি তো রান্না হলেই দেব। বুড়ির নাকের শব্দ আগের মতই বাজতে লাগল। তখন তাঁতী রাগ হয়ে সেই ফুটন্ত পায়েস বুড়ির মুখে ঢেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি চিৎকার করে উঠল। বুড়ির চিৎকারে বাড়ীর লোকজন সব জেগে উঠল। লোকজনের সাড়া পেয়ে তাঁতী আর সাত চোর বাড়ীর দোতলায় উঠে মাটির মটকির মধ্যে লুকাল।

এদিকে বুড়ির নাতিরা গিয়ে বুড়ির অবস্থা দেখে বলল, হায় হায়, বুড়ির দুপুর রাতে পায়েস খাওয়ার সখ হ'ল! বুড়ি বললে, না, আমি পায়েস খাইনি। নাতিরা কিছুতেই বুড়ির কথা বিশ্বাস করতে চাইল না। তখন বুড়ি বললে, আমি পায়েস খেয়েছি কি খাইনি, ওপরে যিনি আছেন, তিনিই জানেন। বোকা তাঁতী বুড়ীর কথা শুনে ভাবলে, বুড়ি বুঝি তার কথাই বলছে। সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, কেবল আমিই জানি, আর ওরা সাতজনে বুঝি কিছুই জানে না? ফলে বাড়ীর লোকেদের হাতে সাত চোর আর বোকা তাঁতী ধরা পড়ল। বাড়ীর লোকেরা সাত চোর আর তাঁতীতে বেদম প্রহার দিয়ে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দিল। তাঁতীর পায়েস তখনো উনুনে ফুট্‌ছে।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

সাত চোরের গল্প বাংলার লোক-কথার একটি নিতান্ত সাধারণ বিষয়। কিন্তু সাত চোরের কোন কৃতিত্বের পরিবর্তে ইহাদের সঙ্গে অতিরিক্ত আর একটি চরিত্র যে আসিয়া অনেক সময় যুক্ত হয়, তাহারই বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতার কথা এই শ্রেণীর কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করে। এখানে সেই চরিত্রটি তাঁতী, বাংলার লোক-কথার সুপরিচিত নির্বোধ চরিত্র। নির্বোধ যখন চুরির কার্য করিতে যায়, তখন ধরা পড়াই তাহার স্বাভাবিক। এখানেও তাহাই হইয়াছে। লোক-কথায় বুড়ী ব্যঙ্গাত্মক চরিত্র, সকলের সহানুভূতি হইতেই সে বঞ্চিত। এখানেও ঘুমন্ত বুড়ীর মুখে ফুটন্ত পায়েস ঢালিয়া দিয়া তাহারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ কাহিনী পূর্বেও শোনা গিয়াছে।

২৩

বড় বোকা

চারটি লোক একসঙ্গে গ্রামের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের বিপরীত দিক দিয়ে একটি লোক আসছিল। এই চারজনকে দেখে সে হাত জোর করে নমস্কার করে চলে গেল। কিছুদূর যাবার পর চার জনার মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল। সবাই বলে, তোকে নয়, আমাকে নমস্কার করেছে। কিছুতেই এর সমাধান হোল না দেখে চারজনই ঠিক করল, লোকটিকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করা উচিত। তারপর লোকটিকে ডেকে আনল। লোকটি বলল, আমি কাউকেই নমস্কার করি নি। অনেক বলার পর সে বলল, আপনাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বোকা, তাকে আমি নমস্কার করেছি। তখন চার জনার মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। সবাই বলে, আমিই সবচেয়ে বোকা।

প্রথম জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা; কারণ, একদিন আমি মামার বাড়ী যাচ্ছিলাম। বাবা আমাকে একটা ঘটি দিল, ঘি আনার জন্যে। পথে যেতে খুব খিদে পেল, গ্রামের একটা লোকের কাছ থেকে আমি এক আনার মুড়ি কিনলাম। মুড়িগুলি ঘটির মধ্যে রেখে দিলাম; কিন্তু খাবার সময় ঘটি থেকে মুঠো ভরা হাত কিছুতেই তুলতে পারলাম না। সারাটা রাস্তায় না খেয়ে রইলাম। এবার বলুন, এর থেকে কেউ কি বেশি বোকা! আমিই বেশি বোকা, অতএব আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

দ্বিতীয় জন বলল, আমি সবচেয়ে বেশি বোকা; কারণ, একদিন আমার স্ত্রী ধোপাকে ডেকে কাপড়গুলো ধুতে দিতে বলল। কিন্তু আমি ধোপাকে না ডেকে মাথায় কাপড়গুলি বেঁধে রজকের বাড়ীতে গিয়ে ফেলে দিয়ে এলাম; অতএব আমিই সবচেয়ে বোকা, আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

তৃতীয় জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা; কারণ, আমার দুজন স্ত্রীকে একদিন দুপাশে নিয়ে শুয়ে আছি, হাত দুটো দুজনার কাছে। এদিকে আমার চোখে পিঁপড়ে কামড়াতে আরম্ভ করল; কিন্তু কোন হাত দিয়েই তাড়াতে পারলাম না; কেন না, যে হাতই তুলি না কেন, আমার স্ত্রীরা রেগে যাবে; অতএব আমিই বোকা। আপনি আমাকেই নমস্কার করেছেন।

চতুর্থ জন বলল, আমি সবচেয়ে বোকা, কারণ; একদিন আমার স্ত্রীকে বৈঠকখানায় তামাক দিয়ে আসতে বললাম; কিন্তু স্ত্রী রাজী হোল না, কেন না

উঠনের জলে তার পায়ের আলতা উঠে যাবে। তখন আমি হুঁকো শুদ্ধ কাঁধে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম বৈঠকখানায় : অতএব আমিই সব চাইতে বোকা।

কে সবচেয়ে বোকা ?

উঃ—প্রথম জন সবচেয়ে বেশি বোকা। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

ইহাকে প্রশ্নোত্তর বাচক কিংবা ধাঁধামূলক লোক-কথা বলা যায়। কারণ, কেবলমাত্র কাহিনী শুনিবার মধ্যেই ইহার রস নহে; ইহার মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা আছে। শ্রোতা মাত্রকেই তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন হয়। মীমাংসাটি না হওয়া পর্যন্ত কাহিনীটি সম্পূর্ণ হয় না। গল্পটি বলা শেষ করিয়া গল্পের বক্তা তাহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাদের মধ্যে কে সব চাইতে বোকা ? নিজেদের বুদ্ধি এবং বিচারমত প্রত্যেকেই এই প্রশ্নের জবাব দিবে। কেহ বলিবে চতুর্থ বোকাই সব চাইতে বোকা, কেহ বলিবে তৃতীয় বোকা ইত্যাদি। প্রত্যেকের জবাবের সঙ্গে প্রত্যেকেই এক একটি ব্যাখ্যাও দিবে। কিন্তু প্রথম বোকাই যে সব চাইতে বোকা এই উত্তরটিই গ্রাহ্য হইবে। এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে কাহিনীর বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে পরস্পর একটি সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি হয়।

২৪

বাঁশকড়ার তরকারি

এক গ্রামে এক তাঁতী ছিল। সে তার শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিল। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর শ্বশুর তাকে খেতে দিল। তাকে যে সব খাবার দেওয়া হোল, তার মধ্যে একটা ছিল বাঁশের তরকারী। কিন্তু তাঁতী কিছুতে বুঝতে পারল না, ওটা কিসের তরকারী। তখন সে বলল, এটা কিসের তরকারী বুঝতে পারছি না তো। তখন তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা বলল, এটা বাঁশকড়ার তরকারী। শুনে তাঁতী ভাবল ; বাঁশকড়ার তরকারী তো বেশ ভাল খেতে ; এবার দেশে ফেরার সময় বেশ কিছু নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ীতে সে বাঁশকড়া তো আর চাইতে পারে না, এদিকে খাবারও ভীষণ ইচ্ছা হয়েছে। সাতপাঁচ ভেবে সে পরদিন রাত থাকতে উঠলো। উঠে শ্বশুরবাড়ীতে যে বাঁশের বেড়া ছিল, সেটাকে নিয়ে তার বাড়ীর দিকে দৌড় দিল। রাস্তার লোকে তার হাতে বাঁশের বেড়া দেখে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ হে, এটা কি করছ? এটা দিয়ে কি করবে? তখন তাঁতী বলল, ওহে, এটা দিয়ে তরকারী হবে গো। সে কথা শুনে রাস্তার লোক হেসে খুন! বলল, হ্যাঁ হে, তরকারী তো বাঁশকড়ার হয়, তোমার হাতে তো কতকগুলা শুক্‌না বাঁশ। ওগুলো দিয়ে কি তরকারী হয়!

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

অসমীয়া ভাষাতেও কাহিনীটি প্রচলিত আছে। 'শ্বশুরবাড়ীতে যেয়ে জামাতা কচি বাঁশের তরকারী খেয়ে সগজ্ঞে জিজ্ঞেস ক'রে জেনেছিল, তরকারী আর কিছু নয় বাঁশ। সুতরাং রাত্রে যখন সবাই ঘুমোচ্ছেন তখন সে ধীরে ধীরে উঠে ঘরের বাঁশের দরজাটি খুলে নিয়ে রাতারাতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্ত্রীকে অবিলম্বে বাঁশের দরজা কেটে পাক করতে আদেশ করে। দেখে শুনে স্ত্রী বেচারার ত আক্কেল গুড়ুম (সাহিত্যকী, রাজসাহী, ১৩৭১, পৃ ১৪)।' শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে লোভী জামাতার অনুরূপ নিবুদ্ধিতার আচরণ সম্পর্কে আরও একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। শাশুড়ী যখন জামাতাকে খাদ্য পরিবেশন করিতে আনিয়াছে, তখন সে বিনয় বশতঃ তাহা ফিরাইয়া দিল। এক ফোঁটা তাহার পাতে পড়িয়াছিল, খাইয়া দেখিল, পরম সুস্বাদু। তখন রান্নাঘরে তাহার সন্ধান করিতে গিয়া অপদস্থ হইল। (J 312 41; Type 1332 B)।

জ্বরের ওষুধ

এক গ্রামের এক তাঁতী কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে গিয়েছিল। ক্রমশ বেলা হোতে লাগল। এমন সময় তাঁতীর ভীষণ পিপাসা পেল, তখন তাঁতী কাস্তেটা মাটিতে রেখে পাশের এক নদীতে জল খেতে গেল। জল খেয়ে যখন তাঁতী ফিরে এল, তখন সূর্যের তাপে কাস্তেটা বেশ গরম হোয়ে গেছে, তাঁতী একজন লোককে বলল, দেখ ভাই, আমার কাস্তেটা ভীষণ গরম হোয়ে গেছে। আমি এখন কি করে ধান কাটব? লোকটি বলল, কাস্তেটা জলে ডুবিয়ে দাও, তবেই ওটা ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে। কথামত তাঁতী তার কাস্তে জলে ডুবাল এবং কাস্তেও ঠাণ্ডা হোয়ে গেল। তাঁতী বেশ ভালভাবে ধান কাটতে পারল।

ধান কাটা শেষ হোতে তাঁতী বাড়ীতে ফিরে এল, তাঁতীর মা বলল, দেখরে, আজ আমার বেশ জ্বর হোয়েছে। তখন তাঁতী বলল, তোমার কি রকম জ্বর হোয়েছে? বুড়ী বললে, বাবাগো, গাটা খুবই গরম। তাঁতী তার মায়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখল, খুবই জ্বর হোয়েছে, গা' খুবই গরম। তারপর বলল, একি গরম মা, এর চেয়ে দা'টা আমার অনেক বেশী গরম হোয়েছিল, জল দিয়ে আমি ওকে ঠাণ্ডা করেছি। শুনে বুড়ী বলল, দে দে, বাবা, আমার গা'টা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করে দে'! তখন তাঁতী বুড়ি-মা'র ঘাড়ে দড়ি বেঁধে কুয়োতে নামিয়ে দিল। বুড়ী সেখানে গিয়ে দেখে অতল জল। তারপর বারবার খাবি খেতে লাগল এবং আঁ আঁ করে উপর দিকে তাকাল।

তাঁতী তখন তার মা'কে ডাকতে লাগল—ওমা, মা, কেমন লাগছে? কিন্তু বুড়ী আর সাড়া দেয় না। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

এই কাহিনীটি বাংলা দেশের সর্বত্রই প্রায় অনুরূপ ভাবেই প্রচলিত আছে। তবে বুড়ীকে অন্যত্র পুকুরের জলে, দামের নীচে ঠাসিয়া মরিবারও কথা আছে। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সঙ্কলিত 'টুনটুনির বই'য়ে একটি দীর্ঘতর কাহিনীর সঙ্গে ইহা যুক্ত হইয়াছে; তাহাতে অন্যান্য অভিপ্রায়ও ইহার সঙ্গে আসিয়াছে এবং কাহিনীও একটু মার্জিত হইয়াছে।

২৬

ঘোড়ার খবর

এক সদাগর কাপড়ের ব্যবসা করত। একদিন হাট থেকে ফিরবার সময় সদাগরের পিপাসা পেল; সে নদীতে জল খেতে গেল। ফিরে সদাগর তার ঘোড়াটি দেখতে পেল না। এদিকে তিনজন লোক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। এরা কেউ ঘোড়া দেখে নি। তবে কতকগুলি চিহ্ন দেখে নিজেরা বলাবলি করছিল, এ রাস্তা দিয়ে একটা ঘোড়া গেছে। ঘোড়াটির পিঠে বোঝা ছিল, ডানদিকের চোখটি কানা ছিল, আর ঘোড়াটি মাদী ঘোড়া ছিল।

কিছুদূর যেতেই সদাগরের সঙ্গে লোক তিনটির দেখা হল। সদাগর বলল, একটি ঘোড়া দেখেছ? তারা প্রশ্ন করল, তোমার ঘোড়ার পিঠে বোঝা ছিল? সদাগর উত্তর দিল, হ্যাঁ। তারা দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করল, তোমার ঘোড়াটির ডান চোখটি কি কানা ছিল? সদাগর উত্তরে বলল, হ্যাঁ। সর্বশেষে জিজ্ঞাসা করল, ঘোড়াটি কি মাদী ঘোড়া ছিল? সদাগর বলল, হ্যাঁ। সব শুনে সদাগর বলল, কোথায় আমার ঘোড়া, ঘোড়াটিকে দাও। তারা বলল, আমরা ঘোড়া দেখিনি, ঘোড়াটি এখন কোথায়, তাও আমরা জানি না।

সদাগরের তা বিশ্বাস হলো না। সদাগর তাদের চোর মনে করে বিচারের জন্য কাজীর বাড়ী গেল। কাজী সব শুনে তিনজন লোককেই চোর সাব্যস্ত করল। তখন তারা নিজেদের মধ্যে ইশারায় বলাবলি করল যে কাজী একটা শিং ছাড়া ছোট গরু। কাজীকে গরু বলায় কাজী খুব রেগে গেল। কাজী বলল, যদি তোমরা প্রমাণ করতে পার যে তোমরা চোর নও, তবেই আমি তোমাদের মন্তব্য মেনে নেবো। লোক তিনজন তখন বলল যে মাটিতে ঘোড়ার পায়ের দাগ গভীর ভাবে পড়েছিল তাই তারা বুঝেছে ঘোড়ার পিঠে বোঝা ছিল। বাম দিকের গাছপালা নেই, ডানদিকের গাছপালা আছে, তাই তারা বুঝতে পেরেছে, ঘোড়াটির ডান চোখ কানা ছিল। আর ঘোড়াটি যেখানে পায়খানা করেছে, সেখানেই প্রস্রাব করায় বুঝেছে ঘোড়াটি মাদী ঘোড়া। এইভাবে তিনজন লোক কাজীকে বোকা বানিয়ে চলে গেল। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ১৯৬৬

মন্তব্য

কাজীর নির্বুদ্ধিতা প্রতিপন্ন করা কাহিনীর উদ্দেশ্য। কাজী বিচারক এবং কেবল মাত্র বুদ্ধি দ্বারাই তাহার বিচার কার্য পরিচালিত হয়। সেইজন্য কাজীকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করার মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি হয়। কাহিনীটি একটি হারাণো উটের সম্পর্কেও প্রচলিত আছে। সুতরাং উত্তর ভারতেও ইহা প্রচলিত।

নাপিত আর তাঁতি

এক নাপিত আর এক তাঁতি, দু'জনে খুব বন্ধু। নাপিত যেমন চালাক, তাঁতি আবার তেমনি বোকা। তারা একদিন ঠিক করল যে ধান চুরি করবে। তাই তারা একটা ক্ষেতের সমস্ত ধান কেটে আনল। তারপর নাপিত বলল, সে আগার অংশটা নেবে, কাজেই তাঁতি গোড়ার দিকটা নিয়ে গেল। তাঁতি বাড়ী ফিরে এলে তার বৌ তো তাকে খুব বকল এবং বলল যে এরপর থেকে চুরি করতে গেলে সে যেন আগা আনে। তাঁতি ভাবল, বন্ধু তো আমাকে খুব ঠকাল। এবার চুরি করতে গেলে আমি আর এমন ভুল করব না। পরের বার তারা আখ চুরি করতে গেল। এবার তাঁতি গোড়ার দিকটা ছাড়ল না, নাপিত পেল আগার অংশটা। কিন্তু তাঁতি-বৌ তো খুব রেগে গেল এবং তাঁতিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

তাঁতি তখন মনের দুঃখে নাপিত বন্ধুর কাছে গেল এবং সব কথা খুলে বলল। নাপিত আর তাঁতি তখন দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। চলতে চলতে তারা একটা কচ্ছপ দেখতে পেল, তারা কচ্ছপকে তাদের সঙ্গে নিল ; তারপর আরও খানিকটা গিয়ে পেল একটা মোটা ছড়ি এবং আরও পরে পেল এক হাঁড়ি চুন। তারা সব কিছুই সঙ্গে নিল। তারপর যেতে যেতে তারা একটা বনের মধ্যে এক বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল। সেটা ছিল একটা রাক্ষসের আস্তানা।

সেখানে গিয়ে নাপিত ঠিক করল যে পালা করে তারা জেগে থাকবে। সেই অনুসারে তাঁতি ঘুমিয়ে পড়ল এবং নাপিত জেগে থাকল। রাক্ষসটা এমন সময় ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার বাড়ীতে কে ? নাপিত বলল, আমি রাক্ষসের বাবা খোক্কস। শুনে রাক্ষস চমকে গিয়ে বলল, তোমার চুল আর উকুন দেখাও তো, দেখি। নাপিত তখন সেই দড়ি থেকে খানিকটা কেটে এবং সেই কচ্ছপটা ফেলে দিল। তারপর রাক্ষসটা থুথু ফেলতে বলল এবং তখন নাপিত খানিকটা চুণ দিয়ে দিল। তাই দেখে রাক্ষস দৌড়ে পালিয়ে গেল। নাপিত তখন তাঁতিকে ডেকে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ল। আ র গভীর রাত্রে রাক্ষস এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার

বাড়ীতে কে ?' উত্তর পেল, 'আমি তাঁতি'। রাক্ষস বলল, 'দরজা খোলো।' তাঁতি ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে দিল। রাক্ষস তো ঘরে ঢুকে তাঁতিকে মেরে ফেলতে উদ্যত হল। এমন সময় গোলমালে তো নাপিতের ঘুম গেল ভেঙে। নাপিত উঠে তখন পেছন থেকে দড়ি দিয়ে রাক্ষসকে বেঁধে ফেলল। তারপর সকালে তারা দু'জনে রাজার কাছে রাক্ষসকে নিয়ে গেল। রাজা তাই দেখে খুব খুশী হলেন এবং তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। নাপিত রাক্ষসের ল্যাজ কেটে ছেড়ে দিল, আর রাজা তাদের অনেক ধনদৌলত দিলেন। তারা তখন বাড়ী ফিরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

ইহাকে সাধারণভাবে রাক্ষসের গল্প (Ogre story) বলা যাইতে পারে। তবে রাক্ষস চরিত্রের সঙ্গে যাহাদের সংঘর্ষ হয়, তাহারা সাধারণতঃ রাজপুত্র. মন্ত্রিপুত্র—নাপিত তাঁতী নহে। কারণ, রাক্ষস রোমান্টিক চরিত্র, রোমান্টিক চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক কল্পনা করিয়া কাহিনী রচিত হয় না। রূপকথার ইহা আধুনিক একটি অধঃপতিত (decadent) রূপ।

রাক্ষস সম্পর্কে সমাজের ধারণা যে কত অস্পষ্ট এই কাহিনীটি তাহার প্রমাণ। ইহাতে রাক্ষসের ল্যাজ কাটিয়া ছাড়িয়া দিবার কথা আছে। সুতরাং রাক্ষসরে এখানে একটি লাঙ্গুল বিশিষ্ট জীব বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। রাক্ষসকে যাঁহারা অনার্য প্রতিবেশী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এখানে তাঁহাদের মতবাদের সমর্থন পাইবেন না। রামায়ণেও রাক্ষসের লেজ নাই, বানরের লেজ আছে। সুতরাং লাঙ্গুল বিশিষ্ট রাক্ষসের পরিকল্পনা বহিঃপ্রভাবের ফল।

২৮

তিন বন্ধু

এক নাপিত, এক টেকো, আর এক বোকা। তারা ছিল পরস্পর বন্ধু। একদিন বিশেষ প্রয়োজনে তিন বন্ধুকে পাশের গ্রামে যেতে হবে। তিনজনই কাল বিলম্ব না করে বনের ভিতর দিয়ে যাত্রা করল। তাদের যাত্রা করতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর বনটাও ছিল খুব গভীর। চলতে চলতে তখন বন্ধু তিনজন খুবই বিপদে পড়লো। কি করবে তখন তারা? সামনেই ছিল এক বিরাট বটগাছ। নাপিত বুদ্ধি দিল, রাতটা এই গাছে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক্। প্রহর প্রহর এক একজন করে পাহারা দেবে। প্রথম রাতে জাগবে টেকো, দ্বিতীয় প্রহরে নাপিত, আর তৃতীয় প্রহরে বোকা। এই ঠিক্ ক'রে তারা গাছটিতে উঠে বসলো। কথা অনুযায়ী টেকো প্রথম প্রহর জেগে রইল, বাকি দুই বন্ধু ঘুমালো। দ্বিতীয় প্রহরে টেকো নাপিতকে ডেকে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়লো। নাপিত সতর্ক হয়ে চারিদিক লক্ষ্য করতে লাগল। সময় আর কাটতে চায় না। বসে থাকতে থাকতে নাপিতের শুধু ঘুম পাচ্ছে। নাপিত অনেক কিছু ভাবতে স্থরু করলো, মনে ভাবতে ভাবতে ঠিক্ করলো, টেকোর মাথায় তো চুল নাই, বোকার মাথায় বেশ এক গুচ্ছ চুল আছে, ও'গুলো কামিয়ে ফেলে দেওয়া যাক্। নাপিত ক্ষুর বার করে বেশ সুন্দর আর মসৃণ করে বোকার মাথাটা কামিয়ে দিল। এ দিকে নাপিতের ঘুমাবার সময়ও হয়ে এসেছে, সে বোকাকে ডেকে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

বোকা ঘুম থেকে উঠে পাহারা দিচ্ছে সতর্ক প্রহরীর মত। প্রথমে সে খেয়াল করেনি, হঠাৎ মাথায় বাতাস লাগাতে মাথায় হাত দিয়ে দেখে মাথায় একটাও চুল নেই। বোকা একটু অবাকই হ'ল প্রথমে; তারপর ভাবলো, নাপিতটা কি বোকা! আমাকে টেকো মনে করে উঠিয়ে দিয়েছে। অতএব ও টেকো, তখন তো টেকোর পাহারা দেবার কথা নয়! সে তখনি আবার ঘুমিয়ে পড়লো। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

কাহিনীর হাস্যরসটি একটু সূক্ষ্ম। নাপিত বোকার মাথার চুল কামাইয়া দিল, তাহাতেই বোকা মনে করিল, সে টেকো। তিন বন্ধুর প্রহরে প্রহরে রাত্রি জাগিয়া পাহারা দিবার বৃত্তান্ত লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়।

সাত বোকা

এক দেশে সাত ভাই ছিল, তারা খুব বোকা, কোন কাজ করতে পারতো না। তাই একদিন ওদের বাবা ওদের সবাইকে তাড়িয়ে দিল। সাত ভাই পথ চলতে লাগলো। যেতে যেতে এক গ্রামে তারা পৌছলো। ক্ষিদে পেয়েছে—পথ চলতে পারে না। একটা বাড়ীতে এসে তারা বললো আমাদের কিছু খেতে দেবে? বাড়ীর মালিক বললো, তোমরা যদি আমার বাড়ী কাজ কর, তা'হলে খেতে দেবো। সাত ভাই রাজি হলো।

পরদিন বাড়ীর মালিক সাত ভাইকে তেল পাহারা দিতে ব'লে ব'ললে, 'দেখো যেন চোর না আসে।' সাত ভাই পাহারা দিচ্ছে, আর বিরাট তেলের গামলার ভেতর উঁকি মেরে দেখছে চোর আসছে কি না। গামলায় যেই নিজেদের ছায়া পড়লো, অমনি সাত বোকা ভাবলো, বোধ হয় সাতটা চোর এসেছে, তখন তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে এসে গামলার ভেতর মারতে লাগলো; গামলা ভেঙে গিয়ে সব তেল পড়ে গেলো। মালিক ফিরে এসে ব্যাপার দেখে বলল, তোমাদের এ সব কাজ করে দরকার নেই, তোমরা ধান পাহারা দেবে।

সাত বোকা পরদিন ধান পাহারা দিতে গেলো। ধানের ক্ষেতে ধান পেকে লাল হয়ে রয়েছে। সাতবোকা ভাবলো, বুঝি ও'গুলো পোকা; তারা লাঠি দিয়ে গাছ থেকে সব ধান ফেলে দিল। মালিক এসে থ'। বলল, দরকার নেই তোমাদের ধান পাহারা দিয়ে। যাও খড়গুলো কেটে বাড়ী রেখে এসো। সাত বোকা খড় কেটে বাড়ী নিয়ে গিয়ে মালিকের বুড়ী মাকে জিজ্ঞেস করলো, ও'গুলো কোথায় রাখবে। মা কাজ করছিলো; বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমরা মাথায় রাখো'। বোকারা সব খড় তার মাথায় চাপিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী মরে গেলো। বাড়ী এসে মালিক সব দেখে 'হায় হায়' করতে লাগলো। তারপর বলল, যা হবার হয়েছে, এবার মাকে দাহ করে এসো। সাত বোকা বুড়ীকে খাটিয়ায় শুইয়ে হরিনাম করতে করতে লাফাতে লাফাতে চললো। কখন যে বুড়ী খাটিয়া থেকে পড়ে গেছে, তা তাদের খেয়াল নেই। শ্মশানে গিয়ে দেখে বুড়ী নেই; কি করবে, কি করবে? হঠাৎ দেখে পাশের ক্ষেতে এক

শাক তুলছে। বোকারা ভাবলো বুড়ী বেঁচে উঠে শাক তুলছে। ছুটে গিয়ে তারা সেই বুড়ীকে লাঠি পেটা করে মেরে ফেললো; তারপর দাহ করে ফিরে চললো। বাড়ী ফেরার সময়ে দেখে মালিকের মা বুড়ী রাস্তায় পড়ে আছে। এমন সময় মালিকও এসে হাজির। সব শুনে সে বললো, তোমাদের মতো বোকাকে রেখে আমার কাজ নেই। তোমরা যেখানে খুশী যাও। এ গ্রামে আর তোমাদের থাকতে হবে না। —ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

কাহিনীটি কয়েকটি নির্বোধ আচরণের তালিকা মাত্র। ইহাদের মধ্যে বুড়ীর প্রতি ব্যবহারটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। পূর্বেই বলিয়াছি, বাংলার লোক-কথায় বুড়ী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত; এমন কি, তাহার নির্মম মৃত্যুও কৌতুকের বিষয় হইয়াছে। বৃদ্ধের প্রতি সমাজের চিরকালীন অবহেলার ভাবই ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর এমন আদিবাসীর সমাজ সেদিন পর্যন্তও ছিল, যাহাতে বার্ধক্যে মাতাপিতাকে হত্যা করিয়া ফেলা হইত। অকর্মণ্য এবং বৃদ্ধ গো-মহিষকে আনুষ্ঠানিক ভাবে হত্যা করিবার রীতি এখনও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত আছে। এই সকল বিষয় হইতেই বৃদ্ধের প্রতি এই সমাজের এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। বুড়ীও কৌতুকের বিষয় হইয়াছে।

বুদ্ধি যার রেহাই তার

একটা বাড়ীতে তিনটে মোরগ ছিল। একদিন একটা শেয়াল এসে বলল, "বোনপো, বোনপো, আমায় থাকতে দেবে?" মোরগরা বলল, "থাকো"।

রাতের বেলা শিয়াল বলল, "বোনপো, আজ তোমরা কোথায় শোবে"? মোরগরা বলল, "আজ উনুনে ছাই আছে, তাই খড়ের চালে শোব।" অনেক রাতে শিয়াল উঠে চালে গিয়ে একটা মোরগকে খেয়ে এলো।

পরদিন দুটো মোরগ ভাবলো, বোধ হয় তাদের ভাই বেড়াতে গেছে। রাতের বেলা আবার জিজ্ঞেস করলো, "বোনপো, বোনপো, আজ তোমরা কোথায় শোবে?" মোরগরা বলল, "আজ চালে ধূলো আছে, উনুনে শোব।" অনেক রাতে শিয়াল গিয়ে আর একটা মোরগকে খেয়ে ফেললো।

পরদিন শেষ মোরগটার খুব সন্দেহ হলো। সে সারা রাত জেগে বসে রইলো। অনেক রাতে যখন শিয়াল তাকে খেতে গেল, মোরগ বলল, "মামা, তুমি চোখ বোজ, আমি তোমার মুখে ঢুকছি।" বোকা শিয়াল চোখ বুজলো, আর অমনি মোরগ উড়ে গেল।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

বাংলার উপকথায় মোরগের গল্প নাই বলিলেই চলে। এই কাহিনীটি যে অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা বৈষ্ণব-প্রধান; মোরগ সেখানে গৃহপালিত নহে। সুতরাং কাহিনীটি বহিরাগত। হয়ত পাশ্চাত্ত্য উপকথা হইতে আসিয়া থাকিবে। তবে মোরগের গল্প ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে ব্যাপক প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্য হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে। মোরগ দুর্বল জীব, সুতরাং তাহার পক্ষে বুদ্ধিমান্ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে শিয়ালের সঙ্গে সে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাহাতে তাহার নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। মোরগের গল্পটি যেখান হইতে আসিয়াছে, এই কাহিনীর শিয়াল চরিত্রটিও সেখান হইতেই আসিয়াছে। কারণ, বাংলার শিয়াল এত বোকা নহে। শিয়াল যে এখানে মোরগের নিকট বোকা হইল, তাহাও বাহিরের কোন প্রভাবের ফল।

১

ঘটকালি

কোন গ্রামে এক তাঁতী বাস করিত। তাহার পূর্বপুরুষ ধনী ছিল বটে ; কিন্তু তাহার সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। সে এখন কোন রকমে এক কুঁড়ে-ঘরে বাস করে। পৃথিবীতে তাহার আর কেহ ছিল না। তাহার কুঁড়ে ঘরের নিকটে একটি শিয়াল বাস করিত। সে একদিন তাঁতীকে বলিল যে, তাহার সহিত সে রাজকন্যার বিবাহ দিবে। এই কথা বলিয়া সে রাজবাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হইল ; সঙ্গে কিছু পানের পাতা লইয়া চলিল।

রাজবাড়ীর নিকটে গিয়া সে একস্থানে বসিয়া সেই পান চিবাইতে লাগিল। শিয়ালকে পান চিবাইতে দেখিয়া সকলে তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজার নিকট শিয়াল তাহার রাজ্যের রাজার ধন ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এমন এক চিত্র বর্ণনা করিল, যাহাতে রাজাকে তাহার তুলনায় দরিদ্র বলিয়া মনে হইল। তাহার পর শিয়াল তাহার দেশের রাজা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিল, তাহাতে রাজা নিজ কন্যাকে তাঁহার হস্তে বিবাহ দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। শিয়াল ঘটকালি করিতে সম্মত হইয়া বিদায় লইল।

কয়েকদিন পরে শিয়াল পুনরায় রাজবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা-রাণীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল যে, কোন প্রকারে সে তাহার রাজাকে সম্মত করাইয়াছে। বিবাহের দিন স্থির হইল এবং ঠিক হইল শিয়ালের রাজা অতি সাধারণ বেশে একা বিবাহ করিতে আসিবেন। কারণ, তাঁহার লোক-লস্কর এতই বেশী যে কন্যার পিতার রাজ্যে স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব। যেহেতু বিবাহের দিন বিবাহবাড়ীতে কোনরূপ গণ্ডগোল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, সেই জন্য বর একা আসাই স্থির হইল। তারপর, বর-রাজা হট্টগোল এবং নিজের জন্য কোন আড়ম্বর পছন্দ করেন না, সেই জন্য, তিনি সাধারণ মানুষের মতই বিবাহ করিতে আসিবেন কথা হইল। রাজা বিবাহের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

এদিকে শিয়াল দেশে ফিরিয়া তাঁতীকে সকল বিষয় শিখাইয়া দিল। তারপর, নিজে হাজার খানেক শিয়াল, এক হাজার কাক এবং এক হাজার ছাতার পাখী সংগ্রহ করিয়া বিবাহ অনুষ্ঠানে চলিল। তাঁতীর জন্য রজকবাড়ী হইতে পোশাক ধার করিয়া আনিয়াছিল। রাজবাড়ীর দুই ক্রোশ

দূরে আসিয়া শিয়াল সকলকে এক সঙ্গে চীৎকার করিতে বলিল। সেই হাজার হাজার পশুপাখীর সমবেত চীৎকারে কী ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, তাহা ধারণার অতীত। শিয়াল দ্রুত রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজাকে বিপদের কথা জানাইল যে, দুই মাইল দূর হইতে বরযাত্রী দলের যে কোলাহল শোনা যাইতেছে, রাজার পক্ষে তাহাদের স্থান হওয়া অসম্ভব। একা বরং বরকে লইয়া আসা যাক্। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন।

শিয়াল একটি ঘোড়া লইয়া অগ্রসর হইল। সেই হাজার শিয়াল, কাক ইত্যাদিকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিল এবং তাঁতী বন্ধুকে ঘোড়ায় চড়াইয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া হাজির করিল। রাজবাড়ীর সকলে বরের বেশভূষা এবং চেহারা দেখিয়া হতাশ হইল। শিয়াল বুঝাইল, তাহাদের রাজা ইচ্ছা করিয়াই এইরূপ বেশ ধারণ করিয়াছেন। যাই হোক্ পুরোহিত বিবাহের মন্ত্রপাঠ সুরু করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া গেল। বর একবারও মুখ খোলে নাই। কিন্তু বাসরঘরে গিয়া সে ঘরের কড়ি-বরগা গুণিতে লাগিল এবং তাহার দ্বারা যে ভালো তাঁত প্রস্তুত করা যায়, তাহা আপন মনেই কহিতে লাগিল। রাজকন্যা অবাক হইল—শেষে কি একজন তাঁতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল?

পরদিন শিয়াল বুঝাইল যে, তাহার রাজার সাতশত পরিবার তাঁতী প্রজা আছে, তিনি তাহাদের কথাই চিন্তা করিয়া থাকিবেন। শিয়াল তাড়াতাড়ি বরবধূকে লইয়া যাইতে চাহিল। তাহাদের গ্রামের প্রান্তে আসিয়া রাজার পাল্কী ছাড়িয়া দিল এবং বরবধূকে পদব্রজে যাইতে বলিল। অল্পক্ষণ পরে তাঁতীর কুটীরের সম্মুখে আসিয়া শিয়াল রাজকন্যাকে তাঁহার স্বামীর প্রাসাদ দেখাইয়া দিল। রাজকন্যা আপন ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও তাঁহার ভালো ছিল।

কিন্তু আর কোন উপায় নাই জানিয়া তিনি স্বামীকে ধনী করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তিনি স্বামীকে অল্প ময়দা কিনিয়া আনিতে বলিলেন। জল দিয়া তিনি আপন দেহে মাখিলেন এবং পরে আঙুল রগড়াইতে লাগিলেন। ঐ ময়দা তখন সোনা হইয়া উঠিল। এইভাবে তিনি প্রচুর সোনা সংগ্রহ করিলেন এবং সেই সোনার সাহায্যে বিরাট রাজপ্রাসাদ বানাইলেন। সাত শত তাঁতী-পরিবার বসাইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বামীকে রাজা বানাইয়া দিলেন।

ইহার পর রাজকন্যা—এখন তিনি রাণী হইয়াছেন—তাঁহার পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজ্যের চারিদিকে হাসপাতাল বসান হইল। রাজ্যের পশুরা পানের পাতা চিবাইতে লাগিল। কাশ্মীরী শালে রাজপথ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। ধন-ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখাইতে কোন ত্রুটি রহিল না। রাজা উপস্থিত হইয়া সকল কিছু দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং কন্যার সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। সেই সময় শিয়াল আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল যে, সে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহা সবই সত্য।

মন্তব্য

কাহিনীটি রূপক হিসাবেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাংলার ঘটক চরিত্র শিয়ালের মতই ধূর্ত এবং প্রবঞ্চক। শিয়াল এখানে ঘটক চরিত্রেরই রূপক। ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে আছে,

না করে মিথ্যারে ভয় বিশেষে ঘটক।

অন্যত্রও শুনিতে পাওয়া যায়,

বিশেষে ঘটক জাতি বড়ই চতুর।

শিয়ালের চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ঘটক চরিত্রের রূপটিই শিয়াল চরিত্রের রূপকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

বাংলার সমাজ-জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়াই এই শ্রেণীর কাহিনী সহজেই সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করিবার সুযোগ পাইত।

২

শিয়াল ঘটক

এক বোকা জোলা। সে একদিন কাস্তে নিয়ে ক্ষেতের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখে, রোদ্দুরে কাস্তেটা খুব গরম হয়ে উঠেছে। জোলা ভাবলে, কাস্তের জ্বর হয়েছে, এই মনে করে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। পাশের ক্ষেতে এক চাষী চাষ করছিল। জোলার কান্না শুনে সে এসে বললে, ওকে জলে ডুবিয়ে রাখ, জ্বর সেরে যাবে।

একদিন জোলার মায়ের জ্বর হল। জোলা তখন তার মাকে পুকুরে জলের ভিতরে চেপে ধরলে। বুড়ী জোলার এই চিকিৎসায় মরে গেল। তখন জোলা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

এক শিয়াল ছিল জোলার বন্ধু। সে জোলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, তুমি কেঁদ না, রাজার মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। শুনে জোলা খুব খুশী হল, সে রোজ বলে, কৈ শিয়াল, তুমি তো সেই ব্যবস্থাটা করলে না? শিয়াল তাকে বললে, তুমি ভেবো না, যখন কথা দিয়েছি, তখন নিশ্চিত তোমার কথা রাখবই, তুমি খানকতক ভাল ভাল কাপড় বুনে ফেল। শিয়াল তাকে সাবান মেখে স্নান করতে বলে রাজার কাছে মেয়ে চাইতে বেরুল।

কানে কলম গুঁজে, পাগড়ী এঁটে, জামা জুতা পরে, চাদর জড়িয়ে, ছাতা বগলে করে, শিয়াল যখন রাজার কাছে উপস্থিত হল, তখন রাজামশাই ভাবলেন, এ খুব পণ্ডিত লোক। তিনি জিগ্যেস করলেন, এই যে শিয়াল পণ্ডিত, তুমি কি জন্যে এসেছো? শিয়াল বললে, মহারাজ, আমাদের রাজার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না জানতে এসেছি। আসলে জোলার ডাক-নাম রাজা। রাজা জিগ্যেস করলেন, তোমাদের রাজা কেমন? তখন শিয়াল রাজার নানাগুণ বর্ণনা করলেন, অবশ্য প্রত্যেকটি গুণের দুটো করে অর্থ হয়। মোটামুটি তার পরিচয় দাঁড়াল এমন যে, রাজা বললেন, এমন পাত্রে কন্যা দেবো না তো কার সঙ্গে দেবো। শিয়ালকে খুশী হয়ে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। সেই টাকা নিয়ে সে জোলার কাছে ফিরে এল, 'দেখল, জোলা এত কাপড় বুনেছে যে গ্রামের প্রত্যেকের এক একখানি কাপড় হতে পারে। শিয়াল সেই রাজার দেওয়া টাকা থেকে দুটো করে টাকা আর একখানা করে

কাপড় গ্রামের সকলকে দিয়ে বলে এল, আমাদের বন্ধুর সঙ্গে রাজার মেয়ের বিয়ে হবে, আপনাদের সব নেমন্তন্ন। শুনে সকলে ভারী খুশী হল। জোলা বোকা হলেও বড় ভাল মানুষ ছিল, তাই সকলে তাকে ভালবাসত।

তারপর শিয়াল আর সব শিয়ালের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, আমার বন্ধুর বিয়ে তোমাদের নেমন্তন্ন। তোমরা সবাই গান গাইতে যাবে। ব্যাঙদের পাড়ায় গিয়ে নেমন্তন্ন করে এল, তারাও এসে গান গাইবে। তারপর শালিক হাড়িচাচা, উৎক্রোশ, বৌ-কথা-ক, ময়ূর, চোখ গেল, ভগদত্ত সবাইকে নেমন্তন্ন করে এল। আটদিনের মাথায় দলবল নিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চলল। বন্ধুর জন্যে চমৎকার পোশাক ভাড়া করে তাকে পরিয়ে দিলে। রাজার বাড়ী যখন এক ক্রোশ দূরে, তখন শিয়াল সকলকে ডেকে বললে, ঐ রাজার বাড়ীর আলো দেখা যাচ্ছে। তোমরা আস্তে আস্তে এস, আমি রাজা মশাইকে গিয়ে খবর দি। তোমরা সকলে মিলে এখন গান ধর।

রাজা শিয়াল পণ্ডিতকে দেখে খুশী হলেন। জিগ্যেস করলেন, শিয়াল পণ্ডিত, কিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

শিয়াল বললে, ও আমাদের বাজনার শব্দ। রাজা এত লোকজনের আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেলেন। তখন শিয়াল বললে, ওসব আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। রাজা খুশী হয়ে শিয়ালকে আরো পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিলেন। শিয়াল মুড়ি মুড়কি, মাছ কিনে মাঠে ছড়িয়ে দিলেন। শিয়াল গ্রামের লোকদের প্রাণভরে সন্দেশ খাইয়ে দিল। তারপর জোলাকে নিয়ে রাজার কাছে এল। জোলাকে আসবার সময় শিখিয়ে দিলে, খবরদার, তুমি যেন কোনো কথা বলো না, তবে কিন্তু বিয়ে করতে পারবে না।

রাজার বাড়ীর লোকেরা বর দেখে খুব খুশী হল, কিন্তু এমন সুন্দর বর কথা কয় না।

শিয়াল বললে, ওর মা মরে গিয়েছেন, সেই দুঃখে তিনি কথা বলছেন না। সবাই বললে, আহা! কিন্তু আসলে জোলা কথা বললেই যদি ধরা পড়ে যায়, এই জন্যে শিয়াল তাকে কথা বলতে বারণ করেছে। খাবার সময় তাকে সোনার থালে ভাত, একশোটা সোনার বাটিতে খেতে দেওয়া হয়েছে। বোকা জোলা বাটিগুলো নিয়ে শুঁকতে লাগল। কোন তরকারীটা কি, চিনতে না পেরে এক সঙ্গে মেখে খেতে গেল; তারপর খেতে না পেরে চাদরে বাঁধতে গেল। সকলে শিয়ালকে বললে, তোমাদের রাজা কখনও কি খেতে পান নি?

শিয়াল বললে, তা নয়, উনি একবার বই দুইবার খান না। আর যা পাতে থাকে, তা চাদরে বেঁধে চাদরখানি শুদ্ধু গরীবকে দিয়ে দেন। একজন গরীবকে ডাকুন।

শুতে গিয়ে জোলা দেখে হাতীর দাঁতের খাট-বিছানা, তাতে মশারী খাটানো। জোলা কোনদিন খাটও দেখেনি, মশারীও দেখেনি, প্রথমে সে গিয়ে খাটের তলায় ঢুকল, মশারীর দরজা দেখতে না পেয়ে, খাটের খুঁটি দিয়ে মশারীর চালে যেই শুতে গেল, সব শুদ্ধ ভেঙে মাটিতে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বললে,

ধান কাটতুম, কাপড় বুনতুম সেই ছিল ভাল,
রাজার মেয়ে বিয়ে মোর কোমর ভেঙে গেল।

রাজার মেয়ে এই সব দেখে শুনে খুব কাঁদলেন, আর শিয়ালকে বকলেন। কিন্তু ভারী বুদ্ধিমতী বলে কাউকে কিছু বললেন না। নানা দেশ দেখবার অনুমতি চেয়ে রাজার মেয়ে লোকজন টাকাকড়ি নিয়ে জোলাকে নিয়ে অন্যদেশে চলে গেলেন। সেখানে বড় বড় পণ্ডিত রেখে জোলাকে বিদ্বান করে তুললেন। জোলা দু'তিন বছরের মধ্যে মস্ত বড় পণ্ডিত আর বীর হয়ে উঠল। খবর পেল রাজামশাই মারা গেছেন। তাঁর ছেলে নেই। তাই জামাইকে রাজা করে গেছেন।

তখন খুব সুখের কথা হল।

মন্তব্য

দুইটি স্বতন্ত্র কাহিনী এখানে একত্র মিশিয়াছে। বোকা জোলা তাহার বৃদ্ধা জননীকে জলে চুবাইয়া মারা পর্যন্ত কাহিনীটি একটি স্বাধীন কাহিনী। পূর্বে ইহা আমরা শুনিয়াছি। ইহার পরবর্তী অংশ অর্থাৎ শিয়ালের ঘটকালির অংশ আর একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন কাহিনী। পূর্বে ইহাও আমরা শুনিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি, কাহিনীটি রূপক। বাংলার ঘটক চরিত্রের বাস্তব রূপ শিয়াল চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

৩

বাঘের মামা

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, বনের ধারে পাহাড়, সেখানে গর্তের ভিতর এক ছাগল ছানা ছিল। তার মা তাকে বারণ করেছিল, খবরদার বাইরে যাস নে, ভালুকে ধরবে, সিংহে খাবে, নয় বাঘে নিয়ে যাবে। ছাগল ছানা যতদিন ছোট ছিল, মায়ের কথা শুনতো। তারপর যখন বড় হল, তখন গর্তের বাইরে চলে এল। সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগল ছানা অত বড় জন্তু কখনো দেখে নি। সে ষাঁড়ের শিং দেখে ভাবলে এও বুঝি ছাগল ছানা। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলে, হ্যাঁ গা, তুমি কি খাও? ষাঁড় বললে, আমি ঘাস খাই। ছাগল ছানা বললে, ঘাস তো আমার মাও খায়, সে তো তোমার মত এত বড় হয় নি। ষাঁড় বললে, আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ভাল ঘাস অনেক বেশী খাই।

সেই ভাল ঘাসের সন্ধান জেনে নিয়ে ছাগল ছানা বনের ভিতরে গেল. যত পেটে ধরে তত ঘাস খেল। খেয়ে তার পেট এমনি ভারি হল যে, সে আর হাঁটতে পারে না। সন্ধ্যে হলে ষাঁড় বললে, চল এখন বাড়ী যাই। কিন্তু ছাগল ছানা কি করে বাড়ী যাবে? সে চলতেই পারে না। তাই সে বললে, তুমি যাও, আমি কাল যাবো। তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগল ছানা একটা গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতর ঢুকে পড়ল। সেই গর্তটা ছিল একটা শিয়ালের। শেয়াল গিয়েছিল তার মামা বাঘের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। শেয়াল অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে যে তার গর্তে একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। সে রাক্ষস-টাক্ষস ভেবে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, গর্তের ভিতর কেও? ছাগল ছানা বললে, 'আমি সিংহের মামা নরহরি দাস, পঞ্চাশ বাঘে এক এক গ্রাস।' শুনেই শিয়াল একছুটে বাঘের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। শিয়াল সব কথা বললে। বাঘ শুনে তো রেগে আগুন। বাঘ বললে, চলতো ভাগ্নে, দেখি বেটার আস্পর্ধা। শিয়ালকে লেজে বেঁধে নিয়ে বাঘ শিয়ালের গর্তের কাছে এসে গেল। ছাগলছানা দূরে থেকেই তাঁদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে—

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি,
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি।

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ গেল উড়ে। বাঘ ভাবলে, নিশ্চয়ই শিয়াল তাকে ফন্দী করে ধরে এনেছে নরহরি দাসকে খেতে দেবে বলে। তারপর সে এক দৌড়ে ছুট দিল। সঙ্গে নিল শিয়ালকে। শিয়াল মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটায় আঁচড় খেয়ে, খেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে যায় আর কি! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, 'মামা আল, মামা আল।' বাঘ ভাবলে, নরহরি দাস বুঝি তাদের তাড়া করেছে। সে আরো বেশী ছুটতে লাগল।

সকালে ছাগলছানা বাড়ী ফিরে এল। শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার খুব রাগ, সেই রাগ আর কিছুতেই গেল না।

মন্তব্য

ছাগল ছানা ক্ষুদ্র ও অসহায় জীব; সেইজন্য বাংলার লোক-কথার সাধারণ আদর্শ অনুযায়ী সে সর্বাপেক্ষা চতুর। বুদ্ধিবলেই সে ধূর্ত শৃগাল এবং হিংস্র ব্যাঘ্রের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিল। ঈশপের উপকথায় মেষ-শাবক ও নেকড়ে বাঘের যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহাতে মেষশাবক দুর্বল এবং অসহায় হইলেও ছাগল ছানার মত বুদ্ধি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ঈশপের কাহিনীটি বাস্তব, বাংলাদেশের কাহিনীটি রূপকাশ্রিত।

৪

নাক কাটা রাণী

রাজার বাগানের কোণে টুনটুনির বাসা ছিল। রাজা সিন্ধুকের টাকা শুকোতে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যের সময় তার একটি টাকা তুলে নিয়ে যেতে তার লোকেরা ভুলে গেছে। টুনটুনি সেই চকচকে টাকাটি দেখে কুড়িয়ে এনে ঘরে রেখে দিলে, আর মনে মনে ভাবলে, আমি কত বড়লোক হয়ে গেছি, 'রাজার ঘরে যে ধন আছে, আমার ঘরেও সে ধন আছে'; সেই কেবলই বলল;

রাজার ঘরে যে ধন আছে

টুনির ঘরে সে ধন আছে।

রাজা তাঁর সভায় বসে সে-কথা শুনতে পেয়ে জিগগেস করলেন, পাখিটা কি বলছেরে?

সভার লোকেরা হাতজোড় করে বললে, মহারাজ, পাখিটা কেবলই বলছে, রাজার ঘরে যে ধন আছে—ওর ঘরে নাকি সেই ধন আছে। শুনে রাজা খিল্ খিল্ করে হেসে বললেন, দেখ তো, ওর বাসায় কি আছে?

তারা দেখে এসে বললে, একটি টাকা আছে। রাজা বললে, সে আমারই টাকা, তোরা নিয়ে আয় সে টাকা। তখুনি রাজার লোকজন গিয়ে টাকাটি নিয়ে এল। টুনটুনি বলতে লাগল,

রাজা বড় ধনে কাতর

টুনির ধন নিলে বাড়ীর ভিতর।

শুনে রাজা বললে, যা টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে আয়। টুনটুনি তখন বলতে লাগল, রাজা ভয় পেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে। এ কথাও রাজার কানে গেল। শুনে রাজা রেগে গিয়ে বললেন, ধরে নিয়ে আয় বেটাকে, ভেজে খাই। রাজার কথায় টুনটুনিকে ধরে নিয়ে আনল রাজার লোকেরা। রাজার বাড়ীর ভিতরে রাণীদের দিয়ে বললেন, এই পাখিটাকে ভেজে আজ আমাকে খেতে দিতে হবে। রাণীরা সেই পাখিটাকে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলো। একজন বললেন, কি সুন্দর পাখি! আমার হাতে দাও তো, একবার দেখি!' বলে, তিনি তাকে হাতে নিলেন, তা দেখে আর একজন দেখতে চাইলেন। এই ভাবে-দেখতে দেখতে টুনটুনি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। রাণীদের মাথায় বাজ পড়লো, কি সর্বনাশ! রাজা জানতে পারলে তো আস্ত রাখবে না। তাঁরা দুঃখ করছেন, তখন এক ব্যাঙ থপথপ করে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সাতরাণী সেই ব্যাঙটিকে ভেজে রাজা মশাইকে খেতে দিলেন। রাজা ব্যাঙ ভাজা খেয়ে

তো মহাখুসী। সভায় গিয়ে বসে বসে ভাবছিল, পাখির বাচ্চাকে কেমন জব্দ করেছি।

অমনি টুনি বলছে—

বড় মজা, বড় মজা
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা।

শুনেই তো রাজা মশাইয়ের গা গুলুতে লাগলো, তিনি মুখ ধুলেন আর রেগে বললেন, সাতরাণীর নাক কেটে ফেল। অমনি জল্লাদ গিয়ে সাতরাণীর নাক কেটে নিল। তা দেখে টুনটুনি বললে—

এক টুনিতে টুনটুনাল
সাতরাণীর নাক কাটা গেল।

তখন রাজা বললেন, আন বেটাকে ধরে, এবার গিলে খাব, দেখি কেমন করে পালায়। টুনটুনিকে ধরে আনা হল। রাজা টুনটুনিকে এক ঢোকে গিলে ফেললেন, তারপর জল খেলেন। যেই না তিনি ঢেকুর তুলেছেন, টুনটুনি হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে পালাল। রাজা বললেন, ধর ধর। অমনি দুশো লোক টুনটুনিকে ধরে ফেলল। এবার রাজা মশাই বললেন, জল আন, টুনটুনি বেরোলেই তলোয়ার দিয়ে দু'টুকরো করে কেটে ফেলবে। খানিক বাদে রাজামশাই নাকসিটকিয়ে বললেন, 'ওয়াক'। অমনি টুনটুনি পেটের ভিতরের সব কিছুর সঙ্গে বেরিয়ে এল। সবাই বললে, সিপাই সিপাই, মারো মারো। সিপাই থতমত খেয়ে যেই না তলোয়ার চালিয়েছে, সেই তলোয়ার টুনটুনির গায়ে না পড়ে রাজার নাকে গিয়ে পড়ল। রাজার নাক কাটা গেল। অনেক কষ্টে বৈদ্য এসে রাজা মশাইকে বাঁচাল। টুনটুনি দেখে বললো,

নাক কাটা রাজারে
দেখ তো কেমন সাজারে।

এই বলেই সে দেশ থেকে সে চলে গেল। রাজার লোক ছুটে এসে দেখলো খালি বাসা পড়ে আছে।

মন্তব্য

দুর্বলের প্রতি সহানুভূতি বশত ক্ষুদ্রতম জীব টুনটুনিকে অপরাজেয় বুদ্ধির অধিকারী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রাজার শক্তির বিশালতা, আর একদিকে টুনটুনি পাখীর ক্ষুদ্রতা ইহাদের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি দ্বারা কাহিনীর কৌতুক রস সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

ফাঁকি

গৃহস্থদের ঘরের পিছনে যে বেগুন গাছ আছে, তার পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি তার বাসা বেঁধেছে। বাসার ভিতর রয়েছে তার তিনটি ছোট ছোট ছানা। ছানাগুলি এত ছোট যে তারা ভাল করে চোখ মেলে তাকাতে পারে না। কেবল চিঁ চিঁ করে। গৃহস্থদের বিড়ালটি মহাদুষ্টু। তার ভারী ইচ্ছে, ছানাগুলি খায়। একদিন বেগুন গাছের তলায় গিয়ে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারাণী'। বিড়াল ভারী খুসী হয়ে চলে গেল। এমন করে বিড়াল রোজ আসে আর ভারী খুসী হয়ে চলে যায়।

তারপর কিছু দিন কেটে গেল। টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের ডানাগুলি ভারী সুন্দর হয়েছে। তারা আর আগের মত চোখ বুজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি ছানাদের বললে, বাছা, তোরা উড়তে পারবি? ছানারা বললে, হ্যাঁ মা। সামনে একটা মস্ত তালগাছ ছিল, বললে, দেখতো ঐ তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না? ছানারা তক্ষুণি উড়ে তাল গাছটার ডালে গিয়ে বসলে।

খানিক বাদে বিড়াল এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি পা উঠিয়ে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী' বলেই ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। দুষ্টু বিড়াল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লাফিয়ে বেগুন গাছের উপর উঠতে গিয়ে, বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরলো।

মন্তব্য

এখানেও ক্ষুদ্র এবং অসহায়ের উপর সহানুভূতি বশত টুনটুনিকে অপরাজেয় বুদ্ধির অধিকারী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। বিড়াল অনিষ্টকারী; সেইজন্য সহানুভূতি হইতে স্বভাবতই বঞ্চিত হইয়াছে। বিড়াল টুনটুনির নিকট এখানে বুদ্ধিতে পরাজিত হইয়াছে। ক্ষুদ্রই বুদ্ধির অধিকারী, সবল নির্বোধ। চোর চতুর, কিন্তু রাজা নির্বোধ। পক্ষীজগতেও তেমনই বিড়ালকে নির্বোধ মনে করিয়া টুনটুনিকে চতুর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে দুর্বল সমাজ এক মানসিক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে মাত্র।

৬

ক্ষুদ্রের ব্যথা

টুনটুনি একবার বেগুন পাতার ওপর বসে নাচতে গিয়েছিল। নাচতে গিয়ে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তার থেকে হল মস্ত ফোঁড়া। ফোঁড়া কি করে সারবে, এই ভেবে সে কুল পেল না। টুনটুনিকে সবাই বলে, নাপিতকে দিয়ে ফোঁড়াটি কাটিয়ে ফেল। টুনটুনি নাপিতের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করে ফোঁড়াটি কেটে দিতে বললে। নাপিত বললে, আমি রাজাকে কামাই, তোর ফোঁড়া কাটতে আমার বয়ে গেছে। টুনটুনি বললে, বেশ, কেমন তুমি ফোঁড়া না কাট, আমি দেখবো—এই না শুনে সে রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করল এবং রাজাকে সাজা দেবার জন্যে বললে।

এই কথা শুনে রাজার ভারী হাসি পেল। রাজা বিছানায় শুয়ে গড়াগড়ি দিলেন, নাপিতকে রাজা কিছু বললেন না। এতে টুনটুনির ভারী রাগ হল, সে ইঁদুরের কাছে গেল। ইঁদুর তাকে ভারী যত্ন আত্তি করলে। টুনটুনি ইঁদুরকে বললে, যখন রাজামশাই ঘুমুবেন, তখন তাঁর ভুঁড়িটা ফুটো করে দিতে হবে। ইঁদুর তা শুনে বললে, ওরে বাপরে, তা আমি পারব না। তখন রাগ করে টুনটুনি বিড়ালের কাছে গেল; গিয়ে বললে, ইঁদুরকে মারতে হবে। বিড়াল বললে, ইঁদুর-টিঁদুর মারতে পারবো না। টুনটুনি রাগ করে লাঠির কাছে গেল এবং বিড়ালকে মারবার জন্যে বললে। লাঠি বলল, তা আমি পারবো না। সেখান থেকে আগুনের কাছে গেল এবং বললে, লাঠিকে পোড়াতে হবে। এমনি করে সে সাগরের কাছে গেল, হাতির কাছে গেল; শেষ পর্যন্ত মশার কাছে গেল। মশা টুনটুনির কথা শুনে হাতিকে কামড়াতে গেল। সঙ্গে জুটিয়ে নিলে রাজ্যের যত মশা। তখন হাতি বলে, সাগর শুষি, সাগর বলে, আগুন নেবাই, আগুন বলে, লাঠি পোড়াই, লাঠি বলে, বিড়াল ঠেঙাই, বিড়াল বলে, ইঁদুর মারি, ইঁদুর বলে, রাজার ভুঁড়ি কাটি, রাজা বলে, নাপতে বেটার মাথা কাটি। নাপিত ভয়ে ভয়ে টুনটুনির ফোঁড়া কেটে দিল।

মন্তব্য

ক্ষুদ্রের দুঃখ ক্ষুদ্রই বুঝে। সেইজন্য টুনটুনির আবেদনে মশা সাড়া দিল। একক শক্তিতে মশা ক্ষুদ্র হইলেও একতা দ্বারা তাহার শক্তি সর্বজয়ী।

৭

শিয়াল পণ্ডিত

কুমীর দেখলে, সে শিয়ালের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। তখন সে ভাবলে তার সাতটি ছেলেকে শিয়ালের কাছে লেখাপড়া শেখালে তারা এমন চালাক চতুর হবে যে, তা দিয়ে করে খেতে পারবে। শিয়াল তো খুব খুশী হয়ে রাজি হল। সে রোজ একটা করে কুমীর বাচ্ছার ঘাড় মটকায়, আর খায়। কুমীর দেখতে এলে একটা বাচ্ছাকে ঘুরিয়ে সাতবার দেখায়। যেদিন সবগুলো খাওয়া শেষ হয়ে গেল, সে দিন শিয়ালনীকে নিয়ে অন্য জায়গায় শিয়াল পালিয়ে গেল।

বোকা কুমীর যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারল, তখন শিয়ালকে জব্দ করবার ফন্দি আঁটলে। নদীর ধারে কুমীর গিয়ে দেখল, শিয়াল আর শিয়ালনী সাঁতরে নদী পার হচ্ছে, কুমীর গিয়ে শিয়ালের পা কামড়ে ধরলে, শিয়ালনী আগেই ডাঙায় উঠে গিয়েছিল, শিয়াল সামনের দুটো পা ডাঙায় তুলেই বলতে লাগল, আমার লাঠিগাছটা নিয়ে কে টানা টানি করছে! এই শুনে বোকা কুমীর তার পা ছেড়ে দিলে, শিয়াল পালিয়ে গেল। কুমীর এবার নদীর চরায় মরার মত পড়ে রইল। শিয়াল আর শিয়ালনী কচ্ছপ খাবে বলে নদীর ধারে এগিয়ে এল। শিয়াল তো খুব চালাক। সে বললে, কুমীরটা বড্ড বেশী মরে গিয়েছে। অত মরা আমরা খাই না। কুমীর তখন তার লেজের আগাটুকু নাড়িয়ে দিল। এবার কাঁকড়া খেতে শিয়াল আর শিয়ালনী নদীতে এল, কুমীর সেখানে লুকিয়ে ছিল, শিয়াল তা টের পেয়ে বললে এত পরিষ্কার জলে আমরা কাঁকড়া খাই না, জল ঘোলা হলে তবে খাই, কুমীর তখন জল ঘোলা করল।

বারবার শিয়ালের কাছে ঠকে কুমীর মনের দুঃখে গর্তে এসে বসে রইল।

মন্তব্য

এইখানে শিয়াল চরিত্রটি সম্পর্কে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে—একটি অনুসারে শিয়াল পণ্ডিত, বিদ্যাদানের মত মহৎ কর্মে তাহার দক্ষতার কথা প্রকাশ পাইয়াছে; সেইজন্যই সন্তানগুলি লইয়া কুমীর তাহার নিকট আসিয়াছিল। আর একটি অনুসারে শিয়াল বিশ্বাসঘাতক। Sten Konow-র মতে বাংলার শৃগাল চরিত্রের এই দুইটি গুণ দুইটি স্বতন্ত্র দিক হইতে আসিয়াছে। একটি ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির দান, আর একটি নিষাদ বা Proto-Australoid জাতির দান। উভয়ের মিশ্র প্রভাব বশতঃ একই চরিত্রে মিশ্রগুণের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

খাঁচায় বাঘ

এক দুষ্টু বাঘ খাঁচায় বদ্ধ ছিল। সেই খাঁচার সামনে দিয়ে যেই যেত, তাকে সে নমস্কার করে বলত, একটিবার খাঁচা খুলে দাও। বাঘের এমন মধুর ব্যবহার দেখে অনেকে খাঁচা খুলে দিতে চাইত ; কিন্তু সাহসে কুলোতো না।

একদিন এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে ফলারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলেছেন। ব্রাহ্মণ বড় ভাল মানুষ, আর সরল। বাঘ তাঁকে দেখে বললে, ঠাকুর মশাই, খাঁচাটা খুলে দিন। ব্রাহ্মণ দয়াপরবশ হয়ে খাঁচা খুলে দিতেই বাঘ বললে, ঠাকুর মশাই, আমি তোমাকে খাব। ঠাকুর মশাই বললেন, এমন কথা তো কোনো দিন শুনি নি, যে উপকার করে তাকে বুঝি খায়। বাঘ বললে, জগতের নিয়মই হল, যে যার ভাল করে, তার অনিষ্ট সে আগে করে। তখন ব্রাহ্মণ বললে, বেশ তিনজন সাক্ষী যদি তোমার কথায় সায় দেয়, তবে তুমি আমাকে খেতে পার।

বাঘ বললে, বেশ, চলুন আপনার সাক্ষীর কাছে। ঠাকুর মশাই ক্ষেতের আল দেখিয়ে বললেন, এই আল আমার সাক্ষী। আলকে ঠাকুর মশাই যেই জিগ্যেস করলেন, বলতো উপকারীর উপকার করা উচিত কি না? আল বললে, আমি দুই চাষীর জমি পাহারা দেই ; কিন্তু তারাই আমাকে কাটে। অতএব উপকারীর উপকার করা উচিত নয়। ঠাকুর মশাই তখন এক বটগাছ দেখিয়ে বললে, এই বটগাছ আমার সাক্ষী। বটগাছও ঐ একই কথা বললে। বটগাছের ছায়ায় কতলোক আশ্রয় নেয় ; কিন্তু লোকে তার ডাল ভাঙ্গে, পাতা ছেঁড়ে, গুঁড়ি থেকে রস বা আটা বার করে নেয়। তাই তার মতে উপকারীর উপকার করা উচিত নয়। এমন সময় এক শিয়াল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শিয়ালকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হল। শিয়াল খুব চালাক। কিন্তু বোকার ভান করে বললে, ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। বাঘ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল না ঠাকুর মশাই খাঁচায় বদ্ধ ছিল তা তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তখন বাঘ, বামুন ঠাকুর আর শিয়াল সেই খাঁচার কাছে গেল। বাঘ রেগে গিয়ে শিয়ালকে দেখাতে গেল, কি ভাবে সে খাঁচায় ছিল। ধূর্ত শিয়াল তাড়াতাড়ি খাঁচায় হুড়কো টেনে দিলে। আর বামুন ঠাকুরকে বললে, দুষ্ট লোককে কখনও বিশ্বাস করা উচিত নয়। আর বললে, তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীতে যান, এখনো ফলারের ব্যবস্থা আছে। এই বলে শিয়াল চলে গেল।

৯

পিঠের সাধ

গৃহস্থদের ঘরের কোণে হাঁড়ি ঝোলানো থাকতো, তার ভিতর চড়াই আর চড়ানী বাসা করত। একদিন চড়াই বলল, চড়ানী, পিঠে খাবো। চড়ানী ময়দা, দুধ, কলা, গুড়, কাঠ জোগাড় করে আনতে বললে। চড়াই বনে গেল কাঠ আনতে। গাছের সরু সরু শুকনো ডাল মট মট করে ভাঙতে লাগল। সেই বনের ভিতর ছিল মস্ত এক বাঘ। ডাল ভাঙার শব্দ শুনে বাঘ বললে, মটমট করে ডাল ভাঙছো কেন, বন্ধু। বাঘ চড়াইকে বন্ধু বলতো। চড়াই বললে, হ্যাঁ বন্ধু। ডাল দিয়ে তুমি কি করবে? চড়ানী পিঠে তৈরী করবে। বাঘ বললে, আমি কখখনো পিঠে খাইনি, আমাকে খান কতক পিঠে দিও। চড়াই তাকে সব জোগাড় করে এনে দিতে বললে। বাঘকে চড়াই বললে, ময়দা, গুড়, কলা, দুধ, ঘি, হাঁড়ি, কাঠ সব চাই। বাঘ হাটে গিয়ে যেই হালুম করে ডাক ছেড়েছে, অমনি দোকানীরা যে যার দোকান ছেড়ে ছুট দিল। বাঘ পিঠের সব জিনিস জোগাড় করে ফিরল। তার পর চড়ানী ভারী চমৎকার পিঠে গড়ল। আর দুজনে খুব পেট ভরে খেলে। শেষে একখানা পাতায় খান কতক পিঠে বাঘের জন্যে ফেলে দিয়ে দু'জনে হাঁড়ির ভিতর লুকিয়ে রইল। বাঘ এসে পিঠে দেখতে পেয়ে খেতে বসে গেল। প্রথম পিঠেটি খেয়ে বললে, চমৎকার। দ্বিতীয় পিঠে খেয়ে বললে, না এটা তত ভাল নয়। আর এক খানা মুখে দিয়ে বললে, না, এটা শুধু ভুষি দিয়ে গড়েছে। আর একটিতে মুখ দিয়ে বললে, এটা কিসের গন্ধ,—নিশ্চয় গোবর দিয়ে গড়েছে।

এমন সময় হাঁড়ির ভিতর থেকে চড়াই বলছে, চড়ানী আমি হাঁচবো। শুনে চড়ানী বললে, খবরদার, হাঁচলে ভারী মুশকিল হবে। চড়াই আবার হাঁচতে গেল, চড়ানি তাকে থামাবার চেষ্টা করলে। বাঘ গোবর দিয়ে গড়েছে পিটে বলে থ্যাক থু করতে লাগল; আর মনে মনে বললে, ব্যাটা চড়াইকে পেলে চিবিয়ে খাব। আর একটা পিটে মুখে দিয়ে ওয়াক ওয়াক করতে গেছে, এমন সময় 'হ্যাঁ ছোঃ' করে চড়াই হেঁচে উঠল। বাঘ সেই শব্দে যেই চমকে লাফিয়ে উঠেছে অমনি হাঁড়ি শুদ্ধু দড়ি ছিঁড়ে চড়াই আর চড়ানী তার ঘড়ে পড়ল। বাঘ কিছুই বুঝতে পারলে না। আকাশ ভেঙে পড়ল কি, বাজ পড়ল। সে ল্যাজ গুটিয়ে ছুট দিল, ঘরে না গিয়ে থামল না।

কাকের সাধ

চড়াই আর কাকে খুব ভাব। দুজনে গৃহস্থের বাড়ীতে ধান আর লঙ্কা খেতে আরম্ভ করল। দু'জনের কথা হল, যে আগে খাবে সে অপরের বুক খেয়ে নেবে। কাকের লঙ্কা খাওয়া আগে হয়ে গেল। চড়াই ধীরে ধীরে ধান খেতে লাগল। কাক বললে, বন্ধু, এইবার! চড়াই বললে, বন্ধু হয়ে যদি বন্ধুর বুক খাও, তবে খেতে পার, তবে তুমি নোংরা টোংরা খাওতো, ঠোঁটটি ভাল করে ধুয়ে এস।

কাক ঠোঁট ধুতে গঙ্গায় গেল। তখন গঙ্গা বললে, তোর নোংরা ঠোঁট আমার গায়ে ছোঁয়াস নে, জল তুলে নিয়ে ঠোঁট ধো। তখন কাক কুমোরের বাড়ীতে গেল ঘটি আনতে। কুমোর বললো, মাটি আন, ঘটি গড়ে দি। তখন কাক গেল মোষের কাছে। মোষের শিঙ দিয়ে মাটি তুলবে। শুনে মোষ রেগে আগুন, কাককে সে তাড়া করলে। কাক তখন কুকুরের কাছে গেল, মোষকে মারবার জন্যে বললে। কুকুর বললে, দুধ আন, খেয়ে দেয়ে নিয়ে আগে গায়ে গতরে জোর করি তবে মোষ মারবো। তখন কাক গরুর কাছে গেল। গরু বললে, ঘাস আন তবে দুধ দেবো। শুনে কাক মাঠের কাছে গেল, মাঠ বললে ঘাস তো রয়েছে নিয়ে যা না। তখন কাক কামারের বাড়ী গেল, কামারকে কাস্তে দিতে বলল। কামার বললে, আগুন চাই, তবে কাস্তে গড়ে দেবো। তখন কাক গৃহস্থবাড়ী গেল। গৃহস্থ এক হাঁড়ি আগুন এনে বললে, 'কিসে করে নিবি'। বোকা কাক তার পাখা ছড়িয়ে বললে, এই আমার পাখার উপরে ঢেলে দাও। গৃহস্থ সেই হাঁড়ি শুদ্ধ আগুন কাকের পাখার উপর ঢেলে দিলে, আর কাক তখুনি পুড়ে মরে গেল।

মন্তব্য

ব্রহ্মদেশ হইতেও গল্পটি প্রায় আনুপূর্বিক একই ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। Maung Htin Aung, *Burmese Folk-tates*, Oxford, 1948, pp 141-145). বাংলা দেশ হইতেই ইহা আরাকানের পথে ব্রহ্মদেশে গিয়া থাকিবে।

১১

ভাগ্নের কীর্তি

এক শেয়াল। সে ভাবে, বাঘমামা, তোমাকে আমি মজা দেখাব। এদিকে নরহরি দাসের ভয়ে পুরোনে গর্তেও যেতে পারে না। অনেক কষ্টে নোতুন গর্তে সে বাসা করেছে। একদিন নদীর ধারে একটা মাদুর দেখতে পেয়ে সে টানতে টানতে একটা কুয়োর মুখে এনে রাখলে। তারপর বাঘকে গিয়ে বললে, মামা, আমার নূতন বাড়ী দেখতে গেলে না। বাঘ খুব খুশী হয়ে শেয়ালের বাড়ী দেখতে গেল। শেয়াল তখন তাকে মাদুরের ওপর বসতে দিলে। মাদুরের তলায় ছিল কুয়ো, বাঘ তখনই কুয়োর ভিতরে পড়ে গেল। শেয়াল বাঘকে বললে, জল খেয়ে পেট ভরাও। বাঘতো ভীষণ রেগে গেল। তারপর অনেক চেষ্টা করে কুয়ো থেকে উঠে এল। কুয়োর জল বেশী ছিল না আর তেমন গভীরও ছিল না।

এদিকে বাঘমামার ভয়ে শেয়াল পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে ক্ষিধের জ্বালায় তাকে ছটফট করে বেড়াতে হয়। তখন শেয়াল ঠিক করল, যতই হোক, বাঘ তো তার মামা। মামার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেবে। এই ভেবে সে বাঘের কাছে গেল এবং দূর থেকে বাঘকে ঘন ঘন প্রণাম করতে লাগল। বাঘতো তাকে দেখেই রেগে আগুন। শেয়াল তো অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে, মামা, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছেই এলুম ; এখন খেতে হয় আমাকে খাও। বাঘ তাকে খেলে না। কেবল জিগ্যেস করলে, তুই কেন আমায় কুয়োয় ফেলে দিয়েছিলি ?

শেয়াল বললে, আরে রাম রাম, ওখানে কুয়ো ছিল না, মাটিটা নরম ছিল। বাঘ তাই বিশ্বাস করলে।

একদিন নদীর ধারে এক কুমীর ডাঙায় শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। শেয়াল ছুটে, গিয়ে বাঘকে বললে, 'মামা, আমি একটা নৌকা কিনেছি। তুমি চড়বে এস'। বোকা বাঘ তাই বিশ্বাস করলে। যেই না কুমীরের পিটের উপর বসতে গেছে সেই সময়ে কুমীর বাঘের ঠাং ধরে জলের ভিতর নিয়ে গেল।

এখন শেয়াল ভারী খুশী। মনের আনন্দে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল।

মন্তব্য

বাংলার পারিবারিক জীবনে মামা ও ভাগিনেয়ের সম্পর্কের রহস্য বিষয়ে একটু ইঙ্গিত ইহাতে পাওয়া যায়।

১২

চিংড়ির বুদ্ধি

একটা চিংড়ি মাছ পদ্ম পাতায় রোজ তার চুল শুকায়। একদিন একটা কাক এসে বলল, আমি তোকে খাব। চিংড়ি মাছটা তখন বলল, চল, আগে পুঁটি মাছের কাছে বিচার করতে হবে। তারা তখন পুঁটি মাছের কাছে এলো। পুঁটি মাছ তাদের একটা সোনার আসনে আর একটা রূপার আসনে বসতে দিল। সোনার সিংহাসনে চিংড়ি মাছটা বসল, আর রূপার সিংহাসনে কাকটা বসল।

পুঁটি মাছ তখন ফৎ ফৎ করে চলে গেল চেং-মাছের ঘরে। চেং-মাছের ঘরে চিংড়ি মাছ ও কাকের ডাক পড়ল। চেং মাছ তিনটে আসন বসতে দিল। চেং-মাছ বিচার করে বলল, এবার কাঁকড়াকে ডাকতে হবে।

তখন কাঁকড়াকে ডাকা হল বিচার করতে। কাঁকড়া তখন বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। এসে সামনে দেখতে পেল কাককে। তখন কাঁকড়া কাকটার মাথাটা মচকে কাকটাকে মেরে ফেলল। চিংড়ি মাছটা তখন জলের তলায় পালিয়ে গেল।

— বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৬৫

মন্তব্য

বাংলার লোক-কথায় কাক ধূর্ত এবং লোভী; কিন্তু লোভ পূর্ণ করিবার পক্ষে কাকের বার বার বাধা সৃষ্টি হয়, কখনই পূর্ণ করিতে পারে না; ক্ষুদ্রতর জীবের নিকট সর্বদাই সে পরাজিত হয়। একবার চড়ুইয়ের নিকট শোচনীয়-ভাবে পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে শুনা গিয়াছিল; এইবার চিংড়ির নিকট পরাজয় ও মৃত্যুবরণ করিল। ক্ষুদ্র এবং অসহায়ের মধ্যে বুদ্ধির সন্ধান বাংলা লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়।

১৩

দুই চোর

এক গ্রামে দুইটি চোর বাস করিত। তাহারা সৎভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য বহুদূরে এক গ্রামে গেল। তাহারা এক গৃহস্থের বাড়ীতে চাকুরী লইল। একজন গরু চরাইত, একজন গাছে জল দিত। প্রথম দিনেই তাহারা নিজেদের কাজে নাস্তানাবুদ হইয়া গেল; কিন্তু কেহ কাহাকেও কিছু জানাইল না। পরদিন তাহারা কাজ বদল করিয়া লইল এবং বুঝিল দু'জনেই দু'জনকে ঠকাইয়াছে, আসলে কোন কাজই প্রীতিপ্রদ নয়।

সেই রাতে তাহারা চিন্তা করিল যে, চাঁপা গাছের জল যতই ঢালা যায়, তাহাতে মাটি ভেজে না, নিশ্চয়ই তাহার নীচে গর্ত করা আছে। এই চিন্তা করিয়া তাহারা কোদাল লইয়া মধ্যরাত্রে চাঁপাগাছের গোড়া খুঁড়িতে লাগিল। ছোট চোর প্রথম বুঝিতে পারিল যে, ইহার নীচে ঘড়া-ভর্তি সোনার মোহর আছে। কিন্তু বড় জনকে কিছু বলিল না। দু'জনে আসিয়া শুইয়া পড়িল। ছোট চোর ঘুমাইলে, বড় চোর উঠিয়া গেল এবং ঘড়া দুইটি তুলিয়া পুকুরের পারে পুঁতিয়া রাখিল। বড় চোর ঘুমাইলে ছোট চোর খোঁজাখুঁজি করিয়া ঘড়ার সন্ধান পাইল এবং একটি গরু চুরি করিয়া ঘড়া চাপাইয়া গ্রামের দিকে চলিল। বড় চোর সকালে উঠিয়া ব্যাপারটি বুঝিয়া ছোট চোরেব অনুসন্ধান করিতে চলিল।

বড় চোর ছোট চোরের সন্ধান পাইল এবং পথের মধ্যেই তাহাকে বোকা বানাইয়া নিজেই গরু সমেত গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট চোরও তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। শেষে দুইজনে সমস্ত মোহর সমান সমান ভাগ করিয়া লইতে সম্মত হইল। কিন্তু ভাগ করিতে যাইয়া দেখা গেল, একটি মোহর বেশী হইতেছে। অনেক তর্কের পর ঠিক হইল যে, রাতের মত উহা বড় চোরের নিকট থাকিবে; পরদিন প্রাতে উহা ভাঙাইয়া যে টাকা পাইবে, তাহা দুইজনে ভাগ করিয়া লইবে।

বড় চোর মোহরের অংশ ফাঁকি দিবার জন্য নিজে মড়ার মত পড়িয়া রহিল এবং স্ত্রীকে বিলাপ করিতে বলিল। ছোট চোর সকালে আসিয়া ব্যাপারটা বুঝিল এবং পায়ে দড়ি বাঁধিয়া বড় চোরকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া

চলিল। পথের ইট-পাথরে বড় চোরের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল; তথাপি সে একটি মোহরের অংশ ছাড়িতে রাজী হইল না, নীরবে সকল সহ্য করিল।

শ্মশানে আসিয়া ছোট চোর ভাবিল, আগুন আনিতে গেলে, নিশ্চয়ই বড় চোর পলাইয়া যাইবে। তাই সে একটি গাছের ডালে সেই ভান-করা মৃতদেহটি ঝুলাইয়া রাখিল। এমন সময় একদল ডাকাত মৃতদেহ দেখিয়া খুশী মনে ডাকাতি করিতে গেল। এক বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রচুর ধন-সম্পত্তি ডাকাতি করিয়া সেই শ্মশানে ফিরিয়া আসিল। মৃতদেহটিকে সেইরূপ ঝুলিতে দেখিয়া তাহারা তাহা নামাইয়া দাহ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় মৃতদেহটি বিকট চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট চোরও ওইরূপ চীৎকার করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িল। ডাকাতেরা ইহাতে ভীষণ ভয় পাইয়া গেল এবং যে-যেখানে পারিল পলাইয়া গেল। তখন দুই চোর অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল এবং ডাকাতদের সমস্ত লুণ্ঠিত ধন-সম্পত্তি ভাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। তার পর আর তাহাদের চুরি করিতে হয় নাই।

কালক্রমে দুই চোরের দুইটি ছেলে হইয়াছিল। তাহাদের চৌর্য-বিদ্যা শিক্ষার বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। বড় চোরের ছেলে অল্পকাল মধ্যেই সেরা কৌশলী চোর হইয়া উঠিল। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য এক চাষীর খড়ের চালের উপরে ফলন্ত একটি লাউ চুরি করিয়া আনিবার জন্য পাঠান হইল। এক গাছি দড়ি এবং একটি বিড়াল লইয়া সে চুরি করিতে গেল। সে চালে উঠিতেই চাষীর স্ত্রী জাগরিত হইল। কিন্তু বিড়ালের ডাক শুনিয়া চাষী সন্দেহ করিল না। এইভাবে যুবক চোর লাউটি কাটিয়া আনিল।

কিন্তু তাহার পিতা পুত্রকে আরও পরীক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিল, তাহাদের রাণীর গলা হইতে হারটি চুরি করিয়া আনিতে হইবে। যুবক চোর তাহাতেও রাজী হইল। সে অত্যন্ত কৌশলে চারিটি সিংহ-দরজার রক্ষীদের ফাঁকি দিল। পেরেক পুঁতিয়া পুঁতিয়া চারতলায় রাণীর শয়নঘরে উপস্থিত হইল। রাণীর দাসীকে হত্যা করিয়া ঘুমন্ত রাণীর গলার হার চুরি করিল এবং দাসীর পোশাক পরিয়া প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পিতা ইহা দেখিয়া হতবাক্ হইলেন এবং পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন।

পরদিন রাজা রাণীর শয়নঘরে হত্যা এবং রাণীর গলার হার চুরি গিয়াছে দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইলেন। একটি উটের পিঠে দুইটি মোহরের থলি

দিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন এবং রাণীর গলার হার যে চুরি করিয়াছে, সাহস থাকে তো সে যেন উহা গ্রহণ করে এইরূপ প্রচার করিলেন। দুইদিন উট শহরে ঘুরিয়া বেড়াইল। তৃতীয় দিনে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে যুবক চোর উট-চালককে গাঁজা খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিল এবং উট লইয়া পলাইয়া গেল। পরে উটটিকে বধ করিয়া মাটিতে কবর দিল।

উট সমেত মোহরের থলি চুরি গিয়াছে শুনিয়া রাজা ক্রোধে উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। তিনি লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। এইবার ছোট-চোরের ছেলে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া, বড় চোরের বাড়ী আসিল এবং উটের মাংসের খোঁজ করিল। যুবক চোরের স্ত্রী কবরের মাটী খুঁড়িয়া ছোট চোরের পুত্র চোরকে একটু উটের মাংস দিল। ছোট চোর সমস্ত বুঝিয়া রাজার নিকট যাইয়া জানাইয়া দিল যে, সে চোরের সন্ধান পাইয়াছে। সেই রাত্রেই যুবক চোর এবং তাহার পিতাকে বন্দী করা হইল। যুবক চোর তাহার সকল দোষ স্বীকার করিল এবং যে তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে, সে এবং তাহার পিতাও যে চোর, তাহার বহু প্রমাণ দিল। রাজা সনাক্তকারীকে লক্ষ টাকা দিলেন বটে; কিন্তু চারটি গর্ত করিয়া, দুই প্রবীণ ও দুই নবীন চোরকে জীবন্ত কবর দিলেন।

মন্তব্য

পূর্বেই বলিয়াছি, চোরের গল্প বুদ্ধির বিশেষতঃ উপস্থিত বুদ্ধিরই গল্প। বুদ্ধির অনেকগুলি অভিপ্রায় ইহতে প্রকাশ পাইয়াছে। চাঁপা গাছের নীচে জল ঢালিতে গিয়া সেই জল যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায় তাহা সে দেখিতে পাইল না, বরং তাহাতে বুঝিতে পারিল, ইহার কিছু রহস্য আছে, ইহা এ'দেশের লোককথার একটি সাধারণ অভিপ্রায় মাত্র। এই প্রকার অবস্থায় গর্ত খুঁড়িয়া মোহরের ঘড়া এবং কোন কোন সময় সর্পের গর্তও পাওয়া যায়। অবশ্য সর্পও ধনের অধিপতি; সুতরাং ইহাদের অভিপ্রায় অভিন্ন। চোর যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, চোরের স্ত্রীরা সাধারণতঃ বোকা এবং সরল হইয়া থাকে। সেই-জন্য ছোট চোরের স্ত্রী কবর খুঁড়িয়া উটের মাংস বাহির করিয়াছিল। পাপ-কর্মের শাস্তি (misdeed punished) না হইয়া যায় না। এখানেও তাহা হইয়াছে।

কাঠুরিয়ার মুক্তি

এক আঁটকুড়ে কাঠুরিয়া-বউ আচারনিয়ম ব্রত-উপাস করিয়া মা ষষ্ঠীর তলায় হত্যা দিয়া পড়িল। ষষ্ঠী রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিলেন, বলিলেন—"তেল সিন্দুরে নাইবি, শশা পাইলে শশা খাইবি। তবেই বুক জুড়ানো সোনার ছেলে কোলে পাইবি।" ভোর রাত্রে উঠিয়া কাঠুরিয়া-বউ নাইয়া মা ষষ্ঠীর ঘটে তেল সিন্দুর দিয়া আসিল। সেইদিন কাঠ কাটিতে গেলে এক বুড়ী কাঠুরিয়াকে একটি শশা দিল। বলিল—"বউকে বলিস, এই শশা সাত দিন পরে খেতে—কিছু যেন না ফেলে।" বউ মনের আনন্দে পাওয়া মাত্র বোঁটা সোটা ফেলিয়া শশাটি খাইয়া ফেলিল। কাঠুরিয়া জানিতে পারিয়া বউকে তিরস্কার করিল—"এ কি করেছিস তুই, বোঁটা কেন ফেলেছিস, শীগগির খেয়ে নে।" কাঠুরিয়া-বউ তাড়াতাড়ি বোঁটাটিও তুলিয়া খাইয়া ফেলিল।

কাঠুরিয়া-বউ-এর ছেলে হইল—এক দেড় আঙ্গুলে ছেলে, তিন আঙ্গুল তার টিকি। কাঠুরিয়া রাগ করিয়া কুড়াল হাতে এক দিকে চলিয়া গেল। বউও ছেলের মুখ দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর জলে ঝাঁপ দিতে চলিল। দেড় আঙ্গুলে ছেলে দৌড়িয়া আসিয়া তিন আঙ্গুলে টিকি দিয়া মায়ের পা জড়াইয়া বলিল—"মা, মা, আমায় একটু দুধ দে।" ছেলের কীর্তি দেখিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া কাঠুরে বউ ছেলে কোলে তুলিয়া লইল। পেট পুরিয়া দুধ খাইয়া ছেলে বলিল—"মা, আমি এবার বাবাকে আনতে চললাম।"

কাঠুরিয়া রাজার বাড়ী কাঠ কাটিতেছে, সেখানে পিতাপুত্রে মিলন হইল। দেড় আঙ্গুলে বলিল—"চল বাবা, বাড়ী চল।" কাঠুরিয়া বলিল—"কি করে যাব? আমি যে রাজার কাছে বিক্রি হয়ে গেছি। দেড় আঙ্গুলে রাজার কাছে চলিল। "রাজা মশাই, তোমার কাঠুরিয়াকে আমায় দিতে হবে।" রাজা বলিলেন—"কড়ি দিয়ে কাঠুরিয়া কিনেছি, আগে কড়ি নিয়ে আয়, তবে কাঠুরিয়া পাবি।" দেড় আঙ্গুলে কড়ি আনিতে চলিল।

এক খালের ধারে দেড় আঙ্গুলে বসিয়া ভাবিতেছে কি করিয়া পার হওয়া যায়। হঠাৎ পিছন হইতে টিকিতে এক টান—"দেড় আঙ্গুলে চটিয়া মটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে রে?" উত্তর হইল—"আমি ব্যাঙ, রাজার রাজপুত্তুর রঙ সুন্দর ব্যাঙ।" ক্রমে ব্যাঙের সঙ্গে দেড় আঙ্গুলের ভাব জমিয়া উঠিল। ব্যাঙ বলিল—"যদি কুড়ুল আনিয়া দিতে পারিস, তবে আমার এক কানা কড়ি আছে তা তোকে দিতে পারি।" দেড় আঙ্গুলে কুড়ুল আনিতে গেল।

এক ছোট ঘরে এক আড়াই আঙ্গুলে কামার, তিন আঙ্গুল তাহার দাড়ি। কামার দাড়ি নাড়িয়া নাড়িয়া এক পৌণে আঙ্গুল কুড়াল গড়িতেছে। দেড় আঙ্গুলে চুপি চুপি ঘরে ঢুকিয়া কামারের দাড়ির সঙ্গে নিজের টিকিটি বাঁধিয়া 'চ্যা ম্যাঁ' করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। কামার রাগিয়া আগুন। দেড় আঙ্গুলের টিকি খুলিতে গিয়া একটি চুল ছিঁড়িয়া গেল। সুযোগ পাইয়া দেড় আঙ্গুলে কামারের কুড়ুলটিই চাহিয়া লইল। বলিল, "কামার ভাই, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার মিতালি।"

কুড়ুল লইয়া দেড় আঙ্গুলে ব্যাঙ-রাজকুমারের কাছে আসিল। ব্যাঙ রাজপুত্র বলিল, ভাই, আমার বউ কুনোব্যাঙ ওই ভেরেণ্ডা গাছে লাউএর খোলসের মধ্যে, তাহার সঙ্গে আছে ঘাসের এক চাপাটি, আর এক সাতনলা। তুমি গাছটি কাটিয়া কুণোরাণীকে পাড়িয়া দাও।" দেড় আঙ্গুলে গাছটির গোড়া কাটিয়া দিল। তারপর খোলসের মধ্যে নিজের টিকিটি ঢুকাইয়া দিল। কুণোরাণী উঠিয়া আসিল। খুসী হইয়া ব্যাঙ নিজের কাণা কড়িটি দিয়া দিল। কুণোরাণী বলিল, "দেড় আঙ্গুলে, আমার এই থুথুটুকু লইয়া যাও। রাজার কাণা মেয়ের চোখ ফুটাইও।" সাতনলা ও খোলস বলিল—"আমাদেরও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও, রাজার কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে।"

রাজার কাছে আসিয়া দেড় আঙ্গুলে বলিল—"রাজামশাই, কড়ি গুণে নিয়ে কাঠুরেকে মুক্তি দাও।" রাজা কড়ি গুণিয়া লইয়া বলিলেন—"তের নদীর পারে সাত চোরের আবাস। সেই সাত চোরের সঙ্গে কানা রাজকন্যার বিয়ে দিব। সেই সাত চোরকে আগে এনে দে।" দেড় আঙ্গুলে ব্যাঙ বন্ধুর কাছ হইতে দুইটি কড়ি লইয়া সাত চোরের সন্ধানে বাহির হইল।

অনেক রাত্রে সাড়ে সাত চোর চুরি করিতে বাহির হইয়াছে। সাড়ে সাত চোরের আধখানা যে চোর, তাহার পা দেড় আঙ্গুলের ঘাড়ে পড়িল। দেড় আঙ্গুলে চোরের পায়ে কুড়ুলের এক কোপ বসাইয়া দিল। সাড়ে সাত চোরের সঙ্গে দেড় আঙ্গুলের পরিচয় হইল। সাড়ে সাত চোর সেদিন কামারের বাড়ী সিঁদ কাটিয়া চুরি করিতে যাইতেছে। দেড় আঙ্গুলে বলিল—"ভাই, ও বাড়ী যাসনে, সে বাড়ী শাঁকচুন্নী আছে। ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত শুষবে, তার চেয়ে চল্ রাজবাড়ী—রাজার মেয়ে বিয়ে করবি।" চোরেরা দেড় আঙ্গুলের সঙ্গে রাজার জামাই হইতে চলিল।

নদীর পারে গিয়া পাটনীকে এক কড়ি দিয়া উতাল পাতাল নদী পার হইল। নদী পার হইয়া যাইবার সময় সাড়ে সাত চোর আবার সেই কড়িটিই চুরি করিল। দেড় আঙ্গুলে রাজার দরজায় ঘা দিল—'রাজামশাই, খাট পালঙ্ক ছাড়, পার হইয়া পারের কড়ি দেয় নাই।' রাজা বলিলেন—'কে পারের কড়ি দেয় নাই, তারে শূলে চড়াও।' সাড়ে সাত চোর শূলে গেল। দেড় আঙ্গুলে বলল, 'রাজামশাই, কাঠুরে দাও'। রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'ব্যাটা বারে বারে ভ্যান্ ভ্যান্ করে জ্বালিয়ে দিল, ওকে শূলে দাও। শুনিয়াই দেড় আঙ্গুলে ছুট।' চোরের রাজা যত রাজ্যের যত চোর ছিল সবাইকে রাজপুরীতে পাঠাইল। চোরের উৎপাতে রাজ্য ছারখারে যায় যায়। একদিন দেড় আঙ্গুলে আসিয়া হাজির। 'রাজামশাই, আমি চোর তাড়াইতে পারি যদি রাজকন্যা পাই, আর পাই পুরীর রাজা হুলো বেড়ালটি, পোশাক আশাক আর হীরের পাগড়ী।' রাজা রাজী হইলেন। দেড় আঙ্গুলে পোশাক-আশাক পরিয়া সাতনলা হাতে, টিকির নিশান মাথায়, টিকিতে লাউ-এর খোলস বাঁধিয়া হুলো বেড়ালের পিঠে চোরের রাজ্যে হানা দিল। চোরেরা সবাই বাধা দিতে আসিল। নল চিরিয়া হাজার চুল এবং খোলস কাটিয়া ভীমরুল বাহির হইল; চোরেরা প্রাণের দায়ে সবাই দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া গেল। দেড় আঙ্গুলে বিজয়ী বীরের ন্যায় রাজার কাছে হাজির হইল। রাজাকে বলিল, 'রাজামশাই, কাঠুরে ও রাজকন্যা দাও।' রাজকন্যার সঙ্গে দেড় আঙ্গুলের বিবাহ হইল। পুষ্পরথে কাঠুরিয়া আসিল। দেড় আঙ্গুলে কুণোরাণীর থুথু দিয়া রাজকন্যার চোখ ফুটাইল। রাজা দেড় আঙ্গুলকে রাজ্য দিয়া তপস্যায় গেলেন।

মন্তব্য

ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক জন্ম অর্থাৎ শশা আহার করিয়া গর্ভ সঞ্চার, বিকলাঙ্গ সন্তানের জন্ম, বিকলাঙ্গ সন্তানের অপরিসীম বুদ্ধি, পুত্র কর্তৃক পিতার উদ্ধার „ইত্যাদি অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীমন্ত সদাগর বন্দী পিতার উদ্ধার এবং রাজকন্যা লাভ এক সঙ্গেই করিয়াছিল। ইহারও মূল অভিপ্রায় তাহাই। থুথুর ঐন্দ্রজালিক শক্তির কথাও লোক-কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়, এখানেও থুথু দিয়া রাজকন্যার চোখ ফুটাইয়া দিবার কথা আছে। কাহিনীটি 'ঠাকুমার ঝুলি' হইতে বাংলা দেশের সর্বত্র ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে।

১৫

বুড়ীর পরিত্রাণ

এক বুড়ী। সে পান্তাভাত খেতে খুব ভাল বাসত। কিন্তু চোর তার পান্তাভাত রোজ চুরি করে নিয়ে যেত। বুড়ী রাজার কাছে চলল নালিশ করতে। পথে যেতে যেতে নদীর ধারে এক শিঙি মাছের সঙ্গে দেখা হল। বুড়ীকে দেখে শিঙি মাছ বললে, আমাকে নিয়ে যেও, তোমার ভাল হ'বে। বুড়ী আচ্ছা বলে চলতে লাগল। বেলগাছতলায় একটি বেল পড়েছিল। বেল বললো, ফেরার সময় আমায় নিয়ে যেও, তোমার ভাল হবে। তারপর গোবর পথে পড়েছিল, গোবর বললে, আমায় নিয়ে যেও, তোমার ভাল হবে; একটি ক্ষুর বললে, আমায় নিয়ে যেও, তোমার ভাল হবে।

বুড়ী চলতে চলতে রাজবাড়ীতে পৌছে গেল। গিয়ে শুনলো, রাজা-মশাই বাড়ীতে নেই। তাই তার নালিশ জানানো হল না। বুড়ী বাড়ী ফেরার পথে ক্ষুর, গোবর, বেল আর শিঙি মাছ নিয়ে নিলে। ক্ষুর বললে, আমাকে ঘাসের উপর রাখো। বুড়ী তাই রাখলে। গোবর বললে, আমাকে দরজার কাছে রাখো, তাই বুড়ী করলে। বেল বললে, আমাকে উনুনের ভিতর রাখো। বুড়ী উনুনের ভিতর বেল রাখলে। শিঙি মাছ বললে, আমাকে পান্তাভাতের ভিতরে রাখ। বুড়ী সেই মত কাজ করলে।

বুড়ী খেয়ে দেয়ে রাত্রিতে শুতে গেল। চোর এসে প্রথমে যেই হাঁড়ির ভিতর হাত দিয়েছে, অমনি শিঙি মাছ তার হাতে কাঁটা ফুটিয়ে দিলে, যেই উনুনের কাছে গেছে, অমনি বেল ফটাশ করে ফেটে তার চোখে মুখে জ্বালা ধরালো, যেই দরজা দিয়ে বেরোতে যাবে, গোবরে পা পিছলে পড়ে গেল। গোবর মোছবার জন্যে যেই ঘাসে পা মুছতে গেছে, অমনি ক্ষুরে পা কেটে গেল। অমনি সবাই এসে চোরকে ধরে ফেললো।

মন্তব্য

বুড়ী অসহায় চরিত্র, বহু লাঞ্ছনার ভোগী। মানুষ তাহার অসহায় অবস্থা লইয়া কৌতুক করে। কিন্তু প্রকৃতি তাহাকে সাহায্য করে। অসহায়ের প্রতি সহানুভূতির ভাবই ইহাতে প্রধানত ব্যক্ত হইয়াছে। 'টুনটুনির বই' অবলম্বন করিয়া কাহিনীটি বাংলাদেশে সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে।

বকের রাঁধুনি

এক বুড়ী। তার মাথায় ছিল ভয়ানক উকুন। একদিন বুড়োকে ভাত দিতে গিয়ে অনেক উকুন ঝরে পড়ল ভাতে। বুড়ো রেগে গিয়ে বুড়ীকে মারলে। বুড়ী মনের দুঃখে নদীর ধার ধরে চলতে লাগল। এক বক নদীর চড়ায় ছিল। সে বললে, বুড়ী, তুই কাঁদিস কেন। বুড়ী তার দুঃখের কথা বললে। বক উকুন খেতে খুব ভালবাসে, বুড়ীকে রাঁধুনি রাখলে। একদিন এক বড় শোলমাছ নদী থেকে নিয়ে এসে বুড়ীকে রান্না করতে বললে। বুড়ী রাঁধ্‌তে গিয়ে মাথা ঘুরে উনুনে পুড়ে মরে গেল। বক এসে দেখলে বুড়ী পুড়ে মরে গেছে। বকের ভারী দুঃখ হল। নদীর ধারে সাতদিন বসে রইল উপোস করে, খায় না, দায় না। নদী বকের দুঃখ দেখে জিগ্যেস করলে, কি ভাই, বক, খাও না, দাও না, কি ব্যাপার ? বক বললে, যদি বলি তোমার জল ফেনিয়ে যাবে। নদী বললে, যাক্‌ গে। বক তার দুঃখের কথা বলতেই নদীর জল ফেনিয়ে গেল।

এক হাতী নদীতে জল খেতে আসত। সে নদীকে জিগ্যেস করল, নদীর জল ফেনিয়ে গেল কেন ? নদী বললে, যদি বলি তোমার ল্যাজ খসে যাবে। হাতী বললো, তা যাক্‌ তুমি বল। বলতেই তার ল্যাজ খসে গেল। এক গাছতলা দিয়ে হাতী যাচ্ছিল। গাছ তাকে যেই জিগ্যেস করলো, তার ল্যাজ নেই কেন, তখন হাতী বললো, যদি বলি তোমার পাতা ঝরে যাবে। গাছ বললো, যাক্‌ গে, বলতেই গাছের পাতা ঝরে গেল।

সেই গাছে ছিল এক ঘুঘুর বাসা। ঘুঘু খাবার খুঁজতে গিয়েছিল, সে বললে, গাছ, তোর পাতা নেই কেন ? গাছ বললো, যদি বলি, তবে তোর চোখ কানা হবে। যেই গাছ বললে, অমনি ঘুঘুর চোখ কানা হয়ে গেল। ঘুঘু যখন মাঠে চরতে গেছে, রাজার বাড়ীর রাখাল তাকে দেখে বললে, কিরে ঘুঘু, তোর চোখ কানা হল কেন ? ঘুঘু বললে, যদি বলি, তবে তোমার হাতে লাঠি আটকে যাবে। রাখাল বললে যাক্‌গে। বলতেই রাখালের হাতে লাঠি আটকে গেল।

রাজার বাড়ীর দাসী ভাঙা কুলো করে ছাই ফেলতে এসেছিল। সে রাখালকে দেখে বললে, কিরে, অমন করে হাত ঝাড়ছিস কেন, কি হয়েছে তোর হাতে ? রাখাল বললে, সে কথা বললে তোমার হাতে ভাঙা কুলো

আটকে যাবে। দাসী বললো, ঈস, যায় যাবে তুই বল। যেই বলা, ভাঙা কুলো তার হাতে আটকে গেল।

রাজবাড়ীতে যেতে রাণী দাসীকে জিগ্যেস করলে, কিরে কুলোটা হাত থেকে নামাচ্ছিস না কেন? দাসী বললে, যদি বলি তা হলে আপনার থালাটা হাতে আটকে যাবে। ঠিক সেই সময় রাজার ভাতের থালা নিয়ে রাজাকে খেতে দেবার জন্যে রাণী যাচ্ছিলেন। রাণী বললে, তুই বল। অমনি থালা আটকে গেল।

রাজামশাই খেতে এলেন। রাণীকে জিগ্যেস করলেন, হাতে থালা কেন? রাণী বললেন, যদি বলি, তবে তুমি পিঁড়েতে আটকে যাবে। রাজা শুনেই তো হো হো করে হেসে উঠলেন। রাণী যেই না বলেছেন, রাজা আটকে গেলেন পিঁড়িতে। সভায় তাঁকে পিঁড়ি করে নিয়ে যাওয়া হল। সভার লোকজনের খুব হাসি পেল, কিন্তু কেউ হাসতে পারলে না। রাজা বুঝতে পারলেন, বললেন, যদি ব্যাপারটি বলি তা'হলে আপনারাও যে যেখানে বসে আছেন, সেখানে আটকে যাবেন। সভার লোকেরা বললে, আপনার যখন ঐ অবস্থা আমাদের হলে আর ক্ষতি কি? রাজা তখন ব্যাপারটি বললেন।

একথা বলতেই তারা আটকে গেল। এমন করে তারা তক্তপোশে আটকে গেল যে ওঠবার সাধ্যি রইল না। ভাগ্যিস সেই দেশে এক নাপিত ছিল। সে ছুতোর ডেকে আনল। ছুতোর পিঁড়ি কেটে রাজা মশাইকে ছাড়ালে। তক্তপোশ কেটে সভার লোকজনকে ছাড়ালে। তবু একটু আধটু কাঠকুটো সকলের গায় লেগে রইল।

রাণীর হাতের থালা, দাসীর হাতে কুলো আর রাখালের হাতের লাঠিও কেটে ফেলা হল।

মন্তব্য

সহানুভূতি-সম্পন্ন পশুপক্ষী ইহার মূল অভিপ্রায়। ইহা একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক-কথা, একই অভিপ্রায় ক্রমাগত নূতন দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়াই চলিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সকল কিছুরই একভাবে মীমাংসা হইয়া যায়।

বুড়ীর বুদ্ধি

এক বুড়ী, সে কুঁজো। লাঠি ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে চলত, আর তার মাথাটা খালি ঠক্ ঠক্ করে নড়ত। বুড়ীর গঙ্গা আর যমুনা নামে দুটি কুকুর ছিল। বুড়ী নাতনীর বাড়ী যাবার সময় বলে গেল, তোরা যেন বাড়ী আগলাস, কোথাও যাসনে।

বুড়ী যখন লাঠি ঠুকে ঠুকে নাতনীর বাড়ী চলেছে, তখন এক শিয়াল তাকে দেখতে পেয়ে বললে, বুড়ী, তোকে খাব। বুড়ী বললে, দাঁড়া আগে নাতনীর বাড়ী থেকে খেয়ে-দেয়ে মোটা হয়ে আসি, তখন খাস, এখন তো শুধু হাড় আর চামড়া খাবি। শিয়াল বললে, আচ্ছা। পথে যেতে কুঁজো বুড়ীকে দেখে বাঘ বললে, তোকে খাব। বুড়ী, সেই কথা বললে, খাস না, আগে নাতনীর বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে মোটা হয়ে আসি। শুনে, বাঘ খুসী হয়ে চলে গেল। তার পর এক ভল্লুকের সঙ্গে দেখা হল, সেও বুড়ীকে খেতে চাইল। বুড়ী তাকে সেই একই কথা বললে।

নাতনীর বাড়ী গিয়ে দই আর ক্ষীর খেয়ে বুড়ী খুব মোটা হল, আর একটু মোটা হলেই সে ফেটে পড়তো। নাতনীকে বুড়ী বললে, এবার বাড়ীতে তো আমি যেতে পারবো না, আমায় গড়িয়ে যেতে হবে, পথে ভাল্লুক, শিয়াল, বাঘ হাঁ করে বসে আছে খাবে বলে। নাতনী বললে, ভয় কি দিদিমা, তোমাকে লাউয়ের খোলার ভিতর পুরে দেবো, কেউ বুঝতেই পারবে না। বলে সে বুড়ীকে খোলার ভিতর পুরে দিলে, সঙ্গে দিলে চিঁড়ে, তেঁতুল। তারপর লাউএ দিলে ধাক্কা, লাউ গড়াতে গড়াতে চলল।

পথে ভালুক লাউটাকে নেড়ে দেখলে, কিছুই বুঝতে পেলে না। ভাবলে বুড়ী চলে গেছে। তখন সে রেগে গিয়ে এক ধাক্কা দিল। বাঘও তাই ভাবলে, সেও মারলে এক ধাক্কা। শিয়াল ভারী চালাক। সে লাউ ভেঙে বুড়ীকে দেখতে পেল। বললে, বুড়ী তোকে খাব। বুড়ী বললে, খাবি বৈকি, আগে দুটো গান শুনবিনে। শিয়াল রাজি হল, বুড়ী বললে, চল ঐ ঢিপিটায়। বুড়ী গানের সুর ধরে চেঁচিয়ে বললে, 'আয় আয় গঙ্গা তু-উ-উ-উ-উ।'

অমনি বুড়ীর দুটো কুকুর ছুটে এল। একটা শিয়ালের ঘাড়, আর একটা শিয়ালের কোমর ধরে টান দিল। শিয়ালের ঘাড় ভাঙলো, কোমর ভাঙলো, জিব বেরিয়ে গেল, প্রাণটাও বেরিয়ে গেল, তবু তারা টানছে তো টানছেই।

মন্তব্য

বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পশু ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। বুড়ী শক্তিহীন এবং অসহায় বলিয়া বুদ্ধি দ্বারাই তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এখানেও সে নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারাই সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইল। পশু অনেক সময় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, অনেক সময় হিংস্র অথবা বিশ্বাসঘাতক। পূর্ববর্তী একটি কাহিনীতে পশুর সহানুভূতিশীলতার কথা শুনিয়াছি। এখানে হিংস্রতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। 'টুনটুনির বই'রে স্থান লাভ করিয়া কাহিনীটি ব্যাপক প্রচারলাভ করিয়াছে।

দুখুর সুখ

এক তাঁতীর দুই স্ত্রী। বড় স্ত্রীর মেয়ে সুখু, ছোট স্ত্রীর মেয়ে দুখু। সুখু আর সুখুর মা সুখে থাকে, খায় দায় আর দুখু ও দুখুর মাকে গঞ্জনা দেয়। দুখু আর দুখুর মা সুতা কাটিয়া কোন রকমে সংসার চালায়, চারিটি পেটের অন্ন জোগাড় করে।

একদিন নেতিয়া পড়া তুলা রৌদ্রে দিয়া দুখু আগলাইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় দমকা হাওয়া দুখুর তুলা উড়াইয়া লইয়া গেল। দুখু কাঁদিয়া ফেলিল। বাতাস বলিল, 'দুখু, আমার সঙ্গে আয়, তুলা দেবো'। দুখু বাতাসের পিছু ছুটিল। পথে চলিতে চলিতে এক গাই দুখুকে বলিল, 'দুখু, আমার গোয়ালটা কাড়িয়া দিয়া যাবি?' দুখু গোয়াল কাড়িয়া, গাইয়ের খড় জল দিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে এক কলাগাছ বলিল, দুখু, আমাকে লতাপাতায় ঘিরেছে, এগুলি ছাড়িয়ে দিয়ে যাও।' দুখু থামিয়া তাহা করিয়া দিল। আবার খানিক দূরে গেলে সেওড়াগাছ বলিল, দুখু, আমার তলটা পরিষ্কার ক'রে দেবে? দুখু গাছের তলা পরিষ্কার করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। একটু চলিতেই ঘোড়া বলিল, 'দুখু, আমায় একটু ঘাস দিয়ে যাবে?' দুখু ঘোড়াকে ঘাস দিয়া বাতাসের সঙ্গে চাঁদের মা বুড়ীর বাড়ী আসিয়া হাজির।

বুড়ীকে প্রণাম করিয়া দুখু তুলা চাহিল। বুড়ী বলিল, 'আগে স্নান খাওয়া কর, তারপর তুলো দেবো এখন'। বুড়ীর ঘরে কত ভালো ভালো শাড়ী গামছা। দুখু সে সবে হাতও দিল না। যেমন তেমন ছেঁড়া নাতা লইয়া এক চিমটি ক্ষার খৈল হাতে সে নাইতে গেল। জলে এক ডুব দিতেই দুখুর রূপ যেন আর ধরে না, অত রূপ বুঝি দেবকন্যারও নাই। আর এক ডুব দিতে দুখুর অঙ্গে অঙ্গে গয়না। সোনা ঢাকা অঙ্গে দুখু খাবার ঘরে গিয়া দেখে ঘরে কত ভাল ভাল খাবার। দুখু সব ফেলিয়া চারটি পান্তা খাইয়া বুড়ীর কাছে আসিল। বুড়ী বলিল, 'ওই ঘরে পেঁটরায় তুলা আছে, নাও গে।' দুখু ঘরে গিয়া দেখে কত পেঁটরা। দুখু সব চাইতে ছোট একটি পেঁটরা লইয়া চাঁদের মা বুড়ীকে প্রণাম করিয়া রূপে পথ ঘাট আলো করিয়া বাড়ীর পথ ধরিল। পথে ঘোড়া তাহাকে খুব তেজী এক পক্ষীরাজের বাচ্চা দিল, সেওড়া গাছ এক ঘড়া মোহর দিল, কলা গাছ মস্ত এক ছড়া সোনার কলা দিল। গাই এক কপিলা লক্ষণ বকনা দিল। বাড়ী আসিলে মা ছুটিয়া আসিয়া দুখুকে বুকে নিল। দুখু সব কথা মাকে

বলিল। দুখুর মা সুখুকে কতক দিতে চাহিল। সুখুর মা মুখ ঝামটা দিয়া ফিরাইয়া দিল। রাত্রে দুখুর ছোট পেঁটরা হইতে তাহার রাজপুত্র বর বাহির হইল। দুখু ও দুখুর মার দুঃখ দূর হইল।

পরদিন সুখুর মা তুলা রোদে দিল। বাতাস আসিয়া সুখুর তুলা উড়াইয়া নিল। সুখুও বাতাসের পিছু ছুটিল। পথে গাই ডাকিল, কলাগাছ, শেওড়া গাছ, ঘোড়া সকলেই ডাকিল, সুখু কাহারো ডাকে সাড়া দিল না। বলিল, 'আমি চাঁদের মা বুড়ীর বাড়ী তুলো আনতে যাচ্ছি।'

চাঁদের মা বুড়ীর বাড়ী আসিয়া সুখু বুড়ীকে এক ধমক দিল। বুড়ী তাহাকেও স্নান আহারে পাঠাইল। সুখু সব চাইতে ভাল শাড়ীটি, গামছাটি, সুবাস তেল, চন্দনের বাটি যত সব লইয়া স্নান করিতে গেল। জলে নামিয়া এক ডুবে অপরূপ সৌন্দর্য, আর এক ডুবে একগা গহনা, আর এক ডুবে না জানে আরো কত কি পাওয়া যাইবে। সুখু আর এক ডুব দিল। তিন ডুবে গা ভরা আঁচিল, ঘা পাঁচড়া, শনের গোছা চুল, কদর্যরূপ। কাঁদিতে কাঁদিতে সুখু বুড়ীর বাড়ী আসিয়া খাইতে বসিল। তারপর খাবলে খাবলে সব ভালো খাবার খাইয়া, সব চাইতে বড় পেঁটরাটি মাথায় করিয়া বুড়ীর মুণ্ডু পাত করিতে করিতে বাড়ীর পথ ধরিল। পথে ঘোড়া এক লাথি মারিল, সেওড়া গাছের এক ডাল ও কলাগাছের এক কাঁদি কলা মটাস্ করিয়া ভাঙিয়া পিঠে পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সুখু বাড়ী ফিরিল। মাথায় চেলাকাঠের ঘা মারিয়া সুখুর মা মরিয়া গেল।

মন্তব্য

আমাদের সাধারণ বিশ্বাস, চাঁদের মধ্যে এক বুড়ী বসিয়া সুতা কাটে, হাওয়ায় ভাসিয়া তুলা তাহার নিকট হইতে আসে, তাহার নিকটে যায়। এখানে সুখু সততার পুরস্কার লাভ করিল। বুদ্ধি অপেক্ষা সততাই কাহিনীটির অভিপ্রায়।

ধুতুয়া

এক বুড়ী থাকে। তার এক বেটা থাকে। বেটার নাম ধুতুয়া। ধুতুয়া বনে হাল বাইতে যায়। তখন ধুতুয়ার মা তাকে ভাত রেঁধে দেয়। ঐখানে একটা বনে একটা শিয়াল থাকত। শিয়ালটা রোজ এসে ধুতুয়ার ভাতটা খেয়ে চলে যায়, আর মাড়টা রেখে যায়। ধুতুয়া রোজ বাড়ী ফিরে এসে ভাত চায় তার মার কাছে। মা বলে শিয়ালটা খেয়ে গেছে।

একদিন ধুতুয়া তার মাকে বলল, আমি ভাত রাঁধব, তুই হাল বাইতে যাবি। তাই হল। ধুতুয়া ভাত রাঁধতে বসল, সামনে একটা কাপড় টানিয়ে দিল। এমন সময় শিয়ালটা এল। বলল, এই বুড়ী, ভাত নামা, নামা। তখন ধুতুয়া লাঠি তুলে ধরল। তখন শিয়ালটা রেগে গিয়ে বলল, দাঁড়া, আমি তোর ছাগল খাব। ধুতুয়া তখন ছাগল গোহালে লাঠি নিয়ে বসে রইল। রাত্রি বেলা শিয়ালটা এলো। তখন ধুতুয়া আড়াল থেকে তেড়ে এল। শিয়ালটা পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে আবার এল। তখন ধুতুয়া আস্তে আস্তে এসে তাকে মেরে তাড়িয়ে দিল। তখন শিয়ালটা বলল, আচ্ছা, আমি তোর কুকড়া (মুরগী) খাব; বলে চলে গেল।

তখন ধুতুয়া তার মাকে বলল, 'মা, তুই একটা কাজ কর'। মা বলল, 'কি করব বল'। তখন ধুতুয়া ওর মাকে বলল, 'তুই বনের কাছে গিয়ে খুব জোরে কাঁদবি। বলবি আমার ধুতুয়া মরে গেছে'। বুড়ী তখন বনের ধারে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগল। তখন শিয়ালটা এসে জিজ্ঞেস করল, 'ও বুড়ী, তোর কি হয়েছে?' তখন বুড়ী বলল, 'আরে, আমার ধুতুয়া মরে গেছে।' পরশু ধুতুয়ার ঘাটকাম হবে তুই খাস।' শিয়াল বলল, 'আচ্ছা বুড়ী, আমি ঠিক যাব।'

ঘাটকামের দিন শিয়াল তো এসেছে বুড়ীর বাড়ী। ধুতুয়া ঘরের ভিতরে লুকিয়ে আছে। তখন বুড়ী বলল শিয়ালকে, 'আয় ঢেঁকীঘরের কাছে আমার কুকড়া রেখেছি, তুই খাবি আয়।' শিয়াল খুব খুশী। ঢেঁকীঘরের দিকে গেল। আর সেখানে ধুতুয়া রেখেছিল ফাঁদ পেতে। যেই শিয়াল পা দিয়েছে, অমনি

ফাঁদে গেছে পা আটকে। তখন ধুতুয়া এসে বলছে, 'ও শিয়াল, খা আমার কুকড়া পা।' শিয়াল তখন কিছুই বলতে পারে না।

কয়েক দিন গেছে শিয়াল ফাঁদে আটকে আছে। একদিন আরেকটা শিয়াল এসে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কেমন আছিস্'। ঐ শিয়ালটা বলল, 'আমি খুব ভাল আছি। রোজ আমাকে কত খেতে দেয়।' তারপর দ্বিতীয় শিয়ালটা বলল, 'আমার থাকতে ইচ্ছে করছে।' বন্দী শিয়ালটা তখন বলল, 'বেশত, তুই থাক আমার এখানে আর আমায় ছাড়িয়ে দে। তুই কদিন খেয়ে নে, তারপর আবার আমি আসব।' তাই হল। বন্দী শিয়ালটা বনে পালিয়ে গেল। সে আর ফিরল না। বনের শিয়ালটাকে কিছুদিন বেঁধে রেখে তারপর একদিন মেরে ফেল্লে।

—বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৬৫

মন্তব্য

বুদ্ধির জোরে এক শিয়াল বাঁচিয়া গেল, আর এক শিয়াল বুদ্ধির দোষে মরিল। কাহিনীটি এখানে একটু পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কারণ, দ্বিতীয় চরিত্রটি কখনও শৃগাল হইতে পারে না, অন্য কোন নির্বোধ প্রাণী হইবে। বাংলার উপকথায় শৃগাল ধূর্ত, সুতরাং সে বন্দী অবস্থার মধ্যে কখনও ধরা দিবে না। কোন পরোপকারী প্রাণী ধূর্ত শৃগালকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে মরিল।

সত্তাই বন্ধু

এক যে থাকে রাজার বেটা, আর এক মন্ত্রীর বেটী। মন্ত্রীর বেটী থাকে উপরে আর রাজার বেটা থাকে নীচে। মন্ত্রীর বেটী রোজ তার কলমটা নীচে ফেলে দেয়, আর রাজার বেটা সেটা তুলে দেয়। একদিন রাজার বেটা বলল, আমি আর তুলে দেব না। তখন মন্ত্রীর বেটী বলল, তোর সঙ্গে সত্তাই বন্ধু করব।

তখন তারা পাঠশালায় গেল। মন্ত্রীর বেটী বলল রাজার বেটাকে, আমার সাত-মা সাত বাপকে ঘুম করাতে হবে। তখন মন্ত্রীর বেটী বাড়ী এল, এসে তার মা বাপকে ঘুম পাড়াল—

ঘুমা ঘুমা ঘুমা
সাত বাপ, সাত মা গো,
রাজার বেটার সঙ্গে সত্তাই হইলাম গো।

সবাই ঘুমিয়ে গেল। রাজার বেটা তখন টক্ক (টগর) গাছের তলায় সাত ঘোড়া নিয়ে বসে আছে। যখন মন্ত্রীর বেটী গেল, তখন সে ঘোড়াকে দানা দিচ্ছিল। রাজার বেটা ঘোড়াকে দানা দিয়ে রোদন করতে লাগল :

ধরো, ধরো, ধরোগো, ঘোড়া,
পানের বাটা।

কিন্তু ঘোড়া দানা ধরে না, তখন আবার রোদন করতে লাগল :

ধরো ধরো ধর ঘোড়া
আজিও যাইতে হইবে
সাত প্রাচীর ডিঙ্গে।

তখন ঘোড়া দানা ধরল। রাজার বেটা আর মন্ত্রীর বেটী ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল।

তারা যেতে যেতে একটা ঘরের সামনে এল। একটা বুড়ী ছিল সে বাড়ীতে। রাজার বেটা ও মন্ত্রীর বেটী সেই বাড়ীটায় ঢুকল। বুড়ীটা ছিল একটা ডাইনী। ওরা তা জানত না। তখন বুড়ীটি ওদের দুটো আসন দিল। একটা সোনার এবং একটা রূপার। মন্ত্রীর বেটী বসল সোনার আসনে,

রাজার বেটা বসল রূপার আসনে। বুড়ী বলল, আমি বিচার করে বলে দেব কে রাজত্ব চালাবে।

তখন বুড়ী বলল, আগে তোমরা খেয়ে নাও তারপর বলব। এই বলে বুড়ী তাদের সোনার থালায় সোনার ভাত খেতে দিল। মন্ত্রীর বেটীর ভাতের মধ্যে বিষ দিয়ে দিল। মন্ত্রীর বেটী ভাত খাবে এমন সময় একটা কাক এসে বসল তার সামনে। কাকটা কা, কা, করে খাবারটা খেয়ে দিল। কাকটা খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। তখন মন্ত্রীর বেটী আর সেই ভাত খেল না। লুকিয়ে ফেলে দিল।

বুড়ী তখন বলল, সোনার আসনে মন্ত্রীর বেটী বসেছে, মন্ত্রীর বেটীই আমার রাজ্য শাসন করবে। তারপর বুড়ী বলল রাজার বেটাকে, যাও রাজার পুকুরে স্নান করে এসো। রাজার বেটা স্নান করতে গেল। সেই পুকুরটা ছিল কাল পুকুর। যেই রাজার বেটা সেই পুকুরে পা দিল অমনি মরে জলে পড়ে গেল। মন্ত্রীর বেটী সেই কথা শুনে পুকুর পাড়ে গিয়ে কাঁদতে লাগল আর বলল, আমি আর বাঁচব না, আমিও জলে ডুবে মরব। আর কেউ কোনদিন মন্ত্রীর বেটীকে দেখেনি।

—বেলপাহাড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৬৫

মন্তব্য

কাহিনীটি বিশেষত্বহীন প্রেমের কাহিনী। নিরক্ষর গ্রামবাসীর নিকট হইতে যেমন শুনা গিয়াছিল, তেমনই লিখিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি ঘটনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যায় না। সাত মাকে ঘুম পাড়ানোর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু সাত বাপকে ঘুম পাড়াইবার অর্থ কি? সাত শব্দটি সাত মা হইতে সাত বাপে সহজেই আসিয়া গিয়াছে। বক্তা ইহার বিশেষ অর্থ চিন্তা করে নাই। পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর বন্ধুত্ব স্থাপন করাকে সত্তাই বন্ধুত্ব বলে। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম; কারণ, পুরুষের সঙ্গে পুরুষের এবং স্ত্রীর সঙ্গে স্ত্রীরই বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তাহাকে সহেলা বলে।

শিয়ালের ফাঁকি

এক শিয়াল আর শিয়ালনী ছিল। তাদের তিনটি ছানা ছিল; কিন্তু থাকবার জায়গা ছিল না। তারা ভাবলে এখন ছানাগুলোকে কোথায় রাখি, একটা গর্ত না হলে তো এরা বৃষ্টিতে ভিজে মারা যাবে। যাই হোক, অনেক খোঁজের পরএকটা গর্ত বার করলে; কিন্তু সেটা বাঘের গর্ত। শিয়ালনী বললে, যদি বাঘ আসে, তবে তুমি কি করবে? শিয়াল বললে, তুমি ছানাগুলোকে চিমটি কাটবে, ওরা কাঁদবে, আমি জিজ্ঞেস করবো, ওরা কাঁদে কেন? তুমি বলবে, ওরা বাঘ খেতে চায়।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল, একদিন সত্যি বাঘ এল। দূর থেকে বাঘকে দেখে শিয়ালনী ছানাদের চিমটি কাটছে, তারা কাঁদতে লাগল। শিয়াল মোটা আর বিশ্রী গলার স্বর করে বললে, খোকারা কাঁদছে কেন, শিয়ালনী বললে, ওরা বাঘ খেতে চায়। বাঘ কথাটা শুনে থমকে দাঁড়াল, তারপর ভাবলে তার গর্তের ভিতর রাক্ষস ঢুকেছে। এমন সময় শিয়াল বললে, বাঘ কোথায় পাব। শিয়ালনী বললে, তা জানিনা, যেমন করে পারো, ধরে আন। তখন শিয়াল বললে, আচ্ছা রোসো, ঐ যে একটা বাঘ আসছে, আমার ঝপাংটা দাও, এখুনি ওকে ভতাং করছি।

ঝপাং বা ভতাং বলে কিছু নেই। সব শিয়ালের ফাঁকি। ঝপাং বা ভতাং শুনে বাঘ ভয় পেয়ে ছুটে পালাল। এমন ছুট দিল যে এক বানর তাকে জিগ্যেস করল কি হয়েছে। বাঘ সব ব্যাপারটা বললে। বানর বললে, তুমি বোকা, তাই মিছিমিছি ভয় পেয়েছ। চল দেখি ব্যাপারটা দেখতে যাই। বানর বাঘের পিটে চড়ে সেই গর্তের কাছে যেতেই শিয়াল বললে, তোদের বানর মামা এক বাঘ ধরে এনেছে, শীগ্‌গীর ঝপাংটা দে ভতাং করে। বানরের এতক্ষণ খুব সাহস ছিল। সে এইবার ঝপাং ভতাং-এর কথা শুনে গাছে উঠে পড়ল, আর বাঘ ছুট দিল। ওদিকে শিয়াল শিয়ালনী আর তাদের ছানারা পরম সুখে সেই গর্তে বাস করতে লাগল।

মন্তব্য

শিয়ালের বুদ্ধির অনুরূপ কাহিনী পূর্বেও বহু শুনা গিয়াছে। বাঘের অনুরূপ নির্বুদ্ধিতার কথাও বাংলার লোক-কথায় সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। কাহিনীটিতে নূতন কোন বিশেষত্ব নাই।

গাছের ছানা

এক সদাগর একটি ঘোড়া নিয়ে বেচতে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার বড্ড ঘুম পেল। তখন সে ঘোড়াটিকে একটি গাছে বেঁধে সেই গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। এক চোর এমন সময় সদাগরের ঘোড়াটি নিয়ে চলে গেল। সদাগর জেগে উঠে বলল, কি ভাই, তুমি যে আমার ঘোড়াটিকে নিয়ে চলে যাচ্ছ? চোর সদাগরকে যা উত্তর দিল তাতে সদাগর বিস্মিত হল। চোর বলল, ঘোড়াটি তার। আরও বল্‌লে, ঐ ঘোড়াটি হল গাছের ছানা, খবরদার, যেন সদাগর ঘোড়াটি দাবী না করে।

সদাগর আর চোর রাজার কাছে গেল। রাজা মশাই দুইজনের কথা শুনে ঘোড়াটি যে চোরের সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেন। চোর ভীষণ চালাক। সে হাত জোর করে রাজা মশাইকে বললে, দোহাই মহারাজা, এটি কখনই ওর ঘোড়া নয়, এটি আমার গাছের ছানা, ছানাটি হতেই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছিলুম; আর সদাগর সত্যি কথা বললে। তখন রাজা মশাই সদাগরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুমি দেখছি বড় দুষ্ট লোক, পালাও এখান থেকে। গাছের ছানা হোল, আর তুমি বলছ তোমার ঘোড়া। রাজা চোরকে ঘোড়াটি দিলেন। কথা শুনে সদাগর কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

এক শিয়াল সদাগরকে কাঁদতে দেখে বললে, কি ভাই, কি হয়েছে? সদাগর বললে, আর ভাই সে কথা বল কেন। আমার ঘোড়াটি চোরে নিয়ে গেল, রাজার কাছে নালিশ করতে গেলুম, সেখানে চোর বললে কি না, ওটা তার গাছের ছানা, রাজামশাই তাই শুনে ঘোড়াটি চোরকে দিয়ে দিলেন।

একথা শুনে শিয়াল বললে, এক কাজ করতে পার? তুমি রাজা মশাইকে বল যে একজন সাক্ষী আছে, কিন্তু আপনার বাড়ী কুকুরকে তাড়িয়ে দেন, তবে সে নির্ভয়ে আসতে পারে। সদাগর সেই কথাই গিয়ে বললে। রাজা কুকুরদের তাড়িয়ে দেবার হুকুম দিলেন।

শিয়াল চোখ বুজে টলতে টলতে রাজার সভায় এল, সেখানে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঝিমুতে লাগল। রাজামশাই হাসতে হাসতে বললে, কি শিয়াল পণ্ডিত ঝিমুচ্ছ যে!

শিয়াল বললে, সারারাত জেগে মাছ খেয়েছিলুম, তাই আজ বড্ড ঘুম পাচ্ছে। রাজা বললেন, এত মাছ কোথায় পেলে? শিয়াল বললে, কাল নদীর জলে আগুন লেগে সব মাছ ডাঙায় এসে উঠল, আমরা সারারাত সকলে মিলে খেলুম। রাজা মশাই এই কথা শুনে ভয়ানক হাসলেন, বললেন, এমন কথা কখনো শুনিনি, এও কি কখনও হয়, এ সব পাগলের কথা। তখন শিয়াল বললে, ঘোড়া গাছের ছানা, এমন কথাও কি কখনও শুনেছেন? শিয়ালের কথায় রাজা খুব ভাবনায় পড়লেন। রাজা বললেন, সত্যি তো গাছের কি করে ছানা হয়, তবে সে বেটা নিশ্চয়ই চোর। তখনই হুকুম হল, আনতো রে সে চোর বেটাকে বেঁধে। অমনি দশ পেয়াদা গিয়ে চোরকে বেঁধে আনলে। আনতেই রাজা হুকুম দিল, চোরকে পঞ্চাশ জুতো মারতে। চোর মার খেয়ে ঘোড়া এনে দিল। চোরকে নাক কান মলে, মাথা ছেঁটে, ঘোল ঢেলে দূর করে দেওয়া হল।

মন্তব্য

রাজা বিষয়-বুদ্ধিহীন লোক; সেইজন্য প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাহার কোন জ্ঞান নাই, গাছের ছানা হয় না চারা হয়, তাহা তিনি জানেন না। তাহা বুঝাইবার জন্য অনুরূপ অসম্ভব আর একটি কাহিনীর অবতারণা। লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায় মাত্র। শিয়াল এখানে সমাজের কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রতিনিধি।

২৩

চালাকি

রাজার পাটহাতী যখন মরে গেল, তখন রাজা খুব দুঃখ পেলেন। তারপর লোকজন ডেকে তাকে মাঠে ফেলে দিয়ে আসা হল। এক শিয়াল সেই হাতীর পেট চিরে তার ভিতর ঢুকে পড়ল। আর মনের সুখে মাংস খেতে লাগল। এদিকে কড়া রোদ্দুর, হাতীর চামড়া এত পুরু হয়ে গেল যে, শিয়াল আর বেরুতে পারে না। তখন শিয়াল এক বুদ্ধি খাটাল। সে মরা হাতীর ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বললে, ওহে ভাই সকল, কে কোথায় আছ, রাজামশাইকে একটা খবর দাও। তখন মাঠে তিনজন চাষী সেই কথা শুনে হাতীর কাছে এল। ভিতর থেকে শিয়াল বললে, আমার পেটে যদি পঞ্চাশ কলসী ঘী মাখানো হয়, তবে আবার আমি উঠে দাঁড়াব।

রাজা হাতীটিকে খুব ভাল বাসতেন, তিনি এই কথা শুনে হাজার কলসী ঘী আর অনেক লোকজন পাঠিয়ে দিলেন। সবাই মহা উৎসাহে ঘী মাখাতে লাগল। এদিকে যে গর্ত করে শিয়াল ভিতরে ঢুকেছিল সেটা ঘী মাখাতে তা' বেশ বড় হয়ে গেল। শিয়াল তখন ভিতর থেকে বললে, এবার আমি উঠে দাঁড়াব।

এই কথা শুনে রাজার লোকজন ছুটে পালাল আর চালাক শিয়াল ছুটে পালিয়ে গেল।

মন্তব্য

শিয়ালের বুদ্ধি এই কাহিনীটিরও অভিপ্রায়। বুদ্ধি যাহার, তাহার বিনাশ নাই, দৈহিক শক্তিতে দুর্বল বাঙ্গালীজাতি নিজের জীবন-সাধনায় এই কথাই প্রচার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহিয়াছে। শিয়াল বুদ্ধিজীবী দুর্বল বাঙ্গালীরই প্রতীক্। সেইজন্য বুদ্ধির কথা আসিতেই শিয়ালের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের লোক-কথাতেও শিয়ালকে পণ্ডিত বা পাঁড়ে বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং তাহার বুদ্ধি সম্পর্কে সেখানেও অনুরূপ কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে শিয়ালের কাহিনীর একটি প্রধান অংশে শিয়ালের বিশ্বাস-ঘাতকতার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। সাঁওতালী উপকথায়ও শিয়াল প্রধানত বিশ্বাসঘাতক। বাংলার শিয়াল চরিত্রের দুইটি ধারা একত্র মিশিলেও বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুকূল বলিয়া তাহার বুদ্ধিমত্তার দিকটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই কাহিনীটিও উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'টুনটুনির বই'য়ে স্থান পাইয়াছে।

২৫

ক্ষুধার ভান

এক নিবিড় বন। সেই বনের মধ্যে চারটি গর্তে যথাক্রমে একটি শৃগাল, একটি ছাগল, একটি বাঘ ও একটি বাঁদর বাস করিত। ইহারা সমস্ত দিন আহার সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিতে যে যাহার ঘরে আশ্রয় লইত। এইরূপে দিন যায়। ইতিমধ্যে একদিন শৃগালীর একসঙ্গে চারটি বাচ্চা হইল। সে যে ছোট গর্তটিতে থাকিত, তাহাতে তাহার নিজেরই ভালরূপে জায়গা হইত না।। বাচ্চাগুলিকে কোথায় স্থান দিবে ইহাই তাহার একটা ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। একদিন চিন্তিত মনে শৃগালীটি পুকুরধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একটি বড় গর্ত দেখিতে পাইল। সে তাহার বাচ্চাগুলি লইয়া সেই গর্তটিতে আশ্রয় লইল। বাচ্চাগুলিকে ভিতরে রাখিয়া শৃগালীটি গর্তের সামনে বসিয়া আছে, এমন সময় একটি বাঘ আসিয়া উপস্থিত লইল। বাঘটিকে দেখিয়াই শৃগালী তাড়াতাড়ি বাচ্চাগুলিকে কামড়াইয়া দিল এবং বাচ্চাগুলিও তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল। তখন শৃগালীটি গর্তের সামনে বসিয়া বাঘকে শোনাইয়া বলিতে লাগিল, এইমাত্র তোদের সাত সাতটা বাঘ ধরিয়া খাইতে দিলাম, ইহার মধ্যে ক্ষুধা পাইয়াছে? আমি তোদের জন্য এইখানে দেখি, যদি এক আধটা বাঘ পাইতে পারি।

শৃগালীর মুখে এই কথা শুনিয়া বাঘ তো ভয়েই অস্থির। সে প্রাণভয়ে দৌড়াইতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া সে ভাবিল, বাঁদর বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করা যাক। এই ভাবিয়া সে বাঁদর বন্ধুকে সব কথা খুলিয়া বলিল। বাঁদর সব শুনিয়া বলিল, আমি থাকিতে তোমার ভয় কি, বন্ধু! আমি এক্ষুণি যাইয়া ইহার প্রতিকার করিতেছি।

বাঘ বলিল, আমি কিছুতেই সেখানে যাইব না। তুমি একলা যাও।

বাঁদর বাঘকে কাপুরুষ বলিয়া অনেক তিরস্কার করিল।

বাঘ তখন বলিল, কিন্তু বিপদে পড়িয়া যদি আমাকে ফেলিয়া পালাও, তখন আমার কি উপায় হইবে?

বাঁদর বাঘের অবিশ্বাস দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, তোমার যদি এতই অবিশ্বাস, তাহা হইলে এক কাজ কর, তোমার লেজে ও আমার লেজে এমনভাবে বাঁধো, যাহাতে আমি পালাইতে না পারি।

বাঘ বাঁদরের পরামর্শমত কাজ করিল। বাঁধা শেষ হইলে দুই বন্ধুতে বাঘের বাসার দিকে রওয়ানা হইল।

বাঁদর দূর হইতে দেখিল, এক শৃগাল বাঘের বাসায় বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার শিশুগুলি ভিতরে চেঁচামেচি করিতেছে।

শৃগালী দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়া ভাবিল, মরিতে যদি হয়ই, তবে তাহার আগে একটা চাল চালিয়া দেখা যাক্—এই ভাবিয়া সে বাঁদরকে ডাকিয়া বলিল, আমি তোকে কখন বাঘ ধরিতে পাঠাইয়াছি, আর তুই এতক্ষণ পরে একটা মরা বাঘ ধরিয়া আসিতেছিস্? আমার ছেলেরা না খাইয়া কাঁদিতেছে।

শৃগালীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাঘ প্রাণভয়ে এলোপাথাড়ি দৌড়াইতে লাগিল এবং আছাড় খাইতে খাইতে মারা পড়িল। বাঁদর বন্ধুরও ঐ একই দশা হইল। শৃগালী মহাসুখে বাচ্চাদের লইয়া বাঘের বাসায় বাস করিতে লাগিল।

মন্তব্য

শৃগালের বুদ্ধি এবং বাঘের বোকামি সম্পর্কে ইহা আর একটি নিতান্ত সাধারণ কাহিনী মাত্র। এই প্রকার কাহিনী আগেও শোনা গিয়াছে। শৃগালের মত দুর্বল হইয়াও কেবলমাত্র বুদ্ধির জোরে কি ভাবে বাঘকে মারিয়া যে তাহার গর্তে বাস করা যায়, এখানে তাহাই বলা হইয়াছে। পূর্বে যে প্রায় অনুরূপ কাহিনী শুনিয়াছি, তাহাতে বাঘের মরিবার কোন কথা নাই। এখানে চারিটি পশুর বন্ধুত্বের কথার কোন সার্থকতা নাই।

ব্রাহ্মণের বুদ্ধি

এক দেশে এক ধনী বণিক বাস করিত। তাহার রাজার মত ঐশ্বর্য। তাহার একটিমাত্র পুত্র, নাম গজপতি। পুত্র যখন যাহা আব্দার করিত, বণিক্ তখনই তাহা সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও আনিয়া দিত। এইরূপে ক্রমে গজপতি একজন মহাস্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজেকে বিদ্যাদিগ্‌গজ নামে জাহির করিল। বণিকের মৃত্যুর পর গজপতিই সংসারের সর্বেসর্বা মালিক হইল। সে ছিল খুব সৌখিন, বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিয়া সে এক গানের দল তৈয়ারী করিল এবং লোককে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া গান শুনাইতে লাগিল। কিন্তু গানের নামে বিকট চিৎকার লোকে আর কত দিন সহ্য করিতে পারে? পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। গজপতি যখন দেখিল, শ্রোতা পাওয়া যায় না, তখন সে নিজেই বাড়ী বাড়ী ধর্না দিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও লোক নানা অজুহাত দিয়া গা ঢাকা দিতে লাগিল। তখন গজপতি কোন এক গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইয়া বলিল, তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও, আমরা তোমায় রোজ নগদ চারি আনা দিব, তুমি শুধু আমাদের গান শুনিবে।

ব্রাহ্মণ নগদ চারি আনার লোভে রাজী হইয়া গেল এবং গজপতির দলও মহাউৎসাহে গান জুড়িল। গজপতির দয়ায় ব্রাহ্মণের সংসার স্বচ্ছল হইল। কিন্তু তাহার কর্ণ বধির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। একদিন ব্রাহ্মণ অসুখের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল; কিন্তু তবু গজপতির হাত হইতে নিস্তার পাইল না। নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণ একদিন জন্মভূমি ও নিজের ভিটার মায়া ছাড়িয়া পালাইয়া বাঁচিল। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ ছিল, তাহাতে অনেকদিন ধরিয়া এক ব্রহ্মদৈত্য থাকিত। গজপতির গান তাহারও অসহ্য হইয়াছিল।

কিন্তু পুরানো তেঁতুল গাছটির মায়া সে ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না। ব্রাহ্মণকে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া ব্রহ্মদৈত্যও গাছের মায়া ত্যাগ করিয়া অজানা দেশের উদ্দেশে রওয়ানা দিল। পথে ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যের

দেখা হইল। ব্রাহ্মণতো ভয়েই অস্থির! তখন ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণকে বলিল, তোমার কোন ভয় নাই। গজপতির গানের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলাইয়া আসিয়াছি। তবে এতদিন তোমার তেঁতুলগাছে ছিলাম, সেইজন্য তোমার কিছু উপকার করিতে ইচ্ছা করি। আমি অমুক দেশের রাজকন্যার উপরে ভর করিব। কোন বৈদ্যই ছাড়াইতে পারিবে না। তুমি গেলে ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। তাহাতে রাজা তোমায় যে উপহার দিবেন, তাহাতেই তোমার সারাজীবন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান! আর কোথায়ও ভূত তাড়াইতে যাইও না। তবে আমার হাতে প্রাণ যাইবে। এই বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য অদৃশ্য হইল।

কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণ একদিন শুনিলেন, কিছু লোক ঢেড়া পিটাইয়া ঘোষণা করিতেছে, রাজার কন্যাকে যে আরোগ্য করিয়া দিতে পারিবে, তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইবে এবং সে অর্ধেক রাজত্ব পাইবে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যের কথা অনুযায়ী রাজবাড়ীতে গিয়া হাজির হইল এবং ব্রাহ্মণ রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই ব্রহ্মদৈত্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

রাজ্যের লোক মহাখুশী হইল। রাজা ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন এবং রাজ্যের অর্ধাংশও দিলেন। ইতিমধ্যে সেই ব্রহ্মদৈত্য অন্য এক দেশের রাজকন্যাকে ভর করিয়াছে। দেশবিদেশ হইতে বৈদ্য আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

রাজা শোকে দুঃখে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাঁহার মন্ত্রী সেই ব্রাহ্মণের কথা বলিল। রাজা তখন খুশী হইয়া বলিলেন, সেই দেশের রাজা আমার বাল্যবন্ধু, তিনি নিশ্চয়ই জামাতাকে আমার সাহায্যের জন্য পাঠাইবেন। এই বলিয়া তিনি রাজার কাছে একটি চিঠি লিখিয়া মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। রাজা সব শুনিয়া জামাতাকে সেখানে যাইতে অনুরোধ করিলেন। ভূতের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া গেল। কারণ, ব্রহ্মদৈত্যের হাতে প্রাণ দিতে হইবে। কিন্তু সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ সেই দেশে গিয়া উপস্থিত হইল।

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া ব্রহ্মদৈত্য তো রাগিয়াই অস্থির, 'তুই আবার আসিয়াছিস? এবার তোর নিশ্চিত মৃত্যু'—বলিয়া ব্রহ্মদৈত্য রাগে গর্জাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তখন কৌশল অবলম্বন করিল। তাড়াতাড়ি সে ব্রহ্মদৈত্যকে বলিল, ভাই,

আমি তোমাকে তাড়াইতে আসি নাই, খবর পাইলাম, গজপতির গানের দল আসিতেছে, তাহাই বলিতে আসিয়াছি, শুনিবামাত্র ব্রহ্মদৈত্য অন্তর্ধান করিল।

রাজকন্যা সুস্থ হইলেন। দেশের লোক ব্রাহ্মণের প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল।

মন্তব্য

ব্রাহ্মণের নির্বুদ্ধিতার কথাই সাধারণত শুনিতে পাওয়া যায়, এই কাহিনীটি তাহাদের একটি ব্যতিক্রম। তবে বৌদ্ধজাতকের অনেক কাহিনীতে ব্রাহ্মণকে তস্কর রূপে বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার বুদ্ধির কথাও প্রকাশ করা হইয়াছে। জাতকের কাহিনীতে শুনা যায়, ব্রাহ্মণের বুদ্ধি থাকিলেও তাহা সৎকার্যে কদাচ নিয়োজিত হয় না। এখানে ব্রাহ্মণ নিজেই বুদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে।

২৭

দুর্বলের বুদ্ধি

পিঁপড়ে আর পিঁপড়ীর মধ্যে ছিল ভারী ভাব। তাহারা দুইজনে এক দিন বলাবলি করিল, যে আগে মরিবে, সে অপরকে গঙ্গায় লইয়া যাইবে। একদিন হঠাৎ পিঁপড়ী মারা গেল। পিঁপড়ে পিঁপড়ীকে গঙ্গায় লইয়া চলিল। সেখান হইতে গঙ্গা অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, যাইতে অনেক দিন সময় লাগিত। যাইতে যাইতে বেচারী পিঁপড়ে রাজার হাতীশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া সে বিশ্রাম করিতেছিল। রাজার হাতী-শালায় তখন পাটহস্তী বাঁধা ছিল। সেই হস্তীটি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলায় পিঁপড়ীকে শুদ্ধ পিঁপড়েকে উড়াইয়া লইতেছিল। পিঁপড়ে খুব রাগিয়া গেল এবং বলিল যে ভাল হইবে না। হস্তী আবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। পিঁপড়ে আবার খুব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

হস্তী ভাবিল, কে দূর হইতে চিঁ চিঁ করিয়া তাহাকে গালি দিতেছে! এই বলিয়া সেই জায়গাটাতেই পা দিয়া ঘষিয়া দিল। কিন্তু পিঁপড়ে মরিল না, হস্তীর পায়ের তলায় কোনোমতে আশ্রয় লাভ করিয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার পর হস্তী পায়ের তলায় বসিয়া বসিয়া তাহার মাংস খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। তাহার ফলে একদিন হাতী মরিয়া গেল।

রাজা ইহার পর স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার মরা হাতীটি তাঁহাকে বলিতেছে যে, যেন উহাকে গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া হয়। রাজার আদেশে পরদিন দুইশত তিনশ লোক খুব পরিশ্রম সহকারে ইহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পথে এক বামুন ঠাকুরের সহিত তাহাদের দেখা হইল। সেই বামুনের সহিত এক চাকর ছিল। সেই লোকগুলিকে হাঁপাইতে দেখিয়া চাকর বলিল, একটি ইঁদুরের মত হাতীকে টানিতে গিয়া চারশো লোক হাঁপাইতেছে! বামুনের চাকর বলিল, সে একাই টানিয়া লইতে পারে। কিন্তু রাজাকে বলিল, কিছু খাবার তাহাকে দিতে হইবে। এই খাদ্যতালিকার মধ্যে ছিল মণ দুই চাল, দুইটি খাসী, আর এক মণ দৈ।

সম্মতি সহজেই মিলিল। বামুনের চাকর ঐ সব খাদ্য গ্রহণ করিয়া একটু ঘুমাইয়া লইল, তার পর নির্বিঘ্নে পুঁটলিটিতে হাতীকে লইয়া গঙ্গার দিকে

চলিল। পথে যাইতে চাকরটির খুব জল পিপাসা হইল। খানিক দূরে ছিল পুকুর আর তার আড়ালে ছিল কুঁড়ে ঘর ; সেই ঘরের কাছে একটি ছোট মেয়ে বসিয়া ছিল। তাহার কাছে চাকরটি তৃষ্ণার জল চাহিল। মেয়েটি বলিল, মাত্র এক জালা জল আছে, যদি তোমাকে দিই, তবে বাবা মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খাইবেন কি ? এই কথা শুনিয়া চাকরটি খুব রাগিয়া গেল এবং সমগ্র পুকুরের জল পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর একটি বটগাছ গিলিয়া গলায় ছিপি আট্‌কাইয়া দিল। তারপর শ্রান্ত হইয়া সে ঘুমাইতে লাগিল। দূর হইতে মনে হইল, একটি পাহাড়। মেয়েটি তাহার বাবাকে লইয়া তথায় সেই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটিকে দেখিতে গেল। আসিয়া মেয়েটি নাক চাপিয়া বলিল, পচা ইঁদুর পুঁটিলিতে বাধা। তারপর সে পুঁটলিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। পুঁটলিটি গঙ্গায় পড়িল।

মন্তব্য

পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র জীব আর নাই, সেইজন্য বৃহৎ আকৃতি-বিশিষ্ট জীবের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য ভগবান তাহাকে বুদ্ধি দিয়াছেন। পিঁপড়ের গঙ্গায় যাইবার সাধ হইল, কিন্তু তাহার সেই অনুযায়ী শক্তি ছিল না। বুদ্ধিদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। অস্বাভাবিক শক্তিও কাহিনীটির অন্যতম অভিপ্রায়। হাতীকে গঙ্গায় লইয়া যাইবার পরিকল্পনা হইতেই তাহা এখানে আসিয়াছে।

২৮

অন্তিম হাসি

এক গ্রামে দুইটি বিড়াল থাকিত। উহাদের মধ্যে একটি গোয়ালাদের বাড়ীতে দই দুধ ছানা মাখন আর সর প্রচুর পরিমাণে খাইত। আর একজন জেলেদের বাড়ীতে থাকিয়া ঠেঙার বাড়ি আর লাথি খাইত। গোয়ালাদের বিড়ালটি ছিল খুব মোটা, তাই তাহার দেমাক ছিল খুব বেশী। জেলেদের বাড়ীর বিড়ালের হাড়সার চেহারা হইয়াছিল। সে কেবলই ভাবিত, গোয়ালাদের বাড়ী বিড়ালের মত কবে মোটা হইবে। একদিন জেলেদের বাড়ীতে বিড়াল গোয়ালাদের বাড়ীর বিড়ালকে নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণটা কিন্তু একেবারেই ছল। কেননা সে নিজেই খাইতে পায় না, কেমন করিয়া সে অপরকে নিমন্ত্রণ করিবে? সে ভাবিয়াছিল, গোয়ালাদের বাড়ীর বিড়াল জেলেদের বাড়ী আসিলে ঠেঙা খাইয়া মরিয়া যাইবে, তখন সে গোয়ালাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

গোয়ালাদের বাড়ীর বিড়াল জেলেদের বাড়ী আসিলে জেলেরা তাহাকে এমন ভাবে ঠেঙাইল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। আর জেলেদের বিড়াল গোয়ালের বাড়ী গিয়া মোটা সোটা হইল।

একদিন সে কাগজ পত্তর বগলে লইয়া বনের ভিতর গেল। সেখানে তিনটি বাঘের ছানা খেলা করিতেছিল। তাহাদেরে গম্ভীর ভাবে বলিল যে খাজনা দিতে হইবে। বাঘের ছানা তাহার কাগজ কলম দেখিয়া ভয় পাইল। তাড়াতাড়ি তাহারা মায়ের নিকট গিয়া সব বৃত্তান্ত বলিল। বাঘিনী বিড়ালকে দেখিয়া বলিল, কে তুমি, কি চাও, বাছা? বিড়াল উত্তরে বলিল, আমি রাজার বাড়ির সরকার, তোরা রাজার জায়গায় থাকিস, দে খাজনা দে। বাঘিনী বলিল, খাজনা কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি না। কেহ বনে আসিলে তাহাকে ধরিয়া খাই। আচ্ছা, বাঘ আসুক, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বিড়াল একটি উঁচু গাছের ডালে গিয়া বসিল এবং দেখিতে পাইল, বাঘ আসিতেছে। বাঘ আসিতেই বাঘিনী সব বৃত্তান্ত তাহাকে বলিল। বাঘ গর্জন করিয়া বলিল, কোথায় সেই হতভাগা। বিড়াল গাছের

উপর হইতেই বলিল, কি রে বাঘা, খাজনা দিবি না? ইহা শুনিয়াই বাঘ হালুম বলিয়া দুই লাফে সেই গাছে উঠিয়া গেল। বিড়াল সরু ডালে বসিয়া ছিল। মোটা ভারী বাঘ তাহাকে ধরিতেই পারিল না। তাই রাগ করিয়া বাঘ যখন লাফ দিতে গেল, তখন দুইটি ডালের মাঝখানে পড়িয়া তাহার প্রাণ-বায়ু নির্গত হইল। বিড়াল তাহার নাকে দুই চারিটি আঁচড় দিয়া বাঘিনীকে বলিল, দেখ, আমি কি করিয়াছি। বাঘিনী হাত জোড় করিয়া কহিল, দোহাই বিড়াল মহাশয়, আমাদের প্রাণে মারিবেন না, আমরা আপনার গোলাম হইয়া থাকিব। বিড়াল বলিল, বেশ, আমাকে ভাল করিয়া খাইতে দিতে হইবে। সেই হইতে বিড়াল বাঘিনীদের বাড়ীতেই থাকে। বাঘিনীর বাচ্চারা সব সময়ে ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকে। বাঘিনী একদিন বিড়ালকে অন্য বনে ভাল জানোয়ার আছে বলিয়া তাহাকে যাইতে বলিল। বিড়াল বাঘিনীদের সঙ্গে নদীর ওপারের বনে যাইবার জন্য নদীর মধ্যে সাঁতার দিল। কিন্তু নদীর স্রোতে বিড়াল হাবুডুবু খাইতে লাগিল। তাহার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কিন্তু বিড়াল সব ব্যাপারটি এমন ভাবে সামলাইয়া লইল যে, সে ভয়াবহ বিপদে পড়িয়াছিল, তাহা বাঘেদের বুঝিতে দিল না। উপরন্তু সে বাঘের এক ছানার গালে সজোরে চড় কষাইয়া দিল, বলিল, আমি এতক্ষণ নদীর জলে মাছ গুণিতেছিলাম, রাজামহাশয়কে সব হিসাব দিতে হইবে, তুই আমাকে টানাটানি করায় সব হিসাব গুলাইয়া গেল।

বাঘিনী ছানার অপরাধে বিড়ালের নিকট ক্ষমা চাহিল, বলিল, ও মূর্খ উহাকে ক্ষমা করুন। বিড়াল বলিল, এবারের মত মাপ করিলাম। তারপর উঁচু গাছের ডালে উঠিয়া বিড়াল দেখিতে পাইল, একটি মহিষ মরিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে গিয়া, তাহার মুখে আঁচড় টানিল এবং বাঘিনীকে বলিল, যা তোরা খেয়ে নে। বাঘিনী বিড়ালের অসাধারণ শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা আর একদিন তাহাকে বলিল যে, চলুন এই বনে বড় বড় হাতী গণ্ডার আছে, তাহা খাইতে যাই। বিড়াল বলিল, এ আর কি এমন কথা। বাঘিনী পথে যাইতে যাইতে বিড়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি খাপে থাকিবেন, না ঝাঁপে থাকিবেন। খাপে থাকা মানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, ঝাঁপে থাকার অর্থ ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া জন্তু ধরিয়া আনা। বিড়াল বলিল, তোরা ঝাঁপে যা, আমি খাপে থাকি। বাঘের ছানা ও বাঘিনী তখন চতুর্দিক হইতে জন্তুদের তাড়া করিতে লাগিল। ভয়ে বিড়ালীর

তো বুক উড়িয়া গেল। একটি সজারুকে দেখিয়া গাছের শিকড়ের তলায় আশ্রয় লইল। এমন সময় একটি হাতী তাহাকে মাড়াইয়া গেল, বিড়ালের নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু তখনও সে বাঁচিয়া ছিল। এদিকে বাঘিনী ভাবিল, বিড়াল অনেক জন্তু ধরিয়াছে, যাই একবার দেখিয়া আসি। আসিয়া বিড়ালের দুর্দশা দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হল, বিড়াল মশাই। বিড়াল বলিল, তোরা যা ছোট ছোট জন্তু পাঠিয়েছিস, তা দেখে আমার হাসতে হাসতে পেট ফেটে গেল। এই কথা বলিয়া বিড়াল মরিয়া গেল।

মন্তব্য

এখানে বিড়ালের যে বুদ্ধিমত্তার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বাংলার লোক-কথায় কেবলমাত্র শৃগালের উপরই প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং এখানে বিড়ালকে শৃগাল চরিত্ররূপেই বুঝিতে হইতে। বাংলার লোক-কথায় বিড়াল চরিত্রের বিশেষ কিছুই স্থান নাই। ইহার কারণ বড়ই অস্পষ্ট। বিড়াল এবং কুকুরের মত পরিচিত জীব বাঙ্গালীর আর কিছুই নাই, অথচ ইহাদের সম্পর্কে কোন লোক-কথা প্রায় নাই বলিলেই চলে। কুকুর এ'দেশের সমাজে ঘৃণ্য এবং অশুচি আহারে অভ্যস্ত বলিয়া তাহার সম্পর্কিত কোন কাহিনী নাই। বিড়ালের কোন গুণ নাই। দুধমাছ চুরি করিয়া খাওয়া তাহার অভ্যাস। এই নিন্দিত আচার-আচরণের জন্য তাহার সম্পর্কেও কোন কাহিনী রচিত হয় নাই। একমাত্র অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত কথায় তাহার একবার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই কাহিনীটি একটি ব্যতিক্রম। 'টুনটুনির বই'য়ে কাহিনীটি শুনা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

লোভীর কথা

বাংলার লোক-কথার মধ্যে লোভীর কথাও একটি বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া আছে। লোভ স্বভাবতই একটি দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; সেইজন্য লোভের পরিণামের কথাও অধিকাংশ কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায়। তথাপি এই সম্পর্কে একটি লক্ষ্য বিষয় করা যায় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোভী পরিবারের ছোট বউ, পরিবারের অন্যান্য বধূ কিংবা কন্যার এই চারিত্রিক ত্রুটির কথা ইহাদের মধ্যে প্রায় কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে পেটুকের কৌতুককর গল্প প্রায় সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়; গল্পগুলি বৈশিষ্ট্যবর্জিত, কেবলমাত্র ভোজনের পরিমাণ সম্পর্কে কল্পিত অতিরঞ্জিত কাহিনীতেই তাহা পূর্ণ। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে যে লোভীর গল্পগুলির উল্লেখ করা হইল, ইহারা সেই শ্রেণীর গল্প নহে। পারিবারিক জীবনে লোভ একটি অপরাধ, এই অপরাধের বৃত্তান্তই এখানে লোভীর কথা নামে উল্লেখিত হইয়াছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক কাহিনীর নায়িকা পরিবারের ছোট বৌ, তাহারা শ্বশুর শাশুড়ীর অজ্ঞাতে গোপনে পরিবারের গুরুজন-দিগের খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া রাখে, এই লোভ সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না। লোভের জন্য কঠিন দণ্ড ভোগ করে, তারপর কেবল মাত্র দৈবানুগ্রহে এই চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে মুক্তি লাভ করে। এই বৃত্তান্তের মধ্যে বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের বহু জটিল রহস্য গোপন হইয়া আছে। ছোট বৌ পরিবারের সকলের অধীনা। শ্বশুর-শাশুড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া জা ননদ পর্যন্ত সকলকে পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করাইয়া যদি তাহার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে শেষ বেলায় সে পাতে বসিয়া দিনের আহার সমাধান করিবার সুযোগ পায়। তার উপর মধ্যে মধ্যে যখন বিনা সংবাদে আত্মীয়-স্বজন অতিথি-অভ্যাগতের আকস্মিক অভ্যুদয় ঘটে, তখন তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া হতভাগিনী ছোট বউয়ের অদৃষ্টে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অথচ বয়স তাহারই সর্বাপেক্ষা অল্প; সদ্য পিতৃগৃহ হইতে আগতা

বলিয়া পিতৃপরিবারের স্নেহস্পর্শ হইতে তখনও সে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে না। সেইজন্য ক্ষুধার তাড়নায় কোন কোন সময় সে নিজে হইতেই সুযোগ পাইলে অন্যের অজ্ঞাতে আহার্য গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, রন্ধনপর্বের গুরু দায়িত্বও তাহার উপরই ন্যস্ত থাকে। তাহাই বালিকা বধূর অনাচার বলিয়া পরিবার কর্তৃক ধিক্কৃত হয়। এই অনাচারের জন্য তাহাকে দৈব শাসনের ভয় দেখানো হয়। ক্রমে বালিকার সবই সহিয়া যায়, দৈব অভিশাপের ভয়ে ক্ষুধার জ্বালাও স্বীকার করিয়া লয়। কোন কোন কাহিনীর মধ্যে শাশুড়ীর লোভের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাও বিশেষ তাৎপর্যমূলক। বাংলার পারিবারিক জীবনের এই বাস্তব পরিচয় হইতেই এই শ্রেণীর কাহিনীর জন্ম হইয়াছে।

লোভের আর এক শ্রেণীর কাহিনীতে দরিদ্রের লোভের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহ চিরদারিদ্র্যের লীলানিকেতন ছিল। ব্রাহ্মণ দরিদ্র, সেইজন্য লোভী। বৌদ্ধ জাতক হইতে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র পর্যন্ত এই শ্রেণীর কাহিনী সর্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলার লোক-কথায়ও ইহার ধারা অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। তবে লোভী এবং পেটুক ব্রাহ্মণের গল্পের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। সর্বক্ষেত্রেই লোভের শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া সমাজকে শিক্ষা দিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আমাদের শাস্ত্র বলে, 'ভোজনং দ্বিগুণং স্ত্রীণাম্।' অর্থাৎ স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ আহার করে। সেইজন্য বাংলার অধিকাংশ লোভীর কাহিনীরই নায়িকা পুত্রবধূ কিংবা শাশুড়ী। বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত লৌকিক কাহিনী এই—কার্তিক বিবাহ করিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন, সহসা পথে গিয়া মনে হইল, তিনি হাতের দর্পণটি ফেলিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া তাহা লইবার জন্য বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, মা দুর্গা একটি কুলা আড়াল দিয়া কুড়িটি মহিষের মাংস আহার করিতে বসিয়াছেন। কার্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আজ তোমার এই রাক্ষুসে আহার কেন? মা দুর্গা বলিলেন, তোমার বৌ আসিলে আর পেট ভরিয়া খাইতে পারিব না। তাই জন্মের শোধ আহার করিয়া লইতেছি। ইহা শুনিয়া কার্তিক আর বিবাহ করিতে গেলেন না। শাশুড়ীর বধূর সম্পর্কের জটিলতা সৃষ্টির ইহাও অন্যতম কারণ।

বাছুরের মাংস

এক ব্রাহ্মণ, তার এক ছেলে, এক বৌ। ব্রাহ্মণের বাপের শ্রাদ্ধ; ব্রাহ্মণ পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বাপের শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে, তুমি রাঁধিতে পারিবে? বৌ বলিলেন, হাঁ পারিব। ব্রাহ্মণ তখন সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন এবং হরিণের মাংস আনিয়া দিলেন। বৌ সমস্ত রান্না করিয়া মাংস রাঁধিলেন, চাকরানীকে বলিলেন, একটু মাংস চাখিয়া দেখ ত, কেমন হইয়াছে। চাকরানী মাংস চাখিয়া বলিল, অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তখন দুইজনে মিলিয়া মাংস চাখিতে চাখিতে সমুদয় মাংস খাইয়া শেষ করিলেন। ততক্ষণে দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় হইয়াছে। এই দিকে মাংস শেষ হইয়া গিয়াছে। তখন বধূর চৈতন্য হইল। চাকরানীকে বলিল, এখন উপায় কি, তুই দেখ্‌ত মাংস কোথায় পাওয়া যায়! চাকরানী বলিল, আমি কোথায় মাংস পাইব? তবে তোমাদের নূতন বাছুরটা রান্না ঘরের পিছনে চরিতেছে, যদি বল সেইটা কাটিয়া আনিয়া দেই। অগত্যা বধূ তাহাতেই সম্মত হইল। দাসী বাছুরের মাংস কাটিয়া আনিয়া দিল, বধূ সেই মাংস রাঁধিয়া প্রস্তুত করিল।

তখন ব্রাহ্মণ-ভোজনের স্থান প্রস্তুত হইতেছে। বধূর মনে ভয় হইল, গোমাংস খাইলে ব্রাহ্মণের জাতি যাইবে। কেমন করিয়া এতগুলি ব্রাহ্মণের জাতি মারিব। তখন বৌ বুদ্ধি স্থির করিয়া চাকরানীকে বলিল, দেখ্‌ এতগুলি ব্রাহ্মণের জাতি মারিতে পারিব না। তুই এই রান্নাঘরের দরজার কাছে জল ঢালিয়া পিছল করিয়া রাখ্‌, আমি ভাতের থালা লইয়া বাহিরে ঐ খানে পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যাইব। তুই তাড়াতাড়ি হেঁসেলে ঢুকিয়া পাকের ঘটি লইয়া আমার মুখে চোখে জলের ছিটা দিস্‌, তাহা হইলেই হেঁসেল নষ্ট হইবে।

চাকরাণীকে এইরূপে শিখাইয়া রাখিয়া বৌ যেমন ভাতের থালা লইয়া বাহির হইল, অমনি দরজার কাছে পা হড়কিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। পূর্বশিক্ষা মত চাকরানী অমনি হেঁসেলে ঢুকিয়া জলের ঘটি লইয়া আসিয়া মুখে চোখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। তখন স্বামী শশুর সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। বধূর জ্ঞান হইলে দাসী বলিল, আমি তাড়াতাড়িতে পাক নষ্ট

করিয়া ফেলিয়াছি। তখন ব্রাহ্মণ ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, এখন উপায় কি, এই সমুদয় ব্রাহ্মণ কি খাইবে? বধূ বলিল, কোন চিন্তা নাই, আমি এখনই সমুদয় পাক করিয়া দিতেছি।

তখন বধূ ও চাকরানী মিলিয়া সমস্ত পাক করা দ্রব্যাদি ফেলিয়া দিয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেলিল এবং নূতন করিয়া সমুদয় আয়োজন করিয়া পাক করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল। ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেলে বধূ হাঁড়ি তুলিয়া শাঁখা খাড়ু মাজিবার জন্য একটু পিটুলি হাতে লইয়া ঘাটে গা ধুইতে গেল। পাড়ার মেয়েরা তখন ষষ্ঠী পূজা শেষ করিয়া উলু দিতেছে। উলু শুনিয়া বধূর ষষ্ঠীর কথা মনে পড়িল। বধূ বলিল, আজ না ষষ্ঠী, আমার ত সে কথা মনে নাই। তখন তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া গাছ হইতে একখানা মাচপাতা কাটিয়া আনিয়া তাহার উপর হাতে যে পিটুলি ছিল, তাহা দিয়া গাই বাছুর তৈয়ার করিল, সিঁথি হইতে সিন্দূর তুলিয়া গাই বাছুরের কপালে দিল, ছয় কুড়ি ছয় গাছা দূর্বা তুলিয়া আনিল, গাছ হইতে ফুল বেলপাতা তুলিয়া আনিয়া নিজেই ষষ্ঠী পূজা করিল। কথা শুনিল। তারপর সেই নির্মাল্য ফুল দূর্বা কুড়াইয়া রান্না ঘরের পিছনে যেখানে বাছুরের হাড়গোড় পড়িয়া ছিল, তার উপরে ফেলিয়া দিল। অমনি বাছুর বাঁচিয়া উঠিল। বধূ বাড়ির ভিতরে আসিলে শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি হইয়াছে, কেন এত জিনিসপত্র নষ্ট করিলে, আমার মনে সন্দেহ হইতেছে, আমাকে সমস্ত খুলিয়া বল। তখন বধূ সমস্তই বলিল। শ্বশুর শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন।

পাবনা, ১৯৪০

মন্তব্য

কাহিনীটি অত্যন্ত বিশেষত্বপূর্ণ। বাছুরের মাংস রান্না করিবার ভিতরে বহু জটিল সমাজতত্ত্বের বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে যুগে গোমাংস আহারের রীতি এ দেশের সমাজে প্রচলিত ছিল, সেইযুগেই কাহিনীটি উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সে যুগ বৌদ্ধযুগেরও পূর্ববর্তী যুগ। এত সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই সংস্কারের ধারা যে কি ভাবে এই কাহিনীতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

২

লোটন

এক গৃহস্থের ছয় ছেলে, ছয় বৌ, একটি মেয়ে। মেয়ের নাম কথা। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী থাকে। বুড়ো বুড়ী স্বর্গে যাচ্ছেন। বুড়ীর ছয়টি সোনার লোটন ছিল, ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীতে বাহির করিত, অম্বল দিয়া মাজিত, গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া পুজা করিত—কথা শুনিত। এখন ঐ লোটন কয়টি কাহাকে দিয়া যাইবেন, কে এইরূপে পুজা করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইলেন। অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, যে বৌটি শান্ত, সুশীলা, যাহার প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে, লোটন কয়টি তাহাকে দিয়া যাইবেন। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে কে লক্ষ্মী, তাহার পরীক্ষার জন্য এক উপায় বাহির করিলেন। নিজের ঘরটির মধ্যে চাউল দাইল মসল্লা সব একত্র মিশাইয়া ঘরময় ছিটাইয়া ছয়টি বৌকে ডাকিলেন। প্রথমে বড় বৌ আসিলেন, শাশুড়ী বলিলেন, বৌমা, আমার এই ঘরখানা যেখানকার যে জিনিস, সেইখানে সেই জিনিস রাখিয়া ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেও। বড় বৌ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিলেন যে ভয়ানক কাণ্ড—সমস্ত একাকার। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পারিবেন না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বধূই বাহির হইয়া গেলেন। অবশেষে ছোট বৌ আসিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়া ঘরের অবস্থা দেখিলেন, দেখিয়া সমস্ত জিনিস ঝাড়িয়া বাছিয়া যেখানকার যে জিনিস সেইখানে তাহা রাখিয়া ঘরটি পরিষ্কার করিয়া ঝাঁট দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

শাশুড়ী বুঝিলেন যে ছোট বৌ-ই লক্ষ্মী ; তখন যত ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা সকলকে ভাগ করিয়া দিলেন। ছোট বৌকে গোপনে ডাকিয়া ঐ লোটন ছয়টি দিলেন, বলিলেন, এই লোটন ছয়টি যত্ন করিয়া রাখ, ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীতে বাহির করিবে, অম্বল দিয়া মাজিবে, গঙ্গাজল দিয়া ধুইবে এবং পুজা করিয়া কথা শুনিবে। ইহা গোপনে রাখিবে। আর আমার মেয়ে কথাকে আনিবে ও যত্ন করিবে।

বুড়ো বুড়ী স্বর্গে যাচ্ছেন, পুষ্পরথ আসিয়াছে। বুড়ো বুড়ী রথে উঠিয়াছেন, ছেলেরা বউরা সব রথের চাকা ধরিয়া কাঁদিতেছেন। সংবাদ পাইয়া কথা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া রথ চাপিয়া ধরিল। মাতা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, তোমার ধন সম্পত্তি ছোট বৌয়ের কাছে দিয়াছি, সে দিবে, সেই তোমাকে আনিবে, যত্ন করিবে, তাহাকে বলিয়া গেলাম। বুড়ো বুড়ী স্বর্গে

চলিয়া গেলেন। ভাইরা ভাইবৌরা বাপ-মায়ের ধন সম্পত্তি লইয়া সকলে পৃথক্ হইয়া গেলেন, কথা ছোট বৌয়ের ঘরে রহিল।

কথার মনে পড়িল, মায়ের যে ছয়টি সোনার লোটন ছিল, মা তাহা কাহাকে দিয়া গিয়াছে; ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করিল যে মা কাহাকে লোটন দিয়া গিয়াছে, তোমাকে দিয়া গিয়াছে? শাশুড়ীর নিষেধ থাকায় ছোট বৌ সে কথা কোন ক্রমে স্বীকার করিল না।

তখন কথা ভাইদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া দেখিল যে কাহার উপর লক্ষ্মীর দৃষ্টি নাই। মা যে ধন-সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিল, দুই দিনে তাহা নিঃশেষ করিয়াছে। পরণে সব ময়লা ছেঁড়া কাপড়, মাথায় তেল নাই। বাড়ীঘর সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। উঠানে ঘাস গজাইয়াছে, নাই নাই, খাই খাই। রাতদিন কলহ চীৎকার, এই সব দেখিয়া শুনিয়া কথা বুঝিল, ইহাদের কাহারও লক্ষ্মীর দৃষ্টি নাই। মা ইহাদের কাহাকেও লোটন দিয়া যায় নাই। ছোট বৌয়ের বাড়ীখানি দেখিল, বেশ পরিষ্কার। উঠান ঘর দুয়ার সব সুন্দররূপে নিকান, সিন্দুর পড়িলে সিন্দুর তুলিয়া লওয়া যায় এমন পরিষ্কার, ছোট বৌ নিজেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া আছে, কপালে সিন্দূর জ্বল জ্বল করিতেছে, উচ্চ শব্দ নাই। কথা বুঝিল, নিশ্চয় ইহারই কাছে লোটন আছে। কথা সন্ধানে থাকিল। পৌষ মাষ লোটন ষষ্ঠী, ছোট বৌ লোটন বাহির করিয়া অম্বল দিয়া মাজিল, গঙ্গাজল দিয়া ধুইল, ধুইয়া হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া স্নান করিতে গেল। কথা আড়ালে থাকিয়া সমস্তই দেখিয়াছিল; ছোট বৌ স্নান করিতে গেলেই ঘরে ঢুকিয়া একটি লোটন চুরি করিল। ছোট বৌ স্নান করিয়া আসিয়া লোটন বাহির করিতে গিয়া দেখে যে একটি লোটন নাই।

তখনই বুঝিতে পারিল যে কথা ইহা লইয়াছে। কথাকে ডাকিয়া বলিল যে ঠাকুর ঝি, আজ লোটন ষষ্ঠী, আমি লোটন বাহির করিয়া অম্বল দিয়া মাজিয়া গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া রাখিয়া ঘাটে গিয়াছি, এখন দেখি একটা নাই। তুমি ইহা নিশ্চয় লইয়াছ, তুমি ছাড়া আর কেহ ইহা লয় নাই। শীঘ্র বাহির করিয়া দাও, আমি পূজা করিব, কথা শুনিব। কথা বলিল, আমি লোটন লই নাই। তখন ছোট বৌ বলিল, তুমিই নিশ্চয় লইয়াছ। কথা বলিল, তুমি তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়া বল যে আমি লইয়াছি। ছোট বৌ ছেলের মাথায় হাত দিয়া বলিল, হাঁ, তুমিই আমার লোটন লইয়াছ।

এই কথা বলিবা মাত্র ছোট বৌয়ের ছেলে তখনই ঢলিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। ছোট বৌ তখন পুত্রশোকে পাগলের মত হইয়া মরা ছেলে কাঁধে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া একেবারে শ্মশান ঘাটে গিয়া মৃত পুত্র কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি আসিল। গভীর নিঝুম রাত্রি, মৃত পুত্র কোলে করিয়া ছোট বৌ বসিয়া রহিয়াছে। এমন সময় একখানি নৌকা আসিল, নৌকাখানিতে দুর্গার পূজা হইতেছে; পুরোহিত পূজা করিতেছে। ধূপ-ধূনা জ্বালিয়া দিয়াছে।

পাঁঠা মহিষ বলি হইতেছে। ঢাক ঢোল বাদ্য বাজিতেছে। সেই নৌকা ছোট বৌ গিয়া চাপিয়া ধরিল; বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার, ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। তখন তাহারা বলিল, আমরা ইহার বিচার করিতে পারিব না। পরে যে নৌকা আসিবে সেই ইহার বিচার করিবে, আমি সুখ সৌভাগ্য দিতে পারি, জীবন দিতে পারি না। সে নৌকা ছাড়িয়া দিল, পরে কালীর নৌকা আসিল। কালী পূজা হইতেছে, পাঁঠা-মহিষ বলি হইতেছে, ঢাক ঢোল বাদ্য বাজিতেছে, ধূপ-ধূনা জ্বলিতেছে। সেই নৌকা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার। ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। কালী বলিলেন, আমি সংহার-কালী, আমি সংহার করি, জীবন দিতে পারি না। পরে যে নৌকা আসিবে, সেই ইহার বিচার করিবে। পরে সরস্বতীর নৌকা আসিল। হংসের উপর বীণা হস্তে সরস্বতী বসিয়া আছেন। পুরোহিত পূজা করিতেছে, ঢাক ঢোল বাদ্য বাজিতেছে, সেই নৌকা গিয়া চাপিয়া ধরিল। বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার। ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। সরস্বতী বলিলেন, আমি সরস্বতী, লোককে বিদ্যা দান করি, আমি জীবন দিতে পারি না। পরে যে নৌকা আসিতেছে, সেই ইহার বিচার করিবে। পরে লক্ষ্মীর নৌকা আসিতেছে, সোনার সিংহাসনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী নারায়ণ বসিয়া আছেন, রুণুঝুনু বাদ্য বাজিতেছে। ধূপ-ধূনা জ্বলিতেছে, ছোট বৌ গিয়া নৌকা চাপিয়া ধরিল, বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার। ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। লক্ষ্মী বলিলেন, আমি লোকের ধনধান্য দিতে পারি, জীবন দিতে পারি না। পরে যে নৌকা আসিতেছে, সেই ইহার বিচার করিবে। পরে আসিল ধর্মের নৌকা। মুনি ঋষিরা বসিয়া ধর্ম আলোচনা করিতেছেন, বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ছোট বৌ আসিয়া সেই নৌকা চাপিয়া ধরিল, বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার, ইহার বিচার

করিয়া দিয়া যাও। তাঁহারা বলিলেন, আমরা লোককে ধর্ম শিক্ষা দিতে পারি, জীবন দিতে পারি না, পরে যে নৌকা আসিবে সেই ইহার বিচার করিবে। পরে আসিল কলির নৌকা; যত রকম পাপকার্য আছে, সব সেই নৌকায় হইতেছে। কলি মাকে পায়ের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়াছে, বৌকে মাথায় করিয়া লইয়াছে। ছোট বৌ সেই নৌকা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার, ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। কলি বলিল, আমার ত দেখিতেছ সব উল্টা বিচার, যত রকম পাপ আছে, সব আমার নৌকায় আছে, সুতরাং আমি ইহার বিচার করিতে পারিব না। পরে যে নৌকা আসিবে, সে-ই ইহার বিচার করিবে।

পরে আসিল ষষ্ঠীর নৌকা, রুণু ঝুণু বাদ্য বাজিতেছে, ধূপ ধূনা জ্বালিয়া দিয়াছে, সোনার সিংহাসনে মা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বসিয়া আছেন, রাঙ্গাপেড়ে একখানি শাড়ী পরিয়াছেন, সোনার কঙ্কণ দুইগাছি শাঁখার কোলে পরিয়াছেন, সিন্দূরের টিপ কপালে জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছে। পানে ঠোঁট দুইখানি টুকটুক্ করিতেছে। মুখখানি হাসি হাসি। পরের ছেলেটিকে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, আপনার ছেলেটি মাটিতে বসিয়া আছে। পরের ছেলের হাতে কলাটি দিয়াছেন, আপনার ছেলের হাতে খোসাটি দিয়াছেন। ছোট বৌ আসিয়া নৌকা চাপিয়া ধরিল, বলিল, সোনা হারায় যার, পুত মরে তার, ইহার বিচার করিয়া দিয়া যাও। মা ষষ্ঠী বলিলেন, ওকে নৌকায় তুলে নিয়ে এস। মরা ছেলে কোলে করিয়া ছোট বৌ নৌকায় আসিল। মা ষষ্ঠী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? তখন ছোট বৌ সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তখন ষষ্ঠী ঠাকুরাণী বলিলেন, এখন কলিকাল, অধর্মের রাজ্য সেইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক, তুমি বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়া এই মরা ছেলেকে ঘরের মেঝেতে বিছানা করিয়া শোয়াইয়া রাখিয়া এক-খানি থালা লইয়া হাঁড়ি হইতে পান্তাভাত বাড়িয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিও; কিন্তু মুখে দিও না। তখন তুমি পাগল হইয়াছ ভাবিয়া কথা সকলকে ডাকিয়া আনিবে। সকলেই তোমাকে মাথায় তেল দিয়া স্নান করাইতে বলিবে। কথা তোমাকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইতে লইয়া যাইবে, নিজেও স্নান করিবে। আগে আসিয়া যে কলসীর মধ্যে কথা সূতা রাখিয়াছে, তাহারই একখানা সূতা চুরি করিবে। কথা আসিয়াই সূতার খোঁজ করিবে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি স্বীকার করিও না। সে যখন বলিবে যে তুমিই নিশ্চয় লইয়াছ, তখন তুমি বলিও যে, তুমি তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়া বল যে, আমি লইয়াছি।

তখন কথা নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়া যেমন বলিবে যে তুমিই লইয়াছ, তখনই তার পুত্র ঢলিয়া পড়িয়া মরিবে। তখন পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলে বেশী কাঁদিতে দিও না ; কারণ, লক্ষ্মীর সন্তান, উহার চোখের জল মাটিতে পড়িলে পৃথিবীর শস্য হরণ করিবে, গাভীতে দুগ্ধ হরণ করিবে ; সুতরাং উহাকে বেশী কাঁদিতে দিও না, বলিও, ঠাকুরঝি, তুই চুপ কর্, আমি তোর ছেলেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তুই আমার লোটন বাহির করিয়া দে, আমি তোর সূতা দিচ্ছি ; এই কথা বলিলে ও পুত্রশোকের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোটন বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে, তখন তুমি উহার সূতা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে। লোটনগুলি একত্র করিয়া অম্বল দিয়া মাজিবে, গঙ্গাজল কাঁচা দুধ দিয়া ধুইয়া পুজা করিবে, কথা শুনিবে। আগে লোটন-ধোয়া জল ভাগিনার মুখে দিবে, ভাগিনা বাঁচিয়া উঠিবে। পরে নিজের ছেলের মুখে দিবে, ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে। এই বলিয়া ষষ্ঠী ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন।

তখন ছোট বৌ মৃত পুত্র কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়া ছেলেকে ঘরের মেঝেয় বিছানা করিয়া শোয়াইল। তারপর রান্নাঘরে গিয়া হাঁড়ি হইতে পান্তা ভাত বাহিব করিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, মুখে দিল না। কথা কোথা হইতে আসিয়া দেখিল, ছোট বৌ মৃত পুত্র ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়া পান্তা ভাত খাইতেছে। সেই তখনই গিয়া অন্য বধূদের ডাকিয়া আনিল, বলিল, দেখ আসিয়া ছোট বৌ পুত্রশোকে পাগল হইয়া মরা ছেলে ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়া পান্তাভাত খাইতেছে। বধূরা সকলেই বলিল, আহা, শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে! মাথায় তেল দিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আয়। কথা তখন তাড়াতাড়ি গিয়া ছোট বৌয়ের মাথায় খানিকটা তেল দিয়া হাত ধরিয়া স্নান করাইতে লইয়া গেল, নিজেও স্নান করিয়া আসিল। ছোট বৌ আগেই আসিয়া কলসীর মধ্যে উহার যে সূতা ছিল, তাহা হইতে একখানা সূতা চুরি করিল। তখন কথা ঘরে ঢুকিয়া কলসীর মধ্যে হাত দিয়া দেখিল, একখানি সূতা নাই। ছোট বৌকে বলিল, তুমি আমার সূতা লইয়াছ। ছোট বৌ বলিল, আমি তোমার সূতা লই নাই। কথা বলিল, নিশ্চয় তুমি লইয়াছ। বৌ বলিল, তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়া বল যে আমি তোমার সূতা লইয়াছি। কথা ছেলের মাথায় হাত দিয়া বলিল, তুমিই আমার সূতা লইয়াছ। এই কথা বলা মাত্র ছেলে ঢলিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। তখন কথা পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছোট বৌ বলিল, ঠাকুরঝি, কাঁদিস না, আমি তোর

ছেলে বাঁচাইয়া দিতেছি। তুই আমার লোটন বাহির করিয়া দে, আমি তোর সুতা দিতেছি। তখন পুত্রশোকে ব্যাকুল হইয়া কথা লোটন ফেলিয়া দিল। ছোট বৌও কথার সুতা ফেলিয়া দিল।

ছোট বৌ তাড়াতাড়ি লোটন লইয়া গিয়া অম্বল দিয়া মাজিল, গঙ্গাজল কাঁচা দুধ দিয়া ধুইয়া পূজা করিল, কথা শুনিল। তারপর সেই লোটন ধুইয়া জল লইয়া আগে ভাগিনার মুখে দিল, ভাগিনা বাঁচিয়া উঠিল। পরে সেই জল লইয়া নিজের ছেলের মুখে দিল, ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। তখন পাড়াপড়শীরা ছোট বৌকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

—পাবনা, বিমলা দেবী সংগৃহীত,

মন্তব্য

কাহিনীটি বাংলার পারিবারিক জীবনের একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসের মত। ইহার বাস্তব-ধর্মিতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। ইহার মধ্যে যে লোভের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা খাদ্যসংক্রান্ত লোভ নহে, বরং তাহার পরিবর্তে একটি বিশেষ মূল্যবান্ বস্তু সম্পর্কে লোভ। তাহা স্বর্ণনির্মিত লোটন বা নোটন। ইহা লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক্। ইহার অধিকার লইয়া ননদ এবং ভাজের মধ্যে যে বিবাদ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বর্ণনাটি ইহাতে ঔপন্যাসিক গুণ লাভ করিয়াছে। মৃতের পুনর্জীবন প্রাপ্তি ইহার প্রধান অভিপ্রায়।

৩

দাসীর লোভ

একদেশে এক বামন আর বাম্‌নী থাকত। বামনের একটি মাত্র ছেলে। ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে তারা খুব সুখে শান্তিতে বাস করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাম্‌নী মারা গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার পর বামন একদিন তার ছেলের বউকে বলল, বৌমা, আজকে আমি পাড়া-প্রতিবেশীকে খাওয়াব, তুমি ভাল করে রান্নাবান্না করে রেখ। বউ রাজী হয়ে গেল। সকাল সকাল উঠে চান করে সে উপরে রান্নার যোগাড় করতে গেল। কিছুক্ষণ পর রান্না-টান্না যখন শেষ হয়ে গেল, তখন সে ঝিকে বলল, তুই একটু মাংসটা চাক্ দেখি কেমন হয়েছে? মাংস খেয়ে ঝির এমন লোভ হ'লো যে চাক্‌তে চাক্‌তে সে সবটুকু মাংসই খেয়ে ফেলল।

তখন তো বামনী-বৌ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ঝিকে বলল, এখন আমি ঐ সব লোকদের পাতে কি দেব? এত বেলায় কোথাও কি মাংস পাওয়া যাবে!

ঝি তখন আর কি করে! মাংসের যোগার করতে গেল। সে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় গিয়ে দেখল, একটা বাছুর উত্তরমুখী হয়ে শুয়ে আছে। তখন সে বাছুরটাকে কেটে নিয়ে এল। নিয়ে মাংস রান্না করতে বলল। কিন্তু কিছুতেই মাংস আর সেদ্ধ হয় না। তখন বামনী-বউ বলল, তুমি কি মাংস এনেছ যে সেদ্ধ হচ্ছে না। তখন ঝি বলল, এতে একটু আদা রসুন দিয়ে দাও, তাতেই সেদ্ধ হয়ে যাবে।

তখন মাংসের মধ্যে আদা রসুন দিতেই মাংস সেদ্ধ হয়ে গেল। এই সব দেখে বামনী-বউ খুব অবাক হয়ে গেল। আর তার মনে খুব সন্দেহ হলো। ঝিকে বলল, আমি এই মাংস কাউকে দিতে পারব না। এদিকে নিমন্ত্রিত লোকেরাও সব এসে গেছে। তখন সে ঝিকে বলল, তুই জায়গা টায়গা করে দরজার কাছে কিছু তেল জল ছড়িয়ে দে, আমি যখন ভাত দিতে যাব, তখন পা-পিছলে এর মধ্যে পড়ে যাব, আর জাত অজাত এসে ঘরে উঠবে, তখন আর কারও খাওয়া দাওয়া হবে না। এই কথা ঠিক হওয়ার পর যখন বামনী-বউ খেতে দিতে গেছে, অমনি পা-পিছ্‌লে পড়ে তার দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

জাত অন্য জাত সব ঘরে ঢুকলো, ব্রাহ্মণদের আর খাওয়া হলো না। সব চলে যাওয়ার পর বামন তাকে জিজ্ঞাসা করল, বউমা, তুমি এ'রকম ভাবে পড়ে গেলে কেন?

তখন বামুনী-বউ সব কথা বামনকে খুলে বলল।

বামন তখন তার লক্ষ্মী বউএর কথা শুনে খুব খুশী হ'লো। কিন্তু বামুনী-বউ চিন্তা করতে লাগল, কেন এমন হ'লো? অনেকক্ষণ পরে তার মনে হলো, আজ না মূলো ষষ্ঠীর দিন। মাছ মাংস খাওয়া যায় না। সেই জন্যেই হয় তো আমাদের এমন অঘটন ঘটেছে। যাক্ তখন সে সমস্ত জায়গা-টায়গা লেপে ভাল করে মূলো এনে পুজার যোগাড় করে পুজা করল। মূলো ও নানারকম সব্জী দিয়ে তরকারী তৈরী করল। গরু, বছুর বানিয়ে ফুল জল দিয়ে সরষে ক্ষেতে ফুল জল দিতে গেল। গিয়ে দেখল যে একটা গরু হাম্বা হাম্বা করে খুব চেঁচাচ্ছে। তখন সে সামনে গিয়ে দেখল যে গরুটার পাশে একটা বাছুর কাটা অবস্থায় পড়ে আছে। তখন তার মনে হলো যে, ঝি নিশ্চয় এর থেকে মাংস কেটে নিয়ে গেছে। তখন ফুলজল ছিটিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মরা বাছুর বেঁচে উঠে হাম্বা হাম্বা করতে করতে মার কাছে ছুটে গেল।

—পাবনা

মন্তব্য

'বাছুরের মাংস' শিরোনামায় কাহিনীটি পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা তাহারই একটি পাঠান্তর মাত্র। পূর্ববর্তী কাহিনীতে, ছোট বৌ নিজেই মাংস চাখিতে চাখিতে রান্না করা সকল মাংস শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল, এই কাহিনীতে ছোট বৌয়ের পরিবর্তে দাসী মাংস চাখিয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। পুর্ববর্তী কাহিনীতে বাছুর কাটিয়া আনিবার ষড়যন্ত্রে বধূরও অংশ ছিল, বর্তমান কাহিনীতে ইহাতে বধূর কোন অংশ নাই, দাসীই নিজের দায়িত্বে এই কাজ করিয়াছে। বউ পরে একটি কাটা বাছুর দেখিতে পাইয়া সকল কথা বুঝিতে পারিয়াছে। যাই হোক, বাছুরের মাংস কাটিয়া আনিয়া রান্না করিবার পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। একাধিক সংগ্রহে যে ইহার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। মৃতের পুনর্জীবন দান ইহারও প্রধান অভিপ্রায়।

৪

খোঁড়া কবুতর

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আর তার এক মেয়ে। মেয়েটীকে রাখিয়া তাহার মা মরিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা-সিক্ষা করিয়া মেয়েটীকে পালন করে। সারাদিন পথে ভিক্ষা করিয়া বাড়ী আসিলে সেই মেয়েটী যে গরম ভাত গরম ব্যঞ্জন পাক করিয়া দেয়, ব্রাহ্মণ তাই খায় দায়, থাকে। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার মেয়েটীকে কহিল, মা! আমার যে তা শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন একদিন খাইতে ইচ্ছা করে। মেয়েটী সেই কথা শুনিয়া কহিল, আচ্ছা, বাবা, তোমাকে একদিন শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন খাওয়াইব। সেইদিন হইতে মেয়েটী তাহার বাবা যে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনে, তাহার মধ্য হইতে একটী করিয়া ধান বাছিয়া একটী লাউয়ের বখের মধ্যে রাখিতে লাগিল। এইরূপ রাখিতে রাখিতে কিছুদিন পরে লাউয়ের বখ ভরিয়া উঠিল। মেয়েটী সবগুলি ধান রৌদ্রে দিল। মনে, করিল শুকাইয়া ভানিবে এবং বাপকে শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন খাওয়াইবে।

ধান রৌদ্রে দিয়া ছোট মেয়েছেলে বাহিরে খেলা করিতে গিয়াছে, দেখিল, লক্ষ্মী-বাঁদরের এক ঝাঁক কবুতর পড়িয়া সবগুলি ধান খাইয়া ফেলিয়াছে; এই দেখিয়া মেয়েটী করিল কি? একটি পলো আনিয়া সেই ঝাঁকের উপর ফেলিয়া দিল। সব কবুতর উড়িয়া গেল, কেবল একটী খোঁড়া কবুতর যাইতে না পারিয়া পলোর তলে পড়িল। তখন সেই কবুতরটী ধরিয়া কহিল, তুই আমার সব ধান খাইয়া ফেলিয়াছিস্। আমি তোকে কাটিয়া বাবাকে শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন খাওয়াইব। তখন খোঁড়া কবুতর কহিল, আমি যদি তোর বাপকে শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন খাওয়াইতে পারি, তবে ত আমাকে আর মারবি না? মেয়েটী কহিল, না। তখন কবুতর কহিল, তুই এক কাজ কর, তুই ঐ সব তুষগুলি ঝাড়্। সে ঐ সব ঝাড়িয়া দুটী ধান পাইল। কবুতর কহিল, ধান দুটী আঁচলের মাঝে বাঁধিয়া রাখ, আর একবার কুমারবাড়ীতে যা। মেয়েটি ধান দুটী আঁচলে বাঁধিয়া কুমারদের বাড়ী গেল। যে কুমারের স্ত্রীলোকেরা কোনদিন তাহাকে ফিরিয়াও পুছে না, আজ তাহাকে দেখিয়াই সকলে কহিল, কে ও দরিদ্দির ব্রাহ্মণের কন্যা আসিয়াছ? বস্ বস! সে কিছুক্ষণ বসিয়া এ গল্প সে গল্প করার পর কহিল,

না বেলা গেল, এখন বাড়ী যাই। কুমার-স্ত্রীরা কহিল, আচ্ছা যাইবে ত আইস গিয়ে; গোটা চারেক পাতিল লইয়া যাও। সে কোমরে কাঁকলে করিয়া গুটী-চারি পাতিল লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কবুতর তাহাকে দেখিয়া কহিল, পাতিল পাইয়াছ? সে কহিল, হাঁ পাইয়াছি। আচ্ছা বেশ, ওগুলি ভাল করিরা রাখিয়া আজ রাত্তির পোহাইলে কাল একবার জেলের বাড়ী যাইও।

মেয়েটী পরদিন উঠিয়া জেলের বাড়ী গেল; লক্ষ্মীর দৃষ্টি হইয়াছে, তাই জেলেনীরা যাহারা কেহই কোন দিন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় নাই, আজ তাহারা তাহাকে দেখিয়াই কহিল, কে ও দরিদ্রের ব্রাহ্মণের কন্যা আসিয়াছ? বস! মেয়েটী কিছুক্ষণ বসিয়া গল্পসল্প করার পর কহিল, বেলা পড়িয়া গেল, এখন বাড়ী যাই। তাহারা কহিল, আচ্ছা আইস, দুইটা ভাল মাছ লইয়া যাও, বাপে-বেটীতে পাক করিয়া খাইও। ব্রাহ্মণ-কন্যা মাছ লইয়া বাড়ী আসিলে কবুতর কহিল, আজ মাছ পাইয়াছ? মেয়ে কহিল, হাঁ, পাইয়াছি। আচ্ছা বেশ, তুমি এখন স্নান কর। স্নান করিয়া দুইটী নূতন পাতিল আথার উপর দিয়া জাল ধরাইয়া দাও, আর পাতিল ভরিয়া জল দিয়া ধান দুইটী দুই পাতিলের মধ্যে ছাড়িয়া দাও। তুমি চোখ বুজিয়া আথার সম্মুখে বসিয়া "আমার আছে উপরি লক্ষ্মীর বর, ভাত ব্যঞ্জনে ঘর ভর" এই বলিও, আমি যখন ডাকিয়া উঠিব, তখন চোখ মেলাইও। ব্রাহ্মণ-কন্যা স্নান করিল, স্নান করিয়া দুইটা নূতন পাতিল আথার উপর দিল, দিয়া পাতিল জলে ভরিয়া দুটা ধান ছাড়িয়া দিল; দিয়া জাল ধরাইয়া দিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিল; কহিল "আমার আছে উপায়-লক্ষ্মীর বর, ভাত ব্যঞ্জনে ঘর ভর"। কিছুক্ষণ পরে খোঁড়া কবুতর ডাকিয়া উঠিল, কন্যা চোখ মেলাইয়া দেখিল যে তার তালপাতার কুঁড়ে উড়ে গেছে, বেবাক তা উড়ে পুড়ে গেছে; উয়ারী চুয়ারী দক্ষিণদ্বারী ঘর হয়েছে, রাম-লক্ষ্মণ গোলা হয়েছে, দাস-দাসী।

হাতী ঘোড়া লোকজনে বাড়ী থৈ থৈ করিতেছে, পাঁচ ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, পিঠা পরমান্নে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। তখন কবুতর কহিল, কি কন্যা! এখন তোমার বাপ শীতল ভাত শীতল ব্যঞ্জন খাবে? কন্যা কহিল, হাঁ খাবেন। আর এইকথা যেন কোনদিন কাহাকেও কহিও না, কহিলে বাঁচিবে না। কন্যা স্বীকার করিয়া কবুতর ছাড়িয়া দিল।

বেলা চারি কি ছয় দণ্ড থাকিতে দরিদ্দির ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ঝোলা কাঁধে করিয়া বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিল যে, তালপাতের কুঁড়ে নাই, কোন মোগল

পাঠান আসিয়া সেইখানে বাড়ী করিয়াছে। ভয়ে একপা এগোয় ত তিন পা পিছায়। মনে মনে ভাবিতেছে, বাড়ীতে আমার একমাত্র মেয়েটি ছিল, তারই বা কি হইল, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা লাগে দেখিয়া কন্যা ভাবিল, বাবা এখনও ফিরে না কেন? বোধ হয়, হঠাৎ লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে এত পরিবর্তন হওয়ায় ভয়ে ভয়ে বাড়ীতে আসিতেছে না। এই ভাবিয়া চাকর পাঠাইয়া দিল, কহিয়া দিল যে, ভিক্ষার ঝোলা কাঁধে করিয়া যদি কোন ব্রাহ্মণকে বাড়ীর এদিক ওদিক্ ঘুরিতে দেখিস, তবে তাহাকে লইয়া আসিস। চাকর গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বোঝা কাঁধে লইয়া ঘুরিতেছে। তখন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিল। বাড়ীর ভিতর গিয়া কন্যাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। কহিল, মা! আমার এমন হইল কেমন করিয়া? মেয়ে কহিল, বাবা। আগে হাত পা ধোও, জল খাও, সুস্থ হও, পরে শুনিও। বৃদ্ধ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হাত পা ধুইয়া নানা উদ্যোগে জল খাইয়া কন্যাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল, মা! এখন বল তুমি, আমার এ'সব কোথা হইতে আসিল? তখন কন্যা কহিল, বাবা, সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই। সে কথা শুনিলে আমি বাঁচিব না। দরিদ্দির ব্রাহ্মণ কহিল, মা, তুমি যদি না বাঁচ, তবে আমার ও কথায় কি কাজ আছে? আমি শুনিতে চাই না। এই বলিয়া খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়ন করিল। এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মীর কৃপায় ব্রাহ্মণ তাহার কন্যাটিকে লইয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিছুদিন পরে এক রাজা তাহার লোকজন হাতী ঘোড়া লইয়া মৃগয়া করিতে ঠিক সেইখানেই আসিয়া উপস্থিত হইল, সেইখানে আসিয়াই তাহার অত্যন্ত জল-পিপাসা লাগায় একজন লোককে ডাকিয়া কহিল, দেখ, আমার অত্যন্ত জল-পিপাসা হইয়াছে, নিকটেই ঐ যে একটি জমিদারের বাড়ী দেখা যাইতেছে, ঐখানে গিয়া দেখ একটু জল পাও কি না? লোকটি দৌড়াদৌড়ী করিয়া সেই বাড়ীতে গেল। যাইয়া দেখিল, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা সেই বাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছে, তাহার নিকট গিয়া কহিল, মা, আমাকে একটু জল দিবে? আমাদের রাজার বড়ই জল-পিপাসা হইয়াছে তিনি খাইবেন। কন্যা এই কথা শুনিয়া এক পাত্র জল ও একটী আম তাহার নিকট দিল। লোকটি জল খাইয়া রাজাকে দিল, এইরূপে রাজকটক শুদ্ধ সকলেই জল খাইল; তবুও সেই এক পাত্র জল যেমন তেমনি থাকিল। রাজা যখন এই কথা শুনিল, তখন মনে মনে ভাবিল যে, এই কন্যা সামান্য মেয়ে নয়, নিশ্চয় ইহার উপর

লক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। এই মেয়ের কে কে আছে এবং দত্তা কি অদত্তা, তাহা জানিবার জন্য পরদিন আবার একটি লোক পাঠাইয়া দিল। লোকটি সে দিন যাইয়া কন্যাকে কহিল, মা, তোমার কে কে আছে? তোমার বিবাহ হইয়াছে, কি হয় নাই? কন্যা কহিল, আমার কেবল পিতা আছেন। তিনি সন্ধ্যা করিতেছেন, তুমি বস, তাঁহার আহ্নিক হইলে দেখা হইবে। লোকটি বসিল। কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রাহ্মণ আসিলে লোকটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর! আপনার কন্যা দত্তা কি অদত্তা? ব্রাহ্মণ কহিল, আমার কন্যা এখনও অদত্তা। এই শুনিয়া লোকটি কহিল, আমাদের রাজা যে আপনার ঐ মেয়েকে বিবাহ করিতে চান। ব্রাহ্মণ কহিল, আমার সে ত সৌভাগ্যের কথা; আমি রাজ-জামাতা পাইব, এ বড়ই সুখের কথা, ইহাতে আমার অমত নাই। লোকটি রাজার নিকট গিয়া সব কহিল। রাজার সন্তোষ হইল। কিছুদিন পরে রাজা শুভদিন ক্ষণ দেখিয়া কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনার বাড়ীতে লইয়া গেল। রাজার আগে ছয় বৌ ছিল। নূতন বৌ লইয়া বাড়ীতে গেলেই তখন সাত বৌয়েরই সাত দিন পাক করিবার পালি পড়িল। ছোট বৌয়ের লক্ষ্মীর দৃষ্টি— সে তার যেদিন পাক করিবার পালি পড়ে, সেদিন রাজার সহিত বসিয়া পাশা খেলে।

তারপর স্নান করিয়া পাকের ঘরে যাইয়া হাঁড়িতে চাউল জল দিয়া কহে যে, "আমার আছে উপায়-লক্ষ্মীর বর, ভাত ব্যঞ্জনে ঘর ভর।" অমনি চক্ষের নিমিষে পাঁচ ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ঘর ভরিয়া যায়। রাজা, চাকর, চাকরাণী, লোকজন সকলেই খাইয়া সন্তোষ হয়। এই রকম করিয়া দিনের পর দিন ছোট বৌয়ের খ্যাতি বাড়িতে লাগিল। আর যে দিন অন্যান্য বৌদের পালি থাকে, সেদিন তাহারা ভোরে উঠিয়া স্নান করে, চাকর চাকরাণীকে স্নান করায়, চাল ডাল ধোয়া বাঁটনা বাটা, কুটনা কোটা এই সব কাজকর্মের জন্য ভোর হইতেই পাড়ার ভিতর একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া যায়। পাক শাক হইতে হইতে বেলা পড়িয়া যায়। সেই তিতিয়া প্রহর বেলায় কেহই খাইয়া সন্তোষ হয় না। ভাত হয়ত ভাল হয় না, ভাল হয়ত ব্যঞ্জন হয় না; এই রকম নিত্য দিনেই একটা না একটা গণ্ডগোল হয়ই। তখন বড় ছয় রাণী ভাবিল, আমরা কত করিয়া খাটিয়া খুটিয়া নাম পাই না। আর ঐ ছোট রাণী তাহার পালির দিন বেলা দুপ্রহর পর্যন্ত পাশা খেলিয়া চক্ষের নিমিষে পাক সারা করিয়া ফেলে, আর সব লোকজনও খাইয়া দাইয়া বড়ই সন্তোষ হয়, ইহার কারণ কি? যাই হউক;

আমরা জিজ্ঞাসা করিলে ছোট বৌ কোন উত্তর দিবে না। আজ রাজাকে আমরা কহিব। তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া রাজাকে কহিল, ছোট বৌ চক্ষের নিমিষে পাক শাক সারা করিয়া ফেলে, লোকজনও খাইয়া দাইয়া সুখী হয়, আমরা হাজার পরিশ্রম করিয়া পাক শাক করিলেও অত সকাল সকাল শেষ করিতে পারি না, লোকজনকে খাওয়াইয়াও অত সন্তোষ করিতে পারি না। ইহার কারণ কি? তুমি আজ ছোট রাণীকে তাহা জিজ্ঞাসা করিও। রাজা ভাবিল, ঠিকত তাই? আচ্ছা, আমি আজ জিজ্ঞাসা করিব। এই বলিয়া ছোট রাণী যখন খাওয়া দাওয়ার পর রাজার কাছে আসিল, তখন রাজা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ছোট রাণী, তুমি এত দেরি করিয়া পাক সাক করিতে যাও, অথচ চক্ষের নিমিষে সব সারা করিয়া ফেল, লোকজনও খাইয়া দাইয়া সুখী হয়, ইহার কারণ কি? তোমাকে আজ তাহা কহিতেই হইবে।

রাণী কহিল, রাজা! তোমার সে কথা শুনিয়া কাজ নাই। রাজা কহিল, তোমার কহিতেই হইবে, আমি শুনিব। তখন রাণী কহিল, আচ্ছা, আগে আমার একটী বেটা ছেলে হউক, তারপর কহিব। কিছুদিন পর রাণীর একটী বেটা ছেলে হইল। তখন রাজা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, রাণী, এখন তুমি সেই কথার উত্তর দাও। রাণী কহিল, রাজা, আমার আর একটী কন্যা হউক, তারপর কহিব। কিছুদিন পর একটী মেয়ে হইল। তখন রাজা আবার একদিন রাণীকে ঐ কথা কহিল। রাণী কহিল, না রাজা, তোমার সে কথা শুনিয়া কাজ নাই, আমরা দুইজনে বেশ সুখে সংসার করিতেছি, তুমি সে কথা শুনিও না, তোমার শুনার দরকার নাই।

রাজা কহিল, না রাণী, তোমায় কহিতেই হইবে, আমি শুনিব। তখন রাণী বেটাবেটিকে কোলে লইয়া খাটের উপর হইতে মেজেতে নামিয়া আসিল; আসিয়া কহিল, রাজা, এখনও তোমাকে কহিতেছি, সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই। রাজা কহিল, না রাণী, আমি নিশ্চয়ই শুনিব, তুমি বল। তখন রাণী ছেলে মেয়েকে কোলে লইয়া বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের ঘাটে গেল, যাইয়া কহিল, রাজা। এখনও কহিতেছি, তুমি সে কথা জানিও না, আমরা দুইজনে বেশ সুখে সংসার করিতেছি, তোমার শুনিয়া কাজ নাই। রাজা কহিল, না রাণী, তুমি বল। তখন রাণী ছেলে ও মেয়েকে রাজার কোলে দিয়া গলা পর্যন্ত জলে নামিয়া রাজাকে কহিল, রাজা, এখনও কহিতেছি, তুমি সে কথা শুনিও না। আমরা বেশ সুখে সংসার করিতেছিলাম। রাজা তখনও কহিল,

না রাণী, তুমি বল। তখন রাণী কহিল, 'আমার আছে উপায়-লক্ষ্মীর বর। রাজা! তুমি যাও ঘর।' এই না কহিয়াই রাণী ডুব দিল; দুদণ্ড যায়, চারি দণ্ড যায়, আর রাণী উঠিল না।

রাজা কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বেটা ও বেটীকে লইয়া ঘর-সংসার করিতে লাগিল। লক্ষ্মীর বরে ধনে জনে পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিল।

বগুড়া—সংগ্রাহক: গিরীন্দ্র মোহন মৈত্র, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (রঙ্গপুর-শাখা), ১৩১৪, ৩য় সংখ্যা,

মন্তব্য

ইহার প্রথম অভিপ্রায় অফুরন্ত জল পাত্র। একটি মাত্র জল পাত্র হইতে রাজা এবং রাজার সকল কটক (সৈন্যদল) জল পান করিল। এই প্রকার অক্ষয় তূণের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। তারপর অদম্য কৌতূহল ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ছোটরাণীর কর্মকুশলতার গোপন-রহস্য জানিবার কৌতূহল রাজার অদম্য হইয়া উঠিল, তাহার ফলেই ছোটরাণীর মৃত্যু হইল। এই প্রকার কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা মৃত্যুবরণ করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আর একটি অভিপ্রায় বাধা-নিষেধ বা taboo, ইহা ভঙ্গ করিয়াই রাণীর মৃত্যু হইল। কাহিনীটি বিয়োগান্ত, কিন্তু সাধারণত লোক-কথা বিয়োগান্ত হয় না, ইহা তাহার একটি ব্যতিক্রম।

৫

দরিদ্রের লোভ

এক দরিদ্রা ব্রাহ্মণী শিশু-সন্তান লইয়া বাস করিত। বালকটি পাঠশালায় যাইত। তাহাদের বড় কষ্ট, অন্যান্য অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরা তাহাদের নিজেদের আহারের গৌরব করিত। বালক আসিয়া তৎসমুদয় তাহার মাতাকে জানাইত। বলিত, মা, ঝোল কি? মা পুত্রকে বলিলেন, আচ্ছা কাল তোমাকে মাছের ঝোল খাওয়াইব। পরদিন প্রাতে উঠিয়া বালক পাঠশালায় গেল। মা ঐ দিন দেখিলেন যে, এক মেছনি মাছ লইয়া যাইতেছে। মা তাহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, আমাকে দশ কড়ার মাছ দাও; ফিরিবার সময় দাম লইয়া যাইও। মেছনি দশ কড়ার মাছ দিল। মাতা পুত্রের জন্য ক্ষুদ ফুটাইয়া রাখিলেন এবং মাছের ঝোল রাঁধিলেন। পুত্রটি তখনও পাঠশালা হইতে ফিরে নাই। ইতিমধ্যে মেছনি তাহার দাম লইবার জন্য উপস্থিত। ব্রাহ্মণী বলিলেন, বাছা, আমাকে দশ কড়া ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়া তোমাকে দিতে হইবে।

তুমি কাল লইয়া যাইও। মেছনি বলিল, তবে আমার মাছ ফেরৎ দিন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, আমি রাঁধিয়া ফেলিয়াছি, তোমাকে কেমন করিয়া ফেরত দিব? সে বলিল, ঐ মাছই দিন, আমি খাইতে খাইতে বাড়ী যাইব। ব্রাহ্মণী ঝোলের ভিতর হইতে দুইখানি মাছ তুলিয়া দিল, মেছনি তাহাই খাইতে খাইতে চলিয়া গেল।

পরে পুত্র আসিয়া ঐ ক্ষুদের ভাত মাছের অবশিষ্ট ঝোল দিয়া পরিতোষের সহিত আহার করিল; বলিল, মা! মাছের ঝোল এমনই কি সুন্দর! মা বলিল, তুমি ভাল খাইতে ভালবাস, আচ্ছা নিকটেই রাজার পিতার শ্রাদ্ধ; বেশী দেরী নাই। ঐ দিন রাজবাটীতে গিয়া বিবিধ সুখাদ্য আহার পাইতে পারিবে। পুত্র বলিল, রাজবাটী! সেখানে আমার মত দরিদ্রের কি আহার জুটিবে? আমি কি তথায় প্রবেশ করিতে পারিব? মাতা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, রাজবাটীতে গরীব কাঙ্গালের জন্য ব্যবস্থাও থাকিবেই। তুমি নিশ্চয় যাইতে পারিবে। ক্রমে শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত, বালক আশাপুর্ণ হৃদয়ে রাজবাটীর উদ্দেশ্যে চলিল; কিন্তু কেহই তাহার মত দরিদ্রকে প্রবেশ করিতে দিল না।

খিড়কির দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সে দ্বারও প্রহরী রক্ষিত, কি করিবে? ফিরিয়া আসিয়া অদূরে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল। দেখিল, রাজার ভৃত্য এক দল হাঁস চরাইয়া হাঁসগুলি সহ

রাজবাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। বালক দেখিল, ঐ হাঁসগুলির মধ্যে একটি খোঁড়া হাঁস অনেক পশ্চাতে যাইতেছে। বালক ঐ হাঁসটি লইয়া পালকের অজ্ঞাতে বাড়ী ফিরিল ও ঐ হাঁসটিকে মারিয়া ফেলিল। মাতাকে উহা রাঁধিয়া দিতে বলিল। ব্রাহ্মণী তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, কেন এ কার্য করিলে? রাজার লোকেরা তোমার ও আমার উভয়েরই সর্বনাশ করিবে। বালক শুনিল না। মাতা অগত্যা ঐ খোঁড়া হংসের ঝোল রন্ধন করিয়া দিল এবং বালক তৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিল, ঐ হংসের পালকগুলি ছাই-গাদার ভিতর লুকাইয়া রাখিল।

হংসপালক প্রতিদিন রাজার সম্মুখ দিয়া হংসগুলিকে লইয়া যাইত। রাজা দেখিলেন, ঐ পালের মধ্যে খোঁড়া হাঁসটি নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হংসরক্ষক তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। রাজার আদেশে চারিদিকে অনুসন্ধান পড়িয়া গেল। অবশেষে অপরাধী বালক ধৃত হইল এবং রাজা তাহার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

এদিকে দরিদ্র মাতা কাঁদিয়া আকুল। নিকটে এক গৃহস্থের বাড়ীতে শুভচুনির পূজা হইতেছিল। সকলে তাহাকে পরামর্শ দিল, গৃহস্থের বাটীতে গিয়া শুভচুনির নিকট মানত কর। বৃদ্ধা তাহাই করিল এবং দেবীর নিকট তাহারা দুর্ভাগ্যের কথা কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিল। শুভচুনি তাহার কাতরতা দেখিয়া প্রসন্না হইলেন এবং রাজাকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, অচিরাৎ ঐ বালককে মুক্ত করিতে এবং অর্ধেক রাজ্য দিয়া রাজকন্যার সহিত উহার বিবাহ দিতে। দেবীর আদেশ পাইয়া রাজা তাহাকে মুক্ত করিলেন; স্বীয় কন্যার সহিত ঐ বালকের বিবাহ দিলেন এবং তাহাকে রাজত্বের অর্ধেক প্রদান করিলেন।

—ঢাকা, বিক্রমপুর, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৪

মন্তব্য

কাহিনীটি সুবচনীর ব্রতকথারূপে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেই সামান্য পাঠান্তর সহ সংগৃহীত হইয়াছে। কাহিনীর প্রথম অংশটি বাস্তব, শেষাংশে দৈব-প্রভাবের কথা আছে। কোন কোন কাহিনীতে মরা হাঁসটিকে কেবলমাত্র পালকগুলি হইতেই বাঁচাইয়া ফেলিবার কথা আছে। এই শ্রেণীর কাহিনীর পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক।

লোভের দণ্ড

এক গৃহস্থ বৌ'র এক ছেলে ও ছেলের এক বৌ। জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন গৃহস্থ বৌ গাছ বেড়িতে গেল। ছেলের বৌ বলিল, আমি আসি। গৃহস্থ বৌ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। এই অবসরে ছেলের বৌটা কলা বাগান হইতে একটা কলার 'ডিগ্' নখে কাটিয়া আনিল এবং ব্রতের উপকরণের 'আগ' লইয়া বেশ করিয়া খাইল। কলা পাতাটি মুড়িয়া একটা গাইকে খাওয়াইল, বাড়ীতে কালী ও ধলী দুইটি বিড়ালী ছিল, দই মাখা হাতটি বিড়ালী দুইটিকে দিয়া চাটাইল।

শাশুড়ী ঘরে ফিরিয়া দেখিল, পুজার সমস্ত আয়োজনেরই আগ্ খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার মনে বড় কষ্ট হইল, বুঝিল, বৌ-ই এই কাজ করিয়াছে। তাহাকে খুব গালাগালি দিল, "ছুচি, আমি আমার যাদুরে 'বানা' দিতে পারলাম না, দূর (অ) তুই আমার বাড়ী থাক্যা"। গালাগালি দিয়া বৌকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। বৌ লেবু বাগানে আশ্রয় লইল। তার সুন্দর একটি ছেলে হইল। হওয়া মাত্রই ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া ছেলেটিকে লইয়া গেলেন, বৌ মায়ার প্রভাবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

অনেক দিন পরে গাইটার একটা বাছুর হইল; কিন্তু বাছুরটা পাওয়া গেল না। যে কলাগাছের ডিগ কাটিয়া আনিয়াছিল, সেই গাছটার একটা কাঁদি হওয়া মাত্রই কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মায়া করিয়া সমস্ত হরণ করিলেন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠের শুক্লা ষষ্ঠীর দিন বৌ এইরূপ করিতে লাগিল এবং প্রতি বৎসরই একটি ছেলে, একটা বাছুর এক কাঁদি কলা ষষ্ঠী ঠাকুরাণী হরণ করিয়া লইতে লাগিলেন, সাত বৎসর গেল সাতটি ছেলে ষষ্ঠী ঠাকুরাণী লইয়া গেলেন। পরের বৎসর শাশুড়ী এত রাগিয়া গেল যে, বৌকে গালাগালি দিয়া একেবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। "পোড়া কপাল, তোর পেটে হয়, ভুঁয়ে দেখ না, যা তুই আমার বাড়ী থাক্যা।"

ষষ্ঠীর ব্রতের দিন গাছ বেড়া দেখিতে দেখিতে বৌ চলিতে লাগিল। গ্রাম ছাড়াইয়া বনে পড়িল ও বনের পথে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী মন্দিরে

বসিয়া আছেন—পাশে সাতটি ছেলে, সাতটি কলার কাঁদি, সাতটা বাছুর; ষষ্ঠীর গায়ে খশ্‌ পাঁচড়া। দেখিয়া বৌ খৈট পাচড়াগুলি টিপিতে ও গালিতে লাগিল। ষষ্ঠীর বড় আরাম বোধ হইল। আধবোজা চোখে ষষ্ঠী বলিলেন, আমার খৈট পাচড়া কে গাল, আইও রাণী পুত্রবতী অইঅ।" ষষ্ঠী দেবী তিন বার এই বর উচ্চারণ করিলেন। তখন বৌ দেবীর সম্মুখে গলবস্ত্র হইয়া বলিল, "মা, তোমার বরে আমার পুত্র অইব; কিন্তু তুমি যে আমার সাত পোলা নিছ, হেইগুলি ফিরাইয়া দাও।" ষষ্ঠী চোখ মেলিয়া দেখিয়া বৌকে গালাগালি দিতে লাগিল,

"তুই ছুচা খাইবি ডগা খাইবি,
তুই কেমনে পুত পাইবি।"

অনেক অনুনয়ের পর দেবী প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, যদি তুই 'ষাট' মানাইয়া নিতে পারছ ত নে, পথ্‌ (অ) যাইতে যাইতে সাত পোলা তেল্যার তেলের হাঁড়ি ভাঙ্গব, তেইল্যা বেডা কিছু না কইয়্যা, ষাইট ষাইট কইয়া কোল (অ) লইব। আউল্যার ক্ষেত পাড়াইয়া যাইব। ষাইট ষাইট কইর্যা কোল (অ) লইব। এই রকম অইলে তুই পুত পাইবি। সাত পোলারে বাড়ীত নিয়াই তখন তখন বিয়া করাইবি।"

ষষ্ঠীর কথা শেষ হইলে ছেলেরা বলিতে লাগিল, বাড়ীত গিয়াই পাটে উঠ্‌ব—যা চাই তখনই তা দিবা, না অইলে ঢইল্যা পড়ব। নদীর এপারে থাক্যা বুকের দুধ গাইলা দিবা, হেই পারে আমার মুখ (অ) পড়ব। ঘর্‌ (অ) গিয়া মাসীর রাম-লক্ষ্মণ শঙ্খ ভাইঙ্গা ফালায়াম্‌', মাসী কিছু না কইব, ষাইট ষাইট কই(আ) কোলঅ লইব। পিসির শাড়ী ছিঁড়া ফালায়ম্‌, পিসি কিছু না কইব, ষাইট ষাইট কই (আ) কোলঅ লইব, তোমার শাশুড়ীরে এই হগল কথা জিজ্ঞাসা কৈরা আইও, যদি অয়, তবে নিতা পারবা।"

বৌ বাড়ী আসিয়া সকল বিষয়ের উপায় ও বন্দোবস্ত করিল, আউল্লারে টেকা দিল, তেইল্যা বেডারে টেকা দিল। খেয়ার মাঝিরে কৈয়া রাখল, "আমি যখন দুধ গাইল্যা দেই, তখন তুমি হেওৎ নিয়া জল হিচ্যা দিবা, পোলার মুখে জলের ফোঁটা পড়লে কৈবা দুধ পড়েছে।"

এক ছেলে বলিল, "আমকে হৈলের পোনা আর লাল হাগের অম্বল পাট(অ) তুইল্যা দিবা।" আর এক ছেলে বলিল, "আমারে তপ্তা পুলি দিবা।" তৃতীয় ছেলে বলিল, "আমারে বার বৎসরের জল দিবা।"......ষষ্ঠ

ছেলে বলিল, "দিদিমার নাক কাট্‌তে দিবা।" সপ্তম ছেলে বলিল, "বৌ আমাকে ষাট্ করবে।"

গৃহস্থ বৌ স্বীকৃত হইয়া ছেলে লইয়া ষষ্ঠীর পুরী হইতে বাহির হইল। চাষীর ধান ক্ষেত ভাঙ্গিল, চাষী ষাট্ ষাট্ বলিয়া কোলে তুলিয়া লইল। তেলীর তেলের ভাঁড় ভাঙ্গিল, তেলী বলিল,

"গেছে গেছে তেলের মাইট,
তবু আমার ষাইট্ ষাইট্॥"

বৌ ছেলে লইয়া বাড়ী আসিল, বিবাহের আয়োজন হইল। ছেলেরা তখনই পাটে উঠিল। ছেলেদের কথামত সকল কাজ করা হইল। দিদিমা নাকের উপর একটি পিঠালীর নাক বসাইয়া নাতির কাছে গেল, নাতি ধারাল ছুরি দিয়া নাক কাটিয়া ফেলিল, দিদিমা ষাইট্ ষাইট্ করিলেন। সপ্তম ছেলে বলিল, "বৌ আমাকে ষাইট্ করুক।" বৌ বলিল, "স্বামীকে কে কবে ষাট্ করে—লাজের কথা।" অনেক অনুরোধ উপরোধের পর বৌ স্বীকার করিয়া বলিল,

"জিউক প্রভু কুলের নন্দন
যার পস্‌সাদে পিন্দমু সিন্দূর চন্দন।"

—ত্রিপুরা জিলা, প্রতিভা, বৈশাখ ১৩২১

মন্তব্য

লোভী পুত্রবধূর দণ্ড স্বরূপ তাহার সাত পুত্র ষষ্ঠীদেবী হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, পরে ফিরাইয়া দিবার এই কাহিনী পুর্ববাংলার বহু স্থান হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। কাহিনীতে প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা রক্ষিত হইয়াছে।

বিড়ালের দোষ

এক ছিল গৃহস্থ, তাহার বৃদ্ধা মাতা পুত্র ও বধূসহ খুব ঘটা করিয়া অরণ্য-ষষ্ঠী ব্রত করিত। বধূটির ব্রত নিয়মাদিতে বিশ্বাস-ভক্তি ছিল না; সাংসারিক কাজ কর্মে মোটেই উৎসাহ ছিল না; চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যাদি ভোজন-স্পৃহা তাহার অতি বলবতী ছিল। শাশুড়ী বধূর কোন ত্রুটিতেই অসন্তুষ্ট হইত না; একমাত্র পুত্রবধূ বলিয়া তাহাকে কন্যার চেয়েও আদর যত্ন করিত।

একদা ষষ্ঠী ব্রতের আয়োজন করিয়া বৃদ্ধা পুত্রবধূকে পূজার ঘরে বসাইয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, বধূ খাদ্যোপকরণাদি দেখিয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া নৈবেদ্যাদির 'আগভোগ' খাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পর শাশুড়ী তথায় উপস্থিত হইয়া, উপকরণাদি প্রতি লক্ষ্য করিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করায় সে অম্লান বদনে বলিল যে, বিড়ালে 'আগভোগ' খাইয়াছে। শাশুড়ীর চিত্ত সরল, বধূর কথায় তাহার অবিশ্বাস জন্মিল না, বধূটি বিড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া শ্বশ্রূর চির আদরের পাত্রীই রহিয়া গেল; কিন্তু ষষ্ঠী ঠাকুরানীর কিছুই অলক্ষ্য রহিল না।

কালক্রমে বৃদ্ধা ইহলীলা সংবরণ করিল, গৃহস্থের স্ত্রীকে বাধ্য হইয়া সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করিতে হইত। একে বধূটি অলস, তাহাতে আবার গর্ভবতী, ঘর-কন্নায় তাহার ক্লেশের সীমা ছিল না।

যথা সময়ে বধূটির একটি পুত্র সন্তান জন্মিল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী এত দিনে তাহার পাপের শাস্তি দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মায়ায় ভুলাইয়া সন্তানটিকে মাতার ক্রোড়চ্যুত করিয়া লইয়া গেলেন। এইরূপ আরও ছয়টি সুসন্তান ষষ্ঠীদেবী তাহার অঙ্কচ্যুত করিয়া লইয়া গেলেন, একাদিক্রমে সাতটি সন্তান প্রসব করিয়া সাতটিকে হারাইয়া বধূ শান্তিশূন্য জীবন-ভার বহন করিতে লাগিল। অশান্তি-শেলের দারুণ আঘাতে তাহার চিত্ত প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল।

এইরূপে অনেক কাল অতিবাহিত হইল, পুত্র-শোকাতুরা জননী প্রায়শই বাড়ীর নিকটস্থ বনে যাইয়া বসিয়া বসিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বুক ভাসাইত। একদিন সে দেখিতে পাইল, এক অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী নারী এক বৃক্ষতলে বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। সে অগ্রসর হইয়া দেখিল, সেই পরমা সুন্দরী রমণীর পায়ে গোদ ও তাহা হইতে পুঁজ বাহির হইয়াছে। তখন সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি, মা, এখানে বিরস বদনে বসিয়া আছ?

তোমার পায়ের যন্ত্রণাতেই তুমি বুঝি কাতর হইয়াছ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমি ষষ্ঠী দেবী। বাস্তবিক আমি গোদের যন্ত্রণাতে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।"

যে এই গোদের পুঁজ জিহ্বা দিয়া চাটিয়া ফেলিতে পারিবে, সে যে বর চাহিবে, তাহাকে আমি সেই বর দিব। গৃহস্থের স্ত্রী অবিলম্বে অম্লান বদনে দেবীর গোদের পুঁজ জিহ্বা দ্বারা উঠাইয়া ফেলিয়া তাঁহার নিকট তাহার সাত পুত্র ফিরিয়া পাইবার বর চাহিল। ষষ্ঠী ঠাকুরানীর তখন পুর্ব কথা মনে পড়িল। তিনি গৃহস্থের স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাকে অভক্তি করিয়া ও নৈবেদ্যাদির 'আগভোগ' খাইয়া যে অন্যায় করিয়াছিলে, তাহার প্রতিফল তুমি পুর্ণরূপেই ভোগ করিয়াছ। এখন তোমার ছেলেদিগকে অবশ্যই ফিরিয়া পাইবে।

দেবীর কৃপায় গৃহস্থের স্ত্রী পুত্রদিগকে ফিরিয়া পাইয়া, তাহাদের চাঁদমুখ দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া দেবীকে ভক্তিপূতমনে প্রণাম করিয়া এবং তাহাদিগকে লইয়া হৃষ্ট মনে বাড়ী আসিল, পুত্রদিগকে ফিরাইয়া দিবার সময় দেবী বধূকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র সে দিন যে অন্যায় কার্য করিবে, উহার যেন কোন প্রতিবিধান না করা হয় এবং প্রতি বৎসরই ব্রত দিবসে কোন সন্তানকেই অসদাচরণের নিমিত্ত তিরস্কার না করা হয়। ছোট ছেলেটি সেদিন তেলী-বাড়ী যাইয়া তেলের মাইট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মাতা তেলীকে টাকা দিয়া তাহার রাগ দমন করিল ও ছেলেকে লইয়া বাড়ী আসিতে আসিতে বলিল,

ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তেলের মাইট
তবু বাছা আমার যাইট যাইট।

ছেলেটি তাহার মাসীর কান ধরিয়া টানিয়াছিল, মাসী তাহা নীরবে সহ্য করিল। দেবীর আদেশ গৃহস্থের স্ত্রী বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিল।

গৃহস্থের সংসার শান্তিপুর্ণ হইল। তাহার স্ত্রী প্রতি বৎসর ষষ্ঠী ঠাকুরানীর ব্রত ভক্তি সহকারে করিত। দেবীর দয়ায় গৃহস্থের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল, সে স্ত্রী পুত্রাদি সহ সুখে স্বচ্ছন্দে সময় যাপন করিতে লাগিল।

—ঢাকা, চাঁদপ্রতাপ পরগণা, অর্চনা, ১৩৩০

মন্তব্য

পূর্ববর্তী কাহিনীটিরই ইহা একটি আধুনিকতর সংস্করণ। পুরুষ সংগ্রাহক ইহাকে অনেকখানি ভাষার দিক দিয়া মার্জিত করিয়া লইয়াছেন।

বধূর লোভ

জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্য ষষ্ঠী। এক সওদাগরের ছেলে হয়, ছেলে বাঁচে না। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর আগবোল জিনিস সওদাগরের বউ খায়; সেই জন্যই ছেলে পিলে বাঁচে না। শাশুড়ী ষষ্ঠী পুজার জোগাড় করে রেখে স্নান করতে গিয়েছে; সওদাগরের বউ পূর্ণগর্ভা, দশমাস দশদিন; সে কি না গিয়ে সেই ষষ্ঠী পুজার আগবোল জিনিস সব খেয়েছে। সওদাগরের মা স্নান করে এসে দেখে যে পুজার জোগাড়ের সব জিনিষই অর্ধেক অর্ধেক করে বউটী খেয়ে ফেলেছে। শাশুড়ী বকাবকি করিয়া কি করবে! সেই খাওয়া জিনিস দিয়াই পুজা শেষ করল। তারপর কথা শুনতে বসেছে এমন সময় পাড়া-প্রতিবাস সকলে এসে বলল, "তোমার বেটার বেটা হ'য়ে মল।" সওদাগরের মা কাঁদতে লাগল, আমার এক নায়ের সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হ'চ্ছে, অরণ্য ষষ্ঠীর দিন। সওদাগরের বউ আবার গর্ভবতী—দশমাস। সওদাগরের মা সকলের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করল যে, "আমার পুত্রবধূ ত এবারও গর্ভবতী। পুজার আগবোল জিনিষ খায়, কি করব?" তখন সকলে বুদ্ধি দিল যে আর কিছু নয়, ভাসুরকে দরজায় বসিয়ে রাখ, তবেই কিছু খেতে পারবে না।

বুড়ী, পুজার উদ্যোগ কচ্ছে, আর বউকে বুঝাচ্ছে, "মা! পুজার আগবোল খেও না; তোমার কোলে জীয়ন্ত ছেলে হবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুজার উদ্যোগ আয়োজন সব করে বড় বেটাকে দরজায় বসিয়ে রেখে স্নান করতে গেল। বউ, তার জিবা বে'র হয়ে পাই পেঁচে ধরছে; চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যাচ্ছে, লোভ সংবরণ কর্তে পাচ্ছে না; কি করবে, ভাসুর দরজায় ব'সে আছে। বেড়া ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে গিয়ে ছাতু, কাঁঠাল, আম, সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। শাশুড়ী ডুব দিয়ে আসছে—ঘরের মধ্যে ভিজা কাপড়ে ভিজা চুলে যাচ্ছে; গিয়ে দেখে যে বউ সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। কি করবে, বুড়ী বকাবকি কচ্ছে, ঐ সব জিনিসই ধুয়ে নিয়েই তাই দিয়ে পুজার উদ্যোগ করে। সওদাগরের মা কথা শুনতে বসচে! পাড়া-প্রতিবাসী সকলে এসে বলল, "সওদাগরের মা! তোমার বেটার আর এক বেটা হ'য়ে ম'ল।" বুড়ী কাঁদছে, হায়! হায়! আমার দুই নায়ের দুই সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠমাস অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আসছে। সওদাগরের বউ আবার গর্ভবতী—দশমাস দশদিন। মা সকলের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করল যে, আমার বেটার বউ যে এবারও গর্ভবতী। প্রত্যেক বারই পুজার আগ্‌বোল জিনিস সব খেয়ে ফেলে ; এ'র উপায় কি করা যায় ? তখন সকলে বুদ্ধি দিল যে আর কিছু নয়, মামাশ্বশুরকে দরজায় বসিয়ে রেখে স্নান ক'রে এস। তাহলে খেতে পারবে না। বুড়ী পুজার উদ্যোগ আয়োজন কচ্ছে, আর বউকে বুঝাচ্ছে, মা! পুজার আগ্‌বোল কখনই খেও না, তোমার কোলে জিয়ন্ত ছেলে পাবে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বুড়ি যাচ্ছে। স্নান করে এসে পুজা করবে। বউএর আর সহ্য হচ্ছে না। জিব বের হ'য়ে ঘরের নাউই পেঁচে ধরছে, চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যাচ্ছে, লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছে না। কি করবে, মামাশ্বশুর দরজায় বসে আছে,ঘরের বেড়া ভেঙ্গে মধ্যে না গিয়ে ছাতু, কাঁঠাল, আম, দৈ যত ছিল, সব খেয়ে দেয়ে এসে বসে আছে। শাশুড়ী ডুব দিয়ে আস্‌ছে। আসতেই বেড়া ভাঙ্গা দেখে ভিজা কাপড় ভিজা চুলেই তাড়াতাড়ি করে ঘরের মধ্যে যাচ্ছে, গিয়ে দেখে যে বউ সব খেয়ে দেয়ে বসে আছে। কি করবে উপায় নাই ; বউকে বকাবকি ক'রে ঐ সকল জিনিস দিয়েই আবার পুজার জোগাড় ক'রে নিল, আর পুজা শেষ ক'রে কথা শুন্‌তে বস্‌ল। কথা শুন্‌ছে, এমন সময় পাড়াপড়সী সকলে এসে বলল যে, সওদাগরের মা, তোমার যে বেটার ছেলে হয়ে ম'ল। সওদাগরের মা আকুল হ'য়ে কাঁদতে লাগ্‌ল "হায়! আমার তিন নৌকার তিন সওদাগর হ'ত।"

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্যষষ্ঠীর দিন আসছে। সওদাগরের মা পুজার উদ্যোগ আয়োজন শেষ ক'রে সকলের সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছে ; সকলে বল্‌ছে যে, আর এবার কি করবে ? ঘরের বেড়া শক্ত ক'রে বেঁধে, আর দরজায় তালা দিয়ে রাখ! বুড়ী সেই রকমই ক'রে রাখ্‌ল। তারপর স্নান কর্তে যাচ্ছে। বউয়ের কি আর সহ্য হয় ? তার জিহ্বা দুই হাত বের হয়েছে, হ'য়ে ঘরের নাউই পেঁচে ধরছে, চক্ষের জলে বুক কাপড় ভেসে যাচ্ছে। কি ক'রে, ঘরের বেড়া ভেঙ্গে মধ্যে গিয়ে, পুজার জিনিস যত ছিল, সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে! বুড়ী স্নান ক'রে আস্‌ছে। এসেই দেখে যে ঘরের বেড়া সব ভাঙ্গা।

এই না দেখেই দৌড়াদৌড়ী করে ঘরের মধ্যে ভিজা কাপড় ভিজা চুলেই যাচ্ছে,গিয়ে দেখে বউ সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। কি করবে, তার উপায় নাই। বউকে বকাবকি ক'রে ফের ঐসব জিনিস দিয়েই পুজার জোগাড় কচ্ছে। পুজা

হচ্ছে। বুড়ী কথা শুন্‌তে বসেছে! পাড়াপড়শী সকলে এসে সংবাদ দিল, সওদাগরের মা, তোমার যে বউয়ের বেটা হয়ে ম'ল। সওদাগরের মা হায় হায় করতে লাগল। কেঁদে ব্যাকুল হলো! হায়! হায়! আমার চার নৌকার চার সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আসছে। সওদাগরের মা সকলের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ করছে যে এবার কি উপায় করব। সকলে বুদ্ধি দিল "শুকনা যবের ছাতু বউকে গুঁড়া করতে পাঠিয়ে দাও, বউ আসতে দেরী হবে, সেই সময় তোমার পুজা শেষ হয়ে যাবে।" বুড়ী বউকে বুঝাচ্ছে, মা! পুজার আগ্ কোন জিনিস খেতে নেই। কোলে জীয়ন্ত ছেলে পাবে। তুমি এই যবের ছাতু তৈয়ার করে আন। বউ কি করে? তাই গেল; বুড়ী স্নান করতে যাচ্ছে। বউ কিছুতেই যবের ছাতু করতে পাচ্ছে না। কেঁদে কেটে অস্থির হচ্ছে। হায় হায়, আমার এবার বুঝি কিছু খাওয়া হ'ল না। কাঁদতে কাঁদতে চক্ষের এক ফোঁটা জল একটা যবের উপর প'ল। বউ দেখে যে চোখের জল প'ড়ে যবটা ছাতু হয়ে গেল। তখন ভাবল, বুঝি জল দিলেই ছাতু তাড়াতাড়ি হবে। এই না বলে, সে ঘটিয়ে ঘটিয়ে জল এনে সেই যবের মধ্যে ঢেলে দিল। দিয়ে হাগাবাগি ক'রে ছাতু তৈয়ার ক'রে নিয়ে বাড়ী গেল। বাড়ী গিয়ে দরজা বেড়া সব ভেঙ্গে ভিতরে গেল। পুজার যোগাড় যত ছিল—ছাতু, দৈ, আম কাঁঠাল সব খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। সওদাগরের মা ডুব দিয়ে আস্‌ছে, এসে দেখে যে ঘরের বেড়া সব ভাঙ্গা। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখে যে সব জিনিস বউ খেয়ে দেয়ে ব'সে আছে। কি করবে? বকাবকি ক'রে সেই সব খাওয়া জিনিস দিয়েই পুজোর যোগাড় কচ্ছে। পুজো হচ্ছে। বুড়ী কথা শুন্‌তে বসেছে, এমন সময় পাড়া পড়শী সকলে এসে সংবাদ দিল, সওদাগরের মা! তোমার বেটার বউ-এর বেটা হ'য়ে ম'ল। বুড়ী কেঁদে কেটে ব্যাকুল হল। হায় হায়, আমার পাঁচ নৌকায় পাঁচ সওদাগর হ'ত।

ফের বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস। অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আসছে। বুড়ী সকলের সাথে বুদ্ধি পরামর্শ কচ্ছে যে বেটার বউ কিসে আগ্‌বোল খেতে না পারে। সকলের সঙ্গে বুদ্ধি ক'রে বুড়ী বউকে বলল, মা! এই টাকুয়ায় নগুণ যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত কা'ড় দিতে দিতে চলে যাও। যত দূর গেলে শেষ হয়, ততদূর যাও। মধ্যে জাগায় থেমো না। বুড়ী এক বৎসরে সব নগুণ কেটেছে। বউ কি করে, টাকুয়া নিয়ে নগুণ কা'ড় দিতে দিতে যাচ্ছে।

কত শ্মশান ঘাটে শ্মশান পাটে চলে যাচ্ছে, নগুণ আর ফুরায় না। অবশেষে শ্মশানের মধ্যে গিয়ে বউএর প্রসব বেদনা হ'ল। সেই শ্মশান ঘাটের মধ্যেই সওদাগরের বউএর এক পুত্র সন্তান জন্মাল। এদিকে সওদাগরের মা পুজা-আর্চা শেষ করে ষষ্ঠীর কথা শুনতে বসেছে, পাড়াপড়শী সকলে এসে সংবাদ দিল, সওদাগরের মা! তোমার বেটার বউয়ের যে এক বেটা হয়েছে। জীয়ত ছেলেই হয়েছে।

সওদাগরের মা এই কথা শুনে বড়ই সন্তোষ হ'ল। ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর কাছে মানাচিনা ক'রে শ্মশান ঘাটে ছেলে দেখ্‌তে গেল।

ছেলে দেখে সেখানেই তালপাতার এক কুঁড়ে বেঁধে দিল। ছেলে পোয়াতি সেই ঘরেই থাকল। ছেলে নিয়ে পোয়াতি শুয়ে আছে, রাত্রে বুড়া রাক্ষসী এল। এসে পোয়াতিকে বলল, "আগখাকী আগবুলানী, তার কোলে কেন জীয়ত ছেলে? ঘাটের পুৎ গোবিন্দ, তুমি আমার সাথে এস।" ছেলে বলল, "আমি মার কোলে আছি, কেমন ক'রে যাব। তবে ষাটোরের দিন যখন আমায় শুইয়ে রেখে ঘুমবে, তখন আমি যাব।" মায়ে তাই শুনল। ষাটোরের দিন ধাই ধরণী সাথে করে নিয়ে পোয়াতি ছেলে কোলে করে তাবৎ রাত্রি জেগে ব'সে থাকল! শেষ রাত্রে রাক্ষসী এল। ছেলেকে বলল, "ঘাটের পুৎ গোবিন্দ, তুমি আমার কোলে এস। আগখাকী আগবুলানী, তার কোলে কেন জীয়ত ছেলে?" ছেলে কহিল, "আমি মার কোলে আছি, মা জেগেই আছে, কেমন ক'রে যাই? যাই হ'ক দোষ না পে'লেত যেতে পারি না? তুমি মাকে গিয়ে ব'লো, আমি অন্নপ্রাশনের দিন নিশ্চয় মার কাছে যাব। সেই অন্নপ্রাশনের দিন পিসিমার কোলে উঠে তাঁর শাড়ী ভ'রে বাহ্য ক'রে দেব, হাড়ীর মার মাদল ভেঙ্গে দেব, তাহলেই সকলে দুর্ দুর্, ছেই ছেই কর্বে, আমিও সেই দোষে সেই দিন চ'লে যাব।" বুড়ী রাক্ষসী চ'লে গেল। এক মাস দুই মাস ক'রে ছয় মাসের ছেলে হল। দিন ক্ষণ দেখ্‌ল; গহনা গাঁঠরী গড়াল; ধান ভেঙ্গে চা'ল ক'ল্ল; কলাই ভেঙ্গে ডাল কল্ল; বিল ছেঁকে মাছ আন্‌ল, গাই ছেঁকে দুধ আন্‌ল, অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ যে যেখানে আছে, নিয়ে এল; কুলের কুলপুরোহিত আন্‌ল; মহা ধুমধাম্ ক'রে অন্নপ্রাশন দিচ্ছে।

পিসিমা বানারসী শাড়ী প'ড়ে আসচে। মা কি না কর্‌ল কি, দৌড়া-দৌড়ি ক'রে গিয়ে ননদকে কচ্ছে, "ঠাকুরঝি! খোকা তোমার কোলে আজ বাহ্যি করে দিয়ে তোমার শাড়ী নষ্ট ক'রে দেবে, তুমি তাকে কিছু বল না;

তোমায় আমি জড়ির শাড়ী দিব। সে যেমন বাহ্যি করবে, তুমি তাকে অমনি বোলো, ঘাটু ঘাটু ঘাটের পুৎ গোবিন্দ। তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে তোমার জড়ীর শাড়ী হবে।

তারপর হাড়ীকেও কহিল, "দেখ, আমার খোকা তোর মাদল ভেঙ্গে দিবে।

তুই বলিস ঘাটু ঘাটু ঘাটের পুৎ গোবিন্দ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমার সোনার মাদল হবে। তোরে আমি সোনার মাদল বানিয়ে দিব। কিন্তু তুই যেন কোন রকম অসন্তোষ হ'য়ে গালাগালি দিস্ না।" মহাধূমধাম ক'রে অন্নপ্রাশন হচ্ছে।

পিসিমা গিয়ে ছেলেকে কোলে নিচ্ছে; ছেলে কোলভরে বাহ্যি করে দিচ্ছে। এদিকে পিসিমা বল্‌ল, ঘাটু ঘাটু ঘাটের পুৎ গোবিন্দ, তুমি যদি বেচে থাক, তবে আমার সোনার শাড়ী হবে। তার কোলে থেকেই ছেলে কি না কর্‌ল কি, সেই হাড়ীর মাদলের উপর যেমন লাথি মারল, অমনি মাদলটা ভেঙ্গে গেল।

হাড়ী তৎক্ষণাৎ বল্‌ল, "ঘাট ঘাট ঘাটের পুৎ গোবিন্দ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমার সোনার মাদল হবে।" এই রকমে অন্নপ্রাশন হ'য়ে গেল।

নিশীথ রাত্রে মা ছেলেকে কোলে নিয়ে শুয়ে আছে, এদিকে বুড়া রাক্ষসী এসে উপস্থিত। বল্‌ছে, হতভাগী আগ্‌খাকী আগ্‌বুলানীর কোলে কেন জিয়ত ছেলে? ঘাটু ঘাটু ঘাটের পুৎ গোবিন্দ! আজ তুমি এস, তোমার মা তোমায় ডেকেছেন।

ছেলে বলিল, না না, আজ আমি যাই কেমন ক'রে? এদের কোন দোষ না পেলে যাওয়া যায় কি? যাই হউক, আজ তুমি যাও; আমি যে তা নগুনের দিন নিশ্চয় তোমার সাথে মার কাছে যাব। আমি সেইদিন নাপিতের ক্ষুর ভেঙ্গে দিব, আর খানসামার মাথা মোড়ায়ে ঘোল ঢেলে দিব; তবেই বাড়ী শুদ্ধ সকলে আমায় গালাগালি, দূর দূর, ছেই ছেই করবে, আমি সেই দোষে তোমার সাথে চলে যাব। একদিন দুইদিন করে নয় বৎসর যাচ্ছে, নগুনের জোগাড় হচ্ছে, সওদাগরের বাড়ীতে হুলস্থুল পড়েছে, আত্মকুটুম্ব, দাস-দাসীতে বাড়ী ভরে যাচ্ছে। কলাই ভেঙ্গে ডাল কচ্ছে, ধান ভেঙ্গে চাল কচ্ছে, বিল ছেঁকে মাছ আনছে, গাঁই ছেঁকে দুধ আনছে। মহাধূমধাম পড়ে গেল।

এদিকে সওদাগরের মা সেই নাপিতের কাছে গিয়ে বলছে যে, "দেখ্ নাপিত! খোকা যে আজ তোর ক্ষুরখানা ভেঙ্গে দেবে, তুই যেন অসন্তোষ হস্‌নে, গালাগালি দিস না, তবে আমার খোকার অকল্যাণ হবে। তুই বলিস্, ষাট ষাট ষাটের পুৎ গোবিন্দ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমার সোনার ক্ষুর হ'বে। আমি তোকে এক গাছা সোনার ক্ষুর দেব।" পরে খানসামার কাছে যাচ্ছে, তাকে বল্‌ছে, "দেখ্ রে খানসামা, খোকা আজ তোর মাথায় ঘোল ঢেলে দেবে। তুই যেন তাতে রাগিস্ না, কি কোন-রকম বকাবকি করিস না।" বলিস্, "ষাট ষাট ষাটের পুৎ গোবিন্দ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমি কত টাকা কত পয়সা পাব। তুমি বেঁচে থাক। তুই যত টাকা চা'স, তাই তোকে দিব।"

ছেলে গিয়ে নাপিতের কাছে বসছে, ব'সে তার ক্ষুর ভেঙ্গে দিচ্ছে, নাপিত বলছে, "তুমি যদি বেঁচে থাক, ত'বে আমার লোহার ক্ষুর গেল, সোনার হবে।" তারপর সেই খানসামার মাথা মোড়ায়ে ঘোল ঢেলে দিচ্ছে। খানসামা বল্‌ছে, "ষা'ট ষা'ট ষাটের পুৎ গোবিন্দ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আমি কত টাকা পয়সা পাব।" এই রকমে নগুনও হ'য়ে গেল।

নিশীথ-রাত্র মা ছেলে কোলে ক'রে শুয়ে আছে। বুড়ী রাক্ষসী এসে উপস্থিত। বল্‌ছে আগ্‌খাকী আগ্‌বুলানী হতভাগীর কোলে কেন জীয়ন্ত ছেলে? ষা'ট ষা'ট ষাটের পুৎ গোবিন্দ, আজ তুমি এস। আজ আর তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যাব না। তোমার মা আজ তোমায় ডেকেছেন। ছেলে কহিল, "না না, আজও কোন দোষ এই বাড়ীর পাই নাই। মার কোলে শু'য়ে আছি, যাই কেমন করে? বাড়ী শুদ্ধ সকলেই ষা'ট ষা'ট ষাটের পুৎ গোবিন্দ ব'লে বেঁচে থাকৃতে বলে। কোন দোষ না পেলে যাই কেমন করে? যাই হউক, আমি আমার বিয়ের দিন যে তা আর কিছুতেই থাকৃব না। সে দিন আমি ১০১ বার হাঁচ্‌ব, যদি নতুন বউ প্রত্যেক বার হাঁচির সাথে সাথে ষা'ট্ ষা'ট্ না করে, তবে সেই দোষেই আমি সেই দিন তোমার সাথে নিশ্চয় মার কাছে যাব।"

তখন বুড়া রাক্ষসী আর কি করবে, ফিরে চলে গেল। দিনে দিনে দিন গেল। দুই দিন চার দিন করে ছেলে বিয়ের যোগ্য হ'ল। গাঁয়ের মধ্যেই বাড়ীর নিকটে একটী সুশ্রী পাত্রী ঠিক হ'ল। সওদাগরের মা বিয়ের অনেক আগে থেকেই আজ এ জিনিস, কাল ও জিনিসটুকু নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে

দিয়ে আসে, একটু ভাল খাবার জিনিস হলেই নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে খাওয়ায়। এমনি করে ক্রমে ক্রমে মেয়েটিকে বশ করতে লাগল। শুভদিনে শুভক্ষণে পাত্র যাত্রা ক'রে বিয়ে করতে গেল। অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গে বাড়ী ভ'রে গেল। কুলের কুল-পুরোহিত এল, ঢাক ঢোল সানাই কাঁশি নাগারা টিকারায় বাড়ী তোলপাড় করতে লাগ্‌ল। মহাধুমধাম বিয়ে বাড়ীতে আরম্ভ হ'ল। এদিকে সওদাগরের মা দৌড়াদৌড়ী ক'রে পাত্রীর কাছে যাচ্ছে। বলছে, "মা! বর যখন জলচৌকীর উপর দাঁড়াবে, তখন ১০১ বার হাঁচ্‌বে, তুমি প্রত্যেক বারেই ষা'টু ষাটু করো। নইলে অমঙ্গল হবে।"

মেয়েটি আগে থেকেই বশ হয়েচে; পাত্র যখন মুখচন্দ্রিকার জন্য সেই জলচৌকীর উপর দাঁড়াল, তখন থেকেই হাঁচা আরম্ভ করল। নূতন কন্যা প্রত্যেক বারেই হাঁচির পরে পরেই "ষা'ট্‌ ষা'ট্‌" করতে লাগল। এই রকমে ১০১ বার হাঁচল, কন্যাও ১০১ বার "ষাট্‌ ষাট্‌" করল। বিয়ে হ'য়ে গেল। বরকন্যা বাসর ঘরে গিয়ে শু'ল।

সওদাগরের মা, আর ছেলেকে রাত্রে কখনই একা শুতে দেয় না। সেও গিয়ে সেই ঘরের মধ্যেই এক জায়গায় শু'য়ে থাকল। নিশীথ রাত্রে বুড়ী রাক্ষসী এ'ল। এসেই বলল, "আগখাকী আগ্‌বুলানীর কোলে কেন জীয়ত ছেলে? বাবা! তুমি আমার সাথে এস, আজ আমি অবশ্যই সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। তোমার মা আজ তোমাকে নিশ্চয় যেতে ব'লেছেন।" ছেলে বলল, "না না বুড়ী, আমি যে আজও যেতে পার্বনা। আমি ত এদের কোন দোষ দেখ্‌তে পাই নাই। আমি ১০১ বার হাঁচলাম, নূতন কন্যা ১০১ বারই ষা'ট্‌ ষা'ট্‌ বলেছে। এদের দোষ না পেলে আমি যাই কেমন ক'রে? যা হক, আজ ত আমি যেতে পা'রলাম না; তুমি মা'কে গিয়ে ব'লো, আমি এই আসছে অরণ্য ষষ্ঠীর দিন মাথায় তেল মেখে সেই দোষে বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব।"

বুড়ী রাক্ষসী চ'লে গেল। ক্রমে দিন গেল, অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আস্‌ছে। সওদাগরের মা পুজার জোগাড় কচ্ছে। ক্রমে পুজার সময় হ'ল। বেলা হ'ল; ছেলে এসে বলছে, "আমায় একটু তেল দাও, আমি স্নান করব। সওদাগরের মা সেই বিয়ের দিন রাত্রে বুড়া রাক্ষসীর কথা আর ছেলের উত্তর সব শুনেছিল। শুনেই গ্রামগুলির আশেপাশে ২।৪ ক্রোশের মধ্যে ঢোল-মহরৎ দিয়েছিল যে, অরণ্য ষষ্ঠীর দিন যেন কারও বাড়ীতে একটু তেলও না থাকে। খাওয়া দাওয়া, মাথায় মাখা সকলের জন্যই যতটি যা' লাগে আমি দিব;

কিন্তু কারোর বাড়ীতে সরিষার তেল থাকা হবে না। সকল পাড়া সবশুদ্ধ তেল ছেড়েছে। ভারে ভারে ঘি সকলের বাড়ী যাচ্ছে, কোথাও একফোঁটা তেল পাওয়ার উপায় নাই। সওদাগরের মা নিজের বাড়ীর তেলের হাঁড়িটিও ফেলে দিয়েছে।

সওদাগরের মার নিকট তেল না পেয়ে ছেলেটি বল্‌ল, "আচ্ছা, আমি একবার দেখি ত তেল পাই কিনা।" এই বলে দুই প্রহরের রৌদ্রের মধ্য দিয়ে হাঁ হাঁ করতে করতে পাড়ায় চলতেছে। যেতে যেতে দেখে যে মাঠের মধ্যে কলুর জাঠ ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে সেখানে পড়ে আছে। দুই প্রহরের ভয়ানক রৌদ্রে সেই ভাঙ্গা জাঠ উনিয়ে উনিয়ে চুইয়ে তেল গলে পড়ছে। সওদাগরের ছেলে তখন সেই ভাঙ্গা জাঠ না হাতে নিয়ে মাথায় ঘষে ঘষে দিতে লাগ্‌ল। এই রকমে খুব করে জাঠ মাথায় ঘষে যেখানে সওদাগরের মা পুজার জোগাড় করে নিয়েছে, সে জায়গায় এসে বল্‌ল, "আমি এখন যাই ?"

সওদাগরের মা তার কথা বুঝতে পারল। পেরে বলল, "বাবা, তুমি কি দোষে, কার দোষে আজ যাচ্ছ ?" তখন সেই কুলুর ভাঙ্গা জাঠের কথা ছেলে সব তার কাছে ভেঙ্গে চুরে বল্‌ল। সওদাগরের মা আর কি কর্‌বে ? এবার আর কোন উপায় নাই। নিরুপায় দেখে ছেলেকে বল্‌ল ; "বাবা, যাবে যদি যাও, কিন্তু একটু বিলম্ব কর, আমি তোমার কাছে একটু "সাধ" দিচ্ছি, আর দুগাছি কঙ্কণ দিচ্ছি, তা নিয়ে গিয়ে তোমার সেখানকার মাকে দিও, আর তাকে আমার কথা ব'লে বলো যে, সেই এ "সাধ" তোমাকে খেতে দিয়েছে, আর এ কঙ্কণ দুগাছি তোমার হাতে পরতে দিয়েছে।" ছেলে খানিকক্ষণ সেই পুজার কাছে ব'সে থাক্‌ল। পুজা হ'ল। কথা শুনা হলে বুড়ী সওদাগরের মা ভক্তির সাথে মা ষষ্ঠীর কাছে মানাছিনা ক'রে, কান্নাকাটি ক'রে, সেই সাধটুকু ও কঙ্কণ দুগাছি ছেলের কাছে দিল। ছেলে তাই নিয়ে চলে গেল।

ষষ্ঠীঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে পৌছে ছেলে তাঁকে বল্‌ল "মা, আমার গর্ভধারিণী মা তোমাকে এই সাধটুকু খেতে ও এই কঙ্কণ দু'গাছি হাতে দিতে দিয়েছেন। মা ষষ্ঠী তখন ছেলের হাত থেকে সেই সাধটুকু নিয়ে খেলেন। আর কঙ্কণ দু'গাছি হাতে দিলেন। সাধটুকু খেয়ে ষষ্ঠীঠাকুরাণী এতই সন্তোষ হলেন, আর সেই কঙ্কণ দু'গাছি হাতে দিয়েও এতই সন্তোষ হলেন যে, ছেলেকে ডেকে বললেন, "বাবা, তোমার মা যে আমাকে সাধ দিয়েছে, তা

খেয়ে আমি বড়ই সন্তোষ হলাম, আর এই কঙ্কণ দু'গাছি আমার হাতে শাঁখার কাছে যেমন সুন্দর শোভা হয়েছে, তুমিও তেমনি তোমার মার কোলে যেয়ে শোভা সম্পাদন কর। যাও, তোমার মার কোলে যাও।"

ছেলে তখন আবার ফিরে এসে সওদাগরের বাড়ীর মধ্যে গেল। সওদাগরের মা ছেলে হারিয়ে কান্নাকাটি করে, ভাতজল কিছুই স্পর্শ করে নাই। ছেলে পেয়ে সে যেন হাতে স্বর্গ পেল। কোলে নিয়ে সব সমাচার শুনে বড়ই সন্তোষ হ'ল।

—গিরীন্দ্রমোহন মৈত্র কর্তৃক সংগৃহীত, রংপুর, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (রংপুর-শাখা), ১৩১৫, 'মহিলা ব্রত'

মন্তব্য

লোভী বধূ বা অরণ্যষষ্ঠীর বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে এই কাহিনীটির প্রাচীনত্ব এবং সরলতা লক্ষণীয়। ব্রত শেষ হইবার পুর্বেই ব্রতের নৈবেদ্য যে লোভ বশতঃ আহার করিয়া ফেলে তাহাকেই আগখাকী এবং ব্রতোপকরণের উপর আগে হইতেই যে হাত বুলায়, তাহাকে আগবুলানী বলে। ইহা অত্যন্ত গর্হিত কার্য, এই দোষেই মেয়েদের সন্তান হইয়া বাঁচে না, তারপর কঠিন সাধনায় এই ক্রটি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বধূ এখানে সন্তানকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইল। এখানে ১০১ বার হাঁচিবার যে একটি কথা আছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। সংখ্যার দিক দিয়া ১০১-এর কোনও বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং তাহার পরিবর্তে ১০৮ সংখ্যাটিকে ঐন্দ্রজালিক শক্তির অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার লোক-কথায় যদি তান্ত্রিকাচারের কোন প্রভাব থাকিত, তবে সহজেই ১০১ সংখ্যা ১০৮-এ পরিবর্তিত হইতে পারিত। তবে ১০০-এর পরিবর্তে ১০১-এর একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। ১০১ round-figure হইলেও ইহা শূন্য দিয়া শেষ হয় বলিয়া ১ সংখ্যা তাহাতে সর্বদাই যোগ করিতে হয়। বিবাহের নগদ যৌতুকে শূন্য সংখ্যা পরিত্যাগ করিবার এবং তাহার সঙ্গে এক যোগ করার রীতি আছে।

৯

কালো বিড়াল

এক পরিবারে শাশুড়ী, বউ আর ছেলে থাকত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে শাশুড়ী পুজার সমস্ত জোগাড় করে স্নান করতে যাবার সময়, বউকে বলে গেল যে সে যেন পুজার জোগাড়গুলো ঠিক করে রাখে। কিন্তু ও বউ শাশুড়ী চলে গেলেই সমস্ত পুজার প্রসাদগুলি খেয়ে ফেলল, আর ধরা পড়ার ভয়ে বাড়ীর কপিলে গাইয়ের মুখে কলাপাতাটা দিল, আর কালো বিড়ালের মুখে হাতটা মুছে দিল। শাশুড়ী এসে পুজার কিছু না দেখতে পেয়ে বউকে জিজ্ঞাসা করল, সব প্রসাদ কি হোল? বউ বললো, আমি কি কোরে জানবো, ওই দেখুন আপনার কপিলে গাইয়ের মুখে কলাপাতা, আর কালো বিড়ালের মুখে কি সব। শাশুড়ী তো তাই বিশ্বাস করলো।

এইভাবে প্রতি বৎসর পুজার সময় বউটা এইরূপ করত। এতে কালো বিড়ালটা খুব রেগে গেল। সে ভাবলো যে বউটা নিজে খেয়ে, আমার আর কপিলে। গাইয়ের নামে দোষ দেয়! তখন সে ঠিক করলো যে সে বউটার কোলে ছেলে রাখবে না। যখনই বউটার ছেলে হোত, তখনই বিড়ালটা লুকিয়ে মুখে কোরে ছেলে নিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে গাছের তলায় রেখে আসতো। তখন মা ষষ্ঠী বলতো, হাঁরে কালো বিড়াল, তুই কার কোল খালি কোরে ছেলেগুলোকে নিয়ে আসিস। তখন বিড়াল বলতো, ঐ বউটা নিজে খেয়ে আমার আর কপিলে গাইয়ের নামে দোষ দেয়, তাই আমি ওর পেটে দেখতে দেবো, কোলে দেখতে দেবো না।

এইভাবে সাতটা ছেলে বিড়ালটা নিয়ে যায়। যখন একটা মেয়ে হোল, তখন বউটা দেখতে পেলো বিড়ালটা মেয়েটাকে মুখে কোরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন বউটাও বিড়ালটার পিছু পিছু গেল; যেয়ে দেখলো, বিড়ালটা একটা বনের মধ্যে বিরাট গাছতলায় ষষ্ঠী ঠাকরুনের কাছে মেয়েটাকে রেখে দিল, তখন বউটা ঠাকুরের কাছে কেঁদে তার সমস্ত ছেলে-মেয়ে ফিরে চাইলো। তখন মা ষষ্ঠী বললেন, তুমি প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসের এই ষষ্ঠীতে না খেয়ে সাতটা ছেলে ও একটি মেয়ের জন্য ১২ বৎসর যদি আমার পুজা করতে পার, তাহলে তোমার ছেলে মেয়ে ফিরে পাবে। তখন বউটা

শাশুড়ীকে বললো। তখন থেকে সেই গাছটায় একটা লাল সুতা প্রতি বৎসর বেঁধে আসতো, আর মা ষষ্ঠীর কথামতো উপোস করে পূজা করত।

এ ভাবে ১২ বৎসর হয়ে যাবার পর শেষ বৎসর বউটা খুব ধূম-ধাম কোরে, গাছের তলায় মা ষষ্ঠীর পূজা করতে যাচ্ছে। এমন সময় সে দেশের রাজা সংবাদ পেয়ে গাছের তলায় এলো, সমস্ত পূজা দেখতে লাগল, তার পরে যখন বউটা ছেলে-মেয়েদের ফিরে পেলো, তখন রাজা তার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে বউটার মেয়ের বিয়ে দিল। এভাবে মা ষষ্ঠীর পূজা করে, বউটা জামাই পেল।

মন্তব্য

বাংলা দেশে কালো বিড়াল ষষ্ঠীর বাহন বলিয়া কল্পিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কালো বিড়াল সম্পর্কে কোন না কোন লোক-বিশ্বাস প্রচলিত আছে। জার্মাণ দেশে কালো বিড়াল অশুভসূচক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও অনুরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এই সকল দেশে কালো বিড়াল যাত্রাপথের সম্মুখ দিয়া গেলে অমঙ্গল সূচনা করে; কিন্তু কালো বিড়াল বাড়ীতে থাকা মঙ্গল জনক। এই বিশ্বাস আমাদের দেশে যেমন, ইউরোপ এবং মার্কিন দেশে তেমনই দেখা যায়। 'Southern U. S. Negroes believe that black cats are powerful hoodoo; they cause bad luck, misery, disease and death. A black cat is a witch; it is a witch's familiar; it is a haunt from the dead: all beliefs of European origin enhanced with Negro intensity and flavour.' (*Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend*, New York, 1949, p. 197) বিহারের জনশ্রুতিতে কালো বিড়াল অমঙ্গলসূচক এবং ইহাকে বধ করিলে কোন দোষ স্পর্শ করে না। কিন্তু বাংলা দেশে বিড়াল মাত্রই অবধ্য এবং কালো বিড়াল শুভসূচক।

সোহাগের ট্যাপারী

এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী থাকেন। তাঁহাদের একটী মেয়ে ও একটী ছেলে, ছেলের নাম কুবের ও মেয়ের নাম ডুসনে। পৌষমাস পুর্ণিমা, পৌষখণ্ডের লক্ষ্মীপুজা। ব্রাহ্মণী কুবেরকে বললেন যে তোর দিদিকে বলে আয়, আজ পৌষের লক্ষ্মীপুজা পুর্ণিমা, বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজা যেন করে। এই কথা বলতে কুবেরকে পাঠিয়ে দিলেন।

কুবের রাজবাড়ী গিয়ে দিদির কাছে গেল, বলল, দিদি, মা আমায় পাঠিয়ে দিলেন; বলে দিলেন যে আজ পৌষ মাস পুর্ণিমা বৃহস্পতিবার পৌষখণ্ডের কথা শুনতে হয়। ডুসনে বলল, হ্যাঁ, আমি উপোস করে আছি নাকি? কোন্ ভোরে উঠে রাজার পাতের পায়েস পিঠে ছিল খেয়েছি, যা মাকে গিয়ে বলগে যা।

কুবের এই কথা শুনে চলে এলো। মাকে বলল, মা, দিদি বলল যে আমি কোন্ ভোরে উঠে রাজার পাতের পিঠে পায়েস খেয়েছি, মাকে বলগে যা। সেবারও এইভাবে গেল। তারপর চৈত্রখণ্ডের পুজা এলো। ব্রাহ্মণী কুবেরকে ফের পাঠালেন, ব'লে দিলেন যে, কুবের, এবার তোর দিদিকে বলে আয়, আজ চৈত্র মাস পুর্ণিমা, মা লক্ষ্মীপুজা করতে বলে দিলেন। ডুসনে বলল, যা মাকে গিয়ে বলগে, আমি কোন ভোরে উঠে রাজার পাতের লুচি পরমান্ন ছিল খেয়েছি। কুবের এসে মাকে বলল, মা, দিদি এবারও ভোরে উঠে রাজার পাতের পিঠে পরমান্ন খেয়েছে।

সে বারও গেল ভাদ্র মাস পুর্ণিমা বৃহস্পতিবার, ব্রাহ্মণী কুবেরকে পাঠিয়ে দিলেন, যা, দিদিকে গিয়ে বলগে যা, আজ ভাদ্র মাস পুর্ণিমা বৃহস্পতিবার, আজ যেন কিছু না খায়, লক্ষ্মীর পুজা করতেই হবে। কুবের রাজবাড়ীতে আবার দিদির কাছে গেল, গিয়ে বলল যে, দিদি, মা বলে দিলেন, এবার তোমায় লক্ষ্মীপুজা করতেই হবে। ভাদ্রমাস পুর্ণিমাখণ্ডের লক্ষ্মীপুজা। ডুসনে তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল, সোনার চিরুণী কুবেরের কপালে ছুঁড়ে মারল। অহঙ্কারে মত্ত হয়ে বলল, বার বার বিরক্ত করছ আস, যাও চলে, যাও, আমি কোন্ ভোরে উঠে রাজার পাতের বড়া পায়েস খেয়েছি, মাকে গিয়ে বলগে, বারবার এসে শুধু শুধু বিরক্ত করছে। কুবেরের কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। কুবের দু'হাতে চেপে ধরে চলে এলো।

বাড়ীতে আসতেই মা বললেন যে তোর কপালে রক্ত কিসের? আমার নিখুঁত কুবেরকে কে খুঁত করল? কুবের বলল, চৌকাঠে বেঁধে পড়ে গিয়েছি।

ব্রাহ্মণী বললেন, কি চৌকাঠের এত বড় স্পর্ধা যে আমার নিখুঁত কুবেরকে খুঁত করে! সত্যি করে বলতো কি হয়েছে। কুবের তখন বলল, মা, দিদিকে লক্ষ্মীর কথা গিয়ে বলতে দিদি রাগ করে সোনার চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল, তাই ছুঁড়ে মেরেছে। তখন ব্রাহ্মণী বললেন, ওঃ রাজার ঘরে গিয়ে বড় অহঙ্কার হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি। সেই অহঙ্কারে ত লক্ষ্মীপুজা করলই না, আবার আমার নিখুঁত কুবেরকে চিরুণী ছুঁড়ে মেরে খুঁত করল। এই বলে বললেন যে সে মুখ দিয়ে কথা বললেই আগুন বের হবে। সোনার তার লোহার তার হবে। অভিসম্পাত দেওয়া মাত্র ডুসনের গায়ের অলঙ্কার লোহায় পরিণত হল।

সেই দিন রাজার বাপের শ্রাদ্ধের তারিখ। রাজা বলতে এলেন, রাণী, আজ আমার বাপের শ্রাদ্ধ, তুমি কি রাঁধতে পারবে? রাণী যেমন রাজার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছেন, অমনি রাজার দাড়িতে ভক্ ভক্ করে আগুন জ্বলে উঠে পুড়ে গেল। রাজা বললেন, ওমা, এ রাণী না রাক্ষসী, আমার দাড়ি সব পুড়ে গেল, এর মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। রাজা বাইরে গিয়ে মন্ত্রীকে ডাকতে পাঠালেন। মন্ত্রী এলে বললেন, মন্ত্রী, রাণী না রাক্ষসী, মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে, আমার সঙ্গে কথা কইতে গেলে অমনি আগুন বের হয়ে আমার দাড়ি সব পুড়ে গেল। ওকে এখনিই কেটে এনে দাও, তবে আমি স্নান করব।

মন্ত্রী তখন রাণীকে নিয়ে একটী বনের মধ্যে গেলেন; বললেন, মা, রাজা রাজরার মন, আজ বলল কাট, কাল বলবে এনে দাও; তখন আমি কি করব? তুমি রাজরাণী, মা, তোমার গায়ে আমি হাত দিতে পারি না। আমি একটা শিয়াল কুকুর কেটে তারই রক্ত রাজামশাইকে দেখাই গে, তুমি এই বনে থাক। এই বলে মন্ত্রী রাণীকে বনে রেখে শিয়াল কুকুর কেটে রাজাকে রক্ত নিয়ে গিয়ে দেখাল।

তারপর দিন যায়। রাণীর গায় সাতপুরু ময়লা হয়েছে, মাথা তেল অভাবে উকুন বালিতে ভর্তি হয়েছে, কাপড় শতছিন্ন হয়েছে, বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, আর কাঁদে। একদিন এক অশ্বত্থ

গাছের তলায় বসে আছেন। সেই গাছে দুই বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী থাকত। তাদের কতকগুলি ছানা বাসায় রেখে তারা বাইরে চরতে গিয়েছিল। ডুসনে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেল। ঘুমের ঝোঁকে যেই হাই তুলল, অমনি মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে আগুন জলে উঠল। এখন হয়েছে কি, একটা অজগর সাপ ঐ ছানার লোভে গাছে উঠছিল। সে আগুনে পুড়ে মাটীতে পড়ে মরে গেল। সন্ধ্যাবেলায় বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী ফিরে বাসায় আসতেই ছানারা বলল, মা, এক যে মানবের বেটী গাছের তলায় বসে আছেন, তিনি হাই তুললেন, অমনি মুখ দিয়ে আগুন বের হল। আমাদের খেতে একটা সাপ আসছিল, ঐ আগুনে পুড়ে মাটিতে পড়ে মরে গেল। তখন বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী গাছের তলায় এসে দেখে যে দেবতা হ'তে কুরূপ মানুষ হ'তে সুরূপ একটী মেয়ে বসে আছে। ডেকে বলল, মা, তুমি দেবী না মানবী, আমার সন্তানদের অজগর সাপের হাত থেকে বাঁচালে। প্রাণদান দিলে, আর একটী উপকার কর ত ভাল হয়। আমার সন্তানদের চক্ষু ফোটে নাই। যদি কোনজন এসে তার কড়ে আঙ্গুল চিরে রক্ত দেয়, ত আমার ছেলেমেয়েরা চক্ষু পাবে। তখন ডুসনে কড়ে আঙ্গুল কাঁটা দিয়ে চিরে একটু রক্ত দিল, সেই রক্ত তারা তাদের সন্তানদের চোখে লাগান মাত্রই তারা চক্ষু পেল।

সন্তানগণ বলল, মা, উনি আমাদের প্রাণ দিলেন এবং চক্ষু দিলেন, তোমরা উহার কিছু উপকার কর। বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী বলল, মা, আপনার কি করব বলে দিন। আপনার কৃপায় আমার সন্তানেরা জীবন ও চক্ষুদান পেয়েছে, আপনি সামান্য মানুষ নন। রাণী বললেন, লক্ষ্মীর কোপে আমার এইরূপ দশা হয়েছে, তোমরা আমায় বাপের বাড়ীর দরজায় রেখে আস, আমি রাজার রাণী ছিলাম, পথ ত চিনি না। বিহঙ্গম বলল, মা তুমি আমার পিঠে চোখ বেঁধে বসে থাক, আমি তোমায় তোমার বাপের বাড়ীর দরজায় রেখে আসব। চোখ না বাঁধলে তুমি ভয়ে পড়ে যাবে। তখন বিহঙ্গম রাণীকে কাঁধে করে উড়ে উড়ে রাণীর বাপের বাড়ীর দরজায় রেখে এলো। সকাল বেলায় নারায়ণ দরজা খুলে দেখেন যে ডুসনে দরজায় পড়ে আছে। তাকে দেখে ডুসনে কাঁদতে লাগল। নারায়ণ বলল, কাঁদিস না, চোখের জল পড়লে পৃথিবী শস্য হরণ করবে, গাভী দুগ্ধ হরণ করবে। আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইমত করলে মায়ের সুনজরে পড়বি। পুকুর ঘাটে গিয়ে বসে থাক্, যখন

দাসীরা তোর মায়ের স্নানের জল ঘাটে নিতে আসবে, তখন এই কথা বলবি যে 'লক্ষ্মীরে মা, নারায়ণরে বাপ, কুবেররে ভাই, তোমরা থাকতে এত দুঃখ পাই।' তখন শিয়রের যে কলসী তাতে হাতের আংটী ফেলে দিস্, তা হলেই মাথায় যখন জল ঢালবে আংটী মাথায় পড়বে, পড়লে সেই আংটী দেখে তোকে মার মনে পড়বে।

এই সব শিখিয়ে নারায়ণ ডুসনেকে পুকুর ঘাটে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সাত জন দাসী সাতটা কলসী নিয়ে স্নানের জল নিতে এলো। তখন ডুসনে উঠে গিয়ে বলল, তোমরা কি করতে এসেছ? তারা বলল, গিন্নি মায়ের স্নানের জল নিতে আমরা ঘাটে এসেছি। ডুসনে জিজ্ঞাসা করল, কোন্ কলসীর জল কার মাথায় দাও? তারা কলসী দেখিয়ে বলল, এই কলসী কুবেরের, এই কলসী গোড়ের, এই কলসী শিয়রের। ডুসনে তাদের অজানিতে একটী আংটী হাত হতে খুলে শিয়রের কলসীতে দিল।

তারা জল নিয়ে চলে গেল। স্নানের সময় মাথায় জল ঢালতে আংটী টুপ করে পড়ে গেল। লক্ষ্মী বললেন, আরে, ওটা কিরে? তারা বলল, মা, ভয়ে কব, কি নির্ভয়ে কব। তারা বলল, মা, তোমার থেকে কুরূপ, আমার থেকে সুরূপ একটী মেয়ে ঘাটে এসে বসে আছেন, আর বলছেন, 'লক্ষ্মীরে মা, নারায়ণরে বাপ, কুবেররে ভাই, তোমরা থাকতে এত দুঃখ পাই।' তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জল শিয়রের? আমরা কলসী দেখিয়েছি। আর কিছু জানি না।

ব্রাহ্মণী বললেন, তাকে নিয়ে এসো; মাথায় তেল, গায় খোল বেসন দিয়ে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে নিয়ে এসো। তখন তারা তাকে বলল, চলুন, আপনাকে মা ডাকছেন। আগে স্নান করিয়ে তারপর নিয়ে যেতে বললেন। তারা তেল বেসন দিয়ে ডুসনেকে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরাল। পরিয়ে মায়ের কাছে নিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে ডুসনে ক্ষমা চাইল। মা তাকে ক্ষমা করলেন।

এই মত যায়, হঠাৎ রাজার রাণীকে মনে পড়ল; অমনি মন্ত্রীকে ডাকলেন; বললেন, মন্ত্রি, রাণীকে যেখান হতে পাও, সেখান থেকে নিয়ে এস। মন্ত্রী বলল, রাজা রাজরার মন, আজ বলে কাট, কাল বলে আন, রাজরাণী, তাঁকে ত দেখি নাই, তিনি না তবে রাজার শ্বেতহস্তী আছে,

তার কপালে জয়পতাকা লিখে ছেড়ে দেওয়া হউক, সেই জয়পত্র রাণীকে খুঁজে আনবে। তখন রাজার শ্বেতহস্তীর কপালে জয়পত্র লিখে ছেড়ে দিল। বলল, যাও রাণীকে খুঁজে আন।

শ্বেতহস্তী পৃথিবী ঘুরে শেষে ব্রাহ্মণের দুয়ারে এসে দাঁড়াল। ভুসনে রাজহস্তী দেখে মাকে ছুটে গিয়ে বলল, মা, রাজার যে শ্বেতহস্তী মাথায় জয়পত্র লেখা, আমাকে খুঁজতে বের হয়েছে। মা বললেন গজা দেখেই এত! রাজা ত দেখই নাই। হস্তী ফিরে যাক্। বনবাস দিয়েছিল যখন, তখন অমনি পাঠাব না। এই বলে রাজার কাছে সংবাদ গেল যে বরসাজে এসে নিয়ে যেতে হবে, নচেৎ ভুসনেকে পাঠাবে না। রাজা রাণীর জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন। কি আর করেন, বরসাজে ঢাক ঢোল বাদ্যি বাজিয়ে ভুসনেকে নিতে এলেন। এদিকে নারায়ণ ভুসনেকে শিখিয়ে দিলেন, ভুসনে. তুমি যখন রাজার বাড়ী যাবে, তখন মাকে বলবে,. মা, আমি তোমার সোহাগের ট্যাপারী নিব। এই ব'লে সোহাগের ট্যাপারী নিবে, কিছুতেই ছাড়বে না।

রাজবাড়ী যাবার সময় ভুসনে বলল, মা, আমি পিঁড়ি নিব। লক্ষ্মী বললেন, নাও। তার পর বলল, মা, আমি তোমার সোহাগের ট্যাপারী নেব। ব্রাহ্মণী বললেন, তুই সব নিবি, আমার কুবেরের বৌয়ের কিছু থাকবে না? ভুসনে বলল, না মা, হবে না, আমি তোমার সোহাগের ট্যাপারি লবই।

মা আর কি করেন, ভুসনেকে সোহাগের ট্যাপারী দিলেন, পাল্কি করে পথে যেতে যেতে ভুসনে ভাবল, দেখি ত সত্যি কি না। যেই একটু ঢাক্‌না খুলছেন, আর অমনি ট্যাপারীর ঢাক্‌নার ফাঁক হ'তে সোহাগ উতলে পড়তে লাগল। জেলেরা যাচ্ছিল, তাহারা জালে সোহাগ নিল। ছেলেরা হালে সোহাগ নিল, তাড়াতাড়ি ঢাকনা বন্ধ করে দিল। রাণী রাজবাড়ীতে এসে পৌছেছিল। এখন উঠান দিয়ে যেতে যেতে রাণীর পায়ে কাটা ফুটে রক্ত পড়তে লাগল; তাই দেখে রাজা বললেন, কারা উঠান সাফ করেছে, তাদের ডেকে আন। সাতজন হাড়ি উঠান সাফ করতে এসেছিল। রাজার ডাক শুনে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হল। রাজা বললেন, কি রকম উঠান সাফ করেছিস? রাণীর পায় কাঁটা ফুটে রক্ত বের হয়েছে! তোদের গর্দান যাবে। এদিকে

রাণী বাড়ীর ভিতর গেলেন। রাত্রি হলে রাণী দেখলেন, পুর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, বললেন, আজ না পুর্ণিমা, পৌষ মাস, পৌষখণ্ডের কথা শুনতে হবে, পুজা করতে হবে। পুজা না করেই আমার এইরূপ দশা হয়েছিল। ফুলদুর্বা এনে কাঠা সাজিয়ে কথা শুনবেন। সেই দিন রাজার বাপের শ্রাদ্ধ, গ্রামের সব লোকই পেট ভরে খেয়েছে, উপোসী কেউই নাই; কেবল সাত হাড়ির মা ছেলেদের গর্দান গিয়াছে, তাই কেঁদে কেটে জলস্পর্শ করে নাই; সেই উপোসী আছে। রাণী বললেন, যাও, তাকেই নিয়ে আস, কথা শুনবে গিয়ে। রাজার বাড়ীর লোক বলল, ওরে সাত হাড়ির মা, চল, রাণীমা তোকে ডাকছেন। হাড়ির মা বলল, রাণী না কানী, আমার ছেলেদের মেরেছে, এখন আমায় মারুক, তা হলে বাঁচি। এই বলে রাণীর কাছে চলল। রাণীকে গিয়ে বলল, আমার ছেলেদের মেরেছ, এখন আমায় মার ত বাঁচি। রাণী বললেন, না, তোমায় কিছু করব না। আজ যে লক্ষ্মীপুজা। রাজার বাপের শ্রাদ্ধ, কেহই উপোসী নাই, তুমি উপোসী আছ জেনে তোমায় ডেকেছি। রাণী তাকে বসিয়ে কথা শুনলেন। কথা শুনে সেই নির্মাল্য যেখানে সাত হাড়ির গর্দান গিয়েছিল, সেইখানে গিয়ে ঘাড় মাথা এক করে জোড় দিয়ে জল ছিটালেন। অমনি সাত হাড়ি যেন ঘুম হতে উঠছে এইরূপ ভাবে উঠে বসল। হাড়ির মা ছেলেদের বাড়ী নিয়ে গেল। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

—পাবনা, বিমলা দেবী সংগৃহীত।

মন্তব্য

লোক-কথার সাধারণ কতকগুলি অভিপ্রায় ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে ক্রুদ্ধ রাজার রাণীর রক্তে স্নান করিবার অভিলাষ, জহ্লাদ কর্তৃক রাণীকে মুক্তি দান, তৎপরিবর্তে শৃগাল কুকুরের রক্ত প্রদান, বাক্‌শক্তি-সম্পন্ন পক্ষী, কৃতজ্ঞ পক্ষী, সাহায্যকারী (helpful) পক্ষী ইত্যাদি অভিপ্রায়ও ব্যক্ত হইয়াছে। সর্বশেষে ঐন্দ্রজালিক উপায়ে মৃতের প্রাণসঞ্চার অভিপ্রায় দিয়া কাহিনী শেষ হইয়াছে।

১১

গোবিন্দ

এক গৃহস্থের পুত্রবধূ। তাহার 'ছাইব্যা খাওনের' দোষ ছিল, সে শ্বশুর শাশুড়ীকেও নানাভাবে অমান্য করিত, তাই তাহার কোন সন্তান জীবিত থাকিত না; প্রসবের পরই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। একদিন সে বাড়ীর পেছনে পুকুর পাড়ে একা বসিয়াছিল। তখন তাহার গর্ভাবস্থা। সে দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখ দিয়া লাঠিতে ভর দিয়া এক বৃদ্ধা যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতেছে, 'আমার মাথার চুলগুলি বড় চুলকায়, কেহ যদি আঁচড়াইয়া দিত।' বৌ তাহাকে বলিল, 'তুমি কে গো? এদিকে কৈ যাও?' বৃদ্ধা বলিল, 'আমি একজন পথিক, পথ ভুলিয়া এইদিকে আসিয়া পড়িয়াছি।' বৌ তাহাকে দেখিয়া দয়ার্দ্র হইল ও নিকটে আসিয়া তাহার কোলে বৃদ্ধার মাথা রাখিয়া চুলগুলি আঁচড়াইয়া দিল। ইহাতে বৃদ্ধা খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'আমাকে যে এইরূপ সুখ দেয়, সে যেন সাত ছেলের মা হয়, জন্ম-আয়রাণী হয় ও আমার মত শান্তি পায়।' সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাগো, আড়ী-বন্ধ্যার ঘরে সন্তান কেন হয় না, হইলেই বা মা কেন থাকে না?' বৃদ্ধা বলিল, 'যে ছাইব্যা খায়, একাদশী, দ্বাদশী, পুর্ণিমা, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, এই সমস্ত দিনে সুতা কাটে, অনিয়ম করে, গুরুজনকে অবহেলা করে, সংসারের কাজে ব্যতিক্রম করে, আলস্য করে।' 'কি হইলে তাহার সন্তান থাকিবে?' বৃদ্ধা বলিল, 'শ্বশুর, শাশুড়ী, গুরুজনের উপর ভক্তিমতী হইলে, ছাইব্যা না খাইলে, নিয়মনিষ্ঠা মত চলিলে, চণ্ডালের শ্মশানে প্রসব হইলেও তাহার সন্তান থাকিবে, নষ্ট হইবে না।' এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আমি তোর মত আড়ী-বন্ধ্যাকে সমস্ত বলিয়া দিলাম।'

বৌ এই কথায় বৃদ্ধাকে ছদ্মবেশী ষষ্ঠী মা মনে করিয়া পা জড়াইয়া ধরিল ও মিনতি করিতে লাগিল। তাহাতে ষষ্ঠী মায়ের দয়া হইল। এই কথা বলিতে বলিতে বৌয়ের প্রসব-বেদনা উঠিল। বৌ বলিল, 'মা গো, আমি এখন কৈ যাই'। এই কথা শুনিয়া ষষ্ঠী মা নিজ-মূর্তি ধরিয়া হাতের টাকইর ঢিল দিয়া ফেলিলেন। উহা নিকটেই এক শ্মশানে গিয়া পড়িল। ষষ্ঠী বলিলেন, 'এই টাকইর যে চণ্ডালের শ্মশানে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে গেলেই তোমার সুসন্তান হইবে।'

নিকটস্থ শ্মশানে যাইতেই বৌয়ের সুসন্তান হইল। এদিকে ষষ্ঠীও অন্তর্ধান হইলেন। একেত ষষ্ঠীদিন, তার পর নিঝুম সময়, রাত্রি নিশাকাল। ছেলেকে ভূত-পিশাচে, বাঘে-শৃগালে খাইতে চায়। বৌ ষষ্ঠী মায়ের দোহাই দিয়া সন্তানকে কোন মতে বাঁচাইয়া গৃহে আনিল। ষষ্ঠীমায়ের আদেশে ছেলের নাম রাখা হইল গোবিন্দ।

ছেলে ধীরে ধীরে বড় হইল। হইলে কি হইবে, ছেলে বড় দুর্দান্ত। তাহার অত্যাচারে পাড়া-প্রতিবেশী উত্যক্ত হইয়া উঠিল। গোবিন্দের মা, যাহাতে তাহাকে কেহ ভর্ৎসনা না করে, শাপ না দেয়; সেইজন্য পাড়া-প্রতিবেশী ও রাজাকে টাকা-পয়সা দিয়া নানাভাবে সন্তুষ্ট রাখে। এইরূপে অন্নারম্ভের দিন উপস্থিত হইল, কামানির সময় গোবিন্দ নাপিতের কান কাটিয়া দিল। নাপিত বলিল, 'ষাটৃ, ষষ্ঠীর পুৎ গোবিন্দ বাঁচিয়া থাক্।' স্নানের সময় গোবিন্দ তাহার পিসীমায়ের কাপড় টানিয়া ছিঁড়িল। তাহার পিসীমা বলিলেন, 'ষাটৃ, ষাট, ষষ্ঠীর পুৎ গোবিন্দ বাঁচিয়া থাক। কাপড় গেলে কাপড় পাওয়া যাবে, ষষ্ঠী-পুৎ গোবিন্দ গেলে তাহাকে কৈ পাওয়া যাবে?' এইরূপে ষষ্ঠী দিন উপস্থিত, গোবিন্দ মায়ের নিষেধ না মানিয়া ভাঁড় ভাঙ্গিয়া গায়ে মাথায় তেল দিল, জল-ভাত পোনা মাছ দিয়া খাইল, ছাইব্যা খাইল, গাছে উঠিল ও পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ষষ্ঠী মায়ের ঘরে গিয়া তাহার নিকট সমস্ত বলিল।

ষষ্ঠী ভবিষ্যতে এইরূপ কাজ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার মায়ের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার মা ছেলের গুণগ্রাম শুনিয়া কিছু না বলিয়া 'ষাটৃ' ষাটৃ' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এইরূপে ক্রমে গোবিন্দ বড় হইতে লাগিল। বিবাহের দিন সাব্যস্থ হইল। বিবাহের দিন গোবিন্দ বরযাত্রীদের সঙ্গে পথে না গিয়া দেশের যত ধান ক্ষেত, কলাইর ক্ষেত, আক ক্ষেত, বাড়ী-ঘর ভাঙ্গিয়া মেলা দিল। তখন দেশের সকলে বলিল, ধান গেলে ধান পাওয়া যাবে, শস্য গেলে শস্য পাওয়া যাবে, ষষ্ঠীর পুৎ গোবিন্দ গেলে তারে কৈ পাওয়া যাবে?' এইরূপে শ্বশুরগৃহেও গোবিন্দ যে কিরূপ দৌরাত্ম্য করিল তাহার 'লেখা-জুখা' নাই। শ্বশুর শাশুড়ীও 'ষাইটৃ ষাইটৃ' বলিয়া আশীর্বাদ করিল। বিবাহের পর গোবিন্দ সস্ত্রীক বাড়ীতে আসিল। ষষ্ঠী মায়ের কৃপায় ধীরে ধীরে গোবিন্দের ও তাহার মায়ের সমস্ত দোষ দূর হইল। তাহারা সুখ-শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

—পূর্ব মৈমনসিংহ, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী, 'ব্রত ও আচার'।

১২

মাছের মুড়া

এক বৌ। সংসারে তার স্বামী আর এক বিধবা শাশুড়ী ছাড়া কেউ নাই। শাশুড়ীর হাতেই সংসার ছিল, বিধবা হইবার পর বৌয়ের উপরই সংসারের সকল দায়-দায়িত্ব পড়িয়াছে। শাশুড়ী বড় লোভী। বউকে একদিন বলিল, 'বৌ গো, আমার মাছের মুড়া খাইবার বড় সাধ হইয়াছে, একদিন বাড়ীতে আস্ত মাছ আনিলে, তার মুড়াটা আমাকে দিও।' বৌ বলিল, 'আচ্ছা দিব।'

একদিন ছেলে একটি আস্ত রুইমাছ লইয়া বাড়ী আসিল। বৌ নিজেই মাছ কাটিয়া-কুটিয়া রান্নাবান্না করিল। রান্না শেষ হইলে ছেলে খাইতে আসিল, মাকেও সে সঙ্গে বসিয়া খাইবার জন্য ডাকিল। মা ও ছেলে খাইতে বসিল। শাশুড়ী বৌয়ের হাতের দিকে তাকাইয়া আছে, কিন্তু বৌ মাছের মুড়া তাহার পাতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল, 'বৌ গো, তোমাকে বলিয়াছিলাম, মনে আছে?'

বৌ এক ধমক দিয়া বলিল, 'আছে!' কিন্তু কাজে কিছুই করিল না। রাত্রে ছেলে বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, মা তখন কিসের কথা বলিয়াছিল? মা কি চায়?

বৌ বলিল, 'তোমার মা আবার বিবাহ করিতে চায়।' শুনিয়াই ছেলে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিয়া বলিল, 'কি? মা বিবাহ করিয়া আমাকে তাড়াইতে চায়? মাকে বনবাস দিব।'

পরদিন সে মাকে বনবাস লইয়া রওনা হইল। যাইতে যাইতে অনেক দূর গেল, ক্রমে এক গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। মাকে সেখানে রাখিয়া যখন সে বাড়ীর দিকে ফিরিল, তখন আকাশে মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল। মা বলিল, মেঘরে মেঘ, তুই এখন বর্ষাইস না, আমার ছেলে ভাল ভালয় গিয়া বাড়ীতে পৌছুক, তারপর বর্ষাইস্। ছেলে এই কথা শুনিতে পাইল, ভাবিল, যে মাকে আমি বনবাস দিলাম, সেই মা এখনও আমার মঙ্গল চিন্তা করিতেছে! ভাবিয়া মাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, তুমি বলত! কাল খাইবার সময় তুমি বউয়ের কাছে কি বলিয়াছিলে? মা বলিল, 'বাপুরে, আমার মাছের মুড়া খাইবার বড় সাধ হইয়াছিল, সেই কথাই বৌকে বলিয়াছিলাম। শুনিয়া ছেলে বউয়ের উপর অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল;

বলিল, কি ? বউ আমার মায়ের নামে আমার কাছে এই ভাবে মিথ্যা কথা কহিল ! বলিয়া মাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। মায়ের হাতে সংসারের সকল ভার আবার তুলিয়া দিয়া বৌকে জীয়ন্ত কবর দিয়া দিল।

—পূর্ব মৈমনসিংহ, ১৯৬৬

মন্তব্য

এখানে বিধবার মাছের মুড়া খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ সম্পর্কে প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, যে শ্রেণীর সমাজে লোক-কথা উদ্ভব এবং বিকাশ লাভ করে, সেই শ্রেণীর সমাজে বিধবার মাছ খাইবার কোন সামাজিক বাধা নাই। অল্পবয়স্ক বিধবার পুনরায় বিবাহও সেই সকল সমাজে প্রচলিত আছে। কোন কোন সময় উচ্চতর সমাজের সঙ্গে নিম্নতম সমাজের কোন কারণে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবার ফলে এই শ্রেণীর কাহিনী উচ্চতর সমাজের মধ্যেও প্রচলিত হয়। কাহিনীটি শ্রীমতী মায়া দেবী নাম্নী উচ্চ বর্ণীয়া মহিলার নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শাশুড়ী-বধূর চিরন্তন সম্পর্কের পরিচয় ইহার মধ্যেও ব্যক্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়

ছোট বৌয়ের কথা

প্রত্যেক দেশেরই লোক-কথায় পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা কনিষ্ঠা কন্যা একটি বিশেষ অংশ অধিকার করিয়া আছে। পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র কন্যা-দিগের তুলনায় কনিষ্ঠের যে কেবল মাত্র বয়সই কম, তাহা নহে, অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের বুদ্ধিও কম, সেইজন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নীদিগের নানা প্রকার নিগ্রহও তাহাদের ভোগ করিতে হয়, কিন্তু পরিণামে দেখা যায় যে, সকল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপর বিজয় লাভ করিয়া পরিবারের শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। এই সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে,—

It is normaly true that in all tales of this kind the youngest child is also especially unpromising, either because of appearance, shiftless habit or habitual bad treatment by others. But even though such qualities are emphasised in the narrative, it is never forgotten that the distinguishing quality of these heroes and heroines is the fact that they are the youngest. (Stith Thompson, ibid, p. 125) পাশ্চাত্য লোক-সাহিত্যের আলোচনায় এই শ্রেণীর কাহিনীকে Cinderella-গোষ্ঠীর কাহিনী বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

বাংলার লোক-কথায় কনিষ্ঠ পুত্র এবং কনিষ্ঠ কন্যার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠা পুত্রবধূর কাহিনীর একটি বিশেষ স্থান আছে। সদাগরের সাত ছেলে এবং সাত বৌ থাকিলেও ছোট বউ কাহিনীর নায়িকার স্থান অধিকার করিবে। বাংলার রূপকথায় ছোট রাণী এবং ব্রতকথায় ছোট বৌকে কেন্দ্র করিয়া অগণিত লোক-কথা রচিত হইয়াছে। রূপকথার ছোট রাণী একটু সরল প্রকৃতির, জ্যেষ্ঠা রাণীরা সহজেই তাহাকে ছলনা করিয়া থাকে; কিন্তু ছোট এবং অসহায়ের সমাজেব প্রতি যে সহানুভূতি বর্তমান, তাহা দ্বারা তাহাকে পরিণামে বিজয়িনী রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়া থাকে।

অনেক সময় ছোট বউয়ের কতকগুলি চারিত্রিক ত্রুটি থাকে; অবশ্য নৈতিক কোন ত্রুটির কথা এই শ্রেণীর কাহিনীতে শুনিতে পাওয়া যায় না। চারিত্রিক ত্রুটির মধ্যে ছোট বউ একটু লোভী প্রকৃতির হইয়া থাকে। সে ছোট, সেই জন্য হয়ত লোভকে সহজে সংযত করিতে পারে না, তাহাই তাহার সম্পর্কিত

কাহিনীর প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। সে এই লোভের জন্য তাড়না ও গঞ্জনা লাভ করে। তারপর অনেক সময় দৈব অনুগ্রহ দ্বারা কেবলমাত্র চারিত্রিক এই ত্রুটি হইতেই যে পরিত্রাণ পায়, তাহা নহে, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের লোভীর কথায়ও এই শ্রেণীর দুই একটি কাহিনী শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

রামায়ণের মধ্যে যে দশরথের কনিষ্ঠা রাণী অন্য দুই রাণীর সঙ্গে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়া যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাও এই শ্রেণীর লোক-কথার সংস্কার হইতেই আসিয়াছে। সেক্সপীয়রের *King Lear*-নাটকে কনিষ্ঠা রাজকন্যার চরিত্র যে তাঁহার জ্যেষ্ঠা আর দুই ভগ্নী হইতে স্বতন্ত্র, তাহাও এই সংস্কারের ফল। জার্মান উপকথায় একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী আছে, তাহাতে দেখা যায়, এক পরিবারের ছোট মেয়েকে কেহই দেখিতে পারিত না। একদিন সে কুয়ার ধারে বসিয়া সুতা কাটিতেছিল, সহসা তাহার হাত হইতে টাকুয়া খসিয়া গিয়া কুয়ায় পড়িয়া গেল। বিমাতা তাহাকে তাড়না করিলেন, সে অনন্যোপায় হইয়া টাকুয়াটি তুলিবার জন্য কূয়ার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে অজ্ঞান হইয়া গেল, তারপর গভীর জলতলে পাতালপুরীতে গিয়া তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সেখানে সে গাছ হইতে আপেল তুলিয়া খাইল, গরুর দুধ দুহাইল, উনুন হইতে রুটি সেঁকিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল। তারপর এক ডাইনীর সেবা করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিল। বিপুল ধনরাশি লইয়া অবশেষে সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার আর আদরের সীমা রহিল না। আমাদের দেশেও এই শ্রেণীর কাহিনীর অভাব নাই। তবে ছোট মেয়ের পরিবর্তে, ছোট বৌয়ের চরিত্র তাহাতে স্থান পায়।

বাংলার ছোট বউয়ের গল্পের মধ্যে একটি গল্প সমগ্র বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশের বাহিরেও গুজরাট পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা মনসার কথা ; ইহার কয়েকটি পাঠ-ভেদ ইহাতে উল্লেখ করা হইল।

শাঁখার সাধ

সাত ভাই শিকারে গেল। ছয় ভাই তাদের ছয় বৌকে শাঁখা কেনার টাকা দিয়ে গেল। একদিন ছয় বৌ মিলে শাঁখা কিনতে যাবে ঠিক করলো। ছোট বৌ বলল, আমিও যাব। ছয় বৌ বলল, আমাদের স্বামীরা টাকা দিয়েছে, আমরা যাব, তোর স্বামী টাকা দিয়ে গেছে? ছোট বৌ তাতেও যেতে চাইলো এবং কাঁদাকাটি করলো। তখন ছয় বৌ মিলে ছোট বৌকে ঢেঁকিতে কুটে ফেলে হাড় মাংসগুলো একটা পুকুরে ফেলে দিল।

দিন যায়, মাস যায়। ছয় বৌ মিলে একদিন সেই পুকুরটার পাশ দিয়ে স্নান করে ফিরছিল, দেখল, পুকুরে অনেক বড় বড় শুশনি শাক্ হয়েছে। বাড়ীতে এসে শ্বশুরকে বলল, পুকুরে অনেক শুশনি শাক হয়েছে, তুলে নিয়ে আসুন। শ্বশুর তুলতে গেলে শাকগুলো বলে উঠ্‌ল—

ছুবনে ছুবনে শ্বশুরা গো।
মুই তো শুসনাবতী॥
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো।
ঢেঁকিরে দিলন কুটি॥

শ্বশুরের শাক তোলা হলো না, ফিরে এলো।

কিছুদিন পর আবার সেই ছয় বৌ স্নান করে আসার পথে সেই পুকুরে বড় বড় কলমী শাক দেখতে পেল। আবার শ্বশুরকে বলল। শ্বশুর আবার শাক তুলতে গেল। শাকগুলো বলে উঠলো—

ছুবনে ছুবনে, শ্বশুরায়গো, মুই তো কলমীবতী।
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো ঢেকিরে দিলন কুটি॥

শ্বশুর শাক না তুলে ফিরে এলো। ছয় বৌকে জিজ্ঞাসা করলো, ছোট বৌ কোথায়? অন্য বউরা বলল, বাপের বাড়ী গেছে।

দিন যায়, মাস যায়। ছয় বৌ ঐ পুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে একদিন দেখল, ছাঁইচা শাক হয়ে রয়েছে। ছয় বৌ শ্বশুরকে বলে শাক তুলতে পাঠালো। শাকগুলো বলে উঠলো—

ছুবনে ছুবনে শ্বশুরায় গো মুইতো ছাঁইচাবতী।
দাঁতিয়া শাঁখার তরে গো ঢেকিরে দিলন কুটি॥

দিন গেল মাস গেল বৎসর গেল। সাত ভাই বাড়ী ফিরে আসার পথে পুকুরে একটা পদ্মফুল দেখতে পেল। সেই পুকুর ধারে এক গৃহস্থ সাত ভাইকে বললে, আমাকে ঐ পদ্মফুলটা এনে দাও। ছয় ভাই একে একে গেল; কিন্তু ফুল কারোর কাছেই এলো না। তখন ছয় ভাই ছোটভাইকে পাঠাল। ছোট ভাই হাত পেতে ডাকতেই ফুলটি তার হাতে এসে পড়লো। ফুলটিকে নিয়ে বাড়ী এলো। বাড়ীতে ফুলটি সব কথা খুলে বলল। তখন সাত ভাই ছয় বৌকে তাড়িয়ে দিল। তারপরে ফুলটিকে ছোট ভাই যত্ন করে রেখেছিল। বাড়ীর সবাই রোজ ভোর বেলায় উঠে দেখতো, বাসি কাজ হয়ে গেছে। সবাই ভাবতো কি করে এমন হয়! ছোট ভাই একদিন ঠিক করলো কি ব্যাপার দেখতে হবে। তাই একদিন না ঘুমিয়ে লক্ষ্য রাখল; দেখল, ফুল থেকে ছোট বৌ বেরিয়ে এসে সব কাজ করে দিচ্ছে। ছোট ভাই ছোট বৌকে ধরল। ছোট বৌ বলল, আমায় ছেড়ে দাও, আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। ছোট ভাই বললে, আর তোমায় ছাড়বো না। ছোট বৌ এবং ছোট ভাই সুখে সংসার করতে লাগল।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

ছোট বৌ অভিপ্রায়ের পরও ইহাতে বাক্‌শক্তি সম্পন্ন (talking) লতা ও ফুল, সমাধি স্থান হইতে লতা ও ফুলের জন্ম, দুষ্কার্যের দণ্ড (misdeed punished) ইত্যাদি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার ছড়াগুলি ওড়িয়া ভাষায় রচিত। যে অঞ্চল হইতে এই ক্ষুদ্র কথাটি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাংলার সীমান্ত, এখানকার লোক-সাহিত্যে এই উভয় অঞ্চলের পারস্পরিক প্রভাব অনুভব করা যায়।

২

অসাধু

একদিন এক সওদাগরের কাছে এক সাধু পৌঁছোল। সদাগর সাধুকে গুরু করলেন। সদাগর বললেন, তুমি এখানে থাক, কোথাও যেও না। সদাগরের দুই স্ত্রী। ছোট বৌকে সাধুর সেবা পরিচর্যা করবার জন্য বললেন, কারণ, তিনি বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবেন। সাধু বললেন, আমি তো আছি, তুমি যাও। সদাগর বিদেশে যাওয়ার পর সাধু ছোট বৌকে বলল, তোমার ছেলেপিলে নাই কেন? তখন ছোট বৌ বললে, আমার ভাগ্য। সাধু বললে, আমার কথামত কাজ করলে, ছেলে হবে। ছোট বউ বললে? তোমার অন্তরের কথা বল, আমি তাই করব। সাধু বলল, তুমি আমার সঙ্গে থাক। ছোট বৌ বললে, তুমি আমার বাবার মত, একথা বল কি করে? যা বললে বললে, এমন কথা আর বলো না। সাধু বললে, তাহলে আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাকবো না। বড় বৌকে সাধু বললে, মা, আজ হতে আমি তোমাদের বাড়ী হতে চলে যাচ্ছি। বড় বৌ বললেন, কেন যাবেন? আপনার সেবার কি কোন ক্রটি হলো? খুলে বলুন! যদি যাবেন, তা'হলে মহাজন আসুক, তাঁকে বলে যাবেন। তখন ছোট বৌ বললে, আপনি ঐ কথায় রাগ করলেন নাকি, আমি বুঝতে পারিনি, তাই ঐ কথা বলেছিলাম। সাধু বলল, আমি তোমাকে ও কথা বলিনি; এক কথা বলেছি, তুমি অন্য অর্থ বুঝলে। আমি সত্যি কথা বলছি, শ্মশানে একটি ওষুধ আছে। ছোট বৌ বললে, কি করে আনতে হবে? সাধু বললে, অমাবস্যার রাত্রে খোলাচুলে উলঙ্গ হয়ে আনতে হবে। ছোট বৌ বললে, আচ্ছা তাই হবে।

এমন সময় সদাগর বিদেশ থেকে ফিরলেন। সাধু বললে, বাবা, আমি তোমাদের ঘরে থাকবো না। সদাগর বললেন, কেন, আপনার কি হলো? আপনাকে থাকতে হবে। সাধু বলল, বাবা, তোমার ছোট বৌটি পিশাচ সাধন করছে। সদাগর বললে, তা তো আমি মানবো না, আপনি দেখিয়ে দিতে পারেন? সাধু বলল, নিশ্চয়!

এমন সময় অমাবস্যা এলো। ছোট বৌ সাধুকে বলল, আজতো অমাবস্যা, এখনই যেতে হবে? না, একটু রাত্রি হলে? রাত্রি গভীর হলে পর ছোট বৌ ও সাধু শ্মশানে গেল। শ্মশানে শবখানা থেকে মাটী খুঁড়ে মুখে করে আনছে

হবে। ছোট বৌকে সাধু বল্লে, শ্মশানের শবখানায় তুমি যাও। তারপর সাধু বাড়ী থেকে সদাগরকে ডেকে নিয়ে এলো। সদাগর দেখল, খোলাচুলে শ্মশানে ছোট বৌ মাটী খুঁড়ছে। সদাগর অবাক হয়ে সাধুর কথা বিশ্বাস করলো। সদাগর ছোট বৌকে বাড়ী হতে বার করে দিতে মনস্থ করল। সাধু বলল, আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন, আমি দেখিয়ে দিলাম। সদাগর বললেন, কাল এর ব্যবস্থা করবো। সদাগর ছুতার এনে নৌকা তৈরী করলো। সবাই মিলে স্নান করতে যাবে বলে সদাগর ছোট বৌকে বলল। ছোট বৌ বলল, আপনি তো বরাবরই যান, আমাকে তো কোনদিনই বলেন না। সদাগর বললে, সবদিন মন কি এক রকম থাকে? ছোট বৌ সদাগরের অনুগ্রহে আনন্দিতা হলো। তাকে নদীতে স্নান করতে নিয়ে গেলেন। সদাগর ছোট বৌকে সুন্দর একটি নৌকায় উঠিয়ে স্নান করতে গেল। সদাগর নৌকার একখানা তক্তা উঠিয়ে তার মধ্যে ছোট বৌকে ভ'রে দিয়ে তক্তা চাপা দিলেন। সদাগর নৌকা ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে এলেন।

এক দেশের রাজা শিকারে গিয়ে নদীতে একটি সুন্দর নৌকা দেখতে পেয়ে তার লোকজনকে নৌকাটি ধরতে বললেন; নৌকার মধ্য হতে নারীকণ্ঠের কান্না শোনা গেল। রাজা নৌকার ভিতর হতে সদাগরের ছোট বৌকে উদ্ধার ক'রে তার ভিতরে একটি জ্যান্ত ভালুক ঢুকিয়ে দিলেন।

সাধু নদীর উপরে নৌকাটি দেখে বুঝতে পারলো এর মধ্যে ছোট বৌকে পুরে দিয়ে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি বলতে লাগলেন, আমার কথা যদি শুনতে, তাহলে সুখী হতে, তা না করায় দেখ, তোমার কত কষ্ট। এই বলে পাটাতন খুলেছেন, অমনি এক ভালুক বেরিয়ে এসে সাধুর গলা চেপে ধরল। সাধু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'লো।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

দুষ্কার্যের শাস্তি ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। সাধুসন্ন্যাসীর চরিত্রকে নিন্দা-ভাজন করিবার প্রবৃত্তি বৌদ্ধ যুগের পরবর্তী যুগ হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-কথায় তাহারই ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ছোট বউয়ের সঙ্গে সদাগরের যে মিলন হইল না, ইহা কাহিনীর মূল অভিপ্রায় ছিল না।

কুলার সাধ

এক সওদাগর বণিজ্য করিতে যাইতেছেন। তাঁর সাত ছেলে সাত বৌ। সওদাগর তাঁর স্ত্রী ও পুত্রবধূদের ডাকিয়া বলিলেন, আমি বাণিজ্য করিতে যাইব, কাহার জন্য কি জিনিস আনিব, বল! তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূরা কেহ বস্ত্র কেহ অলঙ্কার প্রভৃতি দ্রব্য ফরমাইস দিল। কিন্তু ছোট পুত্রবধূ কিছুই বলিল না। তিনি তখন ছোট পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন, সকলে সব জিনিসের কথা বলিল, তুমি কিছু বলিলে না কেন? সে বলিল, আমার কিছুরই দরকার নাই। তখন সওদাগর বলিলেন, তাও কি হয়, তোমার কি জিনিস দরকার, বল! অনেক পীড়াপীড়িতে সে তখন বলিল, আমার জন্য একখানি কুলা আনিবেন। সওদাগর বলিলেন, এত জিনিস থাকিতে তুমি কুলার কথা বলিলে কেন? তখন ছোট বৌ বলিল, আমার বাপের বাড়ীতে কুলাতেই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে। আমি বাপের বাড়ী হইতে একখানি কুলা আনিয়াছিলাম, এত দিন পর সেখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেইজন্য কুলা আনিতে বলিলাম, আমার জন্য কুলা আনিবেন।

তারপর সওদাগর সাত ডিঙ্গা মধুকরী সাজাইয়া বাণিজ্যে চলিলেন। বাণিজ্যে গিয়া সকলের ফরমাইস মত বস্ত্র অলঙ্কার কিনিয়া বাণিজ্য করিয়া সাত ডিঙ্গা মধুকরী বোঝাই করিলেন, কেবল ছোট বউএর কুলা তুচ্ছ বলিয়া কিনিলেন না। মনে করিলেন, ঐ সামান্য জিনিস আর কিনিব কি?. সাত ডিঙ্গা মধুকরী ফিরিয়া আসিতে পথে ঝড় হইয়া ডুবিয়া গেল, সওদাগরও ডুবিয়া গেলেন।

সওদাগর ভাসিতে ভাসিতে শেষে এক নদীর চড়ায় গিয়া আট্‌কাইয়া থাকিলেন। সেই নদীর ধারে দেবকন্যারা কুলাই ব্রত করিয়া কুলা ভাসাইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, একজন মানুষ চড়ার উপর পড়িয়া আছে। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন. মানুষটি এখনও জীবিত, তাঁহারা শুশ্রূষা করিয়া বাড়িতে লইয়া গেলেন।

মঙ্গলবার তাঁহারা কুলাই ব্রতের আয়োজন করিতেছিলেন, সওদাগর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আপনারা কি ব্রত করিতেছেন? ইহা করিলে কি হয়? তাঁহারা বলিলেন, এ পুজার নাম কুলাইচণ্ডী। ইহা করিলে অকূলে কূল পায়। সওদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা করিতে কি কি লাগে? দেবকন্যারা সকল বলিয়া দিলেন।

সওদাগর বলিল, আমি এই ব্রত করিব, আমি সর্বস্ব খোয়াইয়া অকূলে পড়িয়াছি।

দেবকন্যাদের সঙ্গে সওদাগর ঐ ব্রত করিলেন। পূজা করিয়া কথা শুনিয়া জল খাইয়া কুলা লইয়া নদীতে ভাসাইতে গেলেন, গিয়া দেখেন যে সমস্ত নৌকার গলুই লাগিয়াছে। ইহা দেখিয়া পরে আর আর দুই মঙ্গলবার পূজা করিবার পর দেখিলেন, সাত ডিঙ্গা মধুকরী অক্ষত শরীরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। একটি জিনিসও নষ্ট হয় নাই। তখন সওদাগর একখানি সোনার কুলা গড়াইয়া দেবকন্যাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সাত ডিঙ্গা মধুকরী সাজাইয়া দেশে রওনা হইলেন।

গ্রামের ঘাটে আসিয়া ঢোল দিলেন, তখন গ্রামের সব লোক দেখিতে আসিল। তাহাদের বলিলেন, আমার বাড়ীতে সংবাদ দাও যে আমি বাণিজ্য করিয়া ফিরিয়াছি। ঘাট চাঁছিয়া গোবর দিয়া লেপিয়া ছোট বউমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কুলাই মঙ্গলচণ্ডীর পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া ঘাটের পাড়ে আমার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ বস্ত্র অলঙ্কার পরিয়া আসিবে, পূজার পর আমি নামিব।

গ্রামবাসীদের নিকট সংবাদ পাইয়া সওদাগরের স্ত্রী সাত বধূদের লইয়া স্নান করিয়া বস্ত্র অলঙ্কার পরিয়া পূজার সমস্ত অনুষ্ঠান লইয়া ঘাটের পারে উপস্থিত হইলেন। ঘাট চাঁছিয়া লেপিয়া সেখানে সমস্ত আয়োজন সাজাইল। তখন সওদাগর সোনার কুলা বাহির করিয়া দিলেন, পূজা হইল।

সওদাগর বলিলেন, আমার ছোট বউমা লক্ষ্মী, তাঁহার কুলা তাচ্ছিল্য করিয়া কিনি নাই; সেইজন্য আমার সাত ডিঙ্গা মধুকরী ডুবিয়া গিয়াছিল। আমি দেবকন্যাদের সাহায্যে বাঁচিয়াছি এবং কুলাই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া সব ফিরিয়া পাইয়াছি, এ পূজা আর ছাড়িব না।

—পাবনা, বিমলা দেবী সংগৃহীত

৪

সংক্রান্তি-পুরুষ

এক গৃহস্থ, তার সাত ছেলে সাত বৌ, ভয়ানক গরীব। ছেলেরা জঙ্গলে কাঠ কেটে আনে, বিক্রী করে, মেয়েরা গোবর কুড়ায় ঘুঁটে তৈরী করে বিক্রী করে।

শ্রাবণ মাস, পঞ্চমী, বুড়ী ছেলে-বৌদের নিয়ে কাঠ কাটতে গোবর কুড়াতে গেল, ছোট বৌকে বাড়ীতে রেখে গেল। বলে গেল যে আজ সংক্রান্তি। অতিথি এলে অতিথ করিস্। ঘরে ছেঁড়া পাটী আছে, পেতে দিস্, ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস দিস্, ভাঙ্গা ঝারিতে পা ধোয়াস্, হাঁড়ি নিঙড়ে তেল দিস্, তারপর স্নান করে এলে মাটীর উপর হাঁড়িতে ফল-কাসন আছে, খেতে দিস্। হাঁড়িতে ক্ষুদ আছে, ঘরের পিছনে কলা গাছে কাঁচকলা ধরেছে, তাই থেকে একটা কাঁচকলা দিস্, কুলায় করে ক্ষুদ কাঁচকলা দিস্। এই সব বলে রেখে বুড়ী চলে গেলেন।

তারপর দুপুর বেলা সংক্রান্তি-পুরুষ এলেন। ছাতা মাথায় চটী জুতা পায় এসে বল্লেন, গৃহস্থের বৌ, অতিথ কর। বৌ তাড়াতাড়ি ছেঁড়া পাটী বারান্দায় দিল, ভাঙ্গা ঝারিতে জল এনে পা ধুইয়ে ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। তারপর হাঁড়ি নিঙড়ে এনে দিল, তিনি স্নান করতে গেলেন। তিনি স্নান করে এলে ফুল-কাসন জল খেতে দিলে, তিনি শুঁকে ফেলে দিলেন। ঘরের পিছনের গাছ হতে কলা এনে ক্ষুদ কাঁচকলা কুলায় করে দিল। কিন্তু সংক্রান্তি-পুরুষ কিছুই খেলেন না, তিনি বায়ু ভক্ষণ করে থাকেন, চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। বেলা পড়ে গেলে উঠলেন, উঠে বললেন, গৃহস্থের বৌ, থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, স্বর্ণপুরী ছাইপুরী হবে, না থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, ছাইপুরী স্বর্ণপুরী হবে। তিনবার এই কথা বলে চলে গেলেন। তিনি বেরিয়ে যেতেই বাগ বাগিচা অট্টালিকা দালান কোঠা দীঘি পুষ্করিণী দাস দাসী নফর চাকর সমস্ত হয়ে গেল। বেলা শেষে স্বামী, ভাসুর, জা, শ্বশুর, শাশুড়ী ফিরে আসে; এসে দেখে তাদের কুঁড়ে ঘর আর নাই, তার স্থানে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা। তারা গাছতলায় বসে হাহাকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, কোন্ রাজা এসে আমাদের কুঁড়ে ভেঙ্গে বাড়ী করেছে, আমাদের বৌকেও নিয়ে গিয়েছে। এই সব বলে তারা হাহাকার করতে তখন বৌ তাহাদের দেখতে পেয়ে লোকজন

পাঠিয়ে তাদের ধরে আনল। তখন তারা গালাগালি দিতে দিতে ও কাঁপতে কাঁপতে এল। আমাদের এইবার বধ করবে, বৌ নিয়ে গিয়ে শুধু হয়নি।

ছোট বৌ তখন বেরিয়ে এসে বলল, আপনাদের ভয় নেই, আপনারা বলে গিয়েছিলেন, অতিথ করতে, তাই আমি অতিথ করলাম, সংক্রান্তি-পুরুষ বর দিয়ে গেলেন, সেই বরে এই সব হয়েছে। তখন সকলে বলল, ছোট বৌ আমাদের লক্ষ্মী, ছোট বৌ আমাদের সোনা, এই ব'লে সবাই আদর করতে লাগল। এক প্রতিবেশীর তাদের সুখ ঐশ্বর্য দেখে খুব হিংসে হতে লাগল, সে তাদের ছোট বৌকে নিয়ত গালাগালি দিতে লাগল, আর বলল, ওদের ছোট বৌ কত ধন ঐশ্বর্য করে দিল, বৌ কেমন লক্ষ্মী, তাকেও সব করে দিতে হবে। পরের সংক্রান্তিতে তারা নিজের সমস্ত ধন সম্পত্তি পুতে ফেলে ছেঁড়া পাটী ভাঙ্গা ঝারি ভাঙ্গা পাখা সংগ্রহ করে বৌকে দিয়ে বলল, সংক্রান্তি-পুরুষ এলে অতিথ করিস্, এলে পরে ভাঙ্গা ঝারিতে জল দিয়ে পা ধোয়াস্, ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস করিস্, হাঁড়ি নিঙড়ে তেল দিস্, ক্ষুদ কাঁচকলা খেতে দিস্, এই বলে রেখে ছেলে বৌ নিয়ে কাঠ কাটতে গোবর কুড়াতে চলে গেল। সমস্ত দিন বনের মধ্যে থেকে বেলা পড়তে না পড়তে চলে এল। এদিকে দুপুরে সংক্রান্তি-পুরুষ এসে বললেন, গৃহস্থ বৌ, অতিথ কর। বৌ তখন ছেঁড়া পাটী পেতে দিল, প্রণাম করল, ভাঙ্গা ঝারিতে পা ধুইয়ে দিল, ভাঙ্গা পাখা দিয়ে বাতাস দিল, সুস্থ হলে হাঁড়ী নিঙড়ে তেল দিল, স্নান করতে গেলেন, স্নান করে এলে ফুল-কাসেন জল খেতে দিল, তিনি শুঁকে ফেলে দিলেন ; তারপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন, খান না দান না, বায়ু ভক্ষণ করেন। বেলা পড়লে উঠলেন, গৃহস্থের বৌকে বললেন, থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, তবে সুবর্ণপুরী ছাইপুরী হবে, না থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, ছাইপুরী সুবর্ণপুরী হবে। তিনবার এই বলে যেতেই বেড়া আগুন লেগে সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বৌ তাড়াতাড়ি সংক্রান্তি-পুরুষের পায়ের উপর পড়ে বলল, ঠাকুর, এ কি করলে, ওরা ত আমায় খুন করবে।

সংক্রান্তি-পুরুষ বললেন, আমিত কিছু করিনি! ও আমার মুখের বুলি আর ফেরাবার নয়। এক বছর ঐ ছাই নাড়া ছাই চাড়া, তারপর আমি আবার আসব, তখন যেমন ছিল, তেমনি হবে, এই বলে চলে গেলেন। তখন বুড়ী ছেলেদের নিয়ে বসে ছিল মিছামিছি—কাঠও কাটেনি গোবরও কুড়ায়নি, তাড়াতাড়ি

করে এসে দেখে, কোথায় বা অট্টালিকা, কোথায় বা কি, যা ছিল পুড়ে ভস্মসাৎ। তখন তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বৌকে মারতে লাগলো।

ছোট বৌ তখন বলল, তোমরা আমায় মেরো না, সংক্রান্তি-পুরুষ বললেন, থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, স্বর্ণপুরী ছাইপুরী হবে, না থাকতে যদি দিয়ে থাকিস, ছাইপুরী স্বর্ণপুরী হবে। আমরা থাকতে দিয়েছিলাম, তাই এই দুর্দশা, হিংসা করার ফল এই। এক বছর এই ছাই নাড়তে চাড়তে হবে, তারপর তিনি আসবেন। এলে যেমন ছিল তেমনি হবে। বললেন, এ আমার মুখের বুলি, কর্মের ফল যার যা, সে তাই ভোগ করে। পরের বছর সংক্রান্তি-পুরুষ এলেন। ছোট বৌ অতিথ ক'রল, যা ছিল তাই হ'ল, কিছু বাড়লও না, কমলও না। যা ছিল, তাই আবার হ'ল।

—পাবনা, বিমলা দেবী সংগৃহীত

মন্তব্য

ভাগ্যের বিবর্তন (Reversal of Fortune, L) ইহার প্রধান অভিপ্রায়। ভাগ্যের বিবর্তনের ছোট বৌ ই প্রধানতঃ কারণ; সেই জন্য বিজয়িনী ছোট বৌ (victorious youngest danghter-in-law L. 50) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। সংক্রান্তি-পুরুষ এখানে দৈব বা নিয়তির রূপক বলিয়া ধরিতে হইবে।

নাগ-সন্তান

এক গৃহস্থ, তাঁর সাত ব্যাটা, সাত বৌ। শ্রাবণ মাস পঞ্চমী, ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি হচ্ছে, গৃহস্থের সাত বৌ জল আনতে যাচ্ছে। বড়বৌ ব'লল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, তপ্ত তপ্ত খিচুড়ী পাট ভাজা হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। মেজবৌ ব'লল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, তপ্ত তপ্ত ঝোল ভাত হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। ন-বৌ বলল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, পিঠে পুলি পরমান্ন হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। রাঙাবৌ বলল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, গরম গরম জিলেপি আর লুচি হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। সেজ বৌ বলল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, দৈ চিঁড়ে মুড়কী কলা কাঁঠাল গুড় হয়, মেখে খেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। ফুল বৌ বলল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, পঞ্চ ব্যঞ্জন হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। ছোট বৌ কিছু বলল না। সকলে বলল, ছোট বৌ, তুই বললি না কেন? ছোট বৌ বলল, তোমাদের বাপের বাড়ী আছে, আমার ত বাপের বাড়ী নেই, কিছুই পুর্ণ হবে না, শুধু শুধু বলে কি করব?

সকলে বলল, হ্যাঁ, আমরাও যাচ্ছি বাপের বাড়ী, আর সাধও সকলের পুর্ণ হচ্ছে! মুখের কথা একটা বলবার, তাই আমরা বললাম, তুইও বল! তখন ছোট বৌ বলল, আজকের মত দিন হয়, মা বাপের বাড়ী হয়, উপুল মাছ পোড়া হয়, পান্ত ভাত হয়, খেয়ে দেয়ে সুখে নিদ্রা যাই। এই কথা বলে সকলে জল নিয়ে আসতে দেখে কি, গৃহস্থরা বনপোড়া দিয়েছে, সেই বন থেকে দুটী সাপ বেরিয়ে গরুর ক্ষুরে যে জল বেঁধেছে, সেই জলে উপুল মাছ হয়ে লাফাচ্ছে। সকলে বলল, ও' ছোট বৌ, আমাদের সাধ পুর্ণ হ'ল না, তোর সাধ পুর্ণ হল। এই ছাখ, একটা কচুর পাতা ছিঁড়ে তুলে নিয়ে যা। সকলে বাড়িতে গেল। সেদিন ছোট বৌএর রাঁধার পালা। কচুর পাতায় উপুল মাছ চালের বাতায় গুঁজে ছোট বৌ রান্না বান্না করে সকলকে খাওয়াল। তখন বৌরা বলল, ও ছোট বৌ, হাঁড়ীতে পান্তা ভাত আছে, বার কর, আর উপুল মাছ পুড়িয়ে তোর সাধই আগে পুর্ণ কর।

ছোট বৌ চালের বাতায় যে কচুর পাতায় করে মাছ রেখেছিল, বের করতে গিয়ে ছাখে যে ছুটি উপুল মাছ সাপ হয়ে ফোঁস ফোঁস কচ্ছে। ছোট বৌএর মমতা হ'ল, সে ফেলে দিতে পারল না। কুমোরের বাড়ী থেকে কাঁচা হাঁড়ি এনে তাইতে সাপ ছুটোকে পুরে গোলার মধ্যে রেখে এ'ল। প্রতিদিন গোপনে দুধ কলা দিয়ে আসত। একদিন শ্বশুর ধান পাড়বার জন্য গোলায় উঠে দেখে, ছুটি সাপ ফোঁস করে উঠেছে, তখন শ্বশুর চীৎকার করে বলল, কে বেদের মেয়ে, তেলেঙ্গির মেয়ে সাপ পুষিস্ ! আমাকে এখনই খেয়ে ফেলত—বলে মাচার উপর থেকে নামল। ছুপুরে ছোট বৌ চুপে চুপে হাঁড়ি ধরে বনে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, তোরা বনের সাপ বনে যা, নইলে আমার শ্বশুর দেখতে পেলে আমার প্রাণ যাবে।

তখন দুই সাপ বলল, মানবের বেটী, তুমি বর নাও। সে বলল, আমি বর চাই না, তোমরা বনের সাপ, বনে যাও। তারা বলল, সে কি হয়, গৃহস্থেরা আমাদের মেরে ফেলেছিল, তুমি একমাস ধরে যত্ন করে পালন করলে, বর নাও। তখন ছোট বৌ বলল, আমার বাপের বাড়ী নেই, আমাকে নাইওর করিও। তখন সাপ ছুটি মনসাপুরীতে চলে গেল।

মা মনসা সোনার সিংহাসনে বসে আছেন, জরৎকারু তলায় বসে আছেন। নাগেরা বসে রয়েছে, সাপ ছুটি গা বেয়ে বেয়ে পা বেয়ে বেয়ে উঠছে। মা মনসা তখন বললেন, তোরা এতদিন কোথায় ছিলি ?

তারা বলল, আমরা ছিলাম কি মরেই গিয়েছিলাম, গৃহস্থেরা বন পোড়া দিয়েছিল, তারপর এক গৃহস্থের বৌ আমাদের নিয়ে গিয়ে দুধ কলা দিয়ে এক মাস পুষেছিল। বেশী দিন শ্বশুরের ভয়ে রাখতে পারল না, বনে ছেড়ে দিয়ে গেল। তা তুমি এক সত্যি কর। কি সত্যি করব, যত খায় যত পরে, দিয়ে আয়। তারা বলল, না, তা হবে না, সত্যি কর। এই বলে গা বেয়ে পা বেয়ে উঠতে লাগল। তখন মনসা বললেন, কি সত্যি করব ? যত চায়, সব দিয়ে আয়। তারা বল্ল, সত্যি কর, তা হবে না, নইলে ছাড়বো না।

এই বলে মনসাকে তিন সত্যি করাল, করিয়ে বল্ল, মানবের বিটির নাইওর নেই, নাইওর করাতে হবে। শুনে মনসা বল্লেন, তাই কি হয় ? দেবে মানবে ঘর হয় না। যত খায়, যত পরে, দিয়ে এস। তারা বল্ল, মা, তা হবে না, আমরা বর দিয়েছি, নাইয়র করাব। তখন মনসা বল্লেন, কি করব, নিয়ে এস। ধোড়াই ফোড়াই এগ্নোরাজ মুনিরাজ দুইজন মানুষের মূর্তি ধরে দুই ভাই তার

ভারাতি কাঁধে ছাতি জিনিসপত্র কিনে নিয়ে গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন, হয়ে বললেন, ভাগ্নেরে মাগ্নেরে বোনটিকে নিতে এসেছি। আমরা বাণিজ্যে গিয়েছিলাম—মা নেই, বাপ নেই, সব মরে গিয়েছে। আমরা ছেলে, এক বোন হয়েছে তাই নিতে এলাম। ছোট বৌ বলল, আমার মাও নেই, বাপও নেই ভাইও নেই, কেউই নেই, আমি যাব না।

শাশুড়ী জাএরা বলল, তাও কি হয়, আপনার লোক না হলে কি এত জিনিসপত্র দেয়, যাও, অল্প, দিন থেকে এস। এই বলে তাদের বললেন, এসেছ ভাল, নাও খাও, তারপর যেও। তারা বলল, নাবও না খাবও না, বোনটীকে তেল সিঁদুর দিয়ে দেন, আমরা এখনই নিয়ে যাব। তখন ছোট বৌকে তেল সিঁদুর দিয়ে পাল্কীতে তুলে দিলে, ছোট বৌ কাঁদতে লাগল।

পাল্কী নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে নামাল, নামিয়ে পাল্কী বেহারা বিদায় করে দিয়ে বলল, মানবের বেটী তুমি, তুমিও আমাদের বোন নও, আমরাও তোমার ভাই নই, আমরা এখন নিজ মূর্তি ধরে সমুদ্র পার হব, তুমি সাতপুরু কাপড় বেঁধে থাক, আর দুজনের পিঠে হাত দিয়ে থাক—তাকিও না। এই বলে চোখ বেঁধে দিয়ে নিজ মূর্তি ধরে পার হল, হয়ে ওপারে গিয়ে ধুপ করে ফেলে কেঁচো ঘুঘরো খুঁটে খেতে লাগলো। ছোট বৌ কাপড়ের ফাঁক দিয়ে একটু দেখল, ভীষণ অজগর মূর্তি। দেখে অজ্ঞান হয়ে গেল।

তখন তারা ক্ষার বিছনোর বাও দিল, অমৃতকুণ্ডের জল দিল, দিয়ে জাগিয়ে তুলল ; তুলে বলল, কি দেখলে মানবের বিটী ? 'কিছুই না', তিনবার এই কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর বলল, দেবে মানবে ঘর হবে, মানবের বিটির পেটে কথা থাকে। তারপর নাগপুরীতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল, আর শিখিয়ে দিল—মা মনসা সোনার খাটে শুয়ে আছেন—বাপ জরৎকারু রূপার সিংহাসনে বসে আছেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করবে।

আগে খেতে বললে খাবে না, আগে স্নান করতে বললে স্নান করবে না। এই সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে গেল। নাগপুরীতে মা মনসা বসে আছেন, বাপ জরৎকারু বসে আছেন, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, আর জোড় হাত করে থাকল। মা মনসা স্নান করতে বললে বলল, আপনার স্নান হ'লে স্নান করব, খেতে বলাতে বলল, আপনার প্রসাদ খাব।

শ্রাবণ মাস পঞ্চমী। মা মনসা বললেন, আমি মর্ত্যে পূজা খেতে যাব, তুমি হাঁড়ীতে ভাত ব্যঞ্জন আছে, খেও। হাঁড়ীতে খই আছে, কলাওয়ালী

কলা দিয়ে যাবে, দুধওয়ালী দুধ দিয়ে যাবে, দুধখানি জ্বাল দিয়ে জুড়িয়ে নাগের গর্তে গর্তে ঢেলে দিও। কাঠায় করে খৈ দিও, এক একটা কলা ছুলে দিও। এই বলে পূজা খেতে চলে গেলেন।

এদিকে গৃহস্থের বৌ হাঁড়ী থেকে ভাত ব্যঞ্জন নিয়ে স্নান করে খেয়ে উচল পিঁড়ায় শীতলপাটী পেতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কলাওয়ালী কলা নিয়ে ডেকে ডেকে কলা রেখে গিয়েছে, দুপুর অতিক্রম করেছে, নাগেদের সব ক্ষিদে লেগেছে, তারা ফোঁস ফোঁস করছে। তাদের ফোঁস ফোঁসানি গর্জনে ছোট বৌএর ঘুম ভেঙ্গে গেল, ধড়ফড় করে উঠে দেখে বেলা পড়ে গেছে, দুধওয়ালী দুধ দিয়ে গেছে, কলাওয়ালী কলা দিয়ে গেছে। তখন তাড়াতাড়ি খড়ের চাল থেকে খড় টেনে নিয়ে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দুধ চড়িয়ে দিল। গরম গরম দুধ নাগের গর্তে ঢেলে দিল, চোঁচা শুদ্ধ কলা দিল, ধানেপানে খৈ দিল। কারও ওঁঠ পুড়লো, কারও ঠোঁট পুড়লো, কারও জিভ খস্‌লো, কারও লেজ খসে পড়লো, কারও ডিম পুড়লো, কারও ডিম হেজে গেল।

কেউ বলে খাই, কেউ বলে থুই ; মা আসুক, তারপর বলে দেব। আলাদ সাপের রাগ বেশী, অমনি গিয়ে মানবের বেটীকে ছোঁ মারল, সে অজ্ঞান হ'য়ে ঢলে পড়ল। তখন মনসা পূজা খাচ্ছিলেন, তাঁর মাথার টনক নড়ল। তিনি বলিলেন, যাঃ, তখনই বলেছিলাম, দেবে মানবে ঘর হয় না, কি বা করেছে, একটা অনর্থ ঘটেছে। এই বলে তাড়াতাড়ি এসে দেখেন, মানবের বেটী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ক্ষার বিছানোর বাও দিলেন, অমৃতকুণ্ডের জল দিলেন ; দিয়ে জীইয়ে বললেন, কি হয়েছিল, মানবের বেটী? কিছুই না ! তিনবার এই কথা বললেন। তারপর বললেন , যাক্ মানবের বেটীর পেটে কথা থাকে।

তখন নাগেরা এসে নালিশ করল। কেউ বলল, মা, আমার মুখ পুড়েছে, কেউ বলল, মা, লেজ খসে গেছে। কেউ বলল, মা, আমার ডিম হেজে কেঁচে গেছে। তখন তিনি বললেন, তখনই ত বলেছি, বাছা, দেবে মানবে ঘর হয় না ; যত খায় যত পরে দিয়ে এস। তখন সোনার একটা কুমড়ো করে দিয়ে বললেন, এক অঙ্গের গয়না গড়িয়ে দাও। তারপর মানবের বেটীকে বললেন, দেখ নাগের রাগ সহজে যায় না, ওরা সত্যি করে তোমাকে খেয়ে ফেলত। তা তুমি এক কাজ কর, ওদের ঘাট বাঁচিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে খুব অহঙ্কার ক'রো। শ্বশুর লেখা পড়া করবে বারান্দায় বসে, তুমি

ঘর ঝাঁট দিয়ে শ্বশুরের মাথায় ঢেলে দিও। শ্বশুর বলবেন, ঠ্যাকারীর বিটী ন্যাকারী, এক অঙ্গে অলঙ্কার পরে এত অহঙ্কার; সব অঙ্গে ত' পারিস্‌নি! তুমি বলো, ষাট ষাট, ধাঁড়াই ফোঁড়াই এয়োরাজ মুনিরাজ ভাই বেঁচে থাক, বাপ জরৎকারু বেঁচে থাক, মা মনসা বেঁচে থাক, এক অঙ্গে পরেছি, সব অঙ্গে পর্‌তে কতক্ষণ? শাশুড়ী বলবে, মাথার পাকা চুল তুলে দাও, কাঁচায় পাকায় পড়পড়িয়ে তুলে দিও। বলবে, ঠ্যাকারীর বিটী ন্যাকারী, এক অঙ্গে পরেই এত অহঙ্কার, সব অঙ্গে ত' পরিসনি! তুমি বলো, ষাট ষাট, ধাঁড়াই ফোঁড়াই এয়োরাজ মুনিরাজ বেঁচে থাক, মনসা মা বেঁচে থাক, জরৎকারু বাপ বেঁচে থাক, এক অঙ্গে পরেছি, সব অঙ্গে পর্‌তে কতক্ষণ? রাত্রে স্বামী বলবে চুল আঁচড়াতে, মাথার ছালছড়ি তুলে দিও, সেও ঐ কথা বলবে, তুমি অমনি ষাট ষাট করবে। এই সব শিখিয়া দিলেন।

আবার দুই ভাই ছোট বৌকে নিয়ে গিয়ে সাতপুরু কাপড় বেঁধে দিয়ে পার হলো। এক ভাই কাছে থাকলো, এক ভাই পাল্কী ডাকতে গেল। তারপর তা'রা জিনিস পত্র নিয়ে গিয়ে বলল, তাঐরে মাঐরে, বোনটিকে নিয়ে গিয়েছিলাম, দিয়ে গেলাম। তারা বলল, আমরা খাবও না, দাবও না, সময় নেই, বলে চলে গেল। বাইরে গিয়ে পাল্কী বেহারাকে বিদায় দিল। দুইজন নাগের মূর্তি ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বলল, এইবার সত্য পালন হয়েছে, মানবের বিটীকে খাব। এই বলে বাড়ীর পাশে থাকল। এদিকে ছোট বৌ ঘর ঝাঁট দিয়ে, শ্বশুর কাজ কর্‌ছিল, তার মাথায় ঢেলে দিল। শ্বশুর অমনি বললেন, ঠ্যাকারীর বিটী ন্যাকারী, এক অঙ্গে অলঙ্কার পরে এত অহঙ্কার! সব অঙ্গে ত পরিস্‌নি!

বৌ অমনি বলল, ষাট ষাট, ধাঁড়াই ফোঁড়াই এয়োরাজ মুনিরাজ ভাই বেঁচে থাক, জরৎকারু বাপ বেঁচে থাক, মনসা মা বেঁচে থাক, এক অঙ্গে পরেছি, সব অঙ্গে পর্‌তে কতক্ষণ। তারপর দুপুরে শাশুড়ী চুল তুলতে বলল, কাঁচা পাকা চুল পড়পড় করে তুলল, শাশুড়ী অমনি ঐ কথা বলল। রাত্রে স্বামী মাথা আঁচড়াতে বলল, অমনি ছালছড়ি তুলে চুল আঁচড়ে দিল। স্বামী অমনি গালাগালি দিল, ঠ্যাকারীর বিটী ন্যাকারী, এক অঙ্গে অলঙ্কার পরে এত অহঙ্কার; সব অঙ্গে ত পরিস নি। অমনি ছোট বৌ বলল, ষাট ষাট, ধোঁড়াই ফোঁড়াই এয়োরাজ মুনিরাজ ভাই বেঁচে থাক, বাপ জরৎকারু বেঁচে থাক, মা মনসা বেঁচে থাক, এক অঙ্গে পরেছি, সব অঙ্গে পর্‌তে কতক্ষণ? ওরা দুই ভাই

বেড়ার গায়ে ছিল, গেরস্থর বৌকে খাবার জন্য। তারা বলল, এক অঙ্গে গয়না দিয়ে বড় খোঁটার ঘর হয়েছে, আবার নিয়ে গিয়ে সব অঙ্গের গয়না গড়িয়ে দেব। পরদিন সকালে তারা দুজনে মানুষের মূর্তি ধরে জিনিসপত্র নিয়ে এসে বলল, তাঐরে, মাঐরে, বোনটীর আমার খোঁটার ঘর হয়েছে, আমরা আর এক অঙ্গে অলঙ্কার দেব, আমরা নিয়ে যাব। শাশুড়ী বলল, ও মা, তোমরা কি দেবতা! কথা কই ঘরের কোণে, তোমরা থাক বনে। যাবে—এসেছ যখন, নাও খাও, তার পর যেও।

বোনটীকে তেল সিঁদুর দিয়ে দেন, পাল্কী বেহারা এসেছে, এখনই নিয়ে যাব। তাড়াতাড়ি ছোট বৌকে তেল সিঁদুর দিল। ছোট বৌ কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সমুদ্রের ধারে গিয়ে পাল্কী বেহারা বিদায় করে দিয়ে সাতপুরু কাপড় চোখে বেঁধে দিল, দিয়ে বলল, দুজনের পিঠে হাত দিয়ে থাক, এই বলে সাঁই সাঁই করে সমুদ্র পার হ'ল, তারপরে নাগপুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে নিয়ে গিয়ে মনসা মাকে বলল, মা, মানবের বেটীর বড় খোঁটার ঘর হয়েছে। এক অঙ্গে অলঙ্কার পরে তার বড় যন্ত্রণা হয়েছে। তবু সে আমাদের ঘাট বাঁচায়। সেইজন্য তাকে নিয়ে এলাম।

তিনি বললেন, বেশ ত, এসেছে থাকুক। খায় দায় থাকে। পঞ্চমী শ্রাবণ মাস, মা মনসা পুজা খেতে যাবেন—বললেন, ঘরে দৈ আছে, চিঁড়া মুড়ি মুড়্‌কী কলা আছে, তুমি স্নান ক'রে ফলার খেও। কলাওয়ালী কলা দিয়ে যাবে, দুধওয়ালী দুধ দিয়ে যাবে। দুধ জ্বাল দিয়ে জুড়িয়ে নাগের গর্তে গর্তে দিও, কলা ছুলে দিও, খৈ দিও। খেয়ে দেয়ে বেড়িও, তিন দিক দেখো, এক দিক দেখো না। দক্ষিণ দিক দেখো না।

এই সব বলে মা মনসা পূজা খেতে চলে গেলেন। সে তখন তেল মেখে স্নান করে খৈ মুড়কী চিড়া চালভাজা ছাতু কলা দিয়ে দৈ দিয়ে মেখে খেল। তারপর খৈ খানি চেলে বেছে রাখল। কলা নিয়ে এল, পূর্ব দিকে গেল, দেবপুরীর বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত করছে, ইন্দ্রপুরী সাজান হয়েছে, বড় বড় সব রোশনাই আলো জ্বলছে, অরুণ বরুণ ইন্দ্র চন্দ্র বসে আছেন। পশ্চিম দিকে গেল, দেখল, কাশী গয়া বৃন্দাবন তীর্থ, সাধু-সন্ন্যাসীরা বেদমন্ত্র পাঠ করছে। উত্তর দিকে গেল, দেখল, দেব-দেবীর পুজো হচ্ছে, দুর্গা পুজা হচ্ছে, ঢাক ঢোল বাদ্যি বাজছে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছে, পাঁঠা, মোষ বলি হচ্ছে, ধূপ ধুনো জ্বলছে। তিন দিক দেখে বলল, মা দক্ষিণ দিক

দেখতে বারণ করেছেন, থাক্ যাবনা; আবার ভাবল, যাই না, একটু দেখে আসি। এই না বলে দক্ষিণ দিকে গেল, গিয়ে দেখে কি—মা মনসা পড়ে আছেন, ঢেঁকির মত পেট করেছেন, কুলোর মত বেঁত করেছেন, প্রকাণ্ড এক অজগর মূর্তিতে পড়ে আছেন, কেঁচো ঘুঘরে ব্যাঙ পোকা মাকড় মুখের মধ্যে যাচ্ছে, দেখেই এক চীৎকার করে ছোট বৌ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন মা মনসার টনক নড়ল; বল্লেন, তখনই ত বলেছিলাম. দেবে মানবে ঘর হয় না, আবার কি বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

তারপর দৌড়াদৌড়ি করে এলেন, এসে দেখেন, মানবের বেটী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, ক্ষার বিছানোর বাও দিলেন, অমৃতকুণ্ডের জল দিলেন—দিয়ে বাঁচিয়ে তুললেন, তুলে বললেন, কি, দেখলে কিছু কি, দেখলে কিছুই না। তখন বললেন, যাক, মানবের বেটীর পেটে কথা থাকবে। তুলে বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললেন, এক অঙ্গের গয়না দিয়ে খোঁটার ঘর হয়েছে, আর সব অঙ্গের অলঙ্কার দাও, বলে ভাণ্ডার থেকে সোনার কুমড়ো বের করে দিলেন। সব অঙ্গের অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তেল সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে বললেন, দেখ, মা, নাগেদের রাগ একজন্মে যায় না, এরা এবার তোমায় খাবে। তুমি তখন বলো, আমায় এখন খেয়ো না. আমার সন্তান ভূমিষ্ঠ হোলে খেও। তারপর ছেলে হলে বলবে খাব, তখন দাইএর মেয়েকে ব'লো, ভালোতে যে মন্দ করে, সে ভস্ম হয়ে মরে—এই তিনবার বলবে, তা'হলে ভস্ম হয়ে পড়বে। তখন সেই ভস্ম কচুর পাতায় তুলে নদীতে ভাসিয়ে দিও, আমি জীইয়ে নেব। এই সব বলে পাঠিয়ে দিলেন।

তখন তারা ছোট বৌকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে এসে চোখ বেঁধে পার হয়ে এল। এপারে এসে ছোট বৌ বলল, আমার একটা সাধ আছে, পূর্ণ করতে হবে। তারা বলল, আচ্ছা, কার কি সাধ, তাই বল। তখন ঘাটে লক্ষ টাকার শাড়ী পরে এক রাজকন্যা স্নান করছিল, সে বলল, ঐ শাড়ী নেব। তখন একজন গিয়ে রাজকন্যার পায়ে কামড় দিল, অমনি রাজকন্যা ঢলে পড়ল। তখনই চারদিক থেকে সব এসে পড়ল। রাজকন্যাকে নিয়ে গেল, ঢোল পিটিয়ে দিল, যত ওঝা বদ্যি আসার জন্য। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারল না। তখন এরা দু'ভাই ওঝার মূর্তি ধরে রাজার কাছে গিয়ে বলল, মহারাজ, আমরা আপনার কন্যাকে বাঁচিয়ে দেব, কিন্তু আমরা যা চাইব, তাই দিতে হবে। এই বলে তিন সত্যি করিয়ে নিল। তারপর কাপড়ের কাণ্ডার টাঙাল, সেই

কাণ্ডারের ভেতর নিয়ে গেল, এক ভাই সাপ হয়ে বিষটুকু চুষে ফেলল, অমনি রাজকন্যা উঠে বসলেন।

রাজা বললেন, কি চাও তোমরা? যা চাও, তাই দেব। ওরা বলল, আমরা কিছু চাই না, কেবল রাজকন্যার পরণের শাড়ীখানি চাই। তখন রাজকন্যা শাড়ীখানি দিলেন। ওরা দু'ভাই চলে গেল, গৃহস্থর বৌকে এনে দিল। তারপর জিনিসপত্র কিনে পাল্কী বেহারা নিয়ে গিয়ে বলল, তাঐরে মাঐরে, আমাদের বোনটিকে নিয়ে এলাম। সে বলল, বেশ ত এসেছ, নাও খাও, জিরাও, তারপর যেও। তারা বলল, আমরা নাবও না, খাবও না, এখনই যাব; এই বলে চলে গিয়ে পাল্কী বেহারা বিদায় দিয়ে দুই ভাই নাগমূর্তি ধরে বেড়ার গায়ে থাকল।

দুপুর বেলা গৃহস্থের বৌ শুয়েছে, অমনি এসে বলল, গৃহস্থের বৌ, এবার আমরা তোমায় খাব। বৌ বলল, তা খাবে বেশ ত', আমার এখন পেটে সন্তান আছে, সন্তান হোক, তখন খেও। এই রকমে দশ মাস দশ দিন গেল। তখন একটি সন্তান হলো। দাই আর গৃহস্থর বৌ শুয়ে আছে, এমন সময় দুই ভাই সাপ এসে বলল, গৃহস্থর বৌ, এখন খাই? গৃহস্থর বৌ তখন দাইকে বলল, ভালতে যে মন্দ করে, ভস্ম হয়ে সে মরে—এই কথা তিনবার বলতেই দুই সাপ ভস্ম হয়ে পড়ল, তখন বৌ আঁতুড় থেকে বেরিয়ে কচুর পাতা ছিঁড়ে তাতে তুলে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে এল। শাশুড়ী উঠে দেখে আঁতুড় ঘরের দরজা খোলা। দাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, দাই, দরজা খোলা কেন? বৌ কোথায়? দাই বলল, কি জানি, বাপু, তোমাদের বৌ কোথায়, কি বা বুড়-বুড়াল খুড়খুড়াল, আমি জানি না। ইতিমধ্যে ছোট বৌ এল। শাশুড়ী বললেন, কোথায় গিয়েছিলে? বৌ বলে না; অনেক ধমকাতে তখন বলল, সে অনেক কথা—ভয়ে কইব, না নির্ভয়ে কইব? তখন তিনি বললেন, নির্ভয়ে বল। তখন স্বামী শ্বশুর সব বেরিয়ে এলেন। তখন বলতে লাগল, আমি উপুল মাছ বলে দুই সাপ তুলে এনেছিলাম, এক মাস দুধ কলা দিয়ে পুষেছিলাম, তারপর শ্বশুর রাগারাগি করলেন, তাই তাদের এনে বনে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তারা খুসী হয়ে নাইওর করাবে বলে বর দিল। আমার বাপও নেই ভাইও নেই, আমি ওদের অনিষ্ট করেছিলাম, তাই ওদের রাগ ছিল আমার ওপর এবং খাওয়ার চেষ্টা করেছিল; মা মনসা তাই আমায় শিখিয়ে দিলেন

এবং এক অঙ্গে অলঙ্কার দিয়ে খোঁটার ঘর করলেন। নাগেদের রাগ এক জন্মে যায় না। তারপর দু'বার নিয়ে গেলেন। এখন নাগেরা খেতে এসেছিল। তাই বললাম, ভালতে যে মন্দ করে, ভস্ম হয়ে সে মরে। তিনবার বলার পর ভস্ম হয়ে পড়ল। ওদের কচুর পাতায় করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

এই সব শুনে সকলে বলল, ও মা, ছোট বৌ আমাদের লক্ষ্মী, বলে সকলেই তাকে আদর করতে লাগল।

—পাবনা, বিমলাদেবী সংগৃহীত

মন্তব্য

খড়ের চাল হইতে খড় টানিয়া লইয়া উনুন জ্বালানো অমঙ্গলসূচক ; এখানে তাহার অশুভ ফল স্বরূপ নাগের মুখ পুড়িয়া গিয়া নাগের সঙ্গে ছোট বৌয়ের শক্রতার সৃষ্টি হইল। অমৃত কুণ্ডের জল দিয়া বাঁচাইয়া দেওয়া সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন জল সিঞ্চন করিয়া পুনর্জীবন দান অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। ছোট বৌকে দক্ষিণ দিকে তাকাইতে নিষেধ করা taboo বা বাধানিষেধ অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাক্য দ্বারা ভস্মীভূত করা ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পন্ন বাক্য বা মন্ত্র অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। Taboo বা বাধা-নিষেধ ভঙ্গ করিয়া দণ্ড লাভ করিবার কথাও সকল দেশের লোক-কথারই স্বাভাবিক অভিপ্রায় মাত্র। 'দেবে মানবে ঘর হয় না'—বাংলা দেশের ইহা একটি সাধারণ লোক-বিশ্বাস।

নাগশিশু

এক সওদাগরের তিন ছেলে ছিল। তিন ছেলের তিন বৌ। একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তিন বৌ দাওয়ায় বসে নিজেদের সাধ বাট্‌ছিল। বড় বৌ বললে শ্রাবণ মাস হয়, এমন দিন হয়, গরম গরম লুচি হয়, বেগুন ভাজা হয়, মা বাপের বাড়ি হয়, খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাকি।

মেজোবৌ বললে, এমন দিন হয়, শ্রাবণ মাস হয়, গরম গরম খিচুড়ি হয়, পাঁপড় ভাজা হয়, মা বাপের বাড়ি হয়, খেয়ে শুয়ে থাকি। ছোট বৌয়ের মা বাবা কেউ ছিল না। সে চুপ করেই রইল। বড়বৌ বলল, ও ছোট, তুই তো কিছু বল্‌লি না। ছোট বললে, আমি আবার কি বলবো, আমার তো কেউ নেই। বড়বৌ বললে, না থাকলেই বা, আমরা তো ওমনি একটা সাধ বাট্‌ছি, তোর কি সাধ, তুই বল। তখন ছোট বৌ বললে, এমন দিন হয়, শ্রাবণ মাস হয়, উফল মাছ পোড়া হয়, পান্‌তা ভাত হয়, খেয়ে দেয়ে কাজকর্ম করি। তারপর তিন বৌ মিলে নদীতে নাইতে গেল। রাস্তায় পা-ডোবা জল হয়েছে। সেই পা-ডোবা জলের মধ্যে বড় বৌ দেখতে পেলে দুটো উফল্ মাছের বাচ্চা।

তখন সে ছোট বৌকে বললে, ছোট বৌ, তোর সাধই পূর্ণ হল, ওই দেখ উফল মাছের বাচ্চা, ধরে নিয়ে চল, হাঁড়িতে পান্‌তা ভাত আছে, খাবি। ছোট বৌ সেই মাছ ধরে নিয়ে এসে হাঁড়ি-চাপা দিয়ে রেখে দিলে। সমস্ত কর্ম সেরে সকলকে খাইয়ে ধুইয়ে তিন বৌ মিলে খেতে বসেছে। বড়বৌ বললে, ও ছোট, তোর উফল মাছ আছে না, পুড়িয়ে খাবি না? ছোট বৌ বল্‌লে, আমি ভুলেই গিয়েছি। তারপর সে গিয়ে হাঁড়ি তুলে দেখে যে সে দুটো সাপের ড্যাকা। তখন সে সেই দুটো সাপকে দুধ কলা দিয়ে পুষতে লাগলো। সাপের তর্জন গর্জন শুনে শ্বশুর-শাশুড়ী সকলে বলতে লাগল, কি বাবা বেদে তালাচোরে মেয়ে ঘরে নিয়ে এনেছি যে, ঘরদোড় সব সাপের হালা সাপের জালায় ভর্তি হয়ে গেল। এইসব খোটানির কথা শুনতে শুনতে ছোট বৌ একদিন দুটো সাপকে নদীর পাড়ে নিয়ে গিয়ে প্রণাম করে ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে, তোমরা যেই হও, এতদিন আমি তোমাদের পুষ্‌লাম, তোমরা আমাকে এই আশীর্বাদ কর যে, এ জন্মে আমার মা বাপ ভাই দাদা কেউ নেই, আসচে জন্মে আমার সব হয় যেন।

দুই ভাই নদী পার হতে হতে ছোট ভাই বড় ভাইকে বল্‌লে, দাদা, ছোট বৌয়ের খুব কষ্ট. তাকে কি করে সাহায্য করা যায়! বড় ভাই বললে, আমি কিছু জানি না, মাকে গিয়ে বলি চল, মা যা বলবে, আমরা তাই করবো। এই বলে দুই ভাই নদী পার হয়ে মনসাপুরীতে গিয়ে মা মনসাকে ছোট বৌয়ের কথা সব বললে, আর তাকে মনসাপুরে নিয়ে আসার কথা বলতে মা মনসা বল্‌লে, দেখ, দেবে মানুষে কখনও ঘর হয় না। তোমরা, বাবা, খল জাত, মানুষের কোন ত্রুটি পেলেই তাকে কামড়ে শেষ করে দেবে, আর মর্ত্তে আমার নিন্দে হবে।

তখন দুই ভাই বল্‌লে, না, মা, আমরা কিছু করবো না, তখন মা মনসা বল্‌লে, ভাল করে ভেবে দেখে তোমরা ওকে নিয়ে আস্‌বে। তখন দুই ভাই দুই সদাগর পুত্র সেজে অনেক জিনিস নিয়ে ছোট বৌয়ের বাড়িতে এসে বললে, তাওই মাওই গো, আমরা তোমার ছোট বৌয়ের ভাই। আমাদের বোনটি যখন ছোট ছিল, তখন আমরা অনেক দূরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলাম, তারপর বাণিজ্য করে দেশে ফিরে শুনলুম যে এখানে আমাদের বোনটির বিয়ে হয়েছে. তা আমরা আমাদের বোনটিকে কিছু দিনের জন্য আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব। 4

ছোট বৌ সেই কথা শুনে বল্‌লে, আমার তো, বাবা, কোন ভাই ছিল না। তখন সকলে বললে, তুই হয়তো জানিস না. আপন লোক না হলে এত জিনিস দিতে পারে? তখন ছোট বৌ ভয়ে ভয়ে তাদের সঙ্গে গেল। নদীর পাড়ে গিয়ে তারা বল্‌লে, আমরা তোমার কেউ নই, তুমিও আমাদের কেউ নও। তুমি যে দুটো সাপকে বাঁচিয়েছিলে, সেই সাপই আমরা, তোমাকে আমরা মনসাপুরীতে নিয়ে যাচ্ছি।

ছোট বৌ শুনে খুব ভয় পেলে। ছোট বৌয়ের ভয় দেখে ওরা বল্‌লে, তোমার কোন ভয় নেই, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি মা মনসাকে মা বলে গড় হয়ে প্রণাম করবে, তা হলে মা তোমাকে ঝি বলে তুলে নেবে। তারপর তারা ছোট বৌকে বল্‌লে, তুমি সুপরির মত ছোট হও, আর শোনের মত পাত্‌লা হও; তারপর আমাদের ঘাড়ে হাত দাও। এই বলে তারা ছোট বৌয়ের চোখ সাত ভাঁজ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিলে। তারপর দুই ভাই সাপ হয়ে সন্‌ সন্‌ করে নদী পার হয়ে তাকে ওপারে নিয়ে গিয়ে নিজেরা আবার মানুষ হয়ে ছোট বৌয়ের চোখ খুলে দিয়ে তাকে নিয়ে মনসাপুরীতে এ'ল। আসতেই

মা মনসা বেরুচ্ছিলেন, তাকে দেখেই ছোট বৌ গড় হয়ে মা বলে প্রণাম করতে মা ঝি ব'লে তুলে নিলেন। তারপর মা মনসা ছোট বৌকে খুব সাবধানে থাকতে বললেন, আর বললেন, ভারে ভারে দুধ আসবে, কলা আসবে, তুমি ভালো করে দুধ জ্বাল দিয়ে প্রত্যেক গর্তে দুধ আর কলা ঢেলে দেবে। মা মনসা আরো বললেন, তুমি এ পুরীর তিন কোণ দেখবে, কিন্তু এক কোণ কখন দেখবে না। এই সমস্ত উপদেশ দিয়ে মা মনসা বেরিয়ে গেলেন।

তখন ছোট বৌ খুব ভালো করে দুধ জ্বাল দিয়ে প্রত্যেক গর্তে দুধ ও কলা ঢেলে দিলে। সব সাপ খেয়ে তো মহাখুসী। মা মনসা আসতেই সকলে বললে, মা, আজকে ছোট বৌ আমাদের খুব ভাল করে খেতে দিয়েছে, আজকে আমরা খুব ভাল করে খেয়েছি।

একদিন ছোট বৌ সকালে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এদিকে ভারে ভারে দুধ কলা এসে গিয়েছে। কাকে সব ছেঁড়া ছিঁড়ি করছে। সাপেরা খিদের জ্বালায় গর্জন করছে, আর এ ওকে বলছে, চল, আমরা ওকে খেয়ে ফেলিগে। এমন সময় ছোট বৌয়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে ওই সমস্ত দেখে তাড়াতাড়ি করে দুধ জ্বাল দিয়ে সেই গরম দুধ কলা গর্তে ঢেলে দিতেই কোন সাপের লেজ পুড়লো, কোন সাপের মুখ পুড়লো। এ'রকম সকলেরই কোন-না-কোন ক্ষতি হল।

তখন সমস্ত সাপেরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে খেয়েই ফেলবে ঠিক করল; কিন্তু আড়াইরাজ মণিরাজ বললে, আমরা ওকে নিয়ে এসেছি, এখন আমরা যদি খেয়ে ফেলি, তবে মায়ের দুর্নাম হবে, তার চাইতে মা আসুক, সব বলবো। মা যা বলবেন, আমরা তাই করবো। মা মনসা আসতেই সব সাপ মিলে তাকে ছোট বৌয়ের কথা বললে, আর বললে, মা, আমরা ওকে খেয়ে ফেলি। তখন মা মনসা বললেন, না, তোমরা ওকে খেয়ে ফেললে আমার দুর্নাম হবে। তার চাইতে তোমরা ওকে শাস্তিস্বরূপ এক পায়ে আলতা, এক অঙ্গে গহনা, এক অঙ্গে কাপড় দিয়ে ওর শ্বশুরবাড়ি দিয়ে এসো।

তখন সাপেরা তাই করলে। ছোট বৌ যাওয়ার আগের দিন ভাবলে যে কাল তো আমি চলেই যাব, আজ যে কোণটা মা মনসা দেখতে বারণ করে-ছিলেন, সেই কোণটা দেখবো। তাই ভেবে ছোট বৌ ওই কোণটা খুলে দেখলে যে, মা মনসা ভীষণ মুর্তি ধরে ব্যাঙ, গুগলি, শামুখ ধরে ধরে খাচ্ছে। তখন সে তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে দিলে।

তার পরদিন যাওয়ার সময় মা মনসা তাকে বলে দিলেন, আড়াইরাজ মণিরাজ তার পিছু ছাড়বে না ; সেইজন্য তাকে শ্বশুরবাড়িতে যতই খোঁটা দিক না কেন, সে যেন সব কথাতেই আড়াইরাজ মণিরাজের ষাট মানে।

ছোট বৌ শ্বশুরবাড়ি এসে তাই করলে। কারণ, আড়াইরাজ মণিরাজ তাদের ছাতের উপরেই ছিল। আড়াইরাজ মণিরাজ ওর ষাট মানা শুনে ছোট ভাই আড়াইরাজ বড় ভাই মণিরাজকে বললে, দাদা, ছোট বৌ এত খোটানি সহ্য করেও আমাদের ষাট মানছে। তা'হলে চলো, আবার আমরা তাকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত গায়ে গয়না ভর্তি করে দিয়ে যাই। দ্বিতীয় বারে যখন ছোট বৌ মনসাপুরী হতে শ্বশুরবাড়ী আস্‌ছিল, তখন মা মনসা বল্‌লেন, যদি কেউ বলে, ভালোকে মন্দ বললে কি হয় ? তুমি তার উত্তরে বলবে, আড়ইরাজ মণিরাজ ধ্বংস হয়। তারপর ছোট বৌয়ের একটা ছেলে হল। আঁতুর ঘরে শুয়ে ছোট বৌ একটা পাখা চাইল। বড় বৌ বললে, তুই তোর ভাইদের স্মরণ কর, তোকে তারা সোনার পাখা দেবে। সেই শুনে আড়াইরাজ মণিরাজ অনেক চেষ্টা করে একটা সোনার পাখা নিয়ে এসে ছোট বৌয়ের খাটে ফেলে দিলে। তা দেখে বড় বৌ বললে, দেখলি, ছোট, আমি না বললুম তোর ভাইদের স্মরণ করলেই তুই সোনার পাখা পাবি। ভালকে মন্দ বল্‌লে কি হয় ? তখন ছোট বৌ মনে মনে বল্‌লে, আড়াইরাজ মণিরাজ ধ্বংস হয়। যেই না এই কথা বলা, তখনি ছাত হতে ঝুর্ ঝুর্ করে ছাই পড়লো। ছাই দেখে ছোট বৌ বুঝতে পারলো যে আড়াইরাজ মণিরাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে ।তখন সে সকলকে সমস্ত কথা খুলে বল্‌লে। —নদীয়া

মন্তব্য

কাহিনীটি প্রধানতঃ কৃতজ্ঞ পশু (grateful animal) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। কিন্তু নাগগণ প্রথমে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সত্ত্বে পরে তাহারা ছোট বউয়ের জীবন নাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাতে কৃতজ্ঞ পশুর (এখানে সর্পের) হিংস্র প্রবৃত্তিটিকে রক্ষা করা হইয়াছে। এক পায়ে আল্‌তা আর এক পায়ে আল্‌তা নাই, এই পরিকল্পনাটি এই কাহিনীতে নূতন।

৭

পান্তা ভাতের সাধ

এক দেশে এক বেণে সদাগর ছিল, তার সাত বউ। সব বৌয়ের বাড়ী থেকে তত্ত্ব আসে, খালি ছোট বৌয়ের বাপের বাড়ী থেকে কিছু আসে না, সেই জন্যে গিন্নী তাকে একেবারে দেখতে পারে না। ছোট বউ মনের দুঃখে কারো সঙ্গে কথা কয় না।

একদিন খুব বৃষ্টি হ'চ্ছে, আর বাড়ীর সব বৌয়েরা এক জায়গায় ব'সে গল্প-সল্প কচ্ছে। কেউ ব'লছে—এই বাদলায় খিচুড়ী খেতে বেশ। কেউ ব'লছে—চাল-কড়াই ভাজা খেতে বেশ। কিন্তু ছোট বউ একটিও কথা ব'লছে না দেখে সব জায়েরা ব'ল্লে, "ছোট বউ! তোর কি খেতে ইচ্ছে করে?" ছোট বউ পোয়াতি ছিল, সে অনেক ভেবে চিন্তে ব'ল্লে, "আমার মাছের অম্বল দিয়ে পান্তাভাত খেতে ইচ্ছে করে।"

ক্রমে সন্ধ্যে হ'য়ে এল। সব বৌয়েরা তাদের বনের ধারে পুকুরে গা ধুতে গেল। সেই বনেতে অষ্টনাগ বাস ক'রতো, হঠাৎ একদিন বনেতে আগুন লেগে যাওয়াতে তারা সেই পুকুরে মাছ হ'য়ে লুকিয়ে রইল।

ছোট বউ গা ধুতে ধুতে দেখতে পেলে একঝাক মাছ ভাসছে; তাই দেখে ছোট বউ গামছা ছাঁকা দিয়ে মাছগুলো ধ'রলে। ধ'রতেই জায়েরা ব'ল্লে, "ছোট বৌয়ের সাধই মিট্‌লো।"

ছোট বউ মাছগুলো বাড়ীতে জীইয়ে রাখল। তার পরদিন সকাল বেলা কুট্‌তে গিয়ে দেখলে যে, মাছগুলো সব সাপ হ'য়ে রয়েছে। ছোট বউ দেখে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। তারপর সে সাপগুলোকে দুধ আর কলা দিয়ে পুষতে লাগ্‌লো। ক্রমে সাপগুলো বেশ বড় হ'য়ে উঠলো।

একদিন তারা মনে ক'রলে, ছোট বৌয়ের কিছু উপকার ক'রতে হবে। এই ভেবে তারা স্বর্গে মা মনসার কাছে চ'লে গেল। এদিকে মা মনসা ছেলেদের দেখতে না পেয়ে কান্নাকাটি ক'রছিলেন। ছেলেরা গিয়ে মা মনসাকে সব কথা বললে। শেষকালে তারা মাকে বললে, 'মা, ছোট বউকে এখানে নিয়ে এস, তাকে সবাই বড় কষ্ট দেয়।'

মা মনসা বললেন, 'না বাবা, তোমরা যা রাগী, মর্ত্ত্যের লোক কিছু দোষ করলেই তোমরা কামড়াবে।' ছেলেরা বললে, 'না মা, কামড়াব না, তুমি মাসী সেজে ছোট বউকে নিয়ে এসো।'

তখন মা মনসা শাখা, সিন্দুর-চুপড়ী, নোয়া, নথ নিয়ে মাসী সেজে সদাগরের বাড়ীতে এলেন। শাশুড়ী তখন ছেলেদের কাছে বসে বউদের নিন্দে কচ্ছিল। গিন্নী জিজ্ঞাসা ক'ল্লে, 'তুমি কে গা?' মনসা বললেন, 'আমি ছোট বৌয়ের মাসী গো, ছোট বউকে নিতে এসেছি।' গিন্নী বললে, কই গো, এতকাল ছোট বৌয়ের কোন মাসী-টাসী তো ছিল না। তা যাক্ বাছা, এসেছো নিয়ে যাও।'

তখন মা মনসা ছোট বউকে নিয়ে বেরিয়ে এসে রথে চড়লেন, চড়ে বললেন 'দেখ মা, তুমি চোখ বুজে থেকো, যখন খুল্‌তে বলবো, তখন খুলো।' ছোট বউ তাই করে রইল। তারপর মনসা বল্‌লেন, 'চোখ খোলো।' ছোট বউ চেয়ে দেখলে—মস্ত বড় বাড়ী, আর সেইখানে সেই অষ্টনাগ রয়েছে—দেখে সে ভারি আশ্চর্য হয়ে গেল।

মা মনসা বললেন, 'দেখ মা, তুমি রোজ আমার পুজোর আয়োজন করবে, আর তোমার এই আট ভায়ের দুধ গরম করে রাখবে, আর কখনও দক্ষিণ দিকে চাইবে না।'

এই রকম করে কিছুদিন যায়। একদিন ছোট বউ ভাবলে, দেখি না দক্ষিণ দিকে কি আছে! এই ভেবে দক্ষিণ দিকে চেয়ে দেখলে যে, মা মনসা নাচছে। ছোট বউ তাই অবাক্ হ'য়ে দেখতে লাগলো। দেখতে গিয়ে ভাইদের দুধের কথা ভুলে গেল। যখন নাচ ভাঙলো, তখন তাড়াতাড়ি ছোট বউ ভাইদের দুধ গরম করে দিলে। সাপেরা এসে দুধ খেতেই তাদের মুখ পুড়ে গেল। সাপেরা ভয়ানক রেগে গিয়ে তাকে কামড়াবে বলে বাড়ীর চারিদিকে ওৎ পেতে বসে রইল।

মা মনসা জানতে পেরে বললেন, 'দেখলি তো বাবা, ওই জন্মেই ওকে আন্‌তে চাইনি।' ছেলেরা বল্‌লে, 'না মা, ওকে কামড়াব, ও কেন আমাদের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে?' মা মনসা বল্‌লেন, 'তবে আমি ওকে ওর শ্বশুর-বাড়ী রেখে আসি, সেখানে গিয়ে কামড়াও।' এই বলে ছোট বৌয়ের এক গায়ে গয়না দিয়ে তার শ্বশুর-বাড়ী নিয়ে গেলেন।

সেখানে গিয়ে ছোট বউকে বললেন, 'দেখ, তোমার ভায়েরা তোমার উপর রেগে গেছে, তোমাকে কামড়াবে; তা তুমি শ্বশুর-শাশুড়ী সকলকার কাছে তোমার ভাইদের খুব সুখ্যাতি করো; তাহলে কিছু আর করবে না।' এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ছোট বউ বাড়ী আসতে ছোট বৌয়ের এক গায়ে গয়না দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে সকলে বল্‌লে, 'এ আবার কি ঢং? এক গায়ে সোনা, আর এক গায়ে কিছু নেই?'

ছোট বউ বললে, 'বেঁচে থাক আমার আড়োন, পাড়োন, ঢোঁড়া, বোড়া, পুঁয়ে, আরুল, পারুল, কেউটে সব ভাইয়েরা। আমার আবার গয়নার ভাবনা! এবার এক গায়ে পরে এসেছি, আস্‌ছে বারে দু গায়ে পরে আসবো।' এদিকে সেই অষ্টনাগ বাড়ীর আনাচে-কানাচে ঘুরছিল। ছোট বউকে তাদের সুখ্যাতি করতে শুনে স্বর্গে মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বল্‌লে, 'না মা, বোনকে আর কামড়ান হলো না; সে আমাদের ভারী সুখ্যাতি করছে। মা, তাকে তুমি আবার নিয়ে এসো, এনে আর এক গায়ে গয়না পরিয়ে দাও; নইলে আমাদের মান থাকে না।'

মা মনসা তখন গয়না-গাঁটী নিয়ে মর্ত্যে এসে ছোট বউকে গয়না কাপড় পরিয়ে দিলেন। তারপর ছোট বউকে বললেন, 'আমি তোর মাসী নই, আমি মনসা; আমি ফণী মনসা গাছেতে থাকি। দশহরা, নাগপঞ্চমীর দিনে ঐ গাছ এনে পুজো করবি, আর ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন শুদ্ধাচারে পুজো করে আমাকে পান্তা ভাতের সাধ দিবি। তাহলে আর কখনও সাপের ভয় থাকবে না।' এই বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন।

ছোট বউ তখন সকলকে সমস্ত কথা বললে। সবাই শুনে ছোট বৌয়ের খুব সুখ্যাতি করতে লাগলো। তারপর সবাই তাকে ভালবাসতে লাগলো।

—২৪ পরগণা, আশুতোষ মজুমদার সংগৃহীত।

মন্তব্য

ফণীমনসা গাছের পাতার আকৃতি অনেকটা সাপ বা ফণীর মত বলিয়া পশ্চিমবঙ্গে ইহার মধ্যেই মনসা পূজা হইয়া থাকে। পান্তা ভাতের সাধ বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্য মূলক। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কেন যে পান্তা ভাত খাইতে সাধ করেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাংলার অন্যত্র তাঁহার এই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই কাহিনীতে যে অষ্টনাগের কথা আছে, তাহা মহাভারতের প্রভাব-মূলক। ভাদ্র সংক্রান্তির দিন অরন্ধন পশ্চিম বাংলার একটি আচার। সে' দিন মেয়েরা পান্তা ভাত খায়।

মনুষ্য-কন্যা

এক গৃহস্থ, তার সাত পুত্রবধূ। একদিন পুত্রবধূরা সকলে জল আনিতে ঘাটে গিয়াছে। ফিরিবার পথে ছোট বৌ অন্য জা'দের বলিল, "দিদি গো, তোমাদের কি খাইতে ইচ্ছা হয়?" তখন সকলে যার তার মনোমত দ্রব্যের নাম করিল। ছোট বৌ বলিল, 'আমার কিন্তু পোনা মাছ খাইতে ইচ্ছা হয়।' ছোট বৌ সকলের অগোচরে দুইটি পোনামাছ আনিল ও ঘরের চালের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। দুই দিন পরে সে দেখে, পোনা দুইটি সাপ হইয়া রহিয়াছে।

সর্পশিশু দুইটি দেখিয়া বৌয়ের বড়ই স্নেহ হইল। কাজেই সে জল-ভরা ছোট মাটির পাত্রে তাহাদের রাখিল। প্রতিদিন তাহারা বড় হইতে লাগিল। সে তাহাদের বড় মাটির পাত্রে রাখিল ও দুধ-কলা খাইতে দিল। এইরূপে সুখে প্রতিপালিত হইয়া যখন তাহারা বেশ বড় হইল, তখন ফোঁস্-ফোঁস্ শব্দ আরম্ভ করিল। তাহাদের ভয়ে শাশুড়ী ও বড় জায়েরা বলিল, নাগিনী কন্যা, নাগ পাল, শীঘ্র সাপ দুইটা ছাড়িয়া দেও, নতুবা মারিয়া ফেলিব।" ছোট বৌ তাহাদের ছাড়িয়া দিল ও বলিল, "জাদের জ্বালাতনে তোমাদের রাখিতে পারিলাম না, মায়ের ধন মায়ের কোলে যাও।"

তাহারা মা-পদ্মার কাছে গেল। মা পদ্মা তাহাদের দেখিয়া বলিলেন, 'এতদিন তোমরা কোথায় ছিলে?' 'তাহারা বলিল, আমরা এক বনে ছিলাম। এক কাঠুরিয়া বনে আগুন দেওয়ায় নিকটেই এক পুকুরে নামিয়া বাঁচি। পরে এক 'মনুষ্য-কন্যা' আমাদের এতদিন প্রতিপালিত করিয়া বড় করিয়াছে।" এই ভাবে দিন যায়। একদিন সাপ দুইটি পদ্মাকে বলিল, 'মা গো, মনুষ্য-কন্যাকে আমরা নাইওর আনিব।'

মা পদ্মা তাহাতে মত দিয়া তাহাদের মর্ত্যলোকে পাঠাইলেন। সাপ দুইটির নাম ছিল দাঁড়াই বুড়াই। তাহারা মর্ত্যলোকে গিয়া ছোট বৌয়ের শাশুড়ীকে অনেক অনুরোধ করিয়া সম্মত করিল। ছোট বৌ নানা পোষাকে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াই-বুড়াইর সঙ্গে স্বর্গলোকে আসিল। স্বর্গলোকের নানা দ্রব্য দেখিয়া ছোট বৌ অবাক্ হইয়া গেল। মা-পদ্মাও বৌকে খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে সে মর্ত্যের কথা ভুলিয়া রহিল। আর একদিন মর্ত্যে বিষহরী পূজা উপস্থিত।

পদ্মা বলিলেন, 'মা, আমি পূজা খাইতে মর্ত্যে চলিলাম, তুমি সাবধানে থাকিও, দাঁড়াই-বুড়াইকে ক্ষুধা পাইলে খাওন দিও। যে তিনদিকে যাইতে বলিয়াছি, সেই তিন দিক ব্যতীত অন্য কোন দিকে যাইও না।' এই কথা বলিয়া পদ্মা মর্ত্যলোকে পূজা খাইতে গেলেন। একদিন মনুষ্য-কন্যা মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমি মর্ত ছাড়িয়া স্বর্গে আসিলাম, আমার ভয় কি? তিন-দিক্ দেখিয়াছি, আর একদিক্ বাকি রাখি কেন?' এইরূপ ভাবিয়া সে নিষিদ্ধ দিকেও গেল।

ঘরে গিয়া সে দেখিল, সুন্দর দেবপুরী। নানা দেবদেবী নিজ নিজ মূর্তি ধরিয়া নাচিতেছে ও আনন্দ করিতেছে। এইসব দেখিয়া মনুষ্য-কন্যা আনন্দে বিস্ময়ে বিভোর হইয়া রহিল। এইদিকে নাগেরা ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর মনুষ্য-কন্যার চৈতন্য হইল। তখন সে পদ্মার পুরীতে ফিরিয়া গিয়া গরম দুধ খাইতে দিল। তাহারা গরম দুধের প্রভাবে ঢলিয়া পড়িল।

এইদিকে মর্ত্যলোকে মা পদ্মার আসন টলিল, জটা কাঁপিল, চোখ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, 'না জানি মনুষ্য-কন্যা কি প্রমাদ ঘটাইয়াছে।' এই ভাবিয়া শীঘ্র পূজা খাইয়া তিনি স্বর্গে আসিলেন এবং মনুষ্য-কন্যার কাণ্ড দেখিয়া তাহাকে ভৎ'সনা করিলেন। পদ্মা নানা ঔষধপত্রে নাগদের ভাল করিলেন। তাহারা ভাল হইয়া ক্রোধে মনুষ্য-কন্যাকে খাইতে চায়। মা পদ্মা তাহাদের প্রবোধ দিয়া ক্রোধ প্রশমিত করিবেন।

কিছুদিন পর পদ্মা মনুষ্য-কন্যার অর্ধ শরীর অলঙ্কারে পুর্ণ করিয়া দাঁড়াই-বুড়াইর সঙ্গে মর্ত্যে পাঠাইয়া দিলেন। গোপনে দাঁড়াই-ভাইদের বলিয়া দিলেন, 'তোমরা শুনিও তো এই মনুষ্য-কন্যা আবার কোন নিন্দা করে কি না? যদি নিন্দা করে, তবে তোমরা তাকে দংশিয়ো।' বহুদিন পর ছোট বৌ স্বামিগৃহে আসিল। ভ্রমক্রমে বড়জা'দের শরীরে তাহার পাদস্পর্শ হওয়াতে ছোট বৌ তাহাদের প্রণাম জানাইল না। তখন অন্য জায়েরা বলিল, 'অর্ধ শরীরে অলঙ্কার পরিয়াই তোমার যে অহঙ্কার, সমস্ত শরীরে অলঙ্কার থাকিলে না জানি তোমার কত গর্ব হয়।'

ছোট বৌ তাহাদের বলিল; "আমার পদ্মকুমারী মা জিউক, তাহা হইলে আমার গর্বের সীমা কি।" নাগেরা এই কথা শুনিয়া খুব খুসী হইল এবং পদ্মার কাছে মনুষ্য-কন্যার প্রশংসা করিল। কাজেই বহুদিন পর পদ্মা মনুষ্য-কন্যাকে

পুনরায় স্বর্গলোকে নাইওর আনিলেন। কিছুদিন পর স্বর্গলোকে তাহাকে রাখিয়া, যাওয়ার সময় তাহাকে সুন্দর পোষাক ও সর্বাঙ্গে অলঙ্কার দিয়া মর্ত্যে পাঠাইলেন। এইবার মনুষ্য-কন্যার জয়-জয়কার মর্ত্যলোকে প্রচারিত হইল।

—পূর্বমৈমনসিংহ, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী সংগৃহীত।

মন্তব্য

পূর্ব মৈমনসিংহে পোনা মাছ অর্থে মাছের ছোট ছোট ছানা বুঝায়; এখানেও পোনা মাছ অর্থ মাছের ছানা। ছানাগুলি এক সঙ্গে মায়ের রক্ষণাধীনে ঘুরিয়া বেড়ায়, বড় হইলে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করে। একটি বিশেষ প্রকৃতির জাল দিয়া ছাঁকিয়া ছানাগুলিকে ধরা হয়। গামছা ছাঁকিয়া ধরা যায়। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রুচি অনুযায়ী ছোট বৌয়ের সাধ বিচিত্র প্রকারের হইয়াছে। রূপ পরিবর্তন (Transformation) অভিপ্রায়টি ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

৯

ননদের দাসী

এক গৃহস্থ। গৃহস্থের সাত ছেলের সাত বউ, সকলেই সুকীর্তি ব্রত করে। ব্রত করিয়া যখন তাহারা শাশুড়ীকে প্রণাম করে, তখন শাশুড়ী এক এক জনকে এক এক বর দেন। কেউরে দেন পুতের বর, কেউরে দেন ধনের বর, কেউরে দেন আয়ুর বর। এর মধ্যে ছোট পুতের বউকে যখন বর দেন, তখন তাঁর মুখ দিয়া ভাল কথা না আসিয়া কেবল খারাপ কথা আসিয়া পড়ে :—"খাগ ভেঙে শাস্ খেয়ো, নল ভেঙে জল খেয়ো, মাছ রেখে কাঁটা খেয়ো, আর ননদের ঘরে দাসী হয়ে থেকো।"

অন্য বধূরা জিজ্ঞাসা করে—"কিগো ঠাকরুন, ছোট বউকে এসব বলেন কেন ?"

শাশুড়ী উত্তর দেন,—"কি জানি গো বউ সকল, আমি যখন ওকে বর দিতে যাই, তখন আমার মুখ দিয়ে কেন জানি ওসব কথা বের হয়ে আসে।"

অনেকদিন পর। সাত ভাই বাণিজ্যে গেছে। একদিন সাত বউ ঘাটে গিয়া কি করিল, না, ছোট বউকে ধাক্কা মারিয়া জলে ফেলিয়া দিল। বাড়ী আসিয়া বলিল, "তাকে কুমীরে নিয়ে গেছে।"

ওদিকে ছোট বউ ভাসিতে ভাসিতে একটা সাপলা গাছ আশ্রয় করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল,—নল ভাঙ্গিয়া জল খায়, খাগ ভাঙ্গিয়া শাস খায়, এইরূপে তার দিন যায়।

একদিন হইল কি, না, ননদের জামাই সাপলা তুলিতে আসিয়া দেখে—এক অপরূপ কন্যা! দেখিয়াই তাহাকে দাসী করিয়া বাড়ী লইয়া গেল। কন্যা দেখিয়া ননদের মনে কিন্তু আর এক সন্দেহ জাগিল। সে নিয়ে তাড়াতাড়ি কন্যাকে রূপ নাই ঘাটে ডুব দেওয়াইল,—রূপ গেল; চুল নাই ঘাটে ডুব দেওয়াই,—চুল গেল;—দেখিতে সে একটা কুৎসিত কদাকার হইল।

ছোট বউ এখন ননদের ঘরের দাসী। সাত বৎসর পর তাহার স্বামী বাণিজ্য করিয়া আসিয়াছে। পথে আসিয়া ছয় ভাইকে বলিল, তোমরা বাড়ী যাও, আমি বোনকে দেখে আসি।"

সাত বৎসর পর ভাই আসিয়াছে বোনের বাড়ী; ভাইয়ের যত্নের সীমা নাই। দাসী আসিয়া তাহাকে বাতাস করিল, পা ধুইবার জল দিল, তেল দিল,

গামছা দিল। সে কিন্তু তার স্বামীকে চিনিতে পারিয়াছে, স্বামী তাকে চিনিল না।

তখন হইল কি, তেল মাখাইবার সময় দাসী আঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিল। স্বামী তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কি, তুমি কাঁদছ কেন?'

দাসী আর কিছু বলে না, শেষে বলিল, "আমি একবার সুকীর্তি ব্রত করেছিলাম, সেই ব্রতের নারকল তুমি ভাঙতে নিয়েছিলে, তখন তার একখণ্ড চার প'ড়ে তোমার পা কেটে গেছিল! দেখছি, সেই দাগটা আজও আছে।"

এই কথা শুনিয়া স্বামী তার আশ্চর্য হইয়া গেল!—"কি বললে? তুমি সুকীর্তি ব্রত করেছিলে, আর আমি তার নারকল ভেঙ্গেছিলাম। আচ্ছা দেখি, কদ্দুর কি দাঁড়ায়।"

ভাই আর স্নান আহার করিল না। ঘরে কপাট লাগাইয়া শুইয়া রহিল। বোনে ডাকে, বোন জামাইয়ে ডাকে, সে আর শব্দ করে না, উঠে না।

বোন তখন দাসীকে ভীষণ বকাবকি আরম্ভ করিল,—"অলক্ষ্মী, পোড়াকপালী, নিশ্চয়ই তুই আমার ভাইকে কিছু বলেছিস, তাই সে রাগ করে, না খেয়ে-দেয়ে শুয়ে আছে।

ভাইয়ে ভাবিল—"না, আর চুপ করে থাকা ঠিক নয়; শুধু শুধু দাসীর উপর দোষ পড়ছে।

ভাই তখন কপাট খুলিয়া জিজ্ঞাস করিল, "বল, তোমরা এই দাসী কোথেকে পেলে?"

বোনে বলে, "এসব আমি জানি না, তোমার বোন-জামাইর কাছে জিজ্ঞেস কর।"

বোন-জামাই তখন আগাগুড়ি সব কথা বলিল, দাসীকে ডাকিয়া সবকথা শুনিল, শুনিয়া তাদের লাজের সীমা রহিল না। বোন তখন তাড়াতাড়ি ভাই বউকে রূপ আছে ঘাটে ডুব দেওয়াইল, রূপ হইল; চুল-আছে ঘাটে ডুব দেওয়াইল, চুল হইল;—এইরূপে তার সোনার কান্তি রূপ ফিরিয়া আসিল। স্বামি-স্ত্রীতে পরিচয় হইল।

ছোট ভাই তখন বউকে লইয়া বাড়ীর ঘাটে গিয়া ডঙ্কা পিটিল। ছয় ভাই দৌড়াদৌড়ি করিয়া আসিল। তাদের বউদের কীর্তিনীর্তির কথা সব শুনিল। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী জিদ ধরিল, তাদের শাস্তি না দিলে সে পারে উঠিবে না।

বড় ভাইরা কথা দিল,—এর সমুচিত শাস্তি তারা দিবে। তখন সকলে

বাড়ী গেল, গিয়া মস্ত বড় একটা গর্ত করিল, তারপর বড় ছয় বউকে বলিল, 'আচ্ছা, তোমরা নেমে দেখতো, টাকা-পয়সা এতে কতটা ধরবে।'

যেই তারা নামিল, অমনি ছয় ভাই তাদের মাটী চাপা দিয়া মারিয়া ফেলিল। ছোট ভাই, ভাই-বউ তখন ভারি খুশী হইল। ছয় ভাই আবার বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার পাতিল; তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সীমা নাই।

—পূর্ব-মৈমনসিংহ, কামিনী কুমার রায়, 'সুবর্ণবণিক' ফাল্গুন, ১৩৫৫

মন্তব্য

কেবল মাত্র সুকীর্তির ব্রত করিবার কথা বাদ দিলে ইহা একটি উত্তম লোক-কথা। আচার-অনুষ্ঠান হইতেই যে লোক-কথার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাতে ছোট বৌ অভিপ্রায়ের পরও নিম্নলিখিত অভিপ্রায়গুলি প্রকাশ পাইয়াছে; যেমন নিষ্ঠুরতা (cruelty), ভাগ্যের বিপর্যয়, সদাগর-বধূর দাসীতে পরিণতি, ঐন্দ্রজালিক গুণসম্পন্ন পুকুর বা নদীর ঘাট, রূপের পরিবর্তন (Transformation), নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয়ের সন্ধান লাভ, দুষ্কার্যের শাস্তি (misdeed punished) ইত্যাদি।

নীল পদ্ম

এক রাজার দুই রাণী। বড় রাণীর চার ছেলে; কিন্তু ছোটরাণীর কোন ছেলে নাই। তাই রাণীর মনে দুঃখের অন্ত নাই। একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল, 'আমি ঔষধ দিতে পারি, তাহাতে রাজার পুত্র লাভ হইবে; কিন্তু রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিতে পারিবেন না। যেদিন রাজা ছেলের মুখ দেখিবেন, সেইদিনই তিনি অন্ধ হইয়া যাইবেন'। ছোটরাণী সব শুনিয়া বলিলেন, যেই দিন ছেলের জন্ম হইবে, আমি সেই দিনই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, রাজার আর ছেলের মুখ দেখিতে হইবে না।' এই বলিয়া তিনি ঔষধটি দিলেন।

যথাসময়ে ছোটরাণীর ছেলে হইল এবং তিনি সেইদিনই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর বহুদিন হইয়া গিয়াছে, রাজা একদিন মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন। বড় রাণীর চার ছেলেও রাজার সঙ্গ নিল। বহুদূরে যাইয়া রাজা একস্থানে দেখিলেন, কতকগুলি যুবক ঘোড়ায় চড়িয়া মৃগয়ায় বাহির হইয়াছে।

রাজা তাহাদের শিক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহাদের পরিচয় লাভ করিতে ব্যগ্র হইলেন। মন্ত্রী পরিচয় জানিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে ঐদিকে চাহিতে নিষধ করিলেন; কারণ, ঐ যুবক ছিল ছোট রাজ-কুমার। কিন্তু ততক্ষণে রাজপুত্র রাজার একেবারে সামনে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে দেখিয়াই রাজা অন্ধ হইয়া গেলেন।

তখন মন্ত্রী ছোট রাজকুমারকে দেখিয়া বলিলেন, আজ মহারাজ তোমায় দেখিয়া অন্ধ হইয়া গেলেন। তোমরা পাঁচ ভায়ের মধ্যে কেহ যদি একটি নীলপদ্ম আনিতে পার, ভবিষ্যতে সেই রাজা হইবে এবং রাজা পুনরায় দৃষ্টি-শক্তি ফিরিয়া পাইবেন।'

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া চার ভাই তখনি ডিঙ্গা সাজাইয়া রওয়ানা হইল। ছোটরাজকুমার ডিঙ্গা কোথায় পাইবেন? তাই তিনি গোপনে তাহাদেরই ডিঙ্গায় চলিতে লাগিলেন। ডিঙ্গা যাইয়া এক দেশে পৌছিল। সেই দেশের রাজ-কন্যার নাম কাঞ্চনকুমারী।

রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞা ছিল, পাশা খেলায় যে তাহাকে পরাজিত করিবে তাহাকেই সে বিবাহ করিবে, আর পরাস্ত হইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করিবে। বড়রাণীর চার ছেলেই একে একে পরাস্ত হইয়া কারারুদ্ধ হইল। ছোট রাজকুমার গোপনে রাজকুমারীর রহস্য সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লাগিলেন। জানিলেন যে রাজ-কুমারীর পরাজয়ের মুহূর্তে একটি ইঁদুর আসিয়া আলো নিভাইয়া দেয়, আর সেই সঙ্গে রাজকুমারী ঘুঁটি বদল করিয়া জিতিয়া যায়।

ছোট রাজকুমার সব জানিয়া একটি বিড়াল সঙ্গে লইয়া খেলিতে গেলেন। ফলে ইঁদুরের কৌশল বিফল হইল। রাজকুমারী হারিয়া গেল। রাজকুমারী তখন রাজকুমারকে স্বামীত্বে বরণ করিতে চাহিল; কিন্তু রাজকুমার বলিল, 'যতদিন না আমার অভীষ্ট কার্য শেষ হইতেছে, ততদিন অপেক্ষা কর। আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমায় বিবাহ করিব।' রাজপুত্র আবার নীলপদ্মের অন্বেষণে বাহির হইলেন, অনেক দূর যাইয়া একস্থানে বিশ্রামের জন্য বসিলেন, পরে নির্মল বাতাস পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমন সময় হাম্বা নামক এক রাক্ষস সেখানে আসিল। সে ভাবিল, তাহার মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দিবে। রাজপুত্রও প্রাণভয়ে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু নীলপদ্ম না পাওয়া পর্যন্ত রাজপুত্রের মনে শান্তি নাই। তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া হাম্বা রাক্ষস তাহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন রাজপুত্র তাহাকে নীলপদ্মের কথা বলিল। সব শুনিয়া রাক্ষস বলিল, সে অতি দুর্গম স্থান। সেখানে মাটীতে ইঁদুর পাহারা দেয়, চারদিকে আমরা পাহারা দিই; উপরে পরীতে উড়িয়া উড়িয়া পাহারা দেয়। তবে আমি তোমার জন্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ফুল তোমার নিজের আনিতে হইবে। এই বলিয়া হাম্বা রাক্ষস ইঁদুরকে ডাকিয়া নীলপদ্মফুলের গাছের নীচ অবধি একটি সুরঙ্গ তৈয়ারী করিতে বলিল।

ইঁদুর আদেশ পাওয়া মাত্রই তাহা পালন করিল। রাজকুমার সেই সুরঙ্গ দিয়া নীলপদ্মের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সেই নীলপদ্ম লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। যুবরাজ তখন পত্নীকে সঙ্গে লইয়া হাম্বার কাছ হইতে বিদায় লইলেন। পরে রাজকুমারীর রাজ্যে আসিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার চারভাইকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমার তাহার চার ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের ছাড়িয়া

দিতে রাজী আছি ; কিন্তু তোমাদের প্রত্যেককেই হাঁটুতে একটি করিয়া তপ্ত লোহার দাগ লইতে হইবে।

রাজকুমারগণ তাহাতেই রাজী হইলেন। রাজকুমারীর নামাঙ্কিত মোহরে তাহাদের সবাইকে ছাপ দেওয়া হইল। তখন রাজকুমারগণ একে একে ডিঙ্গায় উঠিয়া স্বদেশ অভিমুখে রওনা দিলেন। ছোটরাজকুমার দুই পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বণিকের বেশে তাহাদের ডিঙ্গায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, আমার কাছে আর কিছুই নাই যে আমরা ডিঙ্গা লইয়া বাড়ী যাইব। তবে আমাদের কাছে একটি নীলপদ্ম ফুল আছে, তাহা দরকার হইলে কিনিয়া লইতে পারেন। নীলপদ্মের কথা শুনিয়া তাহারা খুব আগ্রহী হইয়া দাম জানিতে চাহিল, ছোটকুমার বলিল, মহাশয়, এই ফুলের দাম লাখ টাকা। রাজকুমারেরা তাহাতেই রাজী হইয়া ছোটকুমারকে নিজেদের ডিঙ্গায় তুলিয়া লইল।

কিছুদূর যাইয়া তাহারা মতলব করিল, বণিককে ডিঙ্গা হইতে ফেলিয়া দিয়া নীলপদ্ম ও স্ত্রীলোক দুইটিকে তাহারা লাভ করিবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ছোটকুমারকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিল এবং নিজেরা নির্বিঘ্নে দেশে ফিরিয়া আসিল। মহারাজ নীলপদ্ম পাইয়া দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন এবং পুত্রদের আশীর্বাদ করিলেন।

এদিকে ছোটকুমার জলে পড়িয়া কোন পথ না পাইয়া হাম্বা রাক্ষসকে স্মরণ করিল। হাম্বা তাহাকে স্বদেশে পৌঁছাইয়া দিল। বহুদিন পর মাতাপুত্রে মিলন হইল। মাতার অনুমতি লইয়া ছোটকুমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, 'আমার জন্য আপনি যে দৃষ্টিলাভ করিয়াছেন, ইহা বড় আনন্দের বিষয়।' রাজা অবাক্ হইয়া গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ফুল কি তুমি আনিয়াছ ? তখন ছোটকুমার বলিল, আপনার গৃহে যে দুইটি রাজকুমারী তাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সভায় আনিলে ইহার মীমাংসা হইবে।

রাজা তাহাদের সভায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূতী আসিয়া তাহাকে বলিল, রাজকুমারীরা বলিয়াছেন, যে সভায় তাহাদের 'দাস' আছে, সে সভায় তাহারা যোগদান করিবেন না। রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ছোটকুমার প্রথম হইতে সকল ঘটনা একে একে বলিলেন। রাজা তাহাকেই যুবরাজ নির্বাচিত করিলেন।

মন্তব্য

এখানে নীলপদ্ম বিস্ময়কর বস্তু (Marvel) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। আলৌকিক উপায়ে যে-পুত্র লাভ করা যায়, তাহার সঙ্গে তাহার মাতাপিতার যে সম্পর্ক থাকে, তাহা সর্বদা স্বাভাবিক নহে। এখানে সেই পুত্রকে দেখিলে পিতা অন্ধ হইবে এ'কথা বলা হইয়াছে। এখানে taboo বা বাধা-নিষেধ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। বাধানিষেধ ভঙ্গ করিয়া রাজা অন্ধ হইলেন। কাহিনীটিতে আধুনিকতার স্পর্শ আছে; ইহাতে পরীর উল্লেখ আছে, ইহা মুসলমান কথাসাহিত্যের প্রভাবের ফল। এই কাহিনীতে ছোট বৌয়ের পরিবর্তে ছোট ছেলের সাফল্যের কথা বলা হইয়াছে।

১১

প্রাণ-সঞ্চারিণী

এক দেশে এক রাজা ছিল। তাহার সাতটি ছেলে। ছোট ছেলের একটি অদ্ভুত পাখী ছিল, সে মানুষের মত কথা বলিতে পারিত। একদিন যুবরাজের স্ত্রী সহচরীদের সঙ্গে কথাচ্ছলে বলিতেছিল, আমার তুল্য সুন্দরী এ পৃথিবীতে কে আছে? শুনিয়া পাখীটি ব্যঙ্গভরে হাসিয়া উঠিল। পাখীর হাসি দেখিয়া যুবরাজের স্ত্রী তো রাগিয়াই অস্থির। তখুনি পাখীকে মারিয়া ফেলিবে স্থির করিল। পাখী প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া যুবরাজ আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিল। পাখী যুবরাজকে বলিল, এই পৃথিবীতে এমন সুন্দরী আমি দেখিয়াছি, যাহা আর কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনাকেও দেখাইতে পারি।

পরদিন সকালে যুবরাজ পাখীটিকে আগে ছাড়িয়া দিলেন এবং পরে মন্ত্রি-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পাখীর নির্দেশমত রওনা দিলেন। বহুদূর যাইয়া হঠাৎ তাহারা আর পাখীটাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে একটি অতি সুন্দর বাগান দেখিতে পাইলেন। সেই বাগানের অধিকারিণী এক রাজকুমারী। রাজকুমারী তাহাদের দেখিয়া বুঝিলেন, ইহারা অভিজাত সন্তান। তিনি সাদরে তাহাদের আশ্রয় দিলেন। রাজকুমারীর আশ্রয়ে সুখে থাকিয়া যুবরাজ পাখীর কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তখন একদিন সেই পাখী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া যুবরাজকে ইসারায় পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিল, যুবরাজ তখন রাজকুমারীর নিকট যাইয়া বিদায় নিলেন এবং বলিলেন, ফিরিবার পথে তাহাকে বিবাহ করিয়া তবে স্বদেশে ফিরিবেন, বিদায়ের কালে রাজকুমারীর পিতা উপঢৌকনস্বরূপ যুবরাজকে একটি পাথর দিলেন এবং বলিলেন, 'ইহা খুব সাবধানে রাখিবে। যদি কখনও কোন বিপদে পড়, এই পাথরখানি দেখিলেই প্রতিকারের পথ দেখিতে পাইবে। আর একটি মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, ইচ্ছা হইলে নিজের প্রাণকে যে কোন শবদেহে চালনা করিতে পারিবে। কিন্তু সাবধান! এ মন্ত্র কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।'

যুবরাজ বিদায় লইয়া আবার পাখীর নির্দেশমত চলিতে লাগিলেন, ক্রমে তাহারা এক দূর দেশে যাইয়া পৌঁছাইলেন। সেখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী দেখিয়া যুবরাজ ও মন্ত্রিপুত্র অতিশয় মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু যাইয়া শুনিলেন, রাজকুমারী

এক মায়াবী দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। যুবরাজ আশাহত হইলেন, তিনি তাড়াতাড়ি রাজার কাছে যাইয়া বলিলেন, আপনি চিন্তা করিবেন না, আমি রাজকুমারীকে উদ্ধার করিয়া আনিব।

যুবরাজ কয়েকজন সৈন্যসহ রওয়ানা দিলেন, পাথরখানি তাহার সঙ্গেই ছিল, তিনি পাথরের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, রাজকুমারী কাছেই এক বনে আছেন। যুবরাজ পাথরটির নির্দেশ লক্ষ্য করিয়া সেই বনে যাইয়া রাজকুমারীর সন্ধান পাইলেন এবং সসৈন্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ মহারাজ কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া খুব খুশী হইলেন এবং যুবরাজের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। রাজকুমার নববিবাহিত পত্নীকে লইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে প্রথম রাজকুমারীকেও তিনি বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইলেন।

একদিন রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র গল্প করিতেছেন। মন্ত্রিপুত্র কেবলি জানিতে চাহিল, প্রথম রাজকুমারীর পিতার কাছ হইতে রাজপুত্র কি বিদ্যা শিখিয়াছেন। রাজপুত্র অনেক চেষ্টা করিয়াও বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। বন্ধুর কাছে সবই খুলিয়া বলিলেন। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, আপনি এরূপ একটি আশ্চর্য বিদ্যা শিখিলেন, অথচ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন না। আপনি আজই পরীক্ষা করিয়া দেখুন মন্ত্রিপুত্রের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া রাজকুমার শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করিতে রাজী হইলেন। মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রটি মন্ত্রিপুত্রকে শিখাইয়া রাজপুত্র একটা মৃত পাখীর দেহে নিজের প্রাণ চালনা করিয়া দিলেন। দুষ্টবুদ্ধি মন্ত্রিপুত্র তাড়াতাড়ি রাজপুত্রের মৃতদেহে নিজের প্রাণ চালনা করিয়া দিয়া নিজের দেহটি নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। এবং রাত্রিকালে যুবরাজের বেশে ছোট রাণীর কাছে গেল। তাহার চালচলন দেখিয়া ছোটরাণীর সন্দেহ হইল। সে তাড়াতাড়ি চালাকি করিয়া বলিল, আজ তো আমার কাছে আপনার অসিবার কথা নয়।' শুনিয়া মন্ত্রীপুত্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। তখন ছোটরাণীর সন্দেহ ঘনীভূত হইল। সে স্থির করিল, ইহার সঠিক পরিচয় না জানিয়া ইহাকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া ঠিক হইবে না।

মন্ত্রিপুত্র দেখিল, তাহার পরিশ্রম বিফল হইতেছে। সে সেই দেশের রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দেশের সমস্ত পাখীকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম লইল। প্রত্যহ রাজ্যে সহস্র পাখীর জীবন বলি হইতে লাগিল। এদিকে পাখী-বেশধারী রাজকুমার প্রাণভয়ে এক ব্যাধের নিকট আশ্রয় লইল এবং কাতর-

ভাবে অনুনয় করিল যেন তাহাকে রাজার নিকট না পাঠানো হয়। ব্যাধ তাহাকে পুত্রস্নেহে পালন করিতে লাগিল। পাখীটি কিন্তু মানুষের মত কথা বলিতে পারিত। এই খবর শুনিয়া রাজা পাখীটিকে দেখিতে চাহিলেন। ব্যাধ বলিল, 'যদি দেখিয়া আবার ফেরৎ দিয়া দেন, তবে দেখাইতে পারি।' ইতিপূর্বে ছোট রাণী একটি পাখী ও একটি ছাগল পুষিয়াছিল। যখন ব্যাধ পাখী লইয়া রাজবাড়ীর দিকে যাইতেছিল, তখন ছোটরাণী তাড়াতাড়ি নিজের পাখীটিকে মারিয়া ফেলিল এবং পাখীবেশধারী যুবরাজ তক্ষুণি নিজের প্রাণ ছোটরাণীর মরা পাখীটির দেহে স্থানান্তর করিলেন।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় ছোটরাণী ছাগলটিকে মারিয়া ফেলিলেন এবং মন্ত্রি-পুত্রের কাছে কাঁদিয়া বলিলেন, 'আপনি তো আমার বাবার কাছ্ হইতে মরা বাঁচানোর মন্ত্র শিখিয়াছেন, আমার ছাগলটিকে বাঁচাইয়া দিন।'

মন্ত্রিপুত্র একান্ত নিরুপায় হইয়া নিজের প্রাণ ছাগলের দেহে চালনা করিয়া ছাগল বাঁচাইল। বুদ্ধিমতী ছোটরাণী তখন পাখীটিকে আনিয়া রাজকুমারের মৃতদেহের কাছে ছাড়িয়া দিল। রাজকুমারও পাখীর দেহ ত্যাগ করিয়া নিজের দেহে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, ধূর্ত মন্ত্রিপুত্র ছাগল হইয়া রহিল।

পরদিন রাজকুমার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং একটি সভা করিয়া ছাগলের সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন, ছাগল তাহার অপরাধ সর্বসমক্ষে স্বীকার করিল।

মন্তব্য

ইহার প্রথম অভিপ্রায় বাক্‌শক্তি সম্পন্ন (talking) পক্ষী। ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন পাথর ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। Taboo বা বাধা-নিষেধ অভিপ্রায়টি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। রাজকুমারীর পিতা একটি গোপন মন্ত্র রাজকুমারকে শিখাইয়া দিয়া তাহা অন্যকে বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। নিজের প্রাণ অন্যের দেহে সঞ্চার করিবার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহা ইন্দ্রজাল (Magic) অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। দুষ্কার্যের শাস্তি (misdeed punished) ইহার শেষ অভিপ্রায়।

১২

নিজের ভাগ্যে খাই

এক ধনবান সওদাগরের সাত মেয়ে। সওদাগর একদিন তাহার সাত মেয়েকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহার ভাগ্যে খাও? সকলেই উত্তর দিল, বাবা, আমরা তোমারই ভাগ্যে সুখ-ভোগ করিতেছি। কেবল কনিষ্ঠ মেয়ে বলিল, আমি নিজের ভাগ্যে নিজে খাইতেছি। এই কথা শুনিয়া সওদাগর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তখনই একখানি পাল্কী আনিয়া কন্যাকে বনবাস দিল। একটি বুড়ী সেই মেয়েটিকে মানুষ করিয়াছিল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গ নিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাহাদের নিবিড় বনের মধ্যে একলা রাখিয়া বাহকেরা পলাইয়া গেল। এই নিবিড় অরণ্যে একাকী তাহারা কি করিবে ভাবিতে না পারিয়া এক প্রকাণ্ড গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহাদের কান্না দেখিয়া গাছটি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, আমি আমার গুঁড়ি দুইভাগে ভাগ করিতেছি, তোমরা উভয়ে ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুগণ তোমাদের কোন অপকার করিতে পারিবে না। এই বলিয়া গাছটি তাহার গুঁড়ি দুই ভাগে ভাগ করিল, সওদাগর-কন্যা ও বুড়ী তাহার ভিতর আশ্রয় লইল। রাত্রির অন্ধকারে অনেক হিংস্র জন্তু সেই গাছের কাছে আসিল; কিন্তু তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। গাছ আবার দুই ভাগে ভাগ হইল, সওদাগরের মেয়ে ও বুড়ী বাহির হইয়া দেখিল, হিংস্র জন্তুরা গাছের শাখা ভাঙ্গিয়াছে, পাতা ছিঁড়িয়াছে, নখ দিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়াছে। দেখিয়া সওদাগরের মেয়ে খুব দুঃখ পাইল, সে সরোবরের তট হইতে মাটী আনিয়া গাছের ক্ষতস্থানে লেপন করিয়া দিল।

তাহার সেবায় গাছ খুব খুশী হইল। সে মেয়েটিকে আশীর্বাদ করিয়া বলিল, মা, তোমরা কাল রাত্রি হইতে কিছুই খাও নাই, আমারও ফল হয় না যে তোমাদের খাইতে দিব। তোমাদের কাছে যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা দিয়া বুড়ীকে গ্রাম হইতে খই আনিতে বল।

সওদাগরের মেয়ে সমস্ত খুঁজিয়া পাঁচকড়া কড়ি বাহির করিল এবং তাহা দিয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে খই কিনিয়া আনিল। খই দেখিয়া গাছ বলিল, খইগুলি দুই ভাগ কর। এক ভাগ খাও, আরেক ভাগ সরোবরের তীরে ছড়াইয়া দাও। মেয়েটি গাছের কথামত কাজ করিল। খই দেখিয়া কতগুলি

ময়ূর আসিল এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত মারামারিতে অনেকগুলি পালক খুলিয়া গেল।

গাছের পরামর্শমত সওদাগর-কন্যা ঐ পালকগুলি সংগ্রহ করিল। সে নানাপ্রকার কাজকর্ম জানিত। পালকগুলি দিয়া সে খুব সুন্দর পাখা তৈয়ারী করিয়া বুড়ীকে বিক্রী করিয়া আসিতে বলিল। পাখার কারুকর্ম দেখিয়া এক রাজপুত্র মুগ্ধ হইল এবং সে অনেক টাকা দিয়া খই ও অন্যান্য অনেক খাবার কিনিয়া আনিল। সেই হইতে প্রতিদিন সওদাগর-কন্যা পাখা তৈরী করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল।

যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইলে তাহারা একটি প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী করিল। ইহার পর সওদাগর কন্যা একটি পুকুর কাটাইবে স্থির করিল। সে এইকাজে অনেক লোক নিযুক্ত করিল এবং প্রত্যেককে প্রচুর অর্থ দান করিতে লাগিল।

এদিকে সওদাগর ব্যবসায়ে সর্বস্বান্ত হইয়াছে। দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে। লোকমুখে সওদাগর কন্যার দয়ার কথা শুনিয়া পত্নীকে লইয়া সেও সাহায্যের আশায় তাহার বাড়ীতে যাইবে ভাবিল। পরদিন সওদাগর-কন্যা দালানে বসিয়া আছে, এমন সময় দূর হইতে তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া চিনিতে পারিল; সে তাহাদিগকে ভিতরে আনিবার জন্য চাকর পাঠাইয়া দিল। চাকর আসিয়া তাহাদিগকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল এবং স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিতে দিল।

এইরূপ সমাদর দেখিয়া তাহারা ভাবিল, পুষ্করিণী শেষ হইলে যে নরবলি দিতে হয়, তাহাদের যখন এত আদর যত্ন করা হইতেছে, তখন বোধ হয় তাহাদেরও বলি দেওয়া হইবে। তাহারা খুব বিষণ্ণমনে বসিয়া রহিল। এমন সময় সওদাগর-কন্যা মূল্যবান বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া আসিয়া তাহাদের কাছে আত্ম-পরিচয় দিল এবং কি করিয়া এই বিপুল ঐশ্বর্য পাইয়াছে, তাহাও বর্ণনা করিল।

সওদাগর ও তাহার স্ত্রী সব শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। তখন সওদাগর স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, সুখদুঃখ যে যাহার নিজের ভাগ্যে ভোগ করিয়া থাকে, অপরের ভাগ্যে নয়।

দুঃখের শেষ

এক গৃহস্থ ও তার পাঁচ পুত্রবধূ। গৃহস্থ-পত্নী পুত্রবধূদের এই ব্রত শিক্ষা দিলেন। তাহারা প্রত্যহ ব্রতশেষে শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিত, স্বামীর পা, চুল দিয়া মার্জন করিয়া দিত। শাশুড়ী ছোট বউকে দেখিতে পারিত না; কাজেই, চারি বৌকেই ধনের বর, স্বামীর বর, পরমায়ুর বর, রাজ্যের বর, পুত্রের বর এবং সুখের বর দিত ও ছোট বউকে বলিত, 'মাছ কাটিয়া মুড়া খাইস্, বাড়া বানিয়া কুঁড়া খাইস্, বুচা কলস দিয়া জল আনিস্, ননদের গৃহে দাস্যতা করিস্।' সে এই সমস্ত শুনিয়া মনের দুঃখে দিন কাটাইতে লাগিল। তাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাই অন্য জা-গণ, এমন কি, স্বামী পর্যন্ত সর্বদা তাহাকে মন্দ বলিত। শাশুড়ীর বিদ্বেষের সুবিধা পাইয়া অন্য সকলেই তাহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। একদিন সকলে ঘাটে জল আনিতে গেল। বড় জা'দের সকলে যুক্তি করিয়া ছোট বৌকে জলে ফেলিয়া দিয়া বাড়ী আসিয়া বলিল, 'ছোট বৌ গলায় কলস বাঁধিয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।' তাহার জন্য কেহই বড় একটা শোক আপশোষ করিল না।

এদিকে ছোট বৌ জলে ভাসিয়া ভাসিয়া অনেক দূর চলিয়া যাইতে লাগিল। ঢেউয়ের আঘাতে এক একবার উপরে উঠে আবার ডুবে এবং ঠাকুরের দোহাই দেয়। এমন সময় নদীপথে তাহার ননদের বর নৌকায় যাইতে ছিল। দৈবচক্রে মরণাপন্ন বউটিকে দেখিতে পাইল এবং নিজের নৌকায় উঠাইয়া লইল। বহুদিন পর দেখা, তাই একে অন্যকে চিনিতে পারিল না।

ননদের বর তাহার রূপ দেখিয়া বলিল, 'মনে হয় তুমি কোন ভদ্রলোকের বউ; তোমার ঘর-বরের পরিচয় দাও, তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসি'। সে বলিল, 'আমার কেহ নাই, আমি বনের ভিখারিণী, যদি তুমি আশ্রয় দাও, তবে তোমার বাড়ীতেই দাসীর কাজ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইব'। অনন্যোপায় হইয়া তাহার ননদের বর, বৌকে নিজের গৃহে স্থান দিল। এইরূপ দিন যায়। ছোট বৌয়ের রূপ দেখিয়া তাহার ননদ ভাবিল, বোধ করি তাহার সঙ্গে তাঁহার স্বামীর গোপন সম্পর্ক আছে। তাই ননদ বৌকে উঠিতে বসিতে নানাভাবে যন্ত্রণায় উত্যক্ত করিয়া তুলিত। কাজেই এই দুঃখের মধ্যে শাশুড়ীর

শাপ ভালমতেই ফলিল। বৌ কিছু বলে না। নীরবে কাজ করিয়া যায়, আর গোপনে ঠাকুরকে ডাকে। অনেক দিন পর ছোট বৌয়ের স্বামী ভগ্নী-গৃহে বেড়াইতে আসিল। একদিন স্নানের সময় উপস্থিত হইলে ননদ বৌকে বলিল, 'আমার ভাইয়ের শরীরে তৈল মাখিয়া দিয়া আস।' বৌ স্বামীর পায়ে তেল মার্জনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। দু' চার বিন্দু অশ্রু তাহার পায়ে পড়িল। তখনও কেহ কাহারও দিকে ভালরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে নাই।

তাহার স্বামী বলিল, 'তুমি কাঁদ কেন?' বৌ তখন ভালরূপে স্বামীর দিকে চাহিল এবং বলিল, 'এইরূপে তোমার পাও আমার কেশ দিয়া পুঁছিয়া দিতাম। অনেক দুঃখে কাঁদি'। তাহার চৈতন্যোদয় হইল। সে তাহার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া নিজেও অশ্রু বিসর্জন করিল এবং স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বাটী আসিল।

পূর্ব-মৈমনসিংহ, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী সংগৃহীত।

মন্তব্য

কাহিনীটির মূল অভিপ্রায় নিয়তি। শাশুড়ী ছোট বউকে যে কেন দেখিতে পারিতেন না, তাহার মনস্তত্ত্বমূলক কারণ থাকিলেও বাহির হইতে এখানে কোন কারণ দেখা যায় না। সুতরাং এখানে অদৃষ্টকে স্বীকার করিতে হয়। যতদিন অদৃষ্টের ভোগ ছিল, ততদিন তাহার দুঃখভোগ হইয়াছে, নিয়তির কোন ব্যাখ্যা নাই, এখানে ইহারও কোন ব্যাখ্যা নাই।

সবুর

এক সওদাগরের সাত কন্যা। একদিন সওদাগর মেয়েদের ডাকিয়া জানিতে চাহিলেন, তাহারা কাহার ভাগ্যে আহার পাইতেছে। প্রথম ছয়জনে জবাব দিল যে, তাহারা পিতার ভাগ্যে জীবনধারণ করিতেছে। ইহা শুনিয়া পিতা অত্যন্ত খুশী হইলেন। কিন্তু, ছোট মেয়ে বলিল যে, সে নিজের ভাগ্যে খাইতেছে। ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কপর্দক শূন্য করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন—সে নিজের ভাগ্যে খাইবার চেষ্টা করুক। বালিকা নিজের সেলাই করার ছুঁচ-সূতার বাক্স সঙ্গে লইল। মেয়েটির ধাত্রীমাতা তাহার সহিত চলিল। পাল্কী করিয়া তাহাদের গভীর অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিল।

সন্ধ্যায় মেয়েটি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। চারিদিকে হিংস্র পশুর গর্জন। সে আদরে মানুষ হইয়াছে—বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর; সঙ্গে আবার একটি বৃদ্ধা। তাহার দুঃখ দেখিয়া সম্মুখের বটগাছটির বড় দয়া হইল এবং আপন কাণ্ড ফাঁক করিয়া দুইজনকে আশ্রয় দিল। সারারাত গাছের উপর হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিল; কিন্তু কাণ্ড ফাঁক করিতে পারিল না। প্রাতঃকালে তাহারা বাহির হইয়া দেখিল, গাছের কাণ্ড ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। মেয়েটি সেই ক্ষতে কাদা মাখাইয়া দিল।

তারপর গাছের উপদেশে বুড়ীকে পাঁচটি কড়ি দিয়া হাট হইতে কিছু খই লইয়া আসিল। খইগুলির কিছু অংশ তাহারা দুই জনে খাইল এবং বাকী অংশ পুকুরের ধারে ধারে ছড়াইয়া দিল। গাছের কাণ্ডের অভ্যন্তরে তাহাদের রাত্রিবাসের গৃহ হইল। পরদিন তাহারা পুকুরের পাড়ে বড় বড় ময়ূরের পালক দেখিতে পাইল। রাত্রে ময়ূরের দল খই খাইতে আসিয়া পালক ফেলিয়া গিয়াছে। বটগাছের কথায় বণিক-কন্যা সেই পালকের দ্বারা সুন্দর সুন্দর পাখা প্রস্তুত করিল। বুড়ী সেই পাখা শহরে বেচিয়া অনেক টাকা পাইল। কারণ, বণিক-কন্যা অতি সুন্দর হাতের কাজ জানিত। এইভাবে প্রতিদিন ময়ূরপালক দ্বারা পাখা বেচিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা প্রচুর টাকা জমাইয়া ফেলিল। তখন গাছের উপদেশে একটি প্রাসাদ-সদৃশ অট্টালিকা প্রস্তুত

করিল এবং একটি দীঘি কাটাইবার সময় মেয়েটির মা-বাবা শ্রমিক হিসাবে কাজ করিতে আসিলেন। বণিকের ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ায়, ছয় কন্যা সহ তাঁহারা অতি কষ্টে দিন কাটাইতেন।

পিতামাতার দুরবস্থা দেখিয়া বণিক-কন্যা খুবই কাঁদিলেন। পিতামাতাকে ডাকাইয়া নিজের পরিচয় দিলেন এবং পুনরায় ব্যবসায় করিবার জন্য অর্থ দিলেন। বণিক বাণিজ্য করিতে বিদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কনিষ্ঠা কন্যার জন্য কি আনিতে হইবে, তাহা জানিতে লোক পাঠাইলেন। বণিক-কন্যা তখন পূজা করিতেছিল; দূতকে বলিলেন, 'সবুর'। দূত মনে মনে করিল, সবুর নামক কিছু আনিবার আদেশ দিয়াছেন।

বাণিজ্য হইতে ফিরিবার সময় বণিক কিন্তু সবুর নামক বস্তুটি যে কি, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি 'সবুর চাই' বলিয়া রাস্তায় চীৎকার করিতেছেন, এমন সময় সেই দেশের রাজপুত্র আসিয়া বণিকের হাতে একটি সুদৃশ্য বাক্স উপহার দিলেন; রাজপুত্রের নাম ছিল 'সবুর'। বণিক্ তাহা লইয়া দেশে ফিরিলেন এবং কন্যাকে তাহা পাঠাইয়া দিলেন। বণিক-কন্যা তাহার মধ্যে একটি আয়না এবং একখানি সুন্দর পাখা দেখিলেন। পাখাটি নাড়িতেই রাজপুত্র সবুর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর দুইজনের বিবাহের দিন স্থির হইল। কিন্তু অপর ছয় বোন হিংসাপরবশ হইয়া রাজপুত্রকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। বিছানায় এমন বিষ দিয়া রাখিল যে, রাজপুত্রের সারাদেহে ভীষণ যন্ত্রণা সুরু হইল। তিনি নিজ রাজ্যে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সে যন্ত্রণা সারিল না।

ফুলশয্যার রাত্রেই স্বামীকে হারাইয়া বণিক-কন্যার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি সন্ন্যাসীর বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন। এক বনে সর্পের মুখ হইতে বিহঙ্গম পক্ষীর শাবকদের রক্ষা করিলেন। ইহাতে খুশী হইয়া বিহঙ্গম রাজপুত্রের অসুখের ঔষধ বলিয়া দিল এবং বণিক্-কন্যাকে আপনার পিঠে চাপাইয়া রাজপুত্রের প্রাসাদে লইয়া গেল। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বণিক্-কন্যা রাজপুত্রকে বিহঙ্গমের নির্দেশমত সারাইয়া তুলিলেন। সন্ন্যাসীকে রাজা প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিতে চাহিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী শুধুমাত্র রাজপুত্রের হাতের একটি আংটি চাহিয়া লইলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় বিহঙ্গমের পিঠে চড়িয়া আপন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন তিনি সেই যাদু পাখা নাড়াইয়া রাজপুত্রকে আহ্বান করিলেন। বণিক্-কন্যা আংটি দেখাইলেন এবং সকল ঘটনা বিবৃত

করিলেন। রাজপুত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ; এবং স্ত্রীকে লইয়া আপন রাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে বহুকাল তাঁহারা সুখে রাজত্ব করেন।

মন্তব্য

পূর্বে 'নিজের ভাগ্যে খাই' নামক যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার প্রথম অংশ তাহার অনুরূপ। কিন্তু শেষাংশে নূতন কয়েকটি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। তবে ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নাই। বিষ দিয়া ভগ্নী হত্যা করিবার বৃত্তান্তের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাব থাকা সম্ভব। অবশ্য উপজাতীয় লোক-কথার প্রভাববশতঃ ও এই শ্রেণীর অতিনাটকীয় (melodramatic) কাহিনী বাংলার সমাজেও বহুল প্রচারলাভ করিয়াছে। কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে অন্যান্য ভগ্নীদিগের লিপ্ত হইবার বৃত্তান্ত বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে একটি কাহিনীতে ছয় ভাই কনিষ্ঠা ভগ্নীকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস আহার করিয়াছিল বলিয়া যে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা গভীর মনস্তত্ত্বমূলক। অবশ্য ভগ্নীর সৌভাগ্যে অন্যান্য ভগ্নীর ঈর্ষান্বিত হইবার মধ্যেও মনস্তত্ত্বমূলক কারণ আছে।

১৫

ভাগ্যের বিবর্তন

এক মোড়লের ছয় ছেলে। আবার ছয় বৌ। মোড়লের স্ত্রী ছিল ভয়ংকর ঝগড়াটে। বৌগুলো সারাদিন খেটে মরত। কিন্তু শাশুড়ী খেতেই দিত না। ছয় বৌকে কচুর পাতায় করে ভাত দিত। মোড়লের ছয় ছেলে আবার তাদের মায়ের বড় ভক্ত। কাজেই বৌদের দুঃখের কথা মোটেই বিশ্বাস করত না।

একদিন পাড়ার এক জমিদারের ছেলের বিয়েতে তাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। ছয় বৌ ভাবলে, আজকে দুটো পেট ভরে খেতে পাবে। কিন্তু হলে কি হবে, তাদের কপাল খারাপ। এখানেও শাশুড়ীর দাপট। তাদের আশায় ছাই পড়ল। এখানেও সেই কচুর পাতা। শাশুড়ীর মতলব বুঝতে পেরে ছয় বৌ জল আনবার ছল করে ছটি কলসী নিয়ে নদীর দিকে চললো। তারা ঠিক করলে, আর বাড়ী ফিরবে না। যে দিকে দুচোখ যায়, সেদিকে চলে যাবে।

চলতে চলতে তারা এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেই জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেলে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ পুরী। ছয় বৌ সোজা সেই জনশূন্য ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই রয়েছে। এইসব জিনিস দেখে তারা অবাক্ হয়ে গেল। তারা প্রথমে পেট ভরে খাবার খেয়ে নিলে। এমনি করে সন্ধ্যে হয়ে এল এবং ছয় জায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এভাবে দিনকতক মনের সুখে সেখানে কাটাল। একদিন ছ' জায়ের মধ্যে বড় পাঁচজন নদীতে স্নান করতে গেল। ছোট জা ঘরে রইলো। ছোট বৌ দেখলে, সেই ঘরের মধ্যে একটি বছর দুইএর শিশু শুয়ে রয়েছে। আর সেই খাটের নীচে একটা কানা ভাঙ্গা মাটীর ভাঁড় রয়েছে। ছোট শিশুটা ভাঁড়টাকে জিজ্ঞেস করছে :

—বোঁচা খুড়ি, বোঁচা খুড়ি, কতদিন ?

আর ভাঁড়টা জবাব দিলে : খেঁয়ে দেঁয়ে তেঁল বাঁধুক, এখন যে কেবল হাঁড়।'

এসব কথা শুনে ছোট বৌ একদম অবাক্ হয়ে গেল। বাকী পাঁচ জা যখন এলো, তাদের সব কথা বললো। পাঁচ জা পর পর রহস্যটা পরীক্ষা করলে।

তারাও দেখলে ব্যাপারটা সত্য। ভাবলে এ বাড়িতে কোন মায়াবী রাক্ষসী আছে। তাই তারা ঠিক করলে এখান থেকে পালাবে। পরের দিন সকালে ছয় জা কলসীতে করে সোনা-মোহর যতটা পারলে ভর্তি করে বেরিয়ে পড়লো। চলতে চলতে পথ ফুরোয় না।

সন্ধ্যে হয়ে এলো। এক প্রকাণ্ড অশ্বথ গাছের তলায় ছ' জনায় বিশ্রাম করতে লাগলো। ছোট জা বললে, গাছে দেবতা আছে গো, দিদি। সবাই বললে, হ্যাঁ ঠিক। সবাই ভক্তিভরে অশ্বথ গাছকে বললো, দেবতা, তুমি আজ রাতের জন্য আমাদের একটু আশ্রয় দাও। তখন গাছ বললে, আচ্ছা, আমি ফাঁক হচ্ছি, তোমরা আমার ভেতর ঢুকে পড়। সকাল হলে কিন্তু বেরিয়ে পড়ো। যেমনি কথা, তেমনি কাজ। ছ' জা ঢুকে পড়ল, গাছ আবার যেমন ছিল, তেমন হয়ে গেল। রাক্ষসেরা বুঝতে পারলে মানবীরা টের পেয়েছে, তাই বোধ হয় পালিয়েছে। চল তাদের খুঁজিগে—বললো, বড় রাক্ষসী। ঘুরতে ঘুরতে তারা ঐ অশ্বথ গাছটার কাছে এলো।

সেখানে মানুষের গন্ধ পেয়ে বলতে লাগলো, —'হাঁউ মাউ খাঁউ, মানিষ্যের গন্ধ পাঁউ।' এই বলে গাছের ডাল পালা ভাঙ্গতে লাগলো। এসব করতে করতে ভোর হয়ে এল। ভোর হতেই রাক্ষসেরা পালালো।

ভোর হতেই গাছ ছ' বৌকে বললে, ভোর হয়েছে। এবার তোমরা বাড়ী চলে যাও। ছ' বৌ গাছ থেকে বেরিয়ে দেখলে ডালপালা ভেঙ্গে রাক্ষসেরা তছনছ করে ফেলেছে। গাছের কষ্ট দেখে তাদের দুঃখ হলো। তাই তারা কাদা, জল এনে গাছের গোড়ায় দিলো। গাছ তাদের ওপর খুসি হয়ে বললে, এই বনের পশ্চিমে কিছু জঙ্গল আছে। সেখানে জঙ্গল কেটে বাড়ী-ঘর করগে। ছ' বৌ সেদিকে গেল এবং জঙ্গল কেটে বাড়ীঘর করলে। বাড়ীর চারদিকে অনেক প্রজা বসানো হোল। সে অঞ্চলে তাদের নাম হোল জঙ্গলকাটা রাণী।

এদিকে হোল কি, সেই মোড়লের এবং ছ' বৌ-এর শাশুড়ীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাদের দু' বেলা খাবার জোটে না। তখন তারা মজুরের কাজ করতে লাগলো। জঙ্গলকাটা রাণীদের বাড়ীর সামনে পুকুর কাটার জন্য অনেক মজুরের প্রয়োজন হোল। মোড়ল তার ছ' ছেলেকে নিয়ে মাটি কাটতে গেল।

একদিন দুপুর বেলা ছ' জায় বসে পান খাচ্ছে, আর মজুরদের মাটি কাটা দেখছে। ছোট জা দেখলো এক বুড়ো আর এক বুড়ীও মাটি কাটছে। তারা

বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এই বুড়োবুড়ী দেখতে আবার তাদের শ্বশুর-শাশুড়ীর মত। বাকী পাঁচ জাকে সে কথা বললে। তারাও দেখলে এবং বললে ঠিক। তখন দাসীকে দিয়ে তাদের ডেকে পাঠানো হোল।

তাদের জন্য জলখাবারের ব্যবস্থা হলো। ছোট বৌ তাদের দিকে ভালো করে তাকাতে লাগলো। ছ' বৌ তাদের শ্বশুর শাশুড়ীকে চিনতে পারলে। তারা ছ'জনে তাদের প্রণাম করলে এবং কি ভাবে যে এত ধনরত্ন পেলো, সে কথাও বললো। এইভাবে তাদের বহুদিনের বিচ্ছেদ ও বিরহের অবসান ঘটলো। ছ' বৌ, ছ' ছেলে নিয়ে বুড়োবুড়ী সুখে জীবন যাপন করতে লাগল সেখানে।

মন্তব্য

এখানে ছয় বৌয়ের মধ্যে ছোট বৌয়ের যে কোন সুস্পষ্ট বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা মনে হইতে পারে না। ছয় বৌ এক রকম সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগের অধিকারী হইয়াছে। তবে একদিন ছয় জায়ের মধ্যে পাঁচ জন নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল, ছোট বৌ ঘরে ছিল, সেদিন সেই প্রথম রাক্ষসের অস্তিত্ব টের পাইল এবং তাহাতেই তাহাদের সকলের প্রাণ রক্ষা পাইল। সাহায্যকারী বৃক্ষ ইহার অন্যতম অভিপ্রায়; এখানে নরমাংসাহার (cannibalism)-এর ইঙ্গিত আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বৃক্ষ ইহার অভি-প্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচারীর দণ্ড (misdeed punished) ইহার আরও অভিপ্রায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বৃক্ষের সেবা করিয়া সৌভাগ্যলাভের কথা অন্যান্য কাহিনীতেও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

১৬

সোনার আতা

এক রাজার তিন বেটা। রাজার একটা বাগান ছিল। বাগানে আতা, আম, কলা প্রভৃতি গাছ আছে। রাজার কর্মচারীরা বাগান পাহারা দেয়। কিন্তু রোজ একটা করে সোনার আতা বাগান থেকে চুরি হয়ে যায়। কর্মচারীরা যখন চোর ধরতে পারল না, তখন ঠিক করল বেটাদের পাহারায় রাখবে।

বড় বেটা বাগান পাহারা দিতে গেল যেদিন, সেদিন রাতেও সোনার আতা চুরি হ'ল। তখন সেজ বেটাকে পাঠানো হল, সেদিনও সোনার আতা চুরি হল। তখন রাজা ছোট বেটাকে পাহারা দিতে পাঠাল। ছোট বেটা তীর ধনুক নিয়ে বাগানে একটা গাছের তলায় বসে রইল। অনেক রাত্রে সে দেখল, আতা গাছে একটা সোনার পাখী বসে সোনার আতাটাকে দাঁত দিয়ে কাটতে চেষ্টা করছে। ছোট বেটা তখন তীর ছুঁড়ল, পাখীটা উড়ে পালিয়ে গেল। পাখীর একটা পালক পড়ল তার পায়ের কাছে। সে তখন ঐ পালকটা মাথার কাছে রেখে ঐ গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলা রাজা এল বাগানে। এসে দেখে গাছের তলায় ছোট বেটা ঘুমচ্ছে, আর মাথার কাছে একটা সোনার পালক। রাজা তখন বেটাকে ডেকে তুলল, আর জিজ্ঞেস করল, এই সোনার পালক কোথা থেকে পেয়েছে। তখন সে বলল, একটা পাখী সোনার আতা খাচ্ছিল, তাকে তীর মেরে এই পালকটি পেয়েছি।

রাজা তখন ঘোষণা করলে, যে সোনার পাখী ধরে আনতে পারবে, তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব। তখন রাজার তিন বেটা সোনার পাখীর খোঁজে বেড়িয়ে পড়ল। বড় বেটা আর মেজ বেটা একদিকে গেল, আর ছোট বেটা অন্য দিকে গেল।

ছোট বেটা অনেক দেশ ঘুরে একটা দেশে গিয়ে থেমে গেল। সে দেখল একটা খুব সুন্দর বাড়ী, আর তার ভিতরে একটা সুন্দর বাগান। সেই বাগানে খুব সুন্দর একটা মেয়ে গান গেয়ে ফুল তুলছিল। রাজার ছোট বেটা তাকে দেখে খুব পচ্ছন্দ করল, তখন সে তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করল।

ভাবল, কি করে মেয়েটাকে পাবে। তখন সে রাস্তায় বসে আছে, এমন সময় একটা শিয়াল এল সেখানে। রাজার বেটা শিয়ালটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। শিয়ালটা তখন বলল, যে তুমি এক কাজ কর। সুন্দর মেয়েটি ফুল তোলার সময় গায়ের কাপড় খুলে রাখে, তুমি সেই সময় কাপড়টা নিয়ে আসবে। তখন মেয়েটি কাপড় নিতে আসবে, সেই সময় তুমি তাকে বিয়ে করতে চাইবে।

তার পরদিন রাজার বেটা গেল সেই বাড়ীর কাছে। যেই মেয়েটা গায়ের কাপড়টা খুলে রেখে ফুল তুলতে গেছে, রাজার বেটা কাপড়টা নিয়ে চলে এলো। মেয়েটিও পিছন পিছন এলো। তখন রাজার বেটা বলল, তুমি যদি আমায় বিয়ে কর, তবে কাপড়টা ফেরৎ দেবো। তখন মেয়েটি রাজী হল। তখন রাজার বেটা মেয়েটিকে বিয়ে করে একটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্যে চলে গেল। বন্ধু শিয়ালকেও সঙ্গে নিল।

কিছু দিন গেল, তখন সেই সোনার পাখীর কথা তার মনে পড়ল। শিয়ালের কাছে তার বৌকে রেখে রাজার বেটা গেল সোনার পাখীর খোঁজে। অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে রাজার বেটা একটা দেশে এসে দেখল, রাজার ঘোড়া-শালে সোনার ঘোড়া। তখন সে ভাবল, কি করে একটা সোনার ঘোড়া পাওয়া যায়। সে আবার সুড়ঙ্গতে ফিরে এল। এসে শিয়ালকে বলল, বন্ধু, কি করে সোনার ঘোড়া পাওয়া যায়? শিয়াল আবার পরমর্শ দিল।

রাজার বেটা শিয়ালের পরামর্শ মত অনেক গাঁজা কিনল। একদিন রাত্রে সেই দেশে গেল, ঘোড়াশালার পাহারাদারদের গাঁজা খাইয়ে বেঁহুস করে দিল। যখন পাহারাদাররা সব বেহুঁস হয়ে আছে, তখন রাজার বেটা একটা সোনার ঘোড়া নিয়ে সেই সুড়ঙ্গতে পালিয়ে এল। আবার কিছুদিন গেল। রাজার বেটা তখন শিয়ালকে বলল, বন্ধু, সবইতো হল, এখন সোনার পাখীটা আমাকে পাইয়ে দাও। শিয়াল তখন একটা দেশের কথা বলে দিল। বলল, ঐ দেশের রাজার একটা সোনার পাখী আছে। কিন্তু তাকে আনা খুব কঠিন। রাজার বেটা আবার শিয়ালের কাছে বুদ্ধি চাইল। শিয়াল আবার বুদ্ধি দিল।

রাজার বেটা আবার সেই বুদ্ধি নিয়ে চলল। সেই সোনার পাখীর দেশে গিয়ে রাজার বেটা শিয়ালের বুদ্ধিমত রাজবাড়ীর পিছন দিকে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন লেগেছে শুনে রাজা, রাণী আর সব লোকজন সেই দিকে ছুটল।

কেবল পাখীটা একলাই রইল। সেই সময় রাজার বেটা পাখীটাকে চুরি করে সুড়ঙ্গ দিয়ে চলে এল।

তারপর কয়েকদিন সুড়ঙ্গে থেকে রাজার বেটা বৌ, সোনার ঘোড়া এবং সোনার পাখী নিয়ে দেশে ফিরতে লাগল। শিয়াল বন্ধুও কিছুটা রাস্তা এল। একটা জায়গায় আসতে শিয়াল বলল, দেখ, এবার আমি ফিরে যাব। কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি,' ঐ যে সামনে একটা পুকুর দেখছ, ওর পাশে কিন্তু তুমি রাত্রে থেকো না; উচু পাহাড়টার উপর থেকো। শিয়াল এই বলে চলে গেল। এদিকে রাত্রি হয়ে গেল। রাজার বেটা ভাবল, কি আর হবে এখানে থাকলে। এখন আর উপরে যাব না। এই মনে করে সে সব নিয়ে পুকুর পাড়ে একটা গাছের তলায় শুয়ে পড়ল। সেই গাছটার উপর রাজার বড় বেটা ও মেজ বেটাও দেশে ফেরার পথে রাত্রে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তারা যখন দেখল, ছোট ভাই সোনার পাখী পেয়েছে, আর তারা কিছু পায়নি, তখন তারা পরামর্শ করল। চুপ করে গাছ থেকে নেমে ছোট ভাইয়ের হাত দুটো বেঁধে পুকুরের জলে ফেলে দিল; তারপর বৌ, ঘোড়া আর পাখী নিয়ে দেশে ফিরে এলো। তারা এসে বাবাকে বলল, তারা ছোট ভাইয়ের কোন খবর জানে না, আর তারা এই সব জয় করে এনেছে।

এদিকে শিয়াল বন্ধু সকাল বেলা রাজার বেটার খবর করতে এসে দেখে তার বন্ধু জলে ভাসছে; সে তখন তাকে তুলে আনল। তার কাছে সব শুনল। তখন বলল, তুমি বাড়ী যাও, তোমার বাবার কাছে সব বলবে। তারপর ঘোড়া দিয়ে প্রমাণ করবে যে তুমিই এদের জয় করেছ। রাজার বেটা দেশে ফিরে গেল, তার বাবাকে সব বলল। তখন রাজা বলল, আমি কি করে বুঝব যে তুমি সত্যি বলছ, না ওরা সত্যি বলছে। তখন ছোট বেটা বলল, আমি প্রমাণ দিতে পারি। তখন রাজা বলল, কি প্রমাণ দেবে। ছোট বেটা তখন বলল, ঘোড়া যার দানা ধরবে, যাকে পিঠে বসতে দেবে, সেই সব জয় করে এনেছে বোঝা যাবে।

রাজা বলল, বেশ। তখন সোনার ঘোড়া আনা হল। তিন বেটা এল। প্রথম বড় বেটা দানা নিয়ে গেল, ঘোড়া দানা ধরল না; পিঠে চড়তে গেল, ঘোড়া নিল না। মেজ বেটা গেল, ঘোড়া তার দানাও ধরল না, তাকেও পিঠে ধরল না। তখন ছোট বেটা দানা নিয়ে গেল। ঘোড়া দানা ধরল। রাজার বেটা সোনার ঘোড়ার পিঠে চড়ল, তারপর আবার

রাজাকেও চড়াল। রাজা তখন বুঝতে পারল, ছোট বেটাই সত্য কথা বলেছে।

তখন রাজা বড় ও মেজ বেটাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিল। ছোট বেটাকে অর্ধেক রাজত্ব দিল। ছোট বেটা সোনার পাখী ও বৌ নিয়ে রাজত্ব করতে লাগল।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬।

মন্তব্য

কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের নিষ্ঠুর আচরণ সকল দেশের লোক কথারই একটি নিতান্ত সাধারণ অভিপ্রায়। ইহার প্রধান কারণ মনস্তত্ত্বমূলক। কনিষ্ঠ সন্তানকে মাতাপিতা যে অতিরিক্ত স্নেহ করেন, তাহা জ্যেষ্ঠদিগের ঈর্ষার কারণ হয়। এই ঈর্ষাই জীবনে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সোনার পাখী এখানে বিস্ময়কর (Marvel) প্রাণী অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

চুনি পাথর

এক রাজার চার ছেলে। রাণী ছোট ছেলেকেই সকলের চেয়ে বেশী ভালবাসিতেন। অন্য তিনটি ছেলে ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাণী ও ছোট রাজকুমারকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। ছোট রাজকুমার অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত হওয়ায় অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির ছিল। একদিন সে মায়ের সঙ্গে স্নান করিতে ঘাটে যাইয়া একটি মাঝিবিহীন নৌকা দেখিতে পাইল। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ সেই নৌকায় উঠিয়া বসিল এবং মাকেও উঠিতে বলিল। 'কাহার নৌকা তাহা না জানিয়া ওঠা ঠিক হইবে না'—এই ভাবিয়া তাহার মা ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকুমার অবিচল, ফলে তিনিও নৌকায় উঠিতে বাধ্য হইলেন।

নৌকা তীরবেগে ছুটিতে লাগিল এবং অনেক নদনদী পার হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িল। ক্রমে নৌকাখানি ঘূর্ণীজলের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেই ঘূর্ণীজলে অসংখ্য বড় বড় লাল পাথর ভাসিতেছিল। রাজপুত্র অনেকগুলি লাল পাথর তুলিয়া নৌকায় রাখিল। কিন্তু রাণী পাথরগুলিকে বহুমূল্যবান্ চুনি দেখিয়া তাহাকে লইতে নিষেধ করিলেন, বলিলেন 'যাহার জিনিস, তিনি জানিতে পারিলে আমাদের চোর বলিয়া ধরিয়া লইবেন।' মায়ের কথায় রাজপুত্র একটি মাত্র পাথর রাখিয়া অবশিষ্টগুলি আবার জলে ফেলিয়া দিল।

কিছুদিন পরে নৌকা এক বন্দরে লাগিল। বন্দরটি ছিল কোন এক রাজার রাজধানী। মা ও ছেলে সেইখানে একটি আশ্রয় খুঁজিয়া লইল। তাহাদের বাড়ীর সামনেই একটা প্রকাণ্ড মাঠ। সেই মাঠে সেই দেশের রাজপুত্রেরা খেলিত। রাজপুত্রদের সঙ্গে ছোট রাজকুমারও খেলিতে লাগিল। মাঠের পাশেই ছিল রাজপ্রাসাদ। একদিন সেই রাজ-প্রাসাদ হইতে রাজকন্যা ছোট রাজকুমারের হাতে লাল চুনিটি দেখিতে পাইল। রাজকন্যা সেই চুনিটি পাইবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া পড়িল। রাজাকে যাইয়া বলিল, ঐ চুনিটি না পাইলে সে প্রাণত্যাগ করিবে। মেয়ের কথা শুনিয়া রাজা ছোট রাজকুমারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সহস্র মুদ্রা দিয়া

পাথরখানি ক্রয় করিয়া কন্যাকে দিলেন। রাজকন্যা পাথরখানি লইয়া মাথায় করিয়া তাহার পোষা পাখীটিকে জিজ্ঞাসা করিল, বল্‌ত পাখী, এই লাল পাথরখানি পরিয়া আমাকে কেমন দেখাইতেছে ?

পাখী উত্তর দিল, ছি, ছি, একখানি চুনি পরার চেয়ে কিছুই না পরা ভাল।

পাখীর কথা শুনিয়া রাজকন্যা খুব দুঃখ পাইল। সে রাজার কাছে যাইয়া কাঁদিয়া বলিল, ঐ রকম আর একটি চুনি না পাইলে সে আত্মহত্যা করিবে।

রাজা বিপদে পড়িয়া সেই রাজপুত্রকে আবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং ঐ রকম আর একখানি চুনির কথা বলিলেন। রাজকুমার বলিল, আমার নিকট আর চুনি নাই, তবে প্রয়োজন হইলে আনিয়া দিতে পারি। রাজা বলিলেন, আর একটি চুনি আনিয়া দিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার পাইবে।

রাজকুমার সম্মত হইয়া মায়ের কাছে যাইয়া সব কথা বলিল। মা ভয় পাইয়া নিষেধ করিলেন। কিন্তু রাজকুমার কাহারও কথা না শুনিয়া নৌকায় চড়িয়া সেই ঘূর্ণীজলের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইল। এবারে সে, যে চুনিগুলি জলে ভাসিতেছিল, তাহা না লইয়া চুনিগুলি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। হঠাৎ সে ঘূর্ণীজলের মধ্য ভাগে একটা প্রকাণ্ড গর্ত দেখিতে পাইল। সেই গর্ত দিয়া সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। রাজকুমার সেই গর্তে ডুব দিল এবং মুহূর্তমধ্যে সমুদ্রের তলায় যাইয়া এক বিরাট রাজপ্রাসাদ দেখিতে পাইল। রাজকুমার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া এক ধ্যানমগ্ন যোগী ও তাঁহার পাশে এক সংজ্ঞাহীন ষোড়শী যুবতীকে দেখিল। সেই যুবতীর মুখ হইতে রক্তস্রোত বহিতেছে এবং সেই রক্ত যোগীপুরুষটির মাথার উপর দিয়া সমুদ্রের জলের সহিত মিশিয়া চুনির আকার হইতেছে। সব দেখিয়া রাজকুমার খুব ভয় পাইয়া গেল। হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল দুইটি কাঠির উপর। কাঠি দুইটির একটি সোনার একটি রূপার, রাজকুমার কাঠি দুইটি হাতে তুলিয়া দেখিতে যাইবার সময় সোনার কাঠিটি রাজকন্যার গায়ে পড়িয়া গেল। কাঠিটি পড়িবামাত্র রাজকন্যার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে রাজকুমারকে দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইল। রাজকুমারকে সাবধান করিয়া দিয়া সে বলিল, যোগীর যদি ধ্যানভঙ্গ হয়, তাহা হইলে বিষম বিপদ হইবে।

রাজকুমার তাড়াতাড়ি কতকগুলি চুনি সংগ্রহ করিয়া সেই রাজকন্যাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন, নৌকা যথাসময়ে বন্দরে পৌঁছাইল। পরদিন সকালে রাজপ্রসাদে যাইয়া রাজকুমার কতকগুলি চুনি রাজাকে উপহার দিল। রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। রাজকন্যাও চুনি পাইয়া খুব খুশী হইল। তারপর একদিন সমারোহ করিয়া উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। রাজকুমার ও তাহার মার আর কোনও দুঃখ রহিল না।

মন্তব্য

মাতাপিতার অত্যাধিক আদরের ফলে কনিষ্ঠ সন্তানদের চরিত্রের মধ্যে যে কয়েকটি দোষ প্রবেশ করে, তাহাই শেষ পর্যন্ত তাহাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এখানে তাহাই হইয়াছে। চুনি পাথর বিস্ময়কর (Marvel) বস্তু অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। সোনার কাঠি রূপার কাঠি রূপকথার সাধারণ অভিপ্রায় মাত্র। ইহা ইন্দ্রজালিক (magical) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত।

দোষীর বিচার

এক রাজার তিন ছেলে। রাজ্যের প্রজাগণ একদিন রাজার কাছে আসিয়া বলিল, 'রাজ্যে চোর ডাকাতের খুব উপদ্রব হইয়াছে।' রাজা ছেলেদের উপর চোর ধরিবার ভার দিলেন। ছেলেরাও পালা করিয়া নগরী পাহারা দিতে লাগিল। ছোট ছেলের যখন পালা, তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। হঠাৎ সে দেখিল, এক শ্বেতবসনা নারী রাজপ্রসাদ হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে মা'? সে বলিল—'আমি রাজলক্ষ্মী, আজ রাত্রে রাজার মৃত্যু হইবে, তাই প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।'

শুনিয়া রাজকুমার তৎক্ষণাৎ রাজার শোবার ঘরে গেল। দেখিল, রাজা ও রাণী উভয়েই ঘুমাইতেছে। রাজকুমার অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর দেখিল, এক বিষধর সাপ রাজার দিকে অগ্রসর হইতেছে, সে তক্ষুণি তরবারি দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিল। এই সময় সাপের এক ফোঁটা রক্ত রাণীর বুকের উপর পড়িল। রাজকুমার তাড়াতাড়ি রক্তবিন্দু জিহ্বা দিয়া চুষিয়া লইল। রাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; সে দেখিল, রাজকুমার ঘর হইতে পালাইয়া যাইতেছে। রাণী ছিলেন বিমাতা ; তাই তিনি রাজাকে বলিলেন, রাজকুমার নিশ্চয়ই কোন অসদভিপ্রায়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল। রাণীর কথায় রাজা বড় ছেলেকে ডাকিয়া বলিলেন, বিশ্বাসঘাতককে কি শাস্তি দেওয়া উচিত ?

ছেলে উত্তর দিল প্রাণদণ্ডই তাহার প্রকৃত শাস্তি। কিন্তু তাহার আগে দেখিয়া নেওয়া উচিত সে প্রকৃতই দোষী কি না। কারণ, মহারাজ, দয়া করিয়া আমার একটি কথা শুনুন।

এক স্বর্ণকারের এক উপযুক্ত ছেলে ছিল। তাহাকে সে উপযুক্ত পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিল। স্বর্ণকারের পুত্রবধূর একটি বিচিত্র ক্ষমতা ছিল, সে জীবজন্তুর ভাষা বুঝিতে পারিত। একদিন রাত্রে সে শুনিল, শেয়ালরা বলিতেছে, 'নদীতে একটি মরা ভাসিতেছে, তাহার আঙ্গুলে একটি মূল্যবান্ হীরার আংটি আছে।' শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি সেই হীরার আংটির লোভে নদীর পারে গেল এবং মড়ার হাত হইতে আংটি খুলিতে গেল। তাহার স্বামীও জাগিয়া ছিল, সে স্ত্রীকে এত রাত্রিতে একটা মড়া

ঘাঁটিতে দেখিয়া ভাবিল, নিশ্চয়ই এ কোনও রাক্ষসী। সে স্বর্ণকারকে যাইয়া সব কথা বলিল এবং উভয়ে মিলিয়া স্থির করিল, কৌশলে উহাকে বনবাস দিবে। তখন স্বর্ণকারপুত্র বৌকে বাবার বাড়ী যাইবার নাম করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিল, কিছুদূর যাইয়া তাহারা সাপের গর্জন শুনিতে পাইল। তখন তাহার স্ত্রী বুঝিল, সাপ বলিতেছে, 'ঐ গর্তে একটা প্রকাণ্ড ভেক আছে। ভেককে আমার কাছে ধরিয়া দিতে পারিলে ঐ গর্তে যত স্বর্ণ ও মূল্যবান্ পাথর আছে সবই তাহার হইবে'। স্বর্ণকারের পুত্রবধূ সাপের কথামত কাজ করিল এবং তাহারা অনেক মূল্যবান্ পাথর ও মুদ্রা পাইল। স্বর্ণকার-পুত্র তখন সব বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, তুমি খিড়কি দুয়ার দিয়া যাও, আমি সদর দিয়া যাইতেছি। তাহার স্ত্রী তাহাই করিল। এই সময় স্বর্ণকার হাতে একটি হাতুড়ি লইয়া কোনও কাজে বাহির হইতেছে। পুত্রবধূকে দেখিয়া ভাবিল, রাক্ষসী নিশ্চয়ই তাহার পুত্রকে হত্যা করিয়া আসিয়াছে। এই ভাবিয়া সে হাতুড়ি দ্বারা পুত্রবধূর মস্তকে এমন আঘাত করিল যে সে ঘটনাস্থলেই মারা গেল। পরে ছেলের কাছে সব শুনিয়া স্বর্ণকারের দুঃখের আর সীমা রহিল না।

তখন রাজা মেজ ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ্বাসঘাতকের কি শাস্তি হওয়া উচিত বলিয়া মনে কর? মেজ ছেলেও বলিল, আগে দেখা উচিত, সে প্রকৃত দোষী কি না!

এই বলিয়া সে বলিল, এক রাজা মৃগয়ায় যাইয়া খুব তৃষ্ণার্ত হইলেন। জলের খোঁজে এদিক ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ দেখিলেন, একটি গাছের শাখা হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিতেছে। রাজা তাড়াতাড়ি একটি পাত্রে সেই জল সংগ্রহ করিলেন। আসলে উহা প্রকৃত জল ছিল না। এই গাছে একটি অজগর সাপ বাস করিত। তাহারই মুখ হইতে বিন্দু বিন্দু বিষ ঝরিতেছিল। রাজা তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহার ঘোড়া বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজা যেই সেই জল পান করিতে যাইবে, অমনি ঘোড়া এক ধাক্কায় সেই পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তৃষ্ণার্ত রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ঘোড়ার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা যখন সব বুঝিতে পারিলেন, তখন যার পর নাই অনুতপ্ত হইলেন।

রাজা ছোট ছেলেকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সেও বলিল, আগে ভাল ভাবে বিবেচনা না করিয়া কাহারও শাস্তিবিধান করা উচিত নয়।

এই বলিয়া সে বলিল, এক রাজার এক শুকপাখী ছিল। পাখীটি ছিল রাজার খুব আদরের। একবার পাখীটি রাজাকে বলিল, আমি একটু কিছুদিনের জন্য মা বাবার সঙ্গে থাকিয়া আসি। রাজা অনিচ্ছা সত্বেও সম্মতি দিলেন। শুক পাখী মা বাবার কাছে কিছুদিন থাকিয়া রাজার কাছে ফিরিবে ঠিক করিল। তখন শুকপাখীর মা রাজার জন্য একটি অমৃত ফল উপহার পাঠাইলেন। পরদিন পাখী ফলটি মুখে করিয়া রাজার কাছে আসিল। পথে একরাত্রি সে একটি গাছের কোটরে ফলটি রাখিয়া এই গাছে রাত কাটাইয়াছিল। সেই কোটরে ছিল একটি সাপ। সে ফলটিকে একবার লেহন করিয়াছিল। রাজা তো ফল পাইয়া খুব খুশী। বিশেষতঃ উহার গুণের কথা শুনিয়া রাজা আরও খুশী হইলেন। পারিষদবর্গ কিন্তু রাজাকে ঐ ফল খাইতে নিষেধ করিলেন। রাজা তখন পরীক্ষা করিবার জন্য একটি কাককে ফলটি খাইতে দিলেন, কাকটি বিষের ক্রিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল, রাজা শুককে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া তখনি মারিয়া ফেলিলেন। এদিকে সেই ফলের বীজে একটি গাছ হইল, রাজা সবাইকে সেই ফল খাইতে নিষেধ করিলেন। ঐ দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিত। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সে ঠিক করিল, এই বিষফল খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। প্রহরীর নিদ্রার সুযোগে সে বাগানে ঢুকিয়া ঐ ফল পাড়িয়া খাইল, তার স্ত্রীও তাহাকে অনুসরণ করিল। কিন্তু মরা তো দূরে থাক্ ঐ ফল খাইয়া তাহাদের দেহে লাবণ্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। রাজা সব শুনিয়া শুকের জন্য শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

সবশেষে রাজকুমার বলিল, আপনি কেন আমাদের তিনজনকে এইরূপ সন্দেহ করিতেছেন, তাহা আমি জানি। সে পূর্বরাত্রের সকল ঘটনা বিস্তারিত বলিল এবং প্রমাণ স্বরূপ সেই সাপের খণ্ডিত দেহ রাজাকে দেখাইল। রাজা তাহার সাহস ও কাজ দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন।

মন্তব্য

কাহিনীটিতে সংস্কৃত কথাসাহিত্য বিশেষতঃ বেতাল পঞ্চবিংশতির প্রভাব আছে। ইহার মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র, বিমাতা ও সতীন পুত্র ইত্যাদি অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। বাক্‌শক্তি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন পশু পক্ষী অভিপ্রায়ও ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে।

হাড় মুড়মুড়ি

এক দেশে এক রাজা ছিল, তার সাত রাণী। রাজার হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ধনজনে ভরা রাজ্য। কিন্তু রাজপুরীতে শান্তি নেই। কারণ রাজা অপুত্রক। একদিন রাজা পুকুর ঘাটে দাঁত মাজছেন, এমন সময় এক ডোমনী এসে হাজির হল। কিন্তু রাজাকে দেখেই সে চোখ ঢেকে বললে, আঁটকুড়া রাজার মুখ দেখলাম, আজ আর আমার কপালে খাওয়া নেই। কথাটা রাজার কানে গেল। রাজা মনের দুঃখে রাজপুরীতে প্রবেশ করে সোনায় পালঙ্কে না বসে কাঠের পালঙ্কে শুয়ে পড়লেন। রাজা খায় না দায় না, খালি মনঃকষ্টে মুখভার করে থাকেন। সাতরাণী এসে রাজাকে দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করল। রাজা ডোমনীর কথা রাণীদের খুলে বললেন। শুনে রাণীদের মনেও দুঃখের বান ডেকে গেল। সমস্ত রাজপুরীতে শোকের ছায়া নেমে এল। এমনি করেই দুঃখের মধ্যে রাজার দিন কাটে। একদিন এক সাধু এসে রাজবাড়ীতে দেখা দিলেন এবং রাণীদের কাছে রাজার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। রাণীরা সব কথা খুলে বলতে সাধু বললেন, রাজাকে ডাক, আমি যা বলব, তা যদি শোনেন, তো রাণীদের ছেলে হবে।

এই কথা শুনে রাণীরা রাজাকে ডেকে নিয়ে এল। তখন সাধু বললে, রাজবাড়ীর পেছনের বাগানে সবচেয়ে বড় যে আম গাছটি তার সব থেকে উঁচু ডালে সাতটি আম আছে। যদি কেউ সেই আম পেড়ে এনে দিতে পারে, তাহলে সেই আম খেয়ে রাণীদের ছেলে হবে। রাজার নির্দেশে লোকজন গেল সেই আম পারতে। কিন্তু একে একে সকলেই ব্যর্থ হ'ল। তখন রাজা রাজ্যময় পুরস্কার ঘোষণা করে ঢেরা পিঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন যে, যদি কেউ ওই আম সাতটি পেরে দিতে পারে, তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। এর পর স্বয়ং ভগবান এক বৃদ্ধের বেশ ধরে এলেন এবং সেই আম পেড়ে দিলেন। রাজা খুশী হয়ে তাকে প্রচুর ধন দৌলত দিয়ে বিদায় দিলেন।

এদিকে প্রথম ছয় রাণী যুক্তি করে ছোট রাণীকে বঞ্চিত করে সাতটা আমই নিজেরা ভাগ করে খেয়ে নিল। ছোট রাণী গিয়েছিলেন সরোবরে স্নান করতে, যাতে পবিত্র হয়ে সেই দৈব ফল খাওয়া যায়। কাজেই অন্য

রাণীদের এই চক্রান্ত সে বিন্দুবিসর্গও টের পেল না। স্নান সেরে ফিরে এসে ছোট রাণী অন্য রাণীদের কাছে আম চাইলেন। রাণীরা বললে, তোর আমটা কাকে নিয়ে গেছে। কি আর করে ছোট রাণী! মনের দুঃখে সে অন্য রাণীদের খাওয়া আমের ছোবড়াগুলো খেয়ে নিল। ছয় রাণী মনের সুখে দিন কাটান। কিন্তু কিছুদিন বাদে একমাত্র ছোট রাণী গর্ভবতী হল। যথা সময়ে রাণীর প্রসব কাল উপস্থিত হল। ছয় রাণী হিংসায় অন্ধ হয়ে গেল।

তারা যুক্তি করে ছোট রাণীকে বলল, রাজবাড়ীর নিয়ম হল প্রসব কালে প্রসূতির চোখ বেঁধে দেওয়া। সুতরাং ছোট রাণীর চোখ বেঁধে দেওয়া হল। এর পর ছোট রাণী এক অপূর্ব সুন্দর রাজকুমারের জন্ম দিলেন। কিন্তু চোখ বাঁধা ছোট রাণীর কাছ থেকে সেই রাজকুমারকে সরিয়ে নিয়ে ছয় রাণী তাকে একটা বনের মধ্যে ফেলে দিল। সেই বনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল একটা কালো কুকুরী। সে সব ব্যাপার দেখল এবং শিশু রাজকুমারকে নিয়ে গিয়ে পালন করতে লাগল।

এদিকে ছয় রাণী রাজাকে ডেকে এনে দেখালো যে ছোট রাণী ঝাঁটা প্রসব করেছে। রাজা রাগে, দুঃখে অপমানে ছোট রাণীকে ঘোড়াশালের দাসী করে দিলেন।

এদিকে কুকুরীর আশ্রয়ে রাজকুমার একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠে। একদিন ছয় রাণী যখন সরোবরে স্নান করছিল, তখন সেই সরোবরের পাড়ে রাজকুমার ও কুকুরীকে দেখতে পেল। রাণীরা সবই বুঝতে পারল। রাজপুরীতে ফিরে এসে রাজবৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে যুক্তি করে সকলেই অসুখের ভান করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। বিছানার নীচে ছিল ভাঙ্গা কলসীর টুকরা। রাণীরা এপাশ ওপাশ করেন আর সেই কলসীর টুকরোগুলো মড়মড় শব্দে ভাঙ্গে। মন্ত্রীর মুখে রাণীদের অসুস্থতার খবর পেয়ে রাজা ছুটে এলেন। পূর্বের চক্রান্ত অনুসারে রাজবৈদ্য বললেন, রাণীদের হাড় মুড়মুড়ি ব্যথা হয়েছে, এর ওষুধ হল কালো কুকুরীর রক্ত। রাজার আদেশ হল কুকুরীকে মেরে রক্ত নিয়ে আসা হোক। কুকুরী সব খবর শুনে তার বান্ধবী কপিলা গাইএর কাছে গিয়ে বলল, রাজার লোকজন আমাকে মেরে ফেলবে। সই, তুমি আমার ছেলেটাকে রেখে দাও।

কপিলা গাই রাজী হল। রাজার লোক কুকুরীকে হত্যা করে রক্ত নিয়ে গেল। কিন্তু রাণীদের মনোবাসনা পূর্ণ হল না। রাণীরা কপিলা গাইএর

কথাও একদিন জানতে পারল। এবারও রাণীদের যথারীতি হাড় মুড়মুড়ি ব্যথা হল এবং দরকার হল কপিলা গাইএর রক্তের। কপিলা গাই সব খবর জানতে পেরে রাজকুমারকে নিয়ে গেল পক্ষীরাজ ঘোড়ার কাছে। পক্ষীরাজ ঘোড়া রাজকুমারকে রেখে দিল। রাণীদের চক্রান্ত এবারও ব্যর্থ হল। পক্ষীরাজ ঘোড়া একদিন রাজকুমারকে বলল, তোমাকে নিয়ে উড়ে একদিন রাত্রে আমি রাজপুরীতে ঢুকব, তুমি রাজভাণ্ডার থেকে কিছু ধনরত্ন নিয়ে আসবে। তার পর তোমাকে নিয়ে বিদেশে চলে যাব। রাজকুমার রাজী হয়ে গেল। সত্যই একদিন নিঃঝুম নিশুতি রাতে পক্ষীরাজ রাজপুত্রকে নিয়ে রাজপুরীতে গেল। রাজপুত্র স্পর্শকরা মাত্র রাজভাণ্ডারের দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে রাজপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়া সেই রাজ্য ছেড়ে চলল। সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তারা এক রাজার দেশে উপস্থিত হল। সেই রাজার একমাত্র মেয়ে রাজকুমারকে দেখে মুগ্ধ হ'ল। রাজা রাজকুমারীর মনের কথা বুঝতে পেরে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে দিয়ে সমস্ত রাজ্য যৌতুক দিলেন। এবার রাজপুত্র একজন লোক পাঠালেন নিজের দেশে। বলে পাঠালেন, রাজপুত্র বিয়ে করে দেশে ফিরছেন। রাজ্যে উৎসবের আয়োজন করা হোক।

সেই লোকটি রাজার কাছে এসে বলল, মহারাজ, একটা কথা আছে। কিন্তু ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব? রাজা বললেন, নির্ভয়েই বল। লোকটি তখন রাজপুত্রের বিয়ের খবর জানালেন। রাজা শুনে তো স্তম্ভিত। তাঁর আবার ছেলে হল কোথা থেকে। এ নিশ্চয় কোন দুষ্ট লোকের কারসাজি। রাজা মজা দেখবার জন্য বললেন, তুমি গিয়ে রাজকুমারকে খবর দাও, আমরা উৎসবের আয়োজন করছি। ছয় রাণী সবই বুঝতে পারল। ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কিন্তু তবুও মুখে সাহসের ভাব দেখিয়ে বললে, মহারাজ, এ নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট ব্যক্তির কাজ।

এদিকে রাজকুমার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে সিঁদুরবরণ রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে এল। এসে বললে, আমার মাকে সবার আগে প্রণাম করব। তাকে খবর পাঠান, মহারাজ! রাজা ছয় রাণীকে রাজসভায় আসতে আদেশ দিলেন। ছয় রাণী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজসভায় এল। রাজপুত্র বললে, এঁরা আমার মা নন। ঘোড়াশালের দাসীই আমার মা। রাজার কাছে ছয় রাণীর সমস্ত চক্রান্তের কথাও জানাল। সব শুনে রাজা যেমন আনন্দিত হলেন, তেমনি

দুঃখিত হলেন ছোট রাণীর ওপর দুর্ব্যবহার করার জন্যে। রাজার আদেশে আবার ছোট রাণীকে রাণী করে নিয়ে আসা হল। আর ছয় রাণীর কুচক্রান্তের জন্যে রাজা তাদের ওপরে কাঁটা নীচে কাঁটা দিয়ে মাটিতে পুতে ফেলার আদেশ দিলেন। এর পর রাজপুত্রকে রাজা করে সমস্ত রাজ্য দান করলেন। রাজ্যে আবার আনন্দের সাড়া জাগল, বাজনা বাজল। ছোট রাণীর আর আনন্দ ধরে না। সিঁদুর বরণ রাজকন্যাকে নিয়ে রাজপুত্র সুখে বাস করতে লাগল।

মন্তব্য

ইহার প্রথম অভিপ্রায় পরিত্যক্ত শিশু (abandoned child)। সর্বত্রই দেখা যায়, কোন না কোন কারণে যে সন্তান জন্ম মুহূর্তেই পরিত্যক্ত হয়, সে পরবর্তী জীবনে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহাভারতের কর্ণ প্রসঙ্গ এই লোক-ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করিয়াই বিকাশ ভাল করিয়াছিল। কালো কুকুর বিষয়টি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। বাংলার লোক-কথায় কালো বিড়াল থাকিলেও, কালো কুকুর নাই—কোন কুকুরই নাই। সুতরাং ইহার উৎপত্তি অনুসন্ধান যোগ্য। সাহায্য করী পশু (helpful animal) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহাতে যে গোহত্যার কথা এবং গরুর রক্তে রাণীর রোগ উপশমের কথা আছে। তাহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পূর্বে গোমাংস আহারের কথাও পাইয়াছি, ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ (Magic touch) ইহার অন্যতম অভিপ্রায়।

দশম অধ্যায়

ভাই-ভগিনীর কথা

পারিবারিক জীবনে ভাই-ভগিনীর সম্পর্কটি বড়ই মধুর। পারিবারিক জীবনের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য একসঙ্গে ইহারা ভোগ করিয়া থাকে, পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ সেবা, শ্রদ্ধা, স্নেহ এবং সহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাহাদের আচার এবং আচরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায়।

কিন্তু ভাই-ভগিনীর সম্পর্কের আরও একটি দিক আছে। শৈশবের সম্পর্কের মধ্য দিয়া যৌবনে উত্তীর্ণ হইয়া যখন তাহারা প্রত্যেকেই যৌন সচেতনতা লাভ করে, তখন তাহাদের মধ্যে একটু জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। লোক-কথায় তাহার নানা প্রতিক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই জটিল অবস্থা সৃষ্টি করিবার পূর্বেই কোন কোন সমাজে ভাই-ভগিনীর মধ্যে জীবনে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হইয়া যায়; কারণ, ভগিনীর বিবাহ হইয়া পরের সংসারে চলিয়া যায়, ভাইও বিবাহ করিয়া জীবনে নূতন সঙ্গিনী লাভ করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কতকগুলি প্রবৃত্তি কাহারও মনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, কোন-না-কোন ভাবে ইহাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই অধ্যায়ের মধ্যে দুই একটি অসাধারণ কাহিনী আছে। তাহাদের মধ্যে দেখা যায়, ভাই ভগিনীকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস খাইয়াছে। ইহার সুগভীর মনস্তত্ত্ব-মূলক কারণ বিশ্লেষণযোগ্য।

কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর সমাজে ভাই-ভগিনীর সম্পর্ক আরও সরল, এতখানি জটিল নহে। ভেরিয়র এলউইন মধ্য ভারত হইতে যে এই বিষয়ক লোক-কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর জটিল কাহিনীর কোন সন্ধান পান নাই। তিনি লিখিয়াছেন,—

Among the aboriginals of Central India relations between brother and sister are of a peculiar tenderness and intimacy. The subject indeed is so interesting that any tale about it is certain of a hearing.'

তারপর তিনি একটি গল্প উদ্ধৃত করিয়া দেখিয়াছেন,—

'The brother and sister loved one another so much that they always ate from the same plate and slept in the same

bed. ......The fact that they cast a sombre light upon it should not be taken to imply that murder and incest are common between brother and sister. I know of no actual case of murder and though examples of incest occur from time to time, they are sufficiently rare to cause a major scandal.' (*Folktales of Mahakoshal*, op. cit. p. 367).

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মধ্যভারতে আদিবাসীর সমাজে প্রচলিত কাহিনীতেও ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক বিষয়ক দুই শ্রেণীর গল্প পাওয়া যায়, একশ্রেণীর গল্পে ভগ্নী-হত্যা ও অপর শ্রেণীর কাহিনীতে অজাচারের (incest) বৃত্তান্ত শুনা যায়।

বাংলার লোক-কথায়ও একদিক দিয়া যেমন ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্কের মাধুর্য এবং পবিত্রতা রক্ষা করিবার কথা আছে, তেমনই আর একদিক দিয়া তাহাকে বধ করিয়া তাহার মাংস আহার করিবার মত নিষ্ঠুরতার কথাও আছে। অগ্রসর সমাজে পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে যে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, অনগ্রসর সমাজে তাহা তত হইতে পারে না। তবে লোক-কথার মধ্যে সমাজ-জীবনের অবচেতন এবং অচেতন-লোকের ক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া আমাদের সংস্কার-বিরুদ্ধ অনেক আচার-আচরণই তাহাতে প্রকাশ পায়। সেইজন্য এই বিষয়ে আদিবাসী সমাজের কাহিনীতে এবং বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীতে কোন পার্থক্য থাকে না। যে কাহিনীতে ভগ্নীর মাংস খাইবার কথা আছে, তাহার সঙ্গে মধ্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী আদিবাসী সমাজের কাহিনীর সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। এই প্রকার বীভৎস কাহিনী পশ্চিমবাংলা হইতে ছোটনাগপুর এবং এমনকি মধ্যভারত পর্যন্ত কি ভাবে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহা বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার যোগ্য।

১

বেণুবতী

এক রাজা। তার চারি পুত্র এক কন্যা। কন্যার নাম বেণুমতী। রাজা-রাণী কন্যাকে বড়ই স্নেহ করেন, ছেলেদের চেয়েও মেয়েদের আদর ও যত্ন খুব বেশী। বেণুবতী পরমা সুন্দরী। চারি ভাই বাপ মা সকলেরই সে আদরের ধন। বেণুর যেমন রূপ, স্বভাবও তেমনি সুন্দর। সে ভাইদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া শিকারে যায়, খেলা করে, লেখাপড়ার চর্চা করে। এক কথায় রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। মানুষের চিরদিন সমান যায় না। রাজারাণী চারি ছেলে, ছেলের বৌ ও মেয়ে লইয়া পরমসুখে কাল কাটাইতেছিলেন ; কিন্তু বিধাতার এত সুখ সহিল না। এক দিন রাজা মৃগয়ায় যাইয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজার শোকে রাণীও অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেলেন। এ ঘটনাগুলি ঝড়ের মত দ্রুতবেগে ঘটিয়া গেল।

রাজবাড়ীতে লোকজন দাস-দাসী চাকর-চাকরাণীর অভাব নাই ; তবু কিন্তু বেণুর আর সে সুখ, সে আনন্দ নাই। পিতামাতার মৃত্যুতে বেণুর মুখের হাসি লোপ পাইয়াছে, পূর্বের মত তাহার আর সে হাসিখুসি আমোদ-প্রমোদ কিছুই নাই। সে মনের দুঃখে দিন কাটায়। এদিকে বড় রাজপুত্র রাজা হইলেন, আর ছোট তিন ভাই যুবরাজ হইয়া নানা স্থানে যাইতে লাগিলেন। একবার চারি ভাই একত্রে মৃগয়া করিতে গেলেন, বেণুবতী বধূগণের সহিত রাজপুরীতে রহিল।

বেণুর এক সই ছিল, তার নাম রূপমতী। রূপমতী এক বণিকের স্ত্রী। বণিকের ধন দৌলত ও ঐশ্বর্যের অভাব নাই। রূপমতী তার মেয়ের বিয়েতে সই বেণুবতীকে নিমন্ত্রণ করিল। বেণুবতীকে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ তাহার পরিবার একটি ভাল বারাণসী শাড়ী পরাইয়া সাজাইয়া বলিলেন, 'বেণুবতী, সাবধান ! যদি আমার এ কাপড়ে এক তিলও ময়লা লাগে তা'হলে তোমার রক্ষা নাই।' বেণুবতী সইর বাড়ী যাইয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিল এবং সকলকে বলিতে লাগিল, 'আমার কাপড়ে যেন ময়লা না লাগে, তোমরা সেদিকে একটু নজর রেখো। যদি ময়লা লাগে, তবে আমার রক্ষা নাই।' বেণুবতীর এমন ভয়ের কথা শুনিয়া একটি ছোট মেয়ে দুষ্টুমি করিয়া একটি খড়্কায় করিয়া বেণুর কাপড়ে খানিকটা চুণ লাগাইয়া দিল। বেণুবতী ইহার কিছুই জানিল না।

সে বাড়ী ফিরিয়া অন্য কাপড় পরিয়া বড় বৌর শাড়ীখানা তাহাকে ফিরাইয়া দিল। বড় বৌর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র দাগটিও এড়াইল না, কাপড়ের সে দাগ যেমন দেখা, অমনি সে তর্জন গর্জন করিয়া বেণুবতীকে প্রহার করিতে লাগিল। বেণু কত কাঁদিল, কত মিনতি করিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না। বড় তিন বৌ একত্র হইয়া বেণুবতীকে প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিল এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুটিয়া মাংসগুলি একটা নির্জন স্থানে ফেলিয়া দিল। ফেলিয়া দেওয়ার কিছুকাল পরে সে স্থানে একটী ঝুমকা লতার গাছ হইল। গাছটি সবুজ পাতায় রাশি রাশি ফুলে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

বেণুবতীর মাসীমা অনেক দিন পরে রাজবাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া বেণুর মৃত্যুর সংবাদ শুনিলেন। হায়! হায়! অনাথা মেয়েটি। বেণুর মাসীমা বেণুর জন্য শোক প্রকাশ করিতে করিতে রাজোদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের এক পাশে ঐ ঝুমকা লতার গাছটি দেখিতে পাইলেন। সুন্দর ফুলগুলি দেখিয়া যেমন তিনি ফুল তুলিতে হাত বাড়াইয়া গেলেন, অমনি গাছটি বলিয়া উঠিল.—

> ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না মোরে আমি ঝুম্‌কা লতা।
> রাজকন্যা বেণুবতী সহি মর্ম-ব্যথা॥
> কাপড়ে লাগিল চুণ হৈল প্রাণনাশ।
> বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

মাসীমা বৌদের কাছে ঝুম্‌কা লতার এই আশ্চর্য কথা বলিলেন, তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিল এবং ঝুমকা লতার সে গাছটিকে কাটিয়া ফেলিল। কিন্তু আবার ঠিক সেই জায়গায় একটি ডালিম গাছ হইল এবং দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গাছে খুব বড় বড় ডালিম ফলিল। পিসীমা বেণুর জন্য খুব কাঁদিলেন, হায়! হায়! পিতৃ-মাতৃহীনা মেয়েটি, তার অদৃষ্টে এই ঘটিল! পিসীমাও একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ডালিমতলার নিকট আসিলেন। বড় বড় লাল টুকটুকে ডালিম ছিঁড়িবার জন্য যেমনি হাত বাড়াইয়াছেন, অমনি মানুষের ন্যায় গাছটি বলিয়া উঠিল—

> ছুঁয়ো না গো, পিসীমা, আমি বেণুবতী,
> কর্মদোষে গাছের বেশে কাটাই দিবারাতি।
> কাপড়ে লাগিল চুন কৈল প্রাণনাশ।
> বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

পিসীমাও আশ্চর্য হইয়া বৌদের কাছে এ গল্প বলিলেন। আগের মত এবারও তাহারা কথাগুলি হাসিয়া উড়াইয়া দিল। নানা মিথ্যা ছলে ভুলাইয়া পরদিনই তাহারা পিসীমাকে বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিল। আর বড় বৌ তাড়াতাড়ি গাছটা কাটিয়া ফেলিল। ডালিম গাছটার জায়গায় এবার জন্মিল একটা মরিচ গাছ। এবার মাসী বেড়াইতে আসিলেন। বেণুর মাসী বেণুর জন্য নানা ছাঁদে কথায় ফাঁদে বিনাইয়া বিনাইয়া কত কাঁদিলেন। হায়! হায়! অনাথা অভাগা মেয়েটি ফুলের মত অকালে ঝরিয়া গেল, কি দুঃখ! কি কষ্ট! মাসী পিসীর মত বেণুর মামীও একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানের সেই মরিচ গাছটি দেখিতে পাইলেন। খুব বড় বড় মরিচ ফলিয়াছে। বেণুর মামী কয়েকটি মরিচ ছিঁড়িবার জন্য যেমনি হাত বাড়াইয়াছেন, অমনি গাছটি বলিয়া উঠিল,

কি কর! কি কর, মামী, আমি বেণুবতী।
মা নাই বাপ নাই বলে আমর দুর্গতি॥
কাপড়ে লাগিল চুণ কৈল প্রাণনাশ।
বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

মামী চলিয়া গেলে আবার তিন বৌ মিলিয়া ঐ গাছটি কাটিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিল। সে পুকুরে একটি অতি সুন্দর লাল পদ্ম ফুটিয়া রহিল। কিছু দিন পরে বেণুর মাতুল আসিলেন এবং ঐ পুকুরে স্নান করিতে যাইয়া ঐ সুন্দর পদ্ম ফুলটি দেখিয়া উহা ধরিবার জন্য যেমন হাত বাড়াইয়াছেন, অমনি ফুলটি বলিয়া উঠিল,—

ছুঁয়ো না, ছিঁড়ো না, মামা, আমি বেণুবতী।
ভাই সব দেশে নাই তাই এ দুর্গতি,
কাপড়ে লাগিল চুণ কৈল প্রাণনাশ।
বিধি বাম হৈল তাই মোর সর্বনাশ॥

মামা বধূদের নিকট ফুলের এ আশ্চর্য গল্প বলিলেন এবং বেণুর জন্য আক্ষেপ করিয়া দেশে চলিয়া গেলেন।

এক বৎসর পরে রাজপুত্রগণ নানা দেশেবিদেশ ঘুরিয়া মৃগয়া করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানীতে আনন্দ-লহরী ছুটিয়া চলিল। বাড়ী আসিয়াই ভাইরা সকলে বেণুর খোঁজ করিলেন। তিন বৌ বলিল, কি বল্‌বো গো, কি বল্‌বো! হঠাৎ মাথার বেদনায় বেণু মারা গেল। রাজপুত্রেরা

বলিলেন, মন্ত্রীকে কেন খবর দেওয়া হইল না? রাজ-বৈদ্য কেন আসিল না? বেণুর কথা লইয়া মহা তোলপাড় পড়িয়া গেল। হাঁক ডাক ধূমধাম, বেণু কেমন করিয়া মরিল! ছোট রাজপুত্রের বৌটি খুব ভাল ছিল, সে বেণুকে ভালবাসিত; কিন্তু জায়েদের ভয়ে সব কথা এতদিন চাপিয়া গিয়াছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া ছোট রাজপুত্রের কাছে গোপনে সব কথা বলিয়া দিল। এদিকে বড় তিন বৌ বিপদ বুঝিয়া তাড়াতাড়ি পুকুর হইতে পদ্মটি লইয়া আসিলেন এবং পাপড়িগুলি ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। যেমন মাটিতে ফেলা, অমনি সেখান হইতে একটি টিয়া পাখী উড়িয়া পলাইল।

একদিন চার ভাই এক জায়গায় বসিয়া আহার করিতেছেন। এমন সময় সেখানে ছাতের এক পাশে একটা টিয়া পাখী উড়িয়া আসিল এবং বলিতে লাগিল,

আসিয়াছ চারি ভাই সুখে কর বাস।
অভাগিনী বেণুবতীর পাখীর দেহে বাস॥
রাজার নন্দিনী আমি রাজার ভগিনী।
কত দুঃখ পাইলাম আমি অভাগিনী॥

পাখীর কথা শুনিয়া রাজপুত্রগণ চমকিয়া উঠিলেন। পাখী এ কি বলিতেছে? ছোট রাজপুত্র তাড়াতাড়ি ভাত ফেলিয়া ছাতে উঠিয়া পাখীটি ধরিতে গেলেন এবং ধরিবার জন্য হাত বাড়াইবা মাত্র আপনা হইতেই পাখীটি আসিয়া তাহার হাতে বসিল। ছোট রাজপুত্র পাখীটিকে লইয়া যাইয়া ছোট বৌর হাতে দিলেন। ছোট বৌ তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া পরিষ্কার সুবাসিত জলে পাখীটিকে স্নান করাইয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা যেমন তাহার গা মুছাইয়া দিবেন, অমনি কোথায় গেল পাখী? ছোট বৌ দেখিলেন রূপে ঢল ঢল সোনার কমল, বেণুবতী তাহার সামনে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। বেণুবতী ছোট বৌর ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাদাদের প্রণাম করিল। সকলে আনন্দে অধীর। দেশশুদ্ধ লোক চমৎকৃত। বৃদ্ধ মন্ত্রী দেখিয়া সব কথা শুনিয়া অবাক্। কি আশ্চর্য! এত আশ্চর্য ঘটনা, সে তাহার কিছুই শোনে নাই। বেণুবতী ভাইদের কাছে একে একে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সব কথা বলিল। তাহার কথা শুনা মাত্রই সেই রাক্ষসী তিন বৌকে রাজপুত্রেরা বনবাস দিলেন, চারিভাই ও বেণুবতী মহাসুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

ছোট বৌ বেণুকে ছোট বোনটির মতই যত্ন করিতেন, ভাইরা আর বেণুকে চোখের আড়ালে করেন না। বড় তিন ভাই আবার তিন সুন্দরী ও গুণবতী

রাজকন্যা বিবাহ করিলেন। আর এদিকে রূপবান ও গুণবান মন্ত্রীপুত্রের সহিত গুণবতী বেণুবতীর বিবাহ হইল। চারি ভাই স্নেহের ছোট বোনটিকে ধন-রত্ন, দাস-দাসী কত যে যৌতুক দিলেন সে কি আর বর্ণনা করা যায়! দারুণ কালো মেঘ কাটিয়া সুখের পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া উঠিল। বেণুর সুখে রাজ্যের ছোট বড় সকলে সুখী হইল।

—ঢাকা, 'বিক্রমপুর' (১৩২০)

মন্তব্য

রূপান্তর (Transformation) ইহার মূল অভিপ্রায়। মাটিতে প্রোথিত মৃতের হাড়-মাংস হইতে লতা ও ফুলের জন্ম-বৃত্তান্ত বহু কাহিনীতেই শুনিতে পাওয়া যায়। সাতভাই চম্পার কাহিনীটিও ইহার কতকটা অনুরূপ। পাখীর মধ্যে মানুষের প্রাণের সঞ্চারের কথাও বহু লোক-কথায় শুনিতে পাওয়া যায়।

২

টেপাই

এক মস্ত বড় সওদাগর। সওদাগরের সাত পুত্র, এক কন্যা। কন্যার নাম টেপাই। টেপাই বড় আদুরে মেয়ে। বাপ-মা সকলেই তার আব্দার পালন করেন। পূর্ণিমার সন্ধ্যা, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছে, চাঁদ দেখিয়া টেপাই বাপকে চাঁদ পাড়িয়া দিবার জন্য বায়না ধরিয়া বসিল বাপ। বলিলেন, 'মা লক্ষ্মী! একি সম্ভব? আকাশের চাঁদ কি ধরা যায়? সে যে অনেক দূর।' কিন্তু টেপাই নাছোড়বান্দা, কাঁদিয়া আকুল, শুধু ঐ এক আব্দারের কথা, 'বাবা, যে করে হোক, আমাকে চাঁদ পেড়ে দাও।' সওদাগর স্নেহময়ী কন্যার কান্না দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বাড়ীর তেতলায় ছাতের উপরে একটা সিঁড়ি লাগাইয়া তাহার উপর হইতে একটা আঁকুশি দিয়া চাঁদ পাড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হঠাৎ সিঁড়ির উপর হইতে তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল, সেখান হইতে নীচে পড়া মাত্রই তাঁহার মৃত্যু হইল। বাপ মারা গেল, তবু কিন্তু টেপাইর চাঁদ পাইবার বায়না কমিল না।

সে এবার মাকে ধরিয়া বসিল, 'মা, আমায় চাঁদ দাও।' বাপের মত মাও টেপাইর আব্দার পুরাইতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। স্নেহময় পিতা স্নেহময়ী মাতা টেপাইর নিজের দোষে অকালে প্রাণ হারাইলেন।

এখন টেপাইর বড় কষ্ট। এখন আর আগের মত আদর যত্ন কে করিবে? তাহার শরীরের সে শ্রী নাই, মুখের সে হাসি নাই, সে আদর আব্দার কিছু নাই। সাত ভাইর সাত বৌ। বড় ছয় বৌর কেহই টেপাইকে দু'চোখে দেখিতে পারে না। কেবল সকলের ছোট ভাইর স্ত্রী গোপনে গোপনে আদরিণী ননদার আদর যত্ন করিতেন। সাত ভাই বোনটিকে খুব যত্ন করিতেন ও ভালবাসিতেন; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তাঁহারা সকলেই বাণিজ্য করিতে নানা দেশে চলিয়া গেলেন। টেপাই এখন সর্বদাই বিষণ্ণ থাকে, ক্ষুধায় আকুল হইলেও সে ভয়ে ভয়ে পেট ভরিয়া খায় না; এখন তাহার রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ দেখিলে আর পূর্বের শ্রী বুঝিবার সাধ্য নাই। এদিকে ভাইরা সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের বাণিজ্য হইতে ফিরিতে আরও এক বৎসর সময় লাগিবে। এ সংবাদে বড় ছয় বৌয়ের বড়ই আনন্দ হইল, কেমন করিয়া টেপাইকে দূর করিতে পারিবেন সে সুযোগের চেষ্টায় রহিলেন। কেবল টেপাইর ছোট বৌ ঠাকুরাণী সকলের আসিবার দিন গণিতে লাগিলেন।

বাহিরে কুভাব দেখাইলে পাছে টেপাই মনের ভাব বুঝিতে পারে, এজন্ত বড় ছয় বৌ বাহ্যিক ভাবে তাহার প্রতি বড়ই মধুর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনে মনে তাঁহারা একটা উপায় ঠিক করিলেন। টেপাই সহ তাঁহারা একদিন নদীতে স্নান করিতে চলিলেন। ছয় বৌ ছয় পাল্কীতে আর টেপাই ও ছোট বৌ এক পাল্কীতে চড়িয়া রওয়ানা হইলেন।

দাসীরা কাপড় চোপড় লইয়া হাঁটিয়া চলিল, ছোট বৌ কাপড়ের সঙ্গে লুকাইয়া একটা ছোট বালিশ সঙ্গে লইলেন। টেপাই একটি টিয়া পাখীকে পালন করিত, সে তাহার বড় আদরের টিয়াপাখীটিকেও সঙ্গে লইতে ছাড়িল না। বড় নদী। ওপারের গাছপালাগুলি ভাল করিয়া চেনা যায় না। নদী ঢেউ তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরের দিকে বহিয়া চলিয়াছে। পাল তুলিয়া পালে পালে নৌকা দেশ বিদেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর জলে ছয় বৌ স্নান করিতে লাগিলেন। ছোট বৌ নদীর ঘাটে বসিয়া ননদার গায়ের মলা তুলিয়া দিতেছিলেন। এমন সময় বড় বৌ টেপাইকে বলিলেন, 'আয় না, বোন, তোকে সাঁতার কাটিতে শেখাই।'

টেপাই আনন্দে হাসিতে হাসিতে বড় বৌর নিকটে আসিল, বড় বৌ সাঁতার শিখাইবার ছল করিয়া ননদকে গভীর জলে ঠেলিয়া দিলেন এবং কুমীরে টেপাইকে ধরিয়া লইয়া গেল বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে সকলকে লইয়া তীরে উঠিলেন। ছোট বৌ ব্যাপার কি বুঝিয়াও ভয়ে ভয়ে নীরবে রহিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, টেপাইকে কুমীরে লইয়া গিয়াছে।

টেপাইকে জল হইতে ফিরিতে না দেখিয়া ছোট বৌ তাহার বালিশটি এবং টিয়া পাখীটিকে জলে ফেলিয়া দিয়া গেলেন। এদিকে টেপাই অতি কষ্টে নদীর অপর পারে যাইয়া উঠিল। সে বালিশটি ও টিয়া পাখীটিকেও কোন রকমে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিল। তীরে উঠিয়া শীতে তাহার সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। এখন তাহার বাপ, মা, ভাই সকলের কথা মনে পড়িয়া বড়ই কান্না আসিল। একে একে তাহার ঘরবাড়ী ছোট বৌ সকলের কথা মনে পড়িল; তাহাদের কথা মনে হইয়া তাহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইল। টেপাই একাকিনী টিয়া পাখীটিকে হাতে করিয়া ও বালিশটিকে বুকে করিয়া নির্জন নদীর তীরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। রাখাল বালকগণ দলে দলে ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে।

বিজন নদীতীরে একটা সুন্দরী বালিকাকে একাকিনী কাঁদিতে দেখিয়া তাহারা একে একে সেখানে আসিয়া মিলিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল কেন সে একাকিনী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে? তাহারা একে একে বিবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। টেপাই আদ্যোপান্ত যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বলিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হায়! হায়! করিতে লাগিল। রাখাল বালকেরা তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজেদের বাড়ীতে লইয়া আসিল। টেপাই কৃষকদের বাড়ীতে অতি আদর ও যত্নের সহিত গৃহীত হইল।

ছেলেরা তাহাকে বোনের মত এবং কৃষক ও কৃষক-পত্নীরা আপন বাপ-মায়ের মত যত্ন করিতে লাগিল। টেপাই কৃষকদের আদরে যত্নে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। সামান্য নিরক্ষর কৃষকপল্লীতে যে স্নেহ যত্ন পাইল, তাহার ভ্রাতৃবধূদের নিকট হইতেও সে তাহা পায় নাই। সে এখন হৃদয়কে দমন করিতে শিখিয়াছে; বুঝিয়াছে, সংসারে সুখদুঃখ কখনও স্থায়ী হয় না। এক দিন নিশ্চয়ই তাহার এই দুঃখের অবসান হইবে।

এক বৎসরের অধিক হইল, টেপাই কৃষক-পল্লীতে বাস করিতেছে। বর্ষাকাল। একদিন সন্ধ্যা হইতেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টেপাই কুটীরের দরজাখানি বন্ধ করিয়া ঘরের এক কোণে আগুন জ্বালিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল, হায়! এমন ভীষণ ঝড়ে যদি আমার দাদাদের কোন অনিষ্ট ঘটে। যদি তাঁহারা কোন দেশ হইতে রওয়ানা হইয়া থাকেন। আর কি আমি তাঁহাদেরে দেখিতে পারিব? ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, ঝড়-জলও একটু কমিল। আকাশও পরিষ্কার হইল। টেপাইর চোখে ঘুম নাই, তাহার মন আজ প্রবাসী ভাইদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

এদিকে সেই নদীর তীরে ঠিক ঝড়জলের সময় সাতখানা বাণিজ্য-তরী নোঙ্গর করিয়া ছিল। বাণিজ্য-তরীর কর্তাগণ ঝড়জলের প্রকোপে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ঝড় জল কমিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা ভৃত্যদের ডাকিয়া বলিলেন, 'আজ এ পর্যন্ত একটি দানাও দাঁতে কাটিবার অবসর জোটে নাই। এখন ঝড়জল কমিয়াছে, ঐ দূরে একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ঐ দেখ একটা আলোও দেখা যাইতেছে, নিশ্চয় ও কৃষক-পল্লী। যাও, ওখান হইতে খাবার জিনিসপত্র জোগাড় করিয়া নিয়া এস।' ভৃত্য 'যে আজ্ঞে' বলিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। টেপাই কি করিবে! দুর্ভাবনায় অস্থির হইয়া

সবে মাত্র বিছানায় শুইয়াছে। এমন সময় তাহার প্রিয় টিয়াপাখীটি বলিয়া উঠিল,

গা তোল গা তোল টেপাই,
ভাত বাড়, এল সাত ভাই।

টেপাই বলিল—

অভাগা অভাগা টিয়া
ঘন ঘন ডাকিস্ কিয়া ?
বাপ মরিল চাঁদ পাড়িতে,
মা মরিল চাঁদ ধরিতে,
সাত ভাই বাণিজ্যে গেল।
সাত বৌ ঘরবাসী,
আমি অভাগী বনবাসী।

এদিকে ঐ যে সওদাগরের ভৃত্য, সে কুটীরের নিকট দাঁড়াইয়া পাখীর ও মানুষের এই সমুদয় কথা শুনিতেছিল। সে অবাক হইয়া সমুদয় কথা সওদাগরের নিকট যাইয়া বলিল, সাত ভাই এ কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, আমাদের বাপ মা ঐ ভাবে মরিয়াছেন। আমরা সাত ভাই বাণিজ্যে আসিয়াছি, নিশ্চয়ই সাত বৌ আমাদের আদরের ছোট বোনকে কোনরূপ নির্যাতন করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। সাত ভাই তখনি সেই চাকরকে সঙ্গে লইয়া কুটীরের দিকে দৌড়িয়া চলিলেন এবং কুটীরের নিকট গিয়া সাত ভাই সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কুটীরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। টেপাই সাত ভাইকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া হর্ষ-বিষাদে বিহ্বল হইয়া পড়িল। সাত ভাই আদরের ছোট বোনটির চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়া একে একে সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন।

রাত্রি ভোর হইলে কৃষকদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি পারিতোষিক দিয়া ভগ্নীকে সহ দেশে গেলেন। সাত ভাই বাড়ী পঁহুছা মাত্রই ছয় বৌ টেপাইর নামোচ্চারণ করিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন যে, টেপাই রাজরাণীর মত বহু মূল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সাত ভাইর সহিত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। ভৃত্যগণ বহু ধন-রত্ন নৌকা হইতে তুলিয়া আনিতেছে।

তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহাদের কৃত্রিম কান্না ফুরাইয়া গেল। টেপাই বাড়ীতে পৌছিয়াই ছোট বৌদির গলা জড়াইয়া

ধরিল, বড় ছয় বৌকে বড় ছয় ভাই বনবাসে দিলেন। টেপাই বৌদিদের ক্ষমা করিবার জন্য ভাইদের অনুরোধ করিল; কিন্তু তাঁহারা তাহা শুনিলেন না, বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী লইয়া তাঁহারা ঘর-সংসার করিতে সম্মত হইলেন না। এ দিকে নানা দেশ বিদেশে খোঁজ করিয়া খুব বড় এক সওদাগরের বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও রূপবান্ পুত্রের সহিত টেপাইর বিবাহ দিলেন। ভাইরা ভগ্নীকে বহু ধনরত্ন দাসদাসী যৌতুক দিলেন। টেপাই শ্বশুরবাড়ী যাইয়া স্বভাবগুণে সকলের মনোহরণ করিল। ছয় ভাইও সুশীলা পত্নীর পাণি-গ্রহণ করিয়া সুখী হইলেন। চারিদিকে ছোট বৌর সুনাম রটিল।

—ঢাকা, 'বিক্রমপুর পত্রিকা', ১৩২০

মন্তব্য

প্রথমেই ইহাতে ছোট বৌ অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর ঈর্ষাপরায়ণা ভাজ (jealous sister-in-law) অভিপ্রায়টি ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পশু ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। দুষ্কর্মের শাস্তি (misdeed punished) যথারীতি ইহার শেষ অভিপ্রায়। শিশুকন্যার আব্দার পালন করিতে আকাশ হইতে চাঁদ পাড়িতে গিয়া পিতার আকস্মিক মৃত্যু কাহিনীটিকে প্রথম হইতেই করুণ করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি, শেষ পর্যন্ত যে মিলনের কথা আছে, তাহার মধ্য হইতেও পিতার মৃত্যুর কারুণ্য দূর হইতে পারে নাই। লোক-কথা সাধারণতঃ এই প্রকার করুণরসাত্মক হইতে দেখা যায় না, তবে মিলনের কথা দিয়া ইহা শেষ হইয়া ইহার লোক-কথার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছে।

৩

সাদা ঘোড়া

এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজার তিন ছেলে এক মেয়ে। তিন ছেলেতে খুব বন্ধুত্ব। মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গেও তাঁহাদের খুব ভাব, একমাত্র বোনকে লইয়া তাহাদের আনন্দের সীমা নাই। তাহারা সব সময়েই বোনকে লইয়া খেলিত। একদিন তাহারা পাঁচজনে সমুদ্রের তীরে খেলা করিতেছিল, এমন সময় একটা ঘোড়া আসিয়া মেয়েটির কাছে দাঁড়াইল। ঘোড়াটি কোন উৎপাত করিতেছে না দেখিয়া মেয়েটি সাহস করিয়া তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়াটিও সুযোগ পাইয়া দৌড়াইতে লাগিল। অনেক চীৎকার করিয়াও কোন ফল হইল না। ভাইয়েরা কিছু বুঝিবার পূর্বেই ঘোড়াটি অদৃশ্য হইয়া গেল। অনেক অন্বেষণ করিয়া ক্লান্তদেহে বিষণ্ণ মনে তিন ভাই ও মন্ত্রীর ছেলে ফিরিয়া আসিল।

রাজা সেই খবর পাইবা মাত্র, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, মেয়ের সন্ধান না পাইলে তিনি কাহারও মুখদর্শন করিবেন না।

ছেলেরা তখনই আবার বোনের খোঁজে বাহির হইল। সব শুনিয়া তাহাদের মাও সঙ্গ নিলেন। মন্ত্রিপুত্রও তাহাদের দলে যোগ দিল।

পাঁচজন দিবারাত্র ক্রমাগত চলিতে লাগিল। পথের মধ্যে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহুদিন কাটিয়া গেল। ছোট ছেলেটি আর পথ চলিতে পারে না। তখন সকলে মিলিয়া তাহার জন্য ঐখানেই একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিল এবং অবশিষ্ট চারজন আবার রওয়ানা দিল। আরও কিছুদিন পরে মেজ ছেলেরও ঐরূপ অবস্থা হইল। তাহাকে সেইখানেই রাখিয়া বাকি তিনজন অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাণীরও শরীর ভাঙ্গিতে শুরু করিল। মন্ত্রিপুত্রও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বড় ছেলেটি মন্ত্রিপুত্রের জন্য একটি কুটির নির্মাণ করিয়া দিয়া মাকে লইয়া রওয়ানা দিল। কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই রাণী আর যাইতে পারিলেন না। পথের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ছেলে তখন মায়ের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া আবার বোনের খোঁজে বাহির হইল।

একদিন রাজপুত্র বনের মধ্যে এক নির্জন স্থানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় একটা সাদা ঘোড়া তাহার কাছে আসিল। ঘোড়া দেখিয়া আনন্দিত হইয়া সে

ঘোড়াটিকে ধরিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। হতাশ হইয়া সে এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া বসিল। সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্রমে থাকিয়াই ঘোড়ার সন্ধান করিতে বলিলেন এবং বলিলেন, যেখানে ঐ ঘোড়াকে দেখা যাইবে, সেইখানেই তাহার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রাজপুত্র প্রায় মাসখানেক নানা দেশ, উপদেশ, নগর, প্রান্তর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে এক নির্জন প্রান্তরে ঘোড়াকে দেখিতে পাইল। ঘোড়াকে দেখিতে পাইয়া রাজপুত্র সেইখানে বিরাট প্রাসাদ তৈয়ারী করিল এবং অল্পকালের মধ্যেই নানা দেশ হইতে অনেক লোক সেইখানে বসতি স্থাপন করিল।

কিছুদিন পর হঠাৎ এক রাক্ষস আসিয়া এই নূতন রাজ্য ধ্বংস করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাজকুমার তখনই সসৈন্যে রাক্ষসকে আক্রমণ করিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাকে ধ্বংস করিলেন। রাক্ষসের মৃতদেহ লইয়া সে কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে সহসা দৈববাণী হইল, রাক্ষসের দন্তগুলি মাঠে পুঁতিয়া দাও, তাহা হইতে দুর্ধর্ষ সৈন্য উৎপন্ন হইবে। তাহারা গ্রামে তোমার বিরুদ্ধাচারণ করিবে; কিন্তু কৌশলে তুমি তাহাদের হারাইবে এবং অবশিষ্ট সৈন্য দ্বারা তোমার রাজ্য সুরক্ষিত হইবে। রাজপুত্র তাহাই করিল। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য উৎপন্ন হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, রাজকুমার একখানি প্রকাণ্ড পাথর সকলের অজ্ঞাতসারে সৈন্যদলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাহারা ভাবিল, বুঝি তাহাদেরই পশ্চাদ্‌বর্তী সৈন্যগণ এই পাথর ফেলিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। পাঁচজন ব্যতীত সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হইল। সহসা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল, এই অবশিষ্ট সৈন্যদের রক্ষা কর, ইহারা তোমার রাজ্য রক্ষা করিবে। রাজপুত্র তখন মিষ্টকথায় তাহাদের তুষ্ট করিয়া বশ করিলেন। এদিকে রাজকুমারের পিতা দুই বছর কাহারও কোন খোঁজ না পাইয়া একদিন গোপনে রাজ্যত্যাগ করিলেন। পথে পথে পুত্রকন্যাদের সন্ধান লইতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি তাহার বড় ছেলের রাজ্যের খবর পাইলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি ছেলের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলের মুখে স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাজা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক মাসের মধ্যে তিনিও মারা গেলেন। বাবার শ্রাদ্ধাদি শেষ করিয়া রাজকুমার আবার লোকজন সঙ্গে

লইয়া বোনের খোঁজে বাহির হইলেন। ঠিক এমন সময় দৈববাণী হইল, বৃথা বোনের খোঁজ করিও না। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা কর।

দৈববাণী শুনিয়া রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, এক পরমা সুন্দরী ষোড়শী মালা হাতে তাহার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া রাজপুত্র খুব খুশী হইলেন। এই সময় আবার দৈববাণী হইল। রাজকুমার! ঐ তোমার উপযুক্ত। ইহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও।

রাজপুত্র শুভদিনে সেই ষোড়শীকে বিবাহ করিলেন। রাজ্যে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

মন্তব্য

এই কাহিনীর মধ্যে পর পর কতকগুলি মৃত্যু-সংঘটিত হইয়াছে। ইহা আধুনিকতার লক্ষণ। বিদেশী কাহিনীর প্রভাবের ফলও হইতে পারে। এখানে শ্রাদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে, তাহাও আধুনিক যোজনা। কারণ, লোক-কথায় কোন সাম্প্রদায়িক আচার পালন করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন অশ্ব ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। ইহাতে চড়িবা মাত্র আরোহীকে লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। ইহা আশ্চর্যজনক (miraculous) ঘটনার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম বাংলায় ধর্মঠাকুরের বাহন সাদা ঘোড়া।

কিরণমালা

এক রাজা। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। দিনে মৃগয়া করেন, রাত্রে গোপনে প্রজার সুখ-দুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করেন। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া রাজা শুনিলেন, গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা হইতেছে। বড় মেয়ে বলিল, 'যদি রাজবাড়ীর ঘেসেড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাহলে মনের সুখে কলাই ভাজা খাই।' মেজ বোন বলিল, 'যদি রাজবাড়ীর সূপকারের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়, তবে আমি রাজভোগ থাইতে পাই।' ছোট বোন বলিল, 'আমার যদি রাজার সঙ্গে বিয়ে হইত, তবে আমি রাণী হইতাম।' পরদিন রাজার পাইক আসিয়া চৌদোলায় তিন বোনকে তুলিয়া রাজ-দরবারে লইয়া গেল। রাজা বড় বোনকে ঘেসেড়ার সঙ্গে ও মেজোকে সূপকারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন এবং ছোটকে নিজের রাণী করিলেন।

কয়েক বৎসর পর রাণীর ছেলে হইবে। রাণী রাজাকে বলিলেন, 'আমার মায়ের পেটের বোনদের আনাইয়া দিলে তাহারা আঁতুর ঘরে যাইত।' রাজা তাহাই করিলেন। বড়বোন মেজবোন রাজবাড়ীতে আসিল। ছোট বোনের রাণীর ঐশ্বর্য দেখিয়া তাহারা হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল।

তিন প্রহর রাত্রে রাণীর ছেলে হইল। ছেলে যেন চাঁদের পুতুল। রাণীর বোনেরা কাঁচা মাটির ভাঁড়ে ছেলেকে পুরিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিল, আর রাজাকে বলিল, 'রাণীর এক কুকুরছানা হইয়াছে।' পর বৎসর রাণীর আবার ছেলে হইল। হিংসুটে বোনেরা এইবারও ছেলে নদীর জলে ভাসাইয়া রাজাকে বলিল, 'রাণীর এক বিড়ালের ছানা হইয়াছে!' পরের বছর রাণীর এক সুন্দর টুলটুলে মেয়ে হইল। এইবার মেয়েটিকে নদীর জলে ভাসাইয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এইবার কি হইয়াছে?' মাসীরা বলিল, 'এক কাঠের পুতুল হইয়াছে।' রাজ্য জুড়িয়া রাণীর অখ্যাতি রটিল। এই অলক্ষণে রাণী কখনও মনুষ্য নয়, পেত্নী বা ডাকিনী। রাজা রাণীকে ত্যাগ করিলেন। রাজ্যের লোকেরা তাহাকে মাথা মুড়াইয়া দেশের বাহির করিয়া দিল।

এইদিকে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ নদীজলে স্নান করিতে গিয়া মাটির ভাঁড়ে সন্থ শিশুর কান্না শুনিতে পাইল। ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরিয়া দেবশিশু ঘরে লইয়া আসিল। পরের বছর আবার এক দেবশিশু, তিন বছরের বছর আবার এক দেবকন্যা সে ঘরে আসিল। ব্রাহ্মণ আনন্দে দুই পুত্র এক কন্যা লইয়া পরম সুখে সংসার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেদের নাম রাখিলেন, অরুণ, বরুণ, মেয়ের নাম কিরণমালা। তিন ভাইবোনে চাঁদের মত বাড়ে, ফুলের মত দোলে। ব্রাহ্মণের সংসার যেন আনন্দের হাট। তিন ভাইবোনকে বড় করিয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলেন। রাজার সংসারে আর সুখ নাই। মনের দুঃখে তিনি আবার মৃগয়ায় বাহির হইলেন। পথে ঝড় তুফানে, বৃষ্টি বাদলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল রাজা ব্রাহ্মণের কুটিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'কে আছ, একটু জল দিয়া বাঁচাও।' ভাইবোনে ছুটিয়া জল আনিয়া দিল। বিজন দেশে এমন সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে দেখিয়া দুঃখী রাজার চোখের জল পড়ে-পড়ে।

কিরণমালা একদিন ভাইদের কাছে আব্দার ধরিল, রাজার বাড়ীর ন্যায় অট্টালিকা বানাও। অরুণ বরুণ কিরণমালা তিন ভাই বোনে মিলিয়া এক অপূর্ব অট্টালিকা তৈয়ার করিল। এক দিন এক সন্ন্যাসী বলিলেন, উত্তর পুর্ব, পুর্বের উত্তর মায়া-পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে হীরার গাছে সোনার ফল ফলে, সোনার পাখী ডাকে। যে এই সব আনিতে পারিবে, সেই বীর। অরুণ তাহা আনিবার জন্য যাত্রা করিল। কিন্তু মায়া-পাহাড়ের দেশে অপ্সরীর মায়ায় পড়িয়া আর ফিরিল না, পাথর হইয়া গেল। বরুণেরও একই দশা হইল। এইবার কিরণমালা যাত্রা করিল। কিরণমালা যেই পাহাড়ে উঠিল, অমনি চারিদিক হইতে দৈত্য দানব, বাঘ ভল্লুক, ভূত পেত্নী, হাতী, ঘোড়া সাপ আসিয়া পথ ঘিরিয়া ফেলিল। ইহার পর উঠিল ঝড় তুফান, মেঘের গর্জন। বজ্রধারায় বৃষ্টি নামিল। কিরণমালার কোন দিকে খেয়াল নাই। তাহার পায়ের তলায় পাহাড় টলিয়া গেল, পাথর গলিয়া গেল, কিরণমালা তরতর সরসর করিয়া সোনার ফল হীরার গাছের তলায় হাজির হইল। অমনি হীরার গাছে সোনার পাখী বলিল, আসিয়াছ, আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে।

এই তীর ধনুক নাও, ঝরনার জল, ফুল নাও, আমাকে নাও। তারপর ডঙ্কায় ঘা দাও। সব লইয়া কিরণমালা পাহাড়ের গায়ে সোনার ঝারির জল ছিটাইয়া দিল। চক্ষের পলকে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হইয়া গেল।

তাহারা হাতজোড় করিয়া বলিল, 'সাতযুগের ধন্য বীর'। অরুণ বরুণ বলিল, 'মায়ের পেটের ধন্য বোন।' তিন ভাই বোন বাড়ী ফিরিয়া বাগানে হীরার গাছ পুতিল, আর সোনার পাখীকে বলিল, 'এইখানে বস।' তিন ভাইবোনের ঐশ্বর্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে সব খবর রাজার কানে গেল। সোনার পাখীর নির্দেশে একদিন তিন ভাইবোনে রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। রাজা তো পুরী দেখিয়া, পুরীর ঐশ্বর্য দেখিয়া অবাক। এ যে ইন্দ্রপুরীকেও হার মানাইয়াছে!

রাজা খাইতে বসিয়াছেন। থালায়, বাটিতে, রেকাবে থরে থরে সাজানো কত খাবার, গন্ধে ঘর ভরপুর। রাজা খাবারে হাত দিয়াই বলিলেন, 'একি! এ যে সব মোহর'! উত্তর শুনিলেন, 'কি হয়েছে তাহাতে'।

রাজা বলিলেন, 'এ সব কি মানুষে খায়'?

উত্তর শুনিলেন, 'মানুষের কি কুকুর ছানা হয়?'

অবাক রাজা আবার শুনিলেন, 'মানুষের কি বিড়াল ছানা হয়?' কে এই কথা বলিতেছে? রাজা দেখিলেন, মাথার উপর সোনার পাখী। পাখী বলিল, 'রাজা মশাই, মানুষের পেটে কি কাঠের পুতুল হয়'? রাজা সব বুঝিতে পারিলেন। সোনার পাখী আবার বলিল, 'রাজা মশাই, ইহারাই আপনার পুত্রকন্যা।' রাজা অরুণ বরুণ কিরণমালাকে বুকে টানিয়া লইলেন। সোনার পাখীর নির্দেশে নদীর ওপারের কুঁড়ে ঘর হইতে তাহাদের দুঃখিনী মাকে লইয়া আসা হইল। আবার রাজ্যে আনন্দের হাট বসিল।

মন্তব্য

পরিত্যক্ত শিশু ইহার প্রধান অভিপ্রায়। সোনার পাখী বিস্ময়কর প্রাণী অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহার উপসংহার অন্যান্য অনুরূপ কাহিনীর উপসংহারের প্রায় অনুরূপ। 'সাত ভাই চম্পা'র কাহিনীর সঙ্গে ইহার সুদূর ঐক্য আছে।

৫

সুতাশঙ্খ

রাণীর আয়ু এক জোড়া পাশার মধ্যে, একথা জানিত রাজপুরীর তালগাছের এক রাক্ষসী। রাক্ষসী একদিন ভিখারিণী সাজিয়া রাজপুত্রের কাছে গিয়া পাশা জোড়া চাহিয়া লইল। তারপর তিন ফুঁয়ে রাক্ষসী সেই পাশা কোন রাজ্যে পাঠাইয়া দিল এবং রাণীকে খাইয়া রাণীর মূর্তি ধরিয়া রাজবাড়ীতে ঢুকিল। কেহই বুঝিতে পারিল না। ক্রমে রাজার সাত ছেলে হইল। রাজকুমারেরা বড় হইয়া রাজাকে বলিলেন, 'আমরা দেশ ভ্রমণে যাইব'। আট ভাই দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। রাক্ষসী রাণী সুতাশঙ্খ সাপের কাছে জানিল, বড় রাজপুত্র ডালিমকুমারের আয়ু ডালিমের বীজে। রাক্ষসী সুতাশঙ্খকে পাঠাইল পাশাবতীর দেশে, সঙ্গে এক লিখন, আমার সাত ছেলের জন্য সাত কন্যা চাই, আর সতীনের ছেলে যেন পাশা আনিতে না পারে। রাজপুরীর সিঁড়ির ধাপের নীচে ডালিমের বীজও বন্ধ করিয়া রাখিল। সঙ্গে সঙ্গে কোন সুদূর বনের মধ্যে ডালিমকুমারের দুই চোখ অন্ধ হইয়া গেল। তারপর ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ে সাতভাই পক্ষীরাজের পিঠে কোথায় চলিয়া গেল। আর ডালিমকুমার পড়িয়া রহিল।

এইদিকে সুতাশঙ্খ সারাদিন চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া রাজবাড়ীতে বাগানের এক ফলের মধ্যে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। পরদিন সেই ফলের সঙ্গে সুতাশঙ্খ রাক্ষসীর লিখন রাজকন্যার পেটে গেল।

এইদিকে মন্ত্রপড়া পক্ষিরাজ সাতরাজপুত্রকে লইয়া পাশাবতীর রাজ্যে উপস্থিত। পাশাবতী বলিল, "কে তোমরা"?

"আমরা রাজপুত্র, দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি"।

রাজপুত্রের পণ রাখিয়া পাশাবতীর সঙ্গে খেলিতে বসিল। খেলায় রাজপুত্রেরা হারিয়া গেল। পাশাবতীরা সাত বোনে তাহাদের খাইয়া ফেলিল।

অন্ধ রাজকুমারের পক্ষীরাজ ছুটিতে ছুটিতে এক পাহাড়ের উপর পড়িয়া পাথর হইয়া গেল। রাজকুমার ঘোড়ার পিঠ হইতে গড়াইয়া রাত্রি রাজার রাজপুরীতে গিয়া পড়িল। রাত্রি রাজার রাজ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজার পাট-হাতী পথে বাহির হয়, একজনকে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া রাজা করে। রাজকন্যার সঙ্গে নূতন রাজার বিবাহ হয়। পরদিন সকালে দেখা যায়,

রাজকন্যার ঘরে রাজা নাই, আছে শুধু হাড়গোড়। কি যে হয়, রাজকন্যা তা জানেন না, জানে না রাজ্যের লোকেও। সুরু হয়, কান্না কাটি, চিৎকার, হাহাকার। আবার রাজার পাট হাতী বাহির হয় রাজার সন্ধানে। এইভাবে দিনের পর দিন চলে। সেইদিন রাজ্যের পাটহাতী অন্ধ বড় রাজকুমারকে সিংহাসনে বসাইয়া দিল। অভিষেক, দরবার, বিচার সবশেষ হইল।

রাত্রে রাজকন্যা ঘুমে বিভোর, রাজপুত্র জাগিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, চারিদিকে নিঃসার নিঃঝুম। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে চিৎকার করিয়া রাজকন্যা অজ্ঞান হইলেন। রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে সরু মিহি সূতার মত সাপ বাহির হইয়া ক্রমে বত্রিশ ফণা ছড়াইয়া শঙ্খের আওয়াজে গর্জন করিয়া উঠিল। অন্ধ রাজপুত্র দুই হাতে তরোয়াল ঘুরাইয়া সূতাশঙ্খের বত্রিশ ফণায় আঘাত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। তরোয়ালের কোপে কোপে সূতাশঙ্খ খণ্ড খণ্ড হইল। সেইরাত্রে রাজবাড়ীর হাজার সিঁড়ির ধাপ ধ্বসিয়া পড়িল, আর রাজকুমারের আয়ু সোনার ডালিম গাছ হইয়া গজাইয়া উঠিল।

এইদিকে সূতাশঙ্খ পোড়াইতে গিয়া তাহার পেটে রাক্ষসীর লিখন পাওয়া গেল। রাজপুত্র লিখন পড়িয়া ভাইদের উদ্ধার করিতে চলিলেন। পক্ষীরাজের পিঠে তীরের বেগে কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড়, রক্ত নদী পার হইয়া রাজপুত্র পাশাবতীর পুরীতে হাজির হইলেন। পাশাবতীর পণ পাশা খেলায় যে তাহাকে হারাইবে, তাহারা সাত বোনে তাহার গলায় মালা দিবে। রাজপুত্র রাজী হইলেন। খেলিতে বসিয়া রাজপুত্র চমকিত। এ যে তাঁহারই পাশা। খেলিতে খেলিতে রাজপুত্র হারিয়া গেলেন। একটি ইঁদুর আসিয়া পাশা উল্টাইয়া দিয়া যায়। পরের দিন রাজপুত্র একটি বিড়াল লইয়া খেলিতে বসিলেন। ইঁদুর আর আসে আসে, আসে না, বিড়াল দেখিয়া পলাইয়া যায়। এইবার রাজপুত্র জিতিলেন। পাশা আবার তাঁহার হইল। রাজপুত্র তাঁহার সাত ভাই, সাত ভাই-এর সাত পক্ষীরাজ ঘোড়া সব জিতিয়া লইলেন।

ঘোড়া ছুটাইয়া আট ভাই দেশে ফিরিলেন। মাতাপুত্রে আবার মিলন হইল। রাত রাজার দেশের লোকজনও আবার তাহাদের সবে-জীয়ন্ত রাজার খোঁজ পাইল। দুই রাজ্য এক হইল। রাজবাড়ীর সোনার ডালিম গাছে হাজার ডালিম ফুল ফুটিল।

৬

দ্বিতীয়ার কোঁটা

এক গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক, মা ও মেয়ে। এরূপ সময় একদিন তাহারা পরস্পর মাথা দেখাদেখি করিতেছিল। তখন এক ফকির আসিয়া ভিক্ষা চাহিল, মা মেয়েকে ভিক্ষা দিতে বলিলেন। ফকির তাহার হাতের দান গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে মা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির বলিল, সে অলক্ষ্মী। তাহা প্রমাণ করার জন্য মেয়েকে ভিক্ষা আনিতে মা আদেশ করিলেন। ফকির তাহার ঝুলিতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া দূর্বার উপর নিক্ষেপ করিলে দূর্বা জ্বলিয়া উঠিল।

ইহা দেখিয়া মা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'কিরূপে মেয়ে, লক্ষ্মী হইবে? ফকির বলিল, 'দীপান্বিতার অমাবস্যা রাত্রে, পরীরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার কথা শুনিবার জন্য গোবর সংগ্রহ করিতে করুয়ালকে পাঠাইলে গোশালার সম্মুখে মেয়ে যেন নিদ্রিত থাকে এবং মা গৃহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকেন; করুয়াল সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে।' নির্দিষ্ট দিনে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে করুয়াল আসিয়া দ্বারে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কেন এরূপ ভাবে শুইয়াছ?' মেয়ে বলিল, 'আমি অলক্ষ্মী, আমার হাতে ভাই ফোঁটা গ্রহণ করে না, শ্বশুরালয়ে কেহ অন্ন গ্রহণ করে না। তাই পিতৃগৃহে বাস করিতেছি। আমার দুঃখ কিরূপে দূর হইবে?' তাহা শুনিয়া করুয়াল মেয়েকে পক্ষে করিয়া পরীরাজ্যে উড়িয়া গেল। পরী-রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার শরীরে মানুষের গন্ধ পাই।' করুয়াল তখন সমস্ত বিষয় বলিল। পরীদের রাণী মানব-কন্যার শরীরে হলুদ-মাখানো একটি বস্ত্রাংশ পুরিয়া দিলেন ও মন্ত্র বলিলেন। সে রাত্রেই করুয়াল মানব-কন্যাকে শূন্যে নিয়া আসিল ও গোশালার সম্মুখে রাখিয়া দিল, তাহার পর করুয়াল গোময় নিয়া পরীরাজ্যে উপস্থিত হইল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে মেয়ের ভ্রাতা বিদেশ হইতে গৃহে আসিল। তখন মা ও মেয়ের আমোদের সীমা কি? ভাই দ্বিতীয়ার ফোঁটা গ্রহণ করিল। তাহার পরদিন এই মেয়েকে নেওয়ার জন্য শ্বশুরালয় হইতে পাল্কী আসিল। চারিদিকে মেয়ের জয়-জয়কার পড়িল।

—মৈমনসিংহ, প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত

৭

অভিশাপ

সাত ভাই সদাগর আর এক বোন, সদাগররা বোনকে খুব ভালো বাসে। সাত ভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে যেতে পথে পড়লো এক ইন্দ্রপুরীর রাজ্য, ডাইনীরা সেখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে সাত ভাই সাত কন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এলো। বোন তো বৌদের বরণ করে ঘরে তুললো। এদিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না। তাকে সারাদিন খাটায়। দেখে শুনে সাত ভাই বোনের বিয়ে দিয়ে দিলো দূর দেশে, বোন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর-ঘর করতে গেলো। দিন যায়, মাস যায়, ভাইরা কাঁদে বোনের জন্য; কিন্তু দেখতে যেতে পারে না। কারণ, দিনের বেলা যে ডাইনীরা তাদের মাছ করে রাখে। একদিন তারা ভাবলো, আর তো বোনকে না দেখে থাকতে পারে না, মাছের বেশ ধরেই যাই। নদী দিয়ে তারা যেতে লাগলো।

বোন নাইতে এসেছে নদীর ঘাটে, এমন সময় দেখে সাতটা মাছ তার চারপাশে ঘুরছে। বোন মাছগুলোকে চুপড়ি করে তুলে নিয়ে এলো বাড়ীতে। যেই কাটতে যাবে, অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, 'কেটোনা কেটোনা বোন, মোরা তোমার ভাই।' বোনের আর মাছ কাটা হলো না। সে সব কথা শুনলো, তারপর কাঁদতে কাঁদতে মাছগুলোকে চুপড়ি শুদ্ধই তুলে রাখলো।

এদিকে শাশুড়ীর খুব সন্দেহ হলো, বৌ মাছ কাটলো না কেন? বৌ পরদিন যেই ঘাটে গেছে, অমনি সে মাছগুলোকে কেটে রেঁধে ফেললো। এদিকে বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাঁদতে লাগলো। তারপর যেখানে আঁশ ফেলা হয়েছে, সেখানে ছুটে গেলো। গিয়ে দেখে সাতটা পদ্ম ফুটে আছে। বোন কাঁদতে লাগলো। এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে এক হাঁড়ি মন্ত্রপড়া জল বোনটিকে দিয়ে বললো, এক নিঃশ্বাসে এই জল তুমি সাতটা ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমার ভাইরা আবার মানুষ হবে। বোন কিন্তু তা পারলো না। তখন সাটতা ফুল সাতটা বিরাট বিরাট কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেলো, আর তাদের বোন কাঁদতে লাগলো।

—ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

ইহার মূল অভিপ্রায় রূপ-পরিবর্তন (Transformation)। ভাইরা প্রথমতঃ মাছ এবং পরে কুমীর হইয়া গেল। ইহাতে ঐন্দ্রজালিক (magic) শক্তির কথাও আছে। কাহিনীটি অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয় ; কারণ, কুমীর-রূপী ভায়েরা পুনরায় মানুষের আকার লাভ না করিলে কাহিনী বিয়োগান্তক হয়, অথচ এই শ্রেণীর কাহিনী কদাচ বিয়োগান্তক হয় না। ভাইরা কুমীর রূপে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতে পারে না। ইহা কদাচ লোক-কথার অভিপ্রায় নহে। সমাধি হইতে পদ্মফুলের জন্ম লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়।

কাঞ্চনী

এক রাজার সাত ছেলে ও এক মেয়ে। মেয়েটির নাম কাঞ্চনী। বিয়ের পর কাঞ্চনী বাপের বাড়ী এসেছে, কয়েকদিন থেকেই আবার চলে যাবে। কিছুদিন পর সাত ভাই মিলে কাঞ্চনীকে শ্বশুরবাড়ীতে দিয়ে আসতে গেল। পথে যেতে যেতে সাত ভাই বোনটিকে নিয়ে এক বনের ধারে এসে পৌছোল। সে বনে বোনকে মারবার জন্য সাত ভাই মিলে যুক্তি করল।

প্রথম ভাই বলল—যাইতে যাইতে তিরিকার

কাঞ্চনী বলল—আস্থ আস্থ, ভাই, বাঁদি কাঁদি যাও পরায়ি

দ্বিতীয় ভাই বলল—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

ডাহন দিগদি, দিদি, যাউ পরায়ি

কাঞ্চনী—যাতি দিগদি যাউ পরায়ি

তৃতীয় ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

কাঞ্চনী—যাউ যাউ, ভাই, মাথা উপরদি যাউ পরায়ি

৪র্থ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

কাঞ্চনী—পাপ তরদি যাউ পরায়ি

৫ম ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

কাঞ্চনী—ডাহন পাদদি যাউ পরায়ি

৬ষ্ঠ ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

কাঞ্চনী—আস্থ আস্থ, ভাই, কন মূলদে যাও পরায়ি

৭ম ভাই—যাউচি যাউচি, দিদি, তিরিকার

কাঞ্চনী—আস্থ আস্থ ভাই কণ্ঠ উপর যাউ পরায়ি॥

তারপর কাঞ্চনীকে মেরে ফেলা হলো।

তখন সাত ভাইএর খাবারের জন্য কাঞ্চনীর দেহের মাংসকে ভাগ করা হ'ল। সেই সময় ছোট ভাই নদীতে গিয়ে মাছ আর কাঁকড়া ধরে আনল এবং সেগুলি পুড়িয়ে খেল, তার ভাগের মাংসটা মাটীতে পুঁতে রাখল। সেখানে একটা ফুলের গাছ হলো, তাতে একটি মাত্র ফুল ফুটলো।

এদিকে কাঞ্চনী শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে না দেখে শ্বশুর ও শাশুড়ী কাঞ্চনীকে নিতে তার বাপের বাড়ীতে এলো। পথে সেই ফুলগাছটায় একটি মাত্র

ফুল দেখতে গেল। শ্বশুর বলল, আমার বৌমার জন্ম ফুল নিয়ে যাব। ফুলটা বলল,

সস্তেগো কাঞ্চনীর ফুল নিয়ে গোভারে গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তো সধবার ঝি॥

এই গানটা শুনে শ্বশুর ফুলটা ছিঁড়লো না। তারপর তারা কাঞ্চনীর বাপের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো এবং জিজ্ঞাসা করলো, কাঞ্চনী বউ কই। কাঞ্চনীর বাপ মা বলল, সাত ভাই কাঞ্চনীকে তোমাদের বাড়ীতে দিয়ে এসেছে। শাশুড়ী শ্বশুর তখন সবাইকে ডেকে সেই গাছটার নীচে নিয়ে গেল এবং সেই ফুলটা দেখিয়ে কাঞ্চনীর মাকে বলল, এই ফুল তোল দেখি। মা ফুলটা তুলতে গেলে ফুলটা গান গেয়ে উঠল—

মাগো মা, ফুলটকে নিয় গো গভারে (ঘরে) গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তোমার ঝিঅ॥

তখন সকল ভাইএর বৌ গেল ফুলটা তুলতে। ফুলটা গান গেয়ে উঠল।
বড় ভাইএর বৌকে বলল, বড় বৌ ভগারী, ফুলটকে নিয়ে গভারে গেঞ্জিব।
ছয় বৌকেই এই কথা বলল, পত্র না বিনাশ করিব মুই তো তোমার ননদ।

ছোট বৌ এলে পরে তাকে বলল—
বৌদি ফুলটকে নিয়ে গভারে গেঞ্জিব।
পত্র না বিনাশ করিব। মুই তো তোমার ননদ॥

কাঞ্চনীর মা ফুলটির কাছে আবার গেল এবং দুধ খেতে দিল। ফুলটা তখন মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কাঞ্চনী হয়ে গেল। তাকে কাপড় জামা গয়না গাঁটি দিয়ে সাজিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিল।

হাতীবাড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

কাহিনীটির মূল অভিপ্রায় নরমাংসাহার (Cannibalism)। এই ক্ষেত্রে সাত ভাই মিলিয়া যে ভগ্নীর মাংস খাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, তাহা গভীর মনস্তত্ত্বমূলক। যদিও প্রকৃত পক্ষে সাধারণভাবে মানুষ কোনদিনই মানুষের মাংস আহার করে না বলিয়াই নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন, তথাপি এই বিষয়ক কাহিনী বৌদ্ধ জাতকের যুগ হইতেই এই দেশের কথাসাহিত্যে প্রচলিত

আছে ; তবে তাহাদের প্রচলন যে খুব ব্যাপক, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। বৌদ্ধ জাতকে এই বিষয়ক মাত্র দুইটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্য হইতে এই বিষয়ে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা কোন প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ নহে, পরোক্ষভাবে তাহা সর্বত্রই সংগৃহীত। তাহাতে দেখা যায়— Some tribes eat only enemies, and never eat their totem or kinsmen ; others, do eat only relatives (Dieri) or father do not eat thier own children, but mothers do.' (*SDF.* Vol I. p. 187)। কিন্তু এই সকল বিবরণ সর্বত্রই অনুমানাত্মক মাত্র। প্রকৃত কি না, সন্দেহের কারণ আছে।

চম্পা

পাঁচ ভাই আর এক বোন, বোনের নাম চাঁপা। তার বাবা মারা গেল। মা রান্না করতে পারে না, চাঁপা রান্না করে। একটানে শাক কাটতে কাটতে একদিন চাঁপার আঙুল কেটে গেল। রক্ত শাকে লেগে গেল, তার ভাইদের খেয়ে খুব ভাল লাগলো। তারা ভাবলো, চাঁপার রক্ত এতো মিষ্টি, নিশ্চয়ই ওর মাংস আরও মিষ্টি হবে। এদিকে চাঁপার বয়স হয়েছে; মা বললেন, কন্যা এত বড় হলো, বিয়ে দাও।

পাঁচ ভাই মিলে চাঁপাকে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে চললো, সঙ্গে নিল তীর ধনুক। চাঁপা জিজ্ঞেস করলো, তীর ধনুক নিয়ে কি করবে? ভাইরা বললো, পথে বন পড়বে তো, তাই ধনুক নিয়েছি। তারা পথ চলতে লাগলো। পথে পড়লো একটা বড় পুকুর। ভাইরা চাঁপাকে বললো, —চাঁপা, জল খেয়ে আয়। চাঁপা যেই জলে নামলো, অমনি ভাইরা তীর ছুঁড়ে তাকে মেরে ফেললো। তারপর তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে কেটে খেয়ে ফেললো। ছোট ভাই কিন্তু খেলো না। ছোট ভাইএর ভাগটা তারা মাটিতে পুঁতে দিল। সেখানে একটা পদ্ম ফুটলো। তারপর তারা বাড়ী ফিরে এলো।

এদিকে বৌ শ্বশুর বাড়ী যায় না, শ্বশুরবাড়ী থেকে তার ডাক এলো। চম্পার মা তো অবাক। বললেন, চাঁপা তো শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। শ্বশুর কি আর করবে? ফিরে গেলো। যেতে যেতে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে শ্বশুর উপস্থিত হলো, আর দেখলো পুকুরের ধারে একটা গাছ, তাতে একটি ফুল ফুটে রয়েছে। সেটা আসলে চাঁপা। শ্বশুর সেই ফুলটা তুলতে গেছে, অমনি ফুলটা বলে উঠলো—

শ্বশুর, পাতা ভেঙ্গো না ডাল ভেঙ্গো না।

শ্বশুরের মনে সন্দেহ হলো, সে গিয়ে চাঁপার মাকে সব কথা বললো। মা ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন। ছোট ভাই সব কথা বলে দিলো। তখন চাঁপার শ্বশুর মন্ত্র পড়ে চার ভাইকে পাষাণ করে দিল। তাই দেখে চাঁপা সেই গাছ থেকে নেমে এল, আমার কথাটিও ফুরোল॥

—হাতীবাড়ী, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

এখানে বীরহোড় জাতির মধ্যে প্রচলিত এবং মধ্যভারত হইতে সংগৃহীত প্রায় অনুরূপ কাহিনীটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে (*Folk-tales of Mahakoshala*, op. cit, p. 368),

'The sister cooks her brothers' food and accidentally allows some of her blood to fall upon it. They decide to kill her but the youngest brother objects. They take her to the jungle and persude her to sleep on a machan. The six elder brothers shoot at her, but all miss and then call the youngest and force him on pain of death to shoot. He aims his arrow in the opposite direction but it flies straight into his sister's body, and she dies. The brothers then cut up and roast their sister's body, giving the youngest brother the entrails and legs. He takes them some distance away but cooks fish and crabs instead, burying the entrails and legs of his sister in the ground. Before long a bamboo stalk shoots up from the hole where the girl's legs were buried.'

সর্পকন্যা

একটি ছোট ছেলে ও তার বোন। দুই ভাইবোন, এদের বাবা মা নেই। ছাগল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন বোনটি ছাগল চরাতে চরাতে রাজার বাড়ীর বাগানের কাছে চলে এলো। দেখে রাজার বাগানে একটি খুব সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে। ফুলটি নিতে ভারী ইচ্ছে হলো। মালীকে বলল, ফুলটা আমাকে দাও। মালী কিন্তু ফুলটি দিতে রাজী হোল না; কারণ, এই ফুল যে নেবে, রাজার ছেলে তাকে বিয়ে করবে। মেয়েটি কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিল। অনেক কান্নাকাটির পর মালী যখন ফুলটা দিল না, তখন সে নিজেই ফুলটা ছিঁড়ে নিল এবং রাজার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী এল; কিন্তু শাশুড়ী এতে খুশী হোল না, সে বউকে মোটেই দেখতে পারে না। এদিকে রাজার ছেলে প্রায়ই শিকারে যায়, মাঝে মাঝে বাড়ী ফেরে। যখন রাজার ছেলে শিকারে যায়, তখন শাশুড়ী বৌকে সাপ কেটে ভেজে খাওয়ায়। সাপ খেতে খেতে বৌটি সাপের মত দেখতে হয়ে গেল। একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, তখন রাজার ছেলে বিদেশে।

সাপের খোলসপরা বৌটি তার ছোট ভাইটিকে নিয়ে একটা বাঁধের ধারে এল। সেই বাঁধের ধারে একটা প্রকাণ্ড বট গাছ ছিল, সেই বটগাছের নীচে ভাইটি থাকত একটি কুড়ে ঘরে, আর বোনটি বাঁধের জলের মধ্যে থাকত। একদিন সেই বোনটির একটি মানুষের মত শিশু সন্তান হোল এবং ছোট ভাইএর কাছে শিশুটিকে রেখে দিল। শিশুটাকে দুধ খাওয়াবার সময় হোলে ভাইটি বোনকে ডেকে বলত—

সুতা লাটাই দেখো শাশু বনবাস কল।
পুত্র যে কাঁদিছে, নানী, ক্ষীর ননী দিও॥

তখন সাপটা দুধ দিতে আসত সাঁতরে পার হয়ে। এই ভাবে দিন যায়। কিছুদিন পর রাজার ছেলে ফিরে এল, আর এসে দেখল বৌ নেই। মাকে জিজ্ঞেস করল, বৌ কোথায়? মা বলল, সে বেড়াতে গেছে, আসবে এক্ষুণি। রাজার ছেলে বৌ আসবে আসবে করে অপেক্ষা করতে করতে এক সময়

বেড়াতে চলে গেল। বেড়াতে বেড়াতে বাঁধের ধারে এল এবং এসে সেই বটগাছের নীচে ছোট ভাইটি আর শিশুটিকে দেখতে পেল। ছোট ভাইটি রাজার ছেলেকে সব বলে দিল। রাজার ছেলে তখন সাপটার মাথার দিক আর ল্যাজের দিকটা কেটে সাপের খোলসের ভেতর থেকে বৌকে বের করে আনল। বাড়ীতে নিয়ে এসে মাকে খুব গালাগালি করল। আর গর্ত খুঁড়ে তাতে মাকে পুঁতে ফেলল। তারপর রাজার ছেলে বৌ ছেলে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগল।

—দহমুণ্ডা, মেদিনীপুর, ১৯৬৬

মন্তব্য

নাগিনী কন্যা বা serpent damsel অভিপ্রায়টি ইহার মধ্য দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সর্পের একটু একটু অংশ এক একদিন কিছু কিছু আহার করিবার ফলে বালিকা সর্পে পরিণত হইয়া গেল কিংবা সর্পের শক্তির অধিকারিণী হইল, এই অভিপ্রায়টি বাংলার লোক-কথায় সুপরিচিত। মনসা-মঙ্গলের শঙ্কুর গারড়ীর সর্পমন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার কথায় অনুরূপ বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ফুল বা Magic Flower অভিপ্রায়টিও ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে। ফুলটি যে তুলিবে, সে রাজপুত্রকে বিবাহ করিবে। তারপর কাহারও অভিশাপেই হউক কিংবা কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার গুণেই হোক, মানুষ যখন কোন পশুপক্ষীতে পরিণত হয়, তখন সে পুনরায় পূর্বরূপ লাভ করিবার কথা সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও তাহা দেখা যায়। মানুষ-ভ্রাতার সঙ্গে সর্প রূপিণী ভগিনীর সম্পর্কও কাহিনীটির অন্যতম লক্ষণীয় অভিপ্রায়।

একাদশ অধ্যায়

বন্ধুত্বের কথা

বাংলার লোক-কথার একটি বিশেষ অংশে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কাহিনী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রথমতঃ কৃতজ্ঞ বন্ধুর কথা এবং দ্বিতীয়তঃ অকৃতজ্ঞ বন্ধুর কথা। প্রথম শ্রেণীর কাহিনীতে বন্ধুর জন্য বন্ধুর কঠিন আত্মত্যাগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনীতে অনেক সময় বন্ধুর প্রতি বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও বন্ধুর সর্বনাশ সাধন করিবার পূর্বমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর সকল ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং তাহাকে সেজন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়। লোক-কথার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, দুষ্কার্য মাত্রই ইহাতে দণ্ড লাভ করে, সৎকার্য মাত্রই পুরস্কৃত হয়। বন্ধুও বিশ্বাসঘাতকতা করিলে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হয়। রূপকথার মধ্যে রাজার পুত্র মন্ত্রিপুত্রে যেমন এই প্রকার বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইতে পারে, তেমনি রাজপুত্র এবং রাখালের মধ্যেও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হইতে পারে। এই বন্ধুত্বের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক কিংবা বর্ণগত অসমতা কোন ব্যবধান সৃষ্টি করিতে পারে না। অনেক সময় বিপরীতধর্মী চরিত্রবিশিষ্ট দুইটি পশু কিংবা পক্ষী এবং মানুষ ও পশুপক্ষীতে বন্ধুত্ব হইতে পারে। বলাই বাহুল্য, পশুপক্ষী এখানে নরনারী চরিত্রেরই রূপক মাত্র।

পুরুষে পুরুষে বন্ধুত্বের মত নারীতে নারীতেও বন্ধুত্ব হইতে পারে, তাহাকে সখীত্ব, সহেলা বা সয়লা বলে। বাংলার সাধারণ সমাজে পুরুষে পুরুষে এবং নারীতে নারীতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বন্ধুত্ব স্থাপনের যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহার আদর্শ অনুসরণ করিয়াই প্রধানতঃ এই শ্রেণীর কাহিনী রচিত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে পরস্পরের মধ্যে একাত্মতার ভাব সৃষ্টি হয়। তাহাতে বর্ণ কিংবা সামাজিক স্তরের সকল ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। পরস্পরের মধ্যে কেহ কিছুই গোপন করিতে পারে না, পরস্পর পরস্পরের জন্য জীবন বিসর্জন দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে।

বাংলার প্রতিবেশী সকল আদিবাসী সমাজের মধ্যে এই রীতির ব্যাপক প্রচলন আছে। একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন,—

'The matter here referred to is a peculiar custom by which an intimate and lifelong friendship is established between two persons of the same sex. The parties concerned put a flower in each other's hair and exchange presents of cloth and money. They address each other and speak of each other as *phul* flower, they feast each other and assist each other in all circumstances.'

(P. O. Bodding, *Santal Folk Tales*, Vol. I,
Oslo, 1925, pp. 164-5)

সাধারণ হিন্দু সমাজ হইতে আদিবাসীর সমাজে এই রীতি বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কারণ, বন্ধুত্বের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের জন্য যে আত্মত্যাগ করিবার কথা আছে, তাহা কখনও নিম্নতন সমাজের অন্তর্ভুক্ত নরনারীর চরিত্রগুণ হইতে পারে না। ঈর্ষা-বিদ্বেষকে জয় করিয়াই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইতে পারে, নতুবা নয়। কিন্তু নিম্নতম পর্যায়ের সামাজিক জীবনের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষের মত চারিত্রিক নীচতাই প্রাধান্যলাভ করে বলিয়া সেখানে বন্ধুত্বের মত উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ বিকাশ লাভ করিতে পারে না; সেজন্য আদিবাসী সমাজে যে আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার রীতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা হিন্দু সমাজেরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। বন্ধুত্ব বিষয়ক কয়েকটি কাহিনী সংস্কৃত কথাসাহিত্য হইতেও বাংলাদেশে আসিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহারা যে বাংলার জলবায়ুতে জন্ম লাভ করে নাই, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

১

পাষাণের মুক্তি

এক রাজ্যের রাজার ছেলে আর তাঁর মন্ত্রীর ছেলের মধ্যে খুব ভাব ছিল। দুই বন্ধুতে একদিন দুইটি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন। বহু রাজ্য বহু গ্রাম অতিক্রম করিয়া একদিন এক অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যা নামিল। দুই বন্ধু একটি গাছের গুঁড়িতে ঘোড়া দুইটি বাঁধিয়া নিজেরা গাছের উপরে উঠিলেন। নিকটেই একটি প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। হঠাৎ তাঁহারা দেখিলেন, দীঘির জল আলোড়িত করিয়া একটি বিরাট অজগর সাপ উপরে উঠিতেছে; আর তাহার মাথায় রহিয়াছে সাত রাজার ধন এক উজ্জ্বল মাণিক। সেই মাণিকের আলোকে চারিদিক দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখাইতেছে।

তীরে উঠিয়া অজগরটি ফণা ঝাড়িয়া মাণিকটি নীচে ফেলিল এবং খাদ্যের অন্বেষণে চলিয়া গেল। গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়া দুইটিকে একের পর এক খাইয়া ফেলিল এবং বনের মধ্যে ক্রমে বহু দূরে চলিয়া গেল। মন্ত্রিপুত্র গাছ হইতে নামিয়া ঘোড়ার মল সংগ্রহ করিল এবং তাড়াতাড়ি গিয়া সেই মাণিকের উপর চাপা দিল; সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বন অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। অজগরটি তখন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং গর্জন করিতে করিতে সেইখানেই মরিয়া পড়িয়া গেল।

সারারাত দুই বন্ধু ভয়ে গাছের উপর জাগিয়া কাটাইল। প্রভাতে গাছ হইতে নামিয়া মাণিকটি লইয়া দীঘিতে ধুইতে গেল। কী আশ্চর্য! মাণিকের আলোতে দীঘির ভিতরের সকল কিছু দেখা গেল। জলের তলায় একটি অদ্ভুত রাজপ্রাসাদ রহিয়াছে। সাহসে ভর করিয়া দুইজনে জলের তলায় নামিল। প্রাসাদের চারিদিকে শুধু ফুল আর ফুল—অসংখ্য রকমের ফুল ফুটিয়া চারিদিক গন্ধে আমোদিত করিয়াছে। তাহারা প্রাসাদের মধ্যে ঢুকিল—কী বিচিত্র সুন্দর প্রাসাদ!

একটি ঘরে দুধে-আল্‌তা গায়ের রঙ্‌ এক সুন্দরী মেয়ে দেখিতে পাইল। সে দুই বন্ধুকে পলাইয়া যাইতে বলিল। অজগরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সুন্দরী খুশী হইল এবং তাহাদের সেই প্রাসাদে থাকিতে বলিল। সেই সুন্দরী রাজকুমারীকে দেখিয়া রাজপুত্র এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহাকে বিবাহ করিল। তিনজনে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

রাজাকে সংবাদ দিবার জন্য একদিন মন্ত্রিপুত্র একাই দেশে চলিয়া গেল। কিছুদিন পর রাজকন্যা মাণিকটি হাতে লইয়া জলের উপরে উঠিয়া আসিলেন; রাজপুত্র তখন নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহাকে জানাইলেন না। রাজকন্যা উপরে উঠিয়া স্নান করিলেন এবং পুনরায় নীচে নামিয়া গেলেন।

তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন, কেহই তাঁহাকে দেখিত না। একদিন সেই দেশের রাজপুত্র মৃগয়ায় আসিয়া সেই দীঘির ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং এক বুড়ী কাঠ কুড়াইতেছিল। এমন সময় রাজকন্যা উপরে উঠিয়া আসিলেন, তাহাদের দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি জলে ডুব দিলেন। কিন্তু সেই অল্পসময়ের মধ্যেই রাজার ছেলে রাজকন্যার রূপে পাগল হইয়া গেলেন। "এই ছিল, কোথায় গেল।" তাঁহার মুখে শুধু এক কথা। রাজা মহা ভাবনায় পড়িলেন, কোন উপায়েই ছেলেকে ভালো করা গেল না। সেই বুড়ী সবই দেখিয়াছিল। সে রাজার কাছে আসিয়া জানাইল যে, রাজার ছেলেকে সে রোগমুক্ত করিতে পারে, তবে রাজা বুড়ীর ছেলে ফকিরের সঙ্গে তাহার মেয়ের বিবাহ এবং অর্ধেক রাজত্ব দিবেন। রাজা সম্মত হইলেন। ফকিরের মা সেই দীঘির পাড়ে ঘর করিয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজকন্যা পুনরায় মাণিক হাতে করিয়া উপরে উঠিলেন। কৌশলে ফকিরের মা রাজার লোকজন ডাকাইয়া রাজকন্যাকে বন্দী করিল এবং রাজার কাছে হাজির করিল। মাণিকটি কিন্তু নিজের নিকট রাখিয়া দিল। রাজকন্যাকে দেখিয়া রাজার ছেলে "পেয়েছি, পেয়েছি" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দুইজনের বিবাহ হইবে স্থির হইল।

রাজকন্যা স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। রাজপুত্র জলের তলায় একা কী ভাবে বাস করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া রাজকন্যার দুঃখের অন্ত রহিল না। তিনি রাজাকে বলিলেন, তাঁহার একটি ব্রত আছে; সুতরাং এক বৎসর পরে বিবাহ হইবে। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ওদিকে মন্ত্রিপুত্র হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর সঙ্গে করিয়া সেই দীঘির পাড়ে আসিয়া হাজির হইলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিন পার হইয়া গেল, তবু জলের তলা হইতে রাজপুত্র উঠিলেন না। মন্ত্রিপুত্র দুর্ভাবনায় পড়িলেন। সেই সময় সেই রাজ্যে মহা আনন্দের উৎসব অনুষ্ঠানের তোড়জোড় দেখিয়া রাজ্যমধ্যে গেলেন। তাঁহার লোকজনকে তিনি দেশে পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্যে যাইয়া তিনি এক ব্রাহ্মণের মুখে সকল সংবাদ পাইলেন। রাজকন্যার ব্রত শেষ হইয়াছে, রাজার

ছেলের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে, তাই রাজ্যে উৎসব সুরু হইয়াছে। মন্ত্রিপুত্র বুঝিলেন, এই রাজকন্যাই তাঁহার বন্ধুপত্নী। তখন তিনি ফকিরের ছদ্মবেশে ফকিরের মায়ের নিকট গিয়া ফকিরের মত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ফকির দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। মন্ত্রিপুত্রকেই বুড়ী ফকির ভাবিয়া তাহাকে যত্ন করিল এবং মাণিকটি দেখাইল। মন্ত্রিপুত্র তাহা নিজের কাছে রাখিয়া দিলেন এবং রাজপ্রাসাদে যাইতে চাহিলেন। সেখানে গিয়া রাজকন্যার সহিত দেখা করিলেন এবং বুদ্ধিবলে রাত্রে রাজকন্যাকে উদ্ধার করিয়া সেই দীঘিতে নামিয়া গেলেন। বহুদিন পরে সকলে মিলিত হইলেন। রাজপুত্র গভীর দুঃখেই জলের তলায় মৃতবৎ ছিলেন। আর দেরী না করিয়া তিনজনে দেশের দিকে রওনা হইলেন।

পথিমধ্যে একরাত্রে রাজপুত্র রাজকন্যা যখন এক গাছের তলায় ঘুমাইতে ছিলেন, তখন মন্ত্রিপুত্র জাগিয়া পাহারা দিতেছিলেন। গাছের ডালে বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী রাজপুত্রের মৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিল এবং বাঁচিবার উপায়ও বলিল। মন্ত্রিপুত্র সব শুনিলেন এবং বন্ধুকে বাঁচাইতে প্রস্তুত হইলেন।

পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া রাজা উৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রাজপুত্রের জন্য হাতী এবং মন্ত্রিপুত্রের জন্য একটি ঘোড়া পাঠাইয়া দিলেন। মন্ত্রিপুত্র বন্ধুকে হাতীতে চড়িতে বাধা দিয়া ঘোড়ায় তুলিয়া নিলেন, নিজে হাতীতে চড়িলেন। হাতী হইতে পড়িয়া রাজপুত্রের মৃত্যু হইত; মন্ত্রিপুত্র বন্ধুর জীবন বাঁচাইলেন। পরে প্রাসাদের সম্মুখে একটি সিংহ-তোরণের নিকট আসিলে, মন্ত্রিপুত্র সেই তোরণ ভাঙ্গিবার আদেশ দিলেন, নচেৎ তাহা রাজপুত্রের মাথায় ভাঙ্গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইত; মন্ত্রিপুত্র দ্বিতীয়বার বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইলেন। তাহার পর রাত্রে আহারের সময় মন্ত্রিপুত্র বন্ধুর থালা হইতে রুইমাছের মাথাটি আবদার করিয়া কাড়িয়া লইলেন, রাজপুত্রকে তাহা খাইতে দিলে গলায় কাঁটা ফুটিয়া তখুনি তাঁহার মৃত্যু হইত। মন্ত্রিপুত্র তৃতীয় বার বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে মন্ত্রিপুত্র বিদায় লইয়া বাড়ী গেলেন।

কিন্তু মন্ত্রিপুত্র বাড়ী না গিয়া রাজপুত্রের শয়নঘরে লুকাইয়া রহিলেন। রাজপুত্র ও রাজকন্যা পরে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত হইলে পর একটি ভীষণাকৃতি বিষধর সর্প ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রিপুত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারীর সাহায্যে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি পাত্রে রাখিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক ফোঁটা রক্ত রাজকন্যার বুকের উপর পড়িল।

অনেক চিন্তার পর কাপড় শত-ভাঁজ করিয়া রক্ত-বিন্দু যেই মুছিতে গেলেন, তৎক্ষণাৎ রাজকন্যা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন, রাজপুত্রও জাগিলেন।

বন্ধুকে তাঁহাদের শয়নগৃহে দেখিয়া তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন। মন্ত্রিপুত্র কি ভাবে একের পর এক বিপদ হইতে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, বাধ্য হইয়াই তাহা বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধীরে ধীরে তাঁহার দেহ পাষাণে পরিণত হইতে লাগিল। কাহিনীর শেষে মন্ত্রিপুত্র প্রাণহীন পাষাণে পরিণত হইলেন। প্রাণরক্ষাকারী বন্ধুকে এইভাবে হারাইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যা কাঁদিতে লাগিলেন। সেই পাষাণ তাঁহারা লুকাইয়া রাখিলেন। কিছুকাল পরে রাজকন্যার একটি সন্তান হইল এবং তাহাকে দুইখণ্ড করিয়া কাটিয়া সেই রক্তদ্বারা মন্ত্রিপুত্রের পাষাণ মূর্তির উপর ঢালিয়া দিলেন; সেই পাথর পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

মন্ত্রিপুত্র জীবন পাইয়া সেই দ্বিখণ্ডিত শিশুকে লইয়া আপন স্ত্রীর নিকট গেলেন। তাঁহার স্ত্রী কালীর সাধিকা ছিলেন; দেবীর দয়ায় সেই শিশুর প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। ইহার পর সকলে সুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন।

মন্তব্য

বন্ধুর জন্য বন্ধুর আত্মত্যাগের সমুচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা কাহিনীর মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়াছে। পক্ষীর ভবিষ্যদ্বাণী বা বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পক্ষী ইহার অন্যতম অভিপ্রায়। রক্তদ্বারা পুনর্জীবন দান ইহার আরও একটি অভিপ্রায়। মানুষের পাষাণে পরিণতি এবং পুনরায় পাষাণের মানুষে পরিণতি ইহার অন্যতম অভিপ্রায়।

বন্ধুর উদ্ধার

রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, সওদাগরপুত্র ও কোটালপুত্রের মধ্যে ভারী ভাব। তাহারা কেবল ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়, কোন কাজ করে না। একদিন রাজা, মন্ত্রী, সওদাগর, কোটাল বিরক্ত হইয়া স্ত্রীদের বলিলেন—'খাইতে আসিলে ছেলেকে ভাতের বদলে ছাই দিও।' রাজপুত্র মায়ের কাছে সব শুনিয়া বন্ধুদের সঙ্গে পথে বাহির হইলেন। সকলেরই মনে এক ব্যথা—মা ভাতের বদলে ছাই বাড়িয়া দিয়াছেন। রাজপুত্র বলিলেন, 'চল, আমরা দেশ ছাড়িয়া যাই।' বন্ধুরা বলিলেন, 'তাহাই ভালো।'

চারি বন্ধু ঘোড়া ছুটাইয়া তেপান্তরের মাঠে উপস্থিত। সেই মাঠের চারিদিকে চারিটি পথ। সে পথে দিনমানে ঘোড়া ছুটাইয়া সন্ধ্যায় চারি বন্ধু আবার সঙ্কেত স্থানে মিলিত হইলেন। খাবারের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন একটু দূরে এক হরিণের মাথা। মন্ত্রিপুত্র, সওদাগরপুত্র ও কোটালপুত্র রান্নার আয়োজন করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র এক গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন। হরিণের মাথা কাটিতে গিয়া তিন বন্ধু রাক্ষসীর পেটে গেল। এইবার রাক্ষসী রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। রাজপুত্র তরোয়াল ঘুরাইয়া রাক্ষসীকে মারিতে উদ্যত হইলে চারিদিক হইতে বনের গাছ পাথর চিৎকার দিয়া উঠিল, 'রাজপুত্র, পালাও, পালাও'। তখন দিশাহারা রাজপুত্র ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাণভয়ে ছুটিতে ছুটিতে রাজপুত্র এক আমগাছের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। রাক্ষসী নিরুপায় হইয়া সেই গাছের তলায় এক সুন্দরী রমণী মূর্তিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই দেশের রাজা শিকার করিতে সেই বনে আসিয়া সেই মেয়েকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন। রাক্ষসী রাজরাণী হইল। কিন্তু এখনও তাহার সেই এক চিন্তা—সেই রাজপুত্রকে কেমন করিয়া খাই। রাক্ষসী সাত বাসি পান্তা, চৌদ্দ বাসি তেতুলের অম্বল খাইয়া অসুখ বানাইল। তারপর বিছানায় শুইয়া রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, রাণী, কি হইয়াছে ?

রাণী বলিল, আমার বড় ব্যারাম হইয়াছে। কত ওষুধ, কত চিকিৎসা, রাণীর অসুখ কিন্তু সারে না। শেষে একদিন রাণী বলিল, ওই বনের ওই আমগাছের তক্তার ধোঁয়া আমার ঘরে দিলে তবে আমার অসুখ সারিবে।

ছুতোরেরা আম গাছ কাটিতে গেলে, রাজপুত্র একটি আমের মধ্যে করিয়া জলে পড়িয়া গেল। পুকুরের একটি রাঘব বোয়াল সেই আমটি খাইয়া ফেলিল। আমগাছের ধোঁয়ায় রাণীর অসুখ সারিল না। রাণী বলিল, ওই পুকুরের যে বড় রাঘব বোয়াল, তাহার পেটে একটি আম আছে। তাহা খাইলে তবে আমার অসুখ সারিবে। রাজপুত্রের অনুরোধে বোয়াল তাহাকে একটি শামুক করিয়া ফেলিয়া দিল। পুকুরঘাটে এক গৃহস্থ বৌ শামুকটি তুলিয়া এক আছাড় মারিতে রাজপুত্র বাহির হইয়া আসিলেন। গৃহস্থ বৌকে বলিলেন, 'তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ। তুমি আমার হাসন সখী'। রাক্ষসী রাণী সবই জানিল। রাজাকে বলিল, 'আমার বাপের দেশে হাসন চাঁপা নাটন কাটী চিরণ দাঁতে চিকন পাটি, আর বারো হাত কাঁকুরের তের হাত বিচি আছে। সেগুলি আনিলে আমার অসুখ সারিবে।' কিন্তু কে আনিবে?

রাক্ষসী রাণী বলিল, অমুক গৃহস্থের বাড়ীতে যে রাজপুত্র আছে, সে আনিবে। রাজপুত্রকে ধরিয়া আনা হইল। বাধ্য হইয়া রাজপুত্র যাত্রা করিলেন। চলিতে চলিতে এক মস্ত পুরীর সামনে আসিয়া থামিলেন। পুরীতে ঢুকিয়া এদিক ওদিক খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, সোনার খাটে এক ঘুমন্ত রাজকন্যা। তাহার শিয়রে একটি রূপার কাটী পায়ের তলার একটী সোনার কাটী। পায়ের কাটী শিয়রে, আর শিয়রের কাটী পায়ের দিকে লইয়া রাজপুত্র রাজকন্যার ঘুম ভাঙাইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, 'এ রাক্ষসের পুরী, আপনি পলাইয়া যান।' দুইজনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি ভাবে রাক্ষসপুরী হইতে পলাইয়া বাঁচিবেন। এমন সময় রাক্ষসেরা ফিরিয়া আসিল। রাজকন্যা রাজপুত্রকে শিব মন্দিরের বেলপাতার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

একদিন রাজকন্যা বুড়ী রাক্ষসীর পায়ে তেল মাখিতে মাখিতে কৌশলে রাক্ষসের প্রাণ কোথায়, রাক্ষসী রাণীর প্রাণ কিসে, হাসন চাঁপা, নাটন কাটী, চিরণ দাঁতের চিকন পাটি, বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি কোথায় পাওয়া যায়, সব জানিয়া লইলেন। রাক্ষসেরা বাহির হইয়া গেলে, রাজপুত্র ফুল বেলপাতার তলা হইতে উঠিয়া রাজকন্যার নির্দেশমত রাক্ষসদের মারিয়া ফেলিলেন। তার পর রাক্ষসী রাণীর সেই সব জিনিসপত্র ও একটি শুকপাখী লইয়া রাজকন্যাসহ দেশে ফিরিলেন। রাক্ষসী রাণী বুঝিল, রাজপুত্র সব ধ্বংস করিয়া আসিয়াছে। সে মরিয়া রাজ্যশুদ্ধ রাজপুত্রকে খাইতে উদ্যত হইল। রাজপুত্র তাঁহার বন্ধুদের জীবন চাহিল। রাক্ষসী একে একে

সবাইকে উগলাইয়া দিল। তারপর 'এই রাক্ষসী নিপাত যাও' বলিয়া রাজপুত্র শুকের গলা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। রাক্ষসী মরিল, রাজ্যের লোক বাঁচিল। রাজকন্যা ও তিন বন্ধুকে লইয়া রাজপুত্র নিজের দেশে ফিরিলেন। পৃথিবীর রাক্ষস বংশও ধ্বংস হইল।

মন্তব্য

এখানে জীবন প্রতীক্ বা life token অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। শুকের মধ্যে রাক্ষসীর আত্মা ছিল, শুকের গলা ছিঁড়িতেই রাক্ষসীর বিনাশ হইল। পিতার কথায় ছেলের পাতে মার ছাই দিবার কথা বাংলার বহু প্রচলিত লোক কথায় শুনিতে পাওয়া যায়। একটি কাহিনীতে শোনা যায়, পিতা পুত্রকে ভাতের পরিবর্তে ছাই দিবার জন্য পত্নীকে বলিয়া গেলেন। মা স্বামীর কথা অমান্য করিতে পারেন না, অথচ প্রাণ ধরিয়া পুত্রকে ছাইও দিতে পারেন না। এই উভয় সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি ভাতের সঙ্গে একটুকু সামান্য ছাই ধুইয়া মুছিয়া পুত্রকে পরিবেশন করিলেন। পুত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইহা কি? মা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। শুনিয়া পুত্র পিতার উপর দুর্জয় অভিমানে গৃহত্যাগ করিয়া গেল। বর্তমান কাহিনীতেও এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে।

৩

মণিমালা

রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্র দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যাইতে যাইতে এক পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে আসিয়া রাত্রি হইল। দুই বন্ধুতে তখন এক উঁচু গাছের আগ্ ডালে উঠিয়া শুইয়া পড়িল। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে দুই বন্ধুতে দেখিল, বন আলোময়। সেই আলোয় এক প্রকাণ্ড কালো অজগর সাপ রাজপুত্র আর মন্ত্রিপুত্রের ঘোড়া দুইটাকে আস্ত আস্ত গিলিয়া খাইতেছে। দুইজনে একেবারে অবাক্। আস্তে মন্ত্রিপুত্র বলিল, 'ওই যে আলো দেখিতেছ, ওটা ফণীর মণি। সাতরাজার ধন। ওই মণি লইতে হইবে।'

বলিয়া গাছ হইতে নামিয়া এক তাল কাদা আনিয়া মণির উপর চাপা দিলেন, তারপর তাহার উপর উপর নিজের তরোয়াল খানা উল্টাইয়া রাখিয়া দিলেন। এক মুহূর্তে সব অন্ধকার। অজগর ছুটিয়া আসিয়া দেখে মণি নাই। মণিহারা ফণী পাগলের প্রায় তরোয়ালের উপর ছোবল মারিতে লাগিল। অবশেষে কালো অজগর মণির শোকে রাগে দুঃখে তরোয়ালের উপর মাথা খুঁড়িয়া মরিল। পরের দিন দুই বন্ধুতে কাদার নীচ হইতে মণি কুড়াইয়া লইয়া সরোবরের জলে নামিলেন। নামিতে নামিতে দেখেন, যতদূর যাওয়া যায়, জল দুই ভাগ হইয়া পথ করিয়া দিতেছে। সেই পথ ধরিয়া মণির আলোয় দুইজনে একেবারে পাতালপুরীর অট্টালিকায় চলিয়া আসিলেন। সেখানে লক্ষ সাপের শয্যায় পাতালপুরীর রাজকন্যা মণিমালা ঘুমে অচেতন। মণি ছোঁয়াইয়া রাজপুত্র তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিলেন। পাতালপুরীতে রাজপুত্রের সঙ্গে মণিমালার বিবাহ হইল। কিছুদিন পর মন্ত্রিপুত্র দেশে ফিরিলেন। রাজপুত্র আর মণিমালা পাতালপুরীতে রহিলেন।

মণিমালা রাজপুত্রের কাছে পৃথিবীর গল্প শুনেন, আর মনে মনে ভাবেন পৃথিবী কেমন দেখিবেন। একদিন রাজপুত্রকে ঘুমে দেখিয়া মণিমালা মণিটি লইয়া সরোবরের পথে পৃথিবীতে উঠিলেন। পৃথিবী দেখিয়া তাঁহার ভারী ভালো লাগিল। মণিমালা বলিলেন, 'মণি, উজলে উঠ, সরোবরের জলে আমি নাইব।' মণির আলোয় সরোবরের জলে শ্বেত পাথরের ধাপ হইল। মণিমালা মনের আনন্দে নাইতে লাগিলেন। সেই দেশের রাজপুত্র শিকারে বাহির

হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, মণিমালা মানুষ দেখিয়া চক্ষের পলকে জলের নীচে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রাজপুত্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এই দৃশ্য আর একজন দূর হইতে দেখিয়াছিল। সে হইতেছে কাঠ কুড়ানী পেঁচোর মা।

শিকার হইতে ফিরিয়া রাজপুত্র পাগল হইয়াছেন। রাজা ঘোষণা করিলেন, যে রাজপুত্রকে সুস্থ করিতে পারিবে, অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা তাহাকে দিব। পেঁচোর মা বলিল, "রাজা মশায়, আমি ওষুধ জানি, কিন্তু যদি আমার ছেলে পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দাও, তবে রোগ সারাইতে পারি।" রাজা নিরুপায় হইয়া তাহাতেই রাজী হইলেন। পেঁচোর মা বুড়ী একরাশ তুলা, একটি চরকা লইয়া পবনের নায়ে উঠিয়া সরোবরের ধারে চরকায় সুতা কাটিতে লাগিল। সেইদিনও মণিমালা মণি লইয়া উঠিয়া আসিলেন। বুড়ীকে দেখিয়া বলিলেন, "ও বুড়ী, আমাকে একখানা শাড়ী বুনিয়া দে।" বুড়ী শাড়ী বুনিয়া দিয়া কড়ি চাহিল। মণিমালা বলিলেন, "কড়ি তো নাই, এই মণি লও।" মণিমালা মণি দিতে গেলেন, বুড়ী তাঁহার হাত ধরিয়া পবনের নায়ে উঠাইয়া তাহকে রাজপুরীতে রাজপুত্রের কাছে দিয়া আসিল, আর মণিটি নিজের কাছে রাখিয়া দিল। রাজপুত্রের রোগ সারিয়া গেল। মণিমালার সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ হইবে। মণিমালা ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এক বৎসর সময় চাহিয়া লইলেন। রাজকন্যার সঙ্গে পেঁচোর বিবাহও ঠিক হইল। সাত বছরের নিখোঁজ পেঁচোর খোঁজে চারিদিকে লোক ছুটিল। সেই লোকের মুখে মন্ত্রিপুত্র সমস্ত খবর শুনিলেন। পরের দিন মন্ত্রীপুত্র নিজের পোষাক ছিঁড়িয়া কালি পরিয়া, গায়ে মুখে কালি মাখিয়া বুড়ীর বাড়ী আসিলেন। বুড়ী আনন্দে আটখানা হইয়া ছেলেকে বলিল—

রাজ রাজত্বি দুধের বাটী,
রাজকন্যা পরিপাটী
সোনার দানা মোহর থান
সাতরাজার ধন মণিখান—তোর জন্যই রেখেছি।

মণি পাইয়া পেঁচো তো মহাখুসী। "মা, মা, দেখ আমার নূপ—, নূপের গাঙ্গে নূপ ভেস্তে যায়।" পরের দিন পেঁচোর সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ হইল।

বাসরঘরে মন্ত্রিপুত্র রাজকন্যাকে সব কথা বলিলেন এবং জানিলেন মণিমালা রাজবাড়ীতে আটক আছে। মন্ত্রিপুত্র রাজকন্যার হাতের মণিটি মণিমালার

নিকট প্রেরণ করিলেন। দুই চার দিন পরে মণিমালা বলিলেন, "আমার ব্রত আজ পূর্ণ হইয়াছে। আমি বরণ সাজে নদীর জলে নাইব। আমার সঙ্গে যাইবে কেবল পেঁচো আর রাজকন্যা।"

মণি লইয়া মণিমালা জলে নামিলে জল দুই ফাঁক হইয়া গেল। পেঁচো আর রাজকন্যাকে লইয়া মণিমালা সেই জলে অদৃশ্য হইলেন। পাতালপুরীতে আবার মণিমালা রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রে মিলন হইল। রাজপুত্র মণির আলোয় মন্ত্রিপুত্র, মণিমালা ও রাজকন্যাকে লইয়া আপন দেশে চলিয়া আসিলেন।

মন্তব্য

'পাষাণের মুক্তি' নামক যে কাহিনীটি এই অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা তাহারই একটি পাঠান্তর মাত্র।

৪

সূঁচ রাজা

এক রাজপুত্র ও রাখাল। তাহাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। রাজপুত্র রাখাল-বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি যেদিন রাজা হইবেন, রাখাল-বন্ধুকে সেইদিন তাঁহার মন্ত্রী করিবেন। রাজপুত্র রাজা হইলেন, কাঞ্চনমালা তাঁহার রাণী হইলেন। কিন্তু সেই সুদিনে রাখাল-বন্ধুর কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। রাজপ্রাসাদের ফটকে একদিন রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, 'রাজার রাণীকে একবার দেখিব।' দুয়ারী তাহাকে 'দূর দূর' করিয়া তাড়াইয়া দিল।

পরদিন। রাজার চোকে মুখে, গায়ে হাজার সূঁচ, মাথার চুল পর্যন্ত সূঁচ হইয়া গেল। রাজার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হইল। চোখের ঘুম উড়িয়া গেল। রাজার সংসার অচল হইল। রাণী কাঞ্চনমালা দুঃখে কষ্টে কোন রকমে সংসার চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাণী কাঞ্চনমালা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছেন ; এমন সময় এক পরমা সুন্দরী নারী আসিয়া রাণীকে বলিল, রাণী মা, যদি দাসীর প্রয়োজন হয়, তো আমি দাসী হইব।' রাণী হাতের কাঁকন দিয়া দাসী কিনিলেন। দাসী বলিল, 'রাণী মা, তুমি কতদিন স্নান কর নাই। এস তোমার গায়ে ক্ষার খৈল মাখাইয়া দিই।' দাসী রাণীর গায়ের গহনা খুলিয়া ক্ষার খৈল মাখাইয়া বলিল, 'মা, এখন তুমি ডুব দিয়ে এসো।' রাণী গলাজলে ডুব দিলেন। এইদিকে চক্ষের পলকে দাসী রাণীর গহনা পরিয়া রাণী সাজিল, আর রাণী ডুব দিয়া উঠিয়া তাহার দাসী হইলেন, রাণীর নাম হইল কাঁকনমালা। রাজপুরীতে আসিয়া কাঁকনমালা রাণীর দায়িত্ব লইল, কাঞ্চনমালা তাহার দাসী হইলেন। রাজা কিন্তু ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

একদিন নদীর ঘাটে কাঞ্চনমালার সঙ্গে একজন মানুষের দেখা। লোকটি একরাশ সূতা লইয়া সূঁচ চাহিয়া ফিরিতেছিল। রাণী বলিলেন, 'আমি তোমায় সূঁচ দিতে পারি, চল আমার সঙ্গে।' মানুষটি কাঞ্চনমালার সঙ্গে রাজপ্রাসাদে আসিল। সে কাঁকনমালাকে বলিল, 'রাণী মা, আজ পিট কুড়ুলির ব্রত, রাজ্যে পিঠা বিলাইতে হয়। আপনি আঙিনায় আল্পনা দিয়া দিন। দাসী যোগাড় দিক।' কাঁকনমালা ও কাঞ্চনমালা দুই জনেই পিঠা তৈয়ারী করিলেন।

আল্পনা দিলেন। পিঠা আর আল্পনা দেখিয়া মানুষ বুঝিল কে রাণী, আর কে দাসী। সে কাঁকনমালাকে বলিল, 'ওরে বাঁদী, তুই কোন মুখে রাণী হইয়াছিস্? যদি ভাল চাস্, সত্য কথা বল্।' কাঁকনমালা জল্লাদকে আদেশ করিল, মানুষটির গর্দান লও।' মানুষটির মন্ত্রপুত এক গাছি সুতা জল্লাদকে বাঁধিয়া ফেলিল, আর একটি সুতা কাঁকনমালার নাকে ঢিবি হইয়া বসিল। মানুষটি আবার মন্ত্র পড়িল, দেখিতে দেখিতে লক্ষ সুতা রাজার গায়ের লক্ষ সুঁচে পরিয়া গেল। আবার মন্ত্র পড়িল, রাজার গায়ের লক্ষ সুঁচ উঠিয়া আসিল। সেই সুঁচে কাঁকনদাসীর চোখমুখ সেলাই হইয়া গেল। রাজা চোখ খুলিয়া দেখিলেন, সামনে তাঁহার রাখাল-বন্ধু। রাজা রাখাল-বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন। সেইদিন হইতে রাখাল হইলেন রাজার মন্ত্রী। আর সুঁচের ফোঁড়ের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া দাসী মরিয়া গেল। কাঞ্চনমালার দুঃখ দূর হইল। রাজা তাঁহার রাখাল-মন্ত্রীকে একটি সোনার বাঁশী গড়াইয়া দিলেন। রাখাল-মন্ত্রী সোনার বাঁশী বাজায়, আর রাজা তাঁহার মন্ত্রি-বন্ধুর বাঁশী শোনেন।

মন্তব্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকায়' (পৃ ৩১৫-৪৭) 'কাজলরেখা' নামে ইহার একটি উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর পাওয়া যায়। 'কাজলরেখা' 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা রূপকথা। অবশ্য তাহাতে বন্ধুত্বের অভিপ্রায়টি নাই। বরং তাহার পরিবর্তে মৃতের সঙ্গে বিবাহ অভিপ্রায়টি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কাহিনীটি পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে বিশ্বাস-ভঙ্গের ফল স্বরূপ রাজপুত্র দণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। সর্বাঙ্গে সুঁচের তাৎপর্যটি কাজলরেখার কাহিনীতে আরও সার্থকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

৫

চার বন্ধু

চারবন্ধু। রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগর-পুত্র। চারবন্ধুতে খুব সদ্ভাব। একবার তাহারা মাতাপিতার কাছ হইতে অনুমতি লইয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। যাইতে যাইতে তাহারা এক বনের মধ্যে যাইয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দেখিল, সামনেই একটি মন্দির। তাহারা এই মন্দিরেই রাত্রি বাস করিবে ঠিক করিল। ঠিক হইল, প্রত্যেকে এক এক প্রহর জাগিয়া অপর তিনজনকে পাহারা দিবে। প্রথমে সওদাগর পুত্রের পালা। সে দেখিল, সন্ন্যাসী একমনে পূজায় ব্যস্ত। হঠাৎ দেখিল, সন্ন্যাসী একখানি হাড় লইয়া কি একটা মন্ত্র পড়িল, অমনি নানাদিক হইতে অজস্র হাড় আসিয়া সেখানে জড় হইল।

সওদাগর-পুত্র একবার শুনিয়াই মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া লইল। কিন্তু ততক্ষণে এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কোটালপুত্রকে জাগাইয়া দিয়া সে বিশ্রাম নিল। কোটালপুত্র দেখিল, সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে অনেক হাড় পড়িয়া আছে, সন্ন্যাসী সেই দিকে চাহিয়া মন্ত্র পড়িবামাত্র হাড়গুলি পরস্পর জোড়া লাগিয়া গেল। কোটালপুত্র মন্ত্রটি মনে করিয়া রাখিল। মন্ত্রিপুত্রের পালা আসিল। সে দেখিল, সন্ন্যাসীর কাছে একটি কঙ্কাল পড়িয়া আছে, সন্ন্যাসী একটি মন্ত্র উচ্চারণ করা মাত্রই সেই কঙ্কালে অস্থিচর্ম সংযোজিত হইল। মন্ত্রিপুত্র একবার শুনিয়াই মন্ত্রটি অভ্যাস করিয়া ফেলিল। শেষ রাত্রিতে রাজপুত্রের পালা আসিল। সে দেখিল, একটি প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী সেই দেহের দিকে চাহিয়া একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, অমনি মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইল। রাজপুত্র মন্ত্রটি শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিলেন।

পরের দিন সকালে তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। দুপুরবেলা তাহারা এক নদীর তীরে একটি গাছের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে গতরাত্রির দেখা ঘটনা সকলে একে একে বর্ণনা করিল। তখন চারবন্ধু এক অদ্ভুত বিদ্যা লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তাহারা নিজেদের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইল। সওদাগর-পুত্র একখানি হাড় সংগ্রহ করিয়া মন্ত্র পড়িল, অমনি বনের চারিদিক হইতে অজস্র হাড় আসিয়া গাছের তলে জড় হইল। তখন কোটালপুত্র মন্ত্র পড়িয়া সেই হাড়গুলি পরস্পর জোড়া লাগাইল।

তারপর মন্ত্রিপুত্র মন্ত্র পাঠ করিল, তখন সেই কঙ্কাল মেদমাংস দ্বারা আবৃত হইল। দেখা গেল, তাহা একটি বিরাট বাঘের প্রাণহীন দেহ।

তখন সকলে রাজপুত্রকে মন্ত্র পরীক্ষা করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু রাজপুত্র তখন নিজের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে অত্যন্ত আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই সে নিষেধ শুনিল না। তখন তিনবন্ধু গাছের উপর যাইয়া উঠিল।

রাজপুত্রও কিছুদূর উঠিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই অপর তিনবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইল। বাঘ প্রাণ পাইয়া ঘোড়াগুলিকে নিমেষের মধ্যে হত্যা করিয়া পলাইয়া গেল। বাঘ চলিয়া গেলে চার বন্ধু গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

তাহারা নদীর তীরে আসিয়া দেখিল, একখানি বড় নৌকা যাইতেছে। তাহারা ওই নৌকায় চড়িল, পাঁচদিন পরে তাহাদের নৌকা একটি বন্দরে থামিল। চার বন্ধু খাবারের সন্ধানে সেখানে নামিয়া নগরে গিয়া ঢুকিল। নগরে সবই আছে, কোনও জীবিত প্রাণী নাই। দোকান পসার সাজানো, মানুষ নাই। তাহারা আরও কিছুদূর গিয়া দেখিল, চারজন পরমাসুন্দরী যুবতী তাহাদের দিকে আসিতেছে। তাহারা কাছে আসিয়া বলিল, আজ আমাদের অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল। এই বলিয়া চারিজন যুবতী চার বন্ধুকে বশীভূত করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া গেল।

সেই চারজন যুবতীর মধ্যে একজন রাজকুমারী ছিল। রাত্রিকালে রাজকুমারী রাজপুত্রকে বলিল, আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া মনে হয়। তাই আমার আপনার জন্য খুব দুঃখ হইতেছে। আমার সঙ্গিনী তিনজন মানুষ নয়, রাক্ষসী। উহারাই রাজ্যের সবাইকে হত্যা করিয়াছে।

আপনার বন্ধুগণ রাত্রিবেলায় জাগিয়া থাকিলে লক্ষ্য করিবেন, উহারা গভীররাত্রে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় এবং কোনও দূর দেশে গিয়া গরু মহিষ খাইয়া আসে। রাজকুমার এই কথা শুনিয়া পরদিন বন্ধুদের সকল কথা খুলিয়া বলিল। তাহারা পরপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিয়া দেখিল, রাজকুমারী ঠিক কথাই বলিয়াছে, তখন তাহারা উদ্ধারের চিন্তা করিতে লাগিল।

অধিক রাত্রি পর্যন্ত জাগিতে হইত বলিয়া রাক্ষসীরা সকালে ঘুমাইত। সেই অবসরে রাজকুমারী ও চারবন্ধু নৌকায় চড়িয়া পলায়ন করিল। দুইদিন পরে তাহারা একটি বন্দরে পৌছাইল। নিকটেই বাজার ছিল, সওদাগরপুত্র খাবার আনিতে গেল; কিন্তু আর ফিরিল না।

দেরী দেখিয়া রাজপুত্র একে একে কোটালপুত্র মন্ত্রিপুত্রকেও পাঠাইলেন; কিন্তু কেহই ফিরিল না। তখন রাজপুত্র রাজকুমারীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া

নিজেই গেলেন। রাজকুমারকে দেখিয়া বন্ধুরা বলিল, আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি যাহাকে রাজকুমারী মনে করিয়াছ, সে রাক্ষসী। চল, আমরা পলাইয়া যাই। এদিকে রাজকুমারী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিজেই বাজারে গেলেন। সেখানে নিজের মূল্যবান্ গহনা বেচিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাজকুমারের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া ঘোষণা করিলেন, যে পাশা খেলায় আমাকে হারাইতে পারিবে, সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবে।

সকলেই রাজকুমারীর কাছে পরাস্ত হইলেন। রাজকুমারও ঘোষণা শুনিয়া রাজকুমারীর সঙ্গে খেলিতে গেলেন; কিন্তু উপর্যুপরি দশবার হারিয়া গিয়া অবশেষে রাজকুমারীর কাছে হার মানিলেন। তখন রাজকুমারী নিজের পরিচয় দিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, রাজপুত্র কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং একদিন শুভলগ্নে মহাসমারোহে উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু রাজকুমারীর মনে তবু সুখ নাই। তাহার আত্মীয় পরিজনের জন্য সে সব সময়ই কাঁদিত।

তখন চারি বন্ধু আবার আশ্রমে যাইয়া সন্ন্যাসীর কাছ হইতে রাক্ষসীদের সংহার করিবার মন্ত্র শিক্ষা করিল। তাহারা রাজকুমারীর দেশে যাইয়া রাক্ষসীদের ধ্বংস করিল। তাহার পর একটি মাঠে সকলে সমবেত হইয়া চার বন্ধু নিজেদের বিদ্যা প্রকাশ করিয়া রাজকুমারীর পিতৃরাজ্যের সকলকে পুনর্জীবিত করিল।

রাজকুমারীর আর কোন দুঃখ রহিল না। রাজ্যের সবাই সুখী হইল।

মন্তব্য

চারি বন্ধুতে রাত্রির চারি প্রহর জাগিয়া থাকিয়া চারিপ্রকার বিদ্যালাভের কাহিনী বাংলা এবং বালার প্রতিবেশী অঞ্চলে নিতান্ত সাধারণ। এই কাহিনীর শেষাংশের সঙ্গে প্রথমাংশের যোগসূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ; মনে হয়, ইহা স্বতন্ত্র কোন কাহিনী হইতে আসিয়া প্রথমাংশের সঙ্গে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। শেষাংশে বিভিন্নমুখী নানা অভিপ্রায় প্রকাশ পাইবার ফলে কাহিনীটি রস-নিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। মন্ত্রদ্বারা পুনর্জীবন দান ইহার একটি অভিপ্রায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ কথা

১

পক্ষীমাতা

এক সওদাগর। তাহার শুধু মেয়ে হইত। একে একে সাতটি মেয়ে হইল। আবার সওদাগর-পত্নীর সন্তান সম্ভাবনা হইল। সওদাগর পত্নীকে বলিল, যদি এই বার মেয়ে হয়, তবে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।

যথাসময়ে সওদাগর-পত্নী সন্তান প্রসব করিল।

জীবন মরণ ভগবানের হাতে। এবারেও সওদাগরের স্ত্রীর একটি মেয়ে হইল। সূতিকা-গৃহে ধাত্রিগণ সওদাগরকে বলিল, 'রাণীর গর্ভ মিথ্যা।' পরে মেয়েটিকে একটি হাঁড়িতে পুরিয়া ও সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিল।

হাঁড়িটা ভাসিতে ভাসিতে একটা বড় নদীতে গিয়া পড়িল এবং একটা প্রকাণ্ড বটগাছের নীচে নদীর কিনারায় লাগিল। গাছে একটা চিল বসিয়াছিল, মুখ-ঢাকা হাঁড়ি দেখিয়া ছোঁ মারিয়া মেয়েটিকে বটগাছে তুলিয়া লইল।

যে শিশুর উপর জননীর দয়া হয় নাই, ধাত্রীর দয়া হয় নাই, সেই শিশুর উপর একটা পাখীর দয়া হইল। চিলটা কন্যাটিকে যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া বড় করিতে লাগিল। একটু বড় হইলে মনুষ্য-সমাগমরহিত এক গভীর বনে লইয়া গেল। একটা খুব উঁচু গাছে একটা বড় বাসা করিয়া মেয়েটিকে রাখিল এবং আগের মত যত্ন করিতে লাগিল।

মেয়েটির বয়স এখন আট বৎসর। ইহার রূপে বন আলোকিত হইয়াছে। বালিকার কালো চুলগুলি নিবিড় ভাবে হাঁটু ছাড়াইয়া পড়িয়াছে! কালো, ঘন চুলে ঢাকা মুখখানি দেখিয়া মনে হয়, নিবিড় মেঘমালার অন্তরালে বিদ্যুৎ যেন জাজ্বল হইয়া রহিয়াছে।

একদিন রাজার ও কোতোয়ালের ছেলে শিকারে আসিয়া পথ হারাইয়া সেই -বনে আশ্রয় লইল এবং যে গাছটায় মেয়েটি ছিল, তাহারই নীচে রাত্রি কাটাইল। সকালে রাজপুত্র দেখিল, তাহার গায়ে একগাছি লম্বা চুল; দেখিয়া উভয়ের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরে অনেক অনুসন্ধানের পর গাছের

উপর মেয়েটিকে দেখিল। প্রথমে তাহারা ভীত হইল, পরে বালিকাটিকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"কন্যা, তুমি কি দেবদা, না মনুষ্য ?"

"আমি মনুষ্য।"

"তুমি ইখান (অ) আইলা কেম্‌নে ?"

"কৈতাম্ পার্তাম্ না।"

"তোমারে পালে কে ?"

"চিলে।"

"তুমি বিয়া করবা ?"

"আমি কিছু জানি না।"

মেয়েটি জীবনে আর মানুষ দেখে নাই। মানুষের চেহারা দেখিয়া তাহার মনে ভারি আনন্দ হইল। সে ভাবিল, পৃথিবীতে বুঝি এমন সুন্দর প্রাণী আর নাই। কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ও হইল। সে যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

ক্ষণপরে চিলটা আসিল। আসিয়া সব শুনিয়া কন্যার বিবাহে সম্মতি দিল। মেয়েটি মানুষের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিল, ইহাদের হাত আছে, পা আছে, কান আছে, কিন্তু কি দিয়া যেন শরীর ঢাকা, তাই তাহার ভয় হইয়াছে।

পাখীটা আবার উড়িয়া গেল। দেখিয়া কোতোয়ালের পুত্র আবার গাছে চড়িল। এবার মেয়েটির জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইল। বালিকা বলিল, 'যদি রাজপুত্রে বিয়া করে, তবে বিয়া বয়াম্।'

চিলটা মেয়েটিকে বলিয়া দিল, 'মা, মনুষ্যের দেশ (অ) যাও। বিপদ্ (অ) পড়লে আমারে স্মরণ কইর্ (অ)।'

রাজপুত্র মেয়েটিকে বাড়ী আনিল। সকলে ইহার সরল সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইল। পরে এক শুভদিনে রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইল।

বিবাহের পর বালিকা ভারি বিপদে পড়িল। সে কাহারও কথা বুঝে না এবং কোনও কাজকর্ম করিতে পারে না। ইহাতে যাহারা তাহাকে হিংসা করিত, তাহারা তাহাকে উৎপীড়ন করিবার একটা সুযোগ পাইল। বালিকা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলে চিল মাকে স্মরণ করিত—

'চিলোনী লো মা, উড়চ্ (অ) না, পড়চ (অ) না, আমি আবাগ্যা জির তালাস্ (অ) করছ না।'

চিলটা মাঝে মাঝে আসিয়া কন্যার দুঃখের কথা শুনে ও উপদেশ দিয়া যায়। রাণী ও রাজা মেয়েটিকে বরাবর ভালবাসে; কিন্তু তাহার ছয় জা' তাহাকে বড় হিংসা করে ও উৎপীড়ন করে। কিন্তু বুদ্ধিমান পাখী তাহাদের দুরভিসন্ধি সব নষ্ট করিয়া দেয়; সুতরাং ইহারা সকলে পরামর্শ করিল, আর একদিন আসিলে চিলটাকে মারিয়া ফেলিবে।

চিল্‌টা আর একদিন আসিল, মেয়েটি কাঁদিয়া আকুল হইল ও তাহার ছয় জা'র দুরভিসন্ধির কথা চিল মাকে বলিয়া দিল। চিল্ মা কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'মা, কিছু ভয় নাই। যদি আমাকে মারে, তবে তুমি আমার মাংস খাই (অ) না। আমার পাখনা টাখনা একটা গাতার মধ্যে মাটি দিয়া ঢাইক্যা রাইখ্যা জি-অ, জি-অ, কৈয়া তিন কোষ জল দি (অ), তা অইলে আমি জিয়া উইট্যাম।'

চিলটা আর একদিন আসিয়া মেয়ের শাশুড়ীকে সব কথা বুঝাইতে লাগিল। শাশুড়ীও মেয়েটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিল। কিন্তু সকল জা আসিয়া বলিতে লাগিল, 'কিছু কাজকর্ম করিতে পারে না, বনের অলক্ষ্মী কৈন্যা বন্ (অ) দিয়া আইঅউক।' পরে ইহারা চিলটাকে ধরিয়া ফেলিয়া ইহার মাংস রাঁধিয়া মেয়েটিকে খাইতে দিল। মেয়েটি কিন্তু মাংস খাইল না। মার কথামত পাল্‌কগুলি কুড়াইয়া গর্তে রাখিয়া উপদেশ মত কাজ করিল। পাখীটা বাঁচিয়া উঠিয়া উড়িয়া গেল। ইহার পর হইতে চিলটা গোপনে আসিতে লাগিল।

জা'এরা সুতা কাটে, কাপড় বোনে। নূতন বৌকেও সুতা আনিয়া দিল এবং বলিল, 'যদি এই সুতা কাট্‌তা না পার, তবে বনের কন্যা বন্ (অ) দিব!' সে কোন দিন সুতা কাটে নাই, কেহ তাহাকে দেখাইয়াও দেয় না। চিল-কন্যা নিরুপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমনি চিল মা উড়িয়া আসিল, আসিয়া বলিল, 'মা, তুমি কাইন্দ্য না; তোমার চড়কা, নাটাই, টাউক্কা, ঝাঁকি, তানার খুটা, ধেনু আর চড়কি সমস্ত একটা ডোলের মইধ্যে রাইখ্যা মুখ লেইপ্যা রাখ।'

সকলেই সুতা কাটে, চিলের মেয়ে কাটে না। তাই জা-এরা তাহাকে বড়ই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কেহ লাথি মারে, কেহ ঠোনা মারে। দুঃখিনী বালিকা তখন একদিন অত্যন্ত কাতর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। চিল মা আবার আসিল, আসিয়া বলিল, 'মা, তোমার শশুররে কও, দেশ বিদেশ নিমন্ত্র

করউক ; ধল্ পাডা, ধল কৈতর দিয়া বিশকরমের পুজা কৈরা ডোলের মুখ খুলউক্।'

বৌ শ্বশুরের পায়ে পড়িয়া এই প্রার্থনা জানাইল, শ্বশুর রাজি হইল।

বৎসর শেষ হইল। ১লা বৈশাখ আবার ফিরিয়া আসিল, চিলটার কথামত বিশকরমের পুজা দিয়া মেয়ের স্বামী ডোলের মুখ খুলিল, খুলিয়া দেখিল, ডোলটা শাল, বনাত শাড়ী প্রভৃতি নানা রকম কাপড়ে ভরা। যত বাহির করে, ততই বাহির হয়, ডোল আর খালি হয় না। শ্বশুর সন্তুষ্ট হইয়া সকল ব্রাহ্মণকে শাল ও জোড়ায় জোড়ায় কাপড় দিয়া বিদায় করিল। ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিল। ব্রাহ্মণের বরে রাজার ঐশ্বর্য শত গুণ বাড়িয়া গেল। —ত্রিপুরা, ১৩২০

মন্তব্য

ইহার প্রথম অভিপ্রায় পরিত্যক্ত শিশু (Abandoned child). পক্ষী ধাত্রী (Bird nurse) ইহার প্রধান অভিপ্রায়। মহাভারতের শকুন্তলার বৃত্তান্ত অনুরূপ অভিপ্রায় হইতেই আসিয়াছে। কেবলমাত্র দীর্ঘ কেশ দেখিয়াই কেশের অদৃশ্য অধিকারিণীকে বিবাহ করিবার আগ্রহ প্রকাশও বাংলার লোক-কথার সাধারণ অভিপ্রায়। প্রকৃতি-পালিতা মানব-কন্যার প্রথম পুরুষ দর্শনের প্রতিক্রিয়াটি সেক্সপীয়রের *Tempest* নাটকের অনুরূপ ; একই অভিপ্রায় হইতে উভয়ের জন্ম। পুরুষের চেহারা প্রথম দেখিয়া কন্যাটি ভাবিল, পৃথিবীতে বুঝি এমন সুন্দর প্রাণী আর নাই, ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যমূলক। দৈবানুগ্রহ-লাভও ইহার একটি অভিপ্রায়।

২

অফুরন্ত

এক গরীব ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও চারিটি শিশু লইয়া বাস করিতেন। ব্রাহ্মণটি দেবী দুর্গাকে মনে প্রাণে ভক্তি করিতেন এবং দুর্গানাম জপ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মণের সংসার অতি কষ্টে চলিত। স্ত্রী-পুত্রকে অনাহারে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তিনি কাতর ভাবে ভগবতী দুর্গাকে ডাকিতেন।

সংসারের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন ব্রাহ্মণ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বহু দূর গমন করিলেন এবং গভীর অরণ্যে, ঢুকিয়া দুর্গার নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দেবী দুর্গা ভক্তের কান্না শুনিয়া বড়ই দুঃখ পাইলেন এবং মহাদেবকে অনুরোধ করিলেন, ভক্ত ব্রাহ্মণের দুঃখ যাহাতে দূর হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন। মহাদেব ব্রাহ্মণকে একটি মুড়কির হাঁড়ি দিলেন। হাঁড়িটি উপুড় করিতেই অতি উপাদেয় চিনির মুড়কি পড়িতে থাকিবে, উহা কখনই ফুরাইবে না।

হাঁড়িটি পাইয়া ব্রাহ্মণ মহানন্দে বাড়ীর পথ ধরিলেন। পথে একটি সরাইখানার মালিকের নিকট তাহা রাখিয়া স্নান করিতে গেলেন। পরে দুর্গা নাম জপ করিয়া হাঁড়ি উপুড় করিলেন। কিন্তু হায়! কিছুই পাওয়া গেল না। সরাইখানার মালিক আসল হাঁড়িটি চুরি করিয়া সাধারণ একটি হাঁড়ি দিয়াছিল। ব্রাহ্মণ দুঃখিত হইয়া পুনরায় সেই বনে গিয়া দেবীকে ডাকিতে লাগিলেন। মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে একটি হাঁড়ি দিলেন এবং সাবধানে রাখিতে আদেশ দিলেন। খানিক দূর গিয়া কৌতূহল বশে ব্রাহ্মণ যেই হাঁড়িটি উপুড় করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একশত ভূত-প্রেত বাহির হইয়া ব্রাহ্মণকে পিটাইতে সুরু করিল। ব্রাহ্মণ ব্যাপার বুঝিয়া হাঁড়িটি সোজা করিয়া ধরিলেন এবং ভূত মিলাইয়া গেল।

সেই সরাইখানায় এই হাঁড়িটিও রাখিয়া পুনরায় স্নান সারিয়া দুর্গা-নাম লিখিতে গেলেন। সরাইয়ের মালিক লোভে পড়িয়া যেই এই হাঁড়িটি উপুড় করিল, অমনি একশত ভূত-প্রেত বাহির হইয়া তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে ভীষণ ভাবে মারধোর আরম্ভ করিল; তাহার সরাইখানা ভাঙিয়া তছনছ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার পুর্বের হাঁড়িটি ফেরত চাহিল। মালিক তাহা যখন ফেরত দিল, ব্রাহ্মণ হাঁড়ি দুইটি লইয়া চলিয়া গেল।

এখন আর ব্রাহ্মণের কোন অভাব রহিল না। সে মুড়কির ব্যবসা করিয়া প্রচুর ধন-সম্পত্তি করিল এবং সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। প্রয়োজনের সময় মুড়কি-হাঁড়ি উপুড় করিত এবং সে হাঁড়ি কখনই ফুরাইত না।

কিন্তু সুখ বেশীদিন সহ্য হইল না। ব্রাহ্মণের ছেলেরা অসাবধানে সেই হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের পুনরায় দুর্গতি দেখা দিল। তখন সে তৃতীয়বার দেবী দুর্গার নিকট গেল। মহাদেব আর একটি হাঁড়ি দিলেন এবং আর দিবেন না বলিয়া দিলেন। এই হাঁড়িটি ছিল সন্দেশের হাঁড়ি, উহা উপুড় করিলেই স্রোতধারে সন্দেশ বাহির হইত এবং সেইরূপ উপাদেয় সন্দেশের তুলনা হয় না, তাহা ছিল দৈব-নির্মিত। সেই সন্দেশে বেচিয়া ব্রাহ্মণ ধনী হইয়া গেল। সন্দেশের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল।

জনৈক জমিদার প্রতারণা করিয়া একদিন হাঁড়িটি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিল। ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় হাঁড়িটি আনিয়া ভূত-প্রেতের সাহায্যে জমিদারকে শায়েস্তা করিয়া সন্দেশ-হাঁড়ি কাড়িয়া লইল। সেই অবধি সে হাঁড়ি দুইটি নিজের কাছে অতি সযত্নে রক্ষা করিত। ব্রাহ্মণের দুঃখ চিরকালের মত ঘুচিয়া গেল। কিন্তু এত ধন সম্পত্তির মধ্যেও ব্রাহ্মণ দুর্গা-নাম জপ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে তাহা করিয়া গিয়াছে। দেবী দুর্গা তাই তাহার উপর চিরপ্রসন্ন ছিলেন।

মন্তব্য

অফুরন্ত ভাণ্ডার (endless store) কাহিনীটির প্রধান অভিপ্রায়। দেবানুকূল্যে এই ভাণ্ডার লাভ করা যায়, দৈব অপ্রসন্ন হইলে তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। ইহাকে ঐন্দ্রজালিক (magical) শক্তিসম্পন্ন বলিয়াও মনে করা যায়।

৩

কেশবতী

কোন গ্রামে এক কুঁড়ে আধ-পাগলা ব্রাহ্মণ ছিল। কাজকর্মে তাহার মন ছিল না; ফলে সে এবং তাহার স্ত্রীর অতি কষ্টে দিন চলিত। সেই দেশের রাজার মায়ের শ্রাদ্ধে প্রচুর দান-সামগ্রী পাওয়া যাইবে, এই আশায় ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণকে জোর করিয়া রাজপ্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রাসাদের দিকে না গিয়া দু'চোখ যেদিকে চায়, সেইদিকে চলিতে লাগিল।

বহুদূর যাইবার পর একস্থানে দেখিল, কড়ির পাহাড়; তারপর একে একে দেখিল, টাকা, আধুলি ও সোনার মোহরের বিরাট-বিরাট পাহাড়। পরে একটি রাজপ্রাসাদ দেখিল এবং সেখানে একটি অপরূপ সুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ হইল। অথচ, সেই দেশে আর কোন জনপ্রাণী ছিল না।

সুন্দরী ব্রাহ্মণকে তাহার স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিল এবং সুখে রহিল। কয়েকদিন পরে ব্রাহ্মণীকে আনিতে গেল। ব্রাহ্মণী আসিলে কিছুকাল সুখে তিনজনের দিন কাটিল। ব্রাহ্মণী বুঝিয়াছিল, ওই সুন্দরী একজন রাক্ষসী। দুইজনের দুইটি পুত্র জন্মিল। রাক্ষসীর পুত্রের নাম সহস্রদল এবং ব্রাহ্মণীর পুত্রের নাম হইল চম্পাদল। দুইজনের খুব ভাব, একসঙ্গে লেখাপড়া করিত।

একদিন রাক্ষসী কাঁচা হরিণের মাংস খাইতেছিল, ব্রাহ্মণী দেখিতে পাইল। রাক্ষসী তাহা জানিতে পারিয়া দুইজনকে জীবন্ত খাইয়া ফেলিল। চম্পাদল পলাইয়া যাইতেছিল দেখিয়া সহস্রদল রাক্ষসীকে কাটিয়া ফেলিল এবং দুইজন অন্যদেশে চলিয়া গেল।

অন্য এক রাজ্যে আসিয়া সহস্রদল সেইস্থানের অন্য এক রাক্ষসীকে হত্যা করিয়া রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করিল। সেই রাজপ্রাসাদে দাসীর রূপ ধরিয়া এক রাক্ষসী বাস করিত। চম্পাদল তাহা জানিতে পারে। ইহার জন্য রাক্ষসী তাহাকে রাজমাতার সাহায্যে তাড়াইয়া দেয়। চম্পাদল বহুদূর এক রাজ্যে চলিয়া গেল।

সেই রাজ্যে কোন জনপ্রাণী ছিল না। একটি প্রাসাদে ঢুকিয়া চম্পাদল অপূর্ব একটি সুন্দরী নারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিল। তাহার মাথার কাছে সোনা ও রূপার দুইটি কাঠি দেখিয়া, সোনার কাঠি ছোঁয়াইয়া সুন্দরীকে

জাগাইল। সুন্দরীর নাম কেশবতী। সে রাজকন্যা। সেখানকার সাতশত রাক্ষসী সেই দেশের সকল মানুষকে খাইয়া শুধু কেশবতীকে রাখিয়াছিল।

প্রাসাদের সামনের দীঘির তলায় একটি স্ফটিক স্তম্ভের উপর দুইটি মৌমাছি ছিল। এক ডুবে জলের তলা হইতে মৌমাছি দুইটি আনিয়া এক কোপে কাটিতে পারিলে সাত-শো রাক্ষস-রাক্ষসী তৎক্ষণাৎ মরিবে।

কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়িলে তাহাদের সংখ্যা দশগুণ বাড়িয়া যাইবে। বুড়ী রাক্ষসীর নিকট হইতে এই গোপন কথাটি কেশবতী সংগ্রহ করিবার পর একদিন চম্পাদল সাহসের সঙ্গে মৌমাছি দুইটি হত্যা করিয়া রাক্ষসীদের বধ করিল। তাহার পর দুইজনে বিবাহ করিয়া সুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

কেশবতীর কেশ ছিল সাত হাত লম্বা। একদিন একগাছি কেশ স্নানের সময় নদীতে ভাসিয়া সহস্রদলের ঘাটে আসিয়া লাগিল। সহস্রদল কেশবতীকে বিবাহ করিতে চাহিল। রাণীমাতা তাঁহার সেই রাক্ষসী-দাসীকে পাঠাইলেন। সে মন-পবনের নৌকায় চড়িয়া সেইদেশে গেল এবং কেশবতীকে বন্দী করিয়া আনিল। কিন্তু কেশবতী ছয়মাস কাহারও মুখদর্শন করিল না।

ওদিকে চম্পাদল, কেশবতীকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইল। প্রাসাদের জানালায় কেশবতীর সাক্ষাৎ পাইল। পরদিন ছয় মাস উত্তীর্ণ হওয়ার কথা, রাজ্যে তাই বিবাহের আয়োজন চলিতেছে।

পরদিন রাজসভায় চম্পাদল উপস্থিত হইয়া প্রথানুসারে ব্রতধারিণীর বিষয় ঘোষণা করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সহস্রদলের অতীত জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিল। সহস্রদল ভাইকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং ভ্রাতৃবধূ কেশবতীর সহিত মহাধুমধাম করিয়া বিবাহ দিলেন। দাসী-রাক্ষসীর পরিচয়ও জানা গেল। তাহাকে জীবন্ত কণ্টক-কূপের মধ্যে ফেলিয়া হত্যা করা হইল। সহস্রদল তাহার স্ত্রী একদিকে চম্পাদল, কেশবতী অন্যদিকে বহুকাল সুখে রাজত্ব করিল।

মন্তব্য

ইহাতে জীবন-প্রতীক বা life token অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হইয়াছে। জীবন-প্রতীকের বিস্তৃত আলোচনার জন্য পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

কাজলরেখা

এক সদাগর। এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে একটি ধর্ম্মমতি শুকপক্ষী দিয়াছিলেন। শুকপক্ষীর পরামর্শ মত সদাগর সকল কাজ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার গৃহ ধনৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সদাগরের একমাত্র কন্যার নাম কাজলরেখা। তাহার বয়স হইয়াছে দেখিয়া সদাগর শুকপক্ষীর নিকট তাহার বিবাহের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুকপক্ষী বলিল, 'মৃত স্বামীর সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে। ইহার এই অদৃষ্ট কেহই খণ্ডন করিতে পারিবে না, ইহাকে বনবাস দিয়া আইস।' শুনিয়া সদাগরের দুঃখের আর সীমা রহিল না।

অবশেষে একদিন সদাগর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কন্যাকে লইয়া যাত্রা করিলেন, অনেক দূরে গিয়া এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে পাইয়া দুইজনে তাহার বারান্দায় বিশ্রাম করিবার জন্য বসিয়া পড়িলেন। কাজলরেখা তাহার পিতার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার বড় তৃষ্ণা পাইল, পিতার নিকট জল পান করিতে চাহিল। সদাগর বলিলেন, 'তুমি এইখানে একটু বস, আমি জল লইয়া আসি।' বলিয়া তিনি জলের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন। কাজলরেখা এ'দিক সেদিক চাহিয়া দেখিল, মন্দিরটির দ্বার রুদ্ধ, নিকটে গিয়া দ্বার স্পর্শ করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। কাজল ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইয়া গেল, শত চেষ্টাতেও আর খুলিল না। কাজল কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পালঙ্কে এক মৃত রাজপুত্র, তাঁহার সর্বাঙ্গে সূঁচ ফুটানো, চোখের দুইটি পাতায় দুইটি সূঁচ ফুটাইয়া তাহা বুজাইয়া রাখা হইয়াছে। সদাগর জল লইয়া ফিরিলেন, কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কাজলের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; মন্দিরের মধ্য হইতে কাজল সাড়া দিল। সদাগর বাহির হইতে মন্দিরের দরজা খুলিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু খুলিতে পারিলেন না। তখন সদাগর ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মন্দিরের মধ্যে কি দেখিতেছ?' কাজল যাহা দেখিতেছিল, তাহা বলিল। সদাগর বলিলেন, 'তোমার অদৃষ্টের লিখন আমি খণ্ডাইতে পারিলাম না, চন্দ্রসূর্য সাক্ষী করিয়া আমি এই মৃত রাজপুত্রের

নিকট তোমাকে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি, ইহাকে তুমি স্বামী বলিয়া জ্ঞান করিও।' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইলেন। এমন সময় এক সন্ন্যাসী আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলেন; কাজলরেখাকে দেখিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি ভয় পাইও না, একটি একটি করিয়া তোমার স্বামীর গা হইতে সূঁচগুলি খুলিয়া ফেল, কেবল চোখের সূঁচ দুইটি খুলিও না : এই গাছের পাতা দিয়া গেলাম, সকল সূঁচ খোলা হইলে চোখের সূঁচ দুইটি খুলিয়া এই পাতার রস চোখে দিও, তবেই তোমাব স্বামী বাঁচিয়া উঠিবে; কিন্তু স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় দিও না, পরিচয় দিলে বিধবা হইবে। ধর্ম্মমতি শুকপক্ষী রাজপুত্রের নিকট তোমার পরিচয় দিবে।' বলিয়া সন্ন্যাসী নিরুদ্দেশ হইলেন। কাজলরেখা সাতদিন সাতরাত্রি জাগিয়া রাজপুত্রের গা হইতে একটি একটি করিয়া সূঁচ খুলিয়া ফেলিল। চোখের সূঁচ দুইটি খুলিবার আগে মনে করিল, ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসি। ভাবিয়া শিলনোড়ার উপর গাছের পাতা কয়টি রাখিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। পুকুর ঘাটে গিয়া যখন পৌছিল, তখন এক ব্যক্তি তাহার এক যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া বলিল, 'এক সন্ন্যাসী বলিয়া গেল, তোমার একজন দাসীর প্রয়োজন, অতএব ইহাকে লইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, ইচ্ছা হইলে ইহাকে কিনিয়া লইতে পার।' কাজলরেখা হাত হইতে কাঁকন খুলিয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে তাহাকে কিনিয়া লইল; তারপর বলিল, 'তুমি মন্দিরে গিয়া গাছের পাতা কয়টি বাঁটিয়া রাখ, আমি স্নান করিয়া আসিয়া ইহার রস রাজপুত্রের চোখে দিব; সন্ন্যাসী বলিয়াছেন, তবেই রাজপুত্র বাঁচিয়া উঠিবে।' বলিয়া দাসীকে মন্দিরটি দেখাইয়া নিজে স্নান করিতে ঘাটে নামিল। দাসী মন্দিরে আসিয়া পাতা কয়টি বাঁটিয়া নিজেই সেই রস রাজপুত্রের চোখে দিল—রাজপুত্র চোখ মেলিয়া চাহিয়াই দাসীকে সম্মুখে দেখিলেন। দাসী বলিল, 'রাজপুত্র, আমি তোমার প্রাণ দিয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর।' রাজপুত্র, স্বীকৃত হইয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহাকেই নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এমন সময় স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে কাজলরেখা মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজপুত্র দেখিবা মাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কে?' কাজলরেখা কিছু বলিবার আগেই দাসী বলিল, 'আমার দাসী, হাতের কাঁকন দিয়া কিনিয়াছি; সেইজন্য কঙ্কণ দাসী নাম রাখিয়াছি।' কাজলরেখা কিছুই বলিতে পারিল না; কারণ, সন্ন্যাসীর নিষেধ—নিজের পরিচয় দিতে পারিবে না, দিলে বিধবা হইবে।

অতএব মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া নিজের সংসারে নিজের দাসীকেই দাসীর মত সেবা করিতে লাগিল। রাজপুত্রও তাহার কোন পরিচয় জানিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ দিনের পর দিন বাড়িতে লাগিল। এইভাবে বার বৎসর কাজলরেখার দুঃখের জীবন কাটিল, তারপর একদিন ধর্ম্মমতি শুক তাহার সকল পরিচয় প্রকাশ করিল। তখন রাজপুত্র তাহাকে গ্রহণ করিয়া নকল রাণীকে দণ্ড দিলেন।

মন্তব্য

নিয়তির গতি দুর্নিরীক্ষ্য—কোন কার্যকারণের সূত্রে বাঁধা নহে। অতএব এই শ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে যে সকল অবাস্তবতা ও অসম্ভাব্যতা থাকে, তাহাও নিয়তির দুর্ভেদ্য লীলা-রহস্য বিবেচনা করিয়া পাঠক-মন গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা বোধ করে না। নিয়তির স্পর্শ দ্বারা সংসারের বহু ঘটনারই কারণ যখন অজ্ঞাত হইয়া আছে, তখন লোক-কথায়ও সকল বিষয়েরই সুস্পষ্ট কারণ কেহ দাবি করিতেও শিখে নাই। ভাগ্যবিড়ম্বিত সমাজের প্রত্যেক নরনারীই এই সকল কাহিনীর মধ্যে নিজেদের জীবনের ছায়া দেখিতে পায়—প্রত্যেকেই নিজের জীবনের অনুরূপ ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে।

রূপকথা সর্বদাই রূপকাশ্রিত হইয়া থাকে, সেইজন্য ইহার রূপকথা বা রূপক কথা নামটি বড়ই সার্থক। কাজলরেখার কাহিনীতেও একটি রূপকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। সর্বাঙ্গে সূঁচবিদ্ধ মৃত রাজপুত্র বিষয়টিও একটি রূপক; ইহার তাৎপর্য—সর্বাঙ্গে তীরবিদ্ধ মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত এক রাজপুত্র। মৃত স্বামীর সঙ্গে বিবাহ কাহিনীটির একটি অভিপ্রায়। ভাগ্যের বিপর্যয় ইহার অন্যতম অভিপ্রায়।

অক্ষুরান

এক রাজার এক মেয়ের বিবাহ হয় এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে। কাঠুরিয়া সারাদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপায় করিত, তাহার দ্বারা অতি কষ্টে কোন মতে তাহাদের জীবিকা নির্বাহ হইত। একদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী তাহার মাকে বলিল, "মাগো, কিছু ধান যদি দিতে, তবে আমরা ক্ষেত করতাম।"

রাণী কিছু ধান কন্যাকে দিলেন, কন্যা আসিয়া তাহা তাহার স্বামী কাঠুরিয়ার হাতে দিলেন, কাঠুরিয়া পাড়ার প্রতিবেশীদের নিকট একখানা কোদাল সংগ্রহে বাহির হইল। যাহার নিকট কোদাল চাহিল, সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। "আমরা লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া ধান করিতে পারি না, আর তুমি কোদাল দিয়া ক্ষেত চাষ করিবে।" সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাড়ীতে একখানা ভাঙ্গা কোদাল পাইল এবং তাহা লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, "সকলেই আমাকে পরিহাস করিয়া বলে, আমরা এত চেষ্টা করিয়া লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া কিছু করিতে পারি না, আর তুমি বসিয়া ধান পাইবে। ধান এত সহজ-লভ্য নয়। আমি কেমন করিয়া ধান চাষ করিব। কন্যা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল, তুমি কোদাল দিয়া মাটীতে ধান ফেলাও, দেখিও, তাহা হইতে ধান নিশ্চয়ই হইবে।

কাঠুরিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর অনতিদূরে একখানা ক্ষেত কোদাল দিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ধান বপন করিল। সকলেই কাঠুরিয়াকে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সময় আসিলে দেখা গেল, মাঠের সকলের ক্ষেত অপেক্ষা কাঠুরিয়ার ক্ষেতেই অপর্যাপ্ত ধান হইয়াছে। সকলে অবাক্। ক্রমে ধান পাকিতে আরম্ভ করিল।

এখন পশুপক্ষী ধান নষ্ট করিতে পারে আশঙ্কায় কাঠুরিয়া ক্ষেতের মধ্যে একখানা টং প্রস্তুত করিয়া রাত্রিদিন পাহারা দিতে লাগিল। কন্যা প্রত্যহ রাত্রে খাওয়ার জন্য কিছু "তিলের গুঁড়া", "ধোপাইল জল" টং-এ রাখিয়া আসিত। কিন্তু কাঠুরিয়া একদিনও তাহা খাইতে পারিত না, সে অবাক হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি কি আমার খাবার দাও না।" কন্যা মহা বিপদে পড়িল—কি উত্তর দিবে। প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল।

এক দিন কাঠুরিয়া সন্ধ্যা না হইতে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া রহিল। রাত্রি হইলে দেখে, ক্ষেতের ঠাকুরান্ তিলের গুঁড়া ও ধোপাইল জলের গন্ধে আসিয়া তাহার টং খুঁজিতেছে। কতক্ষণ পরে তাহার খাদ্যগুলি বেশ তৃপ্তি

সহকারে খাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখন কাঠুরিয়া হঠাৎ আসিয়া ক্ষেত্রের ঠাকুরানের পায়ে পড়িল এবং জিজ্ঞাসা করিল "মা! তুমি কে? নিত্য নিত্য আসিয়া আমার রাত্রের আহার খাইয়া যাও, আর আমি উপবাস করি—আজ তোমাকে ধরিয়াছি।" ঠাকুরান উত্তর করিল, "আমি ক্ষেত্রের দেবতা,—তুমি আমার নিকট কি কি বর চাও?" কাঠুরিয়া বলিল, "আমি গরীব, খাইতে পাই না, তুমি আমার খাওয়া-পরার সংস্থান করিয়া দাও।" ক্ষেতের ঠাকুরান্ বলিলেন, "আমি আজ তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই বর দিলাম যে তোমার ক্ষেতে যে ধান হইয়াছে, তাহা কাটিয়া কখনও শেষ করিতে পারিবে না। তোমার ক্ষেতের ধান কখনও শেষ হইবে না। একবার কাটিয়া যাইবা মাত্র আবার নূতন ধানে পূর্ণ হইয়া থাকিবে।" ইহা বলিয়াই ঠাকুরান চলিয়া গেলেন।

বাড়ী আসিয়া কাঠুরিয়া স্ত্রীকে সকল বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণনা করিয়া শুনাইল। দিন চলিতে লাগিল। কতদিন গেল। তত দিনে ধান ক্ষেত পাকিয়া উঠিল। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই অবাক্।

এমন ধান মাঠে আর কাহারও হয় নাই, এখন কেহ তাহাকে ঠাট্টা করিতে সাহস পায় না। সে ধান কাটিবার বন্দোবস্ত করিল। আজ ক্ষেতে ধান কাটিয়াছে, কাল আবার ক্ষেতে গিয়া দেখে যে সেই ক্ষেত পূর্ণ। সকলে অবাক্। এইরূপে ক্রমে তাহার বাড়ীঘর ধানে ভরিয়া গেল। এখন রাখার স্থান নাই। কাজেই একদিন সে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন হর-গৌরী কৈলাসে যান। কতদূর যাইতে যাইতে গৌরী বলিল, "আমি আর যাইব না।" "কেন"? "দেখ না, এই কাঠুরিয়া কত শ্রম করিয়াছে, কিছুতেই তার ধানকাটা শেষ হয় না; সে এখন অবশ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার একটা উপায় কর।"

মহাদেব বলিলেন, "দেখ, গৌরী, তোমরা স্ত্রীলোক; চতুর্দিকে তোমাদের নজর। তোমাদের সঙ্গে করিয়া কোথাও বাহির হওয়া বড় দুষ্কর। পথে চলিয়াছ, এসব দেখিয়া ফল কি? চল, চলিয়া যাই।"

গৌরী বলিলেন, "ইহার কষ্ট দূর কর, নতুবা আমি যাইব না।" মহাদেব দেখিলেন, বড় বিপদ, তাই বলিলেন, "গৌরী! একে ডাক দিয়া বল যে, সে ডাইনে কেটে বাঁয়ে রাখে, বাঁয়ে কেটে ডাইনে রাখে" এবং 'নারই' 'নারই' বলিয়া তিনটি ডাক দেয়—তাহা হইলে আর ধান হইবে না।

গৌরী কাঠুরিয়াকে ডাকিয়া বলিলেন। সে সেই প্রকার করিল। তখন দেখে, ধান আর নূতন গজায় না। এই অবসরে হর-গৌরী চলিয়া গেলেন।

—ঢাকা; ১৩ ৮

মন্তব্য

কাহিনীটি অক্ষয় ভাণ্ডার অভিপ্রায়ের অন্তর্গত। ক্ষেতের ধান কখনও শেষ হয় না, ইহার উদ্দেশ্য তাহাই। পরোক্ষে ইহাতে নিরলস কৃষিকর্মের প্রশস্তি কীর্তন করা হইয়াছে।

দুঃখ মোচন

এক গ্রামে ছিল এক বুড়ীর পুত দুইখ্যা, তার ক্ষেত পাতর নাই। অগ্রহায়ণ মাস, সকলেই ক্ষেতে যায়, ধান কাটে, বাড়ী আনে, মাড়া মারে, গোলায় তুলে। দুইখ্যা দেখে, মনে বড় কষ্ট পায়। ৬

বড় মর্মাহত হইয়া একদিন দুইখ্যা তার মাকে বলিল, 'মা, আমার ক্ষেত কর্তে ইচ্ছা হয়।'

'আবাগ্যা, তর এক বেলা খাইলে আর একবেলার উপায় নাই, তুই ক্ষেত পাইবি কৈ!'

যাহা হউক, দুইখ্যা গ্রামের জমিদারের নিকট গিয়া তাহার ক্ষেতের আইলটি ভিক্ষা চাহিল, এই আইলটিতে সে ধান বাইন করিবে। জমিদার দয়া করিয়া দুইখ্যার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

সময়ে দুইখ্যার আইলে প্রচুর ধান হইল। অন্যের ক্ষেতের আটটি ছড়ার মত তাহার এক একটি ধানের ছড়া হইল।

দুইখ্যার কাচি নাই, ধান দাইবে কি করিয়া! দুইখ্যা অনেক ভাবিয়া একটা উপায় ঠাওরাইল। যখন অন্যের ক্ষেতের মুনিরা ধান কাটিতে কাটিতে শ্রান্ত হইয়া তামাক খায়, তখন দুইখ্যা তাহাদের কাস্তে চাহিয়া লইয়া ধান কাটে। এইরূপে ধান কাটিয়া দুইখ্যা এক বছরের সমস্ত ধান গোলায় তুলিয়া রাখিল।

বছর ফিরিয়া আসিল। ধান বাইনের সময় হইল। দুইখ্যা জমিদারের নিকট এইবার তিনটি আইল ভিক্ষা করিয়া ধান বুনিল। এবারও তাহার আইলে প্রচুর ধান হইল। প্রকাণ্ড ছড়া! এমন ছড়া আর কেহ কখনও দেখে নাই! এবারও কাস্তে চাহিয়া লইয়া দুইখ্যা ধান কাটিল।

গৃহস্থেরা ভারে ভারে ধান লইয়া যায়। দুইখ্যার অল্প ধান, তাহার এত ভার হয় না। দেখিয়া দুইখ্যার বড় কষ্ট হইল। দুইখ্যা মনের কষ্টে গামছা বিছাইয়া আইলে সমস্ত দিন শুইয়া রহিল। শীতের মিষ্ট রৌদ্র ক্রমে তীক্ষ্ণ হইয়া আবার মিষ্ট হইল, শেষে একেবারে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িল, দুইখ্যা উঠিল না। ক্ষেত্রপালের মনে দয়া হইল; তিনি ব্রাহ্মণের বেশে

দুইখ্যার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 'আরে, দুইখ্যা, তুই কা এম্‌নে পইড়া রইছত্ ?' দুইখ্যা তার দুঃখ-কাহিনী সরল ভাবে বলিয়া শেষ করিল, দুইখ্যার চোখে জল আসিল।

ঠাকুর বলিলেন, 'ওঠ! বাড়ী যা; রোজ সকালে আইয়া দেখবি, তোর ক্ষেতে ছড়া অইয়া রইছে। যত দিন ইচ্ছা, তুই তোর ক্ষেত দাইতে পারবি। কিন্তু দেখিস, তোর মা যেন কোন দিন ক্ষেত না দেখে। দেখলে কিন্তু নাড়া ক্ষেতে আর ছড়া মেলবে না।'

দুইখ্যার মা দেখিল, দুইখ্যা ধানের পাড়া দিয়া বাড়ী ভরিয়া ফেলিয়াছে। বুড়ীর মনে ঘোর সন্দেহ হইল। দুইখ্যা এত ধান আনে কোথা হইতে! বুড়ীর সন্দেহ হইল, বুঝি দুইখ্যা অন্যের ক্ষেতের ধান চুরি করিয়া আনে।

বুড়ী দুইখ্যাকে অনেক প্রশ্ন করিল, দুইখ্যা কিন্তু কিছুই বলিল না। পরে একদিন বুড়ী খুব সকালে 'নাড়া' ক্ষেতে গিয়া দেখিল, নাড়ার মাথায় ধানের ছড়া বাহির হইয়া রহিয়াছে! বুড়ী সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দুইখ্যা ধান কাটিতে আসিল, দেখিল, শুধু নাড়া শুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আজ আর ছড়া নাই! দুইখ্যা কাঁদিয়া ফেলিল। ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া বুড়ীকে অনেক গালাগালি দিল।

সন্ধ্যাকালে দুইখ্যা আবার ক্ষেতের আইলে পড়িয়া হত্যা দিল। ক্ষেত্রপাল ঠাকুর আসিয়া দুইখ্যার মনের দুঃখ আবার শুনিল। শুনিয়া বলিল, 'তোর নাড়া ক্ষেতে আর ছড়া মেলবে না; তবে তোর মাকে বল গিয়া সে যেন বছর বছর অগ্রহায়ণ মাসে ক্ষেত্রপালের ব্রত করে। তাহা হইলে তোর আইলে এত ধান হইবে যে, এক বছরে তোর সমস্ত ধান লাগিবে না।'

মন্তব্য

ইহার একটি প্রধান অভিপ্রায় বাধা-নিষেধ (taboo)। ক্ষেত্রপাল নিষেধ করিলেন, দুইখ্যার মা যেন তাহার ক্ষেতের দিকে না তাকায়। বাধানিষেধ (taboo) অভিপ্রায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, তাহা ভঙ্গ করা হইবে এবং তজ্জনিত দণ্ডভোগ করিতে হইবে। এখানে তাহাই হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহে সম্পদ লাভ ইহার অন্যতম অভিপ্রায়।

৬

গোমাংসের সাধ

একদেশে এক রাজা আর রাণী ছিল। রাণীর একদিন গোমাংস খেতে ইচ্ছে হয়েছে। সে তার প্রতিবেশীর মেয়েকে তার মনের ইচ্ছা বলল। সেই প্রতিবেশীর মেয়ে রাজাকে লুকিয়ে কাপড়ের মধ্যে কোরে গোমাংস দিয়ে গেল।

রাজা রাণীকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রাণী, তোমায় মেয়েটা কি দিয়ে গেল? রাণী রাজার ভয়ে কিছু বলতে পারল না। সে শুধু দেবতার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল, 'হে ঠাকুর, আমার যে গোমাংস খাবার সাধ হয়েছিল, রাজা জানতে পারলে আমার গর্দান যাবে। ঐ গোমাংস যেন ফুল হয়ে থাকে।' তারপর রাণী ঠাকুরকে নমস্কার কোরে ঢাকা খুলে দেখে, সেই গোমাংস জবাফুল হয়ে আছে। রাজাকে দেখাতে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

আর একদিন রাজার মা রাত্রির বেলা ঘরে শুয়ে শুনতে পেলেন, যেন ঘরময় কি ঘুরছে, আর এঁড়ে গরুর মত চীৎকার করছে। আরও রাত্রিরে দেখেন যে একটা শাঁখ বেজে বেজে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও পরে দেখেন যে, কাঁসর ঢং ঢং করে বাজতে বাজতে ঘুরছে। কিন্তু রাজার মা কাউকে সে কথা বলেন নি।

রোজই রাতে একই জিনিস দেখে, আর ঘুম হয় না। রাজা ও রাণী ত্'জনেই দেখলেন যে, তাঁদের মা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। রাজা তখন মায়ের ওষুধের চেষ্টায় গামছা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাজার হাঁটা অভ্যাস নেই।

তিনি ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় ঘাটের কাছে বসে পড়লেন। রাজার কষ্ট দেখে দেবতার দয়া হলো। তিনি রাজাকে বললেন, 'কেন, তুই মিছিমিছি হাঁটছিস্? ওষুধ তো ঘরেই আছে। তোর মায়ের বাক্সয় ঠাকুরের পুজোর সুপুরি বাঁধা আছে। ঐ সুপুরি ধুয়ে তিন দিন জল খাওয়ালে তোর মায়ের সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে। সেই কথা শুনে রাজা ফিরে এলেন, আর দেবতার কথা মত কাজ করলেন। এতে তার মায়ের অসুখ ভাল হয়ে গেল। তিনি আগের মত স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। পরে রাজা জান্‌লেন,

অশুচি অবস্থায় তাঁর মা তামা, গরু, শাঁখ, ঘণ্টা ছুঁয়েছিলেন ; সেইজন্য তিনি কদিন ভয় পেয়েছিলেন। তাঁর সব দোষ কেটে গেছে।

—২৪ পরগণা, ১৯৬৪

মন্তব্য

ইতিপূর্বে লোভীর কথা অধ্যায়ে বাছুরের মাংস খাইবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে গোমাংস খাইবার সাধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমানে হিন্দু মুসলমানের সমাজে খাদ্যাখাদ্যের যে আচার-বিচার হইয়াছে, যে সমাজ হইতে লোক-কথাগুলির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাতে তাহা ছিল না। সেই সূত্রেই এই প্রসঙ্গ ইহাতে আসিয়াছে।

অবিশ্বাসের ফল

এক ছিল গৃহস্থ। তাহার মাতা প্রতি বৎসরই ভক্তি সহকারে পাটাই ব্রত করিতেন। দেবীর কৃপায় গৃহস্থের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। গৃহস্থ যুবক, কিন্তু অবিবাহিত। সকল সুখের অধিকারিণী হইয়াও, একমাত্র পুত্র বিবাহ না করায় গৃহস্থের মাতার মনে শান্তি ছিল না। এমন দিন যাইত না, যেদিন মাতা পুত্রকে বিবাহ করিতে অনুরোধ না করিতেন, কালক্রমে পুত্রের মত পরিবর্তিত হইল; মায়ের অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না, বিবাহ করিতে সম্মত হইল। ইহাতে মাতা অতিশয় সুখী হইলেন।

একদিন শুভদিনে শুভলগ্নে গৃহস্থের বিবাহ হইল। পরমা সুন্দরী বধূ পাইয়া গৃহস্থের মাতার আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এবার বৃদ্ধা পুত্রবধূ সহ খুব ঘটা করিয়া পাটাই ব্রত করিবেন। তাই গৃহস্থ পূর্ব হইতেই নানা দ্রব্য আনয়ন করিতে লাগিল। ব্রতের দিন শাশুড়ী বধূসহ পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিলেন।

বধূ পিতৃগৃহে, এমন কি, তথাকার কোন বাড়ীতেই এই ব্রত করিতে দেখে নাই। সে 'পাটাই' নাম শুনিয়া এই ব্রতের প্রতি মনে মনে অবহেলা করিয়াছিল এবং ভাবিয়াছিল যে, ইহাতে কোন লাভ নাই; অনর্থক সারাটা দিন অনাহারে কষ্টে অতিবাহিত করা। পূজার সময় সে ভাবিয়াছিল যে, পূজাটা শীঘ্র হইয়া গেলেই ভাল; নতুবা উপবাস-ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে।

সেই রাত্রেই বধূটি অতি যন্ত্রণাদায়ক পেট ব্যথায় সারা রাত্রি চীৎকারে ও অনিদ্রিতাবস্থায় যাপন করিল। পরদিন গৃহস্থ চিকিৎসক আনিল। চিকিৎসক রোগিণীকে ঔষধ দিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলই পাওয়া গেল না। গৃহস্থ ও তাহার মাতা উদ্বিগ্নচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন, আর কেন এমন হইল, তাহা ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেন না।

রাত্রিতে গৃহস্থের মাতা স্বপ্নে দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময়ী দেবী বলিতেছেন, 'তুমি যে বউ ঘরে আনিয়াছ, তাহার দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস ভক্তি নাই। আমাকে সে মনে মনে হেয় জ্ঞান করিয়াছে। মতি পরিবর্তিত না হইলে তাহার কষ্ট দূর হইবে না।'

পরদিন প্রাতে বৃদ্ধা, পুত্র ও বধূর নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। ইহা শুনিয়া বধূর প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে তখনই দেবীর উদ্দেশে ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করিল, 'মা, আমি অবোধ বালিকা, না বুঝিয়া অন্যায় করিয়াছি; দয়া করিয়া নিজগুণে তোমার এ অধম সন্তানকে ক্ষমা কর, মা! আর যে এ দারুণ কষ্ট সহ্য হয় না, কৃপা করিয়া এ অসহ্য ক্লেশ দূর কর, মা! তোমার প্রতি আমার ভক্তি অটুট থাকিবে। আমি শাশুড়ী মাতার সহিত প্রতি বৎসরই নিয়ম নিষ্ঠা সহকারে ব্রত করিব।'

বধূর কাতর প্রার্থনায় দেবীর দয়া হইল। সত্বরই তাহার বেদনা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। সেই বৎসর পবিত্রভাবে খুব ঘটা করিয়া শাশুড়ী পুত্রবধূসহ পাটাই ব্রত করিলেন। তাহাদের কোন দুঃখ রহিল না। তাহারা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করিতে লাগিল।

—ঢাকা, ১৩৩০

মন্তব্য

শ্বশুর গৃহে যে দেবতার পূজার অনুষ্ঠান হইতেছে, বধূ তাহার পিতৃগৃহে সেই দেবতার পূজা দেখে নাই বলিয়াই যে সেই দেবতার প্রতি বধূর অবিশ্বাস, তাহা নহে। এই অবিশ্বাসের আরও নিগূঢ় কারণ আছে। ইহাতে অসবর্ণ বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এমন কি, ভিন্ন সম্প্রদায় হইতেও কন্যা গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহাতে সে যুগের সামাজিক ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে মনে হয়।

যে গল্পের শেষ নাই

অজয় নগরের রাজকন্যা সূর্যমণি প্রত্যূষে এক আশ্চর্য ঘটনা নিরীক্ষণ করিলেন। যেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, সেখানে কেমন করিয়া পুরুষের উত্তরীয় তাঁহার গায়ে ঢাকা পড়িল। রাজকন্যা সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা এ বিষয়ে নীরবতা প্রদর্শন করিলে রাজকন্যা অনন্যোপায় হইয়া নিজেই সেই পুরুষের সন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রে নিদ্রার ভান করিয়া রাজকন্যা শুইয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হইল, তখন তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, কি যেন তাঁহার ঘরে সন্তর্পণে প্রবেশ করিতেছে। তাহার পর এক অপরিচিত যুবা ধীরে ধীরে তাঁহার পালঙ্কে আসিয়া বসিল। যুবা যেই রাজকন্যার গায়ে হাত দিয়াছেন, অমনই রাজকন্যা উঠিয়া প্রদীপটি উস্কাইয়া দিলেন। কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার এই দুঃসাহস। কামদেব তখন বিনীত ভাবে তাঁহার দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলেন। প্রথমে আপত্তি থাকিলেও কামদেবের মুখের দিকে তাকাইয়া কন্যার বড় করুণা হইল। কেন না, করুণ সুন্দর মুখখানি তাঁহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। রাজকন্যা বলিলেন, বলুন আপনার কাহিনী।

কামদেব বলিতে লাগিলেন, অবন্তী নগরে সদানন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র। সেখানে ছিল এক গরীব ব্যাধের বাড়ী। পাখী শিকার করিয়া কোনমতে তাঁহার সংসার চলিত। তাহাতে কোন দিন তাহাদের উদরান্নের সংস্থান হইত, কোনদিন বা হইত না। সংসারে ব্যাধেরা ছিল স্বামী আর স্ত্রী। ধার্মিক ব্যাধ কোনদিনই তাহাদের দুঃখের কথা রাজার গোচরে আনয়ন করেন নাই। কেবল দুঃখের দিনে তাহারা ভগবানকেই ডাকিত।

একদিন ক্ষুধায় জর্জরিত হইয়া ব্যাধপত্নী স্বামীকে ভর্ৎসনা করিল। ব্যাধ সাতনলা কাঁধে লইয়া শিকারের অনুসন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করিল। ভরসা যদি সত্যনারায়ণ কৃপা করেন।

অরণ্যে ঘুরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়াও একটিও শিকার জুটিল না। তখন ক্লান্ত ব্যাধ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। ব্যাধের দুঃখ দেখিয়া

দয়াল ঠাকুরের দয়া হইল। এমন সময় একটি সুন্দর পাখী অশ্বথের ডালে আসিয়া বসিল। সাতনলায় আঁঠা মাখাইয়া অতি সন্তর্পণে ব্যাধ সেই পাখীটিকে ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু কি আশ্চর্য ! পাখী মানুষের সুরে কথা বলিতে লাগিল। তাহার পর আরো আশ্চর্য ! সুরে কীর্তন করিতে আরম্ভ করিল। সেই গানে সমগ্র বনভূমি আমোদিত হইল। তারপর সে বলিল, আমাকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে অমূল্য রত্ন দান করিব। ব্যাধ পাখীকে মুক্ত করিয়া দিল। পাখী গলা হইতে তিনটি অমূল্য মাণিক উগরাইয়া দিল। ব্যাধ ভাবিল, ইহা মায়া। পাখী তাহা অনুভব করিয়া বলিল, এই মাণিক মিথ্যা নহে। এই মাণিক রাজার নিকট লইয়া গেলে বহু মূল্য দিয়া রাজা ক্রয় করিবেন।

ব্যাধিনী অধীর প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন, ব্যাধ তিনটি মাণিক লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি একটি মাণিক রাগ করিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। রাত্রে মাণিকের আলোয় আকৃষ্ট হইয়া নগর কোতোয়াল তাহা কুড়াইয়া লইল।

এদিকে ব্যাধ সন্দিগ্ধ মন লইয়া রাজ-দরবারে চলিলেন। রাজা উপযুক্ত মূল্য দিয়া মাণিক দুইটি ক্রয় করিয়া লইলেন। রাজা ইহার জন্য দুইশত টাকা দাম দিলেন। সেই টাকায় চাল, ডাল, আলু, ক্রয় করিয়া স্ত্রীকে রন্ধন করিতে বলিলেন। রাজা সেই দুইটি মাণিক দিয়া রাণীর কানের দুল গড়াইয়া দিলেন। কিন্তু রাণী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। আরো একটি মহামূল্যবান্ মণিক রাজার নিকট চাহিলেন। নগর কোতোয়াল সেই মলামূল্যবান্ মাণিকটি রাজাকে দিলেন। রাজা রাণীর মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। সেই মাণিক দিয়া তিনি মাথার সঁীথি নির্মাণ করিলেন। তবু রাণীর আশা পরিপুরিত হইল না। তিনি আরো মাণিক চাহিয়া বসিলেন। এক শত মাণিক দিয়া তিনি হার গড়াইবেন। ব্যাধকে রাজা আদেশ দিলেন, যেমন করিয়াই হউক সেই মাণিক সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। তিন দিনের মধ্যে এই মাণিক অতি অবশ্যই অনিতে হইবে—এই আদেশে ব্যাধ গভীর অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল, অনেক প্রচেষ্টার পর সেই পাখীর সন্ধান পাওয়া গেল। পাখী যখন ব্যাধকে মাণিক জোগাড় দিতে পারিল না, তখন ব্যাধ সেই পাখীটিকে রাজার নিকট ধরিয়া লইয়া গেল।

পাখীর মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া রাজা ও রাণী ভক্তিবিগলিত চিত্তে আত্মহারা হইয়া গেলেন। সোনার খাঁচায় পাখী দিন কাটাইতে লাগিল।

একদিন সভাস্থ পাত্রমিত্রদিগকে সঙ্গীত শোনাইবার উদ্দেশ্যে রাজা পাখীটিকে লইয়া আসিলেন। এমন সময় সভায় বাঘ বাঘ বলিয়া কোলাহল উঠিল। সকলে সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রহিলাম কেবল আমি। পাখীটি আমায় বলিল, যদি আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিই, তবে আমাকে সে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র ঘুরাইয়া লইয়া আসিবে। পাখীর কথায় আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। পাখী নানা বিশ্বাসযোগ্য কথা বলিয়া আমার সুগভীর বিশ্বাস উৎপাদন করাইল। আমি অগত্যা পাখীটিকে ছাড়িয়া দিলাম। রাজা এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন। কাকুতি মিনতি করিয়াও রাজার নিকট হইতে মুক্তি পাইলাম না।

জহ্লাদ বধ্যভূমিতে আমাকে লইয়া গেল। আমি বিপদহারী মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলাম। জহ্লাদ যখন আমাকে স্নান করাইবার জন্য জলে নামাইল, তখন পাখী কোথা হইতে আসিয়া আমাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। পাত্র-মিত্র হায় হায় করিতে লাগিল। পাখী রাণীকে বলিলেন, তেরো বছর পরে আমার সঙ্গে সে পুনরায় আসিয়া দেখা দিবে।

তাহার পর বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করাইয়া পাখী এক কাননে বৃক্ষের সহিত আমায় বাঁধিয়া রাখিয়া গেল। যন্ত্রণায় প্রাণ কাতর হইল।

এবারও বিপদহারী মধুসূদন আমাকে উদ্ধার করিলেন। পাখী আবার আসিয়া আমাকে অন্য কাননে লইয়া গেল। সেখানে সেই পাখী খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করিয়া দিল।

এমন সময় তোমার অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের কথা পাখী আমাকে বলিল। আমার সহিত তোমার বিবাহ হউক, ইহাই পাখীর ইচ্ছা। কিন্তু কেমন করিয়া তোমার পুরীতে প্রবেশ করা যাইবে. তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। পাখী মন্ত্র জানিত। ইন্দ্রজাল সে ছিন্ন করিয়া দিল, আমি তোমার পুরীতে প্রবেশ করিলাম।

এই কাহিনী শুনিয়া রাজকন্যা কামদেবকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিলেন।

রাজকন্যা সন্তান-সম্ভবা জানিয়া রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং কে এই অন্যায়কারী পুরুষ তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য কড়া হুকুম দিলেন। রাজপুত্র কামদেব অচিরে ধরা পড়িলেন। রাজার আদেশে পুনরায় কামদেবের প্রাণদণ্ড

হইল। রাজকন্যা ঘাতককে অনুনয় বিনয় করিলেও কিছুতেই সে তাঁহার কোন কথা শুনিল না। এবারও পাখী দুইজনকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। একদিন সূর্যমণির অমৃতফল খাইবার ইচ্ছা হইল। পাখী সিংহল দ্বীপ হইতে দুইটি অমৃতফল লইয়া আসিতে গিয়া পথে মৃত্যুবরণ করিল। কামদেব ও সূর্যমণি দেখিতে পাইলেন, পথে পাখীটি মরিয়া গিয়াছে। তাহার মুখে রহিয়াছে দুইটি অমৃত ফল।

তাহারা গভীর দুঃখে পাখীটির শেষ কৃত্য সম্পাদন করিলেন। ইহার পর রাজকন্যা একটি সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম হইল বীরবর। এদিকে ভগবান মায়া করিয়া একটি কলার ভেলা ভাসাইয়া দিলেন। কামদেব, সূর্যমণি, শিশুপুত্র বীরবর সেই কলার মান্দাসে করিয়া দেশে ফিরিতে উদ্যোগ করিলেন। এমন সময় রাজকন্যা দেখিতে পাইলেন, স্রোতের টানে একটি ইঁদুর ভাসিয়া যাইতেছে। রাজকন্যার মনে খুব দয়া হইল। তিনি ইঁদুরটিকে কলার ভেলায় তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ইঁদুর তাহার স্বভাবগুণে ভেলাটি তিন টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিল। তিন জনে তিন দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

—মেদিনীপুর

মন্তব্য

ইহার প্রধান অভিপ্রায় বাক্‌শক্তি সম্পন্ন পাখী। যে গল্পের শেষ নাই (unending tale or endless tale)ও লোক-কথার অভিপ্রায়, ইহাতে তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। নানা কাহিনীর সংমিশ্রণের ফলে ইহার প্রধান অভিপ্রায়টি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

৯

একতোলা কন্যা

এক কামারের ছেলে আর এক গৃহস্থর ছেলে। দুইজনই বড় অলস। সেইজন্য কেউ তাহাদিগকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সবাই কেবল দূর দূর ছি ছি করিত। একদিন তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিয়া দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বহু দূর দেশে গিয়া এক রাজবাড়ীতে তাহারা কর্মপ্রার্থী হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কে কি কাজ করিতে জান?'

কামারের ছেলে বলিল, 'আমি বিশেষ কোন কাজ জানি না, তবে লোহা দিয়া বক তৈরী করিতে পারি, সেই বক জল হইতে মাছ ধরিয়া খাইতে পারে। সেই মাছও আমি তৈরী করিতে জানি।'

রাজা বলিলেন, 'আচ্ছা, তাহাই কর দেখি।'

কামারের ছেলে লোহা দিয়া বক তৈরী করিল, তারপর মাছ তৈরী করিল। লোহার বক জল হইতে সেই মাছ ধরিয়া খাইয়া রাজাকে দেখাইয়া দিল। রাজা দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। রাজবাড়ীতে তাহাকে একটা কাজে বহাল করিয়া দিলেন। এইবার গৃহস্থের ছেলের ডাক পড়িল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কাজ জান? গৃহস্থের ছেলে বলিল, আমি কাজের মধ্যে কেবল ঘুড়ি তৈরী করিতে জানি। যদি সতী মায়ের সন্তান হয়, তবে আমার ঘুড়ি তাহাকে লইয়া আকাশে উড়িতে পারে।

রাজা তাহাকে ঘুড়ি তৈরী করিতেই আদেশ করিলেন। গৃহস্থের ছেলে অনেকদিন পরিশ্রম করিয়া এক বিরাট ঘুড়ি তৈরী করিল। রাজা ভাবিলেন, তাহার পুত্র সতী নারীর সন্তান কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই ভাবিয়া রাজ্যের সকলকে আহ্বান করিয়া ঘুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন।

একটী প্রকাণ্ড স্থানে গিয়া রাজা তাহার পুত্রকে সকলের সমুখে ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে বলিলেন। ঘুড়ির সঙ্গে রাজপুত্রকে বাঁধিয়া ঘুড়ি উড়াইয়া দেওয়া হইল, ঘুড়ি রাজপুত্রকে লইয়া শূন্যে উড়িল। ঘুড়ি সূতা ছিঁড়িয়া এক রাজার রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যে গিয়া উড়িয়া পড়িল। অপরিচিত

দেশে আসিয়া রাজপুত্র আশ্রয়ের সন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে এক মালিনীর গৃহে আশ্রয় পাইল। মালিনী রাজবাড়ীতে ফুল জোগাইত। রাজপুত্র তাহাকে মাসী বলিয়া ডাকিল।

একদিন রাজপুত্র নিজেই একটি মালা গাঁথিয়া মালিনীকে রাজবাড়ীতে লইয়া যাইতে বলিল। রাজকন্যা মালাটি হাতে লইল, ইহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া তারপর মনে মনে কি ভাবিল; মালিনীকে বলিল, তুই একটু দাঁড়া, আমি এখনই একটু আসি। বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। তারপর ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মালিনীর গালে শক্ত করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। মালিনী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিষণ্ণ বদনে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিল।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিল, 'মাসী, রাজবাড়ীতে আজ কি পুরস্কার পাইলে বলিলে না?'

মালিনী বলিল, 'এই দেখ, কি পাইয়াছি।' বলিয়া নিজের গালটি দেখাইয়া দিল। রাজকুমার চাহিয়া দেখিল, সেখানে লেখা আছে, 'কে তুমি ফুলের মালাটি আমার জন্য বসিয়া বসিয়া এত চিকন করিয়া গাথিয়াছ? আমাকে দেখা দিবে না?'

কি করিয়া রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করা যায়, রাজপুত্র ভাবিতে লাগিল। তারপর এক কাগজের ময়ূর তৈরী করিল। গভীর রাত্রে রাজপুত্র কাগজের ময়ূরে চড়িয়া রাজকন্যার শয়ন-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইল। দুইজনের মিলন হইল। ভোর না হইতেই আবার কাগজের ময়ূরে চড়িয়া রাজপুত্র মালিনী মাসীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। প্রতিরাত্রেই বিদেশী রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার মিলন হইতে লাগিল।

রাজা নিজের কন্যার প্রতিদিন তুলাদণ্ডে ওজন করিতেন। তাহার এক তোলা ওজন ছিল, ক্রমে রাজা দেখিতে পাইলেন, তাহার ওজন বাড়িতেছে। রাণী একদিন সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার ওজন বাড়ে কেন?' রাজকন্যা বলিল,'লাউ কুমড়া খাইয়া ওজন বাড়িতেছে।'

রাজা সবই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন, এই কন্যা জাতিকুল মজাইবে। ভাবিয়া কন্যাকে বনবাস দিতে মনস্থ করিলেন।

একদিন রাজা তাহাকে বলিলেন, 'চল, মা, একটু বেড়াইয়া আসি।' বলিয়া তাহাকে লইয়া এক গভীর বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকন্যা আর পথ

চলিতে পারিল না, বলিল, 'বসিয়া একটু বিশ্রাম করি।' রাজা সম্মত হইলেন। বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে রাজকন্যা ঘুমাইয়া পড়িল। রাজা এই সুযোগে তাহাকে গভীর বনের মধ্যে ফেলিয়া পলাইয়া গেলেন।

ঘুম ভাঙ্গিয়া রাজকন্যা দেখিল, পিতা তাহাকে নির্জন অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে রাজপুত্র রাজকন্যার সন্ধান করিতে করিতে আসিয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তারপর রাজকন্যাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া নিজের রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

—ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা হইতে সংগৃহীত

মন্তব্য

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সঙ্গে ইহার সম্পর্ক থাকিলেও ইহার আরও কতকগুলি অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমতঃ কুঁড়েমি (laziness) লোক-কথার একটি সাধারণ অভিপ্রায়। প্রত্যেক দেশের লোক-কথাতেই বহু প্রকার কুঁড়ে বা অলস প্রকৃতির চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। অনেক সময় অলসতা লইয়া প্রতিযোগিতার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশের আর একটি অলসের কাহিনী এই প্রকার :

দুই বন্ধু, তাহারা উভয়েই সমান অলস। তাহারা কেবল ঘুমাইত, কোন কাজকর্ম করিত না। তাহারা যে ঘরে ঘুমাইত, একদিন সেই ঘরে আগুন লাগিয়া গেল ; যখন তাহারা পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইল, তখন একজন অলস আর একজন অলসকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কত রবি জ্বলে রে।' অর্থাৎ আজ আকাশে কয়টি সূর্য উঠিয়াছে ?

চোখ না খুলিয়াই দ্বিতীয় অলস ব্যক্তি তাহার জবাব দিল, 'কেবা আঁখি মেলে রে।' অর্থাৎ কষ্ট করিয়া চোখ খুলিয়া তাহা কে দেখে ? বলা বাহুল্য তাহারা আগুনে পুড়িয়া মরিল, তথাপি অগ্নিদগ্ধ গৃহ হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল না। অধ্যাপক স্টীথ টমসনও বলিয়াছেন, 'The most popular stories about lazy men are concerned with absurd cases of extreme laziness.' পূর্বেই বলিয়াছি, দুই অলস প্রকৃতির লোকের মধ্যে অলসতার প্রতিযোগিতা লইয়াই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই নানা কাহিনী

প্রচলিত আছে। এই প্রকার কাহিনীকে ষ্টীথ টমসন অভিপ্রায় (W111.1) এবং আদর্শ (Type) ১৯৫০ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত কাহিনীটি অলস প্রকৃতির ব্যক্তির উল্লেখ দিয়া আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের অলসতার বৃত্তান্ত দিয়া শেষ হয় নাই। সুতরাং মনে হয়, মূল কাহিনীটি এখানে কোন কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র একটি অভিপ্রায় এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়া গিয়াছে। এই কাহিনীর পরবর্তী অংশে যে অভিপ্রায়গুলি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া (magic)-র কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। লোহার বকের জল হইতে মাছ ধরা, ঘুড়ি মানুষকে লইয়া আকাশপথে যাত্রা করা, কিংবা কাগজের ময়ূরে চড়িয়া নায়িকার শয়ন কক্ষে নায়কের উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। ষ্টীম টমসন্ এই শ্রেণীর অভিপ্রায়কে D800 সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। আরব্য উপন্যাসের ঐন্দ্রজালিক গালিচা (magic carpet) ইহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হয়। কিন্তু এই কাহিনীতে যে অভিপ্রায়টি সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা কাহিনীর শেষাংশে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গোপন যৌন-সম্পর্ক। ইংরেজীতে ইহাকে Conception from casual contact with man (T 531) অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তারপর লোকলজ্জার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পিতা যে কন্যাকে বনবাসে বিসর্জন করিলেন, তাহাও লোক-কথার একটি বিশেষ অভিপ্রায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

এই কাহিনী সম্পর্কে একটি প্রধান কথা এই যে, ইহাতে যে নৈতিক ব্যাভিচারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহার লোক-কথার গুণ বিনষ্ট হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর প্রভাব হইতে বুঝিতে পারা যায়, ইহা কোন রোমান্টিক প্রণয়াখ্যানের সঙ্গে রূপকথার সংমিশ্রণের ফলে রচিত হইয়াছে। কাগজের ময়ূরে চড়িয়া একস্থান হইতে অন্য স্থানে উড়িয়া যাইবার বৃত্তান্তের উপর মধুমালা ও মদনকুমারের রূপকথার প্রভাব অনুভব করা যায়। ইহা একদিক দিয়া মুস্‌লিম প্রণয়াখ্যান এবং অন্য দিকে বাংলার রূপকথার প্রভাবজাত রচনা, আনুপূর্বিক রূপকথারূপে ইহাকে গ্রহণ করিবার পথে বাধা আছে।

১০

বাঁদর স্বামী

ব্রাহ্মণের বিটিরা দিনে দিনে নদীতে সিনান করে। এক বাঁদর দেখে কাপড়গুলা নিয়ে গাছে রেখেছে। পরে ঘাটে উঠে মেয়েগুলা দেখে কাপড় নেই, বাঁদরগুলা কাপড় নিয়ে গাছে উঠেছে। তারা বলল্, 'বাঁদর, কাপড় দাও।, বাঁদর বলে, 'তোমাদের ছোটবোনের সঙ্গে আমার বিয়ে দাও, নয় তো কাপড় দিব না।' মেয়েগুলো বললে, 'হাঁ দিব।'

বিকেলে ব্রাহ্মণের মেয়েগুলা ঘরে আছে ; এমন সময় বাঁদর এসে ঘরের চালে ঝাপর ঝুপুর করছে।

তাই দেখে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী বল্লে, 'তোমরা কি বাঁদরকে কিছু বলেছ?'

তখন ব্রাহ্মণের মেয়েরা বল্লে, 'আমরা বাঁদরের সঙ্গে ছোট বোনের বিয়ে দেবার কথা বলেছি।'

তাই শুনে মা-বাপ বল্লে, 'তবে তো বিয়ে দিতে হবে।'

রাত্রে বিয়ে হলো, খাওয়া-দাওয়া হলো। কিন্তু সকাল না হতেই বাঁদরটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে নিয়ে রওনা হলো।

অনেক দূর যেতে যেতে ব্রাহ্মণের মেয়ে—বড় লোকের মেয়ে বলল্,

'বাঁদর যায়, মা, ডালে পাতে,
আমি যাই, মা, রাস্তাতে।
সত্য করে বল্রে, বাঁদর,
আর কতদূর আছে?

বাঁদর বল্লে,

'ঐ তো কাছে।'

যেতে যেতে এক রাজার দেশ পেরিয়ে গেল। ব্রাহ্মণের মেয়ে বল্লো,

'বাঁদর যায়, মা, ডালে পাতে
আমি যাই, মা, রাস্তাতে।
সত্য করে বলরে, বাঁদর,
আর কতদূর আছে?'

বাঁদর বল্লে,

'ঐ তো কাছে।'

দেখতে দেখতে আরও এক রাজার দেশ পেরিয়ে গেল। ব্রাহ্মণের মেয়ে আবার বল্‌লে,

'বাঁদর যায়, মা, ডালে পাতে
আমি যাই, মা, রাস্তাতে।
সত্য করে বলরে বাঁদর
আর কত দূর আছে?'

বাঁদর বল্‌লে,

'ঐ তো কাছে।'

এমনি করে সাত রাজার দেশ পেরিয়ে গেল। বাঁদর ব্রাহ্মণের মেয়েকে এক আমপাতার ঘরের কাছে নিয়ে এল। বাঁদর ঘরে ঢুকতেই তো ঘর উলটে গেল। বাঁদর রোজ রাত্রে মানুষ হয়, দিনে আবার বাঁদর হয়। একদিন রাত্তিরে ব্রাহ্মণের মেয়ে বাঁদরের খোলসটা পুড়িয়ে দিলে। তখন বাঁদর বল্‌লে,—

'আচির পাঁচির সোনার পাঁচির।'

তখন ঘর দোর সব সোনা হয়ে গেল। এমন কি কেউ পারে? বাঁদর নিশ্চয়ই ভগবান্। তারপর তারা সুখে ঘরকন্না করতে লাগলো।

—বাঁশপাহাড়ী, ১৯৬৪

মন্তব্য

অসম বিবাহ বা মানুষের পশুস্বামী (Animal husband) অভিপ্রায়টি এখানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বাঁদরের ভিতর হইতে মানুষের আবির্ভাব হইয়া কাহিনীর সুখকর সমাপ্তির মধ্যে একটু রূপকের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বাঁদর প্রকৃতির মানুষ নারীর স্পর্শে পূর্ণ মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে।

১১

বীর-পুরাণ

এক ছিল ভীষণ বড় বীর। কিন্তু ভীষণ বড় বীর হলে কি হবে, তার ঘরে খাবার অভাব। কিছু উপার্জনের প্রত্যাশায় সে ভাব্‌লো বিদেশে যাই। স্ত্রীকে বল্‌লো, 'কুঁড়ো (ছাতু) বেঁধে দাও, রাস্তায় খিদে পেলে খাবো।' খাবার নিয়ে বীর পথে বেরুলো। যাচ্ছে, অনেক দিন পেরোলো, অনেক মাস পার হয়ে বছর ঘুরে গেল প্রায় —বীর হেঁটেই যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একটা পুকুর দেখতে পেয়ে বীরের মনে হলো তার খিদে পেয়েছে। সঙ্গে কুঁড়ো ছিল, পুকুরের জলে সেগুলো ভিজতে দিলো সে। বিরাট পুকুরে তার কুঁড়োগুলো গেলো হারিয়ে। কিন্তু বীর তার জন্য বিব্রত নয়, সে পুকুরের সমস্ত জলই খেয়ে নিলো। এদিকে ঐ পুকুরে রোজ একটা হাতী জল খেতে আসতো, সে যথানিয়মে, যথাসময়ে এলো। শূন্য পুকুর দেখে হাতী তো রেগে খুন। সারা শরীর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাতী খুঁজতে লাগল, কোথায় সেই লোক যে এমন কাণ্ড করেছে। বীরকে দেখতে পেয়েই শুঁড় দোলাতে দোলাতে বীর বিক্রমে ছুটলো বীরকে সংহার করতে। হাতী তার দিকে ছুটে আসছে দেখেও বীর নির্ভয়ে বসে রইল। হাতী কাছে আসতেই বীর তাকে আছড়ে ফেলে ট্যাঁকে গুজে রাখলে অনায়াসে।

তারপর আবার পথ চলতে সুরু করলে সে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখতে পেলো যে দু'দিনের একটা ছেলে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। তখন সেই বীর সেই হাতী ট্যাঁক থেকে বের করে ছেলেটার সামনে ফেলে দিল। ছেলেটা দেখলো তার ঝাঁটার সামনে কি একটা পড়লো, সে সেটাকে ছুঁচো মনে করে ঝেঁটিয়ে ফেলে দিল। বীর এই ব্যাপার দেখে তো অবাক। বীর ভাবতে লাগল যে যার ছেলে এমন, তার বাবা না জানি কত বড় পালোয়ান। বীরের ঈর্ষা হলো, ভাবলো ছেলেটার বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে জয়ী হতে হবে। ছেলেটার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো যে তার বাবা কোথায়? ছেলেটা বীরের রাগকে তাচ্ছিল্য করে জানালো যে তার বাবা গেছে সাত শ' গাড়ী নিয়ে বনে কাঠ কাটতে।

ছুটতে ছুটতে বীর পেছনের গাড়ীটা ধরে টান মারলো। ছেলেটার বাবা কি একটা ধাক্কা অনুভব করে পেছনে ফিরে দেখে বীর দাঁড়িয়ে। সে বললো, 'যদি বড় বীর হও তো এস আমার সামনে।'

তারপর বাঁধলো তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে এতো ধূলো উড়তে লাগলো যে চারিদিক আঁধি হয়ে গেল। সেই সময় এক কাঁড়া পাইকার ঐ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তারা ভাবলো, ইস্‌স্‌, যদি কাঁড়াগুলো উড়ে যায় ধূলো ঝড়ে! ভয় পেয়ে তাদের একজন কাঁড়াগুলি একসঙ্গে বেঁধে মাথায় তুলে নিল।

ঠিক সেই সময়েই একটা চিল উড়তে উড়তে যাচ্ছিল, কাঁড়া পাইকারদের মাথার ওপর দিয়ে। চিলটা ভাবল, ওদের মাথায় বোধ হয় কিছু খাবার। এই ভেবে চিলটা ছোঁ মেরে ঐ পুটুলিটা নিয়ে ফুস্‌ করে উড়ে গেল। যেতে যেতে পথে পড়লো রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের ছাতে ছিলো অপরূপ সুন্দরী এক রাজকন্যা দাঁড়িয়ে। চিলটার পা ফসকে রাজকন্যার চোখে ঐ কাঁড়াগুলি উড়ে পড়লো। দাসী ছিলো রাজকন্যার পাশেই। তাকে রাজকন্যা বললো, 'ছাখ তো, দাসী, চোখে কি যেন পড়লো।' দাসী কাপড়ের খুঁটে কাঁড়াগুলি বের করে নিল।

এখন বলতো কে এদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বীর ?

মন্তব্য

অসম্ভব বীরত্বের অতিরঞ্জিত কাহিনী ইহাতে শুনিতে পাওয়া গেল। ইংরাজীতে ইহাকে unusual heroism বা অস্বাভাবিক বীরত্ব অভিপ্রায় বলা যায়। ইহাকে কাহিনীমূলক ধাঁধাও বলা যায়। কারণ, কাহিনীটি শেষ হইলে কাহিনীর বক্তা শ্রোতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বীর কে? যে যাহার বুদ্ধি অনুযায়ী এক একটি জবাব দিবে।

১২

দৈবের দান

একজন সদাগর বিদেশে এসে হঠাৎ মারা যায়। তার সঙ্গে ছিল অনেক হীরা-মাণিক-সোনা-টাকা। সে তার বালিসভরা সোনা, তোষকভরা হীরা-মাণিক সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে ফিরতো। বিদেশে হঠাৎ মারা যাওয়ায় সদাগরের সেই অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান কেউই পেলো না। এদিকে ঐ শহরেরই এক ধারে একজন মড়ি-পোড়া বামুন ছিল। একদিন রাতে এক মহাজন সেই বামুনকে ডাকতে এলো একটা মড়াপোড়ানোর জন্যে। পথে যেতে যেতে সেই মহাজন মড়ি-পোড়া বামুনের কানে কানে বল্লে—

আমার যটি কলি পড়বেক
ত'টি টাকা লাগবেক।

বামুন এই প্রস্তাবে সহজেই রাজী হয়ে গেল। মহাজন তখন সানন্দে বামুনকে শিখিয়ে দিল—

ফেলবে যাকে
লাড়ে চাড়ে দেখ্‌বে তাকে।

বিনিময়ে মহাজনের কাছ থেকে গুণে গুণে ছ'টা টাকা বামুন নিয়ে নিল। তারপর মড়াপোড়ানোর কাজ সেরে আরও দশটাকা মহাজনের কাছ থেকে পেলো, মজুরি হিসেবে। এর ওপর মহাজন তাকে পেট ভরে ফলারও খাইয়ে দিল।

বামুন কাজ সেরে বাড়ীর পথে পা বাড়িয়েছে, ঠিক সেই সময়ে আর একজন এসে সেই সদাগরের মড়াপোড়ানের কথা বল্লো। মরি পোড়া বামুন কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই সদাগরের মড়া নিয়ে শ্মশানে চল্লো। শ্মশানে গিয়ে মহাজনের কাছ থেকে শেখা উপদেশ মত কাজ করলো। সদাগরের জামা, কাপড়, বিছানাপত্রের ভেতর থেকে ধনরত্নের সন্ধান পেয়ে মরি পোড়া বামুন খুব বড় লোক হয়ে গেল। তাকে আর এখন মড়া ফেলতে হয় না।

মন্তব্য

কাহিনীটি বিশেষত্বহীন। তথাপি ভাগ্যের পরিবর্তন (reversal of fortune) ইহার অভিপ্রায় বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

১৩

যে কথা কথা নয়

মা গো মা, আমি কি জ্বালায় জ্বললাম গো! এত জ্বালান পারব না। আমি কি করিয়া সংসার চালাব গো। আমি ই জ্বালা সইতে পারব না, এত সুরের কল কলালি, ইয়া কি করিয়া আমি টেক্‌ব। তোমরা আপনার সংসার দেখিয়া লও, বাবারা। এখন তোমাদের সংসার হয়েছে, তোমরা আপনার ধরিয়া খাও। তোমার বাবা বসি বাখান করছে। আমি ভাল কথা বললে মন্দ হচ্ছে। আর আমি পারব না। বরং আমাকে খাইতে দিও না। তাও বড় জ্বালান জ্বলি, বরং আমার মরণটা হলে হায় করি। যেই বউয়ের না ছা ধরিব, সেই বউয়ের রাগ। আমার কে পর, আমার সব লোকই তো সমান। উহারা পরের বিটি। উহারা কি বেদন জানে, যা হয় তাই বলছে। আপনার মায়ের হলে বেদনা জানতো। পরের মার কি বেদনা জানে? যখনি আনে দিবি, তখনই ভাল। ওলো ওলো, এখন আমার গতর আছে বলে খাইতে দিচ্ছে, গতর পড়িলে কে কারটা লয়। খাল ভরা কি ঘরের বউ করলি ও। চিরকাল আমাকে জ্বালাচ্ছে। যখন না খাইতে দিবেক তখন মাগতে যাব, তখন আর তোদের কথা সইতে পারবো না। তখন বুড়ায় বলবে, আর বকিস না। উহারা করিয়া ধরিয়া খাক। নাই দিলে বা কি হলো, আমরা জমি বিচিয়া খাব। উহাদের জন্য কিছু রেখে যাব না। দেখি, কি করে খায়! কত খাটিয়া খায় দেখবো। এমন ঝি দেখি নাই লো! যাকে বলিব, তারই রাগ। একটা বউও ভাল হল না। বড় বউয়ের শিক্ষা সবটি শিখছে। মেজ বউয়ের বেশী মগজ; ছোট বউ তো বড়ালের ঝি। যত ভাল বল্‌ছি, তত হচ্ছে। বলি ছোট বউ সবকের ভাল হবে, তা না বড় বউয়ের শিক্ষা হচ্ছে। আর কেন এমন করিস তোরা। তোরা বললে কেন কথা শুনিস না। এত গণ্ডগোলি করিস্ না, লোক হাসি হচ্ছে। লোকে শুনলে বলবেক্ কি? শাউরীরই দোষ হবে। তোমরা বউয়ের গুণ জান, মা। তখন বেটার বউয়ের কথা শুনবে। তখন মা বাপ পর হবেক। —বাঁশপাহাড়ী, ১৯৬৪

মন্তব্য

ইহা একটি নূতন ধরণের লোক-কথা। ইহাতে কোন কাহিনী বর্ণিত হয় নাই; বরং তাহার পরিবর্তে মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

জীবন-প্রতীক্

প্রত্যেক দেশের রূপকথায় একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়; তাহাতে দেখা যায়, মানুষের প্রাণ তাহার দেহের মধ্যে না থাকিয়া একটি স্বতন্ত্র বস্তুর মধ্যে আশ্রিত হইয়া থাকে। সেই বস্তুটির দ্বারাই তার জীবন-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত কিংবা নিরূপিত হয়। ইংরেজিতে তাহাকে Life token বা Life index বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বাংলা মনসা-মঙ্গল কাব্যে দেখা যায়, বেহুলা যখন লখীন্দরের মৃতদেহ লইয়া স্বর্গের পথে যাত্রা করিলেন, তখন তিনি তাঁহার শাশুড়ী সনকার নিকট একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে যদি বিনা তৈলে কিংবা মাত্র এক কড়ার তৈলে এই প্রদীপ ছয় মাস জ্বলিতে থাকে, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার পুত্র লখীন্দর বাঁচিয়া উঠিয়াছে। প্রদীপ নিভিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা নাই। এখানে প্রদীপ লখীন্দরের জীবনের প্রতীকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। মনসা-মঙ্গল হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

বেহুলা বিনয়ে বলে শাশুড়ীর তরে
'মরা পুত্র জীয়স্তে পাইবে তুমি ঘরে।'
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া
শাশুড়ীর তরে বলে বিনয় করিয়া।
'কড়ার তৈলেতে দীপ ছয় মাস জ্বলিবে,
তবে সে জানিবে মোর লখীন্দর জীবে।
সিজান ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে,
মরা পুত্র জীয়স্তে পাইবে তুমি ঘরে।'
প্রভুর ব্যঞ্জন অন্ন পুরি হেম থালে,
পুঁতিয়া রাখিল নিয়া দাড়িম্বের তলে।
অঙ্গারে ময়ুর রামা বাসরে লিখিয়া,
শাশুড়ীরে বলে রামা বিনয় করিয়া।
'ছয় মাস বই যদি ময়ুরে পেখম ধরে,
তবে সে জানিবে প্রভু আসিবেন ঘরে।

—বিজয় গুপ্ত

এখানে প্রদীপ এবং অঙ্গারে অঙ্কিত ময়ূরের চিত্রের মধ্যে লখীন্দরের জীবনের নির্দেশিকা রক্ষা করা হইল।

'গোপীচন্দ্রের গান' নামক নাথ-গীতিকার মধ্যেও দেখা যায়, গোপীচন্দ্র তাঁহার সন্ন্যাসযাত্রার সময় তাঁহার দুই পত্নীর নিকট একটি পাশার গুটি রাখিয়া গিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ইহা যে দিন উল্টাইয়া পড়িয়া যাইবে সে দিন বুঝিবে আমার মৃত্যু হইয়াছে। তারপর একদিন—

'যেন কালে ধর্মী রাজা রাণীর নাম নিল।
সত্যের পাশা চিহ্ন থুইছে চালত আউলাইয়া পড়িল ॥
রদুনা পদুনা রাণী কান্দিতে লাগিল ॥
যে দিন বোলে সত্যের পাশা পড়িবে আউলিয়া।
নিশ্চয় বিদেশে প্রাণপতি যাইবে মরিয়া ॥
আইজ আরো সত্যের পাশা পড়িল আউলিয়া।
নিশ্চয় বিদেশে প্রাণপতি যাইবে মরিয়া ॥' —পৃঃ ২২৭

এখানে পাশার গুটি রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের জীবনের নির্দেশিকারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বোদ্ধৃত মনসা-মঙ্গলের প্রদীপের আলো এবং এখানে পাশার গুটি ইহারা যথাক্রমে লখীন্দর ও গোপীচন্দ্রের জীবনের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ডালিমকুমারের কাহিনীতে জীবন-প্রতীকের প্রকৃতিটি একটু স্বতন্ত্র। সেখানে একটি সোনার হারের মধ্যে ডালিমকুমারের প্রাণটি আশ্রিত—এই হার গলায় পরিলেই রাজপুত্রের মৃত্যু, গলা হইতে খুলিয়া রাখিলেই তাহার জীবন আবার ফিরিয়া আসে। ইহাও এক প্রকৃতির জীবন-প্রতীক্। হারটি ব্যবহারের মধ্য দিয়া এখানে জীবন-মৃত্যু নিরূপিত হইতেছে। এই জীবন-প্রতীক্ যখন কোন বস্তুর পরিবর্তে জীব বা প্রাণীর মধ্যে আশ্রিত থাকে, তখন সেই প্রাণীকে বধ করিলেই যাহার জীবন তাহাতে আশ্রিত থাকে, তাহার মৃত্যু হয়। সেই জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গচ্ছেদ করিলেই তাহারও অনুরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হয়। তারপর প্রাণনাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণনাশ হয়। তাহার একটি দ্বৈত শারীর সত্তা প্রকাশ পায়। একটির বিনাশে আর একটির বিনাশ।

পৃথিবীর সকল দেশের লোক-কথারই ইহা একটি বিশেষ অভিপ্রায়। ইউরোপ এবং এশিয়া সকল অঞ্চলেই এই শ্রেণীর কাহিনী ব্যাপকভাবে

শুনিতে পাওয়া যায়। লোক-সাহিত্য এবং লোক-বিশ্বাসের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। যে সকল ক্ষেত্রে অলৌকিকভাবে কোন সন্তানের জন্ম হয়, সেখানে জন্মের পূর্বেই ইহার বিষয় জানাইয়া দেওয়া হয়। যেমন ডালিমকুমারের কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়, যে ফকির রাজাকে পুত্রবর দিলেন, তিনিই তাঁহাকে বলিয়া দিয়া গেলেন যে তাঁহার পুত্রের প্রাণ একটা হারের মধ্যে থাকিবে। সেই হার আবার একটি বোয়াল মাছের পেটে থাকিবে। সুতরাং এই জীবন-প্রতীক্ (life token) এবং তাহার ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁহার জন্মের পূর্ব হইতেই রাজা জানিতে পারিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার নিকট হইতে সুয়ারাণীও তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তবে ডালিমকুমার জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা জানিতে পারেন নাই, বিমাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইবার ফলে জানিতে পারিয়াছিলেন। তেমনই রাক্ষস-রাক্ষসীর প্রাণও কিসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, রাজকন্যা জানিতে পারে এবং সেই অনুযায়ীই তাহাদের হত্যা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক সময় এই প্রকার জীবন-প্রতীক্ জাতকের জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মার আধার কোন জীবিত প্রাণীও যেমন হইতে পারে, আবার নির্জীব জড়পদার্থও হইতে পারে। সজীব প্রাণী হইলে বাংলাদেশে তাহা প্রায়শই ভ্রমর হইয়া থাকে, সেই ভ্রমর কোন স্ফটিক স্তম্ভে আবদ্ধ থাকে। বাংলার জনশ্রুতিতে সর্বদাই আত্মার আধার ভ্রমর; এই দেশের দেহতত্ত্বের গানে ভ্রমর অর্থই আত্মা, সেইজন্যই ভ্রমর আত্মার আধাররূপে কল্পিত হয়। আত্মার আধার যদি কোন বস্তু (বা material object) হয়, তবে তাহার রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহার অধিকারী ব্যক্তির শুভাশুভ কিংবা জন্মমৃত্যু নির্ণিত হইয়া থাকে। তাহা কোন সময় একটি ছুরিকা হইতে পারে, ছুরিকায় যদি মরচে ধরিয়া যায় কিংবা তাহা হইতে যদি রক্তের ধারা ক্ষরিত হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে ইহার অধিকারীর বিপদ হইয়াছে। ইহা যদি কোন ধাতু কিংবা রত্ন হয়, তবে ইহার ঔজ্জ্বল্য কিংবা মলিনতা দেখিয়া ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় লোক-কথায় অনেক সময়ই তাহা কোন বৃক্ষ কিংবা লতা হইতে পারে। উপরি-উদ্ধৃত শঙ্খকুমারের একটি গল্প হইতেও দেখিতে পাওয়া যায়, রাজার বড় ছেলে রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার পূর্বে নিজের হাতে একটি

গাছ লাগাইয়া গিয়াছিল, তারপর ভাইকে বলিয়া গিয়াছিল, যখন দেখিবে গাছটি শুকাইয়া গিয়াছে, তখন বুঝিবে আমার কোন বিপদ ঘটিয়াছে। বৃক্ষ কিংবা লতাটি নিস্তেজ এবং মলিন হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে, ইহার অধিকারীর কোন বিপদ দেখা দিয়াছে।

তারপর বৃক্ষের মৃত্যু হইলে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু হইয়া থাকে। একটি কাশ্মীরী রূপকথায় এমন একটি হারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, যাহা ধারণ করিলে দৈহিক সকল বিপদ হইতেই রক্ষা পাওয়া যায়, ইহা খুলিয়া ফেলিলেই মৃত্যু হয়। তাহার জীবন-মৃত্যু ইহার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ডালিমকুমারের কাহিনীর মধ্যে দেখা যায় যে, অন্যের ধারণ করা না করার মধ্যে নায়কের জীবনমৃত্যু নির্ভর করিয়াছে।

আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, মেলানেসিয়া, তাসমেনিয়া এই সকল দেশের উপজাতির মধ্যেও জীবন-প্রতীকের বিশ্বাস অত্যন্ত ব্যাপক এবং প্রবল। উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদিগের মধ্যেও এই বিশ্বাসের অস্তিত্ব আছে। ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন উদ্ভিদ জীবন-প্রতীকের আধার—ইহা শুকাইলেই জীবনের বিনাশ, ইহা পুষ্টিলাভ করিলেই জীবনের স্ফূর্তি। অনেক সময় তাহা কোন মৃৎপাত্র কিংবা লাঠি বা ছড়িও হইতে পারে, ইহারা ভাঙ্গিয়া গেলেই জীবনের বিনাশ বুঝায়।

মনসা-মঙ্গলের যে বিশ্বাসের কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম, তাহার অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় ব্রিটেনি হইতেও পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে দেখা যায়,

'The fisherman's wife puts a candle at the alter, if it burns well all goes well with her husband : if it flickers he is imperiled ; if it goes out he is drowned,'

অনেক সময় বাস্তুসাপকেও জীবন-প্রতীক্ বলিয়া মনে করা হয়। গৃহে কাহারও জন্ম হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বাস্তুসাপেরও জন্ম হয়, বাস্তুসাপটি যতদিন বাঁচিয়া থাকে, জাতকও ততদিনই বাঁচিবে। সেইজন্য বাস্তুসাপটিকে সর্বদা সতর্কতার সহিত পরিচর্যা করা হয়। কারণ, তাহার গায়ে আঘাত লাগিলে জাতকের গায়েও আঘাত লাগিবে বলিয়া বিশ্বাস।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

(কালানুক্রমিক)

১। মধুমালা (১৯৩৬)

২। শব্দ ও উচ্চারণ (১৯৩৬)

৩। মনের আগুন (১৯৩৬)

৪। আজব বেদ (১৯৩৬)

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৬৪)

৬। An Introduction to the Study of Medieval Bengali Epics (1943)

৭। কাব্য-সঞ্চয় (১৯৪৩, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৬)

৮। শিক্ষার পথে (১৯৪৬)

৯। Early Bengali Saiva Poetry (1950)

১০। বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, ২য় সং ১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

১১। বাংলার লোক-সাহিত্য, প্রথম খণ্ড (১৯৫৪, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২)

১২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (১ম সং ১৯৫৫, ২য় সং ১৯৬০)

১৩। 'শিবায়ন' (১৯৫৬), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত

১৪। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৫৮, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৫৮)

১৫। 'গোপীচন্দ্রের গান' (১৯৫৯), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

১৬। 'নীল-দর্পণ' (১৯৫৯, দ্বিতীয় সং ১৯৬২)

১৭। 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৯৫৯) ঐ

১৮। বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত কথা (১৯৫৯, চতুর্থ সং ১৯৬০)

১৯। 'কাদম্বরী' (১৯৬০, দ্বিতীয় সং ১৯৬৪)

২০। গীতিকবি শ্রীমধুসূদন (১৯৬০)

২১। বাংলার লোকশ্রুতি (১৯৬০)

২২। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (১৯৬১)

২৩। বনতুলসী (১৯৬১)

২৪। 'স্বর্ণলতা' (১৯৬২)

২৫। 'প্রফুল্ল' (১৯৬২, ২য় সংস্করণ ১৯৬৩)

২৬। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ১ম খণ্ড (১৯৬২), বেঙ্গল মিউজিক কলেজ প্রকাশিত

২৭। সেকালের কথা ও কাহিনী (১৯৬২, দ্বিতীয় সং ১৯৬৩)

২৮। বাংলার লোক-সাহিত্য, ২য় খণ্ড (১৯৬৩)

২৯। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬৩)

৩০। যতীন্দ্রপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৩)

৩১। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ২য় খণ্ড (১৯৬৩), বেঙ্গল মিউজিক কলেজ প্রকাশিত

৩২। বাংলার লোক-সঙ্গীত ৩য় খণ্ড (১৯৬৪) „ „ „

৩৩। বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১৯৬৪)

৩৪। মহাকবি শ্রীমধুসূদন (১৯৬৪)

৩৫। 'জনা' (১৯৬৪)

৩৬। বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (১৯৬৪)

৩৭। সোভিয়েতে বঙ্গসংস্কৃতি (১৯৬৪)

৩৮। বাংলার লোক-সঙ্গীত, ৪র্থ খণ্ড (১৯৬৫)

৩৯। বাংলার লোক-সাহিত্য, ৩য় খণ্ড

৪০। বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর ১ম খণ্ড (১৯৬৬)

৪১। রবীন্দ্রনাট্যধারা (১৯৬৬)

৪২। বাংলার লোক-সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড